অনীশ দেব
বারোটি
রহস্য
উপন্যাস

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

বারোটি রহস্য উপন্যাস

অনীশ দেব

কেন্দ্র কবুতর

কেন্দ্র কবুতর

ছিটকে গিয়ে পড়লম ঘরের কোনায় রাখা শৌখিন টেবিলটার ওপর। মট করে ভেঙে গেল ওটার পায়া। টেবিলের ওপর থেকে কাচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল। আবার যখন ভালো করে তাকালাম, তখন আমার জিভের ডগায় নোনতা স্বাদটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রায় ছফুট লম্বা লোকটি পায়ে-পায়ে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। ফাঁসফেঁসে গলায় বলল, আমার কাছে রিভলভারও আছে।

এ-কথা বলার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওর একটা ঘুষিতেই আমি সরষেফুল দেখছিলাম। কোনওরকমে বললাম, কী কী চাই তোমার? যদিও মনে-মনে ভালোই বুঝতে পারছিলাম যে ও কী চায়।

লোকটি বলল, পাণ্ডুলিপিটা।

ওই ব্যথার মধ্যেও আমার চোখে বোধহয় একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। সেটা দেখে লোকটি বলল, আমার দলের চিহ্ন– বলে একটা কাগজ ওর জামার বুকপকেট থেকে বের করে আমার হাতে দিল।

কাগজটার মধ্যে লাল রঙ দিয়ে তোলা একটা হাতের পাঞ্জার ছাপ। ওটা দেখছিলাম, লোকটির কথায় আমার চমক ভাঙলঃ আমি লালপাঞ্জা দলের কমরেড।

আমি হেসে বললাম, এটা খুব উঁচুদরের অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, ঠিক ধরতে পারছি না। তবে মনে হয়, ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়ের ছবি, তাই না?

উত্তরে একটা বুটসুদ্ধ ভারি পা দড়াম করে এসে পড়ল আমার চোয়ালে ও পাণ্ডুলিপিটা বের করে দাও।

মনে-মনে রাগ হলেও আমি নিরুপায়। বললাম, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আছে, বলে ওর পেছনে আঙুল নিয়ে দেখালাম। লোকটি ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকাল।

ব্যস, ওই একটি মুহূর্তই যথেষ্ট ছিল আমার কাছে। একটুও দেরি না করে টেবিলের ভাঙা পায়াটা তুলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সর্বশক্তি দিয়ে বসিয়ে দিলাম ওর চোয়ালে। ফট করে একটা শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে অতবড় দেহটা সটান পড়ে গেল মেঝেতে।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালাম। লোকটি ঢুকল কোথা দিয়ে! ভালো করে দেখেশুনেও কোনও দরজা খোলা দেখলাম না। তবে কি জানলা দিয়ে ঢুকেছে! এই ভেবে এগিয়ে গেলাম জানলার কাছে।

দূরে হোটেলের কার পার্কের সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে দিল। এও কি লালপাঞ্জার কমরেড নাকি? রহস্যের জট ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখছি!

প্রথম থেকে ভাবতে লাগলাম ঘটনাগুলো।

ঘটনার শুরু সেইদিন থেকে, যেদিন অশোকের সঙ্গে আমার দেখা হয় কলকাতায়–একরকম হঠাৎই বলতে হবে।

নিত্তনৈমিত্তিক একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাওয়ার আশায় সন্ধের সময় গিয়েছিলাম ময়দানে। ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই দেখা হয়েছিল অশোকের

সঙ্গে। অশোক বোস–আমার স্কুলের বন্ধু ছিল ও।

আরে, কাঞ্চন না!

চন্ডাশোক নিশ্চয়ই! আমিও কম অবাক হয়নি।

হ্যাঁ। তা কী করছিস এখন?

এই দেশভ্রমণ বলতে পারিস হালকা সুরে জবাব দিয়েছিলাম।

আচ্ছা, কাঞ্চন, আমার একটা কাজ করে দিবি?

একটু আশ্চর্য হয়ে বলি, কী কাজ?

খুবই সামান্য একটা ম্যানাস্ক্রিপ্ট একজন প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তা সেটা আমাকে করতে বলছিস কেন? জানতে চাইলাম আমি।

দ্যাখ, তোকে খুলেই বলি, বলল অশোক, তুই নিশ্চয়ই সিরাজনগর স্টেটের নাম শুনেছিস?

হ্যাঁ–শুনেছি। না শুনলেও বললাম আমি।

সেই সিরাজনগরের রাজা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব রায়। তিনি সিনেমার এক হিরোইনকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুলক্ষণা সেন। পরে সিরাজনগরের বিপ্লবীরা বিপ্লবের সময় রাজা-রানীকে খুন করে। শোনা যায় এর পেছনে নাকি লালপাঞ্জা নামে একটা দলের হাত ছিল। রানী সুলক্ষণা অভিনেত্রী ছিলেন বলে তার ওপর বিপ্লবীদের রাগ বোধহয় বেশি ছিল। তাকে ওরা এমনভাবে পিটিয়ে মেরেছিল যে, রাজবাড়ির সিঁড়ির ওপর শুধু এক তাল মাংসপিণ্ড পড়ে ছিল। এরপর শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের প্রথম পক্ষের ছেলে অতলান্ত রায় রাজা হন।

রানী সুলক্ষণার ব্যাপারটা তিনি জানতেন না। রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার সময় রানীর মৃত্যুর খবর পান তিনি। কিন্তু কিছুদিন পর গুপ্তঘাতকের ভয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে শোনা যায় যে, তিনি নাকি নেপালে এক অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। কিছুদিন পর অবস্থা শান্ত হলে রণজিৎ সেন রাজ্যের দায়িত্ব নেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠায় তিনি অর্থ সাহায্যের জন্যে দু-একটি প্রদেশের কাছে গোপনে আবেদন জানান।

কিন্তু এর মধ্যে পাণ্ডুলিপিটা আসছে কোত্থেকে? এতক্ষণ পর অধৈর্য হয়ে উঠি আমি।

আসছে—আসছে। একটু ধৈর্য ধরে শোন, বলে অশোক আবার শুরু করল, তুই নিশ্চয়ই সুরেন্দ্র পালিতের নাম শুনেছিস? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও বলে চলল, সুরেন্দ্র পালিত ছিলেন সিরাজনগরের রাজা শুদ্ধসত্ত্বর মুখ্য প্রতিনিধি। এই দিনসাতেক হল তিনি মারা গেছেন। এই পালিতসাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল একটু বিচিত্রভাবে। সে আজ প্রায় বছরদুয়েক আগের কথা। সিরাজনগরে আমি গিয়েছিলাম অফিসের কাজে—সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে। একদিন রাতে একটা অন্ধকার গলিতে দেখি দুটো লোক একজন বৃদ্ধ লোকের ওপর চড়াও হয়েছে। রাস্তায় আর লোকজন ছিল না। আমি ছুটে গিয়ে ওদের ওপর পড়ি। তারপর আমার সেই পুরোনো অভিজ্ঞতা সামান্য পরিমাণে অবোধ শিশুদুটোকে দান করলাম। বলে প্রাক্তন জেলা বক্সিং চ্যাম্পিয়ন অশোক হাতের মাসল ফুলিয়ে দেখাল। আমরা একসঙ্গেই বক্সিং শিখতাম।

বললাম, তারপর?

তারপর আর কী, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি আজ কার জীবনরক্ষা করলেন? আমি বললাম, না—আমি এখানে নতুন এসেছি। তিনি বললেন, আমার নাম সুরেন্দ্র পালিত।...চমকে উঠলাম আমি। কারণ ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে কানাঘুষোয় অনেক কথাই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম সুরেন্দ্র পালিতই নাকি রাজা শুদ্ধসত্ত্বের পেছনে বসে সবকিছুর কলকাঠি নাড়তেন। যাকগে, তিনি বললেন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ—আমার মনে থাকবে। এরপর তিনি আমার নাম-ঠিকানা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

এতদিন পর হঠাৎ সেদিন–এই দিনদশেক আগে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খবরের কাগজেই দেখেছিলাম, তিনি কলকাতায় আছেন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তখন ভীষণরকম অসুস্থ। আমাকে দেখে বললেন, মিস্টার বোস, আপনার ওপর আমি খুব বড় একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাই। সিরাজনগরের রাজনীতির সমস্তরকম খেলারই সাক্ষী ছিলাম আমি। প্রচুর গুপ্তকথাও জানতে পেরেছিলাম। আমি আজ আমার স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটা আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি দিল্লি যাবেন। সেখানে এক পাবলিশার্স আছে– মেহেতা অ্যান্ড সন্স। তাদের হাতে আপনি এই পাণ্ডুলিপিটা সামনের মাসের মধ্যে তুলে দিলে তারা আপনাকে পনেরো হাজার টাকা দেবে। এইরকমই কথা আছে। আপনি না করবেন না, মিস্টার বোস। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা শোধ দেওয়ার এই আমার শেষ সুযোগ। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। কথা দিন আপনি।

আমি কথা দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে একটা মোটা পাণ্ডুলিপি দেন। আমি সেটা নিয়ে আমার কাছে রাখি। কিন্তু তারপর থেকে একদম সময় করে উঠতে পারছি না। এর ওপর পরশুদিনই অফিসের কাজে একবার রাজস্থান যেতে হবে। এখন তুই এই কাজের ভারটা নিতে পারিস। পনেরোর মধ্যে পাঁচ হাজার তুই নিস, আর আমাকে বাকিটা দিয়ে দিস–রাজি? অশোক হাসিমুখে তাকাল আমার দিকে।

অশোকের কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাই সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম বললাম, আপত্তির কী আছে! কিন্তু রণজিৎ সেন এখন কোথায়, দিল্লিতে?

ঠিকই ধরেছিস, বলল অশোক, সেখানে কুমার রণজিৎ কয়েকজন বিরাট বিজনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন, রাজ্যের অর্থসঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্যে। কয়েকজন বিজনেসম্যান সিরাজনগরে তেলের কোম্পানি খোলার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন।

সেই ব্যাপারেই রফা করে একটা চুক্তি হবে আর কী। ও চাই তেল, আর এ চায় টাকা। বলে অশোক হাসল।

আচ্ছা, অশোক, রণজিৎ সেন শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের ঠিক কীরকম রিলেটিভ হন?

কুমার রণজিৎ শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের শ্যালক। ওহ্-হো, আর-একটা কথা তোকে বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, কাঞ্চন। আমার কাছে কতকগুলো চিঠি আছে। আশ্চর্যভাবেই পেয়েছিলাম ওগুলো। একবার একজন নেপালিকে আমি খুব রিস্ক নিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কৃতজ্ঞতায় সে একটা চিঠির বান্ডিল আমাকে দিয়েছিল।

হেসে বাধা দিলাম আমি : মাইরি, একটা বই লেখ তুই, যাহাদের আমি প্রাণরক্ষা করিয়াছি।

শোনই না আগে! লোকটি আমাকে যা বলল, তা হল যে, ওই চিঠিগুলো সে একটি লোকের কাছ থেকে পায়। লোকটির পকেটে সে নাকি একটা লালপাঞ্জার ছাপওয়ালা কাগজ দেখতে পায়। লোকটি গুরুতর অসুস্থ ছিল। সে মারা যাওয়ার আগে শুধু বলেছিল ভীষণ দামি চিঠি এগুলো। তাই সে কৃতজ্ঞতায় এগুলো আমাকে দিচ্ছে। যা হোক, পরে আমি এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করি যে, পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা আর চিঠির হাতের লেখা একেবারে এক। তবে কি সুরেন্দ্র পালিতই চিঠিগুলো লিখেছেন? কিন্তু চিঠির নীচে সই আছে দিল্লির কোনও এক মিসেস সুচরিতা চৌধুরির। অনেকগুলো চিঠি–আমি আর পড়ে দেখিনি। ওগুলোও তুই নিয়ে আমাকে রেহাই দিস। আর পারলে ওই সুচরিতা চৌধুরীকে চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে দিস।

এরপর আমি অশোকের সঙ্গে গিয়ে পাণ্ডুলিপি আর চিঠি নিয়ে অশোকেরই বুক করা এয়ার টিকেটে দিল্লি রওনা হই। তা এই অতি সামান্য কাজের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা বা মন্দ কী? কিন্তু তখন কি জানতাম, কী সাঙ্ঘাতিক বিপদ হায়েনার মতো হাঁ করে বসে রয়েছে আমারই জন্যে– দিল্লিতেই!

.

ঘরের জানলা দিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল সুচরিতা চৌধুরী। এ-জীবন আর ভালো লাগছে না। ওর মনে পড়ছিল সিরাজনগরের দিনগুলোর কথা। সেখানে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিল অমিত-অমিত চৌধুরী। ওর কথা মনে পড়লে মাঝে-মাঝে এই পোড়া মনটা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। হয়তো একথা সত্যি যে, অমিত সুচরিতাকে ভালোবাসেনি– যন্ত্র হিসেবেই দেখেছে চিরকাল। অথচ কী যে হয়েছিল ওই আঠেরো বছর বয়েসটায়! সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে অমিতকেই হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছিল ও। বিয়ের পর স্বামীর জন্য সবরকম কাজই করেছে। উঃ–সেই বিপ্লবের রক্তাক্ত দিনগুলো, যেদিন শেষবারের মতো আর্তনাদ করে উঠেছিল অমিত। ওর মনে পড়ল লালপাঞ্জা দলের কথা। আজ পর্যন্ত ও সে-দলের কাউকেই দেখেনি। তবে একটা কাগজ দেখেছিল অমিতের কাছে তাতে একটা পাঞ্জার ছাপ ছিল লাল রঙের। সেটা নিশ্চিত বিপদের ইশারা বয়ে এনেছিল।

অমিতের মৃত্যুর পর যখন ও সিরাজনগর ছেড়ে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য দিল্লির দিকে পা বাড়িয়েছিল, সেইসময় ওকে রণজিৎ সেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অমিত চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাহায্যের প্রতিদান দিতে তিনি যে অক্ষম সে কথাই জানিয়েছিলেন। বারবার করে। সুচরিতা লজ্জা পেয়েছিল। এর পরই ও দিল্লিতে চলে আসে। টাকার অভাব ওর ছিল না–এখনও নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে।

এই প্রসঙ্গেই ওর মনে পড়ল সুরেন্দ্র পালিতের কথা। তার স্মৃতিকথা লেখার ব্যাপারটা। ম্যানাস্ক্রিপ্টের কথা। হেন ব্যাপার বোধহয় ছিল না, যা সুরেন্দ্র পালিত না জানতেন। এখন যদি ম্যানাস্ক্রিপ্টটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তা হলে! তা হলে যে সর্বনাশ হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কুমার রণজিৎ একেবারে অথৈ জলে পড়বেন, অথৈ জলে পড়বে লালপাঞ্জা দলের কমরেডরাও। আর হ্যাঁ, আর অসুবিধেয় পড়বে সমর বর্মন। তবে সবচেয়ে বেশি অসুবিধেয় পড়বে সিরাজনগর।

সমর বর্মনকে নিজের লাইনে শিল্পী বলা যেতে পারে। লোকটার সঙ্গে সুচরিতার সামনাসামনি পরিচয় নেই, কিন্তু তার সম্বন্ধে এত কথা শুনেছে যে, তার চরিত্র সুচরিতার কাছে একটুও অচেনা নয়। লোকটা বহুবার প্রমাণ করেছে চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা। এরকম নিখুঁত টাইপের হীরে চোর ও ব্ল্যাকমেলার কেউ বোধহয় কোনওদিন দেখেনি। সুরেন্দ্র পালিত বহুবার সমর বর্মনকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর সফলও হয়েছিলেন। সমর বর্মন জেলে গিয়েছিল তিন বছরের জন্য।

কিন্তু এখন? হ্যাঁ, এর মধ্যে তার মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়ে সে বোধহয় ছাড়া পেয়ে গেছে। এই বর্মন লোকটা ছদ্মবেশ নিতে এত ওস্তাদ যে, ধারণার বাইরে। এককথায়, সমর বর্মন তার লাইনে সম্রাট। সে যখন সুরেন্দ্র পালিতের হাতে ধরা পড়েছিল তখন সুরেন্দ্র পালিত নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতিকথায় বর্মন সম্পর্কে অনেক কথাই লিখে গিয়েছেন, যা পুলিশ জানতে পারলে বর্মন মুশকিলে পড়বে।

সিরাজনগর যে মুশকিলে পড়বে তারও কারণ আছে। কারণ, কুমার রণজিতের আর্থিক অনটনের কথা বাইরের কেউই বিশেষ জানেন না। জানলে কুমার রণজিৎ সারা ভারতের কাছে ছোট হয়ে যাবেন। কিন্তু সুরেন্দ্র পালিত যদি এই সব ব্যাপারে খোলসা করে লিখে গিয়ে থাকেন ওই পাণ্ডুলিপিতে? নাঃ, পরের ব্যাপার আর ভাবতে পারছে না সুচরিতা। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সত্যিই সাঙ্ঘাতিক।

আবার অমিতের কথা মনে পড়ল সুচরিতার। ভালোবাসা কথাটার প্রকৃত সংজ্ঞা সুচরিতা জানে না। অনেকেই এখন ওকে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুচরিতা তাতে হেসেছে। যদিও অত্যন্ত স্বাভাবিক এই ব্যাপারটা। কারণ ওর তিরিশ বছরের সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, কটাক্ষ, চেহারা ইত্যাদিকে অবহেলা করা কোনও পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখনও কোনও-কোনও বিজ্ঞাপনের কাজে সুচরিতা নিজের অমূল্য সময় খরচ করে। নাম করা সিনেমার কাগজেও ওর ছবি মাঝে-মাঝে ছাপা হয়। তবু একটা কিছুর অভাব যেন ও বুঝতে পারে।

এমন সময় ফ্ল্যাটের বেল বেজে উঠল। চটপট উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল সুচরিতা। দরজায় মৃদু হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ সান্যাল। ছিপছিপে চেহারার যুবক। চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। বয়স সুচরিতার চেয়ে কমই। আটাশ কি উনতিরিশ। তবু ছেলেটা ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চায়। সত্যি, কী বিচিত্র!

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তরুণ বলল, সুচরিতা, একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। মানেকজি পাঠিয়েছেন আমাকে বুঝতেই তো পারছ।

দরজা বন্ধ করে সুচরিতা এসে চেয়ারে বসল। বলল, কী জরুরি খবর, শুনি?

মানেকজি আমাকে আজ সকালে বললেন, তোমাকে ফোন করে একটা খবর দিতে। আমি ফট করে বলে দিলাম ফোন খারাপ আছে, যাতে তোমার সঙ্গে অন্তত দেখাটা হয়। তখন তিনি আমাকে পাঠালেন কুরিয়ার হিসেবে।

তরুণ সান্যাল মানেকজিপ্রসাদজি ফার্মের পার্টনার মানেকজির প্রাইভেট সেক্রেটারি। সারাদিনে বেচারা একদম ছুটি পায় না, খালি ডিক্টেশন আর টাইপ।

রাবিশ বিরক্ত গলায় বলল তরুণ, আমার আর ভালো লাগছে না, সুচরিতা।

কেন, বেশ তো আছ। যাকগে, জরুরি কথাটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়? মুচকি হেসে জানতে চাইল সুচরিতা। ও জানে তরুণ সান্যাল বোকা নয়।

তা, মোটামুটি জানি বইকী। ইতস্তত করে বলল তরুণ, তুমি বরং মানেকজির কাছ থেকেই শুনে নিয়ো।

তরুণ! ঈষৎ ভৎর্সনা, কটাক্ষ, চোখের ইশারা-ব্যস ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল তরুণের পক্ষে। গড়গড় করে বিগলিতকণ্ঠে বলতে শুরু করল তরুণ, সুচরিতা, ব্যাপারটা সিরাজনগরের সঙ্গে, সুরেন্দ্র পালিতের সঙ্গে কানেক্টেড। অশোক বোস নামে এক ভদ্রলোক দিল্লি আসছেন

আগামীকাল। সুরেন্দ্র পালিতের স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটা তার কাছেই আছে। তিনি সেটা এখানকার কোনও এক পাবলিশার্সের কাছে পৌঁছে দেবেন। তুমি তো বুঝতেই পারছ—ওই পাণ্ডুলিপি এখন ছেপে বেরোলে সর্বনাশ হবে। সেইজন্যেই মানেকজি আর প্রসাদজি খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। তোমার মনে আছে, গত বছর মিস্টার পালিত একবার কবুতর-এ এসেছিলেন, কিছু গোপন ব্যাপার আলোচনা করার জন্যে?

হ্যাঁ মনে আছে। উত্তর দিল সুচরিতা।

কবুতর! প্রসাদজির বাগানবাড়ি। শহরতলিতে বিরাট জায়গা নিয়ে তৈরি এই কবুতর। মাঝে মাঝে গোপন মিটিং থাকলে প্রসাদজি ওই কবুতরকেই ব্যবহার করেন। এবারও সেই তেলের ব্যাপারটা, টাকার ব্যাপারটা, আলোচনার জন্য একটা ঘরোয়া মিটিং ডাকা হয়েছে ওই কবুতরে।

এবারের মিটিংয়ের আলোচনার বিষয় কিন্তু অন্য। কুমার রণজিতও আসছেন। মানেকজি তোমাকেও ওই মিটিং-এ থাকতে বলেছেন। আর...।

তরুণকে ইতস্তত করতে দেখে সুচরিতা হাসল, বলল, শ্রীঅশোক বোসও আশা করি ওই মিটিং-এ আসছেন!

না, এখনও বোধহয় তাঁকে বলা হয়নি। আগামীকাল তিনি এসে হোটেল কন্টিনেন্টালে উঠছেন। তারপর নিশ্চয়ই বলা হবে।

ও, এবার বুঝেছি, ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে সুচরিতা বলল, তা হলে কবুতরে গিয়ে আমাকে ওই ভদ্রলোককে কবজা করতে হবে, যাতে তিনি আমার ছলাকলায় মুগ্ধ হয়ে ওই ম্যানাস্ক্রিপ্ট পাবলিশার্সের কাছে না দেন!

বুঝতেই তো পারছ, সুচরিতা। এতে তোমারও স্বার্থ আছে। তুমি কি চাও যে, ওই ম্যানাস্ক্রিপ্ট ছেপে বেরোক?

দ্যাখো তরুন, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি তা চাই না। কিন্তু তা বলে মনের দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠতে পারল না সুচরিতা, বলল, যাকগে, আমি সোজাসুজি মানেকজিকেই আমার মত জানাব।

আচ্ছা, সুচরিতা, একটা কাজ করলে হয় না?

কী? অবাক হয়ে তরুণের মুখের দিকে তাকাল সুচরিতা। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তরুণ বোধহয় নতুন কিছু বলবে।

চলো না, আমরা দুজন একটু বেড়িয়ে আসি। মানেকজিকে গিয়ে বললেই হবে যে, আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

না, তরুণ, আমার ঠিক মুড নেই। তা ছাড়া সময় কোথায়!

হুঁ, সময় তোমার আর কোনওদিনই হবে না। কবে তোমার মত পালটাবে বলতে পারো, সুচরিতা!

আচ্ছা, তরুণ, গতকাল সঁদনী চকের কাছে তোমাকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখলাম… ওই মেয়েটি কে?

মুহূর্তের মধ্যে তরুণ স্যানালের মুখের রং পালটে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, ও কিছু নয়। তুমি কি জানো না সুচরিতা, ভালো আমি তোমাকেই বাসি!

মনে-মনে হাসল সুচরিতা। এ ধরনের লোকদের দেখলে ওর রাগ হয়। এইজন্যই আজকাল ওর আর কিছুই ভালো লাগছে না। চারপাশে সব স্তাবকের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য দিনরাত প্রশংসা করে চলেছে। উঃ! মুখে বলল, তরুণ, তুমি এখন যাও। আমাকে একটুখানি একা থাকতে দাও—।

তারপর শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল ও।

তরুণ সান্যাল হতাশভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

সুচরিতা শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল অমিতের কথা। সুরেন্দ্র পালিতের পাণ্ডুলিপি যদি ছাপা হয় তবে কি ও বিপদে পড়বে? অথবা অমিত চৌধুরীর চরিত্রে দাগ পড়বে? না, কিচ্ছু ভাবতে পারছে

সুচরিতা। এ ছাড়াও কানাঘুষোয় ও আঁচ পেয়েছে যে, সমর বর্মন নাকি ওইদিনের মিটিংয়ে হাজির থাকছে। কারণ? কারণটা ঠিক পুরোপুরি জানে না সুচরিতা। তবে শুনেছিল যে, গত বছরের মিটিংয়ে সুরেন্দ্র পালিত অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। রানী সুলক্ষণার গলায় যে হীরের নেকলেস ছিল, সেটা কোনওরকমে সরিয়ে সুরেন্দ্র পালিত এতদূরে এসে এই কবুতরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন–ওই মিটিংয়ের দিনই। অথচ সেই নেকলেস চুরির দায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন সমর বর্মনের ঘাড়ে। সত্যিই সাংঘাতিক কূটবুদ্ধির লোক ছিলেন এই সুরেন্দ্র পালিত।

সুরেন্দ্র পালিত চলে যাওয়ার কিছুদিন পর কবুতরের মালি লাইব্রেরি-ঘরে একজন লোকের মৃতদেহ পায়। মৃত লোকটির পকেটে লালপাঞ্জা দলের প্রতীকচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে হীরের নেকলেসটার কথা সবাই জানে। আগামী মিটিংয়ে বর্মন যদি কারও ছদ্মবেশে আসে– তবে? নাঃ–এই অশোক বোস নামের ভদ্রলোকটির সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। এবং কালই।

.

লোকটির অচেতন দেহটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছিলাম, এমন সময় ঘরে ঢুকল ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম হোটেল কন্টিনেন্টালের বেয়ারা। ও-ই আমার ঘর অ্যাটেন্ড করে। ও ঘরে ঢুকে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল, বলল, স্যার–এ কী কাণ্ড!

আমি কেটে যাওয়া ঠোঁটের কোনাটা রুমাল দিয়ে মুছে নিচ্ছিলাম, বললাম, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। আমি আর-একটু হলেই একে জানলা দিয়ে ফেলে দিতাম। একে নিয়ে গিয়ে হোটেলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

ইব্রাহিম চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে লোকটির উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটিকে চিত করে দিল। আমি আয়নায় দেখছিলাম কতখানি আহত হয়েছি। হঠাৎ আয়নাতেই লক্ষ করলাম, ইব্রাহিম লোকটিকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে। কে জানে! হয়তো আমার দেখার ভুল।

একটু পরেই লোকটিকে কোথায় যেন রেখে ইব্রাহিম আমার ঘরে ফিরে এল। এসে ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করল। ঘর সাফসুতরো হয়ে গেলে ওকে পাঁচটা টাকা দিলাম। ও চলে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সন্ধে ছটা। দারুণ কৌতূহল হচ্ছে ওই পাণ্ডুলিপি আর চিঠিগুলো নিয়ে। আজ পড়ব, কাল পড়ব, করেও সময় করে উঠতে পারিনি। এখন হাতমুখ ধুয়ে দরজা বন্ধ করে সুটকেশ খুললাম। দুটো প্যাকেটই বের করলাম।

প্রথমে চিঠির বান্ডিলটা ধরলাম। দু-একটা চিঠি উলটেপালটে দেখলাম। নিছকই প্রেমপত্র। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে ভরা। লেখিকা মিসেস সুচরিতা চৌধুরী। আর চিঠির ওপরে কোনও নাম উল্লেখ করে সম্বোধন নেই। শুধু মাই ডিয়ার দিয়ে শুরু। তবে একটা বিশেষ চিঠির মধ্যে একটা বাড়ির নামের উল্লেখ করা হয়েছে। কবুতর থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছে। আর চিঠির ওপরে দিল্লি শব্দটি লেখা আছে। তার মানে দিল্লিরই কবুতর নামের কোনও বাড়ি থেকে চিঠিটা লেখা। কেউ কি এই চিঠিগুলো নিয়ে সুচরিতা চৌধুরিকে ব্ল্যাকমেল করছিল? সেইজন্যেই কি এগুলো দামি বলেছিল নেপালীটি? যাকগে, যার চিঠি তার দেখা যদি পাই তবে এ-ভার থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। বলা যায় না, ভদ্রমহিলা হয়তো আতঙ্কে পাগল হয়ে নিশিদিন কোনও ব্ল্যাকমেলারের অপেক্ষা করছেন।

চিঠিগুলো রেখে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে পড়লাম।

প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম।

সাধারণ ধরনের স্মৃতিকথা। সিরাজনগর সম্বন্ধে নানা তথ্য লেখা। পড়তে-পড়তে এক জায়গায় সমর বর্মনের কথা পেলাম। পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে, মানুষ ছদ্মবেশ নিয়ে সর্বাঙ্গে পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু কানের পরিবর্তন করা অসম্ভব...। তার মানে সমর বর্মনের কানে কি কোনও বিশেষত্ব আছে? নাকি এটা নিছক কল্পনা?

পাণ্ডুলিপিটা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পর শেষ করলাম। এমন সময় ঘরের দরজায় নক করার শব্দ শোনা গেল। পাণ্ডুলিপি আর চিঠির বান্ডিলটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

দেখি ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে। ওর হাতের ট্রেতে সাজানো ডিনার।

ও ট্রে-টা এনে টেবিলের ওপর রাখল। হঠাৎ লক্ষ করলাম, ওর চোখের দৃষ্টি ড্রেসিং টেবিলের ওপর।

আমার দেখার ভুল?

ও খাবার রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তা হলে কি তা হলে কি...।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অবশ্য তার আগে চিঠির বান্ডিলটা সুটকেসে বন্ধ করে রাখলাম। আর পাণ্ডুলিপিটা বালিশের নীচে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে ঘরের ভেতরে কারও চলাফেরার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সামান্য চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি ঘরের জানলাটা নেই। শুনতে অবাক লাগলেও ঠিক তাই। জানলার জায়গাটা জমাট অন্ধকারে ঢাকা। হঠাৎ সেই জমাট অন্ধকারটা নড়ে উঠল। জানলাটা আবার দেখা গেল।

ছায়ামূর্তিটা ক্রমশ ড্রেসিংটেবিলের দিকে এগোতে লাগল। আমি চুপিচুপি উঠে গিয়ে একলাফে ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিলাম। যে-লোকটি হতভম্ব হয়ে চমকে ফিরে তাকাল, তার হাতে একটা ছুরি ঝিকিয়ে উঠল। লোকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ইব্রাহিম!

আমাকে আলো জ্বালতে দেখেই ও তীরবেগে আমার দিকে ছুটে এল। আমার চোখ ছিল ওর হাতের দিকে। নিমেষের মধ্যে দু-হাতে ওর ডানহাতের কবজি চেপে ধরলাম। দুজনেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। আমার আঁকুনিতে ইব্রাহিমের হাতের ছুরি পড়ে গেল মাটিতে। তারপর কেন জানি না ও হঠাৎই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়োল জানলার দিকে। এবং মুহূর্তের মধ্যেই জানলা পথে সটকে পড়ল।

ইব্রাহিমের পিছু নিয়ে লাভ নেই জেনে সে-চেষ্টা আর করলাম না। এগিয়ে এসে ছুরিটা তুলে নিলাম। সাধারণ ছুরি একটা, কিন্তু বাঁটের ওপর একটা হাতের পাঞ্জা খোদাই করে আঁকা। এখানেও লালপাঞ্জা! ইব্রাহিমও লালপাঞ্জা দলের কমরেড? তাই হয়তো গত বিকেলের অচেতন লোকটিকে দেখে ও একটু অবাক হয়েছিল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুটকেসটা খুললাম। সর্বনাশ! চিঠির বান্ডিলটা অদৃশ্য হয়েছে। তবু ভালো যে, পাণ্ডুলিপিটা বালিশের নীচে রেখে শুয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার আলো নিভিয়ে জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই রাতে চেঁচামেচি করেও কোনও ফল হবে না। কারণ, ইব্রাহিম নিশ্চয়ই আর কন্টিনেন্টালের চত্বরে বসে নেই!

.

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই প্রথমে গেলাম ম্যানেজারের ঘরে।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, মিস্টার বোস, (অশোকের নামেই হোটেলে ঘর বুক করেছিলাম আমি। শুনলাম আপনার ঘরে নাকি গত রাতে চোর এসেছিল!

আমি বললাম, না তো! ইব্রাহিম কী একটা জরুরি খবর দিতে ভুলে গিয়েছিল বলে রাত দুটোর সময় খবরটা দিতে একবার এসেছিল।

কী খবর? কী খবর? ব্যগ্র হয়ে উঠলেন ম্যানেজার।

ইব্রাহিমের শাদির নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। যাওয়ার সময় ও তাড়াতাড়িতে ওর ছুরিটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। আপনি কাইন্ডলি ওকে এটা দিয়ে দেবেন। বলে পাশপকেট থেকে ইব্রাহিমের অস্ত্রটা বের করে ম্যানেজারসাহেবকে দিলাম।

এটা যে সত্যি-সত্যিই একটা ছুরি দেখছি! আঁতকে উঠলেন ম্যানেজার।

না, দাঁত খোঁচানোর কাঠি মনে-মনে বললাম আমি, মুখে বললাম, ইব্রাহিম আশা করি হোটেলে আর নেই।

না, পালিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গেই জানালেন তিনি।

চুরি অবশ্য তেমন কিছু যায়নি। তবু খবরটা দিয়ে রাখা ভালো, বললাম আমি, এক বান্ডিল চিঠি নিয়ে গেছে ইব্রাহিম। বোধহয় কোনও নামকরা লোকের নিজের হাতে লেখা এক অমূল্য পাণ্ডুলিপি মনে করেছে ওটাকে। বিবিকে শাদিতে উপহার দেবে হয়তো। চেয়ার ঠেলে উঠলাম আমি।

এমন সময় ম্যানেজার আমতা-আমতা করে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার বোস, আপনি কি আমাদের হোটেলে আর থাকবেন?

তার মানে! যেতে গিয়েও ঘুরে তাকালাম আমি।

না, এরকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল…।

ওঃ– হেসে ফেললাম আমি : আপনিশুদ্ধ সবকটা বেয়ারাও যদি আমার ঘরে চুরি করতে ঢোকেন, তবু আমি এ-হোটেল ছাড়ছি না, আন্ডারস্ট্যান্ড?

ম্যানেজারকে উত্তর দেওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ওপরে ঘরে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সবে শেষ করেছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভার তুলে নিলাম।

হ্যালো–

স্যার, ডেস্ক ক্লার্কের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

কী নাম? অবাক হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

মিস্টার...। মিনিটখানেক নীরবতার পর আবার গলা শোনা গেল, স্যার, আমি ভদ্রলোকের কার্ড আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ফোন নামিয়ে রাখার একটু পরেই দরজায় নক করার শব্দ পেলাম। দরজা খুলতেই একজন বেয়ারা একটা কার্ড দিল আমার হাতে। তাতে লেখাঃ

শ্রীনরসিংহ দত্তরায় সেন চৌধুরী
বার-অ্যাট-ল

ডেক্স ক্লার্কের নীরবতার কারণ এখন বুঝতে পারলাম না। যা হোক, মনে-মনে নরসিংহবাবুর বাবাকে ছেলের নামকরণের জন্যে কয়েক হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে বেয়ারাটিকে বললাম, বাবুকে ডেকে দাও–আমি দেখা করব।

একটু পরেই ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁকে এক কথায় জলহস্তীর ছানা বলা যায়। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আসুন, আসুন

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে তিনি বললেন, আমার নাম।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাধা দিলাম আমিঃ প্লিজ, আর বলার প্রয়োজন নেই। কার্ড পড়েই মাথা ঘুরছে। তার ওপর আবার বললে হয়তো হার্টফেল করব।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, বললেন, যদি ভুল না আমার হয়ে থাকে, তবে বোধহয় অশোক বোস আপনিই?

আমি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। বললাম, আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না ।

লয়ালিস্টদের তরফ থেকে আমি আসছি। শুনেছি আপনার কাছে সুরেন্দ্র পালিতের স্মৃতিকথার ম্যানাস্ক্রিপ্টটা আছে।

ঠিকই শুনেছেন। জানালাম আমি। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে ক্রমশ অবাক হচ্ছিলাম।

চাই না আমরা যে, পাণ্ডুলিপিটা ছাপা এখন হোক। কুমার রণজিতও চাইবেন না সেটা। আপনি আশা করি রাখবেন কথা আমাদের এবং প্রকাশ এখন পাণ্ডুলিপিটা করবেন না।

মোটেই না–মোটেই না। বরং আজকালের মধ্যেই আমি মেহেতা অ্যান্ড সন্সের হাতে পাণ্ডুলিপিটা তুলে দিচ্ছি। নির্বিকারভাবে জানালাম আমি।

করতে এটা পারেন না আপনি। এতে বিপদ অনেক হবে।

আমি কথা দিয়েছি।

আপনি তা হলে শুনবেন না অনুরোধ আমাদের? এই শেষ কথা আপনার তা হলে?

আমি নিরুপায়–।

বেশ, উঠে দাঁড়ালেন শ্রীনরসিংহ : জানি অন্য আমরা উপায়। আমরা এটা ছাপানোর ব্যাপারটা করবই যেভাবে হোক বন্ধ। নমস্কার।

শ্রীনরসিংহ থপথপ করে বিদায় নিলেন।

আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। অন্য উপায় মানে! ইব্রাহিমের মতোই কাউকে তিনি ব্যবহার করবেন নাকি!

প্রায় ঘণ্টাখানেক ডুবে রইলাম নানান চিন্তায়।

হঠাৎই সমস্ত চিন্তা ছিন্নভিন্ন করে ফোন বেজে উঠল।

চিন্তিত হলাম। এ আবার কে ফোন করল! এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

হ্যালো।

মিস্টার অশোক বোস?

আপনি?

মেহেতা অ্যান্ড সন্সের শ্রী জগদীশকিশোর মেহেতা।

ও কী ব্যাপার? ভীষণ অবাক হলাম আমি।

মিস্টার বোস, ম্যানাস্ক্রিপ্টটা কি আপনি আজ দেবেন?

হ্যাঁ, আমি একটু পরে গিয়ে দিয়ে আসব। ভাবলাম ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

পাগল হয়েছেন আপনি! আমি ডেফিনিটলি বলতে পারি ওই ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনি কোনওদিনই আমাদের অফিসে সুস্থ অবস্থায় পৌঁছোতে পারবেন না।

তা হলে?

আমি বরং গজানন শিকদার নামে আমার এক অতি বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠাচ্ছি। আপনি ম্যানাস্ক্রিপ্টটার মতো একটা নকল প্যাকেট তৈরি করে হোটেলের কাস্টডিতে জমা দিন। তা হলে সবার নজর ওইদিকেই থাকবে। আর বাই দ্যাট টাইম পনেরো হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে আমি গজানন শিকদারকে আপনার ওখানে পাঠাচ্ছি। আপনি ওর হাতে সুরেন্দ্র পালিতের ম্যানাস্ক্রিপ্টটা দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, রাখছি।

প্রায় আধঘণ্টা পর একজন ভদ্রলোক এলেন। বললেন, আমি মেহেতা অ্যান্ড সন্সের গজানন শিকদার। বলে একটা পনেরো হাজার টাকার চেক পকেট থেকে বের করলেন।

আমি ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। চেকটা নিয়ে পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে তুলে দিলাম। বললাম, মিস্টার শিকদার, সাবধানে যাবেন। আমার কিন্তু আর কোনও দায়িত্ব নেই।

মৃদু হেসে গজানন শিকদার চলে গেলেন।

তিনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই একটা বয় এসে একটা কার্ড আর চিঠি দিয়ে গেল। অবাক হয়ে সেটা নিলাম, দেখি তাতে লেখা?

শ্রী অশোক বোস সমীপেষু,
মহাশয়, আগামী রবিবার কবুতরে যে-পার্টি দেওয়া হচ্ছে তাতে আপনাকে সম্মানিত অতিথি হতে অনুরোধ করছি। বয়টির কাছে আপনার উত্তর দিলে বাধিত হব। ইতি–

সঙ্গের কার্ডে মানেকজিপ্রসাদজির ফার্মের নাম ও কবুতরের ঠিকানা ছিল। বয়টিকে ডেকে ওগুলো ফেরত দিয়ে বললাম, দুঃখিত, তোমার মালিককে বোলো, আমি বিশেষ কারণে পার্টিতে যেতে পারছি না।

বয়টি চিঠি ও কার্ড নিয়ে চলে গেল।

আমি এবার হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। সব কাজ শেষ। এখন শুধু জানতে হবে কে ওই সুচরিতা চৌধুরী। নামটার মধ্যেই যেন কেমন এক প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ আমার চোখ গেল ড্রেসিং টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় রাখা একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের দিকে। এখনও পর্যন্ত নেড়েচেড়ে দেখিনি। হাওয়ায় ম্যাগাজিনটার কতকগুলো পাতা উলটে গেছে। সেখানে একজন মহিলার ফটো দেখা যাচ্ছে। নীচে লেখা : শ্ৰীমতী সুচরিতা চৌধুরী, মোতিবাগ।

লাফিয়ে উঠলাম আমি। ইস, যদি এঁরই হয়ে থাকে চিঠিগুলো! নাঃ, এক্ষুনি ওঁকে একবার সাবধান করে দিতে হবে। নয়তো বলা যায় না, চিঠিগুলো নিয়ে কেউ হয়তো মিসেস চৌধুরীকে ব্ল্যাকমেল করবে। ভদ্রমহিলা তা হলে এখানে বেশ পরিচিত দেখছি!

ভাবলাম শহর দেখতে বেরোব। উঠে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় পালটাতে লাগলাম। মনে-মনে নিজের পিঠ চাপড়ে বললাম, এখন শ্রীযুক্ত অশোক বোস মঞ্চ থেকে প্রস্থান করবেন এবং তার পরিবর্তে মঞ্চে আবির্ভূত হবেন একমেবাদ্বিতীয়ম, আদি ও অকৃত্রিম, শ্ৰীযুক্ত কাঞ্চন মৈত্র!

.

সুচরিতা প্রসাধন সেরে বেরোতে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য, তরুণের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে শ্ৰীযুক্ত বোসের সঙ্গে দেখা করা। কী জানি কেমন দেখতে হবে ভদ্রলোককে! তিনি কি জানেন যে, সঙ্গে অ্যাটমবোমার মতো একটি ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে তিনি ঘুরছেন! বোধহয় না।

বেরোনোর আগে কাজের লোককে ডেকে সুচরিতা বলল, যতীন, আমি একটু বেরোচ্ছি।

কিন্তু দরজা খুলে বেরোতে যেতেই ধাক্কা লাগল একজন লোকের সঙ্গে। লোকটি বোধহয় ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল।

মাপ করবেন, লোকটি বলল, আপনিই কি মিসেস সুচরিতা চৌধুরী?

হ্যাঁ। সুচরিতার ভ্রূ-কুঞ্চিত হল। কী চায় লোকটি? একে তো ও চেনে বলে মনে হচ্ছে না।

লোকটি ওর দিকে চেয়ে হাসল, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিচিত্র এক শব্দ করে বলল, আপনার সঙ্গে একটু ব্যাবসার ব্যাপারে গোপন কথা আছে।

গোপন কথা! খুবই অবাক হল সুচরিতা।

প্লিজ, দয়া করে দরজাটা ছাড়ুন, ম্যাডাম। এখানে দাঁড়িয়ে তো আর কথা হতে পারে না! বলল লোকটি।

ইতস্তত করে সুচরিতা বলল, আচ্ছা—আসুন, ভেতরে আসুন।

ভেতরে গিয়ে বসল দুজনে।

বিচিত্রভাবে হাসল লোকটি ও আমার কাছে কতকগুলো কাগজ আছে। বলল সে।

কাগজ! আবার অবাক হল সুচরিতা।

লেখা কাগজ।

কী বলতে চাইছেন?

আপনার লেখা কাগজ।

আমার লেখা?

কাউকে আপনার লেখা চিঠির কাগজ।

আমার লেখা চিঠি! দেখি!

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে সুচরিতা চৌধুরীর হাতে দিল লোকটি ও অনেকগুলো চিঠির একটি।

চিঠি দেখে মনে-মনে হাসল সুচরিতা। এ-চিঠি ও কোনওদিনই লেখেনি। ওর হাতের লেখাও নয় এগুলো। শুধু লেখিকার নামের জায়গায় ওর নাম লেখা আছে।

কিন্তু কী উদ্দেশ্য এই লোকটির? ব্ল্যাকমেলিং? নাকি অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে?

মনে-মনে নিশ্চিত কিছু একটা ভেবে নিয়ে সুচরিতা বলল, এগুলো আপনি কেমন করে পেলেন?

দেখুন, আমার এখন খুব অভাব চলছে। তাই হাজার পঁচিশেক টাকার ব্যবস্থা যদি করেন… সব চিঠিগুলোর জন্যে। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল লোকটি।

মনে-মনে অতি দ্রুত চিন্তা করল সুচরিতা। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ভাবল, দেখিই না কী মতলব।

সুচরিতা বলল, দেখুন, আপাতত আমার কাছে তো এত টাকা নেই। এই চিঠিটার জন্যে আমি শদুয়েক টাকা দিচ্ছি। আগামীকাল রাতে আপনি আসুন, তখন বাকি চিঠিগুলোর ব্যাপারে কথা বলা যাবে।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একশো টাকার দুটো নোট বের করে লোকটির হাতে দিল ও। চিঠিটা রেখে লোকটি চলে গেল।

চিঠিটা পড়ল সুচরিতা। নিছক একটা প্রেমপত্র। কী কারণে কে কাকে লিখেছিল তা বুঝতে পারল না। চিঠিটা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে উঠে গিয়ে ফোন করল তরুণের অফিসে। সেখান থেকে। অশোক বোসের হোটেলের নাম জেনে সেই হোটেলে ফোন করল।

হ্যালো, হোটেল কন্টিনেন্টাল?

হ্যাঁ–কাকে চান?

অশোক বোসকে।

কাইন্ডলি একমিনিট অপেক্ষা করুন, লাইন দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর টেলিফোনে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে কথা বলছেন?

আমি কি অশোক বোসের সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে বলছেন?

মিসেস সুচরিতা চৌধুরী।

ওদিকের কণ্ঠস্বর চমকে উঠল মনে হলঃ মিসেস চৌধুরী!

হ্যাঁ। আপনার কাছেই তো নটোরিয়াস ম্যানাস্ক্রিপ্টটা রয়েছে, না?

কাছাকাছি গিয়েছিলেন। আছে নয়, ছিল।

তার মানে! তার মানে আপনি?

ঠিকই ধরেছেন। ওটা এখন মেহেতা অ্যান্ড সন্সের কাছে। আজ সকালেই ওটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছি।

ওঃ– সুচরিতা যেন আশাহত হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ওপারের কণ্ঠস্বর তখনও বলছিল, কিন্তু মিসেস চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমার–।

সুরেন্দ্র পালিত, কুমার রণজিৎ, মৃত কুমার অতলান্ত রায়, মানেকজি, প্রসাদজি, তরুণ, অমিত এবং অশোক বোস–সবাই যেন সুচরিতার চারপাশে এসে ছায়ার মতো ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। সবাই হাত বাড়িয়ে ওর থেকে যেন কিছু চাইছেন।

চকিতে সুচরিতার মনে পড়ল ব্ল্যাকমেলারটির কথা। আবার আগামীকাল! চোখ বুজল সুচরিতা।

.

পরদিন রাত দশটার সময় ক্লাব থেকে ফিরল সুচরিতা। একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছে আজ। কিন্তু সদর দরজা হাট করে খোলা কেন! দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকল। যতীনকে কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় যেতে পারে! হঠাৎই লক্ষ করল, একটুকরো কাগজ মেঝেতে হাওয়ায় উড়ছে। কৌতূহলে কুড়িয়ে নিল ওটা। এ যে একটা চিঠি! তাতে লেখাঃ

যতীন,
শিগগিরই চাঁদনি চকের বাজারের কাছে চলে আয়। অনেক জিনিসপত্র কিনে ফেলেছি।
–দিদিমণি।

অবিশ্বাস্য। কোনও চিঠি ও যতীনকে পাঠায়নি। অবশ্য একথা ঠিক যে, ক্লাবের ফোন খারাপ থাকলে মাঝে-মাঝে এ ধরনের চিঠি ও ক্লাব থেকে পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু ক্লাবের ফোন তো ঠিকই আছে!

অর্থাৎ, সব জেনেশুনেই এই চিঠিটা কাউকে দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

পায়ে-পায়ে শোবার ঘরে এসে সুচরিতার বিস্ময় আতঙ্কে পালটে গেল। শোওয়ার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একজন চেনা লোক। একটা সুদৃশ্য ছুরি তার হৃৎপিন্ডকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। লোকটি এই হিসেবে চেনা যে, তাকে আগের দিনই সুচরিতা দেখেছে। এ সেই ব্ল্যাকমেলার।

তার মানে টাকার জন্য সে আজ সময়মতোই এসেছিল। কিন্তু কে মারল ওকে?

হতভম্ব অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুচরিতা। আজই ওকে কবুতরে যেতে হবে। ও মিটিং এ যাবে, কারণ অশোক বোসের ব্যাপারটা মিটে গেছে। কিন্তু এ কী ঝামেলা? এরপর পুলিশ আসবে। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের কথা বেরিয়ে পড়বে। ও যে শুধুমাত্র কৌতূহল মেটানোর জন্যই দুশো টাকা দিয়েছে তারা তা শুনবে না। তার মানে নিঃসন্দেহে ওঁকে কিছুদিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে থাকতে হবে। অর্থাৎ, মিটিং-এ যাওয়া যাবে না। কিন্তু কারা ওকে এভাবে রহস্যের জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

এই মুহূর্তে কারও সাহায্য খুব দরকার এই ভেবে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল সুচরিতা। তখনই দেখল একজন সুপুরুষ যুবক ওর বাড়ির নেমপ্লেটের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

হাতে যেন চাঁদ পেল সুচরিতা। কিন্তু ওকে দেখামাত্রই লোকটি বলে উঠল, মিসেস চৌধুরী, তাই না?

আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?

একটা সিনেমা-ম্যাগাজিনের একটা ছেঁড়া পাতা তুলে ধরল লোকটি : আমার নাম কাঞ্চন মৈত্র।

দেখুন, ইতস্তত করে শুরু করল সুচরিতা, মানে, আমার ঘরে একজন লোক মরে পড়ে আছে–মানে, তাকে কেউ খুন করেছে। আপনি যদি পুলিশে…মানে…।

তার বেশি আর বলতে হল না। কোথায় বডি? বলে তৎপর হয়ে উঠল কাঞ্চন। সুচরিতা জবাব দেওয়ার আগেই ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

সুচরিতার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। তাই বোধহয় প্রথম দেখাতেই একজন অচেনা মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলেছে। কিন্তু...।

কোনও উপায় না দেখে সদর দরজা বন্ধ করে কাঞ্চনকে অনুসরণ করে শোবার ঘরে এল সুচরিতা।

ঘরের অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কাঞ্চন। তার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর নিজেকে সামলে বলল, বাড়িতে আর কে-কে আছে?

আপাতত কেউ নেই, তবে একজন কাজের লোক আছে—এখন বাইরে গেছে।

সে এলে দূরের একটা দোকান-টোকানে পাঠিয়ে দেবেন। ততক্ষণে আমি দেখি কদুর কী করতে পারি। বলে চটপট কাজে লেগে গেল সে।

তাকে সাহায্য করতে নিজেও হাত লাগাল সুচরিতা।

প্রায় একঘণ্টা পর বাইরের দরজায় কারও নক করার শব্দ শোনা গেল।

ওই বোধহয় যতীন এসেছে, বলে কাঞ্চনের দিকে একটা ইশারা করে বলল, প্লিজ কোনও শব্দ করবেন না। আমি এখুনি আবার ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সুচরিতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইতিমধ্যে লাশটাকে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখা হয়ে গেছে। তখনই হঠাৎ ছোরার হাতলটার দিকে চোখ গেল কাঞ্চনের। সে কি ভুল দেখছে নাকি? এই তো! এই তো লেখা রয়েছে পরিষ্কারভাবেঃ সুচরিতা চৌধুরী।

সর্বনাশ! তা হলে তো ছুরিটার আলাদা একটা ব্যবস্থা করতে হয়! চটপট হাতে রুমাল জড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় ছুরিটাকে বের করে নিল কাঞ্চল। রক্ত এতক্ষণে জমাট বেঁধে আসায় বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হল না।

এই সময় আবার ঘরে এসে ঢুকল সুচরিতা। ওকে দেখেই কাঞ্চন বলল, দেখুন তো, কিছুটা ব্রাউন পেপার আনতে পারেন কি না। এই ছোরাটাকে মুড়ে একটা প্যাকেটমতো করতে হবে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুচরিতা।

ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করতে গিয়েই দ্বিতীয় বিস্ময়। একচিলতে কাগজ উঁকি মারছে ইব্রাহিমের পকেট থেকে।

হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই? মৃত লোকটি হোটেল কন্টিনেন্টালের সেই রহস্যময় বেয়ারা ইব্রাহিম।

নীচু হয়ে চিরকুটটাকে বের করে নিল কাঞ্চন। তাতে লেখাঃ কবুতর, রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ

কাগজটা পকেটে গুঁজল সে।

কিছুক্ষণ পরই ব্রাউন পেপার হাতে ঘরে ঢুকল সুচরিতা।

সব কাজ সেরে তৈরি হয়ে কাঞ্চন বলল, মিসেস চৌধুরী, আপনি ঘরটাকে আর-একবার ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখুন। আমি আপনার গাড়িটা নিয়ে এগুলোর ব্যবস্থা করতে রওনা হচ্ছি। গাড়িটা হয়তো কাল আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব। আশা করি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন।

সুচরিতা এমনভাবে হাসল যার অর্থ, বিশ্বাস না করে উপায় কী!

ওরা দুজনে মিলে ট্রাঙ্কটাকে বাইরে এনে গাড়ির ডিকিতে রাখল। কাঞ্চন গাড়ি ছেড়ে দিল। যাওয়ার আগে সুচরিতার দিকে আশ্বাসের একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

সুচরিতা ভাবছিল। মিটিং আগামীকাল। কিন্তু আজ রাত থেকেই সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কবুতরে। ওরও আজ রাতেই যাওয়ার কথা।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল সুচরিতা। যতীন ফিরে এলেই ও বেরোবে। লক্ষ্য কবুতর।

মিটিং-এ ওর থাকাটা কি বিপজ্জনক? তাই কি এই রহস্যময় জঘন্য খুনের খেলা? কিন্তু কারা, কেন, মিটিংয়ে ওর হাজিরা চায় না? সেটাই–সেটাই এখন জানতে চায় সুচরিতা।

.

কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত খুনই হল ইব্রাহিম! কার দলের হয়ে কাজ করছিল ও লাল পাঞ্জা কি? হতে পারে। হয়তো তাদের কথার অবাধ্য হয়েই সুচরিতা চৌধুরীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল ইব্রাহিম। তাই হয়তো লালপাঞ্জার এই নিষ্ঠুর শাস্তি।

কিন্তু চিঠিগুলো গেল কোথায়? সুচরিতা চৌধুরী বাড়িতে ঢোকার আগে কি কেউ ঢুকেছিল ওঁর বাড়িতে? গাড়ি চালাতে চালাতে এই সব কথা মনে পড়ছিল। অথচ একইসঙ্গে আর-এক চিন্তা। সেটা হল, এই লাশটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকিয়ে ফেলতেই হবে–যাতে এটা খুঁজে বের করতে অন্তত দু-তিনদিন সময় লাগে।

হঠাৎই একটা কথা মনে এল। সুচরিতা চৌধুরীকে এই খুনের সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? ওঁর বাড়িকেই খুনের জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হল! ছুরির বাঁটেও ওঁরই নাম লেখা! অর্থাৎ, কেউ-কেউ কবুতরে সুচরিতা চৌধুরীর উপস্থিতি চান না। কারণ? সুচরিতা মিটিংয়ে হাজির হলে কি কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে? কেন? কার?

চিন্তার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। স্টিয়ারিং ধরে সোজা হয়ে বসলাম। শহরতলিতে চলে এসেছি বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্জন রাস্তার ধারে একটা গাছের কাছে গাড়ি থামালাম। ক্যারিয়ার খুলে ট্রাঙ্কটাকে বের করে রাস্তার ধারের নদৰ্মার দিকে গড়িয়ে দিলাম। দু চারবার উলটে-পালটে ট্রাঙ্কটা নদৰ্মার মধ্যে গিয়ে পড়ল। এইবার ব্রাউন পেপারে মোড়া ছুরিটাকে পকেট থেকে বের করে চিন্তা করতে লাগলাম, কোথায় লুকোনো যায় এটাকে।

হঠাৎই একটা মতলব মাথায় আসাতে হেসে উঠলাম। তারপরই ছুরিটাকে পকেটে রেখে চটপট গাছে উঠে পড়লাম। দুটো ডালের খাঁজে সাবধানে গেঁথে দিলাম ওটা। গাছে উঠে খোঁজার কথা পুলিশের নিশ্চয়ই মাথায় আসবে না।

গাছ থেকে নেমে হাতঘড়ির দিকে নজর দিলাম। পৌনে বারোটা। ফিরে যাওয়ার জন্যে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়তেই মনে পড়ল সেই কাগজটার কথা। ইব্রাহিমের পকেট থেকে পাওয়া চিরকুটটার কথা। কবুতর, রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ। কবুতরে রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশে কি কিছু ঘটবে নাকি? কবুতরের ঠিকানাটা ভাগ্যিস মনে রয়েছে এখনও। অতএব ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম কবুতরের উদ্দেশে। যে করেই হোক, বারোটা পঁয়তাল্লিশের আগেই কবুতরে আমার পৌঁছোনো চাই-ই চাই! আরও জোরে চাপ দিলাম অ্যাকসিলারেটরে।

শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হলাম কবুতরে। হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত বারোটা চুয়াল্লিশ। আর এক মিনিট বাকি।

গাড়ি ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই দেখা যাচ্ছে প্রসাদজির বাগানবাড়ি কবুতর। কবুতর নাম সত্যিই সার্থক হয়েছে। গোটা বাড়িটা ধপধপে সাদা। যেন কোনও রাজহংসী ডানা মেলে রয়েছে উড়ে যাওয়ার জন্যে।

কবুতরের সদর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বাড়িটার কোনও ঘরেই আলো দেখা যাচ্ছে না। নিঝুম নিস্তব্ধ। সুরকি ঢালা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কিন্তু কিছুটা যেতেই এক বিকট শব্দ ভেসে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

গুড়ুম।

নিশ্চয়ই গুলির শব্দ!

শব্দটা একতলার কোনও ঘর থেকেই এল বলে মনে হল। পরমুহূর্তেই দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আমি তীরবেগে ছুটলাম শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। কে জানে, পরমুহূর্তে আমি কী দেখতে চলেছি!

দৌড়ে গিয়ে উঠোন পার হয়ে একতলার একটা ঘরের কাছে পৌঁছোলাম। ঘরের সবকটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোই ভেতর থেকে আটকানো। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। জানলার শার্সিগুলো ধরে টানাটানি করলাম। নাঃ, ভেতর থেকেই বন্ধ।

হঠাৎই আমি একটু ভয় পেলাম। এইরকম অবস্থায় কেউ যদি আমাকে আবিষ্কার করে, তবে! একথা মনে হতেই আবার ছুটলাম গাড়ি লক্ষ্য করে। গাড়িতে পৌঁছে আর-একবার ঘুরে তাকালাম কবুতরের দিকে। সেই আলোটা এখন নিভে গেছে। গাড়িতে বসে স্টার্ট দিলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে আবার মনে হল ইব্রাহিমের পকেটে পাওয়া সেই চিরকূটটার কথা। ইব্রাহিমের এখানে আসার কথা ছিল। আর তার বদলে এসেছি আমি। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। কিন্তু সুচরিতা? সুচরিতা যদি কবুতরে পৌঁছে থাকে, তবে ও গেল কোথায়! গুলির আওয়াজে কি কারওরই ঘুম (একজন বাদে, যার ঘরে আলো দেখা যাচ্ছিল) ভাঙল না!

যাই হোক, আমি আবার আসব এই কবুতরে মিটিংয়ে যোগ দিতে। নোবডি ক্যান স্টপ মি ফ্রম কামিং হিয়ার। আপনা থেকেই আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

.

পরদিন ভোরবেলা খবরের কাগজে খবরটা দেখে চমকে উঠলাম। কবুতরে আমার প্রায় চোখের সামনে গতকাল রাতে যিনি নিহত হয়েছেন, তিনি সিরাজনগরের বর্তমান প্রধান কুমার রণজিৎ সেন।

তা হলে মিটিং-এ এসেছিলেন তিনি। কিন্তু তাকে খুন করে কার লাভ? কেউ কি চেয়েছিল যে, কুমার রণজিৎ মিটিংয়ের আলোচনায় যোগ না দেন। কিন্তু কেন?

এ কী জটিল রহস্যের মুখোমুখি হলাম! রহস্যময় পাণ্ডুলিপি। ইব্রাহিমের মৃত্যু। সুচরিতা চৌধুরির নাম ধার করে লেখা প্রেমপত্র। সুচরিতা চৌধুরীকে মিটিংয়ে যেতে বাধা দেওয়া। কুমার রণজিতের মৃত্যু। লালপাঞ্জা–উঃ, কে জানে এর পরের অধ্যায় কী!

যা হোক, কবুতরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম। অসুবিধে হবে না। কারণ, সুচরিতা চৌধুরীর গাড়িটা সঙ্গে রয়েছে। মিনিটদশেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে গাড়িতে করে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য– কবুতর। কে জানে, হয়তো আরও কী রহস্য সেখানে আমার জন্যে ওত পেতে রয়েছে।

কবুতরে পৌঁছেই প্রথম যেটা চোখে পড়ল তা হল সারা বাড়ি জুড়ে একটা থমথমে ভাব। গেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে সুরকি ঢালা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। বাড়ির কাছে পৌঁছোতেই কবুতরের একতলার বাঁদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুচরিতা চৌধুরী। গাঢ় বেগুনি রঙের শাড়িতে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

কিছুক্ষণ বোধহয় হাঁ করে চেয়েছিলাম ওর দিকে। চমক ভাঙতেই জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সুচরিতার চোখের তারায় আশঙ্কার ছায়া কেঁপে উঠল। হরিণী-গতিতে ও এগিয়ে এল আমার কাছে। অস্ফুটভাবে বলল, আপনি এখানে। আপনার-আপনার সঙ্গে আমার

অনেক কথা আছে।

একটু অবাক হলেও সে-ভাবটা মুখে প্রকাশ করলাম না। কবুতরের বাইরে এসে দুজনে উঠে বসলাম গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিলাম। লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবিহীন।

কিছুদূর যাওয়ার পর আড়চোখে তাকালাম সুচরিতার দিকে। ওর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, ভয় নেই। ইব্রাহিমকে খুঁজে বের করতে পুলিশের অন্তত দিনদুয়েক লাগবে।

তারপর ওকে শুরু থেকে আমার কাহিনি শোনালাম–সব বললাম। শেষে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু সুচরিতা, এদিকের খবর কী?

একথা বলেই হৃৎপিণ্ডে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। চোখ, মুখ, কান লাল হয়ে উঠল সর্বনাশ! ওকে নাম ধরে ডেকে ফেলেছি!

কিন্তু এ কী! সুচরিতা মাথা নীচু করে ছিল। আমার দিকে চোখ তুলে এক চিলতে হাসল। আমি সাহস করে বাঁ হাতটা ওর হাতের ওপর রাখলাম। বুঝলাম আমরা দুজনেই দুজনকে জানতে চাই।

এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে বললাম, সুচরিতা, আমরা একটা কিছু করতে পারি না?

কী? আনন্দে, কৌতূহলে ওর মুখ ঝলমল করছিল।

না, মানে, এই যে সব রহস্য–সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?

তা হলে তো দারুণ হবে। ছোট্ট মেয়ের মতো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুচরিতা।

আমি ওকে গতরাতের সব কথা খুলে বললাম। ও চোখ বড় বড় করে শুনল।

আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, দোতলার বাঁদিক থেকে তিন নম্বর জানলাটা কার ঘরের?

ওই ঘরেই কি আলো জ্বলতে দেখেছিলে তুমি?

মনে তো হয় তাই।

কিন্তু, তা হলে তো ঠিক মিলছে না। একটু চিন্তিতভাবেই জানাল সুচরিতা।

কেন? কেন?

ওই ঘরটায় মানেকজির এক দূরসম্পর্কের বোন থাকেন। তিনি তো বেশ কয়েকদিন হল আছেন। ওঁকে ঠিক এ-ব্যাপারে...।

মাঝপথে বাধা দিলাম আমি, বললাম, সূত্র যখন পাওয়া গেছে, তা যতই সামান্য হোক, তাই ধরেই এগোব আমরা। আমি ওই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছি। ওঁর নাম কী?

নয়না কল্যাণী।

এবার তবে কবুতরে ফেরা যাক। বললাম আমি, কিন্তু আমার সঙ্গে কী অনেক কথা আছে। বলছিলে যেন? হঠাৎই মনে পড়ায় প্রশ্ন করলাম।

কুমার রণজিৎ গতকাল রাতে রিভলভারের গুলিতে মারা গেছেন।

কাগজে পড়েছি। তুমি তাকে দেখেছ নাকি?

না। তবে সিরাজনগরে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা সম্ভাবনা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার মানসচক্ষে ধরা পড়ল। চকিতে ব্রেক কষে দাঁড় করালাম গাড়িটাকে। ব্যাক করে ঘুরিয়ে নিয়ে হাওয়ার বেগে আবার গাড়ি

ছুটিয়ে দিলাম।

এ কী! কী হল? ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল সুচরিতা।

এখন আর কোনও প্রশ্ন নয়। এই মুহূর্তে আমাদের কবুতরে পৌঁছানো দরকার। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম আমি, তোমার কবুতরে পৌঁছোনো বন্ধ করার চেষ্টা যারা করছিল তাদের উদ্দেশ্য আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি।

তার মানে! কৌতূহলের ঝাপটায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে সুচরিতা।

এই কুমার রণজিৎ সম্ভবত তোমার পরিচিত কুমার রণজিৎ নন।

সুচরিতার মুখ থেকে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। আমি বলে চললাম, যে এখানে কুমার রণজিৎ পরিচয়ে এসেছে, সে জানে যে, তোমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল হবে। তাই কবুতরে তুমি যাতে না আসতে পারো সেই ব্যবস্থা করেছিল। হয়তো সমর বর্মনই এখানে কুমারের ছদ্মবেশে এসে শত্রুপক্ষের হাতে মারা গেছে।

কিন্তু সমর বর্মন এখানে আসবে কেন?

সুরেন্দ্র পালিত রানী সুলক্ষণার হীরের নেকলেস কবুতরেই লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তার ম্যানাস্ক্রিপ্টেই এরকম হিন্টস ছিল। বর্মন সেই খবর পেয়ে হয়তো...।

কবুতরের বাইরে গাড়ি থামিয়ে সুচরিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললাম। উত্তেজনায় তখন আমার আর মাথার ঠিক নেই। হাঁটতে হাঁটতে ওকে জিগ্যেস করলাম, পুলিশ কি এখনও কবুতরে রয়েছে?

কোনওরকমে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল সুচরিতা।

কবুতরের একতলার দরজা দিয়ে দুজনে ঢুকলাম। ডানদিকেই লাইব্রেরি। সেই ঘরের দরজা পেরিয়ে ভেতরে পা দিলাম দুজনে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই চমকে উঠলাম।

কাঞ্চনবাবু, প্লিজ, একটিবার পেছন ফিরে তাকান। একটিবার দেখুন শিগগিরই। ওই দেখুন, কালো পোশাক পরা একটি নোক আপনার রেখে যাওয়া গাড়ির পেছনের সিটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। গাড়ির দরজা বন্ধ করে একটু হাসল। ওই দেখুন, সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দুরের বনানীতে। লোকটি কে বলুন তো! লোকটাকে যে আপনি চেনেন না সে কথা হলফ করে বলতে পারি। প্লিজ, আমার কথা এখনও শুনুন। কবুতরে কেন এলেন। ওই লোকটি প্রথম থেকেই পেছনের সিটের নীচে লুকিয়ে ছিল। কী সাঙ্ঘাতিক কান্ড বলুন তো!
আপনাকে তো প্রথমেই বলেছিলাম, প্লিজ কবুতরে আসবেন না।

লাইব্রেরিতে পা দিয়েই আমি চমকে উঠলাম। পুলিশের লোকজন ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাইব্রেরির র‍্যাকে সাজানো থরেথরে বই। মাঝখানে রাখা টেবিলটার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে। যে-লোকটি শূন্য দৃষ্টি মেলে চিৎ হয়ে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে সে আমার বিশেষ পরিচিত। মেহেতা অ্যান্ড সন্সের কর্মচারী, গজানন শিকদার।

সুচরিতা আমার কানে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ, ইনিই কুমার রণজিৎ। আমি শিয়োর।

তা হলে কুমার রণজিৎই মারা গেছেন! শেষ পর্যন্ত কুমার রণজিৎ নিজেই গিয়ে ভঁওতা দিয়ে আমার কাছ থেকে সুরেন্দ্র পালিতের ম্যানাস্ক্রিপ্টটা হাতিয়েছিলেন! বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, কুমার নিজেই গজানন শিকদারের পরিচয় নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলেন। তার মানে মেহেতা অ্যান্ড সন্স থেকে যে-ফোন এসেছিল, সেটা ভঁওতা দিয়ে কুমার রণজিতই করেছিলেন।

যাকগে, ওই ম্যানাস্ক্রিপ্টটার জন্যে হা-হুঁতাশ করে কোনও লাভ নেই। সুচরিতার গা টিপে ফিসফিস করে বললাম, সু, চলো আমরা যাই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরোতে যেতেই একটা হাত আমার কাঁধের ওপর এসে পড়ল।

চমকে পেছন ফিরে তাকালাম আমি। চোখে পড়ল কাঠে খোদাই করা ভাবলেশহীন একটা বলিষ্ঠ চেহারা। একটু মৃদু হাসি ঠোঁটের রেখায় টেনে তিনি বললেন, মিস্টার...প্লিজ টেক ইওর সিট, বলে লাইব্রেরি-ঘরের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

আমি সুচরিতার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই তিনি বললেন, আ অ্যাম নোন টু এভরিবডি বাই দ্য নেম ক্রসওয়ার্ড। যদিও আমার নাম ওয়াডি ক্রসবি।

কাঞ্চন মৈত্র–। বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলাম, বলুন, আমি আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি? ইন্সপেক্টরকে বাঙালি ক্রিশ্চান বলে মনে হল।

আমি এখানকার থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর, মুখ খুললেন ক্রসওয়ার্ড, কুমার রণজিতের মিস্টিরিয়াস ডেথের ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করার ভার আমার ওপর পড়েছে। আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। আর তা ছাড়া আপনি ঘরে ঢুকেই কুমারের ডেডবডিটা দেখে যেভাবে চোখ কপালে তুললেন...। কথা অসম্পূর্ণ রেখে চোখ নাচালেন ক্রসওয়ার্ড।

এরপর মুখ না খুলে চুপ করে থাকা হবে স্রেফ বোকামি। তাই একটুও সময় নষ্ট না করে বললাম, ইন্সপেক্টর, আমি সুচরিতার বন্ধু। ওয়েল উইশার বলতে পারেন। কুমারের মারা যাওয়ার খবর আমি কাগজেই পড়েছি, কিন্তু তাঁর ডেডবডি দেখে আমার অবাক হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে...।

তারপর প্রথম থেকে শুরু করে সব খুলে জানালাম তাঁকে। অবশ্য ইব্রাহিমের ব্যাপারটা বাদ। দিলাম।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ইন্সপেক্টর। তারপর বললেন, মিস্টার মৈত্র, এবার কাজের কথায় আসা যাক। কাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে। কবুতরের সবাইকেই আমরা প্রশ্ন করেছি, কেউ কিছু বলতে পারেননি। তাই আমরা কবুতরের চারিদিকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, একজন লোককে একটা গাড়ি চালিয়ে বারোটা সোয়া বারোটা নাগাদ কবুতরের দিকে যেতে দেখা গেছে। আপনাকে দেখে আমিও কম অবাক হইনি। কারণ, আপনার সঙ্গে সেই অপরিচিত লোকটির ডেসক্রিপশন প্রায় মিলে যাচ্ছে...।

কী...। ইন্সপেক্টরকে বাধা দিয়ে বলতে গেলাম আমি। কিন্তু ক্রসওয়ার্ড বাধা দেওয়ায় আমার চাইতেও বেশি এক্সপার্ট। তিনি চটপট বলতে শুরু করলেন, সেটাই সব নয়। আমরা কবুতরের সুরকি ঢালা পথে একসারি জুতোর ছাপ পেয়েছি। ছাপগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেশি এবং তাদের ডেস্থ দেখে আমরা আন্দাজ করছি যে, গত রাতে যেই এসে থাকুক না কেন, সে দৌড়েছিল। কবুতরের প্রত্যেকের জুতোর ছাপ আমরা নিয়েছি। আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন ক্রসওয়ার্ড, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। কারও সঙ্গে সেই ছাপ মেলেনি। এখন আপনার জুতোর সঙ্গে যদি এই ছাপটা না মেলে তবে আমাদের আরও ভালো করে প্রোব করে দেখতে হবে...। একটু থেমে দম নিলেন ক্রসওয়ার্ড।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, লুক হিয়ার, ইন্সপেক্টর। শুধু-শুধু আপনাদের পরিশ্রম আর খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই। আমিই সেই রাতের আগন্তুক। আমিই এসেছিলাম কবুতরে।

ইন্সপেক্টর অবাক-টবাক কিছুই হলেন না। অল্প-অল্প হাসতে লাগলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হলেও বিরক্তি চেপে বললাম, মিস্টার ক্রসওয়ার্ড, ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই কো অপ দেন প্লিজ স্টপ লাফিং। তারপর কাল রাতে যা-যা হয়েছিল সব খুলে বললাম।

ইব্রাহিমের পকেট থেকে পাওয়া সেই চিরকুটটার কথা চেপে গিয়ে বললাম, আমি সন্দেহ করেছিলাম যে, কবুতরে একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তাই শখের গোয়েন্দাগিরির নেশাতেই

কবুতরের ওপর লক্ষ রাখতে গত রাতে এসেছিলাম।

জানি না আমার ব্যাখ্যাটা কতটা জোরদার হল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমার কথা মোটামুটি বিশ্বাস করেছেন।

হঠাৎই মুখ তুলে বললেন তিনি, মিস্টার মৈত্র, একটা প্রশ্ন করব–ভালো করে ভেবে উত্তর দিন।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম তার দিকে।

আপনি কি শিয়োর যে, জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল?

হ্যাঁ, দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম আমি, আমি গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটা টানাটানি করেছিলাম। কিন্তু নড়াতেই পারিনি। বলতে বলতে আমি লাইব্রেরির তিনটে জানলার মধ্যে বাঁদিকেরটা দেখিয়ে বললাম, ওই তো, ওই জানলাটা।

কিন্তু এইখানেই একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে, কাঞ্চনবাবু। আজ যখন আমরা এই ঘরে আসি তখন শুধু একটা জানলা খোলা ছিল এবং ওই জানলাটাই।

আশ্চর্য, বললাম আমি, তা হলে নিশ্চয়ই যে খুন করেছে, সে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, খুনি বাইরের লোক। জানলা দিয়ে এসে খুন করে আবার জানলা দিয়েই চলে গেছে।

ঠিকই ধরেছেন আপনি, বললেন ইন্সপেক্টর, কিন্তু জানলায় আপনার ছাড়া আর কারও হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। তবে আপনার হাতের ছাপগুলো আপনার কথামতো শুধু বাইরের দিকেই ছিল।

আমি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলাম, বললাম, মার্ডার ওয়েপনটা পেয়েছেন?

নাঃ, জানালেন ইন্সপেক্টর, সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমার লোকেরা রিভলভারটা বের করতে পারেনি। তবে আশা করি দিনকয়েকের মধ্যেই খুঁজে পাব। আচ্ছা, নমস্কার—আপনি এখন যেতে পারেন। পরে যদি দরকার হয় আপনার সঙ্গে কথা বলবখন।

কোনওরকমে নমস্কার জানিয়ে শ্লথ পায়ে দরজার দিকে এগোলাম।

সুচরিতা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আমার পেছন-পেছন সেও বেরিয়ে এল বাইরে।

বাইরে এসে আমি বললাম, সুচরিতা, কবুতরে যারা রয়েছেন তাদের নামের একটা লিস্ট আমাকে দাও।

সুচরিতা বলল, মানেকজি, প্রসাদজি, তরুণ সান্যাল—মানেকজির সেক্রেটারি। শ্রীনরসিংহ চৌধুরী আর কিরণ শর্মা। এঁরা হলেন লয়ালিস্টদের তরফের। কিরণ শর্মা কুমার রণজিৎকে ফাইনান্স করতে রাজি ছিলেন। নয়না কল্যাণী এবং সর্বেশ্বর রায়—তেলের ব্যাপারটায় এঁর স্বার্থ ছিল। এঁরা ছাড়া কুমারের একজন নেপালি চাকর আর কবুতরের কাজের লোকজন।

আমার মনে নামগুলো গেঁথে গেল। বললাম, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়া শুরু করব এবার। প্রথম কাণ্ড হলেন নয়না কল্যাণী।

আমার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। গজানন শিকদার আর কুমার রণজিৎ এক ও অভিন্ন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি!

কাঞ্চনবাবু, এই যে,...আপনি কিন্তু একজনকে বিশেষভাবে বাদ দিয়ে গেছেন। সুচরিতাদেবীকে আপনি ভালোবাসেন—তাই ওঁকে বাদ দেওয়ার যুক্তি থাকতে পারে—চাকরবাকরদের মোটিভ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব মানলাম। কিন্তু ওই লোকটিকে আপনি বাদ দিলেন কী বলে? আরে, ওই লোকটা, যে কালো পোশাক পরে গাড়ির সিটরে নীচে লুকিয়ে আপনাদের কথা শুনছিল। দেখুন না, ওই দেখুন— সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে

কবুতরের সদর গেটের কাছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। হাতে সিগারেট। দেখুন না, কাঞ্চনবাবু, প্লিজ এদিকে তাকান না একবার!

কবুতর থেকে শপাঁচেক গজ দূরে গাছ-গাছড়ার একটা জঙ্গলের মতো রয়েছে। বনই বলা যেতে পারে সেটাকে। এবড়ো-খেবড়ো জমি। বড়-বড় বট, অশথ, দেবদারু ইত্যাদি গাছ জায়গাটাকে ছেয়ে ফেলেছে। সেইখানে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি আর সুচরিতা।

আমি এখন কবুতরের অতিথি। আমিই যে অশোক বোস নাম নিয়ে ভাগ্যচক্রে পাণ্ডুলিপির জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম সেটা প্রসাদজিকে খুলে বলেছি। এখন ব্যাপারগুলোর একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কবুতরেই থাকব আমি।

বিকেলের সোনা-রোদ যেন অনেক কষ্ট করে লুকোচুরি খেলে গাছের আড়াল দিয়ে এসে পড়েছে আমাদের গায়ে। মাঝে-মাঝে ঠান্ডা হাওয়ায় একটা আদর টের পাচ্ছিলাম। পাশাপাশি হেঁটে যেতে কী ভালো যে লাগছিল! মনে হচ্ছিল, যদি এই পথ আর না ফুরোয়...।

হাতে হাত ধরে ঝরাপাতার পথ মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে তাকালাম সুচরিতার দিকে। সুচরিতাও আমারই দিকে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেলল। আমি একটু বোকা বোকা হাসি হেসে বললাম, সুচরিতা, সত্যিই আমি কোনওদিন ভাবিনি যে, এমনিভাবে তোমার সঙ্গে– সুচরিতার চোখে কপট রাগ দেখে চটপট বলে ফেললাম, তোমার সঙ্গে ভাগ্য এমন চাতুরী করবে। সত্যি, কী বিপদেই না জড়িয়ে পড়েছ!

থাক, আর কথার জাল পাততে হবে না, হেসে বলল সুচরিতা, এবার কাজের কথায় আসা যাক।

হ্যাঁ, গলার স্বর গম্ভীর করে শুরু করলাম, নয়না কল্যাণী সম্পর্কে তুমি কী জানেনা, তাই খুলে বলো।

কিছুই না। ওঁকে আমি চোখে দেখিনি কোনওদিন, ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিল ও, শুনেছি গতবছর পর্যন্ত নাকি সাইরেন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ করতেন। তারপর মানেকজি ওঁকে কবুতরে ডেকে পাঠান। মানেকজির ইচ্ছে, নয়না কল্যাণী তাঁর সঙ্গেই রাজনীতি নিয়ে থাকুক।

তিনি কবুতরে কতদিন হল এসেছেন?

গতকাল সকালে। কিন্তু ওঁকে তুমি সন্দেহ করছ কেন?

না। সন্দেহ আমি প্রত্যেককেই করছি। কিন্তু ভাবছি যে, রণজিৎ সেনকে খুন করে নয়না কল্যাণীর কী লাভ? হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, সু, চলো ফেরা যাক।

ঘুরে দাঁড়াতেই আমার চোখ পড়ল একজন ছায়া-ছায়া মানুষের দিকে। আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই সে দৌড়োতে শুরু করল। দিনের আলোয় উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতেও তাকে চেনা গেল না। তবু আমি ছুটলাম।

সুচরিতা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে আমাকে অনুসরণ করে আসতে লাগল।

দৌড়োতে-দৌড়োতে বনের বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কই, কেউ তো কোথাও নেই! হতাশ হয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললাম, সুচরিতা, এই লোকটা কোন দলের, সমর বর্মন, না লালপাঞ্জা?

উত্তরে ঠোঁট উলটে হাসল সুচরিতা।

দুজনে আবার কবুতরে ফিরে এলাম। বাড়িতে ঢুকতে যেতেই একটা ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম। বাঁদিক থেকে তৃতীয়? নাঃ, এ তো চার নম্বর জানলাটা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে আরও দু-চার পা এদিক-ওদিক সরলেই তিনটে জানলা থেকে চারটে হয়ে যাচ্ছে। কারণ,

দ্বিতীয় সারির ঘরগুলোর একটা জানলা প্রথম সারির ঘরগুলোর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। যাকগে, কুছ পরোয়া নেই।

সুচরিতার দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলাম, সু, ওই জানলাটা কার ঘরের?

কেন বলো তো! ওটা কিরণ শর্মার।

কিরণ শর্মার? ঈষৎ ভাঁজ পড়ল আমার কপালে, তা হলে, আমার লিস্টে দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীযুক্ত কিরণ শর্মা। দৃঢ়স্বরে বললাম আমি।

আবার পা বাড়ালাম কবুতর লক্ষ্য করে।

ভেতরে গিয়ে দেখা হল মানেকজির সঙ্গে। তিনি ক্রসওয়ার্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, আসুন, আসুন–

আমি মৃদু হেসে তার পাশে গিয়ে বসলাম। সুচরিতাও আমার পাশে বসল।

মিস্টার মৈত্র, আমাকে লক্ষ্য করে বললেন মানেকজি, আপনার জন্যে দোতলার যে-ঘরটা ঠিক করে দিয়েছি, সেটা আপনার পছন্দ হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ধন্যবাদ।

এইবার ক্রসওয়ার্ডের দিকে ফিরলেন মানেকজি। বললেন, ওয়াডি, এ তো ভীষণ বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। মানেকজির স্বচ্ছন্দ বাংলা শুনে অবাকই হলাম।

কুমার রণজিৎ এখানে সাঙ্ঘাতিক জরুরি একটা কনফারেন্সে এসেছিলেন, মানেকজি বলে চললেন, মিটিং তো হলই না, তার ওপর এই স্ক্যান্ডালাস ব্যাপার। কে, কেন, কুমার রণজিৎকে খুন করল আমি ভেবেই পাচ্ছি না, ক্রসবি। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে, মুখে একবার বুলিয়ে নিলেন মানেকজি।

দেখুন, আমি চেষ্টায় কোনওই ফাঁক রাখব না। আমতা-আমতা করে বললেন ক্রসওয়ার্ড, কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারছি না যে, আপনারা গুলির শব্দ পেলেন না কেন? অথচ মিস্টার মৈত্র বারোটা পঁয়তাল্লিশের সময় গুলির শব্দ পেয়েছেন।

একটা সম্ভাবনার কথা মনে হওয়ায় আমি বললাম, ইন্সপেক্টর, হয়তো মার্ডারার কোনও কেমিক্যাল দিয়ে রাতে সবাইকে ড্রাগ করেছিল।

হতে পারে, বললেন ক্রসওয়ার্ড, আমি এবার বাড়ির সবাইকে ডেকে একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই। তা হল, কেউ যেন আপাতত, অন্তত দিনসাতেকের জন্যে, কবুতর ছেড়ে কোথাও না যান।

ঠিক আছে, আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি কথাটা। মনে হয় কেউ এতে অরাজি হবেন না। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মানেকজি। বললেন, ওয়াডি, যেমন করে হোক এই পলিটিক্যাল স্ক্যান্ডালের শেষ চাই আমি। কারণ, ভুরু তুলে তাকালেন মানেকজি ও ..এর সঙ্গে আমার আর প্রসাদজির মানসম্মান জড়িয়ে আছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মানেকজি।

মানেকজি চলে যাওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ইন্সপেক্টর, আমি আজ কবুতর ছেড়ে যেতে চাই। কথা দিচ্ছি, কাল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।

ক্রসওয়ার্ড হাসলেন : যাবেন যান। কিন্তু মাইন্ড ওয়ান থিং—আমাদের যেন বডি ওয়ারেন্ট বের করতে না হয়।

উত্তরে আমি স্যালুট করার ভঙ্গি করে সুচরিতার হাত ধরে বললাম, এসো, সুচরিতা।

বাইরে এসে বললাম, সু, আমি এখন সাইরেন ইন্টারন্যাশনালে যাব। নয়না কল্যাণী সম্পর্কে খোঁজ নিতে। কাল আবার দেখা হবে। তুমি কিরণ শর্মার ওপর নজর রেখ। আমার জন্যে ভেব না। আর হ্যাঁ—তোমার গাড়িটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আর দেরি না করে সুচরিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি চড়ে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য, সাইরেন ইন্টারন্যাশনাল।

গাড়িতে যেতে-যেতে ভাবছিলাম। আলোটা জ্বলেছিল কার ঘরে? কিরণ শর্মা না নয়না কল্যাণী? কী করছিলেন তিনি ওই সময়? গুলির শব্দ শুনে কি ঘুম ভেঙেছিল ওঁর? কিন্তু আর কারও ঘুম ভাঙল না কেন? আর নয়না কল্যাণীর যদি কোনও গোপন ব্যাপার থাকে, তবে আমি নিশ্চিত যে, সাইরেন ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে শুনব নয়না কল্যাণী নামে কেউই ওখানে কাজ করত না। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

.

শেষ পর্যন্ত সাইরেন ইন্টারন্যাশনালে।

রিসেপশনের ঘুমে ঢুলে পড়া হ্যাংলা মেয়েটিকে বললাম, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

একটু পরেই একটি লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল ম্যানেজারের ঘরে। ঘরের দরজায় লেখা প্রাইভেট।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

চেয়ারে বসে একজন প্রৌঢ়। মাথাজোড়া টাক। পাইপ টানছেন। তাকে বললাম, আমি নয়না নামে একটি মেয়ের খোঁজ জানতে এসেছি। সে আপনার হোটেলে কাজ করত।

হ্যাঁ, রিসেন্টলি ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কোথায় ওর এক কীরকম ভাই না কে থাকে, তার কাছে যাবে বলছিল।

জবাব শুনে একেবারেই দমে গেলাম আমি। এরকমটা ঠিক আশা করিনি। তা হলে কি কিরণ শর্মা…?

থ্যাংক ইউ, ম্যানেজারসাহেব, বলে নড় করে বেরিয়ে এলাম আমি। তার মানে নয়না কল্যাণী মানেকজির সত্যিকারের রিলেটিভ!

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এসে গাড়ি স্টার্ট করলাম। সুচরিতাকে সব খুলে বলতে হবে। একবার ভালো করে আলোচনা করা দরকার। ঘড়ি দেখলাম, রাত তিনটে।

কবুতরে পৌঁছেই দেখি সুচরিতা গেটের বাইরে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে বাইরে বেরোতেই দৌড়ে এল ও। বলল, কাঞ্চন, সর্বনাশ হয়েছে! বলে ও আমাকে হাত ধরে নিরিবিলি গাছ-গাছালির দিকটায় টেনে নিয়ে চলল। ভোরের হালকা আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে।

কিছুদূর গিয়ে আমি বললাম, কী হয়েছে?

হাঁফাতে-হাঁফাতে বলতে শুরু করল সুচরিতা, ইব্রাহিমকে খুঁজে পেয়েছে ওরা!

তাই নাকি? মুখে একথা বললেও মনে-মনে রেলগাড়ি ছুটিয়ে চিন্তা করছিলাম, এরপর কী করা উচিত।

হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর ক্রসবি খোঁজ করেছিলেন যে, তুমি এসেছ কি না, বলে চলল সুচরিতা, আর কিরণ শর্মাকে দেখলাম লাইব্রেরি-ঘরের বইপত্তর ঘেঁটে-ঘেঁটে দেখছেন। আমি ঢুকতেই মৃদু কাষ্ঠহাসি হেসে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল সুচরিতা, বলল, ওহ্ হো, আমি তো জিগ্যেস করতেই ভুলে গেছি। ওদিকের খবর কী?

বিষণ্ণ হাসি হেসে বললাম, শিকে ছেড়েনি। একদম বাজে খবর। নয়না কল্যাণী সত্যি কথাই বলেছেন, সাইরেনেই কাজ করতেন উনি। এখন আমার মনে হচ্ছে যে, সে-রাতে আলো বোধহয় কিরণ শর্মার ঘরে জ্বলছিল। কথা বলতে বলতেই একটা দেবদারু গাছের

দিকে চোখ গেল আমার। তখনই দেখলাম গাছের গুঁড়ির ওদিক থেকে কারও জামার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই সেই লোকটা।

পা টিপে টিপে এগোলাম। সুচরিতা কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মুখে আঙুল তুলে ওকে ইশারায় জানালাম চুপ করে থাকতে। তারপর গিয়ে আচমকা গাছের ওপিঠে হাজির হলাম।

গাছের আড়ালে যে লোকটি নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। হাসবার চেষ্টা করল।

আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না, ঠান্ডা স্বরে বললাম আমি, দয়া করে নিজের পরিচয়টা যদি দেন...।

আমি–আমি এখানে নতুন এসেছি, কর্কশ স্বরে থেমে-থেমে সে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না কোন দিকে পড়বে বাড়িটা...।

আমি সুচরিতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম। তারপর লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আসুন আমার সঙ্গে। কোথায় বাড়ি আপনার?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটি। তারপর বলল, ওই দিকটায়– বলে একটা দিক দেখাল সে।

আমি তার এই এলোমেলো কথায় ক্রমশ অবাক হচ্ছিলাম। হয়তো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ লোকটি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড বাই বলে হনহন করে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক তখনই আমার মাথায় এল ব্যাপারটা। এই লোকটাই সেই লোকটা নয় তো! নিশ্চয়ই, কোনও সন্দেহই নেই! লোকটার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলাম। চোখে সবুজ

সানগ্লাস, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সরু গোঁফ, কপালে বলিরেখা।

চিন্তার জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে আবার হাঁটতে শুরু করলাম, কবুতরের দিকে।

সুচরিতাকে বললাম, সু, আজ রাতে আমি বোধহয় কবুতরে থাকতে পারব না।

কেন, কেন? অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল সুচরিতা।

আমি হাসলাম। সুচরিতা এতই চঞ্চল হয়ে উঠল যে, হাসি চাপতে পারলাম না।

কেন, আবার হাসির কী হল? অবাক হয়ে বলল সুচরিতা।

কিছু না। আমি একবার হোটেল কন্টিনেন্টালে যাব। খোঁজ নেব যে, ইব্রাহিমের সঙ্গে কেউ ওখানে দেখা করতে যেত কি না...।

ও, তা বেশ তো। গম্ভীর গলায় বলল সুচরিতা।

প্লিজ সু, বোঝার চেষ্টা করো। কোনও ভয় নেই। আজ রাতে আর কোনও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটবে না–তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ। তা ছাড়া ইব্রাহিমের ব্যাপারটার একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।

একটু থেমে সুচরিতা বলল, কাল কখন ফিরবে?

সকালেই। জোর দিয়ে বললাম আমি।

কবুতরের বাইরের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। সুচরিতা কবুতরের বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, তাই আমিই লক্ষ করলাম ব্যাপারটা।

দেখলাম, কিরণ শর্মা উত্তেজিতভাবে ক্রসওয়ার্ডকে কী যেন বোঝাচ্ছেন, আর ক্রসওয়ার্ড চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ছেন।

একটু পরে ক্রসওয়ার্ড একাই এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে, বললেন, মিস্টার মৈত্র, আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে আলোচনা করতে চাই।

সঙ্গে-সঙ্গে সুচরিতার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

আমি ওর দিকে ফিরে হেসে অভয় দিলাম, বললাম, কোনও ভয় নেই, সু, তুমি যাও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে গেল ও।

মিস্টার মৈত্র, ক্রসওয়ার্ডের কাঠ-খোদাই মুখে কোনও অভিব্যক্তি লক্ষ করা গেল না, আমরা একটা ডেডবডি পেয়েছি। তার পরিচয়ও আমরা জেনেছি। হোটেল কন্টিনেন্টালের বেয়ারা ছিল সে। হোটেলের ম্যানেজারও আমাদের আপনার সেই চিঠি চুরি করার কথা বলেছে। সবই ঠিক আছে, শুধু একটা ব্যাপারে একটু খটকা দেখা দিয়েছে। যেখানে বডিটা পাওয়া গেছে, সেখানকার জনাদুয়েক লোক বলেছে যে, সে-রাতে তারা নাকি ভারি অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল। ওরা ড্রিঙ্ক করে ফিরছিল বলে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি...ভেবেছে দেখার ভুল। অর্থপূর্ণভাবে কথা শেষ করলেন ইন্সপেক্টর।

কী, কী দেখেছিল ওরা? আমি জানতে চাইলাম।

আপনাকে একটা গাছ থেকে নামতে দেখেছিল। আমি ওদের আপনার ফটো দেখাতেই ওরা আইডেন্টিফাই করেছে। এরপর সেই গাছে উঠে আমরা এটা পেয়েছি। বলে পকেট থেকে ব্রাউন পেপারে মোড়া ছুরিটা বের করলেন তিনি।

এরপর চুপ করে থাকার মানে হয় না। তাই সব খুলে বললাম ওঁকে। মৃতদেহ গুম করার কারণটাও খুলে বললাম। জানি না তিনি বিশ্বাস করলেন কি না। আমার বলা শেষ হলে ক্রসওয়ার্ড শুধু মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন, হু–।

তারপর একটু থেমে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমি বললাম, ইন্সপেক্টর, আমাকে আজ রাতে একটা জায়গায় যেতে হবে। কাল দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব।

যাবেন যান, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, দিল্লি পুলিশের ডিকশনারিতে ইমপসিব বলে কোনও শব্দ নেই– বলে হনহন করে এগিয়ে গেলেন ক্রসওয়ার্ড।

ওঁর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললাম, মিস্টার ক্রসওয়ার্ড, তুমি যদি জানতে, আমি কে, তবে–।

কাঞ্চনবাবু, সুচরিতা চৌধুরী কিন্তু কবুতরে থেকে গেলেন। আপনি তো যাওয়ার আগে বললেন, আজ রাতে কবুতরে আর কিছু হবে না। কিন্তু শুনুন– হা আজ রাতেই একটা ব্যাপার হবে। সম্ভবত মাঝরাতে– সুচরিতাদেবী বিপদে পড়তে পারেন। তবু আপনি যাবেন? থেকে গেলে পারতেন কিন্তু। যাকগে, নিয়তিকে তো আর কেউ রুখতে পারে না! ভীষণ কান্ড হবে একটা সত্যি বলছি সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হবে!

এ রহস্যের শেষ কোথায়? নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে এ কথা ভাবছিল সুচরিতা। রাত প্রায় দেড়টা। আশ্চর্য! কুমার রণজিৎ খুন হওয়ার রাতে গুলির শব্দ কেউ শুনল না কেন! তবে কি রাতে ওরা যে-ড্রিঙ্কস নিয়েছিল তাতেই কোনও স্লিপিং ড্রাগ মেশানো ছিল। কিন্তু কে মেশাল! হঠাৎ...।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুচরিতার কোষে-কোষে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। পায়ের শব্দ না! অন্ধকারেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে ঠাহর করতে পারল না। তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে এল। করিডর নিঝুম নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও নেই।

আবার শব্দ হল একটা। নিশ্চয়ই নীচের লাইব্রেরি-ঘরে। কেউ তা হলে আছে নাকি ওখানে?

পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাইব্রেরির সামনে এসে দাঁড়াল সুচরিতা। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। এগিয়ে এসে চাবির ফুটোয় চোখ রাখল। এ কী!

লাইব্রেরি-ঘরের গভীর অন্ধকারে শুধু একটা টর্চলাইটের আলো ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পাশ থেকে কেউ একজন সরে দাঁড়ানোয় চাবির ফুটো দিয়ে আর কিছু দেখা গেল না।

তবে কি লাইব্রেরি-ঘরে চোর ঢুকেছে? কিন্তু ওর পক্ষে তো একা কিছু করা সম্ভব নয়। চিন্তা করে দেখা গেল সাহায্য করার মতো একজনই আছে কবুতরে। সে তরুণ সান্যাল।

অতএব সিঁড়ি দিয়ে উঠে তরুণের ঘরের কাছে এসে দরজায় টোকা দিল সুচরিতা।

তরুণ—।

একটু পরে ঘুম চোখে এসে দরজা খুলল তরুণ সান্যাল। চেঁচিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল। ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে সুচরিতা বলে উঠল, শ স্। চুপ! নীচের লাইব্রেরিতে মনে হয় চোর ঢুকেছে।

কী! চোর! তরুণের ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি।

আস্তে, ফিসফিস করে বলল সুচরিতা, তুমি রেডি হয়ে নাও—আমরা দুজনে ঢুকব ও-ঘরে।

দাঁড়াও। বলে ঘরের কোনা থেকে একপাটি লোহার নাল লাগানো জুতো তুলে নিল তরুণ। বলল, চলো, এই জুতোর এক ঘা খেলে চোরবাবাজিকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না।

নিঃসাড়ে চুপিচুপি ওরা দুজনে এসে দাঁড়াল লাইব্রেরির সামনে।

ভেতরে কজন আছে? ফিসফিস করে জিগ্যেস করল তরুণ।

কে জানে! বোধহয় দু-তিনজন! অবহেলাভরে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল সুচরিতা।

আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তুমি ভেতরে ঢুকে আলোর সুইচটা অন করে দেবে। বলে জুতোটাকে বাগিয়ে ধরে এক ঝটকায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল তরুণ।

ভেতরে টর্চের আলো তখনও দেওয়ালের গায়ে ঘুরছিল। দরজা খোলার শব্দে টর্চধারী লোকটি সচকিত হওয়ার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তরুণ। ওদের দুজনের ঝাঁপটিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুচরিতা–ওই অন্ধকারেই। ঠিক ওই সময়ই কে যেন মনে হল ওর পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আর কিছু ভাববার আগেই তরুণের চিৎকার ভেসে এল : সুচরিতা, আলোটা জ্বালাও শিগগিরই

সুচরিতা সুইচের দিকে পা বাড়াতেই দেখা গেল একটি ছায়ামূর্তি এক ছুটে লাইব্রেরির খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে লাফিয়ে সুরকি ঢালা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পালাল।

এই দেখে আর আলো না জ্বালিয়ে লোকটির পিছন পিছন ধাওয়া করে বাইরে বেরিয়ে এল সুচরিতা।

দৌড়ে যখন ও কবুতরের গেটে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময় ওর সঙ্গে একজনের ধাক্কা লাগল।

লোকটি পালিয়েছে। গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল কারও।

চোখ তুলে তাকাল সুচরিতা। ওর সামনে টেরিন-টি-শার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি শ্রীকিরণ শর্মা।

দারুণ অবাক হয়ে গেল সুচরিতা। এই রাতেও টিপটপ ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছেন শর্মাসাহেব!

লোকটি পালিয়েছে, মিসেস চৌধুরী, আর ফলো করে লাভ নেই। দ্বিতীয়বার বললেন তিনি।

ও–।

একটা কথা ভাবছিল সুচরিতা। সত্যি যদি তাই হয়! হয়তো অসম্ভব কল্পনা, কিন্তু অসম্ভবও তো সময়ে-সময়ে সম্ভব হয়।

চলুন, শর্মাসাব, কবুতরে ফিরে যাওয়া যাক, বলে দুজনে ফিরে চলল কবুতরের দিকে।

বাড়ির সবাই তখন লাইব্রেরি-ঘরে এসে ভিড় করেছেন–একমাত্র নয়না কল্যাণী ছাড়া। ওঁর নাকি অনিদ্রা রোগ আছে। তাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়লেও ঘুম নাকি ওঁর ভাঙে না–মানেকজি জানালেন।

তরুণের কপালে একদিকটায় ছড়ে গেছে। সবাইয়ের ননস্টপ প্রশ্নের উত্তরে সবই খুলে বলল ওরা। কিন্তু কারা, কেন এসেছিল, কিছুই জানা গেল না।

অবসন্ন মনে নিজের ঘরে ফিরে চলল সুচরিতা। লোকটা ঘরের দেওয়ালে আলো ফেলে কী দেখছিল? ইস, কাঞ্চন থাকলে কত ভালো হত!

কবুতরের রহস্য কি এখনও শেষ হয়নি? কে জানে, এরপর কবুতরে কোন অধ্যায় অভিনীত হবে!

.

পরদিন সকালেই ফিরে এলাম আমি। আমাকে দেখেই প্রথমে সুচরিতার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। ছুটে এগিয়ে এল আমার কাছে। ওর চোখে আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টি।

আমি ওকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে কাছে টেনে নিলাম। ওর কানে কানে প্রায় ফিসফিস করে বললাম, কী হয়েছে, সু, কী হয়েছে?

আমার ভয় করছে ভীষণ ভয় করছে। কাঁপা কাঁপা স্বরে জবাব দিল সুচরিতা।

আরে ভয় কী– থেমে-থেমে বললাম আমি, আমি থাকতে তোমার গায়ে যে হাত দেবে তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব। কী হয়েছে?

শেষ দিকে আমার গলা পালটাতে দেখে ও একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল সব। কীভাবে রাতে চোর ঢুকেছিল লাইব্রেরিতে, তারপর তাড়া করতে গিয়ে কিরণ শর্মার সঙ্গে ধাক্কা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। তারপর বললাম, সু, তোমার পাশ দিয়ে অন্ধকারেই যে কেউ বেরিয়ে গিয়েছিল এ-ব্যাপারে তুমি কি শিয়োর?

তাই তো মনে হয়েছিল আমার…।

হুঁ–। তার মানে বাইরের কারও সঙ্গে ভেতরের কেউ হাত মিলিয়েছে। একটু চিন্তা করে বললাম আমি।

তক্ষুনি সুচরিতা এমন একটা কথা বলল যে, আমি সাঙ্ঘাতিকভাবে চমকে উঠলাম। ও বলল, বাইরের লোক হওয়ার কী দরকার? ভেতরের দুজন হলেও বা আপত্তি কিসের! যদি কিরণ শর্মাই সেই বাইরের লোক হয়?

কিন্তু, এ কী করে সম্ভব!

তুমি না একটা আস্ত বোকা! তোমাকে বললাম না, কিরণ শর্মা একদম ড্রেস্‌ড-আপ হয়ে ছিলেন। মনে করো কিরণ শর্মা জানলা দিয়ে লাফিয়ে দৌড়লেন। আমি তাড়া করলাম। ধরতে পারলাম না, কিন্তু একটু পরেই তো কবুতরে ওঁর অ্যাবসেন্স ধরা পড়বে, তখন! তাই

দৌড়ে কবুতরের গেট পার হয়েই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। বললেন যে, লোকটি পালিয়েছে। খুশি-খুশি মুখে চুপ করল সুচরিতা।

জিনিয়াস! সু, তুমি একটা জিনিয়াস। উচ্ছ্বাসে বললাম আমি। কিন্তু পরমুহূর্তেই গলার স্বর খাদে নামিয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, কিন্তু তোমার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে কে বেরিয়ে গিয়েছিল?

কী জানি, আমি বুঝতে পারিনি। তবে কী যেন একটা মনে করেও করতে পারছি না…।

কী? কী কথা? আমি জানতে চাইলাম।

ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়তো পরে মনে পড়বে।

এইবার আমি মনে-মনে একটা প্ল্যান ছকে ফেললাম। প্রশ্ন করলাম সুকে, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে, যারা এসেছিল, তারা তাদের কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে?

উঁহু– সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল সুচরিতা।

তার মানে আবার তারা আসবে–দৃঢ়স্বরে বললাম আমি, হয় আজ রাতে, নয়তো কাল রাতে, নয় আগামী আর কোনও রাতে। তা হলে শুরু হোক আজ রাত থেকেই।

কী শুরু হবে? চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল সুচরিতা।

যাকগে…পরেই শুনবে–দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। হ্যাঁ, ভালো কথা–তরুণ সান্যাল কবুতরে আজ থাকছে তো?

হ্যাঁ। কিন্তু ইব্রাহিমের ব্যাপারটার কী হল?

কিস্যু না। যে-অন্ধকারে ছিলাম এখনও সেই অন্ধকারে। ইব্রাহিমের সঙ্গে তেমন কেউ গোপনে দেখা করতে আসত না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুকের পাঁজর থেকে : চলো, ভেতরে যাওয়া যাক। বলে দুজনে কবুতরে ঢুকলাম।

সেখানেই দেখা হল ইন্সপেক্টর ক্রসবির সঙ্গে। আমাকে দেখে হাসলেন, বললেন, শুনেছেন তো, গত রাতে কবুতরে চোর এসেছিল!

হ্যাঁ, জবাব দিলাম আমি।

এতক্ষণ প্রসাদজিকে লক্ষ করিনি। তিনি ইন্সপেক্টরের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, মিস্টার মৈত্র, আপনার সব কথাই আমি শুনেছি। আশা করি কবুতরে থাকতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

না, না,বাধা দিয়ে বলে উঠলাম আমি, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

প্রসাদজি চলে গেলেন।

ইন্সপেক্টর আমার দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কাঞ্চনবাবু, গতরাতে আপনি কবুতর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি সব খুলে বললাম। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন না বলেই মনে হল।

তিনি কি আমাকেই রাতের আগন্তুক বলে সন্দেহ করছেন নাকি? যাক গে, আমি আর সুচরিতা কোনও কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

দুপরের খাওয়া-দাওয়ার পর তরুণ আর সুচরিতার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করলাম। ঠিক হল, সুচরিতা একটা আলমারির পেছনে লুকিয়ে থাকবে, ঘরে কেউ ঢুকলেই আলো জ্বেলে দেবে। আর আমি থাকব টেবিলের পেছনে। সব শেষে তরুণ থাকবে দরজায় কাছে– যাতে দরজা দিয়ে কেউ পালাতে না পারে। রাত বারোটা থেকে আমরা অপেক্ষা শুরু করব

ঠিক করলাম। আমরা ছাড়া আর কেউ যেন কিছু জানতে না পারে, এ-কথা বারবার করে বলে চলে এলাম নিজের ঘরে। সটান গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

.

রাত বারোটা বেজে এক মিনিট। অজ্ঞান কবুতরে জেগে আছি শুধু আমরা তিনজন আমি, তরুণ আর সুচরিতা।

পা টিপে টিপে লাইব্রেরিতে ঢুকলাম আমরা। ঘরে জমাট অন্ধকার। আমরা যার-যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তরুণ সঙ্গে এনেছে একপাটি নাল লাগানো জুতো। আমার পাঁচ আঙুলে আটকানো একটা নাল ডাস্টার। সারা ঘর অন্ধকার। শুধু তিনটে কাচের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল ভেতরে।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম আমি। আজ হয়তো আমাদের প্রতীক্ষা নিষ্ফল হবে। তবু আশা–। বাঁ হাতের রেডিয়াম ডায়ালে চোখ নামালাম। পৌনে একটা। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল।

এইভাবে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎই যেন সুরকি-ঢালা পথে কারও সতর্ক পায়ের শব্দ আমার কানে এল। শরীরের সবকটা স্নায়ু যেন নিঃশব্দ চিৎকারে গলা ফাটিয়ে বলতে লাগল, এসেছে। সে এসেছে!

একটু পরেই একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল জানলায়। দম বন্ধ করে চরম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। ধীরে-ধীরে জানলা টপকে ঘরের মধ্যে নেমে দাঁড়াল সে। একবার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর এক পা এগোতেই আমি কাঁপয়ে পড়লাম তার ওপর।

পরমুহূর্তেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল সুচরিতা। তরুণ এগিয়ে এসে কলার ধরে এক হ্যাঁচকায় তুলে দাঁড় করাল লোকটিকে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম আমি। একী! এ যে সেই রহস্যময় কালো পোশাক পরা লোকটি।

এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, স্যার, নিজের বাড়ি খুঁজতে এসে আপনাকে যে এত বিপদে পড়তে হবে তা বোধহয় ভাবেননি!

লোকটি গম্ভীর মুখে তাকাল আমার দিকে। ইতিমধ্যে লাইব্রেরিতে প্রায় সবাই এসে হাজির হয়েছেন। শ্রী নরসিংহ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, মিস্টার বোস, হচ্ছে এসব ব্যাপার কী? মাঝরাত্রে যত সব বিড়ম্বনা।

আমি হাসলাম, ওঁকে নকল করে বললাম, বোস নয়, মৈত্র। দেখুন না নিজেই হয়েছে কী। সর্বেশ্বর রায় নামধারী ভদ্রলোক চোরের মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন নৈশ আগন্তুকের দিকে।

সকলের দিকে একপলক দেখে জামাকাপড় ঝেড়ে মুখ খুললেন আমাদের নৈশ অতিথি। আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনাদের সবাইকে জানাই যে, আমার নাম কিষাণ আপ্তে– দ্যাট ইজ, এজেন্ট জেড। সি.বি.আই. থেকে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

একথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল সবাইয়ের মুখ দিয়ে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে মিস্টার আপ্তে বলে চললেন, আমি এখানে এসেছি সমর বর্মনকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। নামটা আপনাদের সকলের কাছেই বোধহয় পরিচিত। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, কবুতরে যে কজন হাজির আছেন, তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই সমর বর্মন। বর্মনের ছদ্মবেশ ধরার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। সে আমার ছদ্মবেশ ধরে হাজির হয়েও আপনাদের ধোঁকা দিতে পারে। এই আশ্চর্য চোর এবং ব্ল্যাকমেলারটিকে ধরা

অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন যেহেতু সে কবুতরে আছে, তাই আমাদের কাজ একটু সহজ হয়ে পড়েছে।

সমর বর্মন কবুতরে এসেছে সম্ভবত হীরের নেকলেসের জন্যে। গতবছর সিরাজনগরের মন্ত্রী সুরেন্দ্র পালিত একটা মিটিং-এ কবুতরে এসেছিলেন। আমরা খবর পেয়েছি যে, তিনি একটা দামি নেকলেস এখানে লুকিয়ে রেখে যান। সেটার খবর বর্মন জেলে বসেই পায়। আমরা আন্দাজ করেছিলাম যে, ওটা হাতানোর জন্যে সে, কবুতরে আসবেই। তাই এতদিন আমি ছদ্ম পরিচয়ে কবুতরের আশেপাশে ঘুরেছি বলে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। তারপর সুচরিতার দিকে ফিরে বললেন, ম্যাডাম, গত রাতেও আমি এসেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখা হীরের নেকলেসটা উদ্ধার করা। আমি চাইনি যে, সবাই এই ব্যাপারটা জানুক। যা হোক, আগামীকাল আমি ইন্সপেক্টর ক্রসবির সঙ্গে দেখা করছি। এবার আমি বর্মনকে ধরবই। সে আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না। তার চোখ জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

সর্বেশ্বর রায় বললেন, মিস্টার আপ্তে, আমি আগামীকাল কবুতর ছেড়ে যেতে চাই। তা না হলে আমার প্রায় পঞ্চাশহাজার টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে।

সেটা আপনি ক্রসবিকেই বলবেন—। জানালেন এজেন্ট জেড।

প্রসাদজি মিস্টার আপ্তের জন্যে ওপরে একটা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। সবাই লাইব্রেরি ছেড়ে পা বাড়ালেন নিজের নিজের ঘরের দিকে।

সুচরিতাকে নিয়ে ওপরে ওঠার সময় শুধু শুনলাম, শ্রীনরসিংহ নিজের মনেই বলছেন, খুবই ঘটছে আশ্চর্য এখানে ব্যাপার।

.

পরদিন সকালে উঠে চুল আঁচড়াতে যেতেই সাঙ্ঘাতিক অবাক হলাম আমি। আয়না দিয়েই চোখে পড়ল বান্ডিলটা। তারপর তাকালাম টেবিলের ওপর। এই তো! এই তো সেই চিঠির বান্ডিলটা। সুচরিতা চৌধুরীর নাম লেখা সেই চুরি যাওয়া চিঠিগুলো!

হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে এল। সুরেন্দ্র পালিতের লেখা পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা আর এই চিঠিগুলোর হাতের লেখা একই। তার মানে এই চিঠির লেখক শ্রীযুক্ত পালিতই। হয়তো এই চিঠিগুলোতে কোনও গোপন ইঙ্গিত আছে। এই যে, কবুতর থেকে লেখা চিঠিটা। এটা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও, হয়তো এর সাহায্যেই পালিতসাহেব লুকোনো নেকলেসের সন্ধানটা জানাতে চেয়েছেন।

এক দৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে কিষাণ আপ্তেকে সবকিছু খুলে বলে আমার সন্দেহের কথা জানালাম।

তিনি প্রসাদজির সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার কথা শুনে বললেন, মিস্টার মৈত্র, আপনি যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমি এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি। এখানকার সাইফার রিডারকে অনুরোধ করব এগুলো ডিসাইফার করার জন্যে। বলেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে চিঠিগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি প্রসাদজির সঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম। বললাম, আচ্ছা প্রসাদজি, আপনার বাড়িতে কোনও গুপ্তপথ আছে কি?

না তো। জানালেন প্রসাদজি।

কোনওকালেই ছিল না? গভীর আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে প্রসাদজি জানালেন যে, অনেক আগে একটা সুড়ঙ্গপথ ছিল ওই লাইব্রেরিতেই। কিন্তু পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

আমি আর প্রসাদজি উঠে রওনা হলাম লাইব্রেরির দিকে। মাঝপথেই দেখা হল সুচরিতার সঙ্গে। ওকে সব কথা বললাম। শুনে অবাক হয়ে গেল ও। আমরা তিনজনে গিয়ে হাজির হলাম লাইব্রেরিতে।

প্রসাদজি এগিয়ে গেলেন দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে। ছবিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে দেওয়ালের সেই অংশে একটু চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলমারির পাশ থেকে দেওয়ালের কিছুটা অংশ নিঃশব্দে সরে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। অতি সাধারণ একটা সুড়ঙ্গপথ। দেখে অনেক পুরোনো বলেই মনে হয়। প্রায় কুড়ি গজ যাওয়ার পর দেখা গেল পথ সম্পূর্ণ বন্ধ। সুড়ঙ্গের দেওয়াল অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় ইটের গা থেকে চুন-বালি সব খসে-খসে পড়ছে।

মিনিটদশেক পর আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রসাদজি বললেন, মৈত্রসাব, কিছু ব্যাপারই আমার মাথায় ঢুকছে না। কোত্থেকে কী সব হচ্ছে–

এমন সময় লাইব্রেরির দরজায় হাজির হলেন এজেন্ট জেড। তার মুখ খুশিতে ভরপুর।

আমাদের দেখেই বললেন, সব জেনেছি আমি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, মিস্টার মৈত্র, কবুতরের নাম লেখা চিঠিটাই আসল। সেটা ডিকোড করা গেছে। এই দেখুন– বলে একটা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম। তাতে লেখা–

আট বাঁ–সাতটা ইট-পাশে তিনটে কাগজ।

গজ উপরে

——-সুরেন্দ্র

এ তো জলের মতো স্পষ্ট! বলে উঠলাম আমি, তার মানে সুড়ঙ্গপথ ধরে আট গজ গিয়ে বাঁ দিকের দেওয়ালে দেখতে হবে। মেঝে থেকে সাতটা ইট ওপরে গিয়ে তিনটে ইট

পাশে– ব্যস, তা হলেই পাওয়া যাবে।

আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। বললেন কিষাণ আপ্তে, চলুন, আর দেরি করে লাভ কী!

শুরু করা যাক।

প্রসাদজি একটা মাপার ফিতে নিয়ে এলেন। মাপজোখ করে কাজ শুরু করলাম আমরা চারজন। সাতটা ইট ওপরে আর তিনটে ইঁট পাশে যেতেই একটা আলগা ইট চোখে পড়ল। পকেট থেকে ছোট্ট ছুরি বের করে ইটটাকে বের করে নিলাম।

অন্ধকার একটা খুপরি। আনন্দে উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে গেল যেন। কিষাণ আপ্তে চটপট হাত ঢুকিয়ে দিলেন খুপরির ভেতরে।

একটু পরেই হাত বের করে নিলেন। তার হাতে একটা কাগজ।

তাহলে কি কেউ আমাদের আগেই এ-জায়গার সন্ধান পেয়েছে! উঁচু গলায় বললাম আমি।

মনে তো হয় না। জানালেন এজেন্ট জেড। কাগজটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। কী আশ্চর্য! তাতে শুধু দেখা যাচ্ছেঃ

গ গ গ গ গ
গ গ গ গ গ

দেখে ভীষণ অবাক হলাম আমি। এরকম তিক্ত রসিকতার অর্থ কী?

কিষাণ আপ্তেকে লক্ষ করে বললাম, মিস্টার আপ্তে, আপনি কি এর অর্থ বুঝতে পারছেন?

উঁহু মাথা কঁকালেন এজেন্ট জেড।

প্রসাদজি বললেন, মিস্টার মৈত্র, চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। প্রসাদজি গুপ্তপথটা বন্ধ করে দিয়ে ছবিটাকে আবার যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখলেন।

এমন সময় লাইব্রেরিতে এসে ঢুকলেন কিরণ শর্মা ও ক্রসওয়ার্ড। কিষাণ আপ্তের হাতে চিরকুটটা দেখে এক লাফে এসে দাঁড়ালেন সামনে, বললেন, দেখি, দেখি। বলে আর দেওয়ার অপেক্ষা রাখলেন না। একরকম ছিনিয়েই নিলেন ওটা।

জেড বাধা দিলেন না।

আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম কিরণ শর্মার মুখের দিকে। হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, একটা খুশির ঝিলিক লহমার জন্যে ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। তারপর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর মুখ করে বলে উঠলেন, ভারি অন্যায়। এরকম রসিকতা করা ভারি অন্যায়।

ক্রসওয়ার্ডও দেখলেন কাগজটা। কিন্তু কিছু বুঝলেন বলে মনে হল না।

এসবই সমর বর্মনের কারসাজি, দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন জেড? তাকে একবার হাতের মুঠোয় যদি পাই...।

আমি যাচ্ছি—একটু কাজ আছে। বলে সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শর্মা। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার চলার পথের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমি, মিস্টার আপ্তে, এই কিরণ শর্মা যদি কুমার রণজিৎকে খুন করে থাকেন, তা হলে আমি বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য হব না।

দুজন অফিসিয়াল হাঁ করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। সুচরিতা আপনমনেই নখ খুঁটতে থাকল।

.

ওপরে উঠে প্রথম ঘরটায় উঁকি মেরে দেখি শ্রীসর্বেশ্বর রায় গোছগাছ শুরু করে দিয়েছেন। আমি পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি একজন চাকরগোছের লোক বসে রয়েছে। আমি তাকে দেখে অবাক হলাম। এ যে কুমার রণজিতের নেপালি চাকরটা!

আমাকে দেখেই লোকটি হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, বাবু, আমার সাহেবকে যে খুন করেছে তাকে আমি শেষ করব। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিন—আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব। বলতে-বলতে লোকটি কোমর থেকে হঠাৎই একটা বাঁকানো ছোরা বের করল। ওর মুখ জিঘাংসায় বিকৃত হয়ে উঠল।

আমি ভাবলাম, লোকটি আমাকেই খুনি ভাবছে না তো! হয়তো আমার বিশ্বাসভাজন হয়ে তারপর আমাকেই খুন করতে চায়।

মুখে বললাম, ঠিক আছে। তোমার কোনও চিন্তা নেই। পুলিশ কুমারের হত্যাকারীকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাবেই।

জানি না, সে আমার কথা কতটুকু বিশ্বাস করল। কিন্তু ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার যে-কোনও কাজে দরকার হলেই আমাকে বলবেন। আপনার জন্যে জান হাসিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আমি হাঁফ ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর এসে দাঁড়ালাম জানলায় কাছে। এই জানলা দিয়ে কবুতরের পেছনদিকটা চোখে পড়ে। ও কী! কিরণ শর্মা না?

পেছনদিকের গোলাপ বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ব্যাপার কী জানার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমি রওনা দিলাম বাগানের উদ্দেশে।

বাগানে গিয়ে হাজির হতেই সেখান থেকে দ্রুতপায়ে প্রস্থান করলেন শ্রীশর্মা। ফিরে আসতে যাব, হঠাৎই দেখি কিষাণ আপ্তে দৌড়ে আসছেন আমার দিকে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে, মিস্টার আপ্তে?

হাঁফাতে-হাঁফাতে জবাব দিলেন তিনি, পেয়েছি! এতদিন পরে পাওয়া গেছে রিভলভারটা। চলুন, দেখবেন চলুন।

আমি আর কোনও কথা না বলে দ্রুত তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে এসে হাজির হলাম কবুতরের গেটের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীনরসিংহ, সর্বেশ্বর রায়, ক্রসওয়ার্ড, আর সুচরিতা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম মানেকজি ও প্রসাজি হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আর পেছনে ও কে! তরুণী কথাটা যাকে হুবহু মানায় সেইরকম একজন। নয়না কল্যাণী! নাঃ, রূপ আছে মেয়েটার! চোখে সানগ্লাস, ঠোঁটে লিপস্টিক। ঢল নামা চুলে মুখের অর্ধেকটাই প্রায় ঢাকা।

প্রথমে ভালো করে দেখলাম। সর্বেশ্বর রায়ের সুটকেশটা তার পায়ের কাছে ভোলা অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার মধ্যে উঁকি মারছে একটা সুদৃশ্য কালো অটোমেটিক। সর্বেশ্বর রায় চেঁচাচ্ছিলেন, আমি তো বলেছি, আমি জানি না। আমার ব্যাগে কেউ যদি রিভলবার লুকিয়ে রাখে, তবে আমি কী করতে পারি?

কিষাণ আপ্তে বললেন, ঠিক আছে মিস্টার রায়, আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। আমরা পরে এ-ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করব।

বেশ রাগ-রাগ ভাব দেখিয়েই চলে গেলেন সর্বেশ্বর রায়।

ক্রসওয়ার্ড সুটকেশ থেকে রিভলবারটি বের করে নিয়েছিলেন। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, হু, এটাই কাজে লাগানো হয়েছিল বলে মনে হয়। আপনার কী মনে হয়, মিস্টার আপ্তে?

পয়েন্ট থ্রি এইট বলেই মনে হচ্ছে। ভালো করে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন জেড।

আচ্ছা, আপনারা এবার যার-যার ঘরে ফিরে যান– ক্রসওয়ার্ড হাতে তালি দিয়ে বললেন, এখানে দয়া করে আর ভিড় করবেন না।

মানেকজি, প্রসাদজি আর আমি ছাড়া সবাই চলে গেলেন। নয়না কল্যাণী চলে যাওয়ার আগে মানেকজির সঙ্গে চাপা গলায় কীসব কথা বলে গেলেন।

মানেকজি অস্থিরতাকে আর চাপতে পারছিলেন না। বলে উঠলেন, ক্রসবি, কী সব ফ্যানটাস্টিক ব্যাপার হচ্ছে এখানে? সর্বেশ্বর রায় আমার পরিচিত। তুমি শিগগিরই এর একটা হেস্তনেস্ত করো। ফানি!

মানেকজি ও প্রসাদজি চলে গেলেন।

আমি এবার ক্রসওয়ার্ডকে বললাম, ইন্সপেক্টর, দেখুন, রিভলভারটায় কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পান কি না।

আশা খুবই কম, বললেন এজেন্ট জেড। তারপর চিন্তিত মনে তিনজনই ফিরে এলাম কবুতরে।

একটু পরে ছুটতে ছুটতে আমার ঘরে এল সুচরিতা। বলল, কাঞ্চন, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে।

কী? কী মনে পড়েছে? অবাক হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

সেই রাতে কেউ আমাকে পাশ কাটিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এ-ব্যাপারে আমি শিয়োর। দৃঢ়স্বরে বলল সুচরিতা।

কেন! কী হয়েছে?

আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, বলল সুচরিতা, কিসের গন্ধ তা ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু আজ আবার আমি গন্ধটা পেয়েছি। আজ, একটু আগে, সবাই যখন গেটের কাছে ভিড় করেছিল তখন!

তার মানে সে-রাতে কেউ একজন লাইব্রেরিতে লুকিয়ে ছিল। মিস্টার আপ্তে তা জানতে পারেননি। অথচ আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, ঘরে দু-চারজন লোক ছিল।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘরের দরজায় দেখা গেল সেই চাকরটিকে। কুণ্ঠিতস্বরে সে বলল, যদি এটা একবার দেখেন– বলে আমার দিকে একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল।

উঠে গিয়ে আমি সেটা হাতে নিলাম। তাতে একটা ঠিকানা লেখা।

আমি চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালাম ওর দিকে। ও জবাব দিল, ওই দাড়িওয়ালাবাবুর পকেট থেকে পড়েছিল এটা।

দাড়িওয়ালাবাবু মানে কিষাণ আপ্তে। কিন্তু এর অর্থ কী! জেড কি এই লোকটাকে পরীক্ষা করার জন্যে পকেট থেকে কাগজটা ইচ্ছে করেই ফেলেছেন? যাকগে, একবার শেষ চেষ্টা করব এই সূত্র ধরে। কিষাণ আপ্তের সঙ্গে কথা বলে এই ঠিকানায় একবার যাব। জানি কোনও লাভ হবে না, তবু– এই আশা নিয়ে সুচরিতাকে বসতে বলে জেড-এর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উঠলাম।

নীচের ঘরে এসে তাঁকে দেখলাম। বসে-বসে মানেকজির সঙ্গে কথা বলছেন। আমি গিয়ে তাঁকে একপাশে ডাকলাম, বললাম, মিস্টার আপ্তে, আপনার পকেট থেকে কি এই

কাগজটা পড়ে গিয়েছিল?

না তো! সবিস্ময়ে বললেন তিনি, কোথায় পেলেন এটা?

আমি তাকে সব খুলে বললাম।

সব শুনে তিনি বললেন, ওই চাকরটা নিশ্চয়ই কারও হয়ে কাজ করছে। দেখি, ব্যাটার মতলব কী!

আমি আর দেরি না করে কবুতরের বাইরে এসে ক্রসওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করে বললাম, ইন্সপেক্টর, আমি একটা সামান্য সূত্র পেয়েছি। সেটা নিয়েই একবার শেষ চেষ্টা করতে চাই বলে তাকে সব বললাম, ঠিকানাটাও দেখালাম। শেষে যাওয়ার সময় বললাম, আপনি কাইন্ডলি লক্ষ রাখবেন যে, কেউই যেন কবুতর ছেড়ে কোথাও না যান।

কবুতর ছেড়ে যাওয়ার সময় একবার পেছনদিকটায় উঁকি দিয়ে গেলাম। দেখলাম, কিরণ শর্মা তখনও গোলাপের বাগানে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখেই সাঁৎ করে সরে গেলেন।

আমি মনে-মনে একটু হেসে কবুতর ছেড়ে রওনা দিলাম। হতাশা আমার মন ছেয়ে ফেলেছিল।

.

পোড়ো বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকানাটা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। এই বাড়িটাই তো? ভাঙা নেমপ্লেট থেকে যতটুকু উদ্ধার করা গেল, তা খুবই সামান্য। তবু ঠিকানাটা মেলাতে অসুবিধে হল । বনজঙ্গলে ভরতি এই ভাঙা পোড়ো বাড়িতে আর যেই থাক, মানুষ বাস করে বলে মনে হল না।

পা টিপেটিপে ঢুকলাম বাড়ির চত্বরে। বেলা পড়ে এসেছিল। জায়গাটা ছায়া পড়ে অন্ধকার অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ধীরে-ধীরে বাড়ির পেছনদিকে গিয়ে পৌঁছোলাম। ঝোপঝাড়ে ভরতি পেছনদিকটা। তারই মধ্যে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে নীচের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, সেখানে জনাসাতেক লোক বসে আছে। ঘরের দেওয়ালে একটা লাল পাঞ্জার ছাপ। এখানেও লাল পাঞ্জা!

লোকগুলোর আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, ওদের নেতা বা ওই ধরনের কেউ এখনও আসেননি। জানলা ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই একজন লোককে হেঁটে যেতে দেখলাম। তার পেছনদিকটা দেখে খুব চেনা মনে হল। কিন্তু কে, তা কিছুতেই ধরতে পারলাম না। আমি তো ক্রসওয়ার্ডকে বারণ করে দিয়ে এসেছিলাম যে, কবুতর ছেড়ে কেউ যেন বেরোতে না পারে!

হঠাৎ মাথার ওপরের একটা জানলা থেকে ভেসে আসা গোঙানির শব্দ আমার কানে এল। সঙ্গে-সঙ্গে পুরোনো জীর্ণ পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। সবসময়ই ভয় হতে লাগল, পাইপটা যদি ভেঙে পড়ে, কিংবা কেউ যদি দেখে ফ্যালে!

শেষ পর্যন্ত জানলার কার্নিশে পৌঁছে জানলা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘরে আবছা আবছা চোখে পড়ল একটি লোককে। ঘরের এক কোনায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

কী করব ভাবছি—এমন সময় ঘরের আলো জ্বলে উঠল। আর আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে, তিনি কিরণ শর্মা।

আমি তাঁকে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠলাম, তা হলে শেষ পর্যন্ত আপনিই নাটের গুরু?

কোনও জবাব না দিয়ে আমার দিকে ছপা এগিয়ে এলেন তিনি। তারপরই পকেট থেকে একটা গাঢ় নীলচে রঙের রিভলভার বের করে উঁচিয়ে ধরলেন আমার দিকে, তার মুখ

ব্যঙ্গের হাসিতে বিকৃত হয়ে গেল…।

.

রাতে যখন কাঞ্চন ফিরল না, তখন খুবই মুষড়ে পড়ল সুচরিতা। কোত্থেকে কী হয়ে গেল। তাদের মধ্যেই একজন সমর বর্মন! কী সাঙ্ঘাতিক! তবে কাঞ্চন নিশ্চয়ই নয়। সত্যিই, কাঞ্চন ছেলেটা এমন দুরন্ত প্রকৃতিরদারুণ ছেলে। ওকে ছাড়া সুচরিতা নিজেকে ইদানিং ভাবতে পারে না। ও আসার পর থেকেই সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে আছে সুচরিতা।

ঠিক এমন সময় ঠক করে একটা আওয়াজ হল কাচের শার্সিতে। চকিতে জানলার দিকে ছুটে গেল সুচরিতা। জানলা খুলল–। নীচের সুরকি ঢালা পথে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুচরিতা মুখ বাড়াতেই আর একটা সাদা রঙের কী ছিটকে এল ঘরের ভেতরে। নীচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল ও। কাগজে মোড়া একটা পাথর। কাগজটা খুলল..একী! এ যে কাঞ্চনের চিঠি। চিঠিতে লেখাঃ

সু,
ভীষণ বিপদ, শিগগির কবুতর ছেড়ে আমার লোকের সঙ্গে চলে এসো। অনেক কথা বলার আছে। আর, এদিকে কী হয়েছে জানো? কিরণ শর্মা হলেন…।
কাঞ্চন।

আর দেরি করল না সুচরিতা। চটপট তৈরি হয়ে নেমে এল নীচে। দেখল, লোকটি ওর পরিচিত। ওই লোকটিই কুমার রণজিতের চাকর ছিল।

সুচরিতা নেমে আসতেই সে চাপা গলায় বলল, তাড়াতাড়ি চলুন, বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ওরা দুজন দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল।

সুচরিতা ভাবছিল—তা হলে কাঞ্চনের ধারণাই সত্যি হল। কিরণ শর্মাই আসল লোক।

কবুতরের বাইরে সুচরিতার গাড়ি ছাড়াও আর একটা কালো রঙের স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়িয়েছিল। চাকরটার নির্দেশে সুচরিতা গিয়ে বসল সেই গাড়ির পিছনের সিটে। চাকরটা ওর পাশে এসে বসল।

ড্রাইভারের সিটে যে বসেছিল সে গাড়ি ছেড়ে দিল। লোকটির মুখ সুচরিতার চেনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু পাশ থেকে দেখে ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না।

হঠাৎই পিছনদিকে মুখ ফেরাল লোকটি।

সঙ্গে-সঙ্গে খুশির বন্যায় ছলকে উঠল সুচরিতার আনন্দ ও কাঞ্চন, তুমি!

কাঞ্চন কোনও জবাব না দিয়ে হু-হু করে গাড়ি ছোটাতে লাগল।

এ কী! কাঞ্চন, কী হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন? ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করল সুচরিতা।

কাঞ্চন এবারও কোনও জবাব দিল না। গাড়ি ছুটতে লাগল ঝড়ের গতিতে।

সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ল সুচরিতা। খামচে ধরল কাঞ্চনের জামা। তারপর হিস্টিরিয়া রুগির মতো চেঁচিয়ে উঠল, কাঞ্চন, কী ব্যাপার? কথা বলছ না?

সুচরিতা, তুমি ভয় পেলে? গম্ভীর স্বরে জবাব এল।

গাড়ি তখন ঝড়ের বেগে উল্কার মতো ধেয়ে চলেছে অজানার দিকে..।

.

শেষ দৃশ্য! বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এতক্ষণ ঘটে যাওয়া কবুতর নাটকের এটাই শেষ দৃশ্য।

কবুতরের লাইব্রেরি-ঘর। সেখানে আজ প্রায় সবাই হাজির হয়েছেন। মানেকজি, প্রসাদজি, সর্বেশ্বর রায়, নরসিংহ চৌধুরী, কিষাণ আপ্তে, ক্রসওয়ার্ড, তরুণ সান্যাল। ঘরে অনুপস্থিত কিরণ শর্মা, কাঞ্চন মৈত্র, সুচরিতা চৌধুরী এবং বরাবরের মতোই নয়না কল্যাণী তিনি সম্ভবত মরফিনে আচ্ছন্ন।

জেন্টমেন, আজ সব রহস্যই আমাদের কাছে পরিষ্কার। সমর বর্মনকে আমি খুঁজে পেয়েছি। কিষাণ বলছিলেন, আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন যে, সেই দুর্ধর্ষ তস্কর সমর বর্মন আর কেউ নয়–শ্রীকাঞ্চন মৈত্র!

ঘরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হতবাক দৃষ্টি মেলে সবাই তাকিয়ে রয়েছেন কিষাণ আপ্তের দিকে। তিনি তখনও বলে চলেছেন, মিস্টার ক্রসবির সঙ্গে আলোচনা করে আমি সবই জানতে পারি। ভেবে দেখুন কাঞ্চন মৈত্রের কথা। এই দিল্লিতে আসার আগে ইনি কী করতেন? কোথায় ছিলেন? ..কিছুই আমরা জানি না। চিঠিগুলো হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা দেখুন কী হাস্যকর। আসলে চিঠিগুলো উনি ডিকোড করতে পারছিলেন না। তাই যেমন করে তোক ওগুলোকে আবিষ্কার করলেন–তাও আবার নিজের ড্রেসিং টেবিলেই যাতে আমাদের দিয়ে ওগুলো ডিকোড করিয়ে নেওয়া যায়। কুমার রণজিতের মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর কথাগুলো ভেবে দেখুন। তিনি আসলে পৌনে একটায় হাজির হতে চেয়েছিলেন কবুতরে। হয়তো লাইব্রেরিটা খুঁজে দেখার ইচ্ছে ছিল। কোনও শব্দ-টব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কুমার রণজিৎ। লাইব্রেরিতে গেলেন–সমর বর্মনকে চিনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গুলি করলেন শ্রীমৈত্র। তারপর আমাদের কাছে একটা বানানো গল্প ছেড়ে দিলেন। সুচরিতা চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকেও দলে টানলেন। মনে রাখবেন, বেশিরভাগ ঘটনাই কাঞ্চনবাবুর নিজের স্টেটমেন্ট। লাল পাঞ্জা নামে আদৌ যে কোনও গ্যাং আছে। তা আমি বিশ্বাস করি না। এরপর মিস্টার মৈত্র

রিভলবারটা শ্রীরায়ের সুটকেশে পাচার করে দিলেন। সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে আমরা একটা খুপরি দেখতে পাই। তাতে কিছু না পাওয়ায় শ্রীমৈত্র অত্যন্ত ডিসহার্টেন্ড হয়েছিলেন।

কিন্তু সমর বর্মন সম্বন্ধে আমি যতদূর শুনেছি, সে কখনও মানুষ খুন করেনি, দ্বিধাগ্রস্তভাবে জানালেন ক্রসওয়ার্ড।

ঠিক কথা। কিন্তু তখনকার অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখুন আপনারা। আমি গোপনে তাকে অনুসরণ করে অনেককিছুই জানতে পারি–।

কিন্তু তিনি এখন কোথায়? সর্বেশ্বর রায় প্রশ্ন করলেন।

যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের লোক তাকে খুঁজে বের করবেই। দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন ক্রসওয়ার্ড।

ঠিক এই সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন কিরণ শর্মা, কাঞ্চন মৈত্র ও সুচরিতা চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে ক্রসওয়ার্ড এগিয়ে গেলেন কাঞ্চনের দিকে।

.

হাতে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে একবার তাকালাম সকলের দিকে। বিষণ্ন হাসি হেসে সুচরিতার দিকে চেয়ে বললাম, সু, তুমিও কি এসব বিশ্বাস করো?

বিশ্বাস না করতে পারলেই খুশি হতাম… সুচরিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি মিস্টার মৈত্রকে পরীক্ষা করার জন্যে তার অনুচরের–নেপালী চাকরটা, যে কুমারের সঙ্গে এখানে এসেছিল সামনে ইচ্ছে করেই বাজে ঠিকানা লেখা একটা কাগজ ফেলে দিই। পরে দেখলাম, কাঞ্চনবাবু আমাকে ওটা দেখিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন। কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য কী জানেন! ওই কাগজটা আমি পেয়েছিলাম কাঞ্চনবাবুর ঘর থেকেই ব্যঙ্গের হাসি হেসে থামলেন কিষাণ আপ্তে।

দাঁতে দাঁত চেপে আগুনঝরা দৃষ্টি মেলে আমি এগিয়ে গেলাম ক্রসওয়ার্ডের দিকে। বললাম, মিস্টার ক্রসওয়ার্ড, প্লিজ, ফর হেভেন্স সেক–এই হাতকড়াটা কিছুক্ষণের জন্য খুলে দিন।

কী ভেবে ক্রসওয়ার্ড আমার অনুরোধ রাখলেন। আমি ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম কিষাণ আপ্তের দিকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, মিস্টার জেড, আমার নামে কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। সুরেন্দ্র পালিত তার স্মৃতিকথায় একটা কথা ঠিকই লিখেছিলেন–তা হল– বলে আমি জেডের কানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, মানুষ নিজের কান কখনও চেঞ্জ করতে পারে না। পরের মুহূর্তেই এক বিরাশি সিক্কার চড় মেরে তাঁকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললাম, এটা আপনার মিথ্যে কথা বলার শাস্তি। ক্রসওয়ার্ডের দিকে ফিরে বললাম, ব্যস্ত হবেন না, ইন্সপেক্টর–এই হল আপনাদের ভাষায় দুর্ধর্ষ সমর বর্মন!

অসম্ভব! বলে উঠলেন ক্রসওয়ার্ড।

আমি উত্তরে মৃদু হেসে এগিয়ে গেলাম মেঝেতে পড়ে থাকা আপ্তের দিকে। একটানে তুলে ফেললাম তার পরচুলা আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সানগ্লাসটা খুলে নিতেও ছাড়লাম না।

কিরণ শর্মা এক ফাঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে এক ভদ্রলোক, তার চোখে সবুজ রঙের সানগ্লাস, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

অবাক এ কী কান্ড সব! বললেন নরসিংহ চৌধুরী।

হ্যাঁ, বললেন কিরণ শর্মা, ইনিই হলেন আসল কিষাণ আপ্তে বা এজেন্ট জেড। যাকে আমরা–মানে, আমি আর কাঞ্চনবাবু, একটা পোড়ো বাড়িতে বন্দি অবস্থায় পেয়েছি।

কিন্তু আপনি! অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন সর্বেশ্বর রায়।

অধমের নাম, অরুণ চৌধুরী ফ্রম ক্যালকাটা। পেশায় শার্লক হোমস–মানে, ডিটেকটিভ।

আপনিই! বিস্ময়াপন্ন স্বর বেরিয়ে এল অনেকের গলা দিয়ে।

হ্যাঁ, আমিই। আমি কাঞ্চনবাবুকে সব খুলে বলেছি–উনিই আপনাদের সব বুঝিয়ে বলবেন। আমি কোনওদিন এরকম জটিল রহস্যের মুখোমুখি হইনি।

ক্রসওয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত বর্মনকে দাঁড় করিয়ে হাতকড়া এঁটে দিলেন। বললেন, কিন্তু, মিস্টার চৌধুরী, কুমার রণজিৎকে খুন করল কে? সমর বর্মন?

না। বললাম আমি, সে কথায় পরে আসছি। প্রথম থেকেই বলা যাক সব। শ্রীনরসিংহ যেদিন হোটেলে গিয়ে আমার সঙ্গে পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে কথা বলেন, তখন আমি বুঝিনি অন্য উপায় বলতে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন। পরে আমি ফোন পাই মেহেতো অ্যান্ড সন্স থেকে। তারা একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাচ্ছে পাণ্ডুলিপিটার জন্যে। সন্দেহ হওয়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে আমি ফোন করি মেহেতো অ্যান্ড সন্সে। কিন্তু তারা আমাকে জানায় যে, তারা কোনও ফোনই করেনি। আমি তখন আসল পাণ্ডুলিপিটা হোটেল কন্টিনেন্টালের ভলটে রেখে নকল একটা প্যাকেট গজানন শিকদারের হাতে তুলে দিই।

এখনও তা হলে পাণ্ডুলিপিটা আপনার কাছেই আছে? প্রশ্ন করলেন মানেকজি।

হা-হোটেলের ভলটে। সে যাক, এর পরের ব্যাপার আরও ঘোরালো। চিঠিগুলো আমার কাছে থেকে চুরি করেছিল ইব্রাহিম। সে লাল পাঞ্জার হয়ে কাজ করছিল। পরে বোধহয় বেলাইনে চলার জন্যে সে মার্ডার হয়। তখন মার্ডারারকুমারের হত্যাকারী তাদের নির্দেশ দেয় সুচরিতাকে ফাঁসানোর জন্যে। কারণ? কারণ নিশ্চয়ই একটা ছিল।

আমি পুলিশী ঝামেলা এড়ানোর জন্যে ইব্রাহিমের বডি নিয়ে কী করেছি তা আপনারা জানেন। এদিকে ইব্রাহিমের কাছ থেকে চিঠিগুলো চলে যায় হত্যাকারীর হাতে। কিন্তু এর আগে একটা চিরকুটে সে ইব্রাহিমকে তার সঙ্গে কবুতরে দেখা করতে বলেছিল। সম্ভবত সে

নেকলেসটা পাচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইব্রাহিম মারা যাওয়ায় এবং চিরকুটের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ায় ওটা আমার হাতে পড়ে। আমি সেই রাতে কবুতরে আসি এবং কী ঘটেছিল তা আবার বলার বোধহয় দরকার নেই। হত্যাকারী যখন নেকলেসটা লাইব্রেরিতে খুঁজছিল তখন কুমার আচমকাই সেখানে এসে হাজির হন এবং তাকে চিনতে পারেন। সঙ্গে-সঙ্গে হত্যাকারী তাকে গুলি করে। এই নেকলেস নিয়ে এর আগেও একজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক খুন হয়েছিল–এই কবুতরেই।

সমর বর্মনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল হত্যাকারী। এবং প্রথম রাতে যখন বর্মন (আপ্তের পরিচয়ে) লাইব্রেরিতে ঢোকে তখন তার সঙ্গে মার্ডারার ছিল। সে সুচরিতার পাশ কাটিয়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে যায়। সুচরিতাকে অরুণ চৌধুরী ইচ্ছে করেই আটকেছিলেন। কারণ, তখনও তিনি জানতেন যে, আসল এজেন্ট জেডই গোপনে তদন্ত করছেন। পরে তিনি বর্মনের ছদ্মবেশটা ধরে ফেলেন শুধু তার কানের জন্যে। আপনারা আসল জেডকে দেখুন–তাঁর কানের লতিটা গালের সঙ্গে লাগানো নয়। অথচ সমর বর্মনের কান লক্ষ করুন কানের লতিটা গালের সঙ্গে লাগানো। সুরেন্দ্র পালিত এই কথাই লিখেছিলেন তাঁর পাণ্ডুলিপিতে।

কিন্তু, কুমারের হত্যাকারী কে? প্রশ্ন করলেন প্রসাদজি।

রানী সুলক্ষণা সেন। কুমার রণজিৎ সেনের বোন অথবা শ্রীমতী নয়না কল্যাণী।

অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

মানেকজি কোনওরকমে বললেন, ইমপসিবল!

আমি ওঁর দিকে ফিরে হেসে বললাম, উনি আপনার দূরসম্পর্কের বোন। কিন্তু এখানে আসার আগে কি আপনি ওঁকে কখনও চোখে দেখেছেন?

মানেকজি হতভম্ব হয়ে মাথা নাড়লেন, বললেন, না।

ঠিক তখনই লাফিয়ে উঠল সুচরিতা, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, কাঞ্চন,–সেই রাতে আমি ল্যাভেন্ডারের গন্ধ পেয়েছিলাম–আর নয়না কল্যাণীর গা থেকে কাল ওইরকম গন্ধ পেয়েছি তখন আমার ঠিক মনে পড়েনি।

প্রসাদজি, মনে করে দেখুন যখন গুপ্তপথে আমরা ঢুকেছিলাম, তখন বর্মনের অতিআগ্রহের কথা–। নয়না কল্যাণী নিজেই চেষ্টা করেছিলেন চিঠিগুলো ডিকোড করতে। কিন্তু না পেরে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে-কথা আপনারা নকল জেডের কাছ থেকে শুনেছেন। কুমারের মৃত্যুর রাতে নয়না কল্যাণীর ঘরেই আলো জ্বলেছিল।

কিন্তু আসল নয়না কল্যাণী গেলেন কোথায়? প্রশ্ন করলেন শ্রীসর্বেশ্বর রায়।

তিনি কবুতরে আসার পথে বদল হয়েছেন। আসল নয়নার বদলে এসেছেন সুলক্ষণা সেন। সুলক্ষণা সেনকে আমি দেখিনি। আমি তখন নেপালে ছিলাম, কিন্তু সুচরিতা তাঁকে দেখেছিল। তাই, ও যদি চিনে ফ্যালে…তাই ওকে কবুতরে আসা থেকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।

সুলক্ষণা সেন কি বিপ্লবের সময় মারা যাননি? মানেকজি প্রশ্ন করলেন।

না, কারণ তার মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি। আমি এটা সন্দেহ করেছিলাম। সুলক্ষণা সেন অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি তার দাসীর ছদ্মবেশে পালিয়ে বাঁচলেন, আর তার দাসী মারা পড়ে বিপ্লবীদের আগুনে।

এবার একটা কথা বলি–তা হল ঠিকানা লেখা চিরকুটটার কথা। ওটা সমরের পকেট থেকেই পড়েছিল–ওর অজান্তে। আমি ইন্সপেক্টরকে বলেছিলাম কেউ যেন কবুতর ছেড়ে না যায়। তাই বর্মন বেরোতে পারেনি। কিন্তু অরুণ চৌধুরীর পরিচয় ক্রসওয়ার্ড জানতেন। তাই তাকে যেতে দিয়েছিলেন। মিস্টার চৌধুরীও প্রথমে আমাকেই সন্দেহ করেছিলেন।

সুলক্ষণাকে যদি সুচরিতা চিনে ফেলত তবে ওর বিপদ হত, তাই আমি চিঠি দিয়ে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি একটু অভিনয় করাতে ও দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি সুর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

আপনার আসল পরিচয়টা সবাইকে এবার বলুন, ইয়োর মেজেস্টি। অরুণ চৌধুরী বললেন।

তার মানে! আটটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বলে উঠল।

আমিই শুদ্ধসত্ত্ব রায়ের ছেলে—অতলান্ত রায়। আমিই রটিয়ে দিয়েছিলাম যে, অতলান্ত রায় নেপালে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

কিন্তু, কুমার, নেকলেসটা কোথায় গেল? মানেকজি প্রশ্ন করলেন।

গোলাপ বাগানের নীচে। সারি-সারি গোলাপের ইঙ্গিতই ছিল ওই সাঙ্কেতিক চিঠিতে। বললেন অরুণ চৌধুরী।

তোমার পরিচয় আমাকে আগে বলোনি কেন? অনুযোগের সুরে বলল সুচরিতা।

তা হলে আমি অ্যারেস্টেড হতাম। কারণ রণজিতের পর আমিই ছিলাম সিরাজনগরের অধিপতি। হেসে জবাব দিলাম আমি।

রিভলভারটা আমার সুটকেশে তা হলে নয়নাই রেখে দিয়েছিল? সর্বেশ্বর রায় জানতে চাইলেন।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম আমি।

চলুন, এবার মিসেস সেনের খোঁজ নেওয়া যাক। ক্রসওয়ার্ড বললেন।

তাই তো! কারওরই খেয়াল ছিল না কথাটা। সবাই মিলে দৌড়ে গেলাম ওপরে।

গিয়ে দেখলাম নিজের ঘরে নিপ্রাণ দেহে পড়ে আছেন নয়না কল্যাণী।

আত্মহত্যা করেছেন। বললেন কিষাণ আপ্তে।

সম্ভবত মরফিনের সাহায্যে। জানালাম আমি।

.

এরপর হীরের নেকলেসটা খুঁজে পাওয়া গেল গোলাপ বাগান খুঁড়ে। আবার শান্ত হল কবুতর। সুচরিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পরদিন কাগজে দেখি একটি বিজ্ঞাপন।

কবুতর বিক্রি হচ্ছে। উৎসুক ক্রেতারা খোঁজ নিন।
—মানেকজি প্রসাদজি লিমিটেড কোং

যার হাতেই তুমি যাও, তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে কবুতর।

সুচরিতার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

চুনি-হীরা

চুনি-হীরা

ঘরটা মাপে বিশাল। এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ও-প্রান্তের মানুষকে বোধহয় ঝাপসা দেখায়। কারণ, ঘরের দূরতম কোণে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়্যাট টেবিল সামনে রেখে যে-মানুষটি বসে আছেন তাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার পাশে দাঁড়ানো লম্বা-চওড়া জোয়ান লোকটা কর্কশ গলায় বলল, এগিয়ে যান। উনিই মিস্টার মিত্র।

আমি চোখ ফিরিয়ে লম্বা-চওড়া সঙ্গীর দিকে তাকালাম। নাক থ্যাবড়া, চৌকো চোয়াল, কুতকুতে চোখ। গায়ের রং মাঝারি, তবে শুধু ওইটুকুই মাঝারি। বাকি সব কিছুই মাঝারির চেয়ে বাড়াবাড়ি রকমের। যেমন হাতের পেশি, তেমনি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। হিন্দি ছবির ফর্মুলামাফিক শেষদিকে এর সঙ্গে আমার মোকাবিলা হওয়া উচিত। আর তাই যদি হয়, তা হলে এখন থেকেই বিষ্টু ঘোষের আখড়ায় গিয়ে আমার ব্যায়াম শুরু করা দরকার।

আসুন, আসুন, মিস্টার শিকদার–।

ঘরের দূরপ্রান্তের সেক্রেটারিয়্যাট টেবিলের পিছন থেকে আপ্যায়নবাণী ভেসে এল অনেকটা দৈববাণীর মতোই। মাখনের মতো মোলায়েম স্বর এবং সুর। কিন্তু পরক্ষণেই রুক্ষ আদেশ শোনা গেল, খুদে, তুই নজরকে ডেকে দে। তারপর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবি। দেখবি কেউ যেন আমাদের কথাবার্তায় বাগড়া না দেয়। এবারে গলার স্বর ও সুর শজারুর পিঠের মতো মসৃণ।

আমি খুদের দিকে তাকালাম। এই জিনিস যদি খুদে হয় তা হলে দামড়া কী জিনিস তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

আসুন, মিস্টার শিকদার। আবার মাখনে ফিরে গেছেন মিত্র সাহেব। পিছনে টুকিটাকি শব্দ পেয়ে বুঝলাম, খুদে চলে গেছে। ঘরে শুধু আমরা দুজন।

টেবিলের এপাশে মিৎৰসাহেবের মুখোমুখি বসলাম।

কলকাতার নামি মেটাল মার্চেন্ট শরদিন্দু মিত্র। কলকাতার ওপরতলার মানুষরা ওঁকে উঁদে ব্যবসায়ী বলে চেনেন। আর নীচুতলার মানুষরা চেনে তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। সেই কারণেই খুদেকে চিনে নিতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। ওর শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে যে অন্তত গোটাদুয়েক খুন রয়েছে তা রীতিমতো হলফ করে বলা যায়।

সেক্রেটারিয়্যাট টেবিলটা ভারি অদ্ভুত। কুচকুচে কালো কাঠের ওপরে চকচকে পালিশ। এবং তার মাঝে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিমূর্ত আকারের একটা স্টেইনলেস স্টিলের পাত বসানো। হঠাৎ দেখলে আয়না বলে ভুল হতে পারে। তারই ওপরে নানান সরঞ্জাম–একজন নামজাদা ব্যবসায়ীর টেবিলে যা যা থাকে। তবে একটা তফাত রয়েছে। প্রায় প্রতিটি বস্তুর সঙ্গেই কোনও না কোনও ধাতু জড়িত। যেমন প্রতিটি কলমে সোনালি পাতের পটি। অ্যাশট্রে কারুকাজ করা তামার তৈরি। কলমদানিটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। পিনকুশন অ্যালুমিনিয়াম আধারে বসানো। ডেট ক্যালেন্ডারও একই ধাতুর তৈরি। এইরকম সবকিছু।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করে দেয় টেবিলে রাখা পেপারওয়েটগুলো। দু-ইঞ্চি ব্যাসের ঝকঝকে কতকগুলো বল। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। সেগুলো দিয়ে নানান কাগজপত্র চাপা দেওয়া রয়েছে। না, এজন্য আমি অবাক হইনি। অবাক হয়েছি, বলমার্কা পেপারওয়েটগুলো টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ছে না বলে। কারণ, সিলিং ফ্যানের তীব্র বাতাসে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া কাগজগুলো উড়তে চাইছে। ফলে বলগুলো ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ছে না।

অবাক হয়েছেন, মিস্টার শিকদার?

মুখ তুলে তাকালাম। মিত্রসাহেবের কথায় সূক্ষ্ম একটা অবাঙালি টান লক্ষ করলাম। আরও লক্ষ করলাম, তার কপালে ছোট্ট চন্দনের টিপ। গায়ের রং কালো হওয়া সত্ত্বেও আগে চোখে পড়েনি।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই মিত্রসাহেব বললেন, ছোটবেলা থেকেই মেটালের শখ, তাই মেটাল মার্চেন্ট হয়ে সমস্ত শখ মেটাচ্ছি। তা আপনি ওই পেপারওয়েটগুলো দেখে অবাক হয়েছেন...অবাক হবারই কথা। সবাই অবাক হয়। আমি ছাড়া ইন্ডিয়াতে এরকম পেপারওয়েট আর কেউ তৈরি করতে পারে না। ওই বলগুলোর ভেতরে খানিকটা কাঁপা জায়গা আছে। ফঁপা জায়গাটা ওপরদিক ঘেঁষে হওয়ায় বলের নীচটা ভারী হয়ে গেছে, তাই জায়গা ছেড়ে ওগুলো নড়ে না। সেই যে বাচ্চাদের একরকম খেলার পুতুল আছে দেখেননি! যেদিকেই শুইয়ে দিন সবসময় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পেপারওয়েটগুলো অনেকটা সেইরকম–।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

মিৎৰসাহেব ইঙ্গিতটা বুঝলেন। হাসলেন। ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি চোখে পড়ল। আরও চোখে পড়ল ওপরের পাটির শ্ব-দন্ত দুটো রুপোলি। হাসি শেষ হলে বললেন, আপনি বুদ্ধিমান, মিস্টার শিকদার। পেপারওয়েটের ওপরে বক্তৃতা শোনানোর জন্যে আপনাকে ডাকিনি। আপনাকে ডেকেছি হীরাকে খুঁজে দেবার জন্যে–।

হীরা?

হ্যাঁ, হীরা–আমার মেয়ে। একমাত্র মেয়ে।

রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

শরদিন্দু মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বিষধর ঝুমঝুমি সাপের মতো ঠান্ডা স্থির নজর। ধবধবে পাঞ্জাবির ওপরে বেরিয়ে থাকা কষ্টিপাথরে খোদাই করা কালো মুখ বেমানান লাগছে। মাথায় হালকা হয়ে আসা কাঁচা-পাকা চুল তেল জবজবে করে পিছন দিকে টেনে আঁচড়ানো। সাদা পাঞ্জাবির হাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা দুটো হাতের পাঁচ-পাঁচ দশটা কালো আঙুল সাপের মতো হিলহিল করে নড়ছে। তাল ঠুকছে টেবিলের ঝকঝকে স্টেইনলেস স্টিলের পাতের ওপরে। আঙুলে চড়ানো একাধিক সোনা ও প্লাটিনামের আংটি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিত্রসাহেব আবার বললেন, হীরাকে আমার চাই–কালকের মধ্যেই।

গতকাল রাত দশটা নাগাদ টেলিফোন পেয়েছিলাম। যে ফোন করেছিল নাম বলেনি। তবে এটুকু বলেছে, শরদিন্দু মিত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে চান–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কারণ কাজটা ভীষণ জরুরি। তারপরই একটা ঠিকানা শুনিয়ে দিয়ে লাইন কেটে গেছে। জরুরি কাজটা যে কী তা আর জানা যায়নি। এখন জানা গেল।

আমার টেলিফোন নাম্বার সরকারি বইতে থাকে না। তবে যারা আমার সাহায্য চায় তারা ঠিক খোঁজখবর করে অভিজ্ঞ লোকজনের সূত্র ধরে আমার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে ফেলে। আমাকে খোঁজ করার কারণ, এমন অনেক কাজ আমি করে দিই যা আইনসঙ্গত পথে গেলে চারগুণ সময় ও আটগুণ খরচ লেগে যাবে। সেদিক থেকে আমি হলাম ডিউটি ফ্রি শপ। আমি আইনমাফিক কাজ করি বেআইনি পথে। আইনমাফিক পথে বেআইনি কাজ করি না। নীচু মহলে কেউ-কেউ আমাকে প্রাইভেট আই বলে ডাকে। অবশ্য তাদের অনেকের মতে আমি বড় বেশি প্রাইভেট।

শরদিন্দু মিত্র এমন একজন লোক যার কখনও প্রাইভেট আই দরকার হয় না। বরং দরকার হলে প্রাইভেট আই ব্যাঙ্কে প্রচুর প্রাইভেট আই তিনি জমা দিতে পারেন। সুতরাং টেলিফোনের খবরটা আমাকে চিন্তায় ফেলেছিল। তবে খুশিও কিছুটা হয়েছিলাম। কারণ,

এই প্রথম শরদিন্দু মিত্রের সঙ্গে অমিতাভ শিকদারের দেখা হবে। তাই দেরি না করে আজ সকালেই চলে এসেছি।

মিৎৰসাহেব এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হয়তো চাইছেন আমি কিছু বলি। তাই সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্নটাই করলাম। আপনার মতো একজন মেটাল মার্চেন্ট থাকতে হীরাকে খুঁজে দিতে আমার মতো সামান্য মানুষের ডাক পড়ল?

শরদিন্দু মিত্র হাসলেন : শিকদারবাবু, অনেক রকম মেটালের কারবার আমি করি– তারপর দাঁতের পাটি বের করে একটা রূপোলি দাঁতে সশব্দে টোকা মারলেন। বললেন, প্লাটিনাম। পাশে ঝুঁকে পড়ে একটা ড্রয়ার খুলে কী একটা বের করলেন। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওপরে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষ হল। একটি ঋজু ফলার কুৎসিত ধারালো ছুরি। আবার ঝুঁকে পড়লেন। সোজা হলেন। টেবিলে সংঘর্ষের শব্দ। গাঢ় নীল রঙের একটা পিস্তল। বললেন, এসবও মেটাল–।

আমার কথায় মেটাল মার্চেন্ট-এর বাঁকা ইঙ্গিত বুঝতে ভুল করেননি মিত্রসাহেব।

মিস্টার শিকদার, কাজটা সামান্য বলেই আপনার মতো সামান্য লোককে তলব করেছি। আঙুলে তুড়ি বাজালেন শরদিন্দু মিত্র, হীরাকে আমি এখুনি তুলে আনতে পারি। কিন্তু আমি চাই

চুনিকে ওর চোখের সামনে কোতল করা হোক। খুদে, নজর, বা আর কাউকে পাঠালে চুনির মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেইজন্যেই আপনার সাহায্য চাইছি। সবরকম খবরাখবর আপনাকে আমি দিয়ে দেব। আপনি শুধু হীরাকে ফেরত নিয়ে আসুন। ওকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে চুনির কী হল না হল তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে হীরার চোখের সামনে কিছু না হলেই হল। একটা গভীর শ্বাস পড়ল, বাচ্চা মেয়ে তো! তা ছাড়া ছোটবেলায় চুনির কোলেপিঠে করেই মানুষ হয়েছে।

ঘটনাগুলো আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। এ-পর্যন্ত শরদিন্দু মিত্রের কথাবার্তা শুনে যা অনুমান হয় তাতে হীরা একটি বাচ্চা মেয়ে এবং চুনি মিৎৰসাহেবের বাড়ির চাকর। কিন্তু আসলে নিশ্চয়ই তা নয়। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘটনা ঘটেছে কাল বিকেলে—মিত্রসাহেব বলে চললেন, নজর মহম্মদ আপনাকে সমস্ত খবর-টবর দিয়ে দেবে। কোনওরকম অসুবিধে হলে ওকে বলবেন, ও-ই ব্যবস্থা করবে। বুঝতেই তো পারছেন, আমাকে বিজনেস নিয়ে সবসময় নাজেহাল হতে হয়, কত দিকে আর মাথা দেব।

পিছনের দরজার দিক থেকে শব্দ পেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। খুদের সঙ্গে ছিপছিপে চেহারার একটি লোক এসেছে। ধারালো নাক-মুখ-চোখ। নিখুঁত পরিপাটি চাপদাড়ি। পরনে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি। ওরা দুজন কাছে এগিয়ে আসছে।

ওই তো নজর এসে গেছে। শরদিন্দু মিত্র স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। তারপর আরামি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তার ধবধবে চওড়া পাড় শৌখিন ধুতি চোখে পড়ল। আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন তিনি, শিকদারবাবু, পুলিশে আপনার তো চেনাজানা আছে। আশাকরি এ-ব্যাপারটা নিয়ে আমরা অযথা পুলিশি ঝাটে জড়াব না। তা ছাড়া আপনাকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ তো আমি করাচ্ছি না। শুধু আমার মেয়েকে ফেরত চাইছি। পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিতে চাইনি একটাই কারণে। ওদের গদাইলশকরী তদন্তে চুনিকে হয়তো সাজা দেওয়া যাবে, কিন্তু হীরাকে হয়তো আর কোনওদিনই দেখতে পাব না। আপনার সম্পর্কে অনেক জানি, অনেক শুনেছি। তাই ভরসাও করি অনেক। শরদিন্দু হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমিও হাত বাড়ালাম। পাঁচটা শীতল কালসাপ আমার হাত জড়িয়ে ধরল। রুদ্ধস্বর কানে এল, হেল্প মি, শিকদার। হেল্প আ পুওর ড্যাড!

নজর ও খুদে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ করলাম, নজরের চোখ কটা। কটা নয়, বরং বলা যায় ভীষণ ফ্যাকাশে। হঠাৎ দেখলে চোখের মণি ঠাহর হয় না। চোখের সাদা অংশের সঙ্গে রং মিলিয়ে যেন গা-ঢাকা দিয়েছে।

শরদিন্দু মিত্র বসে পড়লেন। টেবিলের বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা ড্রয়ার খুললেন। সামান্য খোঁজাখুঁজির পর একটা প্লাস্টিক কভার ফাইল বের করলেন। আমার দিকে এগিয়ে দিলেন সেটা।

এগিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে একটু ইতস্তত ভাব ছিল। ফাইলটা নিয়ে প্লাস্টিকের মলাট ওলটাতেই বোধহয় তার কারণটা বোঝা গেল। ফাইলের সব লেখাই ইংরেজিতে টাইপ করা। সেই ইংরেজি পড়ে তার সঠিক অর্থ বুঝে নেওয়ার ব্যাপারটা আমার বিদ্যেয় কুলোবে কি না সেটাই বোধহয় মিত্রসাহেবকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

সুতরাং শরদিন্দু মিত্রের দুশ্চিন্তা দূর করতে হেসে বললাম, চিন্তা করবেন না, মিস্টার মিত্র। বাঙালির লেখা ভুল ইংরেজি আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। ওটা না বুঝলে আপনাদের মতো রইস ক্লায়েন্ট জুটবে কোথা থেকে?

শরদিন্দু মিত্র বেশ চেষ্টা করেই নিজেকে স্বাভাবিক রাখলেন। কিন্তু খুদের বুদ্ধি কম। বোধহয় বিদ্যেও। তাই ফস করে ধমকের সুরে বলে বসল, বসের সঙ্গে মুখ সামলে কথা বলবেন।

আমি শব্দ করে ফাইলটা বন্ধ করে খুদের দিকে তাকালাম। দাঁত বের করে হেসে বললাম, মিস্টার মিত্র, প্রভুভক্তির জন্যে এটার মাইনে এ-মাস থেকে পাঁচসিকে করে বাড়িয়ে দেবেন।

খুদে ওর মোটা বুদ্ধিতেও ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। তেড়ে আসার ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে এল আমার দিকে। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, আর একটা ফালতু আওয়াজ যদি বেরোয়।

আমি খুদের ঘামের গন্ধ পাচ্ছিলাম। নিশ্বাসের শব্দও। সুতরাং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিলাম ওর বাঁ গালে।

ঘরে বাজ পড়ার শব্দ হল যেন। খুদের তামাটে গাল লাল হয়ে গেল। ও ধাক্কাটা সামলে নিয়েই হাত চালাতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে আমি বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে শরদিন্দু মিত্রের

টেবিল থেকে ইস্পাতের ছুরিটা তুলে নিয়েছি এবং তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছি। পিস্তলটা নিইনি, কারণ ওটাতে গুলি ভরা আছে কি না আমার জানা নেই।

খুদে যেন নেতাজির হুকুমে ফ্রিজ শট হয়ে গেল। আমার জীবনে এরকম বহু ফ্রিজ শট আমি দেখেছি। না দেখলে বয়েসটা চল্লিশ পর্যন্ত আর গড়াত না। সেই কোনকালেই নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসে যেত।

আমার ছুরি ধরে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে শরদিন্দু মিত্রের কালো মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল পলকের জন্যে। বুঝলাম, মিত্তিরমশাই জাতসাপ দেখলে চিনতে পারেন। চেনেন তার ফণা তোলার ঢঙ।

শুধুমাত্র নজর মহম্মদ নির্বিকার। যেন কটা চোখে অপলকে তাকিয়ে কাশ্মীরের সিনারি দেখছে।

খুদে! শরদিন্দু মিত্র গর্জে উঠলেন ভয়ংকর সুরে।

খুদের টানটান শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে ঢিলেঢালা হয়ে গেল। আহত গালে কয়েকবার হাত বুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে পিছিয়ে দাঁড়াল। তারপর আচমকাই ওর বাবার লেখা বর্ণপরিচয় থেকে শেখা খিস্তির ফুলঝুরির কয়েকটা ফুলকি উপহার দিল। লক্ষ করলাম, রাগে ওর মুখচোখ থমথম করছে এখনও।

আমি ছুরি ছুঁড়ে দিলাম টেবিলের ওপরে। বললাম, মিস্টার মিত্র, আপনার কথা বলা কুকুরকে একটু পিঠ চাপড়ে দিন। ভীষণ খেপে গেছে।

খুদে। আবার ডেকে উঠলেন শরদিন্দু। বুঝতে পারছিলাম, খুদের আচরণ ওঁর ভদ্রতার পোশাক টেনেহিঁচড়ে খুলে দিতে চাইছে।

তুই দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। মুখ দিয়ে যেন কোনও আওয়াজ না বেরোয়। শিকদারবাবু আমাদের গেস্ট–মেহমান। সেটা খেয়াল থাকে যেন।

লেজ গুটিয়ে চলে গেল খুদে। যাওয়ার সময় গজগজ করছিল আর মাথা নাড়ছিল।

নজর মহম্মদ দুটো হাত সামনে জড়ো করে রেখেছে। আঙুলে আঙুলে পাচানো। চোখ আধবোজা। মুখ শান্ত। মাথার চুল দু-এক গাছা কপালে।

নজর! শরদিন্দু গলার স্বর আবার মোলায়েম করে ফেলেছেন? মিস্টার শিকদারকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। নিরিবিলিতে বসে গোটা ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে দাও। যেন কোনও গোলমাল হয়।

জি মিৎৰসাব। বলে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে আবার সোজা হল নজর। আমার দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, চলিয়ে শিকদারসাব, আপসমে বাত করতে হয়।

অতএব ফাইলটি বগলদাবা করে নজরকে অনুসরণ করলাম।

মিৎৰসাহেব পিছন থেকে বললেন, উইশ ইউ বেস্ট অব লাক–।

আমি মুখ না ফিরিয়ে বাঁ হাতটা ওপরে তুলে ওঁর শুভেচ্ছা গ্রহণ করলাম। খুদেকে থাপ্পড় কষিয়ে আমার ডান হাতটা জ্বালা-জ্বালা করছিল। সুতরাং দরজা পার হয়ে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে ফেললাম, তোমার গাল এত খসখসে কেন গো? গালে কিরিম-টিরিম মালিশ করো না–।

খুদের মুখ থেকে একটা চাপা গরগর শব্দ শোনা গেল।

নজর পিছনে তাকিয়ে বলল, শিকদারবাবু, আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। কাজ হয়ে গেলে ঢের দিল্লাগি করা যাবে, কী বলেন!

আমি মনে-মনে একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ বলতে শুরু করলাম। রাগ কমানোর এ এক অব্যর্থ ওষুধ। ছোটবেলায় বাবার কাছে শিখেছি। এখন শেখানোর কেউ নেই। বাবা-মা দুজনেই বহুবছর ধরে দেওয়ালে ফটো হয়ে ঝুলছে। আমি বছরে দুটো মালা কিনি, ফটোয় লাগাই। আর সেই দিন দুটোয় কোনও খারাপ কাজ করি না। কাউকে দুঃখ দিই না। শুধু নিজে দুঃখ পাই। অন্ধকার নিঃঝুম ঘরে কোলের ওপরে চাঁদের আলো নিয়ে জানলার ধারে বসে থাকি। টেপরেকর্ডারের ক্যাসেটে নীচুস্বরে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান বাজতে থাকে, বুকে বিঁধতে থাকে তীব্রভাবে ও প্রথমত আমি তোমাকে চাই। দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই। তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই। শেষপর্যন্ত তোমাকে চাই...।

কিন্তু কাকে চাই আমি নিজেই জানি না।

.

ছিমছামভাবে সাজানো একটা বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের সর্বত্র রুচি ও পয়সার ছাপ। ভেলভেট মোড়া নরম যে-সোফায় বসলাম তার মধ্যেও কোমল বিলাসী আমন্ত্রণ।

বিশাল ঘরের তিন দেওয়ালে তিনটে পেইন্টিং। আর চতুর্থ দেওয়ালে সুন্দর ওয়াল ক্যাবিনেট। তার পাল্লা কাচের। তাই তাকে সাজানো কারণবারির বোতলগুলো চোখে পড়ছে। তার নীচে একপাশে ফ্রিজ।

দেখেশুনে মনে হয় এটা বোধহয় শরদিন্দু মিত্রের গোপন ব্যবসায়িক কথাবার্তার আপ্যায়নকক্ষ। যেমন এখন আমি আর নজর মহম্মদ ব্যবসায়িক আলোচনা করতে বসেছি।

আমি আর নজর মুখোমুখি বসে। মাঝের টেবিলে পড়ে আছে প্লাস্টিক কভার ফাইলটা। তার পাশেই কারুকাজ করা এক কাচের ফুলদানিতে রজনীগন্ধাগুচ্ছ।

আমি ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎই নজরের কথায় চমক ভাঙল।

শিকদারসাব, এই হল হীরা।

আমি চোখ ফিরিয়ে তাকালাম।

ফাইলের কোনও আনাচকানাচ থেকে পোস্টকার্ড মাপের একটা রঙিন ফটোগ্রাফ বের করে ফেলেছে নজর।

ছবির মেয়েটাকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দরও কাউকে দেখতে হয়! টানা-টানা নিষ্পাপ চোখ। ধনুকের মতো ভুরু। তার মাঝে সবুজ এক চিলতে টিপ। তার নীচ থেকেই কোমল রেখায় নেমে গেছে নাক। নাকের বাঁ দিকে হীরের নাকছাবি। তারপর স্ফুরিত আমন্ত্রণী ঠোঁট এবং মানানসই চিবুক।

ফটোটা গলার খানিক নীচেই শেষ হয়েছে। কিন্তু কোনও পুরুষকে প্রতিবন্ধী করে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। যেমন, আমি এখন বোবা হয়ে গেছি।

আমি বললাম, ফটোটা আমার লাগবে।

নজর হাসল। এই প্রথম ওর শান্তশিষ্ট ভদ্রতার মুখোশ সামান্য সরে গেল যেন। ও বলল, শুধু ফটো কেন, ইচ্ছে করলে এই গোটা ফাইলটাই আপনি নিতে পারেন।

হীরার ফটোটা হাতে নিয়ে দেখতে-দেখতে আমি বললাম, এবারে গোটা গল্পটা আমাকে বলুন। তার পরে ফাইল দেখছি–

নজর বলতে শুরু করল, চুনিবাবু, মানে চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মেটাল কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজার। আজ প্রায় পনেরো বছর ধরে চাকরি করছে। কোম্পানি তখন ছোট ছিল। ডান হাতটা শূন্যে নেড়ে ঘরটাকে দেখিয়ে নজর বলল, এসব ঠাটবাট কিছুই ছিল

আমার চোখ গেল কারণবারিক্যাবিনেটের দিকে। বললাম, নজরসাব, ওগুলো কি শুধু চোখে দেখার জন্যে, না চেখে দেখার জন্যে।

নজর মহম্মদ তৎক্ষণাৎ গুস্তাখি মাফ বলে উঠে পড়েছে সোফা ছেড়ে, এবং এগিয়ে গেছে কাবিনেটের দিকে। সেখান থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে আমাকে, আপনার পসন্দ কী আছে বলুন?

আমি ঠোঁট উলটে কাঁধ কঁকালাম। যার অর্থ যা তোক কিছু একটা হলেই চলবে। মদ আর অস্ত্রের ব্যাপারে আমার খুব একটা বাছবিচার নেই।

এরপর সুন্দর কাচের গ্লাসে বরফ ডোবানো মদিরা নিয়ে বসে পড়েছি আমি আর নজর মহম্মদ মুখোমুখি।

নজরের কাছ থেকে গল্পটা যা জানা গেল তা সংক্ষেপে এই

চুনিবাবু হীরাকে ছোটবেলা থেকে দেখছে। আর কোম্পানির প্রায় শুরু থেকেই মিৎৰসাহেবের ডান হাত হয়ে কাজ করে গেছে। শরদিন্দু মিত্রের বিপদে-আপদে চুনি ব্যানার্জি যা করেছে তা ভোলার নয়। মিৎৰসাহেবও ওকে খুব স্নেহ করেন–অন্তত করতেন, হীরাকে নিয়ে ভেগে পড়ার আগে। হীরা মিত্রসাহেবের চোখের মণি। তাঁর মেটাল বিজনেসের রাজত্ব আর রাজকন্যা কার হাতে তুলে দেবেন তা ঠিক না করলেও, সেই ভাগ্যবান যে চুনি বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, সেটা বোধহয় তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন। তাই যখন টের পেলেন চুনির সঙ্গে হীরার আশনাই চলছে, তখন বিরক্ত হয়েছিলেন, রেগেও গিয়েছিলেন। তারপর একদিন নজর আর খুদের সামনে চুনিকে একা ডেকে শাসিয়েছিলেন। শরদিন্দু মিত্রের শাসানিকে ভয় পায় না এমন লোক খুব বেশি নেই। চুনি ভয় পেয়েছিল। কিন্তু হীরাকে না পাওয়ার ভয়টা ছিল আরও বেশি। তাই কেঁদেকেটে বলেছিল, আপনার ব্যবসা চাই না, একটা ফুটো পয়সাও চাই না, শুধু হীরাকে চাই। ওকে আমি, আমি…।

শরদিন্দু মিত্র চুনির অনুনয়ে কান দেননি। শক্ত গলায় বলেছিলেন, চুনি, তোমাকে আমি পছন্দ করি। তোমার উপকার আমি ভুলিনি, কখনও ভুলি না। তাই এখনও তুমি দেখতে পাচ্ছ, সূর্য উঠছে, পাখি ডাকছে, চঁদ উঠছে। নইলে এসব কিছু দেখতে পেতে না। আর তোমাকে কোম্পানি থেকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিতেও চাইছি না।

কিন্তু এত সাবধান করা সত্ত্বেও কাজ হয়নি। লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহা, হীরা-রাঞ্জার বেলাতেও কোনওরকম হুঁশিয়ারিতে কোনও কাজ হয়নি। তাই গতকাল সকাল থেকে হীরা– মিত্রসাহেবের কলিজা হীরালোপাট। সেই সঙ্গে চুনিবাবুও। ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার।

ঘরের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি পাঁচ কান করতে চান না শরদিন্দু মিত্র। আর চুনিকে খতমও করতে চান না–অন্তত হীরার চোখের সামনে। তাই পুলিশে যাননি। নজর, খুদে, বা ওদের মতো কাউকেও দায়িত্ব দেননি। ডেকেছেন অমিতাভ শিকদারকে। যে-লোকটা রোজ চারটে রিভলভার আর সাতটা স্টিলেটো দিয়ে ব্রেকফাস্ট খায়।

নজর মহম্মদের গল্পটায় কোথায় যেন একটা গোলমাল ছিল। কী একটা যেন ঠিকঠাক খাপ খাচ্ছে না, মিলছে না মোটেই। ব্যাপারটা তখনকার মতো মগজ থেকে সরিয়ে রেখে ফাইলের দিকে মনোযোগ দিলাম।

চুনিবাবুকে আমি দোষ দিই না। হীরার জন্যে যে-কোনও মোকাবিলায় নেমে পড়া যায়। জান কবুল সেই লড়াইতে নেমে কখনও খেয়াল হয় না, জান তো একটাই।

ফাইল থেকে একটার পর একটা কাগজ নিয়ে নজর আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। চুনির একটা ফটোও দেখাল আমাকে।

চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়েস চল্লিশের ওপারে। তবে দেখে বছর পাঁচ-সাত কম বলেই মনে হয়। ফরসা চেহারা। চোখে রিমলেস-চশমা। চোয়াল শক্ত। খাড়া নাক। চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। ডান গালে চোখে পড়ার মতো একটা তিল।

আশ্চর্য! এই লোকটা ওর আধা বয়েসের একটা ছুকরির জন্যে দিওয়ানা হয়ে গেল! অবশ্য হীরার ছবি দেখলে বোঝা যায় যে-কোনও বয়েসের পুরুষই ওর জন্যে দিওয়ানা হয়ে যেতে পারে।

সব দেখা-টেখা যখন শেষ হল তখন আমি জিগ্যেস করলাম, আমি কোথা থেকে ওদের তুলে নিয়ে আসব?

নজর মহম্মদ বলল, হোটেল রিভারভিউ, ডায়মন্ডহারবার। ওরা ওখানে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। রুম নম্বর দুশো তিন।

আমি অবাক চোখে নজরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক ঢোকে গ্লাসের বাকি মদটা শেষ করে দিয়ে বললাম, নজরসাব এই কাজের জন্যে আমাকে ডেকেছেন! আবার পয়সাও দেবেন। সত্যি, বিশ্বাস হচ্ছে না–।

নজর ওপর দিকে চোখ তুলে হাত নেড়ে বলল, খুদা যব দেতা হ্যায়, ছপ্পড় ফাড় কর দেতা হ্যায়। খুদা মেহেরবান, তো ঢুহা পহেলবান।

আমি কোনও জবাব না দিয়ে হীরা আর চুনির ফটো দুটো তুলে নিলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এবার মিত্রসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করব।

অতএব নজর আবার আমাকে নিয়ে চলল শরদিন্দু মিত্রের ঘরে।

ঘরের দরজার মুখে খুদে এখনও দাঁড়িয়ে। দাঁত খুটছে। আমাকে চোখ টেরিয়ে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

শরদিন্দু মিত্র টেলিফোনে কথা বলছিলেন কার সঙ্গে। টেবিলের ওপরে একটা ফাইল খোলা। আমাকে দেখে সপ্রশ্নে তাকালেন নজরের দিকে। নজর তার হাতের ফাইলটা টেবিলে রেখে বলল, শিকদারবাবু সিরফ ফটো দুটো নিয়েছেন।

শরদিন্দু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বসতে বললেন চোখের ইশারায়।

আমি বসলাম। টেলিফোনে কথা শুরু হল আবার। শরদিন্দুর কথা শুনতে পাচ্ছিলাম আমি এবং নজর। উনি ফোনে বলছিলেন, না, না, ব্যাপারটা নিয়ে আমি অকারণে পাঁচকান করতে চাই না। শুধু চাই হীরা আর চুনি মঙ্গলমতো ফিরে আসুক। আমি ওদের দুজনকেই ভালোবাসি, স্নেহ করি। আমি ওদের আশীর্বাদ করার জন্যে অপেক্ষা করছি। কে জানে, কবে ফিরবে ওরা… একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তার একটু পরেই ফোন রেখে দিলেন শরদিন্দু।

আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে বললেন, সব বুঝে নিয়েছেন, মিস্টার শিকদার?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ। তারপর হীরা আর চুনির ফটো দুটো ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এগুলোর পেছনে সই করে তারিখ দিয়ে দিন।

শরদিন্দু হীরার ফটোটা গভীর আবেগমাখা চোখে দেখছিলেন। প্রায় চমকে উঠে বললেন, কেন, সই করব কেন?

আমি হাসলাম। অনেক বুদ্ধিমান মানুষও অনেক সময় ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে। ওঁকে বললাম, আপনার সই-ই হচ্ছে হীরা আর চুনির কাছে আমার আইডেন্টিফিকেশান। আমি বেপরোয়া কাজ করি বটে, তবে বুরবাক নই।

ওঁর কালো মুখ কি বেগুনি হল একটু? স্বচ্ছন্দে হোক। শুধু বেগুনি কেন, শরদিন্দু ইচ্ছে করলে বেগুনি থেকে শুরু করে বর্ণালীর বাকি রংগুলোও পরপর ফুটিয়ে তুলতে পারেন ওঁর মুখে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

হঠাৎই গম্ভীর ভাবটা পালটে ফেললেন শরদিন্দু। হাসলেন। ওঁর প্লাটিনামের দাঁত দেখা গেল। বললেন, মিস্টার শিকদার, মনে হচ্ছে লোক চিনতে আমি ভুল করিনি। হীরাকে আমার চাই। ওকে ছেড়ে আমি একটা মুহূর্তও থাকতে পারছি না।

তারপর খসখস করে সই করে দিলেন। ফটো দুটো এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

এবার টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন শরদিন্দু। একটু পরেই একশো টাকার নোটের একটা বান্ডিল আলতো করে ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওপরে। দশহাজার। বললেন, এটা আপনার পারিশ্রমিক নয়, মিস্টার শিকদার, স্রেফ রাহাখরচ। পারিশ্রমিক আপনাকে দেব হীরাকে হাতে পাওয়ার পর। শরদিন্দু মিত্রের কথার নড়চড় হয় না।

আমি ফটো দুটো নিলাম, টাকার বান্ডিলটাও। পকেটে রাখলাম।

আপনার যদি গাড়ির দরকার হয় বলুন, নজর সব ব্যবস্থা করে দেবে—

আমি বললাম, দরকার নেই। আমার একটা ছোট প্রিমিয়ার পদ্মিনী আছে। আপনাদের মতো ক্লায়েন্টদের সহযোগিতায় কেনা। ওটা দিয়েই কাজ চলে যাবে। একটু থেমে আবার বললাম, সত্যিই কি হীরাকে আপনার কালকের মধ্যেই চাই?

কেন, পারবেন না? ভুরু কুঁচকে গেল শরদিন্দুর।

হয়তো পারব, তবুও একটা দিন বেশি চাইছি।

বেশ। এখন সবই আপনার হাতে—। একটু থেমে আরও বললেন, নজর আপনাকে দুটো আনলিস্টেড ফোন নাম্বার দিয়ে দেবে। কোনও জরুরি খবর থাকলে ওই নাম্বারে ফোন করতে পারেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

শরদিন্দু পিছন থেকে ডাকলেন, মিস্টার শিকদার—।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঘুরে তাকালাম।

শরদিন্দু বললেন, মেটাল মার্চেন্ট হিসেবে আর কোনও সাহায্য করতে পারি?

যথারীতি মেটাল শব্দটার ওপরে জোর দিয়েছেন শরদিন্দু।

আমি হাসলাম। পুরোনো কথাটাই বললাম, ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না। আমি রোজ একডজন আর্মস দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই।

বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সঙ্গে নজর মহম্মদ। এবং দরজার কাছে আবার সেই খুদে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছে। দাঁত ছাড়া বোধহয় খোঁটার মতো আর কিছু ওর নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে যখন গাড়িতে উঠছি তখন আনলিস্টেড কোনও নাম্বার দুটো নজর মহম্মদ আমাকে দিল। ডান হাত আদাবের ভঙ্গিতে দুবার নেড়ে বলল, ফির মিলেঙ্গে, শুকরিয়া।

আমিও ওকে পালটা অভিবাদন জানিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। চারপাশে যানবাহনের কোলাহলে বোঝা যায় বেলা বেড়েছে। রাস্তায় লোকজনও প্রচুর। যে যার কাজে ব্যস্ত।

গাড়ি চালিয়ে কিছুটা এগোতেই হীরার মুখটা মনে পড়ল। অপরূপ ওই মেয়েটা এখন কী করছে, কেমন অবস্থায় আছে? আর তখনই লক্ষ করলাম, একটা সাদা মারুতি আমার গাড়ির প্রায় ছায়া হয়ে গেছে।

আমার হাসি পেল। এরকম টিকটিকির লেজ হেঁটে ফেলতে আমার বেশ মজা লাগে।

.

ডায়মন্ডহারবার রোডে মিনিট পঁয়তাল্লিশ গাড়ি চালানোর পর তাকালাম রিয়ারভিউ মিরারের দিকে। টিকটিকির লেজ ছেটে ফেলতে রিয়ারভিউ মিরারের উপকারিতার কোনও জবাব নেই।

বর্ষা চলছে। তাই রাস্তার দুপাশে প্রকৃতি সবুজ জামা-প্যান্ট পরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে টুকরো দু-একটা দোকানপাট অথবা ছন্নছাড়া কঁচা-পাকা বাড়ি।

চায়ের তেষ্টা পাচ্ছিল। তাই রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানের কাছে গাড়ি দাঁড় করালাম। গাড়ি থেকে নেমে বেঞ্চিতে বসে এক কাপ চায়ের কথা বললাম।

কানটা মাপে বড়সড় হলেও নিতান্ত ঝোঁপড়ি। মালিকের বয়েস দেখে মনে হয় ছশো নিরেনব্বই বছর। চলাফেরার সময় যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠকাঠক শব্দ করে যখন-তখন খসে পড়তে পারে। তারই হুকুমে এক ছোকরা এক গ্লাস চা দিয়ে গেল আমাকে।

চায়ে প্রথম চুমুক দিতেই পায়ের কাছে একটা ছায়া দেখতে পেলাম। কে যেন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো প্যান্ট পরা একজোড়া পা। পায়ে স্নিকার।

আকাশ মেঘলা। একটু আগে পথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পেয়েছিলাম, যদিও এখন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবছা ছায়াটা আলাদা করে চিনতে পারলাম আমি। চায়ের গ্লাস থেকে মুখ না তুলে, ছায়ার মালিকের দিকে না তাকিয়ে আমি আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম, কে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

চায়ের দোকানে দ্বিতীয় খদ্দের বলে কেউ নেই। তবে সামনের পাকা রাস্তায় কদাচিৎ লোকজন চলাফেরা করছে, কয়েকটা গাড়িও ছুটে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

প্রায় দশ সেকেন্ড কেটে গেল চুপচাপ। তারপর একটা ভরাট গলা বলে উঠল, মিস্টার শিকদার, কোথায় যাচ্ছেন? হোটেল রিভারভিউ?

আমার দেখা ছায়ার কণ্ঠস্বর। এ-গলা আমি আগে কখনও শুনিনি।

গ্লাসের চা মোটামুটি গরম। সুতরাং প্রথম ধাপ হিসেবে সেটা এই কালো প্যান্টের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া যায়। তারপর শরীরের দুর্বলতম জায়গা লক্ষ্য করে কষিয়ে বুটের এক লাথি।

ব্যস, ততক্ষণে মক্কেল ভার্টিকাল অবস্থা থেকে হরাইজন্টাল অবস্থায় পৌঁছে যাবে। সুতরাং তারপর ওর শরীরের ওপরে ফ্রি স্টাইল চালানো যেতে পারে।

মানুষ যা ভাবে সবসময় তা করে না। আমিও করলাম না। একবার মনে হল, এটা সেই সাদা মারুতির কেউ নয়তো! তা ছাড়া লোকটা আমার নাম জানল কেমন করে? শরদিন্দু মিত্র কি একে পাঠিয়েছে আমার ওপরে নজর রাখার জন্যে?

অবশেষে মুখ তুলে তাকালাম।

বছর তিরিশের এক যুবক। কিন্তু মাথায় চুল বিরল। চোখ ছোট। তামাটে গালে ছোট মাপের একটা পুরোনো ক্ষতের দাগ। পরনে চেকশার্ট। তাতে লাল আর সবুজ ডোরা।

যুবক হাসছিল। আমি কিছু বলার আগেই বসে পড়ল আমার পাশে। বলল, মিস্টার শিকদার, হীরার খোঁজে আপনি না গেলেই ভালো হয়।

ছেলেটি বোধহয় আমার স্থানীয় অভিভাবক। আমার ভালোমন্দ নিয়ে ভাবছে। চমৎকার!

আমি চায়ের গ্লাস নামিয়ে রাখলাম ভিজে মাটিতে। মুখের ভাব যথাসম্ভব মোলায়েম রেখে জিগ্যেস করলাম, আপনি কে? মিত্তিরের চামচে?

যুবকের মুখ শক্ত হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনিও তো এখন তাই।

আমি নড়েচড়ে বসলাম। এরকম মোকাবিলায় মজা আছে। অমিতাভ শিকদার মোকাবিলায় মজা পায়।

যা বলার চটপট বলে ফেলুন। আমাকে এক্ষুনি রওনা দিতে হবে।

ছেলেটা এবার সিরিয়াস মুখ করে বলল, হীরাকে নিয়ে চলে গিয়ে চুনিদা কোনও অন্যায় করেনি। ওদের মোহাব্বত আছে। শরদিন্দু মিত্তির মোহাব্বতের কী বুঝবে! ও শালা তো বউকে পুড়িয়ে মেরেছিল– ছেলেটার মুখ ঘেন্নায় কুঁচকে গেল।

এই মুহূর্তে শরদিন্দু মিত্রের জীবনী জানার কোনও আগ্রহ নেই আমার। সুতরাং কোনও মন্তব্য না করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ছেলেটা হাতের ঝাপটায় বাতাস কাটার ভঙ্গি করে বলল, আপনি যদি ফিরে না যান তা হলে চুনিদা আপনাকে ছেড়ে দেবে না। চুনিদা বহুত খতরনাক লোক। আপনি এসব ফ্যামিলির ঝামেলায় নাক গলাবেন না। ছেলেটা আঙুলে তুড়ি বাজাল দুবার। বলল, মিত্তিরের ওখানে আমাদের লোক আছে। সব খবরই আমরা পাই। সুতরাং সময় থাকতে থাকতে হাপিস হয়ে যান। ন-দো গিয়ারা। ফুটটুস...।

আমি হঠাৎই হাসতে শুরু করলাম। গলা ফাটানো হাসি।

হাসি দেখে চুনি ব্যানার্জির চামচে এবং আমার লোকাল গার্জেন কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আর চায়ের দোকানের মালিক চমকে নড়েচড়ে বসল। ওর হাড়ে হাড়ে খটাখট শব্দ হল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঢোলা জিন্সের প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালাম। হাতটা যখন মুঠো করে বের করে নিয়ে এলাম তখন তার সঙ্গে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন মিলিটারি অ্যান্ড পুলিশ মডেলের দুটো রিভলভার বেরিয়ে এল। মাত্র দুইঞ্চি ব্যারেলের এই হ্যান্ডগান ০.৩৮ স্পেশাল কার্ট্রিজ ফায়ার করতে পারে। বন্দুকবাজের সঙ্গে মোকাবিলায় এই খুদে রিভলভার ভীষণ কাজের। এর এক-একটার ওজন মাত্র পাঁচশো গ্রাম। আধুনিক ধাতুবিজ্ঞান এই রিভলভারকে একইসঙ্গে মাপে ছোট এবং ক্ষমতাশালী করে তুলতে পেরেছে।

ছেলেটার মুখের রক্ত পলকে মঙ্গলগ্রহে চলে গেল। ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। আর বাঁ গালের একটা পেশি কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

রিভলভার দুটো আমি বেঞ্চির ওপরেই রাখলাম। তারপর হাসতে হাসতেই প্যান্টের অন্য পকেটে হাত ঢোকালাম।

ছেলেটা এবার স্পষ্ট কেঁপে উঠল থরথর করে। বলল, মিস্টার শিকদার, আমি– আমি–।

আমি হেসে বললাম, আমি রোজ রিভলভার চেটে দেখি, চুষে দেখি, কামড়ে দেখি, চুমু খেয়ে দেখি–।

বলে একটা রিভলভার তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। মিষ্টি শব্দ হল। ওকে বললাম, তোকে আজকের মতো ছেড়ে দিলাম। যা, মাঠে গিয়ে হা-ডু-ডু খেল।

ছেলেটা ফ্যাকাশে মুখে দৌড়ে পালাল। আমি ওকে দেখলাম কিছুক্ষণ।

আমার খবর ছেলেটা পেল কেমন করে? কে খবর দিল ওকে? আর চুনি ব্যানার্জি কি সত্যিই ভয়ংকর লোক? কতটা ভয়ংকর? শরদিন্দুর সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পারবে সে?

আর হীরা! অষ্টাদশী ওই অপরূপ সুন্দরী কি সত্যিই ভালোবাসে চুনিকে? নাকি জটিল কোনও সমীকরণ লুকিয়ে রয়েছে এর আড়ালে?

রিভলভারগুলো আবার পকেটে রাখলাম।

শরদিন্দু মিত্র ছেলেখেলা করার জন্যে আমাকে ডাকেননি। এখন ছেলেখেলার সময় নয়। আমাকে আরও সাবধান হতে হবে।

চায়ের দোকানির দিকে চোখ পড়তেই দেখি বৃদ্ধ দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বসে। বোধহয় ঠিক করেছে, একটু আগের দেখা অশ্লীল দৃশ্য জীবনে আর দেখবে না। অবশ্য এর জীবন

বলতে আর কয়েকটা দিনও বাকি আছে কি না কে জানে!

চায়ের পয়সা মেটালাম একটা দু-টাকার নোট দিয়ে। বাচ্চা ছেলেটা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছিল। ছুটে এসে টাকাটা নিল। ওকে জিগ্যেস করলাম টাক মাথা ছেলেটাকে চেনে কি না। কালো বাচ্চাটা মাথা নাড়ল। না, কোনওদিন দ্যাখেনি।

গাড়িতে উঠে স্পিড বাড়ালাম। নাঃ, নাটক মনে হয় জমে উঠেছে। জানি না সামনে এখন কী অপেক্ষা করছে।

·

ডায়মন্ডহারবারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে বুঝলাম, আমার জন্যে একটা লাশ অপেক্ষা করছিল। এবং সেই লাশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হল রীতিমতো নাটকীয়ভাবে।

লাল রঙের মারুতি ওমনিটা ছুটে আসছিল আমাকে লক্ষ করে। আর ছুটে আসার পথে বিপজ্জনকভাবে টলছিল এপাশ ওপাশ।

এক লহমার জন্যে আমার মনে হয়েছিল কোনও সেন্ট পারসেন্ট মাতাল বেলা সাড়ে বারোটায় এই ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালানো প্র্যাকটিস করছে। কিন্তু গাড়িটা আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতেই–অথবা বলা যেতে পারে, আমি কোনওরকমে ওটাকে পাশ কাটিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়েছি, আর একইসঙ্গে আমার গাড়ির চাকা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ তুলে পিচের রাস্তা ছেড়ে পাশের কাদামাটিতে গভীর ছাপ ফেলে টাল খেয়ে আবার উঠে এসেছে রাস্তায়। তবুও যা দেখার তা ওইটুকু সময়ের মধ্যেই দেখে নিয়েছি।

ওমনি গাড়িটা চালাচ্ছে একজন মাঝবয়েসি লোক। মাথায় কঁচাপাকা চুল। জামায় লাল রঙের ছোপ। আর গাড়ির পেছনের কাঁচে কয়েকটা ফুটো, সেগুলোকে ঘিরে মাকড়সার জালের মতো চিড় খাওয়া হিজিবিজি।

আর গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কী ভেবে গাড়ি থামিয়ে দিলাম একেবারে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লাল ওমনিটা দেখতে লাগলাম।

ফঁকা রাস্তায় এলোমেলোভাবে ছুটে মিলিয়ে যেতে-যেতে গাড়িটার ড্রাইভার বোধহয় মত পালটাল। কারণ গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে সোজা মুখ থুবড়ে পড়ল পাশের নালায়। সেখানকার ঝোঁপঝাড় আগাছার মধ্যে গাড়িটার শতকরা সত্তরভাগই ঢাকা পড়ে গেল।

না, আর দেরি নয়। আমার একটা স্বভাব হচ্ছে সব সময় পরের ব্যাপারে নাক গলানো। এই স্বভাবটা বোধহয় জন্মগত কিংবা জন্মের আগে থেকেই। আর সেইজন্যেই নাকটাও কি একটু বেশি চোখা?

অতএব গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ইউ বাঁক নিয়ে পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলাম ওমনির দিকে। অনুভূমিক রেখার সঙ্গে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে গোঁত্তা খেয়ে থমকে রয়েছে গাড়িটা। গাছপালা আগাছা সরিয়ে চলে গেলাম ড্রাইভারের দরজার কাছে। দরজা খুলতেই লোকটা হেলে পড়ল আমার দিকে। আমি চট করে একহাতে ওর দেহটা ঠেলে ধরলাম। নইলে আমার জামা-প্যান্টের বারোটা বেজে যেত।

একটু আগে জামায় লাল ছোপ নজরে পড়েছিল। এখন দেখলাম বেচারা একেবারে হোলি খেলে উঠেছে। লাল রঙের হোলি। বোধহয় অন্য কোনও রং দোকানে ছিল না।

গাড়ির পেছনের কাছে অন্তত চারটে ফুটো আমার নজরে পড়ল। আর লোকটার পিঠে দুটো, পেটের কাছে একটা। অভিজ্ঞতা বলছে, যে দুটো গুলি ওর গায়ে বিঁধেছে তার মধ্যে অন্তত একটা ওর দেহকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছি, ভারতের জনসংখ্যা এক কমে গেছে এবং বাকি জনগনের মাথাপিছু জমি ও খাদ্য অনেকটা করে বেড়ে গেছে। কিন্তু আমার রাষ্ট্র-উন্নয়নের চিন্তা ধাক্কা খেল একটা অস্ফুট আর্তনাদে।

আর্তনাদটা বেরিয়ে এসেছে লালুর–মানে, ওই লালজামার মুখ থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার কৌতূহল একশো তেরো গুণ বেড়ে গেল। খরচা খাতায় ফেলা লোকটাকে মনে মনে ঝট করে জমার খাতায় ফেলে ঝুঁকে পড়লাম ওর মুখের কাছে। অনেকটা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলাম, আপনার নাম কী? কী করে এরকম হল?

লালুর ঢলে পড়া মাথা নড়ল সামান্য। ক্লান্ত ঠোঁট ফাঁক হল। বলল, ডাক্তার... হসপিটাল.. আমাকে বাঁচান...।

আমি ওর নাড়ি দেখলাম, নাঃ যা ভেবেছি তাই। ওর এখন ডাক্তার বা হাসপাতালের কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু ডোমের প্রয়োজন–পোস্ট মর্টেমের জন্যে।

সুতরাং চিৎকার করে আবার একই প্রশ্ন করলাম। তখন মাথা তোলার চেষ্টা করে বিড়বিড় করে লোকটা বলল, মিত্র..শরদিন্দু মিত্র...।

তারপরই ওর মাথাটা আঁকুনি খেয়ে ঢলে পড়ল।

শরদিন্দু মিত্র? এটা নিশ্চয়ই আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর নয়। তা হলে কি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর?

লোকটার নাড়ি দেখলাম আবার। নেই। মুনিয়া উড়ে গেছে দুনিয়া ছেড়ে। মনে-মনে একবার বলো হরি, হরিবোল– বলে মৃতদেহটা ঠেলে দিলাম গাড়ির ভেতরে। ওটা সিটের ওপরে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তখন কী ভেবে খুব সাবধানে লোকটার পকেট হাতড়ালাম। কিছু টাকা-পয়সা আর কাগজপত্র পাওয়া গেল। টাকা মাটি, মাটি টাকা। অতএব কাগজপত্রের ওপরেই নজর বুলিয়ে নিলাম। দু-একটা ক্যাশমেমো আর মিত্রসাহেবের একটা ভিজিটিং কার্ড। কার্ডটা দুমড়ে গেছে। কার্ডের পেছনদিকে দুটো ফোন নাম্বার লেখা। দেখে চিনতে পারলাম। নজর মহম্মদ আমাকে এই দুটো ফোন নাম্বারই দিয়েছিল। অবাক হলাম। অমিতাভ শিকদারের মতো আরও কজনকে একই কাজে লাগিয়েছেন শরদিন্দু মিত্র? নাকি

আমার বোঝার ভুল? হতে পারে এই লোকটা হয়তো শরদিন্দু মিত্রের পরিচিত ব্যাবসার সূত্রে চেনা। সে যাই হোক, কার্ডটা আমি পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। আর তারপরই একটা ক্যাশমেমো আমার নজর টানল। রেস্তরাঁয় খাওয়ার ক্যাশমেমো। ব্লু গার্ডেন রেস্তোরাঁ। কেয়ার অফ হোটেল রিভারভিউ, ডায়মন্ডহারবার। ক্যাশমেমোতে আজকেরই তারিখ। সুতরাং ক্যাশমেমোটাও পকেটে চালান করে দিলাম। তারপর গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে উঠে এলাম রাস্তায়। পুলিশে একটা খবর দিতে হবে।

রাস্তার এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কোনও ভরসা পেলাম না। সুতরাং ঠিক করলাম, হোটেল রিভারভিউ থেকেই ফোন করা যাবে থানায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আমি চাকরি করেছিলাম কলকাতা পুলিশে। সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি প্রায় সাড়ে আট বছর। কিন্তু মাথা থেকে পুলিশি কর্তব্যবোধটা এখনও একেবারে মুছে ফেলতে পারিনি।

অতএব গাড়িতে স্টার্ট দিলাম আবার। তারপর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সোজা হোটেল রিভারভিউ। হীরাকে খুঁজে আনার সামান্য কাজে এত জটিলতা লুকিয়ে থাকবে একথা কে ভাবতে পেরেছিল!

.

হোটেল রিভারভিউতে রিভার আর ভিউ দুই-ই আছে। ডান দিকে হুগলি নদী। বর্ষায় জল থইথই। সেদিক থেকে ভেসে আসছে জোলো বাতাস। নদীর পাড়ে, কিছুটা দূরে-দূরে, কয়েকটা গাছ। বাতাসে দুলছে। তার সামনে খানিকটা খোলা মাঠ-ঘাসে ছাওয়া। সেখানে কয়েকজন মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

বাঁদিকে উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা হোটেল এলাকা। তারই মাঝে বিশাল লোহার দরজা। দরজার দুপাশে আধুনিক স্থাপত্যের কারুকাজে হোটেলের নাম লেখা। সঙ্গে বাতিস্তম্ভ।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে মোরাম বিছানো পথ। আর তার খানিকটা দূরেই চারতলা হোটেল বিল্ডিং। সেখানেও আধুনিক ছাঁদ। চেহারাতেই বোঝা যায়, এ-হোটেল আমজনতার

জন্যে নয়।

দরজার কাছে গাড়ি নিয়ে যেতেই উর্দি পরা দারোয়ান দরজা খুলে স্যালুট ঠুকল। গোঁফওয়ালা গোবেচারা লোকটার হাতে একটা দশ টাকার নোট তুলে দিয়ে জিগ্যেস করলাম, একটু আগে একটা লাল রঙের মারুতি ওমনি এখান থেকে বেরিয়েছে কি না।

লোকটা ইতস্তত করছিল। হয়তো জরুকে জিগ্যেস না করে ও কারও কথার জবাব দেয় না। আমি আর-একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম। ভারতীয় টাকার ঘন-ঘন অবমূল্যায়নে দশ টাকার এখন তেমন একটা দাম নেই–অন্তত লুব্রিকেশানের কাজে। তবে বিশ টাকায় কাজ হল। লোকটা জরুর আদেশের অপেক্ষা না করেই বলল, হ্যাঁ, একটা লাল মারুতি ওমনি গাড়ি সে বেরোতে দেখেছে। তবে ওইটুকুই, তার বেশি কিছু জানে না।

আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। গাড়ি চালিয়ে মোরামের ওপর দিয়ে কচর-মচর শব্দ করতে করতে সোজা হোটেল বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম।

হোটেলের পেছনদিকে বিরাট খোলা জায়গা। সেখানেই কার পার্ক। কিন্তু এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কোনও অ্যাটেনড্যান্টকে চোখে পড়ল না। কার পার্কে গাড়ি রেখে এসে প্রকাণ্ড কাচের দরজা ঠেলে হোটেলের অভ্যর্থনাকক্ষে ঢুকলাম। এবং ঢুকেই চমকে গেলাম।

হোটেলের প্রতিটি সাজসজ্জায় বিলাসিতার ছাপ। পাঁচতারা হোটেলে এক-আধবার যে ঢুকিনি তা নয়। তবে এর তারার সংখ্যা পাঁচের অনেক বেশি মনে হয়।

প্রকাণ্ড রিসেপশান হলের মেঝেতে নরম কার্পেট। একপাশে অনেকগুলো সোফা। তার পাশে পাশে ছোট-ছোট টবে ছায়াতরু। একটু দূরে রঙিন টিভি। হলের ডানদিকের শেষ প্রান্তে কাচের দেওয়াল। দেওয়ালের ওপাশে সাঁতার-দিঘি। সেখানে কলির কেষ্ট আর গোপিনীর দল জলকেলি করছে। গা-থেকে-জল-ঝরে-পড়া দু-একজন সুন্দরীকে দেখে

বেশ ভালো লাগল। লক্ষ করলাম, সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ার ভান করে তিনজন ভদ্দরলোক সুন্দরীদের বেশ খুঁটিয়ে দেখছে।

ইচ্ছে থাকলেও ওসব দেখার খুব বেশি সময় আমার হাতে নেই। সুতরাং এগিয়ে গেলাম রিসেপশান ক্লার্ক দুজনের কাছে। গাড়ি থেকে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ব্রিফকেসটা নিয়ে এসেছি। ওটা কার্পেটের ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাথার মধ্যে ঘুরছে রুম নম্বর টু-জিরো-থ্রি।

ক্লার্ক দুজন যেন উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু। একজন বেশ গাঁট্টাগোট্টা, অন্যজন রোগা। একজন ফরসা, অন্যজন কালো। একজনের চশমা, তো আর একজনের চশমা নেই। তবে দুজনেরই পরনে ছাইরঙা টেরিকটনের টিপটপ পোশাক। তার ওপরে হোটেল রিভারভিউর মনোগ্রাম এবং সারি সারি পেতলের বোতাম।

রিসেপশান কাউন্টারটা তিমির মতো লম্বা। আর তামা, পেতল, কাঠের তৈরি। যেখানে যেটা ব্যবহার করা উচিত, তাই ব্যবহার করা হয়েছে। সবটাই ঝকঝকে তকতকে।

আমাকে দেখেই গাঁট্টাগোট্টা এগিয়ে এল। মুখে ফুটিয়ে তুলল যান্ত্রিক হাসি। আমি ওকে বললাম যে, সেকেন্ড ফ্লোরে, মানে বাংলায় তিনতলায়, একটা ঘর চাই। সিঙ্গল বা ডবল, যে কোনও একটা হলেই চলবে।

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। ঘরের নম্বর লেখা খোপগুলো দেখল। কোনও কোনও খোপে পেতলের বিশাল টিকিট লাগানো চাবি ঝুলছে। আমি আগেই লক্ষ করেছি, দুশো তিন নম্বর খোপে চাবি নেই, আর দুশো সাত নম্বর খোপে চাবি ঝুলছে। ঘরটা খালি হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে, দুশো সাতের বোর্ডার চাবি কাউন্টারে জমা দিয়ে হুগলির হাওয়া খেতে বাইরে গেছে।

লোকটা এবার খাতা খুলল। কী সব দেখেটেখে বলল, দুশো সাত নম্বর খালি আছে। সিঙ্গল বেড। ভাড়া নশো পঞ্চাশ টাকা–।

বোধহয় শেষ কথাটা বলল আমার চেহারা ও পোশাক দেখে। আমি পকেট থেকে টাকা বেরে করে গুনে উনিশশো টাকা দিলাম ওর হাতে। বললাম, দু-দিনের ভাড়া। পরে দরকার হলে দু-একদিন বেশি থাকব।

লোকটা টাকা নিয়ে রোগা সঙ্গীকে ডেকে বলল কাগজপত্র তৈরি করতে। তারপর দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন উর্দিপরা বেয়ারার একজনকে ইশারায় কাছে ডাকল। দুশো সাত নম্বরের চাবিটা তাকে দিয়ে বলতে যাচ্ছিল কী কী করতে হবে, আমি হেসে বাধা দিলাম। বললাম, আমি নিজেই পারব। তারপর চাবিটা নিয়ে পকেটে ঢোকালাম। বেয়ারাটা ব্যাজার মুখে চলে গেল। সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো। আমি সামনের খোলা খাতায় নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লেখার কাজ শেষ করলাম।

এবার আসল কাজ। গাঁট্টাগোট্টা লোকটাকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। ও কৌতূহলী মুখে পালিশ করা কাউন্টারের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আমার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করল। জিগ্যেস করলাম, টেলিফোন করা যাবে একটা?

নিশ্চয়ই, স্যার– বলে কাউন্টারের ভেতরের তাক থেকে একটা নীল রঙের হালকা আধুনিক টেলিফোন বের করে কাউন্টারের ওপরে রাখল।

লোকাল থানার ফোন নাম্বার জানা নেই। অতএব লালবাজারে ফোন করে খুনের খবরটা দিলাম। নিজের পরিচয় জানালাম না। বললাম, লাশ গাড়িতে শুয়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

টেলিফোন শেষ করে গাঁট্টাগোট্টাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর পকেট থেকে একটা আইডেনটিটি কার্ড বের করে পলকে ওর নাকের ডগায় খুলে ধরেই বন্ধ করে দিলাম। একইসঙ্গে জিগ্যেস করলাম, দুশোতিন নম্বরে কোন বোর্ডার আছে?

লোকটা বারকয়েক ঢোঁক গিলে খাতা উলটেপালটে দেখল। তারপর বলল, চুনিলাল ব্যানার্জি, স্যার। কাল থেকে এসে উঠেছে।

লক্ষ করলাম, লোকটার গলার স্বর কাঁপছে। একটা আইডেনটিটি কার্ডেই এই অবস্থা! তাও যদি কার্ডটা জেনুইন হত! এই রামছাগলটা ধরতে পারেনি যে, ওটা আমারই তৈরি। একটা আইডেনটিটি কার্ড বাজার থেকে কিনে তার ওপরে আমার পাসপোর্ট ফটো সেঁটে দিয়েছি। আর তার পাশে আমার নাম, বাবার নাম, জন্মতারিখ, সই ইত্যাদি যেমন থাকা উচিত ঠিক তেমনটি রয়েছে। আর সবচেয়ে যেটা জরুরি সেটা হল রাবার স্ট্যাম্প। আমাদের দেশের জনগণের রাবার স্ট্যাম্পে অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং সেরকম জাতের একটা পুরোনো রাবার স্ট্যাম্প নিয়ে তার ধ্যাবড়া ছাপ ছেপে দিয়েছি আইডেনটিটি কার্ডের ওপরে। স্ট্যাম্পের মাঝখানে তিন সিংহের মূর্তির ছাপও আছে। নিছকই ভেঁতা আউটলাইন–শুধু সিংহ তিনটের আদলটুকুই বোঝা যায়। তবে রামছাগলকে বশ করতে এটুকুই যথেষ্ট আসল সিংহের কোনও দরকার নেই। সুতরাং কার্ডটা নিশ্চিন্তে পকেটে চালান করে দিলাম।

এবার ওকে পরের প্রশ্নগুলো করলাম।

চুনি ব্যানার্জির সঙ্গে আর কেউ এসে উঠেছে? কোনও মেয়ে?

না, স্যার,

আমার ভুরু কুঁচকে গেল। হীরার খোঁজেই এসেছি। অতএব পকেট থেকে হীরার ফটো বের করে ওকে দেখালাম। হীরাকে কেউ একবার দেখলেই যথেষ্ট, কোনওদিন ভুলবে না। জিগ্যেস করলাম, চুনিবাবুর সঙ্গে এই মেয়েটি ছিল না?

হীরার ছবি দেখে লোকটার চশমা কেঁপে উঠল নাকের ডগায়। চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে খাইখাই ভঙ্গিতে বলে উঠল, না, স্যার, মিসেস রায় তো তার স্বামীর সঙ্গে এসে উঠেছেন। এই তো, দুশো আঠেরো নম্বর রুমে। বলে খাতার পাতার দিকে আঙুল দেখাল সে।

তার মানে? চুনি ব্যানার্জি একা উঠেছে? আর হীরা মিসেস রায় নাম নিয়ে উঠেছে তার স্বামীর সঙ্গে? উঁহু..ওরে মন, পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন–।

সুতরাং নোলা ঝরা লোকটাকে আরও এক ডিগ্রি কাহিল করতে বললাম, স্বামী আবার কী! সব বোগাস–।

সত্যি স্যার, তাই?

আমি এক চোখ ছোট করে বললাম, তবে ওর রেটটা বড় হাই। আসলে দেখতে সুন্দর তো–।

কত রেট স্যার, কত? এরকম একজন বিউটি কুইন– লোকটার ডান হাতটা নড়ছিল। বোধহয় নজরের আড়ালে পকেটের খুচরো পয়সা গুনছিল।

আমি পাথরের মতো মুখ করে বললাম, দশ হাজার। পার নাইট।

টগবগে বেলুন চুপসে গেল পলকে। একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুখটাও ব্যাজার হয়ে গেল।

আমি এবার লাল মারুতির প্রসঙ্গে এলাম। জিগ্যেস করলাম, আধঘণ্টাটাক আগে লাল রঙের মারুতি ওনি নিয়ে কোনও কাস্টমার এখানে এসেছিল? ব্লু গার্ডেন রেস্তোরাঁয় বসেছিল খেতে…।

লোকটা হাসল। বলল, সেটা ঠিক বলতে পারব না, স্যার। তবে আমাদের রেস্তোরাঁটা দোতলায়। ওখানে মাইকেল আছে। ও তখন স্টেজে গাইছিল। ও সব লোককে ঠিকঠাক মনে রাখতে পারে। ওকে একটিবার জিগ্যেস করে দেখুন।

আমি হেসে ধন্যবাদ জানালাম। পকেট থেকে লুব্রিকেশান ফি হিসেবে একটা একশো টাকার নোট বের করে লোকটার দিকে এগিয়ে দিলাম।

এর আবার কী দরকার ছিল, স্যার– বলতে-বলতে টাকাটা ও নিল। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের টাকা খরচ করছি ততক্ষণ দয়ালু হতে কোনও বাধা নেই। তবে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলাম। আপনমনেই বিড়বিড় করে কী যেন হিসেব কষছে। বোধহয় ভাবছে, বাকি নহাজার নশো টাকা কোত্থেকে জোগাড় করা যায়। আজ রাতে হীরাকে যে ও স্বপ্নে দেখবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গরিব তো স্বপ্ন নিয়েই বাঁচে।

দোতলার সিঁড়ির পাশেই অটোমেটিক এলিভেটর। এলিভেটরে তিনতলায় উঠতে উঠতে ঠিক করলাম, আগে স্নান, তারপর খাওয়া–অবশ্যই ব্লু গার্ডেনে বসে আয়েস করে। তারপর মাইকেল। কিন্তু ওর পদবিটা কী হতে পারে? জ্যাকসন, না মধুসূদন দত্ত?

.

ব্লু গার্ডেনে। নামের মধ্যে যেমন একটা মিষ্টি সুর ও ছবি রয়েছে, চেহারাতেও তাই। বিশাল খোলা-হাওয়া রেস্তরাঁ। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের মতোই এই নীল উদ্যান। হোটেলের সদর দরজার দিকে মুখ করে তৈরি হওয়ার ফলে এখানে বসেই নদী দেখা যায়, টের পাওয়া যায় ছন্নছাড়া বাতাস। রোদ অথবা বৃষ্টি আড়াল করতে মাথার ওপরে উঁচু-নীচু পিরামিডের ঢঙে তৈরি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আচ্ছাদন। রেস্তোরাঁর শতকরা সত্তর ভাগ খোলা হাওয়ায়, আর বাকি তিরিশ ভাগ অন্দরে। সেই অংশে নাচ-গানের ডায়াস, বার কাউন্টার এবং কিচেন। আর খোলা অংশে টেবিল চেয়ার সাজানো।

রেস্তোরাঁয় ভিড় মাঝারি রকমের। একে বর্ষাকাল, তার ওপরে বেলা প্রায় দুটো। তাই হয়তো খদ্দের বেশি নেই তা ছাড়া এই রেস্তোরাঁয় আকাশছোঁয়া দামও একটা কারণ হতে পারে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম আয়েস করেই। খালি পেটে কখনও রিভলভার চালানো যায় না।

বেয়ারাকে বিল মেটাতেই একটা ক্যাশমেমো হাতে পেলাম। চেহারায় ঠিক লালুর ক্যাশমেমোর মতো। বেয়ারাটাকে ডেকে লালুর ক্যাশমেমোটা দেখিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। লোকটা কিছুই ঠিকমতো বলতে পারল না। তখন ওকে বললাম, তোমার নাম নিশ্চয়ই মাইকেল নয়?

বেয়ারাটা আমতা-আমতা করে বলল, না, স্যার। মাইকেল গান গায়, গিটার বাজায়। একটু আগেই ওর গান শেষ হয়েছে। আবার সন্ধেবেলা ওর শো শুরু হবে। আঙুল তুলে দূরের কোণের ডায়াসটাকে দেখিয়ে বলল, ওই স্টেজে।

মাইকেল এখন কোথায়? পকেট থেকে কার্ডটা বের করে বেয়ারাটাকে দেখলাম। ছোট্ট করে উচ্চারণ করলাম, লালবাজার।

লোকটা মুখ তালশাঁসের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নাঃ, আজ দেখছি শুধু রামছাগলদের দিন।

লোকটা রীতিমতো কাঁপা গলায় বলল, মিউজিক রুমে, স্যার।

আমার ভুরু কুঁচকে গেল। জিগ্যেস করলাম, সেটা আবার কোথায়?

ওই যে, স্টেজের পাশের দরজাটা।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। লুব্রিকেশান ফি হিসেবে দশ টাকা বের করলাম। লোকটাকে অনেক কষ্টে টাকাটা নিতে রাজি করালাম। টাকাটা বকশিশ হিসেবে দিয়ে কী ভেবে জিগ্যেস করলাম, তোমার নাম কী?

ক্ষুদিরাম, স্যার।

বাঃ! মাইকেল, তারপর ক্ষুদিরাম! আজ কি স্বাধীনতা দিবস না প্রজাতন্ত্র দিবস? কে জানে, নীচের ওই গাঁট্টাগোট্টা চশমাওয়ালার নাম রামমোহন অথবা প্রফুল্ল কি না!

ভেলভেট মোড়া সুদৃশ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এবার অপারেশান মাইকেল।

কতকগুলো ব্যাপার আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। শরদিন্দু মিত্রের কাজের দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর কেউ আমাকে সাদা মারুতি নিয়ে ফলো করছিল। তারপর চুনি ব্যানার্জির লোক আমাকে শাসিয়েছে। আর সবশেষে লাল মারুতি ভ্যান নিয়ে লালুর অপঘাতে মৃত্যু।

লালু কী করতে এসেছিল রিভারভিউতে? এল, ব্লু গার্ডেনে খেল-দেল, তারপর একজোড়া গুলি খেয়ে মরে গেল। যে গুলি ছুঁড়েছে সে নিশ্চয়ই গাড়ির বাইরে থেকে, পিছন থেকে, ফায়ার করেছে। আর তখন গাড়িটা হয়তো ছুটন্ত অবস্থায় ছিল। নইলে চারটে গুলির মধ্যে দুটো গায়ে লাগবে কেন? যারা রিভলভার চালায় তাদের টিপ কি এতই ভেঁতা হয়!

হঠাৎই আমার থিয়োরিতে একটা বড় গলদ চোখে পড়ল। না, লালু যখন গুলি খায় তখন সে মোটেই ড্রাইভ করছিল না। কারণ সিটে বসা অবস্থায় সিটের গদি ফুটো না করে কোনও গুলি ওর বুকে বা পিঠে বিধতে পারে না। সামনের সিটের গদিতে সেরকম কোনও ফুটো আমার নজরে পড়েনি। সুতরাং গুলি খাওয়ার পর লালু কোনওরকমে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। তখন আরও চারবার কেউ গুলি ছুঁড়েছে ওর গাড়ি লক্ষ্য করে।

গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে এখানেই, এই হোটেলে–এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। তা হলে গুলির আওয়াজ কি কেউ শোনেনি? নাকি রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো ছিল?

এইসব উলটোপালটা ভাবতে-ভাবতেই মিউজিক রুমে গিয়ে ঢুকলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হুইস্কির গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল।

ঘরটা ঝিমঝিম অন্ধকার। তারই মধ্যে টুং-টাং করে বাজছে গিটারের সুর। ঘরের একপাশে যন্ত্রসংগীতের নানা যন্ত্রপাতি জ্যাজ, কঙ্গো, পারকাসন, ম্যারাকাস, পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন, আর বড় মাপের ইয়ামাহা ইলেকট্রনিক অরগ্যান। সেগুলো থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা মোটাসোটা একটা লোক তামাটে শরীরটাকে সামান্য ঝুঁকিয়ে স্প্যানিশ গিটার বাজাচ্ছে। তার কাছে বসে আছে একটি রোগা চেহারায় ছোকরা।

আমি গিটারওয়ালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হুইস্কির গন্ধ গায়ে মেখে জিগ্যেস করলাম, মাইকেল?

দাড়িওয়ালার গিটার বাজতেই থাকল। তারই মধ্যে সুর করে ছড়া কেটে বলল, কী চাই, বলে ফেল ভাই– হুইস্কির গন্ধ আবার ঝাপটা মারল নাকে।

আমি জিগ্যেস করলাম, ঘণ্টাখানেক আগে ব্লু গার্ডেনে বসে খেয়ে গেছে একটা লোক। তারপর এই হোটেলেই গুলি খেয়ে রাস্তায় গিয়ে মরেছে। রেস্তোরাঁর তখন আপনার শো চলছিল। লোকটার চেহারার বর্ণনা দিলে চিনতে পারবেন?

রোগা ছেলেটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। এত স্বাভাবিক গলায় কখনও কাউকে খুনের ঘটনা বোধহয় বলতে শোনেনি।

মাইকেল গিটার বাজাতে বাজাতেই হাসিমুখে সঙ্গীর দিকে তাকাল। বলল, ভয় পেলি, তরুণ? তোর অবস্থা বড় করুণ।

তরুণ তখন ভয়ার্ত মুখে যাই-যাই করছে।

মাইকেল এবার আমাকে জিগ্যেস করল, ভাই, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার কী নাম?

গিটার বাজছিল। একবারের জন্যেও থামেনি।

আমি দাঁত বের করে হেসে ছড়া কেটে বললাম, ভালো নাম অমিতাভ শিকদার, ডাকনাম পুলিশ। বলতে পারেন, বুলেট খাওয়া লোকটার হদিস?

ওদের দুজনেরই মুখের ছবি পালটে গেল। গিটারের তারের ওপরে থমকে গেল মাইকেলের আঙুল। কুতকুতে চোখ দ্রুত নড়াচড়া করতে লাগল এদিক-ওদিক। আর তরুণের অবস্থা এখন সত্যিই করুণ।

মাইকেলকে এবার লালুর চেহারার বর্ণনা দিলাম। ও চুপ করে শুনল। তারপর গিটারটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। বলল, আবছা মনে পড়ছে। ডায়াসের খুব কাছেই বসেছিল। বারবার ঘড়ি দেখছিল। তারপর একসময় ঘড়ি দেখেই জলদি খাওয়া শেষ করে ঝট করে উঠে পড়েছিল। তাড়াহুড়ো করে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেছে। একটু থেমে আবার বলল, এইজন্যেই লোকটাকে মনে আছে। তবে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে বলতে পারব না।

মাইকেলের মুখ দেখে মনে হল সত্যি কথাই বলছে।

নাঃ, লালুর গল্প তা হলে এখানেই শেষ! হোটেলের ম্যানেজারকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই না, কারণ, তাতে শোরগোল হবে। আমার কাজ হীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, ব্যস।

মাইকেলকে আলগা গোছের ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। ও তখন আবার গিটার বাগিয়ে ঝংকার তুলতে শুরু করেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করে বলল, অলওয়েজ ওয়েলকাম, মাইকেল ডিসুজা আমার নাম।

আমি হাসলাম, বললাম, দরকার পড়লেই আসব আবার, এখন সময় হল যাওয়ার–।

রেস্তোরাঁর দরজা ঠেলে বেরোনোর সময় মনে হল, ছোটবেলা থেকে রিভলভার চর্চা না করে যদি কবিতা চর্চা করতাম তা হলে বড় ভালো হত। আজ আমাকে এভাবে লালুর খোঁজ করে বেড়াতে হত না।

শরীর খুব ক্লান্ত লাগছিল। দুশো সাত নম্বরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম আরামের বিছানায়। সন্ধেবেলা কারপার্কের অ্যাটেনড্যান্টকে লাল ওনির ব্যাপারে জিগ্যেস করা যাবে। আর হীরা যখন হাতের নাগালে রয়েছে তখন রাতের অন্ধকারে ওকে নিয়ে উড়ে যেতে অসুবিধে কী?

শুধু একটা ব্যাপার মনের মধ্যে খচখচ করছিল। লালু মারা যাওয়ার আগে শরদিন্দু মিত্রের নাম বলে গেল কেন?

.

হোটেল রিভারভিউর যে-কোনও ভিউই চমৎকার। অন্তত সূর্য ডুবে যাওয়ার মুখে কার পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে আমার তাই মনে হল।

সবুজ ঘাসের কিনারায় ঝুলন্ত শিকলের চেন। তারপরই মেটাল রোড এবং কার পার্ক। হোটেলের চৌহদ্দির পাঁচিল প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। সুতরাং নদী বা সূর্যাস্ত কোনওটাই সরাসরি দেখা যাচ্ছে না। তবে লালচে আকাশ পরোক্ষভাবে সূর্যের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছিল। আর হু-হু বাতাসের গায়ে নদীর নাম লেখা ছিল।

কার পার্কের কাছে চৌহদ্দির দেওয়াল ঘেঁষে হাফ ডজন পাম গাছ। তার মাথায়, পাতার ফাঁকে, পাখির বাসা ও সংসারী পাখি। ঘাসের ওপরে দাঁড়িয়ে ওদের নির্লজ্জ দাম্পত্য কলহ শোনা যাচ্ছে।

আমি অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে কথা বলছিলাম। নেহাতই বিশ-বাইশের ছোকরা। নাম শিবনাথ। কালো মুখ পুরোনো বসন্তের দাগ। সামনের কয়েকটা দাঁত উঁচু। পরনে খাকি পোশাক।

একটু আগেই লুব্রিকেশান ফি জমা দিয়েছি তিরিশ টাকা। তারপরই লালুর গাড়ির খবর এবং বুলেটের ব্যাপারটা জানতে পেরেছি।

লালু দৌড়ে এসে ওর গাড়িতে উঠছিল। সেই সময়ে ওর পিঠে গুলি লাগে। না, গুলির শব্দ শুনতে পায়নি শিবনাথ। তবে হঠাৎই লালুর পিঠে সাদা জামার ওপরে লাল রং ফুটে উঠতে দেখে চমকে উঠেছে।

সময় তখন কটা হবে? এই বারোটা সাড়ে বারোটা। কার পার্কে শিবনাথ একাই ছিল। ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, মেটাল রোডের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল লালু। তারপর শিবনাথকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে উঠে পড়েছে গাড়িতে। গাড়িটা চলতে শুরু করামাত্রই আবার গুলি। কাচের ওপরে গুলির শব্দ—বেশ কয়েকবার। তখন শিবনাথ আন্দাজে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। তখনই একটা লোককে দেখতে পেয়েছে ও।

আমি মনোযোগ দিয়ে শিবনাথের কথা শুনছিলাম। আর একইসঙ্গে চারপাশে নজর রাখছিলাম। কারণ, খনা বলে গেছেন, ন বিশ্বাসন্তি আপনং ছায়া। যার অর্থ, নিজের ছায়াকেও কখনও বিশ্বাস কোরো না।

শিবনাথ হোটেলের তিনতলার জানলায় একজন লোককে দেখতে পায়। না, তাকে ঠিক চিনতে পারেনি। তবে ওই ঘরটায়।

আঙুল তুলে ঘরটা দেখাল শিবনাথ। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকের ভেতরে একটা হাতি ব্যালে নেচে উঠল। কারণ, ঘরের নম্বরটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি। দুশো তিন। চুনি ব্যানার্জির ঘর!

শিবনাথ আর কিছু বলতে পারেনি। না, এই দুর্ঘটনার কথা কাউকে জানায়নি সে।

তখন ওকে আইডেনটিটি কার্ডটা দেখিয়ে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, ওর কোনও ভয় নেই। পুলিশ ওকে বিরক্ত করবে না।

শিবনাথ তিরিশ টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করতে লাগল। আমি হেসে বললাম, পুলিশ যেমন সবসময় সার্ভিস চার্জ নেয়, তেমনি মাঝে-মাঝে সার্ভিস চার্জ দেয়। এটা অনেকটা সেইরকম–

শিবনাথের কাছ থেকে সোজা ফিরে গেলাম নিজের ঘরে। সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিলের পাশ থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে রাখলাম। বিছানায় ওপরে। কম্বিনেশান লক ঘোরাতেই ব্রিফকেস খুলে গেল। ভেতরে কাগজপত্র, কলম, টুকিটাকি জিনিস। এ ছাড়া ছোট একটা ডাম্বেল। মাঝের হাতলটা কাঠের। তাতে আঙুলের মুঠোর মাপে খাঁজ কাটা। আর দু-মাথায় দুটো ইস্পাতের বল–বড়জোর দু-সেন্টিমিটার ব্যাসের। ডাম্বেলটা মুঠো করে ধরলে হাতলটা দেখা যায় না, শুধু বল দুটো মুঠোর দু-পাশে উঁকি মেরে থাকে।

ডাম্বেলটা প্যান্টের পকেটে ঢোকালাম। তারপর ব্রিফকেস থেকে তুলে নিলাম চার ইঞ্চি মাপের একটা সাইলেন্সার টিউব। টিউবের গায়ে নানা রঙের স্টিকার লাগানো। যাতে দেখে বোঝা না যায় এটার আসল কাজ কী। একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভারে ওটা প্যাঁচ দিয়ে লাগিয়ে নিলাম। তারপর প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম।

অন্য স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটায় হাত দিলাম না। তার বদলে ব্রিফকেস থেকে বের করে নিলাম নল কাটা একটা শটগান। তার বাঁট বলে কিছু নেই। একটা তেকোনা ইস্পাতের ফ্রেম নিয়ে শটগানের সঙ্গে এঁটে দিতেই একটা খাটো বাঁট তৈরি হল। একবার দেখে নিলাম গুলিভরা আছে কিনা। তারপর ওটা শিরদাঁড়ার কাছে প্যান্টের ভেতরে আধাআধি গুঁজে নিলাম। ঢোলা জামাটা টেনে দিলাম ওপর দিয়ে।

ব্রিফকেস বন্ধ করে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শরীর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম শটগানটা দৃষ্টিকটুভাবে উঁচু হয়ে থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কি না। এ-শটগানের বিজ্ঞাপনের দরকার নেই। একবার ফায়ার করলেই শতকরা দুশো ভাগ কাজ দেয়।

ঘর ছেড়ে যখন বেরোলাম তখন আমি দুনিয়া ছাড়ার জন্যে তৈরি। কিন্তু তার আগে দুশো তিন নম্বর ঘরের রহস্য আমি ভেদ করতে চাই। সেই সঙ্গে লালুর মৃত্যুরহস্য।

করিডরে ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। সুতরাং পায়ের শব্দের কোনও ব্যাপার নেই। আর লোকজন কাউকেই চোখে পড়ল না। একবার শুধু একজন বেয়ারাকে দেখলাম। হাতে ট্রে। ট্রে-র ওপরে বোতল ও গ্লাস। আমি বেয়ারাটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। এবং দুশো তিন নম্বরের দরজাটাও পেরিয়ে গেলাম।

যখন দেখলাম পথ পরিষ্কার তখন দুশো তিনের সামনে এসে নক করলাম ব্যস্তভাবে।

কিছুক্ষণ কোনও উত্তর নেই। তখন আমি কলিংবেলের বোতাম টিপলাম। তারপর আবার নক করলাম।

এবার কেউ ভরাট গলায় প্রশ্ন করল, কে?

ভাবার সময় নেই। অতএব যা মুখে এল বলে দিলাম, দরজা খুলুন, মিস্টার ব্যানার্জি। আমি রিভারভিউর ম্যানেজার।

তারাওয়ালা হোটেলের ম্যানেজাররা নিশ্চয়ই বেয়ারাদের মতো বোর্ডারদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ হল। দরজা সামান্য ফাঁক হল। একটা ভয়ার্ত চোখ দেখা গেল সেই ফাঁকে। চুনি ব্যানার্জির চোখ।

আমি দরজায় সপাটে এক লাথি মারলাম। আর একইসঙ্গে পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বের করে বাগিয়ে ধরলাম। তারপর ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ছিটকিনিও এঁটে দিলাম।

মেঝেতে পড়ে যাওয়া চুনি তখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। রিমলেস চশমা চোখ থেকে সরে গিয়ে কাত হয়ে নাকের কাছে আটকে রয়েছে। ব্যাকব্রাশ চুলের পরিপাটি ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু ডান গালের তিলটা রয়েছে জায়গা মতোইনড়ে যায়নি।

নল কাটা শটগানটার জন্যে পিঠের কাছটায় খচখচ করছিল, কিন্তু সেটা ভ্রূক্ষেপ না করে আমি দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েই রইলাম। দু-হাতে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের বাঁট চেপে ধরেছি। সাইলেন্সারের নল সরাসরি চুনির কপাল দেখছে।

শক্ত গলায় চুনিকে বললাম, উঠে দাঁড়ান–।

চশমা ঠিক করে সাইলেন্সরের নলের দিকে স্থির নজর রেখে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল চুনিলাল। তারপর অপমানে আহত গলায় বলল, হাত দুটোও কি মাথার ওপরে তুলতে হবে?

আমি হাসলাম ও কোনও দরকার নেই। হাত তুলুন আর না-ই তুলুন, আমার টিপ ফসকাবে না।

চুনিলাল মাথার চুল ঠিক করল, প্যান্ট-শার্ট ঝাড়ল। তারপর খানিকটা শান্ত গলায় বলল, কবে থেকে হোটেল রিভারভিউর ম্যানেজার হয়েছেন?

আপনার ঘরের দরজায় নক করার দু-সেকেন্ড আগে থেকে।

ও– হাত নাড়াল চুনি, বলল, নিন, আর দেরি করছেন কেন? কাজ শেষ করুন।

কাজ? কী কাজ? একটু অবাক লাগল আমার। চুনির কাছে গিয়ে শরীর হাতড়ে দেখলাম ও নিরস্ত্র। তখন রিভলভার পকেটে রাখলাম। ওকে জিগ্যেস করলাম, ঘরে আর কে আছে?

চুনির নজর কেঁপে গেল একতিল। কিন্তু আমি সেটা লক্ষ করলাম। সুতরাং ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম ভেতরের ঘরের দিকে।

ভেতরের ঘর বললাম বটে, কিন্তু ঘর আসলে একটাই। একটা ভারী পরদা সেটাকে বসবার ঘর ও শোবার ঘরে ভাগ করেছে। সবুজ পরদাটা অনেকখানি টানা ছিল। কিন্তু পরদার ডানদিকে দরজার মতো সামান্য ফাঁক রয়েছে।

আমি সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘরে যাইনি। চুনিলালের কেঁপে যাওয়া নজর আমাকে সাবধান করে দিয়েছে এক লহমা আগেই। অতএব এক ঝটকায় মেঝে পর্যন্ত লেপটে থাকা পরদার

বাঁ দিকের কোণ দিয়ে ঢুকে পড়েছি ভেতরের ঘরে–চুনির শোবার ঘরে।

চায়ের দোকানের সেই শিক্ষানবিস ছোকরা মাস্তানের কথা মনে পড়ল : চুনিদা বহুত খতরনাক লোক...।

কথাটা যে একেবারে মিথ্যে নয় সেটা এখন বোঝা গেল। কারণ, শোবার ঘরে একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। না, বিছানায় নয়, খাটের নীচে, ঘরের মেঝেতে। তবে মেঝেতে

কার্পেট থাকার জন্যে শুয়ে থাকতে বোধহয় তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

লোকটা পরদার শেষপ্রান্তের দরজার দিকে সজাগ চোখে তাকিয়ে বাঘের বাচ্চার মতো ওত পেতে ছিল। বোধহয় আমারই জন্যে। ওর হাতে অস্ত্রশস্ত্র কী আছে ভালো দেখার মতো সময় এবং মনের অবস্থা আমার ছিল না। তা ছাড়া শটগানটা অনেকক্ষণ ধরে পিঠের কাছে খচখচ করছিল। তাই পরদা তুলে ঢোকার সময়েই ওটা হাতে বের করে নিয়েছি এবং ওই হুমড়ি খাওয়া অবস্থাতেই ওর মাথার দিকে তাক করে ট্রিগারে আঙুল শক্ত করে ফেলেছি।

আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঘের বাচ্চা আমার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। শটগানের নিশানা নির্ভুল লক্ষ্যে স্থির।

লোকটা নিশ্চয়ই পেশাদার পুরোনো পাপী। কারণ নলকাটা শটগান দেখেই চিনতে পারল। বুঝতে পারল, যদি আমি ওর কপাল তাক করে ফায়ার করি তা হলে মুন্ডুটা খুঁজে পাওয়ার জন্যে খবরের কাগজে হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলামে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সুতরাং নিমেষের মধ্যে ওত পেতে থাকা বাঘের বাচ্চাটা শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেল। মুখ ফ্যাকাশে। চোখে ভয়।

আমি নোংরা গলায় বললাম, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে মাথা নীচু কর–।

লোকটা দণ্ডিকাটার মতো সামনে দু-হাত বাড়িয়ে মুখ নীচু করে শুয়ে পড়ল।

চুনি ব্যানার্জি ইতস্তত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। আমি ওকে বললাম, আপনার বডিগার্ডকে খাটের তলা থেকে টেনে বের করুন–।

খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখলাম। নাঃ, ওই একজনই, আর কেউ নেই।

চুনিলাল ওর চ্যালাকে টেনে বের করল খাটের তলা থেকে। লোকটার গায়ে আঁটোসাঁটো গেঞ্জি, তার ওপরে লেখা লাভ, পাশে হৃদয়ের ছবি। আর ওর পায়ে ডেনিমের প্যান্ট– প্যান্টের পকেট উঁচু হয়ে রয়েছে।

চুনিলাল বারবার আমাকে দেখছিল, এবং অর্থপূর্ণ চোখে তাকাচ্ছিল ওর চ্যালার দিকে। চ্যালা এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়ল—অর্থাৎ, না। আমার মনে হল, চুনিলাল আমার হাতের নলকাটা শটগানের গুরুত্ব বোঝেনি। চ্যালা বুঝেছে। তাই গুরুকে বোঝাতে চাইছে।

আমি চ্যালাকে বললাম, জামা-প্যান্ট খোল—জলদি।

দু-জোড়া চোখ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কথা শুনল চ্যালা। আমার দিকে সাবধানী চোখ রেখে গেঞ্জি-প্যান্ট খুলে ফেলল। লোকটার পাকানো পেটানো চেহারা। মাথার চুল কদমছাঁট। এখন ওকে ভি.আই.পি. জাঙিয়ার বিজ্ঞাপনের মতো দেখাচ্ছে।

চুনিলাল ব্যানার্জি বোধহয় ধীরে-ধীরে সামলে উঠছিল। ঠান্ডা গলায় জিগ্যেস করল আমাকে, আপনি কে? কী চান এখানে?

আমি কয়েক সেকেন্ড ভাবলাম। তারপর বললাম, শুনলে খারাপ লাগবে, কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। আমি হীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি—একটু থেমে আবার বললাম, তা ছাড়া এই ঘর থেকে আজ সকালে গুলি চলেছে। একটা লোকের পিঠে গুলি লেগেছে। লোকটা উন্ডেড অবস্থায় লাল রঙের মারুতি ভ্যানে চড়ে রিভারভিউ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর রাস্তায় মারা যায়।

কথা বলতে বলতে আমি চুনির চ্যালা উলঙ্গনাথনকে পাশ কাটিয়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেছি। উঁকি মেরে দেখেছি নীচের কার পার্কের দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে শিবনাথ। এই জানলা দিয়ে গুলি চালানোটা নেহাত অসম্ভব নয়।

বোধহয় দু-তিন সেকেন্ড অমনোযোগী হয়েছিলাম। এবং সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে উলঙ্গ নাথন আমার শটগান লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ওকে আমি গুলি করতেই পারতাম। কিন্তু শটগানে নয়েজ পলিউশান হয়। দশটা লোক ছুটে আসতে পারে এই ঘরে। তারপর, সন্দেহ নেই, আমার কাজ পণ্ড হবে।

উলঙ্গনাথনকে দেখে যতই মাথামোটা মনে হোক, ও বোধহয় মনে-মনে ঠিক এই হিসেবটাই কষেছিল।

শটগানটা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল বিছানায়। আর একইসঙ্গে আমি উলঙ্গ নাথনের শরীরের একমাত্র পোশাক ঢাকা অঙ্গ লক্ষ করে তীব্র লাথি চালিয়ে দিয়েছি।

লাথি যে জোরেই লেগেছে সেটা যন্ত্রণার শব্দ শুনে এবং আমার ডান পায়ের ব্যথা অনুভব করে বোঝা গেল, কিন্তু লোকটা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে যায়নি। শুধু সামান্য কাবু হয়ে সামনে হাত চেপে ঝুঁকে পড়েছিল। আমি আর অপেক্ষা করিনি। পকেট থেকে মিনি ডাম্বেল বের করে শক্ত মুঠোয় ধরেছি, এবং পরক্ষণেই বাতাসে এক সুদীর্ঘ বৃত্তচাপ রচনা করে ইস্পাতের বল মারাত্মকভাবে আঘাত করল উলঙ্গনাথনের শক্ত বুকে।

হাড় ভাঙার শব্দ হল বোধহয়। উলঙ্গনাথন হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল কার্পেটের ওপরে। আমি ডাম্বেল ফেলে দিলাম হাত থেকে। খালি হাতের লড়াইয়ের বিখ্যাত বই কিল অর গেট কিড় এর পঞ্চাশ পৃষ্ঠার নির্দেশ অনুযায়ী দু-হাতে প্রচণ্ড চাপড় মারলাম উলঙ্গনাথনের দুকানের ওপরে। বেশ জোরে শব্দ হল। জানি, এই শব্দ উলঙ্গনাথনের কানে বাজ পড়ার শব্দের মতো শুনিয়েছে। এবং ওর দু কানের পরদা নিশ্চয়ই ফেটে গেছে।

উলঙ্গনাথনের চোখ উলটে গেল। ও চিৎ হয়ে পড়ে গেল কাপের্‌টের ওপরে। ওর তামাটে বুকের মাঝখানে একটা জায়গা কালচে-নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

চুনি ব্যানার্জি ভয়ার্ত চোখে নিথর হয়ে পড়ে থাকা উলঙ্গনাথনকে দেখছিল। আমি ডাম্বেলটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখলাম। শটগানটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম চুনির কাছে। উলঙ্গনাথনকে দেখিয়ে বললাম, এটাকে কোত্থেকে জোগাড় করেছেন? যদি গ্যারান্টি পিরিয়ডের মধ্যে থাকে তা হলে সেখানে জমা দিয়ে রিপেয়ার করিয়ে নেবেন।

আমার কথা চুনির মাথায় কতটা ঢুকল কে জানে। ও বড়-বড় চোখে ফ্যালফ্যাল করে আমাকে দেখছিল। বোধহয় ভাবছিল, একটু আগের দেখা ঘটনাগুলো স্বপ্ন, না সত্যি।

আমি আর দেরি করলাম না। চুনির কলার চেপে ধরে শটগানটা ওর মুখের কাছে নিয়ে এলাম। দাঁতে দাঁত চেপে জিগ্যেস করলাম, কে গুলি চালিয়েছে এ-ঘর থেকে?

চুনি ব্যানার্জি হাঁপাতে লাগল। ওর গলা বন্ধ হয়ে এল। কোনওরকমে বলল, সুরিন্দার গুলি করেছে।

কে সুরিন্দার?

মেঝেতে পড়ে থাকা উলঙ্গনাথনকে দেখাল চুনিলাল : ও গুলি করেছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, মেশিনটা কোথায়?

ওর প্যান্টের পকেটে আছে।

আমি মেঝেতে পড়ে থাকা প্যান্টটার দিকে তাকালাম। ওর পকেটে বড়জোর একটা রিভলভার থাকা সম্ভব। ওই রিভলভার দিয়ে তিনতলা থেকে লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব। তা ছাড়া রিভলভার থেকে ছোঁড়া গুলি কখনও ওই দূরত্বে লালুর দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করতে পারত না।

আমি চুনিলালকে দেখলাম এক পলক। ওর ঘোট ছটফট করছে। ঠোঁট কাঁপছে। কিছু একটা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

চিন্তা করে দেখলাম, নলকাটা শটগানটা যদি ওর মুখের ভেতরে গুঁজে দিয়ে ফায়ার করি তা হলে শব্দ তেমন জোরে শোনা যাবে না।

সে-কথাই বললাম চুনিকে। ও কী একটা বলতে গিয়ে ঠোঁট ফাঁক করল। সঙ্গে-সঙ্গে শটগানটা আমি ওর দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলাম। একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরিয়ে এল চুনির মুখ থেকে। চোখ আবার মাপে বড় হয়ে গেল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, শব্দ কম হবে বটে তবে এই ঘরের দামি কার্পেটটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, গুলিটা যখন আপনার মাথার পেছন দিয়ে বেরোবে তখন মাথার ঘিলু টিলু, রক্ত, হাড়ের কুচি, সবই ছিটকে বেরোবে তার সঙ্গে। কিন্তু কী করব, উপায় নেই– তারপর হাসি থামিয়ে ধমকের সুরে বললাম, শিগগির বলুন, মেশিনটা কোথায় রিভলভার দিয়ে সুরিন্দার ও কাজ করেনি।

আমি কথা বলতে-বলতে চুনিলালের ফরসা গালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম। তখন টের পেয়েছি ওর গালের পেশি কাঁপছে। সেটা স্বাভাবিক। আমি মোটেই অবাক হইনি। কিন্তু অবাক হলাম ওর তিলটা লেপটে গালে মাখামাখি হয়ে গেছে দেখে। নকল তিল!

আমি স্থির চোখে চুনিলাল ব্যানার্জিকে দেখতে লাগলাম। এখন বুঝতে পারছি, চায়ের দোকানের সেই উঠতি রংবাজ নেহাত মিথ্যে বলেনি। চুনি ব্যানার্জি সত্যিই বহুত খতরনাক লোক।

আমি শটগানটা টেনে বের করে নিলাম ওর মুখ থেকে। টানের হ্যাঁচকায় একটা দাঁত পড়ে গেল মেঝেতে। কিছুটা রক্তও বেরোল।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, মেশিনটা কোথায়?

আগে মেশিন, পরে তিল।

নকল চুনি আঙুল তুলে বিছানাটা দেখাল।

আমি সুরিন্দারের বুকের ওপরে পা দিয়ে ওর দেহ ডিঙিয়ে গেলাম। তারপর একটানে উলটে দিলাম বিছানায় তোশক। সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলাম মেশিনটা। থ্রি-নট-থ্রি উইনচেস্টার, টেলিস্কোপ লাগানো। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের খতম করার জন্যে এই ধরনের দূরপাল্লার মেশিন ব্যবহার করা হয়।

মেশিনটা বাঁ-হাতে তুলে নিলাম। ফিরে গেলাম নকল তিলের কাছে। সুরিন্দারকে লাথি কষানোর পর থেকে ডান পা-টা একটু টনটন করছে।

নকল চুনি এখন ভয়ে কাঁপছে। কাঁপারই কথা। আমার ডান হাতে শটগান, বাঁ-হাতে থ্রি নট থ্রি, পকেটে সাইলেন্সার লাগানো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, আর সেই মারাত্মক ডাম্বেল। এসব দেখে এবং জেনে ভয় পাওয়ারই কথা। তা ছাড়া সামনেই পড়ে রয়েছে সুরিন্দারের ড্যামেজড বডি।

তোর নাম কী?

আমার প্রশ্ন করার ভঙ্গিই লোকটাকে জানিয়ে দিল এ-প্রশ্ন দ্বিতীয়বার আমি করব না।

ও চটপট বলল, রমেন হালদার।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, আমার হাতে সময় বেশি নেই। গোটা গল্পটা তাড়াতাড়ি বল। কথা শেষ করার সময় শটগানটা খানিকটা ওপরে তুললাম।

রমেন আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুলে আঁতকে উঠল। বলল, বলছি, সব বলছি–মুখটা ধুয়ে আসি।

বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল রমেন। তারপর একরকম টলতে-টলতে বিছানার ওপরে গিয়ে বসে পড়ল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে ছুঁড়ে দিল একপাশে। মাথার চুলে দু-বার হাত চালিয়ে বলল, আপনি কে জানি না। তবে মনে হচ্ছে চুনিদা আপনার সঙ্গে এঁটে উঠবে না।

আমি চুনিদার কথা মতো এই মেকাপ নিয়ে কাল থেকে এই ঘরে এসে উঠেছি। আর সুরিন্দার বলে এই লোকটা সবসময় আমার সঙ্গে রয়েছে। চুনিদা বলছিল, আমার ওপরে অ্যাটাক হতে পারে। কিন্তু কী করব! দশ হাজার টাকা দিয়েছে আমাকে। মাথা ঝাঁকাল রমেন। তারপর বলল, বিশ্বাস করুন, কাল থেকেই ভয়ে-ভয়ে আছি—।

মারুতি গাড়ির লোকটাকে সুরিন্দার খতম করল কেন?

বলছি, বলছি। একটু দম নিল রমেন : আজ সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে ব্লু গার্ডেনে গিয়েছিলাম। চুনিদা বলেছিল মাঝে-মাঝে ঘরের বাইরে বেরোতে, লোকজনকে দেখা দিতে যাতে সবাই আমাকেই আসল চুনিলাল ব্যানার্জি ভাবে। তো ব্রেকফাস্ট সেরে চলে আসছি—তখন কটা হবে? বড়জোর সাড়ে নটা কি দশটা হঠাৎই মাইকেল ডিসুজা নামে দাড়িওয়ালা একটা লোক সুরিন্দারকে ডেকে নিয়ে কী যেন বলল। তখন সুরিন্দার আমাকে এসে বলল, একটা লেজুড় লেগেছে। ওটাকে খতম করতে হবে। সুরিন্দারকে আমি চিনি না—আগে কখনও দেখিনি। তো আমি ঘরে ফিরে এলাম, কিন্তু সুরিন্দার কীসব খোঁজখবর করতে চলে গেল। অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রমেনবাবু কেস খারাপ। ওই ফেউটা আপনার মেকাপের ব্যাপারটা কী করে যেন জানতে পেরে গেছে। ও এখন ফিরে গিয়ে মিত্তিরসাহেবকে খবর দিলেই মুসিবত।

আবার দম নিতে থামল রমেন। ওর ভয়ার্ত চোখ-মুখ বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। এসব ছাপোষা লুড়োখেলা লোককে কেন যে এই খুন-খুন খেলার মধ্যে টেনে আনা কে জানে!

হালদার আবার বলতে শুরু করল, ব্যস, তারপর থেকেই এই জানলায় রাইফেল তাক করে বসে রইল সুরিন্দার। অনেকক্ষণ পর চারবার ফায়ার করল শুনলাম। আমার তখন মাথা ঝিমঝিম করছিল। সুরিন্দার হাসি মুখে আমার কাছে এসে বলল, পাখির গায়ে গুলি লেগেছে। কিন্তু কী করে যে শালা ওই হালতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল কে জানে! চুনিবাবুকে খুশখবরিটা জানিয়ে দিন।

রমেন হালদার এখন রীতিমতো কঁপছে। মানুষ খুন করাটা কোনওদিনই ওর সিলেবাসের মধ্যে ছিল না।

আমি প্রশ্ন করলাম, চুনি ব্যানার্জিকে কী করে খবর দেন আপনি?

টেলিফোনে।

কোথায় ফোন করেন?

আমার ঘরের উলটোদিকের দুশো আঠেরো নম্বর ঘরে। চুনিদা ওই ঘরেই আছে কাল থেকে। ভাঙা দাঁতের জায়গাটায় জিভ বুলিয়ে নিল রমেন।

আমার হাসি পেয়ে গেল। কী চমৎকার ব্যবস্থা! শরদিন্দু মিত্র বোধহয় এরকম হিসেবের কথা ভাবেননি। কিন্তু এখন আমার সত্যিকারের চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। রিসেপশানের খবর অনুযায়ী দুশো আঠেরো নম্বর ঘরেই রয়েছে হীরা, আর তার সঙ্গে হীরার মাশুক চুনি।

আমার গলা খুসখুস করছিল। একটু ভেজাতে পারলে ভালো হত। সে-কথাই বললাম রমেনকে। ও মাথা নাড়ল—ঘরে স্টক নেই।

থ্রি-নট-থ্রি-টা এতক্ষণ ধরে ঝুলিয়ে রেখে বাঁ-হাতটা টনটন করছিল। ওটা রেখে দিলাম তোশকের নীচে। বিছানাটা আবার ঠিকঠাক করে দিলাম। রমেনকে বললাম সবুজ পরদাটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিতে। ও চটপট কথা শুনল। এরকম প্রভুভক্ত লাখে একটা পাওয়া যায়।

চুনি ব্যানার্জিকে ফোন করে এ-ঘরে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? এবং স্বাভাবিকভাবেই ফোনটা করতে পারে রমেন হালদার। অতএব রমেনকে বললাম ফোন করতে।

ঘরের উত্তরদিকের দেওয়াল ঘেঁষে টেলিফোন। রমেন রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাল। ইন্টারকম লাইনের ব্যবস্থা। সুতরাং তিনটে সংখ্যা ঘোরালেই কাজ হয়।

আমি টেলিফোনের কাছে এগিয়ে যেতে চাইলাম। কারণ সম্ভব হলে দু-প্রান্তের কথাই আমি শুনতে চাই। কিন্তু আমার অগ্রগতিতে বাধা দিল সুরিন্দার। ওর পড়ে থাকা নিথর দেহটাকে এতক্ষণ কোনও আমল দিইনি আমি। না দিয়ে যে ভুল করেছি সেটা এখন বুঝলাম।

সুরিন্দার পেশাদার। হয়তো ও চোখ খুলেছে কয়েক মিনিট আগেই, এবং বেশ খুঁটিয়ে আমাকে এবং আমার হাতে ধরা অস্ত্রশস্ত্রকে লক্ষ্য করেছে। তাই প্রথম হ্যাঁচকাটা মারল আমার ডান পা ধরে। আর প্রায় একইসঙ্গে আমার হাতের শটগান ধরে টান মারল।

সুরিন্দার জানে না আমিও পেশাদার। ও যে পাঠশালায় পড়েছে সেখানে পড়াশোনা করলে আমি নির্ঘাত ডবল প্রমোশন পেতাম। সুতরাং ওর হ্যাঁচকা টানে টাল খেয়ে পড়ে যেতে-যেতেই শটগানের ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিলাম। কারণ নয়েজ পলিউশানের চেয়ে প্রাণের দাম বেশি।

গুলির শব্দ হল। তবে আওয়াজটা যত জোরে শোনাবে ভেবেছিলাম ততটা শোনাল না। সুরিন্দার শটগান ধরে টান মেরেছিল। তবে ও ভাবেনি ওই বেটাল অবস্থাতেও আমি ফায়ার করতে পারব।

না, গুলি সুরিন্দারের গায়ে লাগেনি। গুলি গিয়ে বিঁধেছে কার্পেটে। তবে গুলি ছোঁড়ার পরক্ষণেই শটগানের নল চেপে ধরেছিল সুরিন্দার। তাই ওর হাত পুড়ে গেছে। ও যতটা ক্ষিপ্রভাবে আমাকে আক্রমণ করেছিল তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ফিরিয়ে নিল ছ্যাকা খাওয়া হাতটা।

আমি পড়ে গিয়েছিলাম মেঝেতে। শটগানও ছিটকে গেছে হাত থেকে। কিন্তু সুরিন্দারের ছ্যাকা খাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বাড়তি দু-তিন সেকেন্ড সময় দিয়েছে। তাই-ই যথেষ্ট। কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করেই পা চালালাম। বোধহয় সুরিন্দারের মাথায় লাগল। কিন্তু ও দমল না। স্বাস্থ্যবান শরীরটাকে বেঁকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায় কোণে। ও জানে, তোশক ওলটালেই দূরপাল্লার মেশিনটা ওখান থেকে পাওয়া যাবে।

মেশিনটা সুরিন্দার পেল। কিন্তু ততক্ষণে সাইলেন্সার লাগানো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন আমি পকেট থেকে বের করে ফেলেছি, এবং নিশানা নির্ভুল করার ব্যাপারে কোনওরকম চেষ্টা না করেই ট্রিগার টিপেছি।

গুলি সুরিন্দারের উরুতে লাগল। ও কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। যন্ত্রণার দু-একটা টুকরো চিৎকার বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে।

এবার আমি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় পেলাম। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পকেটে ঢুকিয়ে একটু দূরে পড়ে থাকা শটগানটা তুলে নিলাম। মনের ভেতরে একটা ঠান্ডা রাগ কাজ করছিল। এই সুরিন্দার নামের শুয়োরের বাচ্চাটাকে কোথা থেকে তুলোধোনা শুরু করব? মাথা থেকে, না পা থেকে?

আমি সুরিন্দারের কাছে এগিয়ে গেলাম। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, রমেন ফোনে কথা বলা শেষ করে ফোন নামিয়ে রেখে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

ফ্রিজ! আমি চেঁচিয়ে হুকুম দিলাম। আমার শটগান রমেনের বুক দেখছে।

রমেন থেমে গেল মাঝপথে। ভয়ে কেঁপে যাওয়া গলায় বলল, প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন। চুনিদা আসছে এ-ঘরে। প্লিজ...।

আমি সুরিন্দারের বুকে এক লাথি কলাম। অমিতাভ শিকদারের সঙ্গে যারাই মোকাবিলা করে তারা জীবনভর সে কথা ইয়াদ রাখে। ওঁক শব্দ করল সুরিন্দার। আঘাত সামলাতে

চিৎ হয়ে গেল। ওর উরু থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

আমি সুরিন্দারের বহু যত্নে বানানো পেশি ও হাড় দেখছিলাম। কী অযত্নেই না আমি এখন এগুলো চুরমার করব! সাপের বাচ্চাকে মাথা না থেতলানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

সুতরাং শটগানটাকে উলটো করে বাগিয়ে ধরে সুরিন্দারের পাঁজরের মোক্ষম জায়গায় বসিয়ে দিলাম। সুন্দর শব্দ হল—পাকাটি ভাঙার মতো। সুরিন্দার চেঁচাল প্রাণপণে। আর একইসঙ্গে টুং টাং শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল।

আমার চোখেমুখে বোধহয় খুন চেপে গিয়েছিল। কারণ রমেন ছুটে এসে আমাকে একরকম জড়িয়ে ধরল। বলল, চুনিদা এসে গেছে। ওকে এবার ছেড়ে দিন, প্লিজ।

আমি এক ধাক্কায় রমেনকে দরজার দিকে ঠেলে দিলাম। তারপর শটগান বাগিয়ে ধরে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। জীবনমরণের খেলা আমাকে একধরনের বিকৃত আনন্দ দেয়। স্পষ্ট টের পাচ্ছি, আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু মাথা বরফের মতো ঠান্ডা।

রমেন প্রথমে দরজা সামান্য ফাঁক করল। তারপর দরজা খুলে দিয়েই একপাশে সরে দাঁড়াল। আসল চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরে ঢুকেই দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল। ভুরু কুঁচকে চারপাশটা দেখল। পরিস্থিতি আঁচ করল বোধহয়। তারপর রীতিমতো শান্ত গলায় বলল, রমেন, সুরিন্দারকে ফার্স্ট এইড দাও। কোনওরকমে ম্যানেজ করো। আমি এখন আর বাড়তি ঝামেলা চাই না।

চুনি ব্যানার্জির কথায় ব্যক্তিত্বের ছাপ টের পেলাম। এই লোকের পক্ষেই মিত্র সাহেবের ডানহাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সুরিন্দারের এখন হয়তো লাস্ট এইড প্রয়োজন।

চুনিলালের চোখে রিমলেস চশমা নেই। মাথার চুলও ব্যাকব্রাশ করা নয় সামান্য এলোমেলো। বোধহয় আলতো ছদ্মবেশ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফটোর চেহারার সঙ্গে মিলছে পুরোপুরি।

আমার দিকে, আমার হাতের দিকে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় চুনি বলল, মিস্টার শিকদার, আমার ঘরে চলুন–সেখানে বসে আমরা নিরিবিলি কথা বলতে পারি।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে চুনিলাল বলল, কোনও প্রশ্ন নয়–অন্তত এখানে। আমি চাই আমাদের কথাবার্তা নিরিবিলিতে হোক। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা হলে শটগানটা কি লুকিয়ে ফেলবেন? আমার চোখে বোধহয় দ্বিধা ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করেই চুনি আরও বলল, না, ভয় নেই। আমাকে আপনি সুরিন্দারের মতো মূর্খ ভাববেন না। আপনার নাম যারা জানে তারা অন্তত বোকার মতো ঝুঁকি নেবে না।

আমি এতক্ষণে হাসতে পারলাম। নিজের কোম্পানির জন্য জুতসই ডেপুটি ম্যানেজার বাছতে কোনও ভুল করেননি শরদিন্দু মিত্র। সুতরাং শটগানটা জায়গা মতো গুঁজে নিয়ে চুনি ব্যানার্জির কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, চলুন, নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যাক।

ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম হাসল চুনি। আমার হাতে হাত মেলাল।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। এক্ষুনি ভেজানো দরকার। শুকনো গলায় বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। আশা করি দুশো আঠেরো নম্বর ঘরটা মরুভূমি নয়।

দুশো তিন নম্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে কোনওরকম শোরগোল বা ভিড় নজরে পড়ল । না, গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পায়নি। তা ছাড়া ব্লু গার্ডেনে মাইকেলের সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তার জম্পেশ ধুমধাম এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। সেই আওয়াজে আমার তৈরি নয়েজ পলিউশান দিব্যি চাপা পড়ে গেছে। দূষণ দিয়েই দূষণকে ঢাকতে হয়।

চাবি ঘুরিয়ে দুশো আঠেরো নম্বর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে চুনি প্রশ্ন করল, শরদিন্দু মিত্র আপনাকে পাঠিয়েছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। একটু চুপ করে থেকে যোগ করলাম, হীরাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আর আপনিও আমার সঙ্গে গেলে ভালো হয়। মিত্র সাহেব আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ করার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

অবাক চোখে আমার দিকে ফিরে তাকাল চুনি। বলল, তাই? তারপর করিডরে দাঁড়িয়েই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একটা মেয়ে বীভৎস সেজেগুজে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হাসির শব্দে চোখ ফিরিয়ে দেখল আমাদের দিকে।

আমি বিব্রতভাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, মেয়েটা আমাকে লক্ষ্য করে বাঁকা হেসে। চোখ মারল।

নাঃ, হোটেল রিভারভিউর জবাব নেই!

.

চুনি ব্যানার্জির কাছ থেকে গোটা গল্পটা শুনলাম।

দুশো আঠেরোর সঙ্গে দুশো তিনের একমাত্র মাপ ছাড়া সাজসজ্জায় আর কোনও তফাত নেই। ভেড়ার লোমের মতো হালকা বাদামি কার্পেটে মেঝে ঢাকা। ঘরে তিনরকম আলো। তার মধ্যে নৈশবাতির চেহারাটা টেডি বিয়ারের মতো। আসবাবপত্র সবই অভিজাত। সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিল, তার মাথায় প্রসাধন বাতি। চওড়া আধুনিক খাট, তার ওপরে পরিপাটি বিছানা। বিছানার চাদর, দেওয়ালের ডিসটেম্পার ও কার্পেট—এই তিনের রঙে মানানসই মিল।

ঘরে একটিমাত্র ছোট মাপের ফ্লুওরেসেন্ট বাতি জ্বলছিল। সেই কারণেই একটা নিষ্প্রভ ভাব ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। তারই মধ্যে নীচু লয়ে শোনা যাচ্ছে চ্যানেল মিউজিক।

দুটো সোফায় মুখোমুখি বসলাম আমরা। সামনে ছোট টেবিল। টেবিলে গ্লাস। গ্লাসে হুইস্কি। সেই হুইস্কি সঞ্জীবনী ঝরনা হয়ে আমার মরুভূমি-গলা বেয়ে নামছে। কেমন যেন

এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বসে আমি চুনি ব্যানার্জির কথা শুনছিলাম।

ঘরে হীরা নেই। সেটা আমাকে অবাক করেছে। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিনি। সময়মতো করা যাবে।

চুনি ব্যানার্জি পানীয় নেয়নি। তার বদলে সিগারেট ধরিয়েছে। বোধহয় মাথা ঠিক রাখতে চায়–অন্তত এরকম বিপদের সময়ে।

মিস্টার শিকদার, আপনি হয়তো আমার গল্পের অনেকটাই জানেন– চুনিলাল বলতে শুরু করল।

আমি হীরাকে তখনও খুঁজে চলেছি। নাক টানছি বাতাসে যদি খুঁজে পাই পারফিউম পাউডার কিংবা শ্যাম্পুর গন্ধ।

আমি লোকটা খুব সুবিধের নই– ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চুনিলাল বলল, তবে আপনার মতো অতটা এলেমদার নয়। হীরাকে আমি ভালোবাসি। অনেকদিন ধরেই ভালোবাসি। তাই শেষ পর্যন্ত গতকাল ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি মিত্রভিলা থেকে। বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। শরদিন্দু মিত্রকে আপনি কতটা চেনেন জানি না, কিন্তু আমি চিনি।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চুনি। সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে শার্টের পকেট থেকে চশমা বের করে নাকের ওপরে বসাল। হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করল। ওর চেহারাটা এবার নজর মহম্মদের দেওয়া ফটোগ্রাফের মতো হয়ে গেল।

বলুন, আমি শুনছি কান দিয়ে গেলাসে চুমুক দিচ্ছি না।

চুনিলাল হাসল। দুঃখের হাসি। বলল, মিত্রসাহেব তো কান দিয়ে দেখেন–রাজাদের মতো। তাই আমার সঙ্গে হীরার প্রেম মেনে নিতে পারেননি। ওঁর কানে কেউ খবর পৌঁছে

দিয়েছে, আমি নাকি খুব বাজে টাইপের লোক। মাতাল, অপদার্থ, দীর্ঘশ্বাস ফেলল চুনি। ঘরের সিলিংয়ের দিকে বারদুয়েক তাকিয়ে পায়চারি করতে করতে বলল, সে যাই হোক, হীরাকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি, বিয়েও করে ফেলেছি। ও এখন আমার। ওকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। যদি আপনি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তা হলে আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে, মিস্টার শিকদার। আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

আমার ঠোঁটে বোধহয় সামান্য বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে চুনি বলল, জানি, আমার বয়েসটার কথা ভেবে আপনার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু আপনার জানা উচিত, ভালোবাসার সঙ্গে বয়েসের কোনও সম্পর্ক নেই।

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বলা হয়ে উঠল না আর।

কারণ বাথরুমের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। প্রথমেই একটা বিলিতি সুগন্ধী আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। আর তারপরই হীরার সৌন্দর্য ধাক্কা মারল রীতিমতো।

এরকম এক সুন্দরীকে দেখার জন্যে সাতজন্ম সাগরতীরে বসে অপেক্ষা করা যায়। নজর মহম্মদের দেওয়া ছবিটা যেন লজ্জায় নতজানু হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। যেন বলতে লাগল, আমি তো কেবলই ছবি, তুমি তো জীবন–।

চুনিলাল ইশারায় আমার দিকে দেখিয়ে বলল, হীরা, ইনিই অমিতাভ শিকদার। এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

আমার হাতের গ্লাস থেমে গিয়েছিল শূন্যে। এবার সচেতন হয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম টেবিলের ওপরে। দেখতে লাগলাম হীরাকে।

পরনে বেগুনি-সাদা নকশাকাটা সালোয়ার কামিজ। মাথায় সাদা তোয়ালে জড়ানো। নাকে নাকছাবি জ্বলছে। সেইসঙ্গে গভীর দু-চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হয়তো কাগজের বিয়ে হয়ে গেছে।

জোড়হাতে নমস্কার করে ঘাড় কাত করে দেখল আমাকে। বুকের ভেতরে একটা তরুণ বুলবুলি উড়ে গেল আমার। সুদীর্ঘ একযুগ ধরে মরে হিম হয়ে যাওয়া পাখিটা কী করে আচমকা বেঁচে উঠল কে জানে!

এক মিনিটের মধ্যেই চুলের পরিচর্য্যা সেরে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল হীরা। চুনি ওকে সোফায় বসতে বলল। তারপর আমাকে লক্ষ করে বলল, ওর কাছে লুকোনোর কিছু নেই। ওর সামনেই সব বলছি। আগেই আপনাকে বলেছি, আমি লোক খুব সুবিধের নই। ঢিল ছুড়লে তার বদলে পাটকেল মারতে জানি। তাই হীরাকে নিয়ে মিত্রভিলা ছাড়ার আগে থেকেই আমি লোকজন ঠিক করে রেখেছিলাম। তা ছাড়া মিত্র সাহেবের অনেক গোপন খবরও আমার কানে আসে। সেরকম লোক আছে—যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

মিস্টার শিকদার, আপনার খবরটাও লোক মারফতই পেয়েছি। আর তখনই একটু ভয় পেলাম। কারণ, আপনার সম্পর্কে কিছু-কিছু আমি জানি। হীরার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও অবশ্য কিছু জানে না।

আমার সামনে বসে থাকা মেয়েটা অদ্ভুত মিষ্টি গলায় বলে উঠল, কেন, আপনি কি ডেঞ্জারাস লোক?

প্রশ্নটা আমাকেই করা হয়েছে। বোধহয় জীবনে এই প্রথম আমার জিভ আড়ষ্ট হল, নজর হয়ে গেল বিব্রত। কোনওরকমে বলাম, এসব বাজে কথায় কান দিতে নেই।

চুনি বলল, আমার কিছু চ্যালাচামুণ্ডা আছে। তাদের নিয়ে শরদিন্দু মিত্রকে আমি এতদিন কম সাহায্য করিনি। এখন সাহায্যের দরকার হল আমারই। রমেন হালদারের সঙ্গে আমার চেহারা কিছুটা মেলে। ও লম্বা-চওড়ায় আমারই মতো। তাই ওকে আমার মতো করে সাজিয়ে তুলে দিলাম দুশো তিন নম্বর ঘরে। সঙ্গে সুরিন্দার—বন্দুকবাজ সুরিন্দার। আমি জানতাম কেউ না কেউ আসবে আমাকে খতম করতে। এসেছিল। জনার্দন সামন্ত। ওকে

রেস্তোরাঁয় দেখামাত্রই আমি চিনতে পেরেছি। তা ছাড়া মাইকেল ডিসুজারু গার্ডেনে গান গায়...।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ছড়া কেটে পায় সুখ, দাড়িগোঁফ এক-মুখ—।

চুনি হাসল। বলল, পরিচয় হয়েছে তা হলে? ওই মাইকেল হল সুরিন্দারের পুরোনো চেনা লোক। মাইকেলের কাছ থেকেও সুরিন্দার জানতে পারে জনার্দন সামন্ত আমার খোঁজখবর করছে। তখন ও জনার্দনকে খতম করার ব্যবস্থা নেয়—।

লাল মারুতির লালুর নাম তা হলে জনার্দন সামন্ত।

জনার্দন হল শরদিন্দু মিত্রের পুরোনো ভাড়াটে গুণ্ডা। অনেকবার ওর নাম শুনেছি। যাই হোক, তারপর আমরা আপনার খবর পাই—যে আপনি রিভারভিউতে এসে উঠেছেন। এরপর তো সবই জানেন—।

আমি গ্লাসের তরলটুকু এক ঢোকে গলায় ঢেলে দিলাম। বললাম, চুনিবাবু, আমরা রীতিমতো ভাগ্যবান যে, এ-পর্যন্ত মাত্র একটাই লাশ পড়েছে—শুধু জনার্দন সামন্ত খরচ হয়েছে। আর সুরিন্দার খরচ হয়েছে আধাআধি। এ-ব্যাপারে আর বডি পড়ুক তা আমি চাই না। আপনি টেলিফোন করে মিত্র সাহেবের সঙ্গে মিটমাট করে নিন। তা হলে আমিও একটা অস্বস্তির হাত থেকে বেঁচে যাই। তখন আমি অন্য ক্লায়েন্ট খুঁজব।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এইবার কথা বলল হীরা।

মিস্টার শিকদার, আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু ও কিছুতেই আমার কথা শুনছে না। আমি বলেছি, বাপি আমাদের ভালো চায়। আমরা ফিরে গেলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে কথা কে শোনে।

চুনি অধৈর্যভাবে একটা শব্দ করল।

আমি বললাম, কথাটা বোধহয় ঠিক, চুনিবাবু। কারণ, আবার বলছি, আমি নিজের কানে শুনেছি, মিত্র সাহেব আপনাদের আশীর্বাদ করার জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি টেলিফোনে কাকে যেন বলছিলেন।

চুনিলালের চোখ কপালে উঠল। ভুরুর ওপরে ভাঁজ পড়ল। বলল, সত্যি? আসলে আমি একটা এমন ব্যাপার জেনেছি যেটা কাউকে বলতে পারছি না।

কী ব্যাপার? হীরা আকুল হয়ে জানতে চাইল। সুন্দর চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।

তোমাকেও বলা যাবে না। গম্ভীরভাবে জবাব দিল চুনি। তারপর বউকে সাফাই দেবার সুরে বলল, কিছু মনে কোরো না। সময় হলেই সব বলব।

এবারে লাখ টাকার প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল চুনিলাল ও মিস্টার শিকদার, এখন সবকিছুই আপনার হাতে। বলুন, এখন কী করবেন?

আমার মনে এক অদ্ভুত তোলপাড় চলছিল। কী করব এখন আমি?

এমন সময় দরজায় নক করল কেউ। তারপর কলিংবেল টিপল।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল চুনিলাল। বলল, কে এল? এখন তো কারও আসার কথা নয়!

আমি শটগানটা ঝটিতি বের করে নিলাম। দৌড়ে গিয়ে দরজার পাশে পজিশন নিলাম। চুনিলালও পকেটে হাত ঢোকাল। হীরাকে ইশারা করল বাথরুমে গিয়ে ঢুকতে। তারপর এগিয়ে গেল দরজার কাছে। চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, কে? কী চাই?

দরজার ওপিঠ থেকে উত্তর এল? আমি, খুদে–।

আমার মাথার ভেতরে যুক্তি-বুদ্ধির একটা ঘুড়ি লাট খেতে শুরু করল। খুদে? এখানে?

চুনিলাল হাসল। আমার দিকে ফিরে বলল, বলেছিলাম না, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! খুদেই আমাকে সব খবর দেয়। ও মিত্র সাহেবের লোক।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, জানি।

দরজা খুলে দিল চুনি। এবং খুদে ঢুকে পড়ল ঘরে। চাপা গলায় বলল, খবর আছে, চুনিবাবু–বলেই আমার দিকে তাকাল। ওর চোখের নজর দেখেই বোঝা গেল, সকালের থাপ্পড়টা ও ভোলেনি। না ভোলাটাই স্বাভাবিক। আমার শিক্ষা কেউ সহজে ভোলে না।

শটগানটা আমি লুকিয়ে ফেললাম আবার। লক্ষ করলাম, খুদের চোখ ঘরটাকে জরিপ করছে। বোধহয় হীরাকে খুঁজছে।

নজর মহম্মদের কাছ থেকে হীরা ও চুনির গল্প শোনার সময় আমার কেমন যেন খটকা লেগেছিল। এখন চুনিলালের কথা শুনে আর খুদেকে এখানে দেখে সেই খটকা আরও জোরদার হল।

খুদে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ওকে বসতে বলে চুনি আমার কাছে সরে এল। বলল চাপা গলায়, মিস্টার শিকদার, এখন আপনি ভরসা। আমি জানি মিত্র সাহেব এখন আমার ওপরে যেভাবে খুশি যেমন খুশি আক্রমণ চালাবেন। হীরার জন্যে উনি ভাবেন, আমার জন্যে না। আপনি একটু পরে আবার আসবেন। কথা আছে।

আমি বললাম, আপনি কথা বলে নিন। আমি দুশো সাত নম্বরে আমার ঘরে আছি। কথা শেষ হয়ে গেলেই আমাকে একটা ফোন করে দেবেন–।

একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। হীরার কথাটা কানে ভাসছিল : কেন, আপনি কি ডেঞ্জারাস লোক?

এ-প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই জানি না।

.

টেলিফোন এল মিনিট কুড়ি পরেই। এবং ফোনটা করল হীরা।

চ্যানেল মিউজিক চালিয়ে বিছানায় শুয়ে আয়েস করছিলাম। টেলিফোন ধরার পরই হাত পা কাঁপতে লাগল অদ্ভুতভাবে। কারণ হীরা কথা বলছে অস্বাভাবিক সুরে। একটা ভেজা চড়ুই শীতের রাতে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শিগগির আসুন! শিগগির—প্লিজ–।

এই কণ্ঠস্বর যখন ডাকে তখন হিমালয় থেকে কোনও হঠযোগীও ছুটে আসে। সুতরাং আমিও যে হঠকারী হয়ে ছুটে যাব সে আর বেশি কী!

চোখের পলকে তৈরি হয়ে দুশো আঠেরো নম্বরের দরজায় পৌঁছে দেখি দরজা বন্ধ। কলিংবেল টেপামাত্রই দরজা খুলে দিল হীরা। ওর কান্না-ভেজা ভয়ার্ত মুখ আমাকে বিপন্ন করে তুলল। ভয় পাওয়া মুখও এত মিষ্টি।

ঘরে ঢুকেই পায়ের ধাক্কায় দরজা বন্ধ করে দিলাম। আর একইসঙ্গে চোখে পড়ল ঘরের বাঁ দিকের কোণে চুনি আর খুদে ঘোড়া-ঘোড়া খেলছে। চুনি হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে কার্পেটের ওপরে। আর ওর পিঠের দু-দিকে পা রেখে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে খুদে। খুদের দু-হাতে নীল রঙের নাইলনের দড়ি। দড়ির লাগামটা চুনিলালের গলায় লাগিয়ে খুদে টানছে। চুনির চোখ মুখ টকটকে লাল। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, হাতে আর সময় নেই।

ওই অবস্থাতেও খুদে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু ওর দড়ির টান এতটুকুও শিথিল হল না।

লক্ষ করলাম, হীরার কপালের একটা পাশ ফুলে উঠেছে। সেখানে রক্তের দাগও রয়েছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কোনওরকমে বলল, ওকে বাঁচান!

প্লিজ!

আমার মাথার মধ্যে অঙ্ক কষার কাজ চলছিল। খুদের ভূমিকাটা আমার মাথার মধ্যে ঠিক পরিষ্কার হচ্ছিল না। ও কার হয়ে কাজ করছে? ওর একটু আগের বেপরোয়া হাসি বলে দিচ্ছে। আমরা একই লোকের হয়ে কাজ করছি। সে লোকটির নাম শরদিন্দু মিত্র। কিন্তু মিত্র সাহেবের কথার সঙ্গে যে এই মুহূর্তের গল্পটা মিলছে না। চুনিকে যদি খতম করারই দরকার ছিল তা হলে আমাকে ডাকা হয়েছে কেন?

হীরা এবার হাউহাউ করে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। বলল, অমিতদা, অমিতদা, ওকে বাঁচান–।

আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল।

ঘরের নরম আলো, হালকা চ্যানেল মিউজিক আর সামনের ওই বীভৎস ঘোড়া-ঘোড়া খেলা আমার বুকের ভেতরে ঝড় তুলেছিল। সেই ঝড়ে যখন বনের গাছপালা উথালপাথাল কাঁপছে তখনই মেয়েটার ওই দাদা ডাক তাতে দাবানল জ্বেলে দিয়েছে।

কে দাদা? কার দাদা? আমার জীবনে কেউ নেই। মা-বাবা-ভাই-বোন–কেউ নেই! সব শালা ফটো হয়ে দেওয়ালে ঝুলছে। আর আমি একা–এক জিন্দা লাশ, মরার চেষ্টা করছি।

অমিতদা!

শয়তান সর্বনাশী মেয়েটা আবার ডাকছে ওই নামে।

অমিতদা!

চোখ ঝাপসা হয়ে এল আমার। কিন্তু ওই অবস্থাতেই স্লো মোশনে শটগানটা বের করে খুদের দিকে তাক করলাম। মাংস চিবিয়ে বলার মতো করে বললাম, ছেড়ে দে।

আমার চোখে-মুখে খুদে কী দেখল কে জানে, ছেড়ে দিল চুনিকে। চুনি ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। আর হীরা ছুটে গিয়ে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর শরীরের ওপরে।

খুদে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। জিগ্যেস করল, কী হল, বস, খেপে গেলে কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে শটগানটা ঘুরিয়ে বসিয়ে দিলাম খুদের নাকের ওপরে। শব্দ হল। ওর ভারী দেহটা যেন পাথরে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। কিন্তু আমি থামলাম না। কানে বাজছে বহুযুগ ধরে না-শোনা অলৌকিক ডাক অমিতদা! সুতরাং দ্বিতীয় আঘাতটা করলাম ওর মাথায়।

কিন্তু খুদে সেটা রুখে দিল। ওর গায়ের জোর আমি টের পেলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে ও আবার হাসল। অথচ ওর নাক ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বলল, এসব কী উলটোপালটা কাজ করছ, বস্? মিত্তিরসাহেব রাগ করবেন।

আমিও হাসলাম। শটগানটা হাত থেকে ফেলে দিলাম মেঝেতে।

আমি জানতাম, এরপর খুদে কী করবে। ও শটগানটা তুলে নেবে মেঝে থেকে। তারপর দাবার চাল উলটে দেবে। ওর মোটা বুদ্ধি ওকে অন্তত এই শিক্ষাই দিয়েছে। আর ও ভুলে গেছে রোজ এক ডজন আর্স দিয়ে আমি ব্রেকফাস্ট খাই।

সুতরাং খুদে যখন শটগানটা কুড়িয়ে নিচ্ছে তখনই আমি পকেট থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বের করে ওর কাঁধে এবং কোমরে গুলি করলাম।

খুদের বেলা আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি। ওর প্রতিবন্ধী জীবনের জন্যে অমিতাভ শিকদারের সমবেদনা রইল।

খুদে যখন টলে পড়ছে তখনই ওকে পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছি আমি। আর তৎপর হাতে শটগানটা তুলে নিয়েছি। আমার দু-হাতের দুটো মেশিন খুদের বাকি সাহস কেড়ে নিল। খুদে চেঁচায়নি। জানে, চেঁচালে ওরও বিপদ। তাই ও শুধু গোঙাতে লাগল আর বলতে লাগল, তুমি বাঁচবে না, বস্...।

কোন্ শালা বাঁচতে চায়?আমি ওর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলাম। ঘড়ি দেখলাম। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। রিভারভিউ আমাদের কাছে আর কতক্ষণ নিরাপদ কে জানে!

শটগান ও রিভলভার যথাস্থানে রেখে ছুটে গেলাম হীরা আর চুনির কাছে। চুনির চোখ উলটে গেছে। নাইলন দড়িটা কেটে বসে গেছে গলায়। ওর বিবর্ণ ঠোঁট নড়ছে। কী যেন বলতে চাইছে বিড়বিড় করে।

হীরা কাঁদছিল অঝোরে। বারবার বলছিল, অমিতদা, ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন– জলদি!

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, হাসপাতাল এখন কিছু করতে পারবে না। চুনিলাল এখন পাতালের পথে।

হীরাকে সরিয়ে দিয়ে আমি ঝুঁকে পড়লাম চুনির মুখের কাছে। ও কী বলছে শুনতে চাইলাম।

চুনির ফুলে ওঠা ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর বুঝতে পারলাম ওর কথাগুলো : শরদিন্দু মিত্র কাউকে...ছাড়বে না। আমরা সবাই দাবার খুঁটি...সবাই। খুদে এরকমভাবে আমাকে ঠকাবে বুঝতে পারিনি। মিস্টার শিকদার...।

আমি আরও ঝুঁকে পড়লাম চুনির ওপরে।

...হীরাকে দেখবেন...ওকে যেন কেউ কিছু না করে...হীরা...হীরা...।

আমি সরে এলাম। হীরাকে ঠেলে দিলাম ওর স্বামীর দিকে। শেষ কথাগুলো অন্তত ও শুনুক। শেষ কথায় ওরই একমাত্র অধিকার।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলাম দরজার কাছে। মন বলে উঠল, সময় নেই। হীরাকে নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে।

খুদের নড়াচড়া থেমে গেছে। তবে খেল খতম ভাবার কোনও কারণ নেই। ওর ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটে। হোটেল রিভারভিউর দুটো দামি কার্পেট নষ্ট হল। সুরিন্দার আর খুদে যদি দুশো তিন আর দুশো আঠেরো নম্বরে শহিদ হয় তা হলে এই দুটো ঘর হয়তো বাতিলের খাতায় জমা পড়বে। আর এই হোটেলের নামটা রিভারভিউ থেকে হয়তো মার্ডারভিউ হয়ে যাবে।

হীরার কান্না থামেনি। হঠাৎই কান্নার রেশ জোরালো হয়ে উঠতেই বুঝলাম সব শেষ, এবার এক মিনিট নীরবতা পালন করা দরকার। আমি আর চুনিলাল সেটা করলাম বটে কিন্তু হীরা অবাধ্য হল। ওকে ডেকে বললাম, হীরা, জলদি! আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

ও উঠতে চাইছিল না। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে টেনে তুললাম। তারপর বিছানার তোশক সরিয়ে চ্যানেল মিউজিকের সুইচগুলো খুঁজে পেলাম। মিউজিকের ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিলাম। স্বর্গীয় কিশোরকুমার গাইছিলেন? হমে তুমসে প্যার কিতনা ইয়ে তুম নহি জানতে, মগর জি নহি সকতে তুমহারে বিনা–।

বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে চুনিলালের মৃতদেহ ঢেকে দিলাম। ওঁ শান্তি।

তারপর হীরাকে ডাকলাম, চলে এসো–।

এখন সামনে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে কে জানে!

হোটেলের করিডরে কোনও ঝামেলা টের পেলাম না। হীরাকে বলেছি মুখে ওড়না জড়িয়ে নিতে। ও একটুও তর্ক না করে সাদা ওড়নাটা জড়িয়ে নিয়েছে মাথায়। বেশ বউ-বউ লাগছে। আমার ব্রিফকেস পড়ে আছে বিছানার ওপরে। যদি আজকের রাতটা জানে বেঁচে যাই তা হলে কাল ওটা দরকার হবে। আর যদি কপাল খারাপ হয়, তা হলে ব্রিফকেস স্মৃতি হয়ে যাবে।

সতর্কভাবে পা ফেলে নীচে নেমে এলাম। ইচ্ছে করেই এলিভেটর ব্যবহার করিনি। ওই ছোট্ট জায়গায় আমার কেমন অস্বস্তি হয়।

অবশেষে একতলায় হোটেলের লাউঞ্জ। আমি হীরার অনুমতি নিয়ে ওকে সামান্য কাছে টেনে নিয়েছি। লোকে বোধহয় আমাদের নতুন বর-বউ ভাবছে। ভাবুক। যতক্ষণ শ্বাস পড়ছে ততক্ষণ এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভাবা উচিত নয়। কে জানে জনার্দন সামন্ত কিংবা সুরিন্দারের মতো কেউ কোথাও ওত পেতে আছে কি না!

কার পার্কের কাছে এসে কাউকে দেখতে পেলাম না। উঁহু, ভুল হল। বরং বলা উচিত, সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেলাম না। সারি-সারি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। কয়েকটা গাড়িতে ড্রাইভাররা স্টিয়ারিং-এ মাথা ঝুঁকিয়ে ঝিমোচ্ছে। শিবনাথ অনেকটা দূরে, হোটেলের সীমানাপ্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে গল্প করছে।

আমি হীরাকে নিয়ে উঠে পড়লাম আমার গাড়িতে। শটগান ও স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বের করে সিটের ওপর রাখলাম। ইঞ্জিন চালু করে এক ঝটকায় গাড়িটা বের করে নিয়ে কাঁচাচ আওয়াজ তুলে দ্রুত বাঁক নিয়েই গতি বাড়িয়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ করলাম, শিবনাথের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত লোকটা দৌড়ে গিয়ে উঠল একটা কালো অ্যামবাসাডর। ও, আমার ধারণা তা হলে ভুল হয়নি। আর একজন জনার্দন সামন্ত তৈরিই ছিল! আমি বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় শটগানের বাঁটটা চেপে ধরলাম। এই বন্দুকটা সকাল থেকে ভুখা দিন কাটাচ্ছে। আর নয়, সময় এসে গেছে। এখন থেকে ভুখ হরতাল বন্ধ।

গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। সামনের রাস্তা গড়িয়ে ছুটে আসছে চাকার তলায় আত্মহত্যা করছে। আমি দুরন্ত গতিতে পৌঁছে গেলাম হোটেলের সিংদরজায়। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরা ভালোমন্দ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার গাড়ি পিছলে বেরিয়ে পড়েছে বাইরের রাস্তায়।

আর তখনই প্রথম গুলির শব্দ শোনা গেল। বোধহয় পিছনের অ্যামবাসাডর থেকে কেউ গুলি ছুঁড়েছে।

হোটেলের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে কয়েকটা বড় বড় গাছ। হোটেলের লনে লাগানো হ্যালোজেন বাতির আলো সেই গাছের ওপরে পড়েছে। গুলির শব্দে পাখিরা চঞ্চল হয়ে গাছের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এলোমেলো উড়ে বেড়াতে লাগল। হীরা ওর হাত রাখল আমার হাতের ওপরে। স্পষ্ট টের পেলাম, মেয়েটার কোমল হাত কাঁপছে।

এরপর শুরু হল দুরন্ত ছুট। রাতের হুগলি নদী থেকে ছুটে আসা পাগল বাতাস আমাদের শান্ত করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু হীরার ফেঁপানো কান্না তাতে থামছিল কই?

চোখের সামনে অন্ধকার নির্জন পিচের রাস্তা। কখনও কখনও ছুটে আসা হেডলাইটের আলো। সেই আলোয় হীরার মুখ দেখা যাচ্ছে : কান্নার জলছবি। আর আমার গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দুপাশের ঝোপেঝাড়ে গাছে চকিতের জন্যে যেন ঝলসে উঠছে ফ্ল্যাশ বা।

টায়ারের বাঁক নেওয়ার শব্দ আহত হায়েনার কান্না। আর ইঞ্জিন চিতাবাঘের গর্জন। তারই মধ্যে আবার শব্দ তুলল ফায়ারিং-এর শব্দ। অ্যামবাসাডর গাড়ির অনুসরণকারী অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

অ্যাকসিলারেটরে আমার পা চেপে বসেছিল, কিন্তু তাতেও আশ মিটছে না কিছুতেই। আরও অনেক কিছু আমাকে দলে পিষে নিকেশ করতে হবে। যুদ্ধের দামামায় আঘাত

পড়েছে। কেউ ঘা দিয়েছে প্রাণপণে বুকের ভেতরে ও অমিতদা! এক সদ্যবিধবার সিঁথির সিঁদুর কেন মুছে গেল আমাকে জানতে হবে। জানতেই হবে!

রিয়ারভিউ মিরারে অ্যামবাসাডরের একজোড়া চোখ জ্বলছে। দূরত্ব কমে আসছে ধীরে ধীরে। এখন গুলি চালালে আমাদের গায়ে বিঁধবে কি না জানি না, তবে গাড়ির বডিতে বা কাঁচে লাগতেই পারে।

হীরা কান্না ভাঙা গলায় জিগ্যেস করল, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি, অমিতাদা?

কী জবাব দেব এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে! শর্ত অনুযায়ী এখন ওকে নিয়ে যেতে হবে ওর শোকে মুহ্যমান বাবার কাছে। নিতে হবে আমার পারিশ্রমিক। তারপর জানতে হবে জটিল অঙ্কের উত্তর।

আবার গুলির শব্দ। গাড়ির পেছন ও সামনের দুটো কাঁচই ফুটো হয়ে গেল। হীরা চিৎকার করে মাথা নীচু করল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে স্টিয়ারিং এদিক-ওদিক করে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পথ চলতে লাগলাম।

কিন্তু একটু পরেই সরু পিচের রাস্তায় গাড়িটা পাশাপাশি এসে গেল। দুটো গাড়ি এলোপাতাড়ি চলতে-চলতে ধাক্কা খেল গায়ে-গায়ে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হল।

হীরা চিৎকার করে উঠল। বসে পড়ল সিটের নীচের অংশে।

আর আমি বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে শটগানটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরলাম।

ওই এলোমেলো চলার মধ্যেই দেখতে পেলাম অ্যামবাসাডরের স্টিয়ারিং-এ একটা কালো ছায়া। আর তার পাশেই আর একজন। তার হাতে লম্বা লাঠির মতো কী যেন একটা রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটা প্রকৃতপক্ষে রাইফেলের নল। লোকটা আমাদের গাড়ির দিকেই তাক করার চেষ্টা করছে।

ব্যাপারটা আমার অবাক লাগল। এরা নিশ্চয়ই চুনিলালের দল নয়, শরদিন্দু মিত্রের দল। তাই যদি হয় তা হলে এরা কাকে খতম করতে চাইছে? আমাকে, না হীরাকে? নাকি দুজনকেই? আর কেনই বা খতম করতে চাইছে? কোথাও কি কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে? নাকি চুনিলালের কথাটাই ঠিক? শরদিন্দু মিত্র কাউকে ছাড়বে না। আমরা সবাই দাবার খুঁটি। আর মিত্র সাহেব দাবা খেলছেন।

কিন্তু মিত্র সাহেব কি জানেন, এখন ওঁর সঙ্গে দাবা খেলছে শয়তানের বাচ্চা অমিতাভ শিকদার?

এতগুলো ভাবনা পলকে খেলে গেল মনের মধ্যে। আর সেই পলকের মধ্যেই চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে শটগান ফায়ার করলাম। নিশানায় কোনও গোলমাল ছিল না। তাই রাইফেলওয়ালা ঠিকঠাক করে নল তাক করার আগেই ওর মাথা কিংবা বলা যায় মাথার অবশিষ্ট অংশ ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপরে।

অ্যামবাসাডর গাড়িটা পিছলে এগিয়ে যেতে চাইল সামনে। আমি দরজা বন্ধ করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ বাড়িয়েছি। দুটো গাড়িতে ধাক্কা লাগল আবার। এবারের ধাক্কাটা বেশ জোরেই। চাকার বিপর্যস্ত শব্দ, হীরার চিৎকার, ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ সব মিলিয়ে শব্দের এক ডামাডোল। ঠিক তখনই উলটো দিক থেকে ছুটে আসা ট্রাকটা আমি দেখতে পেলাম।

সরু রাস্তায় বিশেষ জায়গা ছিল না। অতি কষ্টে আমি গাড়িটাকে বাঁ দিকে কাদার ওপরে নিয়ে গেলাম। জায়গাটা অন্ধকার ঢালু নালার মতো। রাস্তার কোনও বাতি জ্বলছিল না? হয় খারাপ, নয় তো লোডশেডিং। তাই আন্দাজটা জুতসই না হওয়ায় গাড়িটা টাল খেয়ে গেল।

অ্যামবাসাডরটা আমার সামনে চলে গিয়েছিল। তাই বাঁ দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করার আগেই ট্রাকের সঙ্গে ওটার ধাক্কা লাগল।

মুখোমুখি ধাক্কা নয়। ধাক্কাটা লেগেছে ডানদিকে, হেডলাইটের কাছে। ফলে ছুটন্ত ট্রাকটা নিজেকে সামলে নিয়ে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেছে। আর অ্যামবাসাডর গাড়িটা লাটুর মতো ঘুরপাক খেয়ে গেল খানিকটা। তারপর প্রায় উলটোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আর দেরি নয়। শটগানে নতুন টোটা ভরে নিয়ে কাত হয়ে থাকা গাড়ি থেকে পড়লাম আমি। হীরাকে বললাম, জায়গা ছেড়ে একদম নড়বে না। তারপর এক ছুটে কালো অ্যামবাসাডরের কাছে।

স্টিয়ারিং-এ বসে থাকা লোকটা বোধহয় মাথায় সামান্য চোট পেয়ে থাকবে। কারণ, মাথায় হাত বোলাচ্ছে। আমি দরজা খোলার জন্যে হাতলে টান দিলাম, কিন্তু খুলল না। ট্রাকের ধাক্কায় ডানদিকের ফেন্ডার তুবড়ে গেছে, দরজাও সামান্য আহত। তাই পাল্লাটা এঁটে বসে গেছে।

আমার হাতে সময় নেই। ফলে শটগান কোমরে গুঁজে হেড হোল্ড প্রয়োগ করলাম। ওর চিবুকের তলায় একটা হাত, আর মাথার পিছনে অন্য হাত। সামান্য মোচড় দিয়ে টান মারতে শুরু করলাম। লোকটা আমার হাত খামচে ধরল। আঁকড়া-আঁকড়ি করতে লাগল। ওর নখ আমার হাতের নুনছাল তুলে দিচ্ছে। বেচারা জানে না, হাতের মোচড় সামান্য বাড়ালেই ও নিচ থেকে সোজা আকাশে চলে যাবে। তাই সেটা একটু জানান দিলাম। ব্যস, ওর সব লড়াই থেমে গেল। ও মাখনের মতো বেরিয়ে এল জানলা দিয়ে।

লোকটাকে আমি পেড়ে ফেললাম রাস্তায়। কোমর থেকে শটগানটা বের করে তার হাতল দিয়ে সারেগামা বাজিয়ে দিলাম ওর মাথায়। তারপর ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলাম আমার গাড়ির কাছে।

আতঙ্ক আর উত্তেজনায় হীরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ওকে বললাম পেছনের দরজা খুলতে। তারপর দুজনে মিলে লোকটাকে তুলে দিলাম পেছনের সিটে। হীরাকে ওর পাশে

বসিয়ে শটগানটা ওকে দিলাম। বললাম, ঘড়ি দেখে দশমিনিট অন্তর-অন্তর লোকটার মাথায় শটগানের হাতল দিয়ে মারতে। তা হলে আমি নিশ্চিন্তে বাকি পথ গাড়ি চালাতে পারব।

হীরা জীবনে কখনও একাজ করেনি। সুন্দরীদের এ-কাজ মানায় না। কিন্তু উপায় নেই। এখন শটগানের ট্যাবলেট ছাড়া আর কোনও ওষুধ আমাদের হাতে নেই।

হীরা ভয়েভয়ে বলল, যদি মরে যায়?

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, দশমিনিট হতে আর দু-মিনিট বাকি আছে।

সামনের সিট থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা তুলে নিলাম। একছুটে চলে গেলাম অ্যামবাসাডরের কাছে। নীচু হয়ে পেট্রল ট্যাঙ্ক লক্ষ করে ফায়ার করলাম পরপর দুবার। সঙ্গে-সঙ্গে আগুন জ্বলে গেল।

গাড়িতে ফিরে এসে তাড়াহুড়ো করে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে হীরার দিকে তাকিয়ে দেখি আগুনের আলোয় ওর সুন্দর মুখে এক মায়াময় আভা। কিন্তু চোখে ওর প্রতিজ্ঞা।

রাতের বাতাস কেটে হু-হু করে ছুটে চলল আমার গাড়ি। আজ রাতে হীরা আর ওই অজ্ঞান অথবা মৃত লোকটা আমার বাড়িতেই থাকবে। আমি ওদের পাহারা দেব সারারাত। সারারাত বাজবে নীচু স্বরের গান : প্রথমত আমি তোমাকে চাই, দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই...।

আমি আবার দেখলাম হীরাকে।

অমিতদা!

শুধু ফটোয় ঘেরা আমার জীবন। হীরা, তুই যেন ফটো হয়ে যাস না। তোকে আমি কিছুতেই ফটো হয়ে যেতে দেব না।

.

ঘরটা মাপে বিশাল। এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ও-প্রান্তের মানুষকে বোধহয় ঝাপসা দেখায়। কারণ, ঘরের দূরতম কোণে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়্যাট টেবিল সামনে রেখে যে-মানুষটি বসে আছেন তাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে তাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হল না : শরদিন্দু মিত্র।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নজর মহম্মদ। পরনে সাদা ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি। চুল দাড়ি অভিজাত নবাবের মতো পরিপাটি।

শরদিন্দু হাসলেন। সেই সাপের মতো হাসি। ঠান্ডা হাসি। উনি বোধহয় অন্য কোনওভাবে হাসতে পারেন না। ওঁর প্লাটিনামের দাঁত দেখা গেল।

আসুন, মিস্টার শিকদার। হীরা কোথায়, আমার হীরা? উতলা সাপ তার বাচ্চার জন্যে আকুলভাবে প্রশ্ন করছে। মুখে কাল্পনিক বেদনার ছাপ।

হীরা আছে। একটু থেমে আবার বললাম, আমার কাছে আছে।

হীরার কথা মনে পড়ল আমার।

গতকাল রাতে আমরা কেউই ঘুমোতে পারিনি। একটা অচেনা অচেতন আহত মানুষকে সামনে রেখে দিশেহারার মতো বসে থেকেছি আমরা। তারপর হীরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। আমি কোনও কথা বলিনি। শুধু উঠে গিয়ে টেপরেকর্ডারের সুইচ অন করে দিয়েছি। নিভিয়ে দিয়েছি ঘরের আলো। আর জ্বেলে দিয়েছি অল্প পাওয়ারের রাতের বাতি।

তারপর ফটোগুলোর নীচে জ্বেলে দিয়েছি সুগন্ধী ধূপ। শুরু হয়েছে রাতের পূজা। আমি জানি, আধো-আঁধারেও মা-বাবা-ভাই-বোন আমাকে, হীরাকে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ভালোবাসছে। ওরা জানে কার ভালোবাসা দরকার।

টেপরেকর্ডারে গান শুরু হয়ে গিয়েছিল । একে একে সব তারা, জেনো নিভে যাবে। একলা আকাশটুকু শুধু পড়ে রবে। তোমার আমার কথা কেউ শুনবে না, আমাদের ফেলে রেখে সব চলে যাবে...।

এই গানটা মায়ের বড় প্রিয় ছিল।

হীরা গান শুনতে-শুনতে কান্না থামাল। ডেকে উঠল, অমিতদা!

আমি চোখ মুছলাম। বললাম, কী?

আমার একটুও ভাল্লাগছে না–।

আমারও না...। কিন্তু তবুও যে বেঁচে থাকতে হয়। আমি যদি বেঁচে না থাকতাম, তা হলে তোমার সঙ্গে দেখা হত না। তুমি যদি বেঁচে থাকে তা হলে তেমন কারও সঙ্গে হয়তো তোমার দেখা হবে। কে বলতে পারে।

হীরা কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমার স্বামীর শেষ কথাগুলো বড় কষ্টের।

আমি সব শুনলাম। সত্যি বড় কষ্টের সেই কথাগুলো। বড় বেদনার।

হীরার কথা ভাবতে-ভাবতেই আমি মিত্র সাহেবের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম অবহেলায়।

নজর মহম্মদ আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে এসেছে। এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে খুব কাছাকাছি। মিৎৰসাহেবের কাছ থেকে মাইনে নিলেও ও যেন এখন আমারই দেহরক্ষী।

আমি জিগ্যেস করলাম, খুদে কোথায়?

শরদিন্দু মিত্র উত্তর দিতে কোনও সময় নিলেন না। বললেন, বোধহয় শরীর খারাপ, তাই আসেনি।

আমি হাসলাম। বললাম, আপনি অন্তর্যামী, মিস্টার মিত্র। কাঁধে আর কোমরে গুলি খেয়ে খুদে কাল রাত থেকে হোটেল রিভারভিউর দুশো আঠেরো নম্বর ঘরে পড়ে আছে।

মিত্র সাহেবের মুখে সংশয়ের ছাপ পড়ল। বুঝতে পারছিলেন না আমি সত্যি বলছি, না গপ্পো বলছি। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলাম, নজর মহম্মদের হাত চলে গেছে পাজামার পকেটে। তাই ওর দিকে ফিরে বললাম, নজরসাব, আমার ধারণা ছিল খুদের চেয়ে আপনার মাথায় বুদ্ধি বেশি আছে। আপনার ওই পকেট থেকে কী বেরোতে পারে? বড়জোর একটা ছুরি কি পিস্তল–।

নজর! কী হচ্ছে? ধমক দিলেন শরদিন্দু, আমি মিস্টার শিকদারের সঙ্গে কথা বলছি।

নজর মহম্মদ হাসল। পকেট থেকে সেন্ট মাখানো রুমাল বের করল একটা। বলল, রুমাল, সাব। সিরফ রুমাল।

শরদিন্দু আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন, খুদের ব্যাপারটা কি সত্যি?

আমি বললাম, গল্পটা গোড়া থেকে আপনাকে বলি। তা হলে আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। আপনি হীরাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাকে ভাড়া করেছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অমিতাভ শিকদারকে ভাড়া করা যায়, কিন্তু কেনা যায় না। কাল সকালে আপনার কাছ থেকে বেরোনোর পর একটা সাদা মারুতি আমার পিছু নেয়…।

এইভাবে প্রায় গোটা গল্পটা শুনিয়ে দিলাম শরদিন্দু মিত্রকে। উনি দুহাতে মাথা ঢেকে যেন ভেঙে পড়লেন।

গল্প শেষ করে আমি বললাম, হীরা আমার কাছে আছে। আপনার পাঠানো কালো অ্যামবাসাডরের ড্রাইভারকে পাহারা দিচ্ছে। সে বেচারা এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাই ওর নামটা আপনাকে বলতে পারছি না বলে দুঃখিত।

চুনি—চুনি মারা গেছে। খুদে ওকে খুন করেছে! ভাঙা গলায় আর্তনাদ করলেন শরদিন্দু ও কিন্তু কেন? কেন ও একাজ করল?

আমি আর থাকতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলাম কয়েকবার। হেসে বললাম, উত্তমকুমারের ছেড়ে যাওয়া জায়গাটা এখনও খালি আছে, মিস্টার মিত্র। আপনাকে পেলে বাংলা ফিল্মের বড় উপকার হত।

শরদিন্দু সোজা হয়ে বসলেন। কালো কপালে চন্দনের টিপ কাঁপছে। মুখের চেহারা এখন একেবারে অন্যরকম। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আপনি কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন।

আমি চেয়ার সরিয়ে নজর মহম্মদকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা দূরে সরে এলাম। কিন্তু চোখের সতর্ক দৃষ্টি সবসময়েই শরদিন্দু মিত্র এবং নজর মহম্মদের দিকে।

কিছুটা সময় নিয়ে বললাম, আপনার ছকটা ছিল এইরকম। হীরা ও চুনিকে খতম করা, তারপর সেই খুনের দায়টা আমার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া। কারণ, আমি এককালের পুলিশের লোক হলেও এখন তাদের খুব পছন্দের লোক নই। আসলে আপনি ভাবতেই পারেননি এতগুলো ধাক্কা সামলে আমি হীরাকে সহি-সলামত ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনি জনার্দন সামন্তকে লাগিয়েছিলেন। সাদা মারুতি লাগিয়েছেন। কালো অ্যামবাসাডরে দুজনকে পাঠিয়েছেন। আর সবার সেরা, খুদেকে ডাবল এজেন্ট তৈরি করে পাঠিয়েছেন চুনি ব্যানার্জিকে বোকা বানানোর জন্যে। চুনি বেচারা ভেবেছে, খুদে ওর হয়ে স্পাইয়ের কাজ করছে। আসলে ব্যাপারটা ছিল ঠিক উলটো। আমি একটু থেমে কাঁধ কঁকালাম ও আপনার আর কী দোষ! আপনি কী করে জানবেন, অমিতাভ শিকদার সহজে খতম হয়

না! এই খতমের খেলায় আমি পুরোনো পাপী। তাই আমি বেঁচে ফিরে এসেছি, হীরা বেঁচে ফিরে এসেছে। আপনার পোষা কোনও জনার্দন বা মধুসূদন আমাদের ছুঁতে পারেনি—।

হীরা—আমার মেয়ে হীরাকে আমি মারতে চাইব? একথা আপনি বিশ্বাস করেন, মিস্টার শিকদার!

হ্যাঁ, করি। কারণ হীরা যে আপনার মেয়ে নয়!

শঙ্খচূড় যেন ছোবল বসাল শরদিন্দুর কপালে। মুখ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়ে গেল চোখের পলকে। আর নজর মহম্মদের হাত ঝলসে উঠল শূন্যে।

নজর মহম্মদ আমাকে চেনে না, তাই বোকার মতো এ কাজ করতে গেল। আমি শরীরটাকে আধ পাক ঘুরিয়ে ভয়ংকর এক লাথি কলাম ওর শূন্যে তোলা হাতের বগলের নীচে। ওর ছিপছিপে দেহটা টাল খেয়ে পড়ল শরদিন্দুর টেবিলে। লিকলিকে ছুরিটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল মেঝেতে। আমি ঝটিতি নজরের কাছে চলে গেলাম। বাঁ হাতে চেপে ধরলাম ওর চুলের মুঠি। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ও ডান হাতটা চালিয়ে দিল আমার পাঁজরে।

একটা ধাক্কা আর জ্বালা আমাকে শেষ করে দিল যেন। নজর কোথা থেকে একটা দ্বিতীয় ছুরি বের করে বিধিয়ে দিয়েছে আমার পাঁজরে।

ক্ষণিকের জন্যে আমার দেহ স্থির হল। আর তার পরই টেবিল থেকে ইস্পাতের পেপারওয়েট তুলে নিয়ে আমি নৃশংস আক্রোশে বসিয়ে দিয়েছি নজরের রগের ওপরে—একবার, দুবার।

নজর মহম্মদের শরীর অবশ হয়ে গেল। আমি কোনওরকমে ওর চিবুকের নীচে হাত দিয়ে ওর মাথা মুচড়ে দিলাম। একটা শব্দ হল। কী ভাঙল কে জানে! নজর মহম্মদ এবার টেবিল থেকে পড়ে গেল নীচে। বোধহয় আল্লার প্রিয় হয়ে গেল।

না, শরদিন্দু মিত্র এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেননি। যখনই দেখেছেন লড়াইয়ে পাল্লা আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখনই হয়তো কোনও কোনো বিপদ সংকেত বাজিয়ে দিয়েছেন। আর দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ঘরে হাজির হয়ে গেছে দুজন সাকরেদ।

ওই দশ সেকেন্ড আমিও বসে থাকিনি। কোমর থেকে নলকাটা শটগানটা বের করে আহত শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেছি শরদিন্দুর কাছে। ওঁর চর্বিঝোলা গলকম্বলে শটগান চেপে ধরে বলেছি পুলিশে টেলিফোন করতে।

ডায়াল করুন–ওয়ান জিরো জিরো!

আমার রক্তে ভেজা শরীর আর যন্ত্রণায় ভাঙাচোরা মুখ দেখে প্রতিবাদের বিশেষ ভরসা পাননি শরদিন্দু। ডায়াল করেছেন। তারপর আমারই কথামতো নিজের ডেরার ঠিকানা দিয়ে পুলিশকে আসতে বলেছেন।

শরদিন্দু ফোন রেখে দেবার পর খেয়াল করেছি, ওঁর সাকরেদ দুজন দরজার কাছে ফ্রিজ শট হয়ে আছে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত ওদের ফ্রিজ শট হয়েই থাকতে হবে।

হীরা আপনার মেয়ে নয়। আমি নীচু গলায় বললাম শরদিন্দুকে। আমার শরীরের বাঁ দিকটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছে। জানি, ছুরিটা টেনে বের করে নিলে যন্ত্রণা কমবে। কিন্তু তারপর যে-রক্তস্রোত শুরু হবে তাকে রুখবে কে!

আপনি হীরার সম্পর্কের কাকা। ছোটবেলায় হীরা অনাথ হয়। আপনি ওকে মানুষ করেন। আপনাকে ও বাবা বলে জানে। এই ব্যাবসা, কারখানা, মিত্রভিলা–কোনও সম্পত্তিই আপনার নয়। সব ছিল আপনার দাদার। কিন্তু তাঁর উইল ছিল। তাতে বলা ছিল, হীরা সাবালিকা হলে বা বিয়ে করলে সবকিছু ওর হয়ে যাবে। আপনার তখন কিছুই থাকবে না। হীরা এসব খবর কিছুই জানত না। এসব খবর জানতে পেরেছিল চুনি ব্যানার্জি। মারা

যাবার আগে ও হীরাকে তার কিছু কিছু বলে গেছে। বলে গেছে সেইসব কাগজপত্রের হদিস।

একটু থেমে দম নিয়ে আমি বললাম, সারা জীবনে আপনি কম খারাপ কাজ করেননি। এমনকি নিজের বউকেও পুড়িয়ে মেরেছেন। আর কাল মারতে চেয়েছেন ফুলের মতো একটা মেয়েকে—যে আপনাকে গত ষোলো-সতেরো বছর ধরে বাপি বলে ডেকেছে। আমার বাড়িতে বসে হীরা এখন কাঁদছে। ওর যে আর কেউ নেই—মা-বাবা-ভাই-বোন কেউ নেই।

না, আমি আছি! হীরার ডাক মনে পড়ে গেল : অমিতদা!

আমার জীবনে সবই ফটো আর ফুলের মালা। কিন্তু হীরা ফটো হয়ে যাক আমি চাই না।

ঠিক তখনই গুলির শব্দ পেলাম। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল, তাই ঠিকমতো ঠাহর করতে পারলাম না কে গুলি করল। তবে কোমরের কাছে একটা ধাক্কা টের পেলাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটোর মধ্যে একজনের হাতে কী যেন একটা রয়েছে।

আমার ডান হাতের জোর কমে আসছিল। এরপর আর শটগানের ট্রিগার টিপতে পারব কি না কে জানে!

সুতরাং ট্রিগার টিপে দিলাম। বিশ্রী শব্দ হল। রক্তে আমার ডান হাতের মুঠো ভিজে গেল। আমার সামনের চেয়ারটায় একটা সাপ বসে আছে, কিন্তু তার ফণা নেই, প্লাটিনামের বিষদাঁতও আর নেই। সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

হীরার আর কোনও ভয় নেই।

সুমনের গান কানে বাজছে : প্রথমত আমি তোমাকে চাই, দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই...কিন্তু কাকে চাই এখনও জানি না। মৃত্যুর চেয়ে বড় আত্মীয় আর কে আছে!

শুধু একটাই তৃপ্তি—আমার মতো অন্ধকার ঘরে বসে চাঁদের আলো কোলে নিয়ে হীরাকে কখনও এ-গান শুনতে হবে না।

পায়ের শব্দ নেই

পায়ের শব্দ নেই

০১.

বিদিশা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজের সাজগোজ দেখে নিচ্ছিল। আয়না মিথ্যে কথা বলে না। তাই সামনের মেয়েটাকে রীতিমতো সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল বিদিশার। বিধাতাপুরুষ যখন রোজকার দমবন্ধ করা কাজের রুটিন থেকে ছুটি নিয়ে স্বর্গীয় কোনও জায়গায় আলস্যে অবসর যাপন করছিলেন, তখন বেশ ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে বিদিশাকে তৈরি করেছেন তিনি।

নিটোল ফরসা মুখ, স্পষ্ট ভুরু, মায়াজড়ানো টানা-টানা চোখ, গোলাপি ঠোঁট, হাসলে এক গালে টোল পড়ে। ওর মুখের দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন! কত পুরুষ যে ওর সঙ্গে নানান ছলছুতোয় আলাপ জমাতে চায়।

বিদিশার গাঢ় নীল শাড়িতে সূক্ষ্ম জরির কাজ। গত বছর পুজোর সময় মা কিনে দিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রিটের ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস থেকে। বিদিশাও সঙ্গে গিয়েছিল। এত দামি শাড়ি কিনতে ওর মন চায়নি। কিন্তু মা জোর করে কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর সাজগোজের সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি–।

ছাব্বিশ বছর বয়েসে কি কারও সাজগোজের বয়েস ফুরিয়ে যায়? কিন্তু বিদিশার ভেতরে সবসময়েই একটা অস্থির ঝড় মাথা খুঁড়ে মরতে থাকে।

মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে তেরছা চোখে আয়নার দিকে তাকাল বিদিশা। কোঁকড়া কালো চুলের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে চাইছে পিঠে। চুলের গোড়ায় সাদা সিল্কের সৌন্দর্য বন্ধনী। চুলের ঢঙ বিদিশার পছন্দ হল। আর ঠিক তখনই ওর চোখ গেল বাঁ গালে কানের কাছাকাছি জায়গায়। ইঞ্চিদুয়েক লম্বা একটা কাটা দাগ। রণজয়ের ভালোবাসার চিহ্ন। সেই রাতটার কথা বিদিশা এখনও ভুলতে পারেনি। যেমন ভুলতে পারেনি আরও অনেক দিনরাতের কথা।

সাজগোজ পরখের পালা শেষ করে বিদিশা কবজি উলটে ঘড়ি দেখল ও সওয়া নটা। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে না বেরোতে পারলে অফিসে দেরি হয়ে যাবে। সল্ট লেকের সি. এ. পি. ক্যাম্প থেকে পার্ক স্ট্রিট–সব মিলিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো লাগবেই।

আয়নার পাশে দাঁড় করানো একটা সোফায় বিদিশার লম্বা স্ট্র্যাপ দেওয়া হাতব্যাগটা পড়ে ছিল। তার পাশেই বাপ্পার স্কুলের পোশাক। বাপ্পা এখন স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছে। ও দশটায় স্কুলে বেরোয়।

বিদিশা ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরোতে যাবে, মা বসবার ঘরের দরজা থেকে ডাকলেন, মানু, তোর ফোন।

বিদিশা ভুরু কুঁচকে ডাইনিং হলের দিকে এগোল। কে ফোন করল এই অসময়ে?

সবুজ রঙের রিসিভার টেবিলে কাত করে নামানো। সেটা তুলে নিয়ে বিদিশা ছোট্ট করে বলল, হ্যালো–।

মানু, কেমন আছ?

ও-প্রান্তের গলা শোনামাত্রই বিদিশার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। রণজয়।

কেমন আছ, মানু? রণজয় আবার জিগ্যেস করল।

গলা শুকিয়ে কাঠ। অতি কষ্টে জিভে সাড় এনে বিদিশা বলল, ভালো–

বিদিশা রণজয়কে ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় নমাস। প্রথম ছমাস রণজয় ওর সঙ্গে যোগাযোগের কোনও চেষ্টা করেনি। তারপর একদিন ফোন করে বাপির সঙ্গে কথা বলে, মায়ের কথা বলে। তবে সে-সব কথাবার্তাই ছিল লিগাল সেপারেশনের ব্যাপার নিয়ে।

তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, মানু। রণজয় বলল।

দম বন্ধ করে বিদিশা জিগ্যেস করল, কী কথা?

আমি একেবারে বদলে গেছি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না। রাতগুলো আমাকে হাঁ করে গিলতে আসে। শেষ দিকে রণজয়ের গলা ধরে এল।

বিদিশার ভেতরে একটা কষ্ট সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। ও চোয়াল শক্ত করে সেটাকে চেপে সাধারণ গলায় বলল, আমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি পরে ফোন কোরো।

বিদিশা, প্লিজ। আমার কথাটা শোনো একবার–।

সরি, রণজয়। সত্যি ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।

রিসিভার নামিয়ে রাখল বিদিশা।

মা তখনও বসবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিদিশা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মা পিছন থেকে জিগ্যেস করলেন, রণজয় কী বলল?

বিদিশা দায়সারাভাবে জবাব দিল, তেমন কিছু না।

তুই একটু ভেবে দ্যাখ না, যদি…।

বিদিশা ঘুরে তাকাল মায়ের দিকে। মায়ের দু-চোখে অনুনয়, প্রত্যাশা। মা এখনও ভাবে, রণজয়ের সঙ্গে ওর বিয়েটা জোড়া দেওয়া সম্ভব। দু-বছরে ওদের সম্পর্কে এমন কোনও ফাটল ধরতে পারে না যা সারিয়ে নেওয়া যায় না।

কিন্তু বিদিশা কেমন করে মাকে বলবে, মা, ওই লোকটার সঙ্গে দুটো বছর আমি ঘর করেছি, তুমি করোনি। ওর ভেতরে এমন কতকগুলো গোলমাল আছে যা কখনও ঠিক হবে না। তুমি কি আমার বাঁ-গালের কাটা দাগটার কথা ভুলে গেলে!

বিদিশা ছোট্ট করে বলল, আমি বেরোচ্ছি। ফিরতে একটু দেরি হলে চিন্তা কোরো না। দুপুরে খাওয়ার আগে বাবাকে মনে করে ডাইজিনটা দু-চামচ খাইয়ে দিয়ো।

ও যখন দরজা খুলে বেরোচ্ছে তখন পিছন থেকে শোনা গেল বাপ্পার চিৎকার, দিদি, আমার জন্যে আজ একটা ক্যাডবেরি নিয়ে আসবি।

আচ্ছা, নিয়ে আসব।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে সদর দরজা টেনে দিল বিদিশা। পালিশ করা ভারী কাঠের দরজা ক্লিক শব্দ করে অটোমেটিক লক হয়ে গেল।

ছোট্ট মোজেইক করা বারান্দায় শেষে দু-ধাপ সিঁড়ি। তারপর খানিকটা জায়গা জুড়ে শান বাঁধানো চাতাল। তার প্রান্তে, পাঁচিলের কিনারা ঘেঁষে, লম্বা মাটির ফালিতে সবুজের বাগান। রিটায়ার করার পর বাবাকে এই নেশায় পেয়েছে। সবসময় এই গাছ নিয়ে পড়ে আছেন। একা-একা কথা বলেন গাছের সঙ্গে। আপনমনে মাথা নাড়েন, বিড়বিড় করেন।

বাবা সারাটা জীবন কলকাতা করপোরেশনে ঘুষ না নিয়ে চাকরি করেছেন। ওদের নিয়ে পাইকপাড়া অঞ্চলে কী কষ্ট করেই না থাকতেন! বিদিশা শুনেছে, বিয়ের আগে মা রমলা গালর্স হাই স্কুলে অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়াতেন। বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দেন বাবার কথায়।

কিন্তু পড়ানোর অভ্যেস ছাড়তে বাবা মানা করেননি। তাই বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পড়াতেন মা।

সল্ট লেকের জমি লটারি হওয়ার সময় সেই কোন যুগে বাবা একটুকরো জমি পেয়েছিলেন। তারপর, প্রায় পঁচিশ বছর পর, সেখানে এই ছোট্ট একতলা বাড়ি তৈরি করেছেন। বাবা-মায়ের তিলতিল কষ্ট দিয়ে গড়ে তোলা এই বাড়ি।

তাই বিদিশার আবদার ছিল, বাবা-মায়ের নামেই হোক বাড়ির নাম। অনেক লড়াইয়ের পর জিতেছিল ও।

সদরের গ্রিলের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বিদিশা দেখতে পেল, শোওয়ার ঘরের লাগোয়া গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় বসে বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। লম্বা তামাটে কাঠামো। মুখে বয়েসের ভজ, চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় মানুষটা ঘুম থেকে ওঠে, আর রাতে শুয়ে পড়ে নটার মধ্যে। আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ।

বিদিশা ডেকে বলল, বাবা, আমি বেরোচ্ছি।

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজের আড়াল সরিয়ে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন। সে-হাসির অর্থ বোধহয়, আমার জোয়াল টানার পালা শেষ, এবার তোর পালা।

লোহার গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল বিদিশা। একবার পিছন ফিরে দেখল। সদর দরজায় এক পাশে পাথরের ফলকে লেখা বাড়ির নাম : অরুণা-সুধাময়। ছোট্ট সাদা বাড়িটা যেন বাড়ির মানুষগুলোর মতোই সাদাসিধে। এরকম সাদাসিধে জীবনই চেয়েছিল বিদিশা। কিন্তু ওর বিয়েটা গোলমাল হয়ে গিয়ে সবকিছুই কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

অথচ বিয়ের আগে ও পাঁচ বছর চুটিয়ে প্রেম করেছিল রণজয়ের সঙ্গে।

ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার এক বিয়েবাড়িতে। আঠারো বছর বয়েসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল কল্পিতা বিদিশার স্কুলের বন্ধু। বরযাত্রীরা এসেছিল দুর্গাপুর থেকে। সবাই মিলে বেশ হইহুল্লোড় করছিল। তারই মধ্যে রণজয়কে লক্ষ করেছিল বিদিশা। ফরসা রোগা চেহারা। মুখে কেমন যেন মেয়েলি ভাব। চোখে চশমা। চোখ দুটো বেশ গভীর আর মিষ্টি।

হাতে একটা ক্যামেরা নিয়ে চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল রণজয়। মাঝে-মাঝে নতুন বউকে তাক করে শাটার টিপছিল।

বরযাত্রী দু-চারজন যুবক বিদিশার সঙ্গে গল্প জুড়েছিল। দুর্গাপুর যে কত ভালো জায়গা সে কথা সবিস্তারে বলছিল। বিদিশা সেই বয়েসেই বেশ বুঝে গিয়েছিল ওকে ঘিরে পুরুষদের কিছু সমস্যা হয়। তাই ও সতর্কভাবে সৌজন্য বজায় রেখে টুকটাক কথা বলছিল।

হঠাৎই তাদের একজন বিদিশাকে বলল, ম্যাডাম, আমাদের সঙ্গে একটা ছবি তুলুন।

সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন : এই রনো, আমাদের দিকে তাক করে কটা ফিলিম খরচ করো, বস্।

রণজয় ইতস্তত করে জবাব দিয়েছিল, উনি এখনও ফটো তোলার পারমিশান দেননি।

তখন কে একজন বলে উঠল, রনোটা বড্ড বেরসিক। সবসময় নীতিশিক্ষা ফলায়।

আগের জন্মে ও পাদরি ছিল।

উঁহু, বেচারা নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করে।

বিদিশা অস্বস্তি পাচ্ছিল। অথচ রণজয় বেশ স্মার্টভাবে ওর কাছে এগিয়ে এসে বলল, আজেবাজে কথায় কান দেবেন না। শুধু বলুন, ফটো তুলতে আপনার আপত্তি নেই তো?

বিদিশা বলেছিল, তুলুন–।

রণজয় নরম গলায় আলতো করে বলল, একটা সবার সঙ্গে..আর একটা একা।

ফটো তোলার পর রণজয় বিদিশার ঠিকানা চেয়েছিল। বলেছিল, ফটোর প্রিন্ট ডাকে পাঠিয়ে দেবে। কয়েক সেকেন্ড দোটানার পর ঠিকানা দিয়েছিল বিদিশা।

এমন সময় কনেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ছাদনাতলায়। রণজয় ফটো তোলা নিয়ে কীসব কথা বলছিল গুনগুন করে। আবার মাঝে-মাঝে হঠাৎই চুপ করে যাচ্ছিল। দেখে কেমন যেন অসহায় বলে মনে হচ্ছিল।

একটু পরে ভিড়ের মধ্যে কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছিল রণজয়।

দিন পনেরো পর বিদিশার নামে একটা খাম এসেছিল পাইকপাড়ার বাড়িতে। দুটো ফটোর দু কপি করে পোস্টকার্ড মাপের প্রিন্ট। সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা : খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জন্যে কোনও প্রিন্ট রাখিনি। বিশ্বাস করুন। ফটো কেমন লাগল এক লাইন লিখে জানাবেন?

সামান্য নির্দোষ চিঠি। কিন্তু তারই মধ্যে আঠারো বছরের বিদিশা কী যেন খুঁজে পেয়েছিল। এ যেন এক আঁজলা জলে ডুবে মরার গভীরতা।

এক লাইন নয়, বিদিশা এক পৃষ্ঠা লিখে জানিয়েছিল, ফটো কেমন লেগেছে।

নিতান্ত নির্দোষ চিঠি। কিন্তু তারপর থেকে একইরকম নির্দোষ চিঠি আসতে লাগল, যেতে লাগল।

দিন-মাস কাটতে লাগল। আর, অত্যন্ত ধীরে নির্দোষ চিঠিগুলোতে ভালোবাসার দোষ ঢুকতে লাগল।

রণজয় সি. এন. জ্যাকসন কোম্পানির সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। বি. ই. কলেজ থেকে ইলেকট্রনিক্সে ডিগ্রি নিয়ে বছর আড়াই হল চাকরিতে ঢুকেছে। কোম্পানির হেড অফিস কলকাতার, কিন্তু ফ্যাক্টরি দুর্গাপুর। মাসের মধ্যে অন্তত দুবার কলকাতার আসে রণজয়। তখন বিদিশার সঙ্গে দেখা করতে ওর অসুবিধে নেই।

বিদিশা ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বেথুন কলেজে ভরতি হয়েছিল।

রণজয় ওর সঙ্গে কলেজে এসে দেখা করতে লাগল। একবার দেখা হওয়ার পর চোদ্দো দিন ধরে অপেক্ষা করত বিদিশা। তখন ওর মনে হত, হেদুয়া পার্কের গাছের পাতাগুলো কী সাংঘাতিক সবুজ, ওপরের আকাশটা কী বিপজ্জনক নীল, আর হেদুয়ার জল কী ভীষণ স্বচ্ছ!

জীবনকে আগে কখনও এত রূপসী মনে হয়নি বিদিশার। একটা রোগা ফরসা মুখচোরা চশমা পরা মিষ্টি ছেলে ওর জীবনটাকেই যেন পালটে দিল।

এখন পিছন ফিরে তাকালে বিদিশার মনে হয়, রণজয়ের মধ্যে ছোটখাটো কয়েকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার তখন থেকেই দেখা গিয়েছিল। আজ যত স্পষ্টভাবে তার অর্থ বোঝা যায় তখন তা বোঝা যায়নি।

পার্ক স্ট্রিটের বাস স্টপে নেমে ডানদিকের ফুটপাথ ধরে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটছিল বিদিশা। অফিসে দেরি হয়ে যাবে এই ভয়ে বারদুয়েক হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎই পিছন থেকে, ঠিক ঘাড়ের কাছে, কে যেন বলে উঠল, আগে গেলে বাঘে খায়–।

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল বিদিশা। ওরই অফিসের সহকর্মী বোসদা-সুধীর বোস। অভিজ্ঞ ড্রাফটসম্যান। মাথায় টাক–শুধু কানের কাছটায় খানিকটা করে চুল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পানের রসে ঠোঁট লাল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষকে আপন করে নিতে পারেন।

বিদিশা অপ্রস্তুত হেসে বলল, দেরি হয়ে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছি।

সুধীর বোস পান চিবোতে-চিবোতে জড়ানো গলায় বললেন, আমার কথাটার ইনার মিনিং আছে, মা জননী।

বিদিশা অপ্রতিভ হয়ে আশেপাশে তাকাল। কেউ শুনতে পায়নি তো! বোসদার কথাবার্তাই এইরকম। বিদিশা জানে এখানে বাঘ বলতে ওদের সেকশনের ম্যানেজার প্রশান্তলাল চক্রবর্তী। ভদ্রলোক কানে কম শোনেন, আর সেইজন্যেই বোধহয় মহিলা-আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। কারণ, লোকে বলে, একটা ইন্দ্রিয় কমজোরি হলে অন্য কোনও ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে লোকসান পুষিয়ে দেয়।

বিদিশা স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করে। প্রশান্ত চক্রবর্তী নানা ছুতোয় ওকে ডেকে ডিকটেশন দেন। সারাদিনই নির্লজ্জ চোখে ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম-প্রথম বিদিশার খুব খারাপ লাগত, কিন্তু ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে। ও বুঝতে পেরেছে, মেয়েদের চাকরির ক্ষেত্রে এ-অসুবিধেটা থাকবেই। ছমাসের চাকরি বিদিশাকে ছবছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে দিয়েছে। যেমন রণজয়ের সঙ্গে দু-বছরের সংসারটাকে ওর সবসময় দুশো বছর বলে মনে হয়।

সকালের এই সময়টা পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে অসংখ্য অফিসযাত্রী দ্রুত-পায়ে হেঁটে যায়। আর রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে একের পর এক গাড়ি। এই অঞ্চলটার আপাদমস্তক এখন গতি। মাথার ওপরে শ্রাবণের মেঘলা আকাশ যেন অলস ঘুমচোখে এই গতি দেখছে।

বোসদা বিদিশার পাশাপাশি পা ফেলতে-ফেলতে বললেন, ফাঁকা অফিসে আগে-আগে যেয়ো না। প্রশান্ত চক্রবর্তী ওত পেতে বসে আছে।

বিদিশা হেসে বলল, যাঃ, কী যে বলেন! আমাদের চক্রবর্তীসাহেব অতটা ডেঞ্জারাস নন। যাট পেরোনো রোগা-ভোগা মানুষ, দাঁত-টাত নেই, কামড়াবে কেমন করে!

মাড়ি তো আছে! সুযোগ পেলে ওই মাড়ি দিয়েই কিড়মিড় করবে।

বোসদার কথায় বিদিশা জোরে হেসে ফেলল।

প্রথম-প্রথম এসব পুরুষালি রসিকতায় অস্বস্তি পেত বিদিশা। কিন্তু পরে এই ব্যাপারটাকেও মানিয়ে নিতে পেরেছে। তা ছাড়া ওর অফিস কলিগরা বেশিরভাগই ভীষণ ভালো। একে অপরের সুখে-দুঃখে অংশ নেয়। কারও সম্পর্কে অহেতুক কোনও কৌতূহল নেই।

বিদিশা যখন অফিস বিল্ডিং-এ ঢুকল তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ও আর বোসদা গ্রাউন্ড ফ্লোরের লিফটের কাছে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। দু-চারটে চেনামুখের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছিল বিদিশার। ও সৌজন্যের হাসি হাসল।

আশেপাশের নানান কথাবার্তা কানে আসছিল। কেউ অফিসের সমস্যার কথা বলছে, কেউ বলছে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সমস্যার কথা, কেউ বা পরিবারের সঙ্গে কথা কাটাকাটির কারণ বিশ্লেষণ করছে।

বিদিশার মাথায় রণজয়ের ভাবনাটা আবার ফিরে এল।

আজ মঙ্গলবার। রণজয় বিদিশাকে বাড়িতে ফোন করতে শুরু করেছে রবিবার থেকে। এ পর্যন্ত মোট চারবার ফোন করেছে ও। আর চারবারই একইরকম কথাবার্তা বলেছে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না ইত্যাদি।

কথাগুলো শুনে বিদিশার কষ্ট হয়। প্রথম পরিচয়ের দিনটা মনে পড়ে, মনে পড়ে ফটো তোলার কথা। আবার অন্য অনেক ঘটনাও মনে পড়ে। দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ভারে স্বপ্নের স্মৃতি চাপা পড়ে যায়।

বিদিশার মন বলছে, আজ রাতে ও আবার ফোন করবে। আবার একই কথা বলবে।

ছতলার অফিসের ফ্লোরে পৌঁছে যেন অন্য জগতে ঢুকে পড়ল বিদিশা। নিজের চেয়ার টেবিলে গুছিয়ে বসল। পোস্টাল ফ্যানটা চালিয়ে দিল ফুল স্পিডে। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নিল। হালকা পারফিউমের গন্ধ টের পেল। আর তখনই দেখল শেখর সেন ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

শেখর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ। লম্বা শক্তিশালী কাঠামো। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। চোখে চশমা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

একসময়ে ট্র্যাকে দৌড়োনোই ছিল শেখরের ধ্যানজ্ঞান। একশো মিটারে ইন্টার কলেজ চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। এখন রোজ ভোরবেলা দেশবন্ধু পার্কে দৌড়োয়।

ম্যাডাম, নিন, এই বইটা পড়ে দেখুন– একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বিদিশার দিকে এগিয়ে দিল শেখর, এই বইটা বিদেশে প্রচুর বিক্রি হয়েছে।

বিদিশা বইটা হাতে নিয়ে দেখল। স্টিভ সোয়ানসন নামে একজন সিরিয়াল কিলারের আত্মজীবনী। নাম : মাই লাইফ উইথ নাইফ।

শেখর বইয়ের পোকা। অফিসে কোনও না কোনও বই ওর সঙ্গে থাকবেই। আজ এটা নিয়ে এসেছে। হয়তো আজই বাসে বইটা পড়ে শেষ করেছে। তাই বিদিশাকে পড়তে দিচ্ছে।

শেখর প্রায়ই বই পড়তে দেয় বিদিশাকে। ইংরেজি গল্প-উপন্যাস নিয়ে ফাঁক পেলেই আলোচনা-তর্ক জুড়ে দেয়। আর নিজের দৌড়োনোর দিনগুলোর গল্প করে।

বিদিশা ঠোঁট কুঁচকে বলল, না, না, এসব খুন-জখমের বই আমার ভালো লাগে না।

শেখর বলল, এই সোয়ানসন লোকটা স্যাডিস্ট সাইকোপ্যাথও বলা যায়। মহিলাদের খুন করেই ও আনন্দ পেত। ওর মাথার গণ্ডগোল আছে বলেই ইলেকট্রিক চেয়ার হয়নি। আমেরিকায় যাবজ্জীবন জেল খাটছে।

ওরে বাবা আঁতকে উঠল বিদিশা, এসব বই কেন পড়েন আপনি?

বিদিশার টেবিলে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে পড়ল শেখর। বলল, আপনাকে সত্যি কথাটাই বলি। রোমাঞ্চকর থ্রিলিং ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগে। যখন ট্র্যাকে দৌড়োতাম তখন খুব থ্রিলিং লাগত। এখন তো জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গেছে।

শেষদিকে মুখটা এমন ব্যাজার করল যে বিদিশা হেসে ফেলল।

হঠাৎই কোথা থেকে ম্যানেজার পি. এল. চক্রবর্তী এসে শেখরের পাশ দিয়ে উঁকি মারল ও বিদিশা, জলদি এসো। অনেকগুলো ইমপরট্যান্ট চিঠি ডিকটেট করার আছে।

বিদিশা চক্রবর্তীসাহেবের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, এখুনি যাচ্ছি।

শেখর হেসে বলল, আপনিও একটা এরকম বই লিখে ফেলুন ম্যাডাম। বইটার নাম দেবেন মাই লাইফ উইথ পি. এল. চক্রবর্তী।

বিদিশা শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেন্সিল বের করে নিল ড্রয়ার থেকে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

শেখর বলল, লাঞ্চের সময় দেখা হচ্ছে।

বিদিশা ঘাড় নেড়ে মোজাইক করা মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে চলল প্রশান্ত চক্রবর্তীর টেবিলের দিকে।

এর মধ্যেই যে যার কাজে মন দিয়েছে। চায়ের গাড়ি ঢুকে পড়েছে ফ্লোরে। টেবিলে-টেবিলে চা পৌঁছে দিচ্ছে টি-বয়। ছেলেটা বিদিশাকে জিগ্যেস করল ম্যাডাম, আপনার চা কোথায় দেব?

বিদিশা ইশারায় ম্যানেজারের এক্সিকিউটিভ টেবিল দেখিয়ে দিল।

ঠিক তখনই ওদের বেয়ারা বনজারা এসে দাঁড়াল ওর কাছে। বলল, ম্যাডাম, আপনার ফোন। আঙুল তুলে একটা এক্সটেনশন লাইন দেখাল বনজারা।

বিদিশা এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল।

হ্যালো।

মানু, কেমন আছ?

বিদিশার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে চাইল। ওর অফিসের ফোন নম্বর কী করে পেল রণজয়!

মানু, কথা বলছ না কেন? আকুল গলায় জানতে চাইল রণজয়, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিদিশা...মানু...প্লিজ, একবার আমাকে কথা বলার চান্স দাও।

এটা অফিস। এখানে এভাবে ফোন করাটা ভালো দেখায় না– ঠান্ডা গলায় বলল বিদিশা।

কী বলছ, মানু! আমি তোমাকে ফোন করলে কে কী মনে করবে! আফটার অল আমি তোমার স্বামী।

বিদিশা একটা ধাক্কা খেল। রণজয় ওর প্রাক্তন স্বামী নয়–আইনের হিসেব অনুযায়ী বর্তমান স্বামী। ওর মাথার ভেতরটা কেমন যেন করছিল। কী বলবে এখন রণজয়কে?

অফিসের ফোন নম্বর তুমি কোথায় পেলে? বরফের গলায় জানতে চাইল বিদিশা।

ও-প্রান্তে পাগলের মতো হেসে উঠল বিদিশার স্বামী। হাসতেই লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর সহজ গলায় জবাব দিল, তোমাকে আমি প্রায়ই ফলো করি, তুমি টের পাও না। অফিসের

আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে হইহুল্লোড় ফুর্তি করতে করতে আমার কথা তুমি একেবারে ভুলেই গেছ। তোমাকে আমি দূর থেকে রোজ দেখি আর নতুন করে ভালোবাসায় পাগল হয়ে যাই।

অফিসের অপারেটর লাইন ট্যাপ করে যান্ত্রিকভাবে মন্তব্য করল, প্লিজ মেক ইট কুইক, ম্যাম। সো মেনি ইনকামিং কল্‌স আর ওয়েটিং।

বিদিশার ভয় করছিল। যে-দুঃস্বপ্নটা মুছে গেছে বলে মাসতিনেক ধরে ও নিশ্চিন্ত ছিল। সেই দুঃস্বপ্নটা আবার কুৎসিতভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে।

ও ছোট্ট মেয়ের মতো জেদি গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। প্লিজ, গেট লস্ট ফ্রম মাই লাইফ। কথার শেষে কেঁদে ফেলল বিদিশা।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রণজয় : ছিঃ মানু, শুধু-শুধু কাঁদতে নেই। আজ সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলব। তখন বুঝবে, একা-একা আমি কী কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। এখন রেখে দিই? টা-টা। আই লাভ য়ু, লাভ।

লাইন কেটে গেল।

অসাড় হাতে রিসিভার নামিয়ে রেখে কোমর থেকে রঙিন রুমাল বের করল বিদিশা। প্রাণপণে। কান্না চেপে চোখ মুছল।

ইন্টারকম টেলিফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে। বিদিশার বুকের ভেতরেও পাগলা ঘণ্টি বাজছে। সত্যিই কি আজ সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা করবে রণজয়? কোথায় দেখা করবে?

যেন অন্য কারও পায়ে ভর দিয়ে চক্রবর্তীসাহেবের টেবিলের দিকে এগোল বিদিশা। লক্ষ করল, নিজের সিট থেকে শেখর উদ্বিগ্ন চোখে ওকে দেখছে। আরও দু-একজন কলিগের চোখে কৌতূহল। এখন কী করবে ও?

কী ব্যাপার, বিদিশা, তোমাকে এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন? প্রশান্তলাল চক্রবর্তীর গলায় দরদ উথলে উঠছে? আবার চা দিতে বলি? তোমার চা এতক্ষণে ঠান্ডা জল হয়ে গেছে।

বিদিশা কোনওরকমে বলল, না, চা খাব না। তারপর শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেনসিল নিয়ে ডিকটেশন নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসল।

অফিসের দেওয়ালে বড় বড় কাচের জানলা। জানলার বাইরের ভিজে মেঘলা আকাশ মন খারাপ করে দিচ্ছে। হঠাৎই একটা বিদ্যুৎ-রেখা চোখে পড়ল বিদিশার। বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলেই ওর সেই ভয়ংকর রাতটার কথা মনে পড়ে যায়। চেনা রণজয়ের ভেতর থেকে একটা অচেনা রণজয় হঠাৎই উঁকি মেরেছিল সেই রাতে।

সেদিনটাও ছিল আজকের মতোই মেঘলা। ঘন-ঘন বৃষ্টি পড়ছিল আকাশ ভেঙে। আর সেই সঙ্গে বিদ্যুতের আলপনা।

রণজয় বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে বাড়ি ফিরল। তখন রাত কত হবে? বড় জোর নটা। সকালে বেরোনোর সময় ও বলেই গিয়েছিল ফিরতে একটু দেরি হবে। তবে দেরি বলতে বিদিশা ভেবেছিল সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। কারণ রোজ ও ছটার মধ্যে বাড়ি ফেরে।

ওর হেড অফিস বালিগঞ্জে। বছরদুয়েক হল রণজয় হেড অফিসেই আছে। এখানে নতুন একটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট উইং ভোলা হয়েছে–ও-ই সেটার গ্রুপলিডার। কোনও কোনও দিন অফিসের কাজে আটকে গেলে ও ফোন করে দেয় বাড়িতে।

বাড়িতে শুধু বিদিশা আর রণজয়ের মা। ছোট দোতলা বাড়ির একতলায় মা থাকেন, দোতলায় রণজয়-বিদিশা। ঠিকে কাজের বউ দু-বেলা কাজ করে যায়।

কলিং বেলের ঘণ্টা শুনে বিদিশাই খুলে দিয়েছিল সদর দরজা।

ভিজে সপসপে রণজয় দরজায় দাঁড়িয়ে। রাস্তার মলিন আলো তেরছাভাবে এসে পড়েছে। ওর ভিজে পোশাকে।

আজ ছাতা না নিয়ে ভীষণ ভুল করেছি। রণজয় হেসে বলল।

সদর দরজা বন্ধ করে ওর পিছন পিছন শোয়ার ঘরে এসেছিল বিদিশা। রণজয় অফিস থেকে অন্তত একটা ফোন করতে পারত বিদিশাকে। সারাটা সন্ধে ঘরে বন্দি হয়ে কারই বা টিভি দেখতে ভালো লাগে!

ফিরতে এত দেরি হল?

বিদিশা প্রশ্নটা নির্দোষভাবেই করেছিল, কৈফিয়ত চাওয়ার জন্য নয়।

রণজয় ওর দিকে পিছন ফিরে ভিজে জামা ছাড়ছিল গা থেকে। পলকে ঘুরে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিল বিদিশার গালে। বিদিশা ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে।

কৈফিয়ত দেওয়া আমি পছন্দ করি না। কঠিন গলায় মন্তব্য করেছিল রণজয়।

বিদিশা হঠাৎই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। গালে হয়তো ব্যথা পেয়ে থাকবে, কিন্তু সেই ব্যথাটা ও টের পাচ্ছিল না। ভালোবাসার পুরুষ রণজয়ের আচরণ ওকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

বাইরে মেঘ ডাকছিল। কিন্তু বিদিশার মনে হচ্ছিল মেঘ ডাকছে ওর বুকের ভেতরে। মেঝেতে আধশোয়া অবস্থায় ওর শরীর কাঁপছিল থরথর করে।

ভিজে জামাটা মেঝেতে একপাশে ফেলে দিয়ে রণজয় এগিয়ে এল বিদিশার কাছে।

বিদিশা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ওর ঠোঁটের কোণ জ্বালা করছিল। বোধহয় কেটে গেছে।

রণজয় ওকে সাবধানে তুলে বসাল বিছানায়। বিদিশা তখন মাথা নীচু করে কাঁদছে। ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে।

কেঁদো না, মানু, কেঁদো না– ওকে আদর করে বোঝাতে চাইছিল রণজয়, অন্যায় করেছ, তার শাস্তি পেয়েছব্যস, মিটে গেছে।

মিটে গেছে! চোখ মুছে অচেনা রণজয়কে দেখতে চাইল বিদিশা। কিন্তু ততক্ষণে চেনা রণজয় আবার ফিরে এসেছে। দু-চোখে ভালোবাসা। আর দু-হাতে আদর করছে বিদিশাকে। বিদিশা কাঠ হয়ে বসেছিল।

কিন্তু রণজয়ের আদর বাড়তেই লাগল।

ওর ভিজে প্যান্ট থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল মেঝেতে। গায়ের ভিজে গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেলল রণজয়। পরক্ষণে প্যান্ট ইত্যাদিও।

বিদিশা প্রথম ধাক্কাটা তখনও সামলে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় ধাক্কাটাও পারল না।

রণজয় খ্যাপা ষাঁড়ের মতো হিংস্রভাবে আদর করতে লাগল ওকে। জামাকাপড় লন্ডভন্ড হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বিছানাও।

ঘরের টিউব লাইট নির্লজ্জভাবে জ্বলছে। জ্বলছে বিদিশার শরীরটাও। বাইরে মেঘের ডাক যেন রণজয়ের গর্জন। তীব্র এক জ্বালায় ওর শরীরটা বিদিশাকে আঁকড়ে মরিয়া হয়ে ছটফট করছে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বিদিশার ভেতরেও।

একসময় মেঘের গর্জন, বৃষ্টি—দুই-ই কমে এল। অসাড় মন নিয়ে বিদিশা এলোমেলোভাবে পড়ে রইল বিছানায়। শুধু ওর ক্লান্ত দুটো চোখ রণজয়কে দেখতে লাগল। এই মানুষটাকে ও ভালোবেসে সাতমাস আগে বিয়ে করেছিল!

রণজয় একটা পাজামা আর গেঞ্জি পরে নিয়ে পাখার বাতাসে চুল শুকোচ্ছিল। মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে ও নির্লিপ্ত গলায় বলল, খেতে দাও। খিদে পেয়েছে।

বিদিশা সেই রাতেই মনে-মনে টের পেয়েছিল ওর বিয়েটা মরে গেছে।

কিন্তু তার পরেও সতেরোটা মাস ওকে সেই লাশটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। অবশ্য তারপর আর পারেনি।

থ্যাংক য়ু, বিদিশা। তুমি টেবিলে গিয়ে একটু রেস্ট নাও। এই চিঠিগুলো সেকেন্ড হাফে টাইপ করে দিলেও চলবে।

বিদিশা চমকে উঠে খেয়াল করল প্রশান্ত চক্রবর্তী ওর সঙ্গে কথা বলছেন। বিদিশা ওর হাতের শর্টহ্যান্ড খাতার দিকে দেখল। দেখে অবাক হয়ে গেল। পুরোনো কথা ভাবতে-ভাবতেও কী করে যেন যান্ত্রিকভাবে ও ডিকটেশন নিয়ে ফেলেছে।

স্যার, আমি আসছি বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিদিশা।

প্রশান্ত চক্রবর্তী কথাটা বোধহয় শুনতে পাননি, কারণ চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ওর দিকে। কানে খাটো বলে সবসময় ওঁর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। এখন বিদিশার চেঁচাতে ভালো লাগছিল না।

যদি দরকার হয় বোলো। ছুটির পর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তোমাকে ভীষণ আপসেট দেখাচ্ছে।

বিদিশা কোনও জবাব না দিয়ে ফিরে গেল নিজের সিটে।

ওদের সেকশনে তিনটে এক্সটেনশন লাইন আছে। তিনটে টেলিফোনের দিকেই ভয়ে-ভয়ে দেখছিল বিদিশা। এই বুঝি একটা ফোন বেজে উঠল, আর কেউ ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, মানু, কেমন আছ?

টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল বিদিশা। শরীরটা কেমন লাগছে। সেই সঙ্গে ঝিমুনি ভাব। রণজয় বলেছে, আজ সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলবে। কখন দেখা করবে? দেখা। করে কী বলবে?

অফিস ছুটির সময় যতই কাছে এগিয়ে আসছিল, বিদিশার ভয় ততই বাড়ছিল। রণজয়ের কথা কাকে বলবে ও? শেখরকে? বোসদাকে? নাকি চক্রবর্তীসাহেবকে?

অফিসে কেউ জানে না বিদিশার বিয়ে হয়েছে। কপালে বা সিঁথিতে কোনওরকম সিঁদুরের ছোঁয়া নেই। নামও বিদিশা রায়—সুধাময় রায় ও অরুণা রায়ের মেয়ে। এখন যদি ও হঠাৎ করে কাউকে বলে ওর একটা স্বামী আছে, তাহলে কেমন শোনাবে ব্যাপারটা?

সারাটা দিন এরকম তোলপাড় মন নিয়ে কেটে গেল বিদিশার। বিকেলে হঠাৎই একসময় ওর খেয়াল হল অফিস ছুটি হয়ে গেছে।

ছুটির পর ওরা বেশ কয়েকজন দল বেঁধে পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত যায়। তারপর কেউ পাতাল রেল, কেউ বাস কিংবা মিনিবাস, আর কেউবা চার্টার্ড বাসের যাত্রী হয়ে যে যার দিকে চলে যায়।

বিদিশার সঙ্গে শেখর আর বোসদা প্রায় রোজই বেরোন। আজ ওঁরা দুজন ছাড়াও রয়েছে। জুনিয়ার ড্রাফটসম্যান অশোক চন্দ্র, রিসেপশনিস্ট দেবলীনা পাল, টাইপিস্ট অতনু সরখেল আর অ্যাকাউন্টস-এর সুতপা দাস।

সুতপাদি আর দেবলীনা ক্যামাক স্ট্রিটে কীসব কেনাকাটা করবে বলে চলে গেল। অতনু সরখেল রোজই ধর্মতলা পর্যন্ত হেঁটে যায়, তারপর সেখান থেকে হাওড়ার বাস ধরে। তাই ও

রাস্তা পার হয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে চলে গেল।

শেখর থাকে টালিগঞ্জে। পাতাল রেলে যাতায়াত করে। বোসদা, থাকেন শোভাবাজারে। তিনিও পাতালযাত্রী। অশোক চন্দ্রর বাড়ি রাজাবাজারের কাছে। ও পার্ক স্ট্রিটের মোড় থেকে বাস ধরে।

বিদিশা ভাবছিল, কার সঙ্গে কত বেশিক্ষণ ও থাকতে পারে। রণজয় ওকে প্রায়ই ফলো করে, বিদিশা টের পায় না। এখনও কি ফলো করছে না কি? ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ কয়েকবার পিছনে তাকাল বিদিশা। কিন্তু অফিস ছুটির ভিড়, গাড়ির ব্যস্ততার মধ্যে ফরসা রোগা চেহারার কোনও মানুষকে খুঁজে পেল না।

শেখর বলল, কী ব্যাপার, ম্যাডামকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

বিদিশা ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ, একটু ঝামেলা হয়েছে। পরে বলব।

বোসদা পান চিবোতে চিবোতে বললেন, এ কী ধরনের পারশিয়ালিটি, মা জননী? সেনসাহেবকে বলবেন, আর আমি বাদ! আমি কি বুড়ো বলে এজ বারে আটকে গেলাম?

ওরা তিনজনই হেসে উঠল।

তখন অশোক বলল, ঠিক বলেছেন, বোসদা, আমি ছোট বলে এজ বারে আটকে গেছি।

এইরকম হাসি-ঠাট্টা করতে করতে ওরা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে গেল।

তখন বিদিশা আচমকা বলে উঠল, বোসদা, আমি আপনার সঙ্গে মেট্রোতে যাব। শোভাবাজারে নেমে অটো ধরব।

শেখর একটু অবাক হয়ে গেল। কারণ বিদিশা সাধারণত বাসে যায়। কিন্তু কিছু বলল না।

বোসদা শেখরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললেন, সেন মহাশয়, আমাকে তুমি যতটা বুড়ো ভাব ঠিক ততটা বুড়ো আমি নই।

উত্তরে শেখর হাসল।

ওরা তিনজনে কথা বলতে বলতে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। তখনও বিদিশা পিছন ফিরে শেষবারের মতো রণজয়কে খুঁজল।

.

সল্ট লেকের সি.এ.পি. ক্যাম্প বাস স্টপে যখন নামল, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে মাথায় দিল বিদিশা।

চৌরাস্তার আইল্যান্ডটা জালের বিশাল ঘেরাটোপে ঢাকা। একসময়ে এটা পাখির খাঁচা ছিল। এখন পাখি নেই–শুধু শূন্য খাঁচা পড়ে আছে।

খাঁচাটাকে বাঁ-দিকে রেখে রাস্তা পার হল বিদিশা। বাস স্টপে মাত্র তিন-চারজন মানুষ। প্রত্যেকেরই মাথায় ছাতা। রাস্তার আলোয় ছাতার ভিজে কাপড় চিকচিক করছে।

বিদিশা ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। অফিস ছটায় ছুটি হলেও দু-একদিন এমনই

দেরি হয়ে যায়। উলটোডাঙার রেল ব্রিজের নীচটায় জ্যাম থাকে। আজও তাই।

সি.এ.পি. ক্যাম্প স্টপেজে বিদিশা একাই নেমেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা নিরাকার আতঙ্ক বাসা বেঁধে রয়েছে ওর মনে। তাই ভিজে রাস্তায় চটপট পা ফেলে হাঁটা দিল।

ওর বাড়ি সি.ই. ব্লকে। সুইমিং পুলের মোড় ছাড়িয়ে প্রায় আর এক চৌরাস্তার মোড়ের কাছাকাছি। সেখানেও একটা পাখির খাঁচা আছে।

সারাদিন মেঘলা আর বৃষ্টি। তাই রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। কখনও কখনও একটা-দুটো বাস ছুটে যাচ্ছে। সেই শব্দ মিলিয়ে গেলেই এলাকাটা চুপচাপ।

রাস্তায় কয়েকটা নেড়ি কুকুর বৃষ্টির মধ্যেই ঝগড়া করছে। পরদা ঢাকা একটা সাইকেল রিকশা সুইমিং পুলের দিকে চলে গেল। সামনে যতদূর নজর চলে, কোনও মানুষজন নেই। এমনকী সাইকেল রিকশা স্ট্যান্ডেও কোনও রিকশা দাঁড়িয়ে নেই।

বিদিশা পিছন ফিরে একবার দেখল। না, সন্দেহজনক কাউকে নজরে পড়ছে না। রণজয় কি তাহলে মিথ্যে ভয় দেখাল! কিন্তু ভয় দেখানোর প্রশ্ন উঠছে কেন? একজন স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। এর মধ্যে ভয়ের কী আছে! ভয়ের কিছু থাকত না, যদি না বিদিশা রণজয় সম্পর্কে কিছু কথা জেনে ফেলত। যে রাতে ও কথাগুলো জানতে পেরেছিল সেই রাতেই রণজয় ওর বাঁ গালে ভালোবাসায় স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল।

সুইমিং পুলের মোড়টা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগোতেই বিদিশার নিজেকে আরও একা মনে হল। রাস্তার কোনও আলো জ্বলছে না। তবুও সামনের আইল্যান্ডের প্রকাণ্ড খাঁচাটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগোলেই ডান দিকের সরু গলিটা পেয়ে যাবে বিদিশা। তারপর এক মিনিটেই পৌঁছে যাবে বাড়ির দরজায়।

উলটোদিকের রাস্তায় সি. এফ. ব্লকের বাড়িগুলোর ধার ঘেঁষে একটা মারুতি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির ছাদে আলো পড়ে বৃষ্টির জল চিকচিক করছে। কিন্তু গাড়ির রং ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না।

রণজয়ের গাড়ি নেই। অন্তত বিদিশা যখন ওকে ছেড়ে চলে আসে, তখন ছিল না। বিদিশার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ওই তো, কাঠগোলাপ গাছটা এসে গেছে। তার পাশ দিয়েই সরু গলিটা চলে গেছে। গলির শেষে পিচের রাস্তা। রাস্তার শেষে বিদিশাদের বাড়ি।

আজকের দিনটা কোনওরকমে তাহলে কাটল। ভাবল বিদিশা।

আর ঠিক তখনই মারুতি গাড়িটার তীব্র হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বলে উঠল। বিকট গর্জন করে পাগলের মতো বাঁক নিয়ে গাড়িটা ছুটে এল বিদিশার দিকে।

আপ আর ডাউন লেন—দু-রাস্তার মাঝে সরু একফালি ঘাসে ঢাকা জমি। জমিটা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। আড়াআড়ি আসতে গিয়ে দ্রুতগতির গাড়িটা উঁচু জমিতে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। তার পরেই বিশ্রী গর্জন করে ঠিকরে এল বিদিশাকে লক্ষ করে।

বিদিশা চিৎকার করতে গিয়ে টের পেল ওর গলা দিয়ে কোনওরকমে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলো ওকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। হ্যালোজেন বাতির আলোয় বৃষ্টির ঝিরঝিরে ফোঁটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ও একপাশে সরে যেতে গিয়ে হোঁচট খেল। টাল খেয়ে নিজেকে সামলে নিতে পারলেও ছাতাটা পড়ে গেল হাত থেকে।

গাড়িটা ওর ঠিক পাশ দিয়ে খ্যাপা জন্তুর মতো ছুটে গেল। তারপর বিশ্রী শব্দ তুলে ব্রেক কষে একটা ঝটকা দিয়ে থামল।

পরক্ষণেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে ইউ টার্ন নিল গাড়িটা। বিদিশা তখন বৃষ্টিভেজা পিচের রাস্তা ধরে পাগলের মতো ছুটছে।

গাড়িটা এবারে ধেয়ে এল আরও জোরে। বিদিশার গায়ে মরণের বাতাস ছুঁইয়ে ওর ঠিক গা ঘেঁষে ঠিকরে গেল সামনে। কিছুটা গিয়ে আচমকা ব্রেক কষল। তারপর গর্জন তুলে বাঁক নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিদিশার মুখোমুখি। আবার পাগল করা গতিতে ছুটে এল ওর দিকে।

বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, বৃষ্টিভেজা কালো রাতে গাড়িটা বিদিশাকে নিয়ে ঠিক সেরকম খেলতে লাগল। ইঞ্জিনের গর্জন, হেডলাইটের তীব্র আলো, চাকার শব্দ মেয়েটাকে দিশেহারা করে দিচ্ছিল। এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করতে করতে ও ধাক্কা খেল কাঠগোলাপ গাছটার গুঁড়িতে। পলকের জন্য শরীরটা একটা ভয়ংকর ঝাঁকুনি খেল। তার পরই ও পড়ে গেল মাটিতে।

গাড়িটা ওকে লক্ষ করে ছুটে আসছিল। ওকে পড়ে যেতে দেখেই গাড়িটা থামল। হেডলাইটের উজ্জ্বল চোখ বিদিশার দিকে স্থির।

বিদিশা কেমন অসাড় হয়ে গেলেও চেতনা হারায়নি। ও তাকিয়ে ছিল মারুতি গাড়িটার দিকে। কিন্তু চোখ ধাঁধানো আলোয় স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু বৃষ্টির ফোঁটা ঝিরঝির করে পড়ছে।

গাড়ি থেকে কেউ নামল। কারণ দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ হল। তারপর হেডলাইটের আড়াল করে একটা রোগা শরীর অলস পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল বিদিশার দিকে।

বিদিশা চিৎকার করতে চাইছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছিল না। ওর চোখ সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল এগিয়ে আসা কালো ছায়াটার দিকে।

এক সময় মানুষটার তীব্র ছায়া এসে পড়ল বিদিশার গায়ে। আর তখনই আলতো গলায় সে বলে উঠল, মানু, কেমন আছ?

বিদিশার শীত শীত করে উঠল। ওর শাড়ি বৃষ্টিতে ভেজা সপসপে। কাঁধের ব্যাগ কোথায় ছিটকে পড়েছে। গলার কাছে একটা পাথরের বল আটকে রয়েছে কিছুতেই ওকে চিৎকার করতে দিচ্ছে না। শুধু চাপা আঁক-আঁক শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। ওর

চেতনার জগৎ ঘিরে রয়েছে চোখ ধাঁধানো হেডলাইটের আলো, একটা লিকলিকে কালো ছায়া, আর শ্বাস রোধ করা এক আতঙ্ক।

ওর ফরসা মুখের সৌন্দর্য কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। আতঙ্কে কুঁকড়ে যাওয়া মুখ দেখে ওকে মোটেই চেনা যাচ্ছিল না। জল কাদা মাখা ওর অসহায় শরীরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। বিদিশার সেদিকে কোনও খেয়াল নেই।

অশরীরী ছায়াটা চেনা গলায় আবার কথা বলল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, মানু। তোমাকে ছেড়ে আমি ভীষণ কষ্টে আছি। এতদিন একষ্ট টের পাইনি, কিন্তু এখন টের পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। আমার ফাঁকা জায়গাটা ভরে দাও। নইলে আমি মরে যাব..বিশ্বাস করো। তুমি আমার বাড়িতে উঁহু, আমার বাড়িতে নয়, তোমার বাড়িতে ফিরে এসো, তোমাকে অনেক কথা বলব। আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারো না, মানু। মানুষের কি ভুল হয় না! অনুতাপে অনুতাপে আমি জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো–।

লোকটা শেষ দিকে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে বিদিশার আরও কাছে এগিয়ে এল। যখনই সে বিদিশার ওপরে ঝুঁকে পড়তে গেল, তখনই যেন গলার স্বর খুঁজে পেল ও।

কান ফাটানো এক মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল বিদিশা। হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া কোণঠাসা পশু যেভাবে চিৎকার করে, অনেকটা সেইরকম। বৃষ্টি ভেজা রাতে সে-চিৎকারের প্রতিধ্বনিও যেন শুনতে পেল ও। আর একইসঙ্গে শুনতে পেল ছুটে-আসা কয়েকটা পায়ের শব্দ।

রাস্তার ধারের কয়েকটা বাড়ির দরজা-জানলা খুলতে শুরু করেছে। হেডলাইটের আলো পেরিয়ে চৌকো আলোর খোপগুলো আবছাভাবে দেখতে পেল বিদিশা। ওর গলার ভেতরটা জ্বালা করছিল। সেই অবস্থাতেও ও আরও দুবার চিৎকার করে উঠল।

বিদিশা দেখতে পেল, ছায়ামূর্তিটা কয়েক মুহূর্ত দোনামনা করে এদিক-ওদিক পা বাড়াল। তারপর এক ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠল। জোরালো শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির দরজা। তারপর তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো বেপরোয়া বাঁক নিয়ে ছিটকে গাড়িটা গেল দূরে। যাওয়ার সময় রাস্তার কাছ ঘেঁষে রাখা একটা ইটের পাঁজায় গাড়ির বাঁ দিকের হেডলাইটটা ধাক্কা খেল। ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভাঙল, আলো নিভে গেল। চাকায় কাঁচকাঁচ শব্দ তুলে আঁকাবাঁকা পথে ছুট লাগাল গাড়িটা। মিশে গেল রাতের আঁধারে।

বিদিশা বোধহয় কয়েকমিনিটের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কারণ হঠাৎই ও দেখতে পেল, ও দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দু-পাশ থেকে ধরে রয়েছে দুজন পথচারী। একজন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে ওর ছাতা আর ব্যাগ। আর একজন ওকে জিগ্যেস করছে, কী হয়েছে, দিদি?

লোকগুলোকে এক পলক দেখল বিদিশা। দুজনকে দেখে রাজমিস্ত্রি বা রিকশাওয়ালা বলে মনে হয়। তারাই আজ বিদিশাকে বাঁচিয়েছে।

বিদিশা থরথর করে কাঁপছিল। কোনওরকমে ও বলল, আমি বাড়ি যাব।

কোথায় বাড়ি বলুন, আমরা এগিয়ে দিয়ে আসছি– একজন বলল।

গাড়িটা কি আপনাকে ধাক্কা মেরে পালাল? আর একজন বলল।

বিদিশা মাথা নেড়ে জানাল, না। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগোল। দুজন মানুষ ওর পাশে-পাশে পা ফেলে ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল অরুণা-সুধাময় পর্যন্ত।

কলিং বেলের শব্দে দরজা খুললেন অরুণা। বিদিশার মুখ-চোখ-পোশাক দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে রে?

বিদিশা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, আগে এক গ্লাস জল দাও।

অরুণা আর কোনও কথা না বলে ব্যস্ত পায়ে জল আনতে চলে গেলেন।

বিদিশা ক্লান্ত পায়ে ওর ঘরে এল। হাতব্যাগ আলনায় ঝুলিয়ে ছাতাটা খুলে মেলে দিল পাখার হাওয়ায়। ভিজে কাপড়ে একটু-একটু শীত করছিল। আর একইসঙ্গে বিদিশা বুঝতে পারছিল, ওকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা রণজয়ের মাথায় যখন একবার ঢুকেছে, তখন সহজে ও ছাড়বে না। রণজয়কে বিদিশা যেভাবে চেনে, আর কেউ সেভাবে চেনে না। ওর অনেক ব্যাপার কাউকে খুলে বলেনি বিদিশা—বলতে পারেনি।

মা জল নিয়ে এলেন।

এক ঢোঁকে গ্লাসটা খালি করে দিল ও। তারপর একটা বড় শ্বাস ছাড়ল।

অরুণা আবার জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে বললি না তো!

রণজয়ের ব্যাপার। ও আবার আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে।

অরুণার ভুরু কুঁচকে গেল। কিন্তু বিদিশা আর কোনও কথা না বলে শুকনো জামাকাপড় নিয়ে চলে গেল বাথরুমের দিকে। অরুণা জানেন, নিজে থেকে না বললে কোনও কথা বের করা যাবে না এই মেয়ের মুখ থেকে।

বারান্দার লাগোয়া ঘরে টিভি চলছে। বাবা টিভি দেখছেন। গাছপালা, টিভি আর খবরের কাগজ—এই নিয়ে বেশ আছেন। তবে ছোটবেলা থেকেই বিদিশা আর বাপ্পাকে শিখিয়েছেন; যদি বাঁচতেই হয়, মাথা উঁচু করে বাঁচবে।

বাথরুমে ঢোকার সময় বিদিশা বাপ্পার গলা শুনতে পেল। ওর ছোট্ট ঘরে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছে। পড়া শেষ করেই ও ছুটে আসবে বিদিশার কাছে। ক্যাডবেরির খোঁজ করবে। আজ নানান দুশ্চিন্তায় ওর ক্যাডবেরির ব্যাপারটা ভুলেই গেছে বিদিশা।

মা-বাবা আর ছোট ভাইকে নিয়ে কী সুন্দরভাবেই না জীবন কাটাচ্ছিল বিদিশা! কোথা থেকে এক দুঃস্বপ্নের মতো এসে হাজির হল রণজয়। মাসতিনেক আগেও লিগাল

সেপারেশন আর ডিভোর্সের ব্যাপারে দিব্যি রাজি ছিল। এখন হঠাৎ মাথা বিগড়ে গেছে।

আর কেউ না জানুক, অন্তত বিদিশা তো জানে, হঠাৎ হঠাৎ মাথা বিগড়ে যাওয়াটাই রণজয়ের অসুখ। তার ওপরে রয়েছে ওর অস্বাভাবিক বড় মাপের অপ্রতিসম করোটির ব্যাপারটা। ওর মাথার খুলিকে নাক বরাবর লম্বালম্বি ভাগ করলে দুটো ভাগ মোটেই সমান পাওয়া যায় না। বাঁ-দিকের ভাগটা ডান দিকের তুলনায় অনেক বড়। ডাক্তারি মতে এটা খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

বাথরুমে গা ধুয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে রণজয়ের কথা ভাবছিল বিদিশা। ও মিথ্যে বলেনি। ও নিয়মিত অনুসরণ করছে বিদিশাকে—সে অফিস-পাড়াতেই হোক বা সল্ট লেকেই হোক। ফোন করে ফলো করে রণজয় তো ওকে পাগল করে দেবে।

আচ্ছা, শেখরকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? প্রশ্নটা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল বিদিশা। তারপর ঠিক করল, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শেখরকে ফোন করবে। রাতে ও পাড়ার ক্লাবে আড্ডা মারতে বেরোয়। শেখরই বলেছে। বাড়ি ফেরে সাড়ে দশটা নাগাদ। তারপর নতুন কোনও পেপারব্যাক নিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অবশেষে বই পড়তে-পড়তে ঘুম।

বেশ আছে মানুষটা! ওকে হিংসে করতে ইচ্ছে হল বিদিশার। কী চমৎকার দুশ্চিন্তাহীন সুখী জীবন! রণজয়কে নিয়ে একইরকমই একটা জীবন চেয়েছিল বিদিশা। অথচ সব কীরকম গোলমাল হয়ে গেল।

সেই ভয়ংকর রাতের পর থেকে রণজয়ের অস্বাভাবিক এলোমেলো আচরণ আরও বেশি করে নজরে পড়েছিল। ও খুব সাবধানে কথা বলত রণজয়ের সঙ্গে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও রেহাই পায়নি। রণজয়ের মা ওকে রেহাই পেতে দেননি।

বিয়ের পর সেই মেঘ-বৃষ্টির রাতে প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল বিদিশা। সারাটা রাত ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু নিজের অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে ও দায়ী করবে? ও-ই তো ভালোবেসে বিয়ে করেছিল রণজয়কে।

পরদিন রণজয় অফিসে বেরিয়ে গেলে ও দুপুরের দিকে মাকে ফোন করেছিল।

মা, মানু বলছি।

হ্যাঁ, বল, কী খবর? অরুণা সহজ গলায় কথা বলেছেন।

আমি খুব..খুব..ঝামেলায়... চোখে জল এসে গেছে বিদিশার। গলা ধরে গিয়ে কথা আটকে গেছে মাঝপথে।

কী হয়েছে, মানু? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন অরুণা ও কাঁদছিস কেন? রণজয় কিছু বলেছে?

ন-না। একটু চুপ করে থেকে বিদিশা বলেছে, আমি তোমাদের কাছে গিয়ে কদিন থাকব, মা–

মন খারাপ লাগলে তুই আজই চলে আয়। তুই এলে বাপ্পাও খুশি হবে, আমাদেরও ভালো লাগবে।

বিদিশা ফোন ছেড়ে দিয়ে মনে-মনে ঠিক করেছিল। সেদিনই চলে যাবে সল্ট লেকের বাড়িতে।

রণজয় অফিস থেকে সাড়ে ছটা নাগাদ ফিরে এল। হাত-মুখ ধুয়ে ওর কাছে এসে দু গাল চেপে ধরল দু-হাতে। কয়েকটা আদরের চুমু খেয়ে বলল, চলো, তোমাকে সল্ট লেকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তবে চারদিনের বেশি থেকো না। আমি এখানে বের হয়ে যাব।

বিদিশা হতবাক হয়ে গেল। রণজয় কি মন পড়ে নিতে জানে? ও কী করে জানল যে, বিদিশা সল্ট লেকে যাবে বলে মন ঠিক করেছে! কিন্তু গতকাল রাতের কথা ভেবে কোনও প্রশ্ন করল না বিদিশা। কিন্তু মনের ভেতরে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল।

বেশ মনে পড়ে, ওকে ভালোবেসে অত্যন্ত যত্ন করে সল্ট লেকে পৌঁছে দিয়েছিল রণজয়।

বাপ্পার জন্য একটা ক্যাডবেরি চকোলেট কিনে নিয়ে গিয়েছিল। হেসে-হেসে কথা বলেছিল মা-বাবার সঙ্গে।

বিদিশা অবাক হয়ে দেখেছিল চেনা রণজয়কে। তাই শেষ পর্যন্ত মাকে কোনও কথা বলতে পারেনি ও। ভেবেছে, গতকাল রাতের ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা।

সল্ট লেকের রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে রণজয় ফিরে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে।

তারপর বেশ কয়েকটা দিন স্বাভাবিকভাবে কেটে গেছে। অচেনা মানুষটা মাথা চাড়া দেয়নি চেনা রণজয়ের ভেতর থেকে। কিন্তু একটা ব্যাপার অবাক হয়ে লক্ষ করত বিদিশা। সারাদিন অফিসে কাটালেও রণজয় ওর অনেক কথা টের পেয়ে যেত।

অনেকদিন ধরেই একটা সন্দেহের কাটা বিঁধছিল বিদিশার মনে। সন্দেহটা ঠিক কি না সেটা যাচাই করতে একদিন ও মাকে ফোন করল। তারপর কথায় কথায় বাপ্পার লেখাপড়ার কথা জিগ্যেস করল। বিদিশা জানে বাপ্পার পড়াশোনার কথা জিগ্যেস করলে মা সাতকাহন জবাব দেয়। তাই মাকে প্রশ্নটা করেই ও রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে টেবিলে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে নেমে এসেছে একতলায়।

রণজয়ের মায়ের ঘরে সন্তর্পণে উঁকি মেরে বিদিশা দেখল, ও যা ভেবেছে তাই।

এ বাড়িতে টেলিফোনের প্যারালাল লাইন আছে। একটা দোতলায় বিদিশাদের শোয়ার ঘরে, আর একটা রণজয়ের মা তরুবালার ঘরে।

সেই বিধবা ভদ্রমহিলা এখন টেলিফোনের রিসিভার কানে চেপে ধরে একমনে আড়ি পেতেছেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি পরে ফোন করবেন ছেলের অফিসে, গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো ঢেলে দেবেন ওর কানে।

প্যারালাল লাইনে খুব সহজেই আড়ি পাতা যায়। একটা টেলিফোনে কেউ ফোন করলে অন্য টেলিফোনটায় টিকটিক শব্দ হয়।

বিদিশার সামান্য নড়াচাড়া তরুবালা বোধহয় টের পেয়েছিলেন। কারণ চকিতে চোখ ফেরালেন দরজার দিকে। রিসিভার তখনও কানে ধরা।

না, বিদিশাকে দেখে রণজয়ের মা বিশেষ বিচলিত হননি। সবসময় হুকুম করতে অভ্যস্ত এই মহিলা সহজে হার মানেন না। বিয়ের পরেও রণজয়কে ছোট ছেলের মতো নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বিদিশার সামনেও এই ধরনের হুকুম করতে তার বাধে না।

রণজয় এমনিতে যতই দাপট দেখাক না কেন, মা তরুবালার কাছে সে বাধ্য শিশু। তরুবালার শরীরে শক্ত বাঁধুনি, মনেও তাই। চোখের দৃষ্টি তীব্র—যেন গভীরতা মাপার যন্ত্র। যে সব শাড়ি জামাকাপড় পরেন তাতে সাদার ভাগ কম। তবে সিঁথি শূন্য।

কিছু বলবে, বিদিশা? অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় জিগ্যেস করলেন তরুবালা। প্যারালাল টেলিফোন লাইনে অকারণে রিসিভার কেন চেপে ধরে আছেন তার কৈফিয়ত ছেলের বউকে দেওয়ার কোনও চিহ্ন নেই।

বিদিশা হেরে গেল। কী বলবে ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত না, কিছু না বলে ফিরে এসেছিল দরজা থেকে। চলে আসার আগে তরুবালার কৌতুকের স্মিত হাসি নজরে পড়েছিল ওর।

দোতলায় এসে বিদিশা যখন আবার ফোনে কথা বলল তখন অরুণা মেয়েকে নানান প্রশ্ন আর বকাবকি শুরু করলেন। মেয়ে কোনও জবাব দিল না। ওর ক্রমশ নিজেকে বন্দি বলে মনে হচ্ছিল। টেলিফোন রেখে দিয়ে বিছানায় খোলা জানলার কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে

নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছিল ও। তখন পাশের বাড়ির প্লাস্টার চটে যাওয়া ফাটল-ধরা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা কচি অশ্বত্থ গাছ ওকে দেখছিল। দুপুরের নির্জন পরিবেশ ট্রামের চাকার ঘরঘর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল বিদিশা। লোহার-লোহার ঘর্ষণ। সেই আঘাতের যন্ত্রণা ও টের পাচ্ছিল। ট্রামটা যেন ওর বুকের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

বাথরুমের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। বিদিশা চমকে উঠে প্রায় ভয়ের গলায় বলে উঠল, কে?

তোর জন্যে চা করেছি–জুড়িয়ে যাচ্ছে। মায়ের গলা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল বিদিশা। রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে চায়ের কাপ নিল। তারপর ডাইনিং হলের টেলিফোনটার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে শেখর সেনের নম্বর ডায়াল করল ও।

বিদিশাদের বাড়িতেও ফোনের প্যারালাল লাইন। একটা ডাইনিং হলে, আর একটা মা-বাবার শোয়ার ঘরে। কিন্তু টেলিফোনে আড়িপাতার অভ্যেস নিয়ে ওরা মানুষ হয়নি।

হ্যালো, শেখর সেন আছেন? ও-প্রান্তের মহিলা কণ্ঠের হ্যালো শোনামাত্রই প্রশ্নটা করল বিদিশা। গলা শুনে ওর মনে হল বোধহয় শেখরের বউদি ফোন ধরেছেন।

ধরুন। দিচ্ছি।

একটু পরেই চেনা গলার হ্যালো শুনতে পেল বিদিশা।

আমি বিদিশা বলছি।

আরে বলুন, আপনার জন্য কী শিভারি দেখাতে পারি। হাসিখুশি গলায় বলল শেখর।

না, না, বড়সড় কোনও শিভারি দেখাতে হবে না। শুধু কাল অফিসে আধঘণ্টা আগে আসতে হবে–পারবেন?

না পারার কী আছে! কিন্তু কেসটা কী বলুন, তো, ম্যাডাম?

কাল বলব। মন-টন বেশ শক্ত করে আসবেন। নিজের অজান্তেই হাসি-ঠাট্টার মেজাজটা ফিরে পাচ্ছিল বিদিশা। মারুতি গাড়ির ঘটনাটা যেন মুছে গেছে ওর মন থেকে।

কেন, মন শক্ত করব কেন? আমার আপনার ক্লোজ ইয়ের মাঝখানে কোনও উটকো থার্ড পার্টি এসে গেছে নাকি? হেসে জিগ্যেস করল শেখর।

বিদিশাও পালটা ঠাট্টা করে জবাব দিল, সে তো বরাবরই আছে। আমাদের বোসদা। তা ছাড়া ফোর্থ পার্টিকেও তো আপনি চেনেন–মহান মহামান্য প্রশান্তলাল চক্রবর্তী।

ও-প্রান্তে জোর গলায় হেসে উঠল শেখর ও এতগুলো পার্টিকে আমি কেমন করে ঠেকাই বলুন তো, ম্যাডাম?

না, শেখর, সিরিয়াসলি বলছি। কাল আপনাকে অনেকগুলো জরুরি কথা বলব। একটু ইতস্তত করে বিদিশা আরও বলল, কিন্তু ভয় হচ্ছে, আপনি আমার জন্যে না বিপদে জড়িয়ে পড়েন...।

বিদিশার কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা বলে উঠল, শেখর, বিপদ! মানে থ্রিল? আপনি তো জানেন, থ্রিলিং ব্যাপার আমার দারুণ লাগে। ঠিক ট্র্যাকে দৌড়োনোর মতো। কিন্তু এমনই কপাল, লাইফটা কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে। যাক, তবু আপনি একটু থ্রিলের ব্যবস্থা করেছেন। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

কাল তা হলে আধঘণ্টা আগে আসছেন তো?

অতি অবশ্যই।

টেলিফোন সেরে নিয়ে চা শেষ করল বিদিশা। তারপর ক্লান্তভাবে শোয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। যদি ঘুম এসে যায় আসুক। মা ডেকে খাইয়ে দেবেন।

চোখে ঘুম নেমে আসার সময় বিদিশা রণজয়ের মারুতি গাড়িটা দেখতে পেল। তীব্র হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বেলে খ্যাপা চিতাবাঘের মতো ভয়ংকর গতিতে ওকে লক্ষ করে ছুটে আসছে।

.

মঙ্গলবার গভীর রাতের দিকে মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিদিশার। তারপর আর ভালো করে ঘুম আসেনি। তখন থেকেই অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই বৃষ্টি থেমেছে ভোর ছটায়। শ্রাবণে-শ্রাবণে ভেজা ভিজে কাকের ডাকে বিদিশা বুঝতে পেরেছে গাঢ় মেঘের আড়ালে ভোর হয়েছে।

বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে অফিসে বেরোনোর আগে পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থেকেছে বিদিশা। এই বুঝি টেলিফোনটা বেজে উঠল। কাল রাতের ভয়ানক পাগলটা এই বুঝি শুরু করল নতুন পাগলামি!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ফোন আসেনি।

অফিসে যাওয়ার সময় দিব্যি সহজভাবে অকুস্থলটা পেরিয়ে গেল বিদিশা। গতকাল রাতের ঘটনাটা মনে হচ্ছিল যেন নিছকই কোনও স্বপ্ন। শুধু কাঠগোলাপ গাছটা থেকে খানিকটা দূরে ইটের পাঁজার সামনে ভাঙা কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে। সেই চকচকে কাচের টুকরোগুলো বিদিশার স্বপ্নকে সত্যি করে দিচ্ছিল।

ঠিক আটাশ মিনিট আগে অফিসে ঢুকল বিদিশা। দেখল, শেখর নিজের চেয়ার-টেবিলে হাজির।

ওকে দেখে হাসল শেখর। বিদিশাও হাসতে পারল। সত্যি, অফিসটা ওকে বাঁচিয়ে রাখার কোরামিন জোগায়।

বনজারা সাদা ইউনিফর্ম পরে অফিস ফ্লোরে পায়চারি করছিল। বিদিশাকে দেখে সুপ্রভাত জানাল। ওর ডিউটি অফিস-টাইমের একঘণ্টা আগে থেকে। ও অফিস ঝাড়পোঁছের তদারকি করে। দরজা-জানলা ঠিকঠাকমতো খুলে দেয়। ফাইলপত্র আলমারি থেকে বের করে টেবিলে-টেবিলে সাজিয়ে দেয়।

শেখরকে ডেকে নিয়ে নিজের সিটের কাছে চলে গেল বিদিশা। সেখানে গুছিয়ে বসল দুজনে। সামনের টেবিলে টাইপ মেশিন, পাশে শর্টহ্যান্ডের খাতা আর পেনসিল।

বড় কাচের জানলা দিয়ে মেঘলা আলো এসে পড়েছে বিদিশার মুখে। ওকে বড় বিষণ্ন অথচ সুন্দর লাগছিল।

শেখর, আপনারা কেউই জানেন না...আমার বিয়ে হয়ে গেছে। বিদিশা এমনভাবে কথাটা বলল, যেন খবরের কাগজের খবর পড়ে শোনাচ্ছে।

শেখর বিদিশার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর কথাটা শোনার পর ভোলা জানলার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে মেঘলা আকাশ দেখল। তারপর মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে টেবিলের ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের ডিজাইন দেখল কিছুক্ষণ। এক সময় মুখ তুলে তাকাল বিদিশার দিকেঃ তারপর? বলুন– আমি শুনছি।

বিদিশা বলতে শুরু করলসংক্ষেপে যেটুকু বলা যায় শেখরকে।

রণজয়কে ছেড়ে আসার পর তিনটে মাস এক অদ্ভূত যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছিল বিদিশার। ওর মনের ভেতরে চেনা আর অচেনা রণজয়কে নিয়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব চলছিল। হাজারবার জিগ্যেস করা সত্ত্বেও মাকে ও সব কথা খুলে বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল, ওর সঙ্গে আর থাকা যায় না, মা, কিছুতেই থাকা যায় না।

সেই ভয়ংকর রাতটার কথা মাকে বলেনি বিদিশা। কিন্তু মা যখন গালের কাটা দাগটা দেখিয়ে জিগ্যেস করেছিল, এ কী! কী করে কাটল?

বিদিশা কান্না চেপে বলেছিল, রণজয়...।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণা আর কোনও কথা জিগ্যেস করতে পারেননি।

ওর জীবনে চরম ঘটনাটা ঘটেছিল নভেম্বরের শেষ দিকে। শীত তখন চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে।

রণজয় ফোন করেছিল, ওর হেড অফিসে প্রোডাকশন মিটিং না কী যেন আছে। তাই ফিরতে রাত হবে। বিদিশা ছোট্ট করে হুঁ বলেছিল।

তারপর যথারীতি সংসারের কাজ নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। সন্ধের মুখে একবার মাকে ফোন করেছিল। বুঝতে পেরেছিল, তরুবালা আড়ি পেতেছিল। তবুও সাধারণ কয়েকটা কথাবার্তা বলেছিল মায়ের সঙ্গে।

রান্নাবান্না ইত্যাদির কাজ সেরে টিভি দেখতে বসেছিল বিদিশা। শুনতে পাচ্ছিল, নীচে তরুবালা টেপ রেকর্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট শুনছেন। রণজয়ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসে।

তরুবালা এমব্রয়ডারি কাজ খুব ভালো পারেন। তার হাতের কয়েকটা কাজ বাঁধানো রয়েছে একতলা-দোতলার ঘরের দেওয়ালে। রণজয়ও অল্পস্বল্প এমব্রয়ডারির কাজ জানে। মায়ের হাতের কাজে প্রশংসায় ও সবসময় পঞ্চমুখ।

বিদিশা বুঝেছে, রণজয়ের ভেতরের অনেকটাই দখল করে রয়েছেন তরুবালা।

প্রথম-প্রথম বিদিশা নিজের মতামত স্পষ্ট করে জানাত। দরকার হলে তর্কও জুড়ে দিতে স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু ওকে থাপ্পর মারার সেই অস্বাভাবিক ঘটনার পর ও নিজেকে গুটিয়ে

নিয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে একমত হওয়ার জন্য সবসময় প্রাণপণ চেষ্টা করত।

টিভি প্রোগ্রামটা ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল বিদিশার। তাই টিভি অফ করে ও চলে এসেছিল দোতলার ছোট্ট ঝুলবারান্দায়। নীচের গলিতে সন্ধেবেলার ব্যস্ততা। গলির মোড়ে তেলেভাজার দোকানে ভিড়। বড় রাস্তা দিয়ে হুসহুস করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল বিদিশা। ও ঘরে ফিরে এল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎই সাজতে শুরু করল।

তখনই ও লক্ষ করল, ড্রেসিং টেবিলে ধুলোর আস্তরণ।

সাজগোজ সংক্ষেপ করে ড্রেসিং টেবিলের ধুলো ঝাড়তে লেগে গেল বিদিশা। তারপরই ঘরটার অগোছালো অবস্থা চোখে পড়ল ওর। কোণের টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন ছড়ানো তার পাশে রণজয়ের এলোমেলো বইপত্র আর ফাইল। বিছানার চাদর অনেকদিন পালটানো হয়নি। পিলো কভারগুলোও বদলানো দরকার। আলনার জামাকাপড়গুলোও কীরকম বিচ্ছিরিভাবে অগোছালো হয়ে রয়েছে।

সুতরাং বিদিশা কাজে নেমে পড়ল।

সব কাজ শেষ করে ও যখন রণজয়ের ফাইলপত্রগুলো সাজিয়ে নিয়ে দেওয়ালের তাকে রাখতে যাচ্ছে তখনই ছোট মাপের মেডিকেল ফাইলটা নজরে পড়ল ওর।

বিদিশা প্রথম ভেবেছিল, ওটা বোধহয় রণজয়ের বাবার মেডিকেল ফাইল। এ-ফাইল এখানে কেন? তিনি মারা গেছেন প্রায় চার বছর। গ্যাসট্রিক, ডায়াবিটিস ইত্যাদি নানান রোগে ভুগতেন ভদ্রলোক। তরুবালার ঘরের দেওয়ালে তার ফটো আছে।

কিন্তু ফাইলের মলাট ওলটাতেই অবাক হয়ে গেল বিদিশা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই পাওয়া গেল রোগীর নামঃ রণজয় সরকার।

কী অসুখ হয়েছে রণজয়ের?

ফাইলটা নিয়ে বিছানায় বসে পড়ল বিদিশা। মেডিক্যাল রিপোর্ট আর প্রেসক্রিপশনের মতো একের পর এক ওলটাতে লাগল। বেশিরভাগটাই বুঝতে পারল না। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার জেনে ওর বেশ খটকা লাগল।

রণজয়ের মাথার খুলি সুষম নয়। লম্বালম্বি দুভাগ করলে বাঁ-দিকের অংশটা বেশ বড়। ওর মধ্যে আবেগের জটিলতা রয়েছে। ডাক্তারি ভাষায় লেখা যেসব টুকরো-টুকরো শব্দ বিদিশার নজর কাড়ল সেগুলো হল? মনস্ট্রাস প্যাথোলজিক্যাল ইনটেনসিফিকেশন অফ অ্যাবারেটেড সেনসুয়ালিটি, সাইকোপ্যাথিক স্টেট একসি, সাইকোনিউরোটিক টেন্ডেনসিস, অ্যালার্মিং ডিজঅর্ডার ইন দ্য ফ্রন্টাল লোব অফ দ্য ব্রেইন।

এ কোন অসুখে ভুগছে রণজয়!

বিদিশা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। রণজয়ের মাথার ঠিক নেই, মনেরও ঠিক নেই!

এতদিন যেসব অদ্ভুত আচরণ বিদিশা লক্ষ করেছে, তার আসল কারণ তা হলে এই! এই কারণেই চেনা রণজয়ের ভেতর থেকে হঠাৎ-হঠাৎ অসুস্থ মনের অচেনা রণজয় বেরিয়ে আসে।

ভাবতে-ভাবতে সময় বয়ে যাচ্ছিল। কোনওদিকেই খেয়াল ছিল না বিদিশার। ও রণজয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সাতটা বছরের কথা ভাবছিল। ওদের গল্পটা কীভাবে শুরু হয়েছিল, আর এখন কীরকম অস্বাভাবিক বাঁক নিয়ে জটিল পথে এগিয়ে চলেছে।

নীচের সদরে কলিংবেলের শব্দ নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে। বিদিশা সে শব্দ শুনতে পায়নি। তরুবালা নিশ্চয়ই দরজা খুলে দিয়েছেন। তাই চেনা পায়ের শব্দ উঠে এসেছে ওপরে। কিন্তু অন্যমনস্ক বিদিশা সেই শব্দটাও শুনতে পায়নি।

ব্যাপারটা ও টের পেল যখন রণজয় একেবারে ঘরে এসে ঢুকল।

এ কী! আমার কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ কেন? বিরক্ত রণজয়ের ভুরু কুঁচকে গেছে। বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে মুখে। টিউব লাইটের আলোয় মুখটা কেমন ফ্যাকাসে রক্তহীন দেখাচ্ছে।

হাতের ব্রিফকেস নামিয়ে রাখল মেঝেতে। দুটো লম্বা পা ফেলে চলে এল বিদিশার কাছে। বাঁ-হাতে নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরল ওর চুলের গোছা। এক হ্যাঁচকায় ওকে চিতপাত করে দিল বিছানায়।

ততক্ষণে অচেনা রণজয় বেরিয়ে এসেছে চেনা রণজয়ের মুখোশের আড়াল থেকে। ওর দু-চোখ পাগলের চোখ হয়ে গেছে। সেই চোখজোড়া এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে মরিয়া হয়ে কী যেন খুঁজছে।

বিদিশার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে গোপন মেডিকেল ফাইল। একটা আধো-আধো চিৎকার বোধহয় বেরিয়ে এসে থাকবে ওর ঠোঁট চিরে। এখন ওর চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

রণজয় দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন মনে করেনি।

বিদিশার মাথা তখনও কাজ করছিল। ও বুঝল, তরুবালার কাছে অচেনা রণজয় অচেনা নয়।

আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কোনওদিনও তোমার...।

ডান হাতের এক ঘুসি এসে পড়ল বিদিশার মুখের ওপরে।

ঠোঁট কেটে গিয়ে জিভে নোনতা স্বাদ পেল ও। রণজয়ের বাঁ হাত তখনও ওর চুলের মুঠি ধরে রেখেছে। আর অদ্ভুত এক জান্তব শক্তিতে বিদিশাকে কাবু করে রেখেছে।

রণজয়ের পাগল চোখ অবশেষে খুঁজে পেল দরকারি জিনিসটা। বিদিশা লক্ষ করল, রণজয় অবশেষে তাকিয়েছে রান্নাঘরের দরজার দিকে।

চোখের পলকে এক নৃশংস হ্যাঁচকা টানে বিদিশাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলল রণজয়। তারপর পাগলের মতো ছুটে গেল রান্নাঘরে। দু-এক সেকেন্ড পরেই ও যখন ফিরে এল, তখন ওর হাতে ধরা রয়েছে দশ ইঞ্চি লম্বা ফলার একটা চকচকে কিচেন নাইফ। তার ধারালো দিকটা করাতের মতো দাঁত কাটা।

ঝুঁকে পড়ে আবার বিদিশার চুলের মুঠি চেপে ধরল রণজয়। এক হ্যাঁচকা টানে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে ছুরি চেপে ধরল ওর বাঁ গালে কানের খুব কাছে।

ফাকিং বিচ! দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল বিদিশার উন্মাদ স্বামী। তারপরই অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে দিল।

ওই নোংরা কথাগুলো বলতে-বলতে ছুরিতে টান মারল ওর ডান হাত।

বিদিশা এবার চিৎকার করে উঠতে পারল।

চিৎকারটা যখন মাঝপথে তখনই ওর টুঁটি চেপে ধরল রণজয়ের জঙ্গি ডান হাত।

বিদিশার দম আটকে গেল। চোখ বড়-বড় করে ও নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রণজয়ের বিকৃত মুখের দিকে। ওর চোখে পড়ল করাতের দাঁতওয়ালা ছুরির ফলাটা। চকচকে ফলায় সামান্য রক্ত লেগে আছে।

বিদিশা এইবার ছটফট করতে শুরু করল। কে-ই বা সহজে মরতে চায়। রণজয়ের মুখ ওর মুখের ওপরে অনেকটা নেমে এসেছে। লম্বা-লম্বা চুল ঝরে পড়েছে রণজয়ের কপালে চোখে। ওর দাঁত বেরিয়ে আছে হিংস্রভাবে। ঠোঁটে লালা। চেনা রণজয়ের মুখোশটা

একেবারে সরে গেছে। সাইকিয়াট্রিস্ট-এর মন্তব্য মনে পড়ল বিদিশার : মনস্ট্রাস প্যাথোলজিক্যাল ইনটেনসিফিকেশন অফ অ্যাবারেটেড সেনসুয়ালিটি। এবং ওই মন্তব্যের অর্থ বোধহয় এই মুহূর্তে পুরোপুরি বুঝতে পারল ও।

আচমকা ওকে ছেড়ে দিল রণজয়। ছুরিটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। তারপর মেডিকেল ফাইলটা তুলে নিল বিছানার কাছ থেকে। ওটা নিজের ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রেখে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ও। চোখ বুজে নিজের কপালে মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

বিদিশা কাশতে কাশতে উঠে বসছে বিছানার। গলায় ভীষণ ব্যথা। বাঁ-গালে অসম্ভব জ্বালা করছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গলায়, কাঁধে, বুকে। তীব্র কান্না উঠে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে, কিন্তু বিদিশা কাঁদতে পারছিল না। ওর চোখের সামনে একটা অশরীরী ছায়া উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করছিল, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিল, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল বারবার।

কিছুক্ষণ পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রণজয়। বিদিশার কাছে এসে পিঠে হাত রাখল। ক্লান্ত স্বরে বলল, মানু, আমি এক্সট্রিমলি সরি। ব্যাপারটা ভুলে যাও– একটু চুপ করে থেকে তারপর ও আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত করে খাওয়াও তো।

বিদিশার অবাক হওয়ার ক্ষমতা বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই ও অবাক হল না। স্বামীর হুকুম তামিল করতে চলল। তারই ফাঁকে ও আঁচল চেপে ধরেছিল বাঁ-গালে, কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। তখন রান্নাঘরে গিয়ে একমুঠো চিনি চেপে ধরেছে ক্ষতস্থানে। মাথা ঝিমঝিম করলেও বিদিশা কাঠের তাক ধরে নিজেকে সামলে রেখেছিল–টলে পড়ে যায়নি।

তারপর দুটো ঘণ্টা যে কী ভয়ংকর জ্বালা-যন্ত্রণায় কেটেছে তা বিদিশা আজও ভুলতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে রাতের আঁধারে ও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তখনই কোনও একটা

দুর্বল মুহূর্তে ও ঠিক করেছিল, আর নয়। এই বন্দি জীবন আর নয়। সব জ্বালা-যন্ত্রণায় দাঁড়ি টানতে হবে।

অন্ধকারে বিছানা থেকে নেমে এসেছিল বিদিশা। আন্দাজে ভর করে টলতে টলতে চলে গিয়েছিল ওষুধের তাকের কাছে। হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে পেয়েছিল নির্দিষ্ট ওষুধের পাতাগুলো। টেনটেক্স ফোর্ট। চ্যাপটা গোল রুপোলি রঙের ট্যাবলেট। রোজ রাতে রণজয় একটা করে এই ট্যাবলেট খায়। এই ট্যাবলেট খেলে যৌন উত্তেজনা বাড়ে। রণজয়ের এই ট্যাবলেট কেন দরকার হয় তা বিদিশা জানে না। কিন্তু বিয়ের পরে রণজয়ই ওকে খুলে বলেছিল এই রুপোলি ট্যাবলেটের রহস্য। দশটা ট্যাবলেটের একটা পাতার দাম তেরো টাকা মতো।

যে কটা ট্যাবলেট পেল সবকটা নিয়ে বাথরুমে চলে গেল বিদিশা। আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করে মুঠোয় ধরা ট্যাবলেটগুলো অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল ও। পাতা ছিঁড়ে ট্যাবলেটগুলো যখন ও হাতের চেটোয় ঢালল তখন মনে হচ্ছিল ও বিশ-পঁচিশটা ক্যাডবেরি জেম্‌স খাচ্ছে। শুধু এগুলোর রং লাল-নীল নয়, রুপোলি।

বাথরুমের আয়নার দিকে তাকিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদেছিল বিদিশা। মা, বাবা, বাপ্পার কথা মনে পড়ছিল। ওদের আর দেখতে পাবে না বিদিশা। কিন্তু একটু পরেই যে-ঘটনা ঘটবে তার জন্য নিজেকে ছাড়া আর কাকে দায়ী করবে ও। রণজয়ের সঙ্গে এই জীবন ও নিজেই বেছে নিয়েছিল। আজ এই মৃত্যু ও নিজেই বেছে নিচ্ছে।

কল থেকে মগে করে জল নিয়ে মুখে ঢালল ও। তারপর একে-একে সবকটা ট্যাবলেট ঢেলে দিল মুখে। বারবার জল খেল।

ট্যাবলেটগুলো খাওয়া শেষ করে বাথরুমের ভেজা মেঝেতে বসে পড়ল বিদিশা। পেটটা ভার লাগছে। গাল জ্বালা করছে। মাথা টং হয়ে আছে।

হঠাৎই বিদিশা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল বাচ্চা মেয়ের মতো। তারই মধ্যে ও টের পাচ্ছিল, বুকের ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে। আর মাথার ঝিমঝিম ভাবটা যেন বাড়ছে।

খুব আবছাভাবে বিদিশা টের পেরেছিল বাথরুমের বন্ধ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। সত্যি, না ওর মনের ভুল? এর পর আর কিছুই ওর মনে নেই।

.

দেড়দিন পর বিদিশার জ্ঞান ফিয়েছিল সুকিয়া স্ট্রিটের সিটি নার্সিং হোম-এ। চোখ খুলতেই ও মা-বাবা আর রণজয়কে দেখতে পেয়েছিল। মুহূর্তে বিদিশার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অশরীরী ছায়াটা তার নাচ থামিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।

নার্সিং হোমের চিকিৎসা আর যত্নে আটদিনেই সুস্থ হয়ে উঠেছিল বিদিশা। মা-বাবাকে বলে ও চলে এসেছিল সল্ট লেকে। অরুণা-সুধাময় তখনকার মতো রণজয়কে বুঝিয়েছিলেন, মানসিক আঘাতটা সামলে উঠলেই ও মানিকতলায় চলে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আয় হয়নি। বিদিশা প্রচণ্ড একরোখা জেদ ধরেছিল, সল্ট লেক ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। অরুণার সঙ্গে এ নিয়ে বেশ মন কষাকষি হয়েছিল। কিন্তু বিদিশা সরাসরি সুধাময়কে একদিন প্রশ্ন করেছিল, বাপি, তোমার হাতে বেড়ে ওঠা রক্তকরবী গাছটাকে কেউ যদি রোজ টেনে মুচড়ে ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তুমি কী করবে?

সুধাময় কেঁদে ফেলেছিলেন এ কথায়। তার লম্বা কাঠামো নুয়ে পড়েছিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, আমি সারাজীবন বহু কষ্ট করেছি, মানু। কখনও ঘুষ নিইনি, কখনও ঘুষ দিইনি। আর তোকে আমি বলব ঘুষ দিয়ে ভালোবাসা আদায় করতে! অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা মানেই তো ঘুষ দেওয়া! তুই আমাদের চোখের সামনে থাকবি। এ বাড়িতে তোর অধিকার কিছু কম নয়।

বাবাকে টপ করে একটু চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল বিদিশার। কিন্তু কী করবে! এখন তো আর ও সেই ছোট্টটি নেই।

সেইদিন থেকে সল্ট লেকে অভয়ারণ্য খুঁজে পেয়েছিল বিদিশা।

বেশ মনে পড়ে, রণজয় দু-চারবার যাতায়াত করেছিল ওদের বাড়িতে। ওকে দেখতে এসেছিল। ওর সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেছিল। মানিকতলায় ফিরে যাওয়ার জন্যে অনুরোধও করেছিল।

কিন্তু বিদিশা টলে যায়নি। রণজয়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসার স্মৃতিগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে চাপা দিয়েছিল বিপজ্জনক মারাত্মক সব স্মৃতি। করাতের দাঁতওয়ালা লম্বা ছুরিটা ও সবসময় চোখের সামনে দেখতে পেত।

এর পর রণজয় প্রায় মাসছয়েক চুপচাপ হয়ে যায়। কোনও যোগাযোগ করেনি, কোনও চিঠি দেয়নি, একটা টেলিফোনও করেনি।

তারপর হঠাত্ একদিন ও ফোন করেছে সুধাময়কে। ফোন করে লিগাল সেপারেশন চেয়েছে। একই ব্যাপারে অরুণাকেও ফোন করেছে রণজয়। কথাবার্তা ঢিমে তেতালায় হলেও এগিয়েছে। সেসব শুনে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বিদিশা। আর অরুণা মাঝে-মাঝেই জেদী মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মের কথা।

বিদিশা ধর্মের কথা শোনেনি। শোনার মতো মনের অবস্থা ওর ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ও সামলে নিতে পেরেছিল। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে শর্টহ্যান্ড আর টাইপ শিখতে শুরু করেছিল। কয়েক বছর আগে বিভিন্ন পরীক্ষার ফাঁকে-ফাঁকে শর্টহ্যান্ড-টাইপ নিয়ে ও বেশ কিছুটা এগিয়েছিল। এখন তীব্র প্রয়োজনে সেই পুরোনো চর্চাটাকে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল।

সুধাময়ের যোগাযোগ আর চেষ্টায় ইন নামের এই ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি ফার্মে স্টেনোগ্রাফার কাম-টাইপিস্টের চাকরি পেয়েছে বিদিশা। আর একইসঙ্গে ওর জীবনের ছবিটা একটু একটু করে বদলে গেছে। মুখ ফিরিয়ে নেওয়া জীবন আবার স্মিত হেসে তাকিয়েছে ওর দিকে।

এখন, ওর সেই নতুন বাঁচার জায়গায় বসে, শেখরকে নিজের কথা বলছিল বিদিশা।

রণজয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কের সব কথা অরুণা কিংবা সুধাময়কে খুলে বলেনি বিদিশা। তাই শেখরকেও বলল অনেক রেখে-ঢেকে রণজয়ের অস্বাভাবিক মনের কথা বলল, বলল ওর বাঁ-গালের কাটা দাগের ইতিহাস, আর আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টার কথা।

সব কথা বলতে বলতে বিদিশার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেটা লক্ষ করে শেখর বলল, ম্যাডাম, এখন চোখের জল ফেলার সময় নয়—চোখের জল মুছে নেওয়ার সময়।

বিদিশা চোখ মুখে নিল রুমালে। তারপর গতকাল রাতের ঘটনা বলল।

রণজয় আমাকে ছাড়বে না, শেখর। যেভাবেই হোক, ওর মাথায় এখন ঢুকেছে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা। ও যখন-তখন যা খুশি করে ফেলতে পারে।

অফিসে লোকজন আসতে শুরু করেছে। ম্যানেজার পি. এল. চক্রবর্তী একবার এসে বিদিশাকে গুড মর্নিং বলে গেছেন। চায়ের ট্রলি এসে গেছে ফ্লোরে।

দেবলীনা হঠাৎ এসে দাঁড়াল বিদিশার টেবিলের কাছে। বলল, কাল দারুণ দুটো চুড়িদার কিনেছি। ভীষণ ব্রাইট রং। লাঞ্চের সময় এসো, দেখাব।

দেবলীনার ছিপছিপে ফরসা চেহারা। চোখে বড় ফ্রেমের চশমা। ছাই রঙের ওপরে সাদা কালোয় কাজ করা একটা চুড়িদারে ওকে বেশ মানিয়েছে। বিদিশাকে ও প্রায়ই শাড়ি ছেড়ে চুড়িদার পরতে বলে। তা হলে নাকি বিদিশাকে আরও সুন্দর দেখাবে।

এই প্রস্তাবের কথা জানতে পেরে বোসদা পান চিবোতে-চিবোতে বলেছিলেন, না, মা জননী, তুমি চুড়িদার পোরো না। তাহলে আমার আর চরিত্র বলে কিছু থাকবে না। এমনিতেই শাড়ি পরে তোমাকে যা ফ্যান্টা লাগে! আমি তো সবাইকে স্পষ্ট করেই বলি? আমি তোমাকে দেখতেই রোজ অফিসে আসি। হাসলেন বোসদা? তা হলেই বোঝে। এর ওপর তুমি যদি চুড়িদার ধরো তাহলে আমাদের মতো বুড়োগুলো কী ধরবে।

বোসদা, প্লিজ… কপট অস্বস্তিতে বলে উঠেছে বিদিশা : ঠোঁটে কুলুপ লাগান।

ঠোঁট থেকে পানের রস মুছে নিয়ে সুধীর বোস মজা করে বলেছিলেন, আমার তো যত রস ঠোঁটেই, মা জননী! সেখানে কী করে গোদরেজের তালা লাগাই!

দেবলীনা রিসেপশন কাউন্টারের দিকে চলে যেতে না যেতেই চায়ের কাপ হাতে বোসদা এসে হাজির। হাসি হাসি মুখ। টাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বোঝা যায়, এই মাত্র অফিসে ঢুকেছেন।

আপনাদের কাছে এগোনো যাবে? না কি কালকের মতো এজ বার আছে?

না, না। আসুন, চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন– হাসিমুখে বোসদাকে আমন্ত্রণ জানাল বিদিশা।

বোসদা চোখ সামান্য কুঁচকে বিদিশাকে লক্ষ করেছিলেন। হঠাৎই সিরিয়াসভাবে মন্তব্য করলেন, মা জননী, তোমার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। সকাল-সকাল মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

এমন সময় সিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সৌমেন পাল বোসদাকে এসে ডাকলেন, মিস্টার বোস, একটু আসবেন? আজই একটা আরজেন্ট ড্রয়িং পাঠানোর আছে। আপনার সঙ্গে একটু ডিসকাস করতে হবে।

পরে কথা বলব। ছোটভাই, তুমি দ্যাখো, ম্যাডামের প্রবলেম সলভ করতে পারো কি না– বলে বোসদা চায়ের কাপ হাতেই চলে গেলেন।

শেখর বলল, বলুন, ম্যাডাম, আমার থেকে আপনি কী হেল্প চান?

বিদিশা দিশেহারাভাবে বলল, সেটাই তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

থানায় ডায়েরি করতে চান?

না, না– চকিতে মাথা নাড়ল বিদিশা, ওতে অনেক জল ঘোলা হবে, স্ক্যান্ডাল হবে।

তা হলে আপনি কী করতে চান?

বিদিশা চিন্তিত গলায় বলল, সেটাই বুঝতে পারছি না। রণজয় সবসময় আমাকে ফলো করছে। সেটা শোনার পর থেকেই আমার ভয় করছে।

এমন সময় বনজারা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল বিদিশাকে। শেখর দেখল, সাধারণ একটা ইনল্যান্ড লেটার।

এখন তা হলে যাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেখর, পরে এ-নিয়ে কথা বলব।

বিদিশা ঘাড় নেড়ে চিঠিটা দেখতে শুরু করল। শেখর রওনা হল নিজের সিটের দিকে।

চিঠিটা কে পাঠিয়েছে তা ওপরে লেখা নেই। তবে হাতের লেখাটা বেশ চেনা!

ইনল্যান্ড লেটারটা খুলে ফেলল বিদিশা। তিন পৃষ্ঠা জোড়া বিশাল চিঠি। চিঠির শেষে রণজয়ের নাম লেখা রয়েছে।

বিদিশা ওর খুব চেনা বাংলা হরফগুলোর ওপরে চোখ বোলাতে শুরু করল।

রণজয়ের লেখা প্রেমজর্জর চিঠি। অনেক ভালোবাসা, অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা বলা আছে। চিঠিতে। নির্লিপ্তিভাবে চিঠিটা পড়ল বিদিশা। ওর রক্তে নতুন কোনও স্রোত তৈরি হল না।

চিঠির শেষ দিকে রণজয় লিখেছে?

...তোমার সন্তান এখনও আমাকে বাবা বলে ডাকতে চায়। আর আমি তোমাকে বউ বলে ডাকতে চাই, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে চাই। এখনও সময় আছে ফিরে এসো। তা না হলে ফল খুব খারাপ হবে। অ্যাকোয়া রিজিয়া-র নাম শুনেছ? না, সুলতানা রিজিয়ার কোনও আত্মীয় নন ইনি। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি এক মারাত্মক অ্যাসিড। সোনাও গলিয়ে দিতে পারে অতি সহজে। এই অ্যাসিড ভরা বা তোমার মুখে ছুঁড়ে মারলে তোমার ওই সোনার মতো রঙের কী হাল হবে বুঝতে পারছ?
তাই তোমার পায়ে ধরে বলছি, মানু, ফিরে এসো। আমাকে খারাপ হয়ে যেতে দিয়ো না, লক্ষ্মীটি।

বিদিশার চিঠি ধরা হাত তিরতির করে কাঁপতে লাগল। চিঠিটা কোনওরকমে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ও টেবিলে মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কী করবে এখন ও? কী করা যায়?

জটিল দুশ্চিন্তার মধ্যে অফিসের সময়টা ধীরে-ধীরে কাটতে লাগল। তারই মধ্যে শেখর অন্তত বারতিনেক বলেছে, ম্যাডাম, আমাকে কী করতে হবে বলবেন কিন্তু।

লাঞ্চের পর শেখরের সিটের কাছে বসে ওর সঙ্গে গল্প করছিল বিদিশা। কথা বলতে বলতে ও ভাবছিল, শেখরকে ওর বিপজ্জনক জীবনের সঙ্গে জড়ানো ঠিক হবে কি না।

শেখর ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা বই বের করল। বিদিশার দিকে বইটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই বইটা পড়ে দেখুন। একটা সাইকোপ্যাথের কাণ্ডকারখানা। ভীষণ থ্রিলিং।

বিদিশা পেপারব্যাকটা হাতে নিয়ে দেখল। বইটার নাম ইয়র্কশায়ার রিপার। ব্যাক কভার পড়ে বুঝল, ছুরি দিয়ে একের পর এক মহিলা খুনের ঘটনা।

আবার সিরিয়াল কিলার? আপনার কি টেস্ট বলে কিছু নেই। বিদিশা বইটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল।

শেখর হেসে জবাব দিল, টিভিতে যেসব বাংলা সিরিয়াল হয় তার চেয়ে সিরিয়াল কিলার ফার বেটার। তাছাড়া, রণজয়বাবুর কেসটাও বোধহয় অনেকটা এই টাইপের। সত্যি, আপনার লাইফটা কী থ্রিলিং!

বিদিশা অবাক হয়ে শেখরকে দেখল ও আমি দিনরাত দুশ্চিন্তায় শেষ হয়ে গেলাম, আর আপনি বলছেন আমার লাইফটা কী থ্রিলিং! আপনি হেল্প করবেন বলছিলেন...আপনি পারবেন আমার এই থ্রিল ট্যাক্ল করতে? আমি থ্রিল চাই না—আমি শান্তিতে বাঁচতে চাই।

শেখর বিদিশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বলল, আমি ট্যাক্ল করলে আপনার ওই মিস্টার হাজব্যান্ড হুউশ করে হাওয়া হয়ে যাবে। আমি ট্র্যাকে দৌড়োনো স্পোর্টসম্যান। এটা অফিস

তাইনা হলে আপনাকে এখনই বাইসেপ ট্রাইসেপ দেখিয়ে দিতাম।

আমি কিন্তু ইয়ারকি করছি না, সিরিয়াসলি বলছি।

আমিও সিরিয়াসলি বলছি। আজ আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

সত্যি! বিদিশা শেখরের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সত্যি! আশ্বাসের হাসি হাসল শেখর। সত্যিকারের সহকর্মীর হাসি।

বিদিশাও হাসল–নির্ভর করতে পারার হাসি।

আর তখনই অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে বোসদা এগিয়ে এলেন শেখরের টেবিলের কাছে। যথারীতি পানের রসে ঠোঁট লাল।

জড়ানো গলায় বোসদা বললেন, সেনভায়াকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?

শেখর হেসে বলল, এত ফরমালিটির কী আছে? বলুন—

বোসদা সামান্য ঝুঁকে পড়লেন শেখরের মুখের কাছে ও বলতে পারো সেনভায়া, সেনসেক্স মানে কী?

শেখর বোসদার অশ্লীল ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে বলল, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওটা সেনসিটিভ ইনডেক্স না কী যেন–ঠিক জানি না।

তাই বলো। সেনসেক্স ওয়ার্ডটা শুনে আমি ভাবতাম শুধু বুঝি বদ্যিদেরই সেক্স আছে, আর কারও নেই. চলে যাওয়ার আগে বোসদা বিদিশার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, কিছু মনে করলে না তো, মা জননী। সেনভায়া বড় ভালো ছেলে...তবে মাঝে-মাঝে নুন দিয়ে লুচি খায়...।

বোসদা চলে যেতে বিদিশা শেখরের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, নুন দিয়ে লুচি খাওয়ার মানে?

ও কিচ্ছু নয়, বোসদার বাজে ইয়ারকি। শুনুন, আমি তা হলে আজ থেকে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

বিদিশা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। এই মুহূর্ত থেকেই ও যেন অনেকটা ভরসা পাচ্ছে।

শেখরের কাছ থেকে উঠে চলে যাওয়ার আগে বিদিশা বলল, একটু আগে রণজয়ের একটা চিঠি পেয়েছি–অফিসের ঠিকানায়। পরে আপনাকে দেখাব। আমার মুখে অ্যাসিড বা ছুঁড়ে মারার হুমকি দিয়েছে।

শেখর শুধু বলল, ওসবে পাত্তা দেবেন না–আমি আছি।

বিদিশা নিজের টেবিলে ফিরে আসছিল, অশোক চন্দ্র ওকে ডাকল, ম্যাডাম, আপনার ফোন।

বিদিশা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ডানদিকের দেওয়ালের কাছে অশোক টেলিফোনের রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

বিদিশা ওর কাছে গিয়ে ফোন ধরল।

হ্যালো।

কেমন আছ, মানু? রণজয়।

রাগে জ্বলে উঠল বিদিশা : তোমাকে বলেছি না যে অফিসে এভাবে ফোন করবে না। তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই, কোনও সম্পর্ক নেই। আমি...।

ও-প্রান্তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রণজয়। ধরা গলায় বলল, আমার কষ্টটা তুমি কেন বুঝতে চাও না বলো, তো! আমি যে একা-একা শেষ হয়ে গেলাম।

বিদিশা বাঁকা সুরে বলল, একা কেন? তোমার মা তো রয়েছে।

রণজয় কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, সেইজন্যেই তো কষ্ট আরও বেশি। দেখা হলে তোমাকে সব বলব। কাল রাতে তো সে কথাই বলতে চেয়েছিলাম, তুমি হঠাৎ

অকারণে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলে। আজ তোমার সময় হবে? অফিস ছুটির পর দেখা করতে পারবে?

বিদিশার কৌতূহল হচ্ছিল। তাই ও দ্বিধায় পড়ে গেল। তরুবালার সঙ্গে কী হয়েছে রণজয়ের? ঝগড়াঝাটি? কী নিয়ে? বিদিশার চলে যাওয়া নিয়ে?

ও-প্রান্ত থেকে রণজয় অধৈর্য হয়ে উঠল, মানু, একটিবার আমার সঙ্গে দেখা করো। তুমি পাশে না থাকলে আমি কেমন করে সেরে উঠব? কেমন করে আবার ভালোবাসব তোমাকে?

বিদিশা ঠিক করল, রণজয়ের সঙ্গে দেখা করবে—তবে শেখর সঙ্গে থাকবে। শেখর সঙ্গে থাকলে ও ওই ভয়ংকর মানুষটার সঙ্গে দেখা করার জোর পাবে।

ঠিক আছে। কোথায় দেখা করবে বলো— বিদিশা ঠান্ডা গলায় বলল।

মানু, মানু, আই লাভ য়ু, লাভ— উত্তেজনায় রণজয়ের গলা কাঁপছে ও সি. এ. পি. ক্যাম্প বাস স্টপে আমি সাতটার সময় তোমার জন্যে ওয়েট করব। তুমি আসবে তো?

আসব— বিদিশা ইচ্ছে করেই শেখরের কথা বলল না। রণজয়কে ও একটা মানসিক ধাক্কা দিতে চায়।

আমি…আমি তোমাকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছি…অফিসের ঠিকানায়…।

জানি। একটা আজ পেয়েছি।

চিঠির খারাপ কথাগুলো ধোরো না, মানু। ওগুলো রাগের মাথায় লিখেছি।

বিদিশা কোনও জবাব দিল না।

রণজয় আবার কথা বলল চাপা গলায়, মানু, চিঠি পড়ে তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব বুঝিয়ে বলব।

ঠিক আছে। এখন তা হলে রাখছি। সন্ধে সাতটায়, সি.এ.পি. ক্যাম্প বাস স্টপে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে শেখরের টেবিলের কাছে গেল বিদিশা। অচেনা একজন ভিজিটর ওর টেবিলে বসে টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলছিল। বিদিশা ইশারায় ডাকল ওকে।

শেখর উঠে কাছে আসতেই বিদিশা নীচু গলায় বলল, আজ সন্ধে সাতটায় আমার ডেঞ্জারাস এক্স-হাজব্যান্ডের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। সাবধান থাকবেন…।

শেখর হেসে বলল, দারুণ থ্রিলিং ব্যাপার হবে। আপনার হাজব্যান্ড এক্স হোক আর ওয়াই হোক–আই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু আপনার কাছে যা শুনেছি, যদি হঠাৎ করে ভদ্রলোক খেপে উঠে আপনাকে অ্যাটাক করেন?

বিদিশা সিরিয়াস চোখে তাকাল শেখরের দিকে আপনি কী করতে চান?

শেখরও সিরিয়াস গলায় বলল, আপনি যা হুকুম করবেন।

বিদিশা ঠান্ডা স্বরে বলল, দেন হিট হিম–।

আই উইল লাভ টু। সাংঘাতিক থ্রিলিং ব্যাপার হবে।

.

সেই সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার এতটুকু কমেনি। মাঝে-মাঝে খাপছাড়াভাবে দু-তিনবার বৃষ্টি হয়েছে। বিদিশা আর শেখর যখন সি.এ.পি. ক্যাম্প বাস স্টপে এসে নামল তখন বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু আকাশে কোনও চঁদ-তারা নজরে পড়ছিল না। বরং খানিকটা লালচে আভা দেখা যাচ্ছিল।

বাস থেকে নামার আগেই ওরা ঠিক করেছিল ওরা অচেনা লোকের মতো বাসের দুই দরজা দিয়ে নামবে। নেমে শেখর বিদিশার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে যাবে। দূর থেকেই ও বিদিশার ওপরে লক্ষ রাখবে। রণজয়ের সঙ্গে বিদিশার ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাঝে ও থাকতে চায় না।

শেখর পিছনের দরজা দিয়ে নেমে সোজা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেছে উলটো দিকের বাস স্টপে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ-সাতজন মানুষের মাঝে গা-ঢাকা দিয়েছে। ওর হাতঘড়িতে তখন সাতটা বেজে ছমিনিট।

বাসটা চলে যেতেই রাস্তার ওপারে বিদিশাকে দেখতে পেল শেখর। একা-একা দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে। রণজয়কে খুঁজছে।

যখন ওরা প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে তখন পাখির খাঁচার পিছন থেকে একটা ছায়ার মতো মানুষ ইতস্তত পায়ে এগিয়ে এল বিদিশার কাছাকাছি।

বিদিশা, আমি এসেছি।

চমকে বাঁ দিকে মুখ ঘোরাল বিদিশা।

করুণ মুখে ফরসা রোগা চেহারার রণজয় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মধ্যে কেমন দ্বিধা, ইতস্তত ভাব, যেন কোনও অপরিচিত তরুণীর সঙ্গে আলাপ জমাতে এসেছে।

কী বলবে বলো– বিদিশা পাথরের মতো গলায় বলল।

চারদিকে দেখল রণজয়। এই জায়গাটায় তেমন আলো-টালো নেই। কিন্তু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

রণজয় বলল, এখানে নয়, মানু...ওদিকটায় চলো। আঙুল তুলে সি. এ. পি. ক্যাম্প স্টপেজ থেকে বাঁ দিকে এ. ই. ব্লকের দিকে চলে যাওয়া নির্জন রাস্তাটা দেখাল ও।

বিদিশার ভেতরে কেমন একটা টেনশন শুরু হল। ওর চোখ রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা শেখরকে খুঁজল।

এমন সময় আচমকা ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। বিদিশা চটপট ছাতা খুলে মাথায় দিল। কিন্তু রণজয়ের সঙ্গে ছাতা ছিল না। ও নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল।

রণজয় আরও কাছে এগিয়ে এল। ওর সারা মুখ ভিজে চকচক করছে। চুল লেপটে আছে ফরসা কপালে। বৃষ্টির ফোঁটায় ওর মুখ খানিকটা ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ওকে দেখে বিদিশার মায়া হল। ও রণজয়কে ছাতার তলায় ডাকল, বৃষ্টিতে ভিজো না। এসো।

রণজয় ওর লেডিজ ছাতার নীচে চলে এল। ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানোমাত্রই ও বিদিশার গালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল : মানু..মানু...।

বিদিশা প্রতিক্রিয়ায় গাল সরিয়ে নিল। ও রণজয়কে ছাতার নীচে আসতে বলেছে মানবিকতা বোধ থেকে, ভালোবাসার টানে নয়।

ওর অবাক লাগছিল। কী সহজে ভালোবাসা মরে যায়। এক সময় এই পুরুষটা ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালে বিদিশা ভেতরে-ভেতরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা টের পেত, শরীর পিচ্ছিল হয়ে উঠত।

আর এখন! ওর প্রতিটি রোমকূপ সতর্ক হয়ে রয়েছে বিপদের আশঙ্কায়।

বৃষ্টির ফোঁটা ছাতায় আছড়ে পড়ার তুমুল শব্দ হচ্ছিল। ছাতার রঙের গা দিয়ে জল পড়ছিল চুঁইয়ে চুঁইয়ে। রণজয়ের ভেজা শরীর বিদিশার পোশাক ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

রণজয় ওর হাত আঁকড়ে ধরে বলল, ওদিকটায় চলো।

বিদিশা ওর আঙুলের জোর টের পেল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে শেখরকে শেষবারের মতো খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার ধোঁয়াটে পরদা সরিয়ে ও কিছুই দেখতে পেল না।

নির্জন এলাকা থেকে আরও নির্জন এলাকায় ঢুকে পড়েছিল ওরা দুজনে।

সামনেটা বেশ অন্ধকার। বাড়িগুলোও বর্ষার ঘোমটায় মুখ ঢেকেছে। দু-একটা খালি জমিতে বর্ষায় বেড়ে ওঠা গাছপালা আর আগাছার জঙ্গল। বিচিত্র আকারের অর্ধেক তৈরি একটা বাড়ি অন্ধকারে কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে।

মানু, তোমাকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি..রোজ তুমি অফিসে গেলেই একটা করে আমার চিঠি পাবে…।

বিদিশা কোনও উত্তর দিল না।

বৃষ্টির তেজ হঠাৎই কমে এল। আর রণজয়ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

মানু, মুখটা তুলে আমার দিকে একবার তাকাও।

রণজয়ের কথায় এমন কিছু ছিল যে, বিদিশা ভয় পেয়ে গেল। ও চোখ নামিয়ে বৃষ্টির খই-ফোঁটা ভিজে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আচমকা ছাতাটা টান মেরে ছিটকে ফেলে দিল রণজয়। বিদিশা অসহায়ভাবে ভিজতে লাগল। রণজয় তো আগেই ভিজে স্নান। সেই অবস্থায় ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল বিদিশার পায়ের কাছে। জাপটে ধরল বিদিশার ভিজে লেপটে যাওয়া শাড়ি, সেই সঙ্গে বিদিশাকে।

আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, মানু। তোমাকে ফিরে না পেলে আমি মরে যাব। কথা বলতে বলতে রণজয় মুখ ঘষছিল বিদিশার ঊরুতে। টের পাচ্ছিল, বিদিশার কোমল ভিজে শরীর, ভালোবাসার থরথর করে কাঁপছে।

আসলে বিদিশা ভয়ে কাঁপছিল। আর দমবন্ধ করে মরিয়া হয়ে শেখরকে খুজছিল বারবার।

রণজয়ের জড়ানো স্বর তখনও ভেসে আসছিল বিদিশার কোমরের কাছ থেকে : তোমাকে ফিরে না পেলে আমি শেষ হয়ে যাব, মানু...।

বিদিশার গা ঘিনঘিন করছিল। শরীরটা কাঠ। ও কোনওরকমে বলল, সেটা আর কিছুতেই সম্ভব নয়...।

চাবুকের মতো এক ঘটকায় উঠে দাঁড়াল রণজয়। বাঁ হাতের থাবায় চেপে ধরল বিদিশার গলা। ওর চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। মুখ বেঁকেচুরে বদলে গেছে। অচেনা রণজয় বেরিয়ে এসেছে নির্জন বৃষ্টিভেজা রাস্তায়।

চাপা হিংস্র গলায় রণজয় বলে উঠল, ফাকিং বিচ!

বিদিশার গলায় অসহ্য ব্যথা করছিল। মাথায়, মুখে, শরীরে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। চোখের সামনে ও মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিল। কী বোকার মতোই না ও রণজয়ের কথার ফাঁদে পা দিয়েছে। এই জানোয়ারটা একটুও বদলায়নি, বদলাতে পারে না।

গলার ওপরে আঙুলের চাপ বাড়ছিল। বিদিশার মুখ দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বেরোনোর উপায় নেই। রণজয় শক্ত হাতে ওর টুটি টিপে ধরেছে।

বৃষ্টি অনেক ফিকে হয়ে এসেছিল। আকুল হয়ে সি. এ. পি. ক্যাম্প স্টপেজের পাখির খাঁচার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিদিশা এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। ছাতা মাথায় লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে আসছে। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু একটা ঠাহর করতে চাইছে।

বিদিশা বেশ বুঝতে পারছিল, চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। আর ওর কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো ওর ভয়ংকর স্বামীকে দেখতে বাধ্য হচ্ছিল।

বাঁ হাতে শক্ত করে ওর গলা খামচে রেখে ডান হাতে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল রণজয়।

বিদিশা চোখে সরষে ফুল দেখল। তার পরই চোখের সামনে একটা কালো পরদা নেমে এল যেন। মুখের বাঁ দিকটা অসহ্য যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে মাথা ধরে গেল। ঠোঁটে নোনা স্বাদ পেল ও। এই অন্ধকার বৃষ্টিভেজা রাতে ও কি রণজয়ের হাতে খতম হয়ে যাবে?

শেখর সেনের কথা মনে পড়ল : .যদি হঠাৎ করে ভদ্রলোক খেপে উঠে আপনাকে অ্যাটাক করেন?

আপনি কী করতে চান?

আপনি যা হুকুম করবেন।

দেন হিট হিম–

শেখর সেন যখন স্বামী-স্ত্রীকে দেখতে পেল তখন বিদিশার শরীরটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে। আর ফরসা রোগা একটা বদ্ধ উন্মাদ তখনও হিংস্রভাবে বাঁ হাতে খামচে ধরে আছে বিদিশার গলা।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। শেখরের মাথার ভেতরেও। অন্ধকার এ. ই. ব্লকের রাস্তাটা চোখের সামনে টালিগঞ্জের ভোরবেলার রাস্তা হয়ে গেল। যে-রাস্তায় শেখর প্রতিদিন ভোরবেলা দৌড়োয়।

অনেক কষ্টে একঘেয়ে জীবনে থ্রিল দেখা দিয়েছে। শেখরের মনে পড়ল মাই লাইফ উইথ নাইফ, ইয়র্কশায়ার রিপার-এর কথা। বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে থ্রিল নেমে এসেছে বাস্তবের রাস্তায়। এ-সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

হাতের ছাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে শুরু করল শেখর। আবছায়া অবয়বের অমানুষটা তখন বিদিশাকে পেড়ে ফেলেছে পথের ওপরে। দু-হাতে ওর শাড়ি-জামাকাপড় ধরে টানছে। আর আপনমনেই চিৎকার করে কীসব বলছে। শেখরের মাথায় সে-সব তখন একবর্ণও ঢুকছিল না।

ছুটতে ছুটতে লোকটার প্রায় ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল শেখর। সপাটে এক লাথি চালাল লোকটার কোমরে। লোকটা খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ল, কিন্তু বিদিশার শাড়ির আঁচল তখনও তার মুঠোয় ধরা।

শেখর আনন্দে টগবগ করে ফুটছিল। বইয়ের পাতা শেষ পর্যন্ত তা হলে সত্যি হল!

ও পড়ে যাওয়া রণজয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে না পড়ে ওর একটা পা চেপে ধরল। তারপর ওর দেহটা হিড়হিড় করে টানতে লাগল পিচের রাস্তায় ওপরে।

শেখরের মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছিল বারবার। আর ঝিস্ফাক মিউজিক বাজছিল। রণজয়ের পলকা শরীরটাকে নিয়ে ও দিশেহারার মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল রাস্তার এদিক-সেদিক।

এক সময় ও থামল। হাঁফাতে-হাঁফাতে ঝুঁকে পড়ল রণজয়ের ওপরে। বাঁ-হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল ওকে। তারপর ওর কেটে-ছেড়ে যাওয়া মুখে ডান হাতের এক ভয়ংকর ঘুষি বসিয়ে দিল।

আঁক শব্দ করে উঠল রণজয়। ওর নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। শেখর পর-পর আরও তিনটে ঘুষি চালাল। চুলের মুঠি ধরে থাকা মাথাটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল তিনবার।

শেখর শুনতে পাচ্ছিল, ওর কানের ভেতরে কে যেন বারবার বলছে, দেন হিট হিম। দেন হিট হিম, দেন হিট হিম... আর শেখর সেই অলৌকিক নির্দেশের প্রতিটি শব্দ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছিল।

ক্লান্ত শেখর আহত রণজয়কে একসময় ছেড়ে দিল। বৃষ্টি তখন আরও জোরে নেমেছে।

শেখর একপলক অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে তাকিয়েছিল দুরে রাস্তায় পড়ে থাকা বিদিশার দিকে। সেই ফাঁকে রণজয় কোথা থেকে একটা লুকোনো ছুরি বের করে নিমেষে চালিয়ে দিল শেখরের মুখ লক্ষ করে।

ঠিক সেই সময়ে হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি বাঁক দিয়েছিল এ. ই. ব্লকের দিকে। গাড়িটার আলো রণজয়ের মুখে এসে পড়েছিল, আর শেখরের পিঠ-কাঁধ গাঢ় ছায়া ফেলেছিল রণজয়ের শরীরে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছুরিটা চালিয়েছিল রণজয়।

নেহাতই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল শেখর। তাই ছুরির ফলা ওর গলা আর ঘাড়ে রক্তাক্ত আঁচড় টেনে দিল। শেখর আহত জন্তুর মতো গনগনে রাগে রণজয়ের দু-পায়ের ফাঁকে এক মারাত্মক লাথি কষিয়ে দিল।

রণজয় চকিতে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু লাথিটা পুরোপুরি এড়াতে পারল না।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসা গাড়িটার হেডলাইটের আলোয় রণজয়ের রক্তমাখা মুখ ফ্যাকাসে লাগছিল। ও গাড়িটার দিকে একবার তাকিয়েই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটে পালাল অন্ধকারে। ওকে তাড়া করতে গিয়ে শেখর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। ওর গলা বেয়ে তখন দরদর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু ওই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও শেখর থ্রিলের কথা ভাবছিল, বিদিশার কথা ভাবছিল।

জ্ঞান হারানোর আগে শেখর দেখল, গাড়িটা ওর কাছটিতে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন। কেউ যেন ওকে বহুদূর থেকে জিগ্যেস করছে, কী ব্যাপার, দাদা? কী হয়েছে?

আর একজন যেন কোথা থেকে বলে উঠল, মনে হয় ছিনতাইয়ের কেস।

কথাবার্তার শব্দ ক্রমেই বাড়ছিল।

কে যেন হুড়হুড় করে খানিকটা ঠান্ডা জল ঢেলে দিল শেখরের মুখে। ও চমকে চোখ মেলে তাকাল। এ কী! ও রাস্তায় পড়ে কেন? এই অন্ধকারে বৃষ্টিতে ও কী করছে? গলার পাশটা জ্বালা করছে। কয়েকটা ছায়া-ছায়া মুখ ঝুঁকে রয়েছে ওর শরীরের ওপরে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল শেখর। আর তখনই ওর রণজয়ের ব্যাপারটা মনে পড়ল। ও পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরল গলায়। কয়েকটা হাত ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

উঠে দাঁড়িয়ে বিদিশাকে দেখতে পেল শেখর। ছাতা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল। নানাজনের প্রশ্নের উত্তরে ছিনতাইয়ের চেষ্টার কথাই বলল শেখর। কেন যেন মনে হল, রণজয়ের ব্যাপারটা বলে ফেলা ঠিক হবে না।

বিদিশাকে কেমন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। দু-চোখে ভয় আর উৎকণ্ঠা। ঠোঁটের কোণে রক্তের দাগ। ও জিগ্যেস করল, আপনার লাগেনি তো, শেখর!

শেখর বলল, চিন্তা করবেন না। তেমন কিছু নয়।

দু-চারজন পরামর্শ দিল একটু ফার্স্ট এইড সেরে নেওয়ার জন্য। কে যেন একটা সাইকেল রিকশা ডেকে ওদের তুলে দিল। বলল, কোয়ালিটি স্টপেজের পাশে ওষুধের দোকান আছে। ওখানে দেখিয়ে নিন। আর পুলিশে একটা ডায়েরি করে দেবেন। এদিকটায় ছিনতাই বড্ড বেড়েছে।

রিকশা যখন চলতে শুরু করেছে তখন পিছন থেকে টুকরো একটা মন্তব্য ওদের কানে এল ও এই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে কেউ কখনও এখানে প্রেম করতে আসে।

উত্তরে একজন বলল, না, না—ওরা আপনি করে কথা বলছিল…।

রাখুন, রাখুন। ও-সব লোকঠকানো প্যাঁচ পুরোনো হয়ে গেছে...।

রিকশা কালো রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

.

লাঞ্চের পর সুধীর বোস খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে শেখরের টেবিলের কাছে এলেন। সেখানে বিদিশা আর দেবলীনা দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটা চেয়ারে বসে ছিল অশোক। লাঞ্চের পর আধঘণ্টাটাক অফিসের মেজাজটা একটু ঢিলেঢালা থাকে।

বোসদা এসেই ঘোষণা করলেন, শুনেছ শেখরভায়া, আমাদের অফিসে শক্তিশালী জয়েন করেছে।

শক্তিশালী মানে? একটু অবাক হয়ে শেখর জিগ্যেস করল। ওর গলার বাঁ দিকটায় স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। এখন আর তেমন ব্যথা নেই।

বোসদা হাসলেন : তোমাদের কি সমাস-টমাস কিছুই পড়ানো হয়নি! শক্তিশালীর ব্যাসবাক্য হল, শক্তিপ্রসাদের শালি। আমাদের এম.ডি.-র পি.এ. শক্তিপ্রাসাদের শালি আজ থেকে কোম্পানিতে জয়েন করেছে।

শেখর হাসল। দেবলীনা আর বিদিশাও।

অশোক হেসে বলল, তো আপনার এত হিংসে কেন? আপনিও আপনার শালিকে এখানে ঢুকিয়ে দিন না—।

সুধীর বোস চোখ ছোট করে হেসে বললেন, আমার শালিকে আমি কোথায় ঢোকাব সেটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও না বাবা!

আপনার সঙ্গে না কথা বলা যায় না, বোসদা— বলে হাসি চেপে উঠে চলে গেল অশোক।

বোসদা কপট বিস্ময়ে তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কী খারাপ কথাটা বললাম। তুমিই বলো, জননী বিদিশার দিকে ফিরে বললেন বোসদা।

বোসদা, প্লিজ... প্রায় আবেদনের গলায় বলল বিদিশা।

দেবলীনা বলল, আমি সিটে যাই। নইলে পি. এল. চক্রবর্তী আবার ঝামেলা করবে।

ও চলে যেতেই বোসদা বললেন, দেবলীনা পালের একটাই বড় ডিফেক্ট, বড় লাজুক।, ভাই, তোমরা গপ্পো করো, আমি নীচ থেকে ঝট করে একটা পান খেয়ে আসি বলে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে সুধীর বোস চলে গেলেন।

অশোকের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটা দেখিয়ে শেখর বিদিশাকে বসতে বলল। তারপর জিগ্যেস করল, এখন কেমন আছেন?

সারাদিনে এই প্রথম ওরা আলাদা কথা বলতে পারছে।

বিদিশার ঠোঁটের কোণ, গাল ফুলে আছে। ঠোঁটের কোণে ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ছে। ফরসা গলায় কালচে দাগ। আজ তেমন করে সাজগোজ করেনি ও। চোখে বিষাদ আর অনিশ্চয়তার ছায়া।

আমি ঠিক আছি। একটু থেমে : আপনি?

হাসল শেখর। ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বের করল। বলল, আমি কাল সকালের মতোই থ্রিল খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন, এই বইটা দেখুন, ইচ্ছে হলে পড়তে পারেন...।

বিদিশা বইটার নাম দেখল ও ইন্টারভিউ উইথ দ্য ভ্যাম্পায়ার। তারপর মাথা নেড়ে না বলল। তারপর একটু সময় নিয়ে জিগ্যেস করল, সত্যি ঠিক আছেন? আমার খারাপ লাগছে। শুধু শুধু নিজের ঝামেলায় আপনাকে জড়ালাম...।

বিদিশার সাহস শেখরকে হতবাক করে দিয়েছিল। ও চাপা গলায় বলল, ঝামেলার আর কী আছে! কাল হোঁচট খেয়ে ওরকম পড়ে না গেলে আপনার এক্স হাজব্যান্ডকে চন্দ্রবিন্দু করে ছেড়ে দিতাম। একটু থেমে তারপর ও আমার কথা বাদ দিন। আমি তো সবসময় থ্রিল খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আপনার ভয় করে না?

বিদিশা কাচের চোখে শেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, না। কাল রাতের পর আমার সমস্ত ভয় পাওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।

কথাটা বিদিশা মিথ্যে বলেনি।

কাল রাতে এক ডিসপেনসারি থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ওষুধ নেওয়ার পর বিদিশাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল শেখর।

সারাটা পথ বিদিশা কোনও কথা বলেনি। শুধু একবার বিড়বিড় করে বলেছে, রণজয় আমাকে বাঁচতে দেবে না। হয় ও, নয় আমি—যে-কোনও একজন থাকবে।

শেখর আগে কখনও বিদিশাদের বাড়ি আসেনি। বিদিশা কখনও আসার কথা বলেনি। কারণ, শেখর তখন ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানত না। এখন সবকিছু পালটে গেছে। তাই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ যখন ওরা দুজনে অরুণা-সুধাময়-এ পৌঁছোল তখন বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

অনেক প্রশ্ন, অনেক আলোচনা, অনেক কথা কাটাকাটি। রণজয়ের কাছ থেকে বিপদের ব্যাপারটা যে কত মারাত্মক হতে পারে সেটা অরুণা কিছুতেই বুঝতে চাইছিলেন না। তখন শেখর জামা সরিয়ে নিজের ক্ষতচিহ্নটা দেখাল। অরুণা কথার মাঝখানেই চুপ করে গেলেন। বুঝতে পারলেন, শেখর শেষের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সুধাময় পুলিশে ফোন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অরুণা বললেন, ফোন করে তরুবালাকে সব জানাতে। বদ্ধ পাগল ছেলে কী ভয়ংকর পাগলামিতে মেতে উঠেছে সেটা মায়ের জানা দরকার। বাপ্পা

রণজয়কে ফোন করে সরাসরি হুমকি দিতে বলল। বিদিশা হতাশায় কাঁদতে লাগল। আর এ-বাড়িতে প্রথম অতিথি শেখর বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওর গলার পাশটা ব্যথা করছে। সামান্য চিনচিনে জ্বালাও করছে।

কী আশ্চর্য! আর-একটু হলেই শেখরের থ্রিল-খোঁজা জীবন খতম হয়ে যেতে পারত, অথচ শেখরের মনে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। বরং অল্পের জন্য রণজয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ওর আপশোশ হচ্ছিল।

একটু পরেই বিদিশা যখন কথা বলল, তখন ও একেবারে অন্য মানুষ।

সুধাময়-অরুণা বারবার বলেছিলেন যে, ওর কিছুদিন অফিসে না যাওয়াই ভালো। বিপদটা কেটে যাক, তারপর দেখা যাবে।

উত্তরে বিদিশা রুক্ষ গলায় বলে উঠল, এ-বিপদ কোনওদিন কাটবে না। যেদিন আমি অফিসে যাওয়া শুরু করব সেদিনই আবার বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া বাড়িতে বসে থাকলেই যে কোনও বিপদ হবে না তার কী মানে আছে! যে মানুষটার মাথার গণ্ডগোল সে কখনও সুবিধে-অসুবিধে ভেবে কাজ করে নাকি? আমি কাল অফিসে যাব। আমাকে ভয় পেতে দেখলেই রণজয় আরও পেয়ে বসবে।

বহু তর্কবিতর্ক করেও বিদিশাকে টলানো গেল না। শেখরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল। অরুণা অনেক কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু বিদিশার একরোখা জেদকে হারাতে পারলেন না।

বিদিশাদের পারিবারিক ব্যাপারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শেখরের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বাড়িতে একটা ফোন করে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। এখন দ্বিতীয়বার ফোন করে বলল, এখনই রওনা হচ্ছে।

ও চলে আসার আগে বিদিশা ছোট্ট করে জিগ্যেস করেছিল, কাল অফিসে আসছেন তো?

অফ কোর্স। জবাব দিয়েছিল শেখর, আমি অফিসে না এলে আপনাকে সেলি বাড়িতে পৌঁছে দেবে কে?

উত্তরে ম্লান হেসেছিল বিদিশা। পৃথিবীটা এখনও রণজয়রা কিনে নিতে পারেনি... শেখররাও আছে।

.

শেখর বলল, আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোবেন। আপনাদের বাড়ির কাছটা বেশ অন্ধকার। সন্ধে পার হলেই লোকজন ফিকে হয়ে আসে।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বিদিশা সায় দিল, বলল, তা হলে আধঘণ্টা আগে বেরোব।

ঠিক তখনই পি. এল. চক্রবর্তী কোথা থেকে যেন প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বিদিশার পিঠে হাত দিয়ে তাগাদা দিতে-দিতে বললেন, অ্যাই, বিদিশা, চলো, চলো। খুব জরুরি কয়েকটা ডিকটেশন দেওয়ার আছে।

বিদিশা কুঁকড়ে সরে গেল চক্রবর্তীসাহেবের সুযোগসন্ধানী হাতের আওতা থেকে। উঠে দাঁড়াল চট করে।

প্রশান্ত চক্রবর্তীর স্বভাবটাই এইরকম। সবসময় ছোঁকছোঁক করে বেড়ান। বিদিশার শরীরের যেখানে-সেখানে যৌনতা খুঁজে বেড়ান। বিদিশার গা ঘিনঘিন করে। এই লোকটাও রণজয়ের চেয়ে কম অসুস্থ নয়। শুধু রোগ-লক্ষণগুলো অন্যরকম।

চোখের ইশারায় শেখরকে আসছি বলল বিদিশা। দেখল শেখরের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। ও চক্রবর্তীসাহেবের অসভ্যতায় ভেতরে-ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

পি. এল. চক্রবর্তীর ডিকটেশন আর গায়ে-পড়া গালগপ্পের হাত থেকে বিদিশা রেহাই পেল প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পর। নিজের টেবিলে ফিরে ও চিঠিগুলো টাইপ করতে বসবে, দেখল ওর টেবিলে একটা ইনল্যান্ড লেটার পড়ে আছে।

চেয়ারে গুছিয়ে বসে চিঠিটা খুলল বিদিশা।

যা ভেবেছিল তাই। রণজয়ের চিঠি। সেই একঘেয়ে কাঁদুনিঃ তুমি ফিরে এসো। আর চিঠির শেষ দিকে নির্লজ্জভাবে নোংরা ভালোবাসার কথা লেখা রয়েছে। সেই সঙ্গে কঁচা হাতের রেখায় আঁকা নারী-পুরুষের মিলনের ছবি।

রাগে চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে লিটার বিনে ফেলে দিল বিদিশা। শরীরে ও কেমন এক অসহ্য জ্বালা টের পাচ্ছিল। ওর শান্তশিষ্ট জীবনটা একটা ভয়ংকর জন্তু কীরকম তছনছ করে দিচ্ছে।

বিদিশা আনমনাভাবে ভোলা জানলার দিকে তাকাল। আকাশে গাঢ় মেঘ। কিন্তু কোথাও কোথাও নীলের আভাস। আর কতদিন থাকবে এই মেঘ? লুকিয়ে থাকা নীলের জন্য আকুল হল বিদিশা।

বিদিশা কতক্ষণ যে ও-ভাবে বসে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎই দেখল, বঞ্জারা ওর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাডাম, আপনার ফোন আছে।

বিদিশা উঠে দাঁড়াল। রোবটের মতো নিপ্রাণ পায়ে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ও জানে, এই টেলিফোনটা কে করেছে। কিন্তু এত দেরি হল কেন? আরও অনেক আগে এই ফোনটা আসা উচিত ছিল।

হ্যালো টেলিফোনে যান্ত্রিক স্বরে কথা বলল বিদিশা।

কাল রাতের ওই শুয়োরের বাচ্চাটা কে? ক্ষিপ্ত রণজয়ের কথা ফেটে পড়ল রিসিভারে।

বিদিশা একটা ধাক্কা খেল। ভাবল, রিসিভার নামিয়ে রাখবে। কিন্তু তার পরই একটা তীব্র জেদ আর রাগ ফুটতে শুরু করল ওর মাথার ভেতরে। না, হার মানবে না বিদিশা। ও এই অসভ্য পাগলটার মোকাবিলা করবে।

ছোটলোকের মতো কথা বোলো না। এটা অফিস। এখানে ভদ্রলোকেরা কাজ করে। চাপা ধমকের সুরে বলল বিদিশা।

ও-প্রান্তে আসল রণজয়নোংরা হাসি। বলল, তুমি কি ভেবেছ ওই ভাড়া করা জানোয়ারটা তোমাকে বাঁচাতে পারবে! আমি ওটাকে খতম করে দেব। কেটে টুকরো-টুকরো করে ভাসিয়ে দেব মানিকতলার খালে। তারপর তোমাকে চৌরাস্তায় ন্যাংটো করে...।

চুপ করো। বদ্ধ পাগল কোথাকার বিদিশা হিসহিস করে বলল।

মানু, আমি তোমাকে কতবার বলেছি...।

রণজয়ের কথার ওপরে কথা বলল বিদিশা, তুমি একটা আস্ত পাগল। তোমার মাথার ভেতরে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে আছে। তোমার পাগলামি তোমার মা সহ্য করতে পারে–সেখানে গিয়ে পাগলামি করো–আমার সে-দায় নেই।

মানু– মিষ্টি করে বলল রণজয়, তোমাকে আমি ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। মিষ্টি সুরে বলল, কিন্তু সেই মুহূর্তে রণজয়ের মুখটা দেখলে বিদিশা ভয় পেত।

তুমি আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। নইলে আমি থানা-পুলিশ করতে বাধ্য হব। তোমার মতো ছোটলোক পাগলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আমি রাখতে চাই না। তুমি তোমার মাকে নিয়েই থাকো। তোমরা দুজনেই তো অ্যাবনরমাল-ফলে দিব্যি সুখে থাকতে পারবে...।

একইভাবে রণজয় আবার বলল, মানু, তোমাকে আমি ছাড়ব না...।

এবং লাইন কেটে দিল।

হঠাৎই বিদিশার শরীরের ভেতরে যেন লোডশেডিং হয়ে গেল। টলে পড়ে যেতে গিয়েও ও একটা থাম ধরে সামলে নিল। তারপর থামটার হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সুধীর বোস তার ড্রাফটিং টেবিল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি প্রায় ছুটে এসে বিদিশাকে হাত ধরে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কোথা থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে ধরলেন বিদিশার মুখের সামনে। বললেন, মা জননী, একচুমুক জল খেয়ে নাও, ভালো লাগবে...।

বিদিশা চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে ছিল। বোসদার কথায় গ্লাসের জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল। বোসদাকে ওর ভীষণ ভালো লাগছিল। মনে পড়ল, সকালে এই মানুষটাই ওর আর শেখরের আঘাত আর ক্ষতচিহ্ন লক্ষ করে মন্তব্য করেছিলেন, তোমরা কি অফিসের পর ফ্রি স্টাইল কুস্তি লড়তে গিয়েছিলে নাকি? বয়েসকালে আমিও ওরকম অনেক কুস্তি লড়েছি। তা আমাকেও সঙ্গে নিতে পারতেনিদেনপক্ষে না হয় রেফারি হতাম। তারপর দিলখোলা হেসে শেখরকে বলেছেন, শেখর, সত্যি-সত্যি বলো তো, কী করে চোট পেলে?

শেখর মনগড়া একটা সাফাই দিয়েছে। বিদিশাও তাই। কিন্তু এখন চোখ খুলে ও দেখল, বোসদা স্নেহমাখানো উৎকণ্ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে।

শেখরও কাছে এগিয়ে এসেছিল। ওর আশেপাশে আরও কয়েকজন।

এত মানুষের ভিড় দেখে বিদিশা কেমন অস্বস্তি পেয়ে গেল। ও আলতো গলায় বলল, এখন অনেকটা ভালো লাগছে... তারপর ধীরে-ধীরে উঠে ফিরে গেল নিজের সিটে।

শেখর, বোসদা ও আরও দুজন সহকর্মী বিদিশার সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছিল। বিদিশা ক্লান্ত গলায় বলল, আপনাদের আসার দরকার নেই। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল...এখন ঠিক আছি...আমি একটু একা থাকতে চাই...।

ওরা আর এগোল না। শেখর শুধু বলল, ছুটির পর আপনার সঙ্গে বেরোব—।

বিদিশা ফিরে না তাকিয়েই ঘাড় নড়ল—অর্থাৎ, ঠিক আছে।

নিজের সিটে এসে ক্লান্তভাবে টেবিলে মাথা নামিয়ে রাখল বিদিশা। রণজয়ের হিংস্র মুখটা ও দেখতে পেল। কী শান্তভাবেই না বাঁচতে চেয়েছিল বিদিশা। অথচ এই অসুস্থ বিকারগ্রস্ত লোকটা ওর জীবনকে নরক করে তুলেছে। বিদিশা কি পালটা জবাব দিতে পারে না ওকে? তিল-তিল টেনশনের ভয়ংকর বিষ কি ও ছড়িয়ে দিতে পারে না ওই অমানুষটার জীবনেও?

বিদিশার বারবারই মনে হচ্ছিল, রুখে দাঁড়ানো দরকার। এইবার রুখে দাঁড়ানো দরকার।

চোখ বুজে থাকা সেই ঘোরের মধ্যে বিদিশা হিংস্র পশুটার গলা শুনতে পেল : মানু, তোমাকে আমি ছাড়ব না।

.

ভোরবেলা থেকেই মিহিদানার মতো বৃষ্টি পড়ছিল। ভোরের আকাশ আর ঘড়ির কাটায় কোনও মিল ছিল না। কিন্তু রোজকার অভ্যেস মতো সুধাময়ের জৈবিক-ঘড়ি তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল সাড়ে পাঁচটার সময়ে। নিয়মমাফিক কাজ সেরে সুধাময় বেরিয়ে এসেছেন বাইরের বাগানে। কোণের একটা ঘর থেকে বাগান পরিচর্যার দু-একটি যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে এসেছেন তার প্রিয় গাছপালার কাছে। বর্ষার জলবায়ুতে বেড়ে ওঠা সবুজ পাতার দল তাকে মাথা নেড়ে সুপ্রভাত জানাল। সুধাময় হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন ওদের কাছে।

সুধাময়ের পরনে লুঙি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। তাঁর কাধ আর বাহু দেখলেই শরীরের শক্ত কাঠামো টের পাওয়া যায়। হাতের পিঠে আর কবজির কাছে দড়ির মতো ফুলে রয়েছে শিরা উপশিরা। মাথার কঁচাপাকা চুলে আর চশমার পুরু লেন্সের কাছে বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো লেগে আছে। অথচ সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই তার। কারণ, তিনি তখন শ্বেত করবী গাছের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আর একইসঙ্গে গাছ কাটার বড় কাঁচি নিয়ে করবী গাছের বেপরোয়া বেড়ে ওঠা ডালপালা হেঁটে মানানসই করে দিচ্ছিলেন।

একটা সিগারেটের জন্য তার ঠোঁটে গলায় কেমন তেষ্টা জাগছিল, কিন্তু সুধাময় চেষ্টা করে সেটা সামাল দিচ্ছিলেন। কয়েকবছর ধরে হাঁপের টানে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। সেই কারণেই রোজকার সিগারেটের অভ্যাস সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে আছে, মনের সঙ্গে মোকাবিলায় পেরে না উঠলে এই নেশাটা একেবারে ছেড়েই দেবেন।

এখন তোর ফুলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই—তোর শরীরের দিকে মন দে। শরীর না থাকলে ফুল ফোঁটাবি কী করে? আপনমনে কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সুধাময়ের কঁচি চলছিল।

শ্বেত করবীর পর চারটে দোপাটি গাছ। একটাতেও ফুল নেই, শুধুই সবুজ পাতা। বর্ষায় কোঁকড়া-ঝকড়া হয়ে বেড়ে উঠেছে।

তোরা দেখছি পাতাবাহার গাছ হয়ে গেলি! অবশ্য কী করে ফুল দিবি! এখন তো ঠিক ফুলের সময় নয়।

হাতের কাঁচি রেখে সুধাময় গাছের পাতার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে লালচে-সবুজ ডালগুলো খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এই সময়ে নজর না রাখলে একরকম সাদা-সাদা পোকা হয়।

পোকা খুঁজতে খুঁজতেই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে লোহার গেটের দিকে চোখ গেল তাঁর। গেটের বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

গাছের পাতার আড়াল থেকে মাথা বের করে নিয়ে এলেন সুধাময়। সকাল ছটায়। এ কোন অতিথি এসে হাজির হল!

বাতাসে ভেসে বেড়ানো বৃষ্টির কুচির পরদা ডিঙিয়ে অতিথিকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না।

রণজয় সরকার–তাঁর জামাই। একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোহার গেটের কাছে। বাঁ হাতের নখ দাঁতে কাটছে।

আরে, তুমি! এসো, এসো–এই সাতসকালে হঠাৎ–।

ভোরবেলাতেই লোহার গেটের তালা খুলে দেন সুধাময়। তাই গেট ঠেলে ভেতর ঢুকতে কোনও অসুবিধে হল না রণজয়ের।

ওর পরনে গাঢ় নীল জিনস্-এর প্যান্ট, হলুদ রঙের ঢোলা টি-শার্ট।

হালকা চালে সুধাময়ের কাছে চলে এল রণজয় ও সাতসকালে গাছের যত্ন নিচ্ছেন?

সুধাময় বসেই ছিলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখছিলেন রণজয়কে। এই কাকভোরে কী জন্য এসেছে ছেলেটা? কোনও বদ মতলব নিয়ে আসেনি তো? হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না। কে জানে, হয়তো অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছে মানুর কাছে।

রণজয়ের মুখ হঠাৎ বিষণ্ণ হল। দু-হাত একসঙ্গে জড়ো করে মাথা নীচু করে নিজের জুতোর দিকে তাকাল ও। নরম গলায় বলল, কাল সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। আপনাদের কাছে।

আমি মরমে মরে আছি। আপনি…আপনি আমাকে…।

ঠিক আছে..ঠিক আছে…যাও, ভেতরে যাও। মানু বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছে..।

ছেলেটার চোখে জল। ওর রোগা ফরসা মুখে গাঢ় বিষণ্ণতা মাখানো। সুধাময়ের ভীষণ মায়া হচ্ছিল।

আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, বাবা– বলে ঝুঁকে পড়ে সুধাময়ের পায়ের ধুলো নিল রণজয়।

থাক, থাক– ওকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন সুধাময়। কিন্তু তিনি লক্ষ করেননি, রণজয় যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন ওর হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা ধারালো হেঁসো। আগাছা পরিষ্কার করার জন্য সুধাময়ই ওটা নিয়ে এসেছিলেন কোণের ঘর থেকে।

রণজয়ের নিষ্ঠুর বাঁ-হাত চেপে ধরল সুধাময়ের চুলের মুঠি। এক হ্যাঁচকায় তার মাথাটাকে হেলিয়ে দিল পিছনে। পলকের জন্য সুধাময় দেখতে পেলেন মেঘলা আকাশের পটভূমিতে রণজয়ের বিকৃত মুখ ওর দু-চোখের লালসা, আর তীব্র বাঁকা পথে তার গলা লক্ষ করে নেমে আসা হেঁসোটা।

চিৎকার করতে পারলেন না সুধাময়। কিন্তু তার চিৎকারের চেষ্টাটা বুদ্বুদের মতো বেরিয়ে এল গলার ফাঁক দিয়ে। আর রক্ত ছিটকে গিয়ে ছাপ ফেলল রণজয়ের জিন্স-পরা প্যান্টে।

তার প্রিয় গাছপালার পাশে চিত হয়ে পড়ে গেলেন সুধাময়। তার সামান্য হাঁ হয়ে থাকা মুখে বৃষ্টির কণা ঢুকে পড়ছিল। বাতাসে ছটফট করতে করতে গাছের পাতাগুলো ভীষণ অবাক হয়ে বারবার সুধাময়কে জিগ্যেস করছিল, তোমার কী হল গো? কী হল তোমার? অমন চুপ করে অবাক চোখে তাকিয়ে কী দেখছ? কিন্তু সুধাময় ওদের আর্ত প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছিলেন না।

রণজয় হেঁসোটা ফেলে দিল সুধাময়ের দেহের পাশে। তারপর অত্যন্ত সহজ হালকা পায়ে দু-ধাপ সিঁড়ি উঠে চলে এল মোজেইক করা বারান্দায়। সদর দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল, রণজয় সতর্ক হাতে সেটা ঠেলে ঢুকে পড়ল বিদিশাদের বাড়ির ভেতরে। তারপর দরজা লক করে ছিটকিনি এঁটে দিল।

বাড়ির ভেতরটা নিঝুম...আবছায়া অন্ধকার। একে মেঘলা, তার ওপর সব কটা জানলাতেই পরদা টানা। কিন্তু এ বাড়ির ভূগোল রণজয়ের নিজের হাতের চেটোর মতোই চেনা। তাই ও বেড়ালের মতো পা ফেলে এগিয়ে গেল বিদিশার ঘরের দিকে। মানু কোথায়?

বিদিশার ঘরের দরজাটা বন্ধ। এখনও ও ঘুম থেকে ওঠেনি।

তার পরের ঘরটাই অরুণা-সুধাময়ের। অবশ্য এখন থেকে শুধুই অরুণার। সেই ঘরের দরজা স্বাভাবিকভাবেই ভোলা। সুতরাং শাশুড়ির ঘরে ঢুকে পড়ল রণজয়।

অরুণা তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। তবে হালকা ঘুমের মধ্যে সামান্য এপাশ-ওপাশ করছিলেন। রণজয় ওর ডান হাতটা কলারের পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল পিঠে। তারপর ঢোলা টি শার্টের ভেতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এল খবরের কাগজে ভালো করে মোড়া লম্বা মতো একটা কী যেন। ব্যস্ত হাতে মোড়কের কাগজগুলো খুলে ফেলে দিতেই করাতের দাঁতওয়ালা একটা ঝকঝকে ছুরি দেখা গেল। সেটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে অরুণাকে ধাক্কা মারল রণজয়।

আচমকা রুক্ষ ধাক্কায় চমকে জেগে উঠলেন অরুণা। ঘুম জড়ানো চোখে যা দেখলেন তা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তার মুখের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে গিয়ে জিভটা খসখস করছে। বুঝতে পারলেন, চিৎকারের চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ কোনও শব্দ বেরোবে না তার গলা দিয়ে। আর এ-ও বুঝতে পারলেন, কোন রণজয়কে দেখে বিদিশা এতদিন ভয় পেয়েছে।

রণজয়ের চোখে পাগলের দৃষ্টি, মুখে হাসি, হাতে করাতের দাঁতওয়ালা ছুরি। ও ঠান্ডা গলায় বলল, ভয়ের কিছু নেই। মানুকে ডাকুন।

সুধাময়ের জন্য দুশ্চিন্তা হল অরুণার। মানুষটাতো বাইরে গাছগাছালি নিয়ে থাকার কথা। এখনও সেখানে আছে তো? ওকে কিছু করেনি তো রণজয়!

অরুণাকে এক হ্যাঁচকায় বিছানা থেকে টেনে নামাল রণজয়। তারপর একইরকম শান্ত গলায় বলল, মানুকে ডাকুন।

বিস্রস্ত পোশাক ঠিক করতে করতে বিদিশার ঘরের দরজায় এলেন অরুণা। দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেয়েকে নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকলেন। অনেকক্ষণ পর ঘুম জড়ানো গলায় সাড়া দিল বিদিশা।

অরুণার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। সাতসকালের এই অদ্ভুত ঘটনা তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তার মুখের ভেতরে জিভ নড়ছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন কথা বলার চেষ্টা করলে কথা জড়িয়ে যাবে।

বিদিশা দরজা খুলল। রণজয়কে দেখেই ওর ফরসা মুখ পলকে রক্তহীন হয়ে গেল। ও আকুল আর্ত চোখে অরুণার দিকে তাকাল। যেন বোঝাতে চাইল, ওদের আর কিছু করার নেই। একটা ভয়ংকর বিষধর পাগল সরীসৃপ ধারালো দাঁত নিয়ে হাজির হয়েছে পাখির খাঁচায়। কামড় সে দেবেই।

অরুণাকে এক ঝটকায় পাশে ঠেলে দিল রণজয়। অদ্ভুত এক তৎপরতায় বিদিশাকে টেনে নিল কাছে। চাপা গলায় অস্বাভাবিক সুরে হিসহিস করে বলল, মানু, আমার..মানু...।

বিদিশা সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে ছিল। রণজয়ের বাঁ-হাত কিছুক্ষণ অসভ্যের মতো ঘুরে বেড়াল ওর পিঠে। তারপর ওকে পাশে সরিয়ে অরুণাকে ডেকে নিল রণজয়, আপনি এ-ঘরটায় ঢুকুন। আমি আর আপনার মেয়ে ও-ঘরটায় থাকব।

রণজয়ের কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত অরুণা চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন মেয়ে-জামাইয়ের দিক থেকে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না কিছুতেই। রণজয় তাকে ডেকে যখন বিদিশার ঘরে ঢুকতে বলল তখন তার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল।

বাপ্পা সদর দরজার দিকে ওর ছোট ঘরটায় ঘুমোচ্ছে। ওর ঘুম থেকে উঠতে এখনও অনেক দেরি। রণজয় কি ওকেও ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলবে নাকি!

অরুণার ঘরের লাগোয়া গ্রিল দেওয়া বারান্দায় গেলে বাগানটা দেখতে পাওয়া যায়। আর একইসঙ্গে লোহার গেট, পিচের রাস্তাও দেখা যায়। সুতরাং বারান্দায় দিকের দরজাটা খুলে চিৎকার চেঁচামেচি করলে রাস্তার লোকজন শুনতে পাবে। কিন্তু এই ভোরে রাস্তায় মানুষজন পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া রণজয় হয়তো সেই সুযোগের কথা আঁচ করেই অরুণাকে বিদিশার ঘরে ঢুকতে বলেছে।

বিদিশার ঘরে ঢুকে অরুণা যখন সুধাময়ের চিন্তায় আর আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে আছেন তখন রণজয় এক চিলতে হেসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার আগে ছোট্ট করে বলল, প্লিজ, চিৎকার-টিকার করবেন না। করলে আপনার মেয়ের গলা কেটে দেব– কথা শেষ করার সময় হাতের ছুরিটা উঁচিয়ে দেখিয়েছে রণজয়। তারপর বন্ধ দরজার হাঁসকল টেনে দিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাত চালিয়ে কপালে এসে পড়া চুল ঠিক করল রণজয়। তারপর রুক্ষভাবে বিদিশাকে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল ডাইনিং হলের দিকে।

বন্ধ ঘরের ভেতরে বন্দি হয়ে অরুণা কাঁদতে শুরু করেছিলেন। রণজয়ের সঙ্গে ডাইনিং হলের দিকে যেতে যেতে সেই কান্নার গোঙানি শুনতে পেল বিদিশা। ওরও কেমন কান্না পেয়ে গেল। একইসঙ্গে সুধাময়ের চিন্তাটাও চলে এল মাথায় ও বাপি কোথায়?

ডাইনিং হলে এসেই এক অভদ্র ধাক্কায় বিদিশাকে একটা চেয়ারের দিকে ঠেলে দিল রণজয়। বিদিশা বেশ ব্যথা পেল কোমরে, কিন্তু যন্ত্রণায় চিৎকার করতে ভয় পেল।

ছুরি হাতে রণজয় উদভ্রান্ত বিদিশাকে একবার দেখল, তারপর এগিয়ে গেল বাপ্পার ছোট ঘরের দিকে।

বিদিশা এবার চিৎকার করে উঠল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক্ষিপ্ত চিতার মতো ওর দিকে ছিটকে এল রণজয়। এক ধাক্কায় ওকে চেয়ারসমেত কাত করে ফেলে দিল মেঝেতে।

বিদিশার ভয়ের চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গিয়ে ব্যথার গোঙানি বেরিয়ে এল।

অগোছালোভাবে পড়ে থাকা বিদিশার দিকে তাকিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিল রণজয়। বিদিশা ওর ভয়ংকর চোখ-মুখ দেখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করল।

সকালবেলাতেই নানারকম শব্দ আর কথাবার্তা বোধহয় বাপ্পার ঘুম হালকা করে দিয়েছিল। কারণ, বাপ্পার ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। রণজয় ছুটে সেই দরজায় কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বাপ্পা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওর পরনে ডোরাকাটা পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি।

বাপ্পাকে দেখে বিদিশা চিৎকার করে উঠল, শিগগির! ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দে! জলদি।

বুট পরা পায়ে বিদিশার পাঁজরে প্রচণ্ড এক লাথি কষাল রণজয়। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, ফাকিং বিচ! তারপর এক লাফে পৌঁছে গেল বাপ্পার ঘরের দরজায়। কিন্তু বাপ্পা ততক্ষণে দিদির কথা মতো ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে।

রণজয় বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বাপ্পার ঘরের দরজাতেও হাঁসকল টেনে দিল। ও জানে, বাপ্পার ঘর থেকে পালানোর কোনও উপায় নেই।

তা ছাড়া ওর ঘর থেকে চেঁচিয়ে রাস্তার কাউকে ডাকা বেশ কঠিন। কারণ, ওর ঘরের পাশ ঘেঁষে পরপর দুটো খালি প্লট আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে আছে।

ছুরি হাতে এবার বিদিশার কাছে এসে দাঁড়াল রণজয়। ছুরিটা ডাইনিং টেবিলের একপাশে রেখে দিয়ে ওর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে তেরছাভাবে হাসল, বলল, এসো বউ, আর কোনও লজ্জা নেই–এবারে ফুলশয্যা হয়ে যাক।

বিদিশার ফরসা সুন্দর মুখ ভয়ে বেঁকেচুরে গেছে। কোমরে, পাঁজরে অসহ্য ব্যথা। ডাইনিং হলের এক কোণে রাখা টেলিফোনের দিকে তাকাল ও। যদি কোনওরকমে শেখরকে একটা ফোন করা যেত। কিন্তু ফোন করেই বা কী হত! শেখর টালিগঞ্জ থেকে আসতে-আসতে কম করেও একটি ঘণ্টা। তখন কি আর সাহায্যের কোনও দরকার হবে!

কিন্তু টেলিফোন আর কাউকে করা যায় না? বাড়ির কাছাকাছি কাউকে? পাশের লেনের রমেশবাবুকে, কিংবা ডক্টর সান্যালকে?

হঠাৎ-ই বিদিশা টের পেল, ও বোকার মতন দিবাস্বপ্ন দেখছে। রণজয়ের সামনে এখান থেকে কাউকে ফোন করা অসম্ভব। টেলিফোনের আর-একটা প্যারালাল লাইন রয়েছে সুধাময়-অরুণার ঘরে। সেটা মনে রেখেই বোধহয় রণজয় অরুণাকে বিদিশার ঘরে টেনে এনে বন্দি করেছে। কিন্তু সেখান থেকেও বা ফোন করবে কেমন করে! যদি সুধাময় থাকতেন বাড়িতে, তা হলে...।

কিন্তু বাপি কোথায়? বাইরের বাগানে, নাকি ভোরবেলাতেই বাজারে রওনা দিল? উঁহু, বাজারে। তো যায়নি–ওই তো, রান্নাঘরের দেওয়ালে বাজারের থলে ঝুলছে! বিদিশা হঠাৎ-ই সুধাময়ের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে বিষণ্ন হয়ে পড়ল। ও আর কান্না চাপতে পারল না। হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

আর ঠিক তখনই রণজয় ঝুঁকে পড়ে বিদিশাকে এক হ্যাঁচকায় দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ওকে খুব কাছে টেনে নিয়ে বলল, বউ, কতদিন তোমাকে ভালো করে দেখিনি– ওর গালে ঠোঁটে পরপর কটা চুমু খেল রণজয়। তারপর আদুরে গলায় বলল, নাও, দেখাও।

বিদিশার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। ওর শরীরটা কাঠ হয়ে ছিল রণজয়ের হাতের বাঁধনে। কান্নার দমকে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠছিল বারবার। ও চোখ নামিয়ে রেখেছিল মেঝের দিকে। কী হবে এখন! এই বিপজ্জনক পাগলটার হাত থেকে কী করে রেহাই পাবে বিদিশা!

কী হল! দেখাও– ওকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল রণজয়, নাও, চটপট সব খোলো–।

এতক্ষণে পাগলটার খামখেয়ালি মতলব স্পষ্ট হল বিদিশার কাছে। এই নোংরা লোকটার সঙ্গে ও দু-বছর ঘর করেছে ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। ও আড়চোখে ডাইনিং টেবিলে রাখা নির্লিপ্ত ছুরিটার দিকে দেখল। পুরোনো কয়েকটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল বিদিশার। এইরকম বিপদ এড়াতেই ও মানিকতলার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সল্ট লেকে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, লাভ কিছু হয়নি।

রণজয়ের হাত ওর শাড়ি খামচে ধরতেই বিদিশা চমকে উঠল। প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় বাধা দিয়েছিল ভুল করে। ভুল যে হয়েছে সেটা বুঝিয়ে দিল রণজয়ের নৃশংস থাপ্পড়। বিদিশা টলে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়ে থাকা চেয়ারটা ওর শরীরকে বাধা দিল। ফলে যন্ত্রণার তির বিঁধে গেল পিঠে, কোমরে। ও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

আর তখনই শুনতে পেল, বন্ধ দরজার পিছন থেকে মা চেঁচিয়ে ডাকছে ওকে? মানু! মানু, কী হল? রনো, দরজাটা খুলে দাও। মাথা গরম কোরো না। কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো। মানুকে কিছু কোরো না...।

রণজয় একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল বন্ধ দরজাটার দিকে। তারপর ঝুঁকে পড়ে একমনে বিদিশার শাড়ি ধরে টানতে লাগল।

বিদিশা আর বাধা দিতে পারল না। শাড়ির পাক যতই খুলতে লাগল ওর শরীরটা ততই গড়িয়ে যেতে লাগল পাকে-পাকে।

রণজয় অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে দ্রুত হাতে কাজ সারতে লাগল। খুলে নেওয়া শাড়িটা ও দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল এক কোণে। তারপর পাথরের মতো মুখে বিদিশাকে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

তুমি নিজে খুলবে, না কি আমাকে খুলতে হবে!

রণজয়ের গলার স্বর ভয় পাইয়ে দিল বিদিশাকে। ওর মনে হল, রণজয় বোধহয় বেশ কয়েকটা টেনটেক্স ফোর্ট খেয়ে এসেছে। ও তাড়াতাড়ি ব্লাউজের হুকে হাত দিল।

অরুণা তখনও ইনিয়েবিনিয়ে কেঁদে কেঁদে কীসব বলছিলেন ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না।

রণজয় সরাসরি বিদিশার বুকের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিকে চোখ রেখেই ও ডাইনিং টেবিলে উঠে বসল। বলল, মানু, আমি ফুলশয্যার রাতের মতো এক্সাইটেড হয়ে পড়েছি। কুইক। ওঃ, কাম অন–অত লজ্জা কোরো না। তোমার সবই তো আমার দেখা–শুধু মাঝে ন-দশ মাস দেখিনি। নাও, জলদি।

বিদিশার বোধহয় দেরি হচ্ছিল। অন্তত রণজয়ের সেইরকমই মনে হয়েছে। তাই ও একলাফে নেমে এল বিদিশার খুব কাছে। ওকে জাপটে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল, মুখ ঘষতে লাগল, শরীরে শরীরে ঘষতে লাগল। ওর হাত মাকড়সার মতো হেঁটে বেড়াতে লাগল বিদিশার সারা গায়ে।

বিদিশার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ও এবার স্পষ্ট টের পেল রণজয়ের অবস্থা। সত্যিই ও টেনটেক্স ফোর্ট খেয়ে এসেছে। বিদিশা কাঁদতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওর গলা দিয়ে কেমন একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

ব্লাউজ কখন খুলে গেছে। রণজয়ের লোভাতুর হাতের সামনে কোনও আড়ালই আর নেই। বিদিশা নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অনুভব করতে লাগল ওর প্রাক্তন স্বামীর নির্লজ্জ আদর। প্রথমে হাত দিয়ে, পরে মুখ দিয়ে। ও দেখতে পাচ্ছিল, ওর ফরসা বুকে রণজয়ের কালো মাথাটা কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে, পাগলের মতো ছটফট করছে এপাশ-ওপাশ।

হঠাৎ-ই রণজয় খ্যাপা কুকুরের মতো বিদিশাকে এক হাচড়ায় কোলে তুলে ফেলল। তারপর বসিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলে। ওর শায়ার দড়ি ধরে প্রচণ্ড এক টান মারল। পট করে ছিঁড়ে গেল দড়ি। বিদিশা চোখ বুজে ফেলল। ঘেন্নায় ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

সেই অবস্থাতেই ও টের পেল শায়াটা ধরে ভয়ংকর এক টান মারল কেউ। শব্দে বুঝল শায়া অনেকটা ছিঁড়ে গেল। তারপর বেশ কয়েকটা হ্যাঁচকা টানে ওটা বিদিশার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

লজ্জা ঢাকতে বিদিশা চোখ বুজেই ছিল। তবু টের পাচ্ছিল রণজয় ওর ইচ্ছে মেটানোর পথে ধাপে-ধাপে এগোচ্ছে। পাঁচ-দশ সেকেন্ড পরেই ডাইনিং টেবিলটা বিছানা হয়ে গেল, আর ডাইনিং হলটা বেডরুম। সেইসঙ্গে দিনটাও বোধহয় রাত হয়ে গেল।

সহবাস যে ধর্ষণের চেয়েও জঘন্য হতে পারে সেটা এই প্রথম উপলব্ধি করল বিদিশা। রণজয়ের ফ্রন্টাল লোবের যত গণ্ডগোল সব ধরা পড়ে গেল এই মিলনেও। উপোসী কোনও অশরীরী শরীর ফিরে পেতে যতটা আকুল হয় রণজয়ের চাহিদাও ছিল ঠিক ততটাই আকুল।

পরিশ্রমের ধকলে হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিল রণজয়, আর কাঠ হয়ে পড়ে থাকা বিদিশার কোমল শরীর সেই কম্পন অনুভব করছিল। একইসঙ্গে বিদিশা ভাবছিল, কী করে রুখে দেওয়া যায় এই মারাত্মক অমানুষটাকে।

বাপ্পা চিৎকার করে ডাকছিল, দিদি! দিদি!

অরুণাও কান্না মেশানো গলায় মানু! মানু! করে ডাকছিলেন আর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন।

রণজয় হঠাৎই বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় খিস্তি করে রাগের চোখে ঘুরে তাকাল বিদিশার ঘরের দিকে—যে ঘরে বন্দি আছেন অরুণা। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেল সেদিকে।

বিদিশার চোখে জল, বুকের ভেতরে নাম-না-জানা কষ্ট। ও উঠে বসল ডাইনিং টেবিলে। ব্লাউজ হুকগুলো লাগিয়ে নিল। তারপর লজ্জা ঢাকতে নেমে এল ডাইনিং টেবিল থেকে।

ওকে নামতে দেখেই ক্ষিপ্ত রণজয় এক ঝটকায় ফিরে এল ওর কাছে। এক হাতে টুঁটি টিপে ধরল ওর।

বিদিশার গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা আঁক শব্দ বেরিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই ও চোখের ইশারায় ঘরের কোণে পড়ে থাকা দলা পাকানো শাড়িটা দেখাল। রণজয় বুজতে পারল একটা ছোট্ট ধাক্কায় ওকে ঠেলে দিল সেদিকে।

অরুণা তখনও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন, কান্না জড়ানো গলায় মানু! মানু করে ডাকছিলেন।

রণজয় সাংঘাতিক বিরক্ত হয়ে খ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে গেল সেদিকে। দরজায় একটা জোরালো ধাক্কা মেরে অরুণাকে চুপ করতে বলল। তারপর অশ্রাব্য গালিগালাজের

ফোয়ারা ছোটাল।

বিদিশা শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছিল। তখনই খেয়াল করল, টেলিফোনটা ওর একেবারে হাতের নাগালে।

রণজয় এখন বিদিশার কাছ থেকে অনেকটা দূরে। সুতরাং টেলিফোনটা বিদিশা চট করে একবার ব্যবহার করতে পারে। তবে রণজয় সেটা দেখতে পাবে এবং বিদিশাকে হয়তো অবাধ্যতার জন্য হিংস্র শাস্তি পেতে হবে।

রণজয়ের করাতের দাঁতওয়ালা ছুরিটা এখনও পড়ে আছে ডাইনিং টেবিলে—মাত্র কয়েকহাত দূরে। বিদিশা ইচ্ছে করলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা তুলে নিতে পারে। কিন্তু হাতে পেলেই কি ও জিততে পারবে এই পাগলটার সঙ্গে!

হয় টেলিফোন, নয় ছুরি। যে-কোনও একটা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে বিদিশা। গায়ে শাড়ি জড়াতে-জড়াতে এই অঙ্কের হিসেবটাই কষছিল ও।

শেষ পর্যন্ত ও টেলিফোনের পক্ষেই গেল। শাড়ি খানিকটা অংশ মেঝেতে ফেলে দিয়ে সেটা ঠিক করা ভান করে ঝুঁকে পড়ল মেঝেতে।

সেই সুযোগে টেলিফোনের রিসিভারটা মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে শেখরের বাড়ির নম্বরটা ঘোরাল ডায়ালে : ফোর সেভেন টু ওয়ান নাইন ওয়ান সেভেন।

বিদিশার পিঠ রণজয়ের নজর আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তেই ও ভাবছিল, এই বোধহয় রণজয় এসে দাঁড়াবে ওর পিঠের কাছে, ধরে ফেলবে ওর অভিসন্ধি। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকায় ওকে…।

মেঝেতে পড়ে থাকা রিসিভারে একটি মহিলা কণ্ঠ হ্যালো, হ্যালো করছিল। বিদিশা অতি সন্তর্পণে রিসিভারটা তুলে নিয়ে এল মুখের কাছে। ফিসফিস করে বলল, আমি

বিদিশা বলছি। শেখরকে বলুন আমাদের বাড়িতে এক্ষুনি চলে আসতে। ভীষণ বিপদ...।

পিছন থেকে একটা লাথি এসে পড়ল বিদিশার পিঠে। বিদিশা ঠিকরে পড়ল ডাইনিং হলের বড় জানলার কাছে। ওর শাড়ির অর্ধেকটা কোমরে জড়ানো, বাকিটা লুটোপুটি। সেই অবস্থাতেই ও দেখল, রণজয় ডাইনিং টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়েছে। ছুরির এক কোপে কেটে দিল। টেলিফোনের তার। তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে জোরে আছড়ে মারল মেঝেতে। সংঘর্ষের শব্দ হল। চুরমার হয়ে যাওয়া প্লাস্টিক আর ধাতুর টুকরো ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

রণজয় হাসল বিদিশার দিকে তাকিয়ে। বলল, কী রে, মানু, ভয় পেলি? তারপরই একরাশ খিস্তিখেউড়।

ছুরির ডগাটা বিদিশার ব্লাউজের মাঝামাঝি ঠেকাল রণজয়। ছুরিটা ফেলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল বিদিশার ওপরে। দাঁত দেখিয়ে হাসল, বলল, মানু, আয়, আরও একবার হয়ে যাক।

বিদিশার গা ঘিনঘিন করে উঠল। আবার! টেনটেক্স ফোর্টের তেজ সহজে কমে না।

কিন্তু আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই রণজয় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিদিশার ওপরে। চাপা কর্কশ গলায় বলেছে, তোকে আমি ছাড়ব না!

টেলিফোন আছড়ে ফেলার শব্দে ভয় পেয়েছিলেন অরুণা। বাপ্পাও ভয় পেয়েছিল। সুতরাং কান্নার শব্দ আর দরজার ধাক্কা দুটোই কয়েক পরদা বেড়ে গেল।

রণজয় এবারে আর বিরক্ত হল না। কারণ ওর রক্তে তখন খই ফুটতে শুরু করেছে।

একটা নাম-না-জানা ঘৃণায় বিদিশা হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল, বাধা দিতে চাইল হামলে পড়া জন্তুটাকে। কিন্তু তার জবাবে বিদিশার গলা টিপে ধরল রণজয়। আর বিদিশা ডুবে যাওয়া মানুষের মতো এলোমেলোভাবে বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইল।

বিদিশার চোখের সামনে রণজয়ের বিকৃত মুখ, কপালে-নেমে-আসা চুল, আর গরম নিশ্বাস। আর ওর হাত নিতান্ত অকারণেই খড়কুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটা অবস্থায় বিদিশার হাত পড়ল বেগন পাওয়ারের স্প্রে সিলিন্ডারে। জানলার ঠিক নীচেই দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে সিলিন্ডারটা দাঁড় করানো থাকে। মশা মারার জন্য কেনা হয়েছে এই ওষুধটা। ধাতুর লম্বাটে বোতালের মাথায় সাদা রঙের বোতাম। বোতামে চাপ দিলেই বেরিয়ে আসে ধোঁয়ার মতো স্প্রে। কী বিশ্রী দুর্গন্ধ! নাকে এলেই বিদিশার মাথা ঝিমঝিম করে।

এটা রণজয়ের মুখে স্প্রে করলে কি ওকে থামানো যাবে? মশা মারার বিষে মানুষ কি একটুও অবশ হবে না!

বিদিশা আর ভাবতে পারছিল না। ও মরিয়া হয়ে সিলিন্ডারটা খামচে ধরে রণজয়ের মুখ লক্ষ করে বোতাম টিপে দিল। সাদা ধোঁয়ার মতো স্প্রে রণজয়ের মুখ ঝাপসা করে দিল। উকট দুর্গন্ধে বিদিশার গা গুলিয়ে উঠল। কিন্তু ও দাঁতে দাঁত চেপে বোতাম টিপেই রইল।

এইরকম একটা প্রতিরোধের জন্য রণজয় তৈরি ছিল না। মুখে স্প্রে এসে পড়ামাত্রই ও বিদিশাকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে গড়িয়ে গেল একপাশে।

কিন্তু বিদিশা কোণঠাসা বেড়ালের মতো মরিয়া হয়ে উঠেছে। ও স্প্রে করেই চলল। কখনও রণজয়ের মুখে, মাথায়, কানে, গলায় কখনও বা হাতে, পায়ে, গায়ে। তাক কখনও ঠিক হচ্ছিল, কখনও বা ভুল। কিন্তু মরিয়া বিদিশা বোতামের ওপরে আঙুলের চাপ এতটুকু আলগা করেনি।

রণজয়ের মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ও ছুরিটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছিল। কোথায় গেল ছুরিটা?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলিন্ডার প্রায় শেষ হয়ে গেল। খালি বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারপাশে দেখল বিদিশা। জানলার তাকে টুকিটাকি অনেক জিনিস। একটা তালাচাবি, সাবানকেস, মোমবাতি, ছোট একটা শেকল, দেশলাই, কাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ, আরও কত কী।

দেশলাই! মশা মারার ওই ওষুধে কি সহজে আগুন ধরে? কেরোসিন তেলের মতো? বিদিশার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। ও উদভ্রান্ত নজরে দেখল, রণজয় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওর হাতে সেই ছুরি। সারা গা বেগন পাওয়ারে ভেজা। চোখে খুনির দৃষ্টি।

বিদিশা আর কিছু ভাবতে পারল না। দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিয়ে কাঠি বের করে নিল। এক ঘষায় সেটা জ্বেলে ছুঁড়ে দিল রণজয়ের গায়ে।

চোখের পলকে যেন দেওয়ালি শুরু হয়ে গেল। রণজয়ের ছুরি বাগিয়ে ধরা লড়াকু শরীরটায় আগুন ধরে গেল দপ করে। তারপর লকলকে শিখায় এলোপাতাড়ি জ্বলতে লাগল।

আগুন ধরে গেল ঘরের বাতাসে, যেখানে ওষুধের বাষ্পের কণা ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর বিদিশার শাড়িও রেহাই পেল না। কখন যেন বেগন পাওয়ার ছুঁয়ে গেছে ওর শাড়ি।

বিদিশা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল। রণজয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল জন্তুর গর্জন। আর বন্ধ দরজা দুটোয় কান ফাটানো শব্দ করছিলেন অরুণা ও বাপ্পা—সেই সঙ্গে তীব্র চিৎকার।

এই তুমুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিদিশার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রণজয়ের জ্বলন্ত শরীর। ওর টলোমলো ডান হাত আনাড়ির মতো ছুরি চালাল বিদিশাকে লক্ষ করে।

বিদিশা তখন চিৎকার করে ছুটেছিল কলঘরের দিকে, আর পরনের শাড়িটাকে গা থেকে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। রণজয়ের ছুরি ওর ডান বাহুতে এসে লাগল, কিন্তু সেই যন্ত্রণা

বিদিশা বোধহয় টের পেল না। ও পাগলের মতো ঢুকে পড়ল কলঘরে। শাওয়ারের কল খুলে দিল শেষ পাঁচ পর্যন্ত। তারপর শাওয়ারের নকল বৃষ্টির নীচে কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে গোড়া কাটা গাছের মতো ঠাস করে পড়ে গেল কলঘরের মেঝেতে।

নকল বৃষ্টি ওর লজ্জাহীন শরীরকে তখন ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেও বিদিশা শেষবারের মতো দেখল, রণজয়ের দেহটা মেঝেতে পড়ে গিয়েও দাউদাউ করে জ্বলছে।

চেতনা হারানার আগে বিদিশা অনেকগুলো দরজায় একসঙ্গে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল। মনে হল, বাইরে থেকে কে যেন সদরে কলিংবেলের বোতাম টিপছে।

তারপর আর কিছু ওর মনে নেই।

.

চোখ খুলেই নার্সিং হোমের সাদা দেওয়াল, সাদা পোশাক পরা নার্স। এ ছাড়া সাবানের ফেনার মধ্যে ভাসছে বেশ কয়েকটা পরিচিত রঙিন মুখ। সেই মুখগুলোর মধ্যে মা-বাবা রণজয়কে খুঁজল বিদিশা। কিন্তু শুধু মাকে দেখতে পেল।

মাথার অসহ্য যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ও ভাবতে চেষ্টা করল।

না, এটা সেই প্রথমবারের নার্সিং হোম নয়। টেনটেক্স ফোর্ট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিদিশা এখানে আসিনি। এখানে ও এসেছে অন্য কোনও কারণে।

জলের গভীর থেকে বুদবুদ যেমন ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসে ঠিক সেইভাবে বিদিশার অচেতন মন চেতনায় ভেসে উঠছিল। শরীরের জ্বালা যন্ত্রণাগুলো একটু-একটু করে টের পাচ্ছিল ও। আর একইসঙ্গে চোখের নজর স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল।

এইবার মুখগুলোকে স্পষ্ট করে চিনতে পারল বিদিশা। মা, বাপ্পা, শেখর, বোসদা, দেবলীনা, সুতপাদি আর অশোক চন্দ্র।

ওকে চেতনায় দেখে সবাই স্বস্তির হাসি ফোটাঁল মুখে।

বিদিশাও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁটে বেশ ব্যথা।

অরুণা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, এখন কেমন আছিস?

বিদিশা সামান্য মাথা নেড়ে বলল, ভালো।

আর তখনই ও মায়ের সাদা শাড়ি খেয়াল করল।

ও সামান্য ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্টভাবে প্রশ্ন করল, বাপি আসেনি?

অরুণা বাপ্পাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। মাথা নীচু করে আঁচলে মুখ গুঁজলেন। শেখর এগিয়ে এসে অরুণাকে আলতো করে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিদিশার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনার এখন কথা বলার দরকার নেই–স্ট্রেইন হবে।

সুতপাদি আর দেবলীনা বিদিশার হাত ধরল, হাসল ঠোঁটে।

বিদিশার সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। নার্সিং হোমে ও কতদিন পড়ে আছে? পাঁচ দিন? সাত দিন? দশ দিন?

ও বিড়বিড় করে বলল, রণজয়…।

শেখর বলল, কথা বলতে বারণ করলাম না! আপনার আর কোনও ভয় নেই…আর কেউ কখনও আপনাকে বিরক্ত করবে না। সেরে উঠে পরে সব শুনবেন।

বাপি… ডুকরে কেঁদে উঠল বিদিশা। ওর চোখ ভিজে গেল।

নার্স এগিয়ে এল শেখরের কাছে। বলল, আপনারা এবার যান। পেশেন্টকে এবার ঘুমের ইনজেকশন দেব।

ওরা একে-একে সরে এল বিদিশার কাছ থেকে।

বিছানার পাশের জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে পাচ্ছিল বিদিশা। কোথাও সাদা মেঘ, আর কোথাও নীল আকাশ। কালো মেঘ কোথাও নেই।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে সুধীর বোস বললেন, মা জননী, তুমি ঝটপট সেরে উঠে অফিসে জয়েন করো। তুমি অফিসে না এলে আমরা ঠিক কাজে মুড পাচ্ছি না।

অশোক চন্দ্র জিগ্যেস করল, বোসদা, আমরা মানে কারা?

ঘরের দরজার বাইরে বেরিয়ে এসে শেখরের পিঠে চাপড় মেরে বোসদা বললেন, আমরা মানে আমি আর শেখরভায়া–।

অশোক অবাক হওয়ার ভান করে বলে উঠল, আমি কি সেদিনের মতোই এজ বারে আটকে গেলাম?

সুধীর বোস পান চিবোতে-চিবোতে গম্ভীর গলায় বললেন, ইয়েস।

পোষা পাখির বাগানে

পোষা পাখির বাগানে

হিতেশ কাপুর

রোমিলাকে আমি সঙ্গে নিতে চাইনি।

নতুন পরিবেশ, নতুন জায়গা, সেই কারণেই একটু ইতস্তত করেছিলাম। এখন দেখছি মনের বাধায় সাড়া দিলেই ভালো হত। এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমার ভাগ্যে জুটত না। প্রতিটি পল-অনুপল কাটাতে হত না অন্ধ আশঙ্কায়। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কাকে আমি দায়ী করব? কাহ্রেইন-এর শেখ আবদুল অল হারিদকে? আমার বন্ধু মোহন খান্নাকে? আমার বোন রোমিলাকে? না দায়ী করব নিজেকেই?

প্রথমদিন থেকে ঘটনাগুলো যেন ছবির মতো মনে পড়ছে। ছোট্ট অ্যাভো প্লেনটায় আমরা তিনজন উড়ে চলেছিলাম কাহরেইন-এর দিকে। তিনজন বলতে আমি, মোহন আর রোমিলা। প্লেনে আর কোনও যাত্রী ছিল না। কারণ, শেখ হারিদ আমাদের জন্যেই পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজস্ব ছোট প্লেনটি। তিনজনেই বেশ খোশমেজাজে ছিলাম। কাজের সূত্রে এরকম নতুন দেশ দেখার সুযোগ কজন পায়। কিন্তু...

শুরু থেকেই তা হলে শুরু করা যাক।

.

রোমিলা জানলা দিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। নীচে, অনেক নীচে পার্শিয়ান গালফ সেখানে সূর্যের আলোয় নীল জল ঝিলিক মারছে। পথ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু রোমিলাকে দেখে মনে হচ্ছে, নিজের সৌভাগ্যকে ও এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। কোনওদিন যে এরকম একটা দূর দেশে ও বেড়াতে আসবে সেকথা স্বপ্নেও ভাবেনি। ওকে খুশি দেখে আমার মনটা ভরে গেল। মা-বাপ মরা ওই একটা আদরের বোন আমার। আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। সারাটা জীবন ও ঘরকুনো হয়ে পড়ে রইল। জীবনের সাধ আহ্লাদ-আনন্দ কিছুই তেমন করে পেল না। এমনিতে ও খুব কম কথা বলে। নিঃশব্দে সাংসারিক কাজ সেরে দেয়। কিন্তু এখন ও একেবারে পালটে গেছে। সেই রওনা হওয়ার সময় থেকেই ছোট্ট মেয়েটির মতো খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

সংক্ষেপে আমার পরিচয়টা এখানে সেরে নিই।

আমার নাম হিতেশ কাপুর। এখনও মনের মতো মেয়ে পাইনি, তাই কুমার হিতেশ কাপুর হয়েই রয়ে গেছি। ভারতের এক নামি তেল কোম্পানিতে আমি চাকরি করি। চাকরিসূত্রে প্রায়ই আমাকে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াতে হয়, কিন্তু ভারতের বাইরে এই প্রথম। বিদেশি তেল কেনাবেচার ব্যাপারে হঠাৎই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল পার্শিয়ান গালফ-এ যাওয়ার।

কোম্পানির ডিরেক্টরের কাছ থেকে কথাটা শুনে যে আনন্দ হয়নি তা নয়, কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে : রোমিলার কী হবে? কারণ পার্শিয়ান গালফ এ আমার সাতদিনও লাগতে পারে, আবার সাতাশদিনও লাগতে পারে। দু-চারদিনের ব্যাপার হলে রোমিলাকে একাই রেখে যেতাম। বাড়ির কাজের লোক ওর দেখাশোনা করত। কিন্তু এতগুলো দিন? তাছাড়া বেচারি মেয়েটা খুব মনমরা হয়ে পড়বে। সুতরাং সেদিনই বাড়ি ফিরে রোমিলাকে বললাম, অফিসের কাজে আমাকে মিডল ইস্ট যেতে হচ্ছে। সামনের সপ্তাহে।

ও ছোট্ট করে জিগ্যেস করল, ক-দিনের জন্যে, দাদা?

সাতদিনও লাগতে পারে, আবার এক মাসও লাগতে পারে।

রোমিলা গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখটা বিষণ্ন দেখাল। আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, ভাবছি, তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

সঙ্গে-সঙ্গে অবাক কাণ্ড ঘটল। রোমিলা মুখ নামিয়ে বসেছিল, চকিতে মুখ তুলে তাকাল। চোখেমুখে খুশির ফুল ফুটেছে। ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অবিশ্বাসে ভরা মিষ্টি গলায় বলে উঠল, সত্যি!

আমি প্রাণখোলা হাসি হেসে বললাম, সত্যি। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

আমার বরাবরের দেখা মনমরা চুপচাপ মেয়েটা আনন্দে খুকি হয়ে গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিদেশ ঘোরা আমার কতদিনের স্বপ্ন ছিল জানো? উফ, আমি ভাবতেই পারছি না দাদা, এই খবরটা সত্যি। যাই, টেলিফোনে বন্ধুদের খবর দিই।

ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হল, রোমিলার মনমরা চুপচাপ আচরণের জন্যে আমিই দায়ী। বাইরে ঘোরার নামে মেয়েটা এত খুশি হয়! ওকে খুশি রাখার জন্যে এবার থেকে মাঝে-মাঝে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাব। নিজের ওপরে রাগ হল। এ কথাটা আমার আগে কেন খেয়াল হয়নি?

পরদিনই অফিসে সব ব্যবস্থা সেরে নিলাম।

অফিস থেকে পার্শিয়ান গালফ ট্যুরে আমি একা যাচ্ছি না। আমার সঙ্গী হচ্ছে সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার মোহন খান্না। মোহন আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় হলেও সম্পর্কটা আমাদের বন্ধুর মতো। ওকে একান্তে নিয়ে রোমিলার কথা খুলে বললাম।

আমার সমস্যাটা শুনে ও রাজি তো হলই, তা ছাড়া নতুন বুদ্ধি দিল। বলল, হিতেশ, বোনকে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত খরচ তুমি করবে ঠিক করেছ জানি। কিন্তু তবুও একটা

পরামর্শ দিই। আমরা দুজনেই অফিস থেকে ফার্স্ট ক্লাস এয়ার ফেয়ার পাই। যদি তা নিয়ে আমরা ইকনমি ক্লাসে ট্রাভেল করি তাহলে তোমার বোনের প্লেন ভাড়া তো উঠে যাবেই, তার ওপর হোটেল খরচও কিছুটা পাওয়া যাবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু তুমি কেন ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে ইকনমি ক্লাসে ট্রাভেল করতে যাবে? তোমার অসুবিধে হতে পারে।

মোহন আমার পিঠে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল। তারপর হেসে বলল, নখরা ছোড়, ইয়ার। তোমার বোনকে সুখবরটা আজই ফাইনাল করে শুনিয়ে দাও, তারপর স্টার্ট প্যাকিং। সামনের মঙ্গলবার আমাদের ফ্লাই করতে হবে।

সেই মুহূর্তে মোহন খান্নাকে খুব ভাল লাগল আমার। বুকের ভেতরে খুশি উপচে পড়তে লাগল।

সেদিনই বাড়ি ফিরে হাঁকডাক করে রোমিলাকে ফাইনাল খবর জানিয়ে দিলাম। তারপর দু-ভাইবোন মিলে গোছগাছ শুরু করলাম। উৎসাহ কারও কম নয়। রোমিলাকে বললাম, ওখানে এক শেখের কাছ থেকে তেল আদায় করার জন্যে কোম্পানি আমাকে আর মোহন খান্নাকে পাঠাচ্ছে, বুঝলি? আমরা তিনজনে গিয়ে শেখকে নিংড়ে তেল বের করে ছাড়ব।

আমি আর রোমিলা গলা ছেড়ে হেসে উঠলাম। কাজের মেয়েটি, নাম কমলা, সেই হাসি শুনে ছুটে এল আমাদের ঘরে। হয়তো ভাবল, দাদা-দিদি পাগল হয়ে গেছে।

*

নিজের অবাক করা সৌভাগ্যে রোমিলা তখনও মশগুল। আমি ওর পাশে বসে গুগুন করে গানের সুর ভাঁজছি। আমাদের সামনের সিট থেকে মোহন খান্না ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এয়ার হোস্টেসদের সুর নকল করে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যাব।

রোমিলা খুশিতে ফিরে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর বলল, শেখ লোকটা কিন্তু দারুণ। তেহরান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজের এরোপ্লেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি হাসলাম। কারণ এই প্লেনে ওঠার পর থেকে রোমিলা কমপক্ষে পাঁচবার শেখসাহেবের অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা করেছে। এখন ও অবাক হয়ে প্লেনের বিলাসবহুল অঙ্গ সজ্জাগুলো আবার লক্ষ করছে। সত্যি, অ্যাভ্রো প্লেনটায় পেছনে বহু টাকা ও পরিশ্রম খরচ করেছেন শেষ আবদুল অল হারিদ।

একেই বলে কেতায় থাকা!—রোমিলা মুগ্ধ হয়ে বলল।

আমাদের তেল বেচুক আর না বেচুক, শেখের কখনও টাকার অভাব হবে না।

—মোহন ঠাট্টার হাসি হাসল। তারপর ছোট্ট করে মন্তব্য করল, তেল বেচাটা এই শেখগুলোর শখ!

রওনা হওয়ার আগে আমি শেখ হারিদ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়েছিলাম। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, তার ওপর মধ্য প্রাচ্যে ইদানীং রোজই গোলমাল লেগে রয়েছে। সেইসব খোঁজখবরের ভিত্তিতেই বললাম, শেখ হারিদের সম্পর্কে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে বোঝা যায় হারিদ অন্যান্য শেখের থেকে আলাদা। নিজের কাহ্রেইনকে তিনি বেশ কড়া শাসনে রেখেছেন। আর কিছুটা স্বেচ্ছাচারী। শুনেছি রাজ্যের লোকজনদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারও নাকি করে থাকেন।

সত্যি বলছ?রোমিলা অবাক হয়ে জানতে চাইল। ওর মুখে ভয়ের সংশয় দেখা দিয়েছে। ওকে সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, অবশ্য খবরগুলো পুরোপুরি সত্যি কিনা জানি না—।

কিন্তু রোমিলা ছাড়ল না। বলল, না দাদা, সত্যি করে বলো, খবরগুলো তুমি কোত্থেকে পেয়েছ?

অতএব বাধ্য হয়ে সব খুলে বললাম।

মিডল ইস্টের কয়েকটা খবরের কাগজ আমার হাতে এসেছিল। তাতেই জেনেছি, কাহরেইনকে ঠিক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য বলা যায় না। গণতন্ত্র সেখানে পুরোপুরি নেই। বরং স্বৈরতন্ত্রই যেন বাসা বেঁধেছে। শেখ হারিদের নিজস্ব সেনাবাহিনী আছে এবং রাজ্যের যে-কোনও মানুষের তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

আমার কথা শুনে মোহন খান্না কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এতে নতুন কোনও ব্যাপার নেই, হিতেশ। মিডল ইস্টে এরকম রাজ্য আরও প্রায় একডজন আছে। সবই সেই মোগলাই ব্যাপার।

কিন্তু আমার মনের ভেতরে অন্য একটা কাটা খচখচ করছিল। সে কথাই মোহনকে বললাম, এরকম রাজ্য আরও আছে জানি, কিন্তু শেখ হারিদ-এর কুখ্যাতি সবার চেয়ে বেশি। রাজ্যের কয়েকটা বিদ্রোহ তিনি এমন নৃশংসভাবে দমন করেছেন যে, আমাদের সভ্য সমাজ ভাবতেও শিউরে উঠবে। খবরের কাগজের বক্তব্য হল, অহেতুক নৃশংসতার কোনও দরকার ছিল না। তাতেই মনে হয়, শেখ কিবা তার দলবল হয়তো স্বাভাবিক মেজাজের মানুষ নয়।

মোহন খান্না যৎসামান্য রাজনীতি চর্চা করে। শেখের বিরুদ্ধে আমার অসন্তোষ প্রকাশ পেতেই ও চড়া গলায় বলল, এ-যুগে কোন মানুষটা সুস্থ-স্বাভাবিক মেজাজের বলো দেখি? এ সবই হল কাগজের রিপোর্টারদের মনগড়া অভিযোগ। পৃথিবীর কোনও দেশকে এ-অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে বলতে পারো? হাঙ্গেরি আর চেকোস্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার দাপট, তিব্বতের ওপর চিনদেশের অপশাসন, ভিয়েতনামে আমেরিকা আর আলজিয়ার্স-এ ফ্রেঞ্চ অত্যাচার। এমনকী সাইপ্রাসের ওপরে ব্রিটিশের অত্যাচার নিয়েও অভিযোগ তুলেছে রিপোর্টাররা। সুতরাং দোস্ত, কয়েকটা খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে আমাদের বন্ধু শেখ হারিদকে সমালোচনা কোরো না। তা ছাড়া, সে আমাদের তেল দেবে এটা ভুলে যেয়ো না।

কিন্তু তবুও আমি মোহন খান্নাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলাম না। বললাম, হয়তো তোমার কথা ঠিক, মোহন। কিন্তু যখন সমস্ত অত্যাচারের ঘটনাগুলো নিজের দেশেই ঘটে, তখন? আসলে কাহরেইন হল এমন একটা...।

মোহন হাত তুলে আমাকে বাধা দিল : কাহ্‌রেইন-এর শাসনব্যবস্থা নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, হিতেশ। তোমার-আমার কাজ হল সস্তায় শেখ হারিদের কাছ থেকে তেল কেনা, ব্যস।

সে যাই হোক, শেখ হারিদের ভদ্রতার তুলনা নেই। আমাদের নেওয়ার জন্যে নিজের প্লেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ নিয়ে রোমিলা ছ-বার বলল কথাটা।

ফলে আমিও কাহরেইন-এর প্রসঙ্গ পালটে বললাম, যে-প্লেনে আমরা এসেছি তার সঙ্গে এ-প্লেনটার কোনও তুলনা চলে না।

ঠিক বলেছ!—মোহন খান্না হেসে সায় দিল ও ও-প্লেনটার এরকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল না।

কথাটা বলে মোহন ইশারায় পাইলট কেবিনের দরজার কাছে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটির দিকে দেখাল। মধ্যপ্রাচ্যের এই রূপসী আমাদের বাতাস-বিনোদিনী। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আহার-পানীয় ইত্যাদির ব্যবস্থা সে করে গেছে পরম যত্নে। রোমিলা হাজির থাকা সত্ত্বেও মোহন দু-একবার রসাল রসিকতা করতে ছাড়েনি। আমি বরং নিজেকে সামান্য সংযত রেখেছি।

হঠাৎই দেখি বাতাস-বিনোদিনী দু-পাশের সিটের মাঝখানের অলিপথ ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঠোঁটের মধুর হাসিটা যেন কেউ তেহ্‌রান থেকেই ওর মুখে তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে।

ওকে আসতে দেখে মোহন শিস দিয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, হিতেশ, তোমার শেখ ভাই যতই নৃশংস হোক, তার পছন্দ আছে।

আমাদের সামনে এসে মেয়েটি মিষ্টি স্বরে ঘোষণা করল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কাহরেইন-এ নামব। আপনারা দয়া করে সিট বেল্ট বেঁধে নিন, আর সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন।

আমি সিগারেট ধরিয়েছিলাম। মেয়েটির কথায় সেটি অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলাম।

ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে সে নিজের সিটে ফিরে গেল। টের পেলাম, প্লেনটা একপাশে কাত হয়ে চক্কর দিয়ে নামতে শুরু করেছে।

.

হিতেশ কাপুর

কাহরেইন দাঁড়িয়ে আছে পার্শিয়ান গালফ আধাআধি পেরিয়ে। উপকূল বরাবর প্রায় দশ মাইল চওড়া এবং বিশাল ইরানের মধ্যে প্রায় বিশ মাইল ঢুকে পড়েছে ছোট এই রাজ্যটি। মাত্র দুশো বর্গমাইল এলাকা হলে কী হবে, এটাই বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জমি। কারণ গোটা দেশটাই ভাসছে তেলের ওপর। অথচ রোদে ঝিলিক তোলা সোনালি বালি দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

কাহরেইন-এর রাজধানীর নামও ওই একই। ছোট্ট এয়ারপোর্টটা রাজধানীর পশ্চিম ঘেঁষে। ছোট, তবে নিখুঁতভাবে তৈরি।

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ বসবাস করে রাজধানীতে। অন্য শহরগুলোয় রাজধানীর রমরমা নেই। সেগুলো সত্যিই যেন মরুভূমি। প্লেন থেকে নামতেই একটা কালো এয়ার কন্ডিশন্ড মার্সিডিজ গাড়ি আমাদের তুলে নিল। তারপর হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল হারিদের প্রাসাদের দিকে। চলার পথে ড্রাইভার একটিও কথা বলল না।

মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই শেখের প্রাসাদে পোঁছে গেলাম।

প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে সশস্ত্র প্রহরা। গেট পেরিয়েই টানা নুড়ি-পথ। তার দু পাশে সবুজ গাছপালা। নুড়ি-পথটা অনেকটা পাহাড়ি রাস্তার মতো এঁকেবেঁকে উঠে গেছে একটা বড়সড় টিলার ওপরে। সেখানেই বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেখ হারিদের সাদা ধবধবে বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে তিনদিকের ধূলিমলিন শহরগুলো নীচে, অস্পষ্ট ধোঁয়াশার আস্তরে যেন ঢাকা। আর প্রাসাদের মুখোমুখি গালফ-এর শীতল জল নীল, মাঝে-মাঝে সাদা ফেনার টুকরো। ছোট-ছোট ঢেউ তুলে নীল জলরাশি যেন চঞ্চল খেলায় মেতেছে।

গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ল একটা বড় মাপের গাড়িবারান্দা। কেতাবি আরবি পোশাকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। রোদ পড়ে তার সাদা আলখাল্লা ঝকঝক করছে। আমাদের কাছাকাছি এসেই ভদ্রলোক নীচু হয়ে অভিবাদন জানালেন।

আমার নাম হাসান, আমি শেখ আবদুল অল হারিদের ব্যক্তিগত সচিব। কারেইন-এ আপনাদের স্বাগত জানাই।

হাসানের কণ্ঠস্বর ভরাট, মার্জিত বেশ সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার মতো। মুখচোখের রেখা সজীব ও তীক্ষ্ণ। থুতনিতে মিশকালো দাড়ি।

আমার ও মোহনের সঙ্গে করমর্দন করার সময় হাসানের ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটল। তারপর রোমিলার দিকে মনোযোগ দিয়ে তিনি বললেন, এই সুন্দরীর পরিচয় জানতে পারি?

আমার বোন, রোমিলা।আমি সহজ গলায় বললাম। অথচ বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি জাগছিল।

স্বাগতম, মিস রোমিলা। হাসান রোমিলার হাত ধরলেন। তারপর অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে হাতে চুমু খেলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন

রোমিলাকে। তার কালো চোখ সম্মোহনের দৃষ্টিতে খেলে বেড়াতে লাগল রোমিলার সুন্দর মুখে।

রোমিলা হঠাৎই লজ্জা পেয়ে হাসল । ধন্যবাদ, মিস্টার হাসান। আমি একরকম জেদ করেই দাদার সঙ্গে এসেছি নতুন দেশ দেখব বলে। দাদা আর মিস্টার খান্না যখন ব্যবসায়িক কাজকর্ম সারবেন, সেই ফাঁকে আমি আপনাদের চমৎকার শহরগুলো দেখে বেড়াব।

আপনার বিদেশ ভ্রমণ নিশ্চয়ই সুখের হবে, মিস রোমিলা।

পরক্ষণেই হাসানের মুখ থেকে বিগলিত ভাবটা মিলিয়ে গেল। ভাবলেশহীন মুখে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে মাপা সুরে তিনি বললেন, আমাদের মাননীয় শেখের ইচ্ছে যে, কাহরেইন এ থাকাকালীন আপনারা তার প্রাসাদেই আতিথ্য গ্রহণ করেন।

কিন্তু আমি তো শুধু বেড়াতে এসেছি!–রোমিলা আপত্তি জানিয়ে বলল। তারপর আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, কী হল, তোমরাও কিছু বলো!

আমি ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু হাসান যেন রোমিলা বা আমার কথা শুনতেই পাননি। তিনি তখন শান্ত সুরে যান্ত্রিকভাবে বলে চলেছেন, যদি আপনারা মাননীয় শেখের আতিথ্য-আপ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। অতএব আসুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। সঙ্গে নিয়ে আসা মালপত্রের জন্যে চিন্তা করবেন না। সেগুলো আপনাদের আগেই নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে যাবে।

হাসানের কথার সুরে ও ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা ছিল যে, আমি বা মোহন কেউই তাঁর অনুরোধ বা আদেশের প্রতিবাদ করতে পারলাম না। আমরা তিনজনেই হাসানকে অনুসরণ করলাম।

প্রাসাদের ভেতরটা স্নিগ্ধ শান্ত। সাদা রং ছাড়া অন্য কোনও রং কোথাও নেই। কেন জানি না আমার তাজমহলের কথা মনে পড়ে গেল।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে আমাদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিভিন্ন দিকের দেওয়াল থেকে। অস্বাভাবিকরকম চওড়া অলিন্দ ধরে আমরা হেঁটে চলেছি। মাথার অনেক ওপরে নকশাদার কারুকাজ করা সিলিং। কিছুদূর পরপরই সিলিং থেকে ঝুলে রয়েছে কাটগ্লাসের ঝকমকে ঝাড়লণ্ঠন। ডানদিকের দেওয়ালে সাজানো রয়েছে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা নানারকম অয়েল পেইন্টিং। আর বাঁদিকে একটানা ঘরের মিছিল। আমরা একের পর এক কালচে কাঠের নকশা কাটা দরজা পার হয়ে চলেছি। পর-পর দুটো দরজার মধ্যেকার দূরত্ব দেখে বোঝা যায় ঘরগুলো আকারে বিশাল। দুটো দরজার মাঝের ফাঁকা দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী।

পাশাপাশি তিনটে ঘরে আমাদের স্থান দিলেন হাসান।

প্রতিটি ঘরের আকার-প্রকার ও সাজসজ্জা যে-কোনও পাঁচতারা হোটেলকেও লজ্জা দেবে। অবশ্য ঘর না বলে সেটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বলাই ভালো।

আমি হতবাক হয়ে ঘরের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে পড়ল, প্লেনে বসে রোমিলাও ঠিক এইরকম অবাক হয়েছিল।

একটু পরেই মোহন আর রোমিলা আমার ঘরে এল। ওরা জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে। ওদের দেখে আমি হেসে মন্তব্য করলাম, এই যদি শেখের অতিথিশালা হয় তাহলে শেখ নিজে যে-ঘরে থাকেন তার জাঁকজমক কীরকম কে জানে!

মোহন বলল, তুমি যতই খুঁতখুঁত করো না কেন, আমার কিন্তু এখানে বেশ লাগছে। হোটেলে এই আরাম পাওয়া যেত না।

সে তুমি ঠিকই বলেছ।আমিও মোহনের সঙ্গে একমত হলাম।

রোমিলা এখন আবার খুশি হয়ে উঠেছে। ও বলল, দাদা, আমি শুধু ভাবছি কোন ড্রেসটা পরে শেখের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

রোমিলা খুশি হয়েছে কারণ হাসান যাওয়ার সময়ে ওকে বলে গেছেন, মিস্টার কাপুর ও মিস্টার খান্না যখন মাননীয় শেখের সঙ্গে পরিচয় করতে যাবেন, তখন আপনিও অবশ্যই আসবেন, মিস রোমিলা।

রোমিলা খুশিতে ফুটছে। বলল, ও, বাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধুদের সব গল্প শোনাতে আমার আর তর সইছে না!

মোহন গম্ভীরভাবে বলল, সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কে না আলাপ করতে চায়! শেখ তো তার ব্যতিক্রম নয়।

আমি বললাম, ধ্যুৎ, শেখদের সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে আমাদের হারিদ সাহেবের হয়তো একটা গোটা হারেমই রয়েছে। এতগুলো মেয়ে একটা পুরুষ কখনও সামলাতে পারে!

মোহন খান্না বিজ্ঞের মতো বারদুয়েক ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, যাই বলো ভাই, এই হারিদ লোকটার রুচি আছে।

রোমিলা বলল, আমি যাই। চটপট বেছে ফেলি কোন ড্রেসটা পরে শেখের দরবারে যাব।

ও চলে যেতেই মোহন আমাকে লক্ষ করে চোখ টিপল। বলল, হিতেশবাবু, বলা যায় না, শেখ হয়তো তার হারেম থেকে দুজন রূপসীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে রাতে সেবা করার জন্যে।

আমি ওর কাঁধে এক থাপ্পড় মেরে বললাম, তোমার সবসময় খালি এক চিন্তা।

আমার মনের ভেতরে একটা অস্বস্তির কাটা খচখচ করতে লাগল। কারণ, হাসানের নজর আমার একটুও ভালো লাগেনি। মোহনকে অবশ্য সে কথা বললাম না। আর বললেও ও সেটা হেসে উড়িয়ে দিত।

.

শেখ আবদুল হারিদের চেহারা বেঁটে, মোটা। চোখ দুটো কুতকুতে। থুতনিতে চুঁচলো দাড়ি। তার ধারালো নজরের সামনে রোমিলা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বিশেষ করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর শেখসাহেব যখন ওর হাত তুলে চুমু খেলেন।

এ সত্যিই আমার মহা সৌভাগ্য, মিস কাপুর।—শেখের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল হাসানের ভদ্রতা ও মোলায়েম ভাব। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার কাপুর, আপনার বোন অপরূপ সুন্দরী। সামান্য হাসলেন শেখ হারিদ : এখান থেকে খুব কাছেই আমার চেনা কয়েকজন উপজাতির সর্দার আছে যারা মিস কাপুরের বিনিময়ে অসংখ্য ছাগল দেবে। অবশ্য আমার ধারণা, উনি বিক্রির জন্যে নন।

শেখের কথায় ঠাট্টার সুর থাকলেও আমার কেমন খারাপ লাগল। মনে হল, তিনি বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। কিন্তু কোনও এক শঙ্কায় আমি নিজের উত্তেজনা সামলে নিয়ে ঠাট্টার মেজাজেই বললাম, রোমিলার বদলে আমি যদি একপাল ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরি তা হলে আমার বন্ধু বান্ধব-আত্মীয়রা ছেড়ে কথা বলবে না। তারপর গলা নামিয়ে বললাম, তা ছাড়া স্যার, আপনাদের এদিকটায় ছাগলের সংখ্যাই বোধহয় বেশি, তাই না!

আমার কথায় ব্যঙ্গের খোঁচাটা শেখ হারিদ বুঝতে পারলেন কিনা জানি না, তবে তার মেজাজটা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল।

হারিদ বললেন, আমার দেশ আর আপনাদের দেশের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। রীতি নীতি, আদব-কায়দা, আইন-কানুন, সবাই আলাদা। বিংশ শতাব্দী অনেক এগিয়ে গেছে। সভ্যতাও থেমে নেই। অথচ কারেইন-এ আমরা আমাদের পুরোনো রীতি আর ঐতিহ্যের অনেকটাই এখনও ধরে রেখেছি। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতির সুফলগুলো আমরা এখানেও বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করি।

শেখ কথা থামিয়ে আমাদের তিনজনের ওপর নজর বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, একমাত্র আল্লা ছাড়া আমাদের সবচেয়ে পবিত্র ঐতিহ্য হল আমন্ত্রিত অতিথির সেবা। আপনারা তো এখানে কয়েকদিন আছেন, আশা করি আমার অতিথিসেবার আন্তরিকতা ও নিদর্শন প্রমাণ করার সময় আমি পাব।

মোহন তাকে আশ্বস্ত করে বলল, আপনার আতিথেয়তা আর উদারতার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি, স্যার।

মোহনের কথায় হারিদ যেন সত্যিই খুশি হলেন। বললেন, শুনে আনন্দিত হলাম, মিস্টার খান্না, বড়ই আনন্দিত হলাম। আচ্ছা, এবারে আমাকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি দিন। আগামীকাল সকালে, আমাদের ব্যাবসায়িক আলোচনা শুরুর আগে, আমার এই নগণ্য প্রাসাদের

কথাটা বলেই শেখ হারিদ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে রোমিলার দিকে তাকালেন।

আমি দুঃখিত, মিস রোমিলা, আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারব না। কারণ আমাদের রীতি অনুসারে প্রাসাদের বেশিরভাগ অংশই স্ত্রীলোকের কাছে নিষিদ্ধ।–শেখ হারিদ হাসলেন : বুঝতেই পারছেন, নারী প্রগতি আপনাদের দেশে যতটুকু এগিয়েছে আমাদের এখানে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও এগোয়নি। কোনওদিন আদৌ এগোবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে পরশুদিন আপনার সম্মানার্থে আমি নৈশভোজের আয়োজন করেছি। আপনি সে-অনুষ্ঠানে দয়া করে যোগ দিলে আমি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করব। আপনি আমার দেশে নিছকই বেড়াতে এসেছেন। সে কথা চিন্তা করে আমি একটা গাড়ি আপনার ব্যবহারের জন্যে দিচ্ছি। যদি চান ড্রাইভারও থাকবে গাড়িতে। গাড়ি নিয়ে আমার এই ছোট রাজ্যে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। সোজা কথায়, এটাকে আপনি নিজের দেশ মনে করলেই আমি আন্তরিক খুশি হব। এবারে আমাকে অনুগ্রহ করে বিদায় দিন।

রাজসভা ভঙ্গ হল।

.

রোমিলা কাপুর

ঘড়িতে এখনও নটা বাজেনি, অথচ সূর্যের তাপ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। জোরালো আলোয় চিকচিক করছে পার্শিয়ান গালফ-এর পুঁতে রং জলের ঢেউ। জলের পাশ ঘেঁষে পিচের রাস্তা চলে গেছে আবাদানের দিকে। রাস্তা সামান্য উঁচু-নীচু। যেন এখানেও পার্শিয়ান গালফ-এর ঢেউয়ের ছোঁয়া লেগেছে।

কাহরেইন ও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে একটা টুকটুকে লাল রঙের আলফা স্পোর্টস কার আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন শেখ হারিদ। আর তার বিশ্বস্ত অনুচর হাসান আমাকে উপহার দিয়েছেন কাহরেইন ও ইরানের রোড ম্যাপ। সেটা দেওয়ার সময় হেসে বলেছেন, যদি পথ ভুলে কোথাও হারিয়ে যান তাই এটা সঙ্গে দিলাম। বিপদে কাজে লাগতে পারে।

শেখ হারিদের অতিথিসেবায় হয়তো কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু তবুও আমি যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। কোথায় যেন একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধে রয়েছে।

শেখ ড্রাইভার সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ আমি গাড়ি চালাতে জানি। তবে বিদেশি গাড়ি কখনও চালাইনি। তাই শেখকে অনুরোধ করলাম, ড্রাইভারকে উনি যেন নির্দেশ দেন আলফা চালানোর নিয়মকানুনগুলো আমাকে একটু শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

শেখ হাসলেন আমার কথায়। কিছুটা চতুর সে-হাসি। মুখে বললেন, যথা আজ্ঞা। সুন্দরীদের অনুরোধ রাখতে পারলে আমি খুশি হই!

তারপর দূরে দাঁড়ানো একজন রক্ষীকে ইশারা করলেন।

দাদা ও মোহনদা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মুখে কেমন এক সতর্ক অভিব্যক্তি। কিছুতেই যেন সহজ হতে পারছে না। ওরা শেখের সঙ্গে চলে গেল মিটিং-এ বসবে বলে। যাওয়ার আগে শেখ বলে গেলেন, আপনার ভ্রমণ সুখের হোক, মিস কাপুর।

একটু পরেই সুপুরুষ চেহারার একজন যুবক এসে আমাকে আলফা চালানোর টুকটাক তালিম দিল। তারপর হেসে বিদায় নিল। এবং আমিও রওনা হলাম।

রওনা হওয়ার আগে একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম, গাড়িটার কোনও নাম্বার প্লেট নেই। তার বদলে সামনে ও পেছনে আঁকা রয়েছে দুটি রাজকীয় প্রতীকচিহ্ন।

দিলখুশ মেজাজে উদ্দাম বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি। চুল উড়ে এসে পড়ছে নাকে, মুখে, চোখে। ড্রাইভারজাতীয় একটা অজানা-অচেনা লোক থাকলে হয়তো মন খোলসা করে ঘোরাঘুরি করতে পারতাম না।

এখানে এসে থেকেই মনে হচ্ছে আমার মনের সমস্ত ধোঁয়া আর কুয়াশা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। মা-বাবাকে হারিয়ে যে-দুঃসহ দুঃখটা বুকের মধ্যে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছিল, সেটা যেন কোনও জাদুকর হালকা করে দিয়েছে। দেশে ফিরে বন্ধুদের যে কতরকম গল্প কতদিন ধরে শোনাব তা ভাবতেও বেশ রোমাঞ্চ জাগছে।

রাস্তা থেকে উপকূলের কিনারা এখন আর চোখে পড়ছে না। দু-ধারেই ছোট-বড় গা ঘেঁষাঘেঁষি ঘরবাড়ি। আর থেকে-থেকেই চুড়াওয়ালা মসজিদ দেখতে পাচ্ছি। দাদার কাছে শুনেছি, এখানকার শতকরা নিরানব্বইজন মানুষই মুসলিম।

হঠাৎ সামনে একটা জটলা চোখে পড়ায় আমাকে ব্রেক কষতে হল। শব্দ করে নিশ্চল হল আলফার চাকা। একদল মানুষ নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় মত্ত। অন্তত তাদের হাত-পা নাড়া দেখে সেইরকমই মনে হচ্ছে।

আরও একটু লক্ষ করে যা বুঝলাম, একজন লোক কাঁধে করে কার্পেট ফিরি করছিল, তার সঙ্গেই দরাদরি অথবা অন্য কোনও কারণে কোনও খদ্দেরের ঝগড়া বেঁধেছে।

প্রথমে লোকগুলো আমার গাড়িটাকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে ঝগড়াতেই ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎই একটি অল্পবয়েসি মেয়ে আঙুল তুলে আমার গাড়ির দিকে দেখাল। না, ঠিক গাড়ির দিকে নয়। বরং বলা যায় গাড়ির বনেটের ওপরে আঁকা রাজকীয় চিহ্নটার দিকে দেখাল।

চিহ্নটার দিকে অন্য সকলের চোখ পড়ামাত্রই মন্ত্রের মতো কাজ হল। নগ্ন আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি মেয়ে-পুরুষের মুখে। তারা ঝগড়া থামিয়ে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো পথ ছেড়ে ছিটকে গেল দু-পাশে।

আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম, শেখ হারিদকে তার প্রজারা অস্বাভাবিক ভয় করে। তা হলে কি প্লেনে আসতে-আসতে শেখ হারিদ ও কাহরেইন সম্পর্কে দাদা যে কথাগুলো বলছিল সেগুলো সব অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি?

হঠাৎই একটা নাম-না-জানা ভয় আমাকে পেয়ে বসল, আর তখনই টের পেলাম একটা গাড়ি আমাকে অনুসরণ করছে।

গাড়িটার রং আকাশি। চেহারা অনেকটা বেঁটেখাটো ভ্যানের মতো। উইন্ডশিল্ডের কাচটা সাধারণ স্বচ্ছ কাচ নয়—সানগ্লাসের মতো কালচে। কাচের পেছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জ্বলন্ত সূর্যের প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়েছে উইন্ডশিল্ড থেকে।

গাড়িটা আমি রিয়ারভিউ মিরারে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাইনি পেছনে। এই রাস্তাটার গাড়ির সংখ্যা এমনিতে খুব বেশি নয়। সেইজন্যেই আকাশি ভ্যানটাকে আমি এত অল্প সময়ে সন্দেহ করতে পেরেছি। শেখ হারিদ তা হলে আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত

হতে পারেননি। ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিরক্তি ছাপ ফেলল আমার মনে। অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে আলফার গতি বাড়িয়ে দিলাম আচমকা।

রাস্তার অলিগলি পেরিয়ে একটা জমজমাট জায়গায় এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থামালাম রাস্তার ধার ঘেঁষে। তারপর গাড়ি থেকে নামলাম।

জায়গাটা মনে হয় মার্কেটজাতীয় কিছু হবে। বিভিন্ন দোকানপাট-ফিরিওয়ালায় গিজগিজ করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড় দেখলে তাক লেগে যায়।

হঠাৎ আকাশি ভ্যানটার কথা খেয়াল হতেই পেছনে তাকালাম। আশ্চর্য! গাড়িটা সামান্য

দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভীষণ রাগ হল এবার। মন খুলে বেড়াতেও পারব না এদেশে! কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দ্রুত পা পেলে ভ্যানটার কাছে গেলাম।

জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দুজন মানুষের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। ঠান্ডা নিরুত্তাপ ওদের দৃষ্টি। আমাকে দেখে এতটুকু বিচলিত হল না ওরা।

কী মতলবে ফলো করছেন আমাকে?

এক সেকেন্ড দুজনে-দুজনের দিকে তাকাল। তারপর স্টিয়ারিংয়ে বসা লোকটি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল তার অর্থ হল, ওরা শেখ হারিদের লোক। ওরা আমাকে অনুসরণ করছে না, বরং আমার যাতে কোথাও কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখছে। সোজা কথায় দেহরক্ষী। এর কারণ আমি শেখ হারিদের অতিথি, অর্থাৎ ভি. আই. পি।

বুঝলাম, ভুমিকা ওদের যাই হোক উদ্দেশ্য ওদের একটাই–আমাকে নজরে-নজরে রাখা। ঠিক করলাম, যে করে হোক লেজ থেকে এদের ছাড়াবই। সুতরাং ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে

চলে এলাম।

বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চারপাশে দেখছিলাম।

পাথরের টুকরো দিয়ে গড়া বড়-বড় বাড়ি। কোনও-কোনও বাড়ির সামনে গাড়িবারান্দা। তার নীচেও বাজার বসে গেছে। বিক্রি হচ্ছে শুকনো ফল, সিগারেট, কার্পেট, খোদাই করা কাঠের কাজ, পেতলের কারুকাজ, নকশাছাপা কাপড়, আখরোট, আঙুর, বাদাম, আরও কত কী।

মুগ্ধ চোখে কতক্ষণ সব দেখছিলাম জানি না, হঠাৎই একটা মাঝবয়েসি লোক অসভ্যের মতো আমাকে ধাক্কা দিয়ে গা ছুঁয়ে গেল। আমি রেগে উঠে লোকটাকে ডেকে দুটো কড়া কথা বলতেই বিপদ হল। একগাদা লোক আমাকে ঘিরে ধরল। ওদের ভাষা আমি একটুও বুঝতে পারছি না। আর ওরা যে আমার কথা বুঝতে পারছে তাও মনে হল না।

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছি, এমন সময় সুপুরুষ চেহারার একজন যুবক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। না, সে আমার দেহরক্ষী নয়। আমার দেহরক্ষীরা এখন হয়তো গাড়িতে বসে হাই তুলছে আর মাছি মারছে।

যুবকটি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভিড় সরাতে লাগল। আর দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড, মিস! তারপর দেশজ ভাষায় ভিড় করা লোকজনকে কীসব বলে নিরুৎসাহ করতে লাগল। মিনিটকয়েক ধরে চলল তার অনর্গল কথা, দ্রুত হাত-পা নাড়া, তারপর একসময় লক্ষ করলাম জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক। আর ঘটনাস্থলে আমি ও অচেনা যুবক দুজনে একা।

আপনি আমাদের দেশে নতুন মনে হচ্ছে?—যুবক বিশুদ্ধ ইংরেজিতে প্রশ্ন করল। তারপর সামান্য ইতস্তত করে বলল, আমার নাম ইলিয়াস মহম্মদ ইলিয়াস।

আমি ওর প্রশ্নের জবাবে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম যে, আমি এদেশে নতুন। এবং ও নাম বলার পর ভদ্রতাবশত নিজের নামটা বললাম। সেইসঙ্গে ধন্যবাদও জানালাম ওকে।

ইলিয়াস বলল, ধন্যবাদের দরকার নেই। আসলে বিদেশি কেউ এলেই প্রথম-প্রথম এ জাতীয় অসুবিধেয় পড়তে হয়।

ইলিয়াসের গায়ের রং উজ্জ্বল সাদা। মাথায় কুচকুচে কালো ঢেউখেলানো চুল। প্রাণবন্ত কালো চোখের তারা। সুচারুভাবে তৈরি চওড়া পেন্সিল গোঁফ। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো, তবে ফরসা গাল ও চোয়ালে নীলচে আভা। এছাড়া নাক-মুখ চোখের রেখা ধারাল।

সুদর্শন এই মানুষটার গায়ে লাল-নীল আড়াআড়ি ডোরা কাটা ব্যানলনের টি-শার্ট আর তার সঙ্গে মানানসই কর্ডের কালো প্যান্ট।

প্রখর রোদ আমাদের ঝলসে দিচ্ছিল। সামান্য ইতস্তত করে আমি বললাম, একটা ছায়া দেখে আশ্রয় নিলে হয় না?

ইলিয়াস দমফাটা হাসি হেসে উঠল হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে।

ওর সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে চোখের কোণে জল মুছে বলল, দেখেছেন, আমি কী বোকা! আপনি আমার দেশে অতিথি। কোথায় আপনাকে আপ্যায়ন করব তা না, রোদের মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন, ওই রেস্তোরাঁটায় ঢোকা যাক– অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

ইলিয়াস আঙুল তুলে কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁর দিকে দেখাল। আমি ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে ওর অনুরোধে রাজি হলাম। এবং দুজনে এগিয়ে চললাম সেদিকে।

আমার মনের মধ্যে খুশির জলতরঙ্গ বাজছিল। মনে হচ্ছিল, ভারতের রোমিলার সঙ্গে এ-রোমিলার কোনও সম্পর্ক নেই। রেশমি খোলস কেটে গুটিপোকা যেন বেরিয়ে এসেছে।

দাদা আর মোহনদা যেন দুই দেবদূত। পলকে মিলিয়ে দিয়েছে আমার মুক্তির ছাড়পত্র। তবু এত আনন্দের মধ্যেও শেখ হারিদের মিছরি মাখা আচরণ কেন জানি না সন্দেহের খোঁচা দিয়ে চলেছে ক্রমাগত।

রেস্তোরাঁর নাম কারনামা। সাজগোজে তার কোনও ত্রুটি নেই। বিশাল কাচের দরজায় আলপনা আঁকা। ভেতরটা আধুনিকভাবে, অনেকটা পাশ্চাত্য রীতিতে, সাজানো।

রেস্তোরাঁর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাতাস যেন চোখেমুখে ঠান্ডা চুম্বন এঁকে দিল। বাইরের গরম ও চোখে ধাঁধানো রোদ্দুরের পর ভেতরে ছায়াময় শীতল পরিবেশ এককথায় মরুভূমির মরূদ্যান।

কারুকাজ করা স্বচ্ছ পরদা ঝোলানো একটা বড় কাচের জানলার পাশে একটা টেবিল বেছে নিল ইলিয়াস। আমরা দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

ইলিয়াস বলল, শুধু আমার নামটাই আপনাকে বলেছি, মিস কাপুর। একজন অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শুধু নামটুকু বোধহয় যথেষ্ট নয়। আসলে আমি একজন। রিপোর্টার । এখানে একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ আছে, তার জন্যে খবর জোগাড় করি। এই যে আমি হাটের মাঝে ঘুরছিলাম, তাও খবরের খোঁজে। এখন এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, সেটাও হয়তো আগামী সংখ্যায় ছাপা হয়ে যাবে বিশাল হেডিং দিয়ে ও ভারতীয় তরুণীর চোখে কাহরেইন। সুতরাং রেস্তোরাঁর আপ্যায়নের বিল যদি আমি মেটাই তাহলে আর ওজর আপত্তি তুলবেন না। ধরে নিন, আপনার ইন্টরভিউ নেওয়ার জন্যে আমি এত কসরত করছি।

আমি হেসে বললাম, আপনার কথায় আপত্তি করব সে মনের জোর আমার নেই। কারণ, যে-বিপদ থেকে একবার বাঁচিয়েছেন।

ইলিয়াস হাতের ভঙ্গি করে বলতে চাইল, ও কিছু নয়।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। মেনু কার্ড দেখে অর্ডার দিল ইলিয়াস। তারপর বলল, মিস কাপুর, এখান থেকে আর মাইলপাঁচেক পার হলেই আপনি কারেইন-এর সীমা ছাড়িয়ে ইরানে পা দেবেন। কাহ্রেইন আসলে ইরানেরই অংশ, তবে এর শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র।

দাদার কথাগুলো মনে পড়ল আমার। ইলিয়াস যখন রিপোর্টার তখন ও নিশ্চয়ই শেখ আবদুল অল হারিদ সম্পর্কে অনেক খবরই রাখে। তাই বললাম, আপনাদের কারেইন-এর রাজা শুনেছি সাঙ্ঘাতিক লোক!

স্পষ্ট লক্ষ করলাম, ইলিয়াস চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। তারপর থেমে-থেমে বলল, আপনি কোত্থেকে এ-খবর শুনলেন?

তখনই আমার খেয়াল হল, ইলিয়াসকে শুধু নামটা ছাড়া আর কোনও কথাই বলিনি আমি। অবশ্য ইলিয়াসও জানতে চায়নি। এখন প্রসঙ্গ ওঠায় ওকে বললাম, আমি বর্তমানে আপনাদের শেখসাহেবের গেস্ট, তারপর সংক্ষেপে সব খুলে জানালাম।

ওর নিষ্পাপ সুন্দর মুখ দেখে কেন যেন আমার মনে হল ওকে অকপটে সব খুলে বলা যায়। অনুসরণকারী আকাশি ভ্যানটার কথাও ওকে বললাম।

আমার কথা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেল ইলিয়াস। ফিনফিনে পরদাটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। খুব গভীরভাবে কী যেন ভাবছে ও। ঠিকরে আসা আলোর ছটায় ওর চোখ চিকচিক করতে লাগল।

এমন সময় বেয়ারা এসে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল।

ইলিয়াস ঘোর কাটিয়ে সচেতন হল। তারপর অমলিন হাসি হাসল। বলল, ওসব কথা এখন থাক। লেট আস এনজয় দ্য মিল!

আমি সামান্য বিব্রত হয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও কথা বললাম না দুজনে। তারপর ইলিয়াস বলল, আপনাকে শেষে একটা দারুণ জিনিস খাওয়াই।

কী জিনিস?

খেয়েই দেখুন না–

ও বেয়ারাকে ডেকে স্বদেশি ভাষায় কী যেন বলল। বেয়ারা চলে গেল। তারপর আমাকে লক্ষ করে প্রশ্ন করল, আপনারা শেখের ওখানে কতদিন আছেন?

জানি না, দাদার মিটিং যতদিন চলবে। তবে মনে হয়, সাত-দশ দিনের বেশি লাগবে না।

হতাশভাবে মাথা নাড়ল ইলিয়াস। বলল, সাত-দশ দিনে কি ইরান দেখা শেষ হবে? অন্তত দিনকুড়ি তো লাগবেই।

কেন, আপনি আমাকে ইরান ঘুরিয়ে দেখাবেন নাকি?

দেখাল ক্ষতি কী, মিস কাপুর! ইলিয়াস মুগ্ধ করা হাসি হাসল : ইরান আমার দেশ। আমার জন্ম তাবরিজ-এ। তেহরান-এর তুলনায় তাবরিজ অনেক ছোট শহর, কিন্তু আমার বড় প্রিয়। জানেন, তাবরিজ-এর খুব কাছেই রয়েছে উরমিয়া লেক! ইরানের সবচেয়ে বড় হ্রদ। আর তার ঠিক উলটোদিকে দুশো মাইলটাক পুবে রয়েছে বিখ্যাত কাস্পিয়ান সাগর। দেখলে আপনার তাক লেগে যেত।

বেয়ারা সুদৃশ্য কারুকাজ করা দুটো লম্বা ধাতব গ্লাস টেবিলে রেখে গেল। গ্লাসে উষ্ণ তরল রয়েছে।

আমি অবাক চোখে ইলিয়াসের দিকে তাকাতেই ও একটা গ্লাসে আমেজ-ভরা চুমুক দিল। তারপর দ্বিতীয় গ্লাসটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, নিন, চুমুক দিন। এর নাম সবুজ চা, গ্রিন টি। মধ্যপ্রাচ্যে এই জিনিসটার দারুণ চল রয়েছে। আপনাদের ভারতে এটা তেমন জনপ্রিয় নয় বলেই শুনেছি।

আমি গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে জানালাম যে, ও ঠিকই শুনেছে।

সবুজ চা শেষ করার পর ইলিয়াস বলল, নিন, এবারে বলুন, কাহরেইন কেমন লাগছে? আমি কিন্তু ইন্টারভিউটা সত্যিই নিচ্ছি...সিরিয়াসলি।

আমি থেমে-থেমে নিজের টুকরো মতামত জানালাম কাহরেইন সম্পর্কে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা ডায়েরি আর পেন বের করে কীসব টুকে নিতে লাগল ইলিয়াস। আর মাঝে মাঝে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

আমি বললাম, কী ব্যাপার, হাসছেন কেন?

ও হাসতে হাসতে বলল, আমি ভাবছি আমার খুশ নসীবের কথা। কত সহজে হাজার হাজার মাইল দূরের এক বিদেশিনীর ইন্টারভিউ পেয়ে যাচ্ছি। অন্যান্য রিপোর্টার বহু কাঠখড় পুড়িয়েও কোনও ভারতীয়ের ইন্টারভিউ জোগাড় করতে পারে না।

ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর ইলিয়াস বলল, চলুন এবারে ওঠা যাক।

ও ইশারায় বেয়ারাকে ডাকল। বলল বিল নিয়ে আসতে।

বিল এলে পর টাকা মিটিয়ে দিয়ে ইলিয়াস আমাকে জিগ্যেস করল, বলুন তো, এখানে কারেন্সির নাম কী?

তক্ষুনি আমার মনে পড়ল, ঘুরে বেড়ানো বা কেনাকাটার জন্যে কোনও টাকাপয়সা নিয়ে বেরোতে আমি ভুলে গেছি। তেহরান এয়ারপোর্টেই আমরা ভারত থেকে আনা মার্কিন

ডলার ভাঙিয়ে ইরানি টাকা নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন টাকা তো আনিনি, উপরন্তু তার নামটিও মনে করতে পারছি না। সে-কথা ইলিয়াসকে বলতেই ও হেসে বলল রিয়াল।– একটু থেমে আরও যোগ করল? তবে এখানে বহু দোকানেই মার্কিন ডলার নেয়। ও বিষয়ে আইনের কড়াকড়ি তেমন নেই।

কারনামা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইলিয়াস আমার পাশে-পাশে হাঁটছে। ধুলো উড়ছে রাস্তায়। কাছে-দূরের মসজিদ থেকে আজান শোনা গেল।

ইলিয়াস বলল, আপনার ফেরার তাড়া আছে? না থাকলে আশপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।

আমি হেসে বললাম, সেরকম কোনও তাড়া নেই। তা ছাড়া আমি তো দেশ দেখতেই বেরিয়েছি। আর আপনার মতো গাইড পেলে তো বর্তে যাব।

ইলিয়াস গলা নামিয়ে বলল, সো কাইন্ড অফ ইউ।

তারপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম দুজনে।

স্থানীয় লোকজন, তাদের জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বহু ইতিহাসই শোনাল ইলিয়াস। সেইসঙ্গে শোনাল ওর নিজের কথা। তেহ্‌রান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর ও ফিরে যায় তাবরিজ-এ। সেখানে ওর মা-বাবা দুজনেই অল্পদিনের ব্যবধানে মারা যায়। মা অসুখে, আর বাবা সন্ত্রাসবাদী ঘটনায়। তখন ইলিয়াস দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ভারী মন নিয়ে। ওর সঙ্গে ছোট দু-বোন। বড় বোন আলেয়া আর ছোট নাজমা। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওরা এসে পড়ে কাহ্‌রেইন-এ। ইলিয়াস চাকরি নেয় খবরের কাগজে। তখন থেকে ওরা তিনজনে এখানকারই বাসিন্দা।

বেলা ক্রমশ পড়ে আসতে লাগল। ইলিয়াস একটা দোকান থেকে আঙুরের শরবত খাওয়াল আমাকে। তারপর কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে চললাম আমার আলফা স্পোর্টস-এর দিকে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি আকাশি ভ্যানটা ঠিক একইভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইলিয়াস অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ভ্যানটার দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, সাবধানে থাকবেন, মিস কাপুর। শেখ হারিদ লোকটা স্যাডিস্ট। এ-দেশ ছেড়ে আমি কবে চলে যেতাম…কিন্তু এখন জড়িয়ে পড়েছি…আর ফেরার উপায় নেই।

একটা বাচ্চা ছেলে ঘুরে-ঘুরে গোলাপের তোড়া ফেরি করছিল। ইলিয়াস তাকে কাছে ডাকল। একটা ছোট গোলাপের তোড়া কিনে আলতো করে তুলে দিল আমার হাতে। বলল, টেক কেয়ার। যদি সম্ভব হয় তাহলে আল্লার কাছে প্রার্থনা করি এই গোলাপের গুচ্ছ সমস্ত বিপদ থেকে আপনাকে রক্ষা করুক।

আমি গাড়িতে উঠে বসতে যাচ্ছি, ইলিয়াস বলল, আবার আমাদের দেখা হবে এই আশা পোষণ করার মতো স্পর্ধা কি আমি দেখাতে পারি, মিস কাপুর?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ পারেন। কাল সকাল নটায় আবার আমাদের এখানেই দেখা হবে।

শুক্রিয়া। ইলিয়াস হেসে হাত নাড়ল ও ইন্টারভিটা ভালো করে লিখে কাল আপনাকে শোনাব।

বাই অল মিনস। বলে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। গোলাপের তোড়াটা নাকের কাছে নিয়ে বারকয়েক ঘ্রাণ নিলাম। তারপর গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। ইলিয়াসের সুন্দর মুখটা উইন্ডশিল্ড এর ওপরে ভাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ করলাম, আকাশি ভ্যানটা। যথারীতি আবার আমার পিছু নিয়েছে।

ঠিক করলাম, প্রাসাদে ফিরে দাদা বা মোহনদাকে অনুসরণকারী ভ্যানটার কথা বলব না। বললে হয়তো মিছিমিছিই আশঙ্কায় ভুগবে।

আর ইলিয়াসের কথা? ওর কথা খুব বেশি বলে ফেললে দাদা নিশ্চয়ই আমাকে আজেবাজে ঠাট্টা করে খ্যাপাবে। তার চেয়ে কিছু না বলাই ভালো।

বাতাস চিরে লাল আলফা স্পোর্টস ছুটে চলেছে, আর আমার বুকের ভেতরে কাল সকাল নটার ঘণ্টা বাজছে : ঢং.ঢং…ঢং!

.

হিতেশ কাপুর

সকালে রোমিলা গাড়ি নিয়ে কারেইন দেখতে বেরোল। আর আমি ও মোহন খান্না গেলাম শেখ হারিদের দরবারে।

আমাদের অবাক করে দিয়ে শেখ হারিদ বললেন, আমি নিজেই আপনাদের প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখাব। আপনারা আমার গুরুত্বপূর্ণ অতিথি।

আমরা শেখকে অনুসরণ করলাম। আমাদের ঠিক পেছনেই বিশ্বস্ত সচিব হাসান। এবং কিছুটা দূরত্ব রেখে আমাদের সঙ্গী হয়েছে চারজন সশস্ত্র রক্ষী।

শিল্পকলা ও পুরাসামগ্রীর অমূল্য সংগ্রহ ছড়িয়ে রয়েছে সারা প্রাসাদ জুড়ে। শেখ এক নিপুণ গাইডের মতো প্রতিটি জিনিসের খুঁটিনাটি ইতিহাস শোনাতে লাগলেন আমাদের।

এইভাবে প্রায় একঘণ্টা প্রাসাদ পরিক্রমার পর একটা লুকোনো লিফটে চড়ে আমরা উঠে গেলাম প্রাসাদের গম্বুজে। গম্বুজের ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা নীচে, বহু নীচে, প্রাণচঞ্চল শহরগুলো দেখতে লাগলাম। এটাই কাহরেইন-এর সবচেয়ে উঁচু জায়গা।

আমাদের মুখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমছিল। ভোরের ঠান্ডা বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিল। মনে হল, আরব্য রজনীর রূপকথার কোনও গল্পে ঢুকে পড়েছি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে শেখ হারিদ বললেন, এবারে আপনাদের এমন একটা জিনিস দেখাব যা বাইরের জগৎ কখনও চোখে দেখেনি। আশা করি আপনারা প্রাণভরে সে-দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন।

লিফট আবার ফিরে এল নীচে। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সাদা মার্বেল পাথরে বাঁধানো অলিন্দ ধরে।

চলতে-চলতে একসময় পৌঁছে গেলাম প্রাসাদের পেছনের এক বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে। প্রাসাদের কাছাকাছি মাঠের একটি অংশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলগুলো পাথরের টুকরো গেঁথে তৈরি। তার গায়ে সবুজ লতানে গাছের ঝাড়। ঘেরা অংশে প্রবেশ করার পথ একটাই ও প্রকাণ্ড ভারী এক লোহার দরজা। দরজায় সশস্ত্র প্রহরা। প্রাসাদে ঢোকার মুখেও এত কড়া পাহারা দেখিনি।

আমরা ভেতরে ঢুকতেই লোহার গেট আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। শেখ হারিদ অনুচ্চ অহঙ্কারী কণ্ঠে বললেন, এই বাগানে আমার পোষা পাখিরা থাকে।

তার ঠোঁটে সামান্য ধূর্ত হাসি খেলে গেল।

আমি আর মোহন পরস্পরের চোখে তাকালাম। পোষা পাখি? কিন্তু কই, কোনও খাঁচা তো নজরে পড়ছে না। মাথার ওপরে ভোলা নীল আকাশ। পাখিদের বন্দি করার ব্যবস্থা কই?

অবাক হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের নজর আটকে গেল। মুগ্ধ অপলক চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম। এবং আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।

নানান রঙের রূপসী ফুল ফুটে আছে বাগানে। তাদের বর্ণ গন্ধের তুলনা হয় না। সামনেই এক অগভীর দিঘি। আকাশ-নীল রঙের মার্বেলে বাঁধানো। নির্মল স্বচ্ছ তার জল। দিঘির মাঝে এক স্বপ্নিল ফোয়ারা। তার জলধারা শূন্যে বাঁক নিয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে টলটলে জলে। কুলকুল শব্দ হচ্ছে জলতরঙ্গের মতো। দিঘির পাড়ে সূর্যের খরতাপ আড়াল করে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ দেবদারু ও চিনার গাছের সারি। ছায়া-ছায়া সবুজ পরিবেশ যেন মায়াময় এক মরূদ্যান।

সব মিলিয়ে অপরূপ এই উদ্যান।

না, উদ্যানের অপরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমাদের অবাক করে দেয়নি, পা জোড়া গেঁথে দেয়নি নরম ঘাসের জমিতে। আমাদের হতবাক করেছে বাগানের পাখিরা।

স্বর্গের এই নন্দনকাননে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে সুন্দরী তরুণীর ঝক। সংখ্যায় তারা কুড়ি, কি তারও বেশি হবে। কেউ পায়চারি করছে, কেউ দিঘিতে সাঁতার কাটছে, কেউ শুয়ে আছে ঘন দেবদারুর ছায়ায়, আর কেউ বা ঘাসের ওপর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে।

প্রতিটি মেয়েই অপরূপ রূপসী ও তীব্র যুবতী। সবচেয়ে অবাক করে দেওয়া বিষয় হল, তরুণীরা সকলেই সম্পূর্ণ নগ্ন! শেখ হারিদের নগ্ন পোষা পাখির আঁক!

আপনাদের মুখ দেখে বুঝতে পারছি আপনারা খুশিই হয়েছেন। আসুন, একটু ঘুরে দেখা যাক।—শেখ মেজাজি স্বরে বললেন।

আমরা বাগানে পায়চারি করতে থাকলাম।

তখনই একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম। চলার পথে যে-মেয়েটি আমাদের সামনাসামনি পড়ছে সে সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তারপর আমরা তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ামাত্রই সে আবার নিজের সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় ফিরে যাচ্ছে। যে কাজে মেতে ছিল সেই কাজেই আবার মেতে উঠছে।

এ এক অদ্ভুত সম্মান। আবার একই সঙ্গে আমার শরীরে দপদপ করে উঠছে কামনার শিরা। প্রতিটি নগ্ন নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব যেন নতুন-নতুন বাসনার দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে দেহের অন্ধকার কুঠরিতে।

চলতে-চলতে আমরা বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম।

মুখে সবজান্তা হাসি ফুটিয়ে শেখ হারিদ বললেন, ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি, আমার যে-কোনও অতিথি এই বাগানে আসামাত্রই নির্বাক হয়ে যায়। কথা হারিয়ে ফেলে কোন অজানা জাদুমন্ত্রে।

মোহন খান্নাই প্রথম ভাষা খুঁজে পেল। বলল, স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই স্যার, এই দুর্লভ সুন্দরীদের দেখার অনুমতি ও সুযোগ দিয়ে আপনি একইসঙ্গে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন এবং অবাক করেছেন।

শেখ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন : দয়া করে ভুল বুঝবেন না, মিস্টার খান্না, এটা আমার হারেম নয়। সেটা আছে প্রাসাদেরই অন্য আর এক অংশে। সেখানে আমি ও আমার বিশেষ কয়েকজন রক্ষী ছাড়া আর কারও ঢোকার অধিকার নেই। তা ছাড়া আমার বেগমরা নগ্ন দেহে কখনও আত্মপ্রকাশ করেন না, সেরকম অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি।—শেখ হারিদ একটু থেমে নগ্ন তরুণীদের দিকে ইশারা করে বললেন, না, মিস্টার খান্না, বেগম নয়, এই মেয়েরা আমার কয়েদি।

আপনার কয়েদি?—আমি ও মোহন বিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করে উঠলাম শেখের কথার।

হ্যাঁ, কয়েদি। কোনও-না-কোনও অন্যায় আচরণের জন্যে ওরা এখানে বন্দি। সে অন্যায় আমার বিরুদ্ধে, আমার রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যিই কি ওরা অপরাধী?—দু-পাশে হাত ছড়ালেন হারিদ : আমার বিচার কি সঠিক বিচার হবে? কী করে ন্যায়বিচার করব আমি? আমি ওদের, রাজা, কিন্তু রাজা হলেও আমি এক ক্ষুদ্র মানুষ। তাই ওদের বিচারের ভার

আমি তুলে দিয়েছি মহান আল্লার হাতে। আল্লাই ওদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। আল্লা ওদের বিচার করে চলেছেন, আর সেই বিচারের রায় অনুযায়ী দণ্ড পাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে চেষ্টা করি। ওরা এই ঘেরা বাগানে বন্দি, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনওরকম অসুবিধে ওদের নেই। ওরা সম্মানিত অতিথির আপ্যায়ন পায়।

আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শেখ হারিদ। তারপর এক দুজ্ঞেয় হাসি হেসে বললেন, যাওয়ার আগে আর একটা কাজ বাকি আছে। আমার আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ আজ রাতে দুজন তরুণী আপনাদের শয্যা মধুময় করে তুলবে। ওদের মধ্যে থেকে আপনারা একজন করে বেছে নিন।

আমি একটু অস্বস্তি পেলাম। কী বলছেন শেখ হারিদ?

মোহনকে দেখে বেশ উল্লসিত মনে হল, কিন্তু আমি খুশি হতে পারলাম না। রোমিলার কথা মনে পড়ল। জানতে পারলে ও কী ভাববে?

সেই অস্বস্তির কথাই শেখকে বলতে গেলাম আমি।

কিন্তু আমার ছোট বোন সঙ্গে রয়েছে। ও যদি জানতে পারে...

শেখ হারিদ ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আশা করি আমার আতিথেয়তাকে অসম্মান করার চেষ্টা আপনি করবেন না, মিস্টার কাপুর!

পরক্ষণেই হারিদের স্বর পালটে গেল। মেজাজি গলায় বললেন, ভয় নেই, আপনার সুন্দরী বোন কিছুই জানতে পারবে না।

আমি বুঝলাম, শেখ হারিদের ইচ্ছে বা অনুরোধ তার আদেশের চেয়েও শতগুণ ধারাল।

মোহন জিগ্যেস করল, যাকে খুশি বাছতে পারি?—সে যেন নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

যাকে আপনার খুশি!–শেখ মোহনকে আশ্বাস দিলেন : আপনিই প্রথমে পছন্দ করুন, মিস্টার খান্না।

শরীরে পোশাক থাকুক আর না থাকুক, ওদের মধ্যে যে-কেউই পুরুষের নজর টানে। কিন্তু মোহন একটু দ্বিধায় পড়ল। কিছুক্ষণ ঘুরে-ঘুরে দেখে ও শ্যামলা রঙের একটি মেয়েকে পছন্দ করল। আমরা যখন বাগানে ঢুকি তখন মেয়েটি দিঘির স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটছিল। আমাদের এগিয়ে আসতে দেখেই সে চটপট উঠে এসেছিল জল থেকে। তারপর নিশ্চল ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জলের অলস ধারা তার সুঠাম শরীরের স্তন, নাভি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। মাথার কালো চুল, সুন্দর মুখমন্ডল ও ডৌল স্তনের ওপর বিন্দু বিন্দু জলের মুক্তো চিকচিক করছিল। মেয়েটির বয়েস খুব বেশি হলে সতেরো কি আঠেরো, কিন্তু দেহের গঠনে কোথাও কোনও ঘাটতি নেই।

সুতরাং সুন্দরীদের সমাবেশে ওই মেয়েটিকেই সেরা সুন্দরী বলে মনে হল মোহনের।

এখানে সবাই দারুণ সুন্দরী, কিন্তু দিঘির ধারের ওই শ্যামবর্ণ মেয়েটিকেই আমার সবচেয়ে পছন্দ, স্যার।–একটু ইতস্তত করে মোহন বলল।

সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে আসা হল আমাদের কাছে। দু-হাত দু-পাশে ঝুলিয়ে রেখে সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে–যেন মেহগনি কাঠে খোদাই করা মূর্তি।

তারপর শেখ হারিদের বিশ্বস্ত অনুচর হাসান ইশারা করতেই মেয়েটি আমাদের সামনে বারকয়েক পায়চারি করল, যাতে সবদিক থেকে আমরা তাকে খুঁটিয়ে দেখতে পারি।

পেছন থেকেও মেয়েটির যৌবনের আকর্ষণ কম নয়। তার ভারী নিতম্ব যেন চলার তালে তালে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমার মনে হল, মেয়েটি ইচ্ছে করেই আমাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

আপনার মেয়ে দেখার জহুরি চোখ আছে, মিস্টার খান্না।—শেখ খুশির সুরে বললেন, তাঁর হাত অন্তরঙ্গভাবে খেলে বেড়াতে লাগল মেয়েটির মসৃণ ত্বকের ওপর। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, দারুণ পছন্দ! আজ রাতের জন্যে ও পুরোপুরি আপনার। তবে একটা কথা আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে : ওর শরীরের কোন অংশ আপনার চোখে সবচেয়ে লোভনীয়, মিস্টার খান্না?

ওর শরীরে কোনও খুঁত নেই। সবই সুন্দর।—মোহন স্বীকরা করল অকপটে।

কিন্তু শেখ হারিদ নাছোড়বান্দা।

কিন্তু এমন একটা অংশ তো আছে যেটা আপনার সবচেয়ে পছন্দ?

মোহন বুঝল উত্তর না দিয়ে রেহাই নেই। ফলে ও বলল, ওর পায়ের গড়ন সত্যি একসেলেন্ট। এরকম নিখুঁত গড়ন কখনও আমার নজরে পড়েনি।

চমৎকার! হাততালি দিয়ে উঠলেন শেখ হারিদ। তারপর তিনি ধীরে ফিরে তাকালেন আমার দিকে মিস্টার কাপুর, এবারে আপনার পালা। আপনি আপনার শয্যাসঙ্গিনী বেছে নিন। লজ্জা করবেন না মোটেই।

আমি নিরুপায় হয়ে নগ্ন সুন্দরীদের খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

.

হিতেশ কাপুর

সারাদিন ঘুরে এসে রোমিলা খুশিতে টগবগ করে ফুটছিল। প্রচণ্ড উৎসাহে ও সারাদিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনাতে লাগল আমাদের।

সন্ধে গড়িয়ে রাত বাড়ছে। আমার মন ক্রমাগত উসখুস করে চলেছে। কারণ রাত আর একটু গাঢ় হলেই আমার ঘরে পৌঁছে যাবে আমার পছন্দ করা সুন্দরী। এই এক চিন্তা ও উৎকণ্ঠা আমাকে সারাক্ষণ অন্যমনস্ক করে রাখল।

তাকিয়ে দেখি মোহন খান্নার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। বারবার দরজায় দিকে তাকাচ্ছে।

আমরা রোমিলার ঘরে বসে ছিলাম। মোহন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বারান্দার দিকে নজর রাখতে চাইছে।

কথা বলতে-বলতে রোমিলা একটু পরেই বুঝতে পারল আমরা কেউই ওর কথায় কান দিচ্ছি না। তখন অভিমানে আহত গলায় ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, তোমরা আমার একটা কথাও শুনছ না। ভেবেছিলাম, সারাদিনে আমি কোথায়-কোথায় ঘুরলাম সে কথা বলে তোমাদের তাক লাগিয়ে দেব, কিন্তু কোথায় কী! ধুৎ ছাই, মোহনদারও দেখছি এক অবস্থা।

হতাশায় হাত ছুড়ল রোমিলা।

কিছু মনে করিস না, রোমু।আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর আড়চোখে দেখলাম মোহনের দিকে ও আসলে সারাটা দিন আমাদেরও কম খাটুনি যায়নি। ভাবছি ঘরে গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।

আমারও একই অবস্থা, রোমিলা। ঘুমে চোখ বুজে আসছে।–মোহন চটপট বলে উঠল।

কিন্তু রোমিলা সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে দেখল : কী হয়েছে বলো তো তোমাদের? এখনও তেমন রাত হয়নি! ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে রাতে বেড়াতে বেরোব, কাহরেইন এর রাতের জীবন দেখব।

প্লিজ রোমু, আজ নয়, কাল।আমি রীতিমতো অনুনয়ের সুরে বললাম, শরীরে আর কিছু নেই। নির্ঘাত গরমের জন্যে এমন কাহিল লাগছে।

একথা বলে রোমিলার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। স্পষ্ট টের পেলাম, রোমিলার নজর আমার পিঠে বিঁধছে।

শুনলাম, মোহন ওকে বলছে, আমিও চলি। গুড নাইট।

অবাক সুরে রোমিলা বলল, সত্যি, হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আপনারা শুধু নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে এসেছেন। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

আমি নীরবে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলাম।

ঘরে আসার মিনিটদশেক পরেই আমার পছন্দ করা মেয়েটি এল। আমি তখন অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের সকালে দেখা উদ্যান ও সেখানকার সমস্ত ঘটনা হয়তো নিছকই এক সুন্দর স্বপ্ন, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই ভাবনা থেমে গেল।

উপস্থিত শয্যাসঙ্গিনী এক সুন্দর স্বপ্ন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু একই সঙ্গে সে মনোরম বাস্তবও বটে। পরনে তার আকাশ-নীল ম্যাক্সি। গলা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত বিছানো। অসংখ্য ভাঁজ তার শরীরের রূপরেখা স্পষ্ট অথচ রহস্যময় করে তুলেছে। সকালের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে।

পিঠ পর্যন্ত কালো চুলের ঝরনা। পাতলা টুকটুকে ঠোঁট। টানা-টানা ভুরু, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে টানা কালো চোখ। গায়ের রং মার্বেল পাথরের মতো সাদা।

আমি কোনও কথা বলার আগেই গলায় বাঁধা পোশাকের ফঁসটা খুলে ফেলল সে। চাপা ফিসফিস শব্দ তুলে পোশাকটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ওর সুন্দর পায়ের পাতা ঘিরে যেন

তৈরি হল এক সুনীল জলাশয়। এখনও ও সম্পূর্ণ নগ্ন। সকালে যে-নগ্ন রূপ দেখে আমি ওকে পছন্দ করেছি এখন তা যেন বিকশিত হয়েছে শতদল মেলে।

সকালে ওর সুতনু বাহুর প্রশংসা করেছি আমি। চাপার কলির মতো নিটোল প্রতিটি আঙুল। দীর্ঘ বাহু। নখ থেকে শুরু করে কাঁধ পর্যন্ত যে মোহময়ী রেখা বরাবর বাহুর গতি, তা যেন কোনও দক্ষ শিল্পীর সাবলীল তুলির টান।

ওর শরীরের কোন অংশ আপনাকে বেশি টানে, মিস্টার কাপুর!–শেখ হারিদ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছি, ওরকম সুঠাম দীর্ঘ বাহু কেবলমাত্র অপ্সরী কিন্নরীদের ছবিতেই দেখা যায়, স্যার। এই দুটো হাত বুকে জড়িয়ে আমি সারাজীবন বসে থাকতে পারি।

শেখ মুচকি হেসেছিলেন আমার কথা শুনে। অবশ্য কেন, তা বুঝতে পারিনি–অন্তত তখন।

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে স্বপ্নচারিণী কথা বলল, তোমাকে আমি সুখী করতে চাই। সেরকমই আদেশ রয়েছে আমার ওপরে।

আমার অঙ্গের প্রতিটি শিরা দপদপ করে কাঁপতে লাগল। ওর অপরূপ হাত দুটো হাতে তুলে নিলাম। চোখের নজর যথেচ্ছ খেলে বেড়াতে লাগল ওর নিখাদ-নগ্ন শরীরে ফিসফিস করে বললাম, তোমার মতন সুন্দর কাউকে দেখিনি। শুধু তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখতে চাই।

ও আলতো করে নমনীয় হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল আমার হাত থেকে। তারপর আরও কাছে এসে ধরা দিল আমার বাহুবন্ধনে।

দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমার মুখ নামিয়ে এনে গভীর চুম্বন এঁকে দিল আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে।

আমার শরীরের অভ্যন্তরে, পাগল করা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সেই মুহূর্তে।

আমার মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি, কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা সঙ্কোচ ছিল। কারণ অন্যের আদেশে এই মেয়েটি এসেছে আমাকে ভালোবাসতে। নিজের ইচ্ছেয় আসেনি। কিন্তু প্রথম স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উবে গেল আমার মন থেকে। ওর মোহময়ী যৌবন অনিবার্য নিয়তির মতো গ্রাস করল আমার নীতি আদর্শ-সহানুভূতি, সবকিছু। তা ছাড়া, দেখে মনে হল, একটি সুন্দর স্বপ্নময় সুখ-শয্যা রচনার ইচ্ছে আমার চেয়ে ওর কিছু কম নয়।

আমাদের মিলন হল একটি স্মরণীয় ঘটনা। দুজনেরই কৌমার্যব্রতের ইতি ঘটল সে-রাতে। তীব্র কামনা, আনকোরা অভিজ্ঞতার আনাড়িপনা, সবকিছু মিলে এক আশ্চর্য যুগলবন্দি সৃষ্টি করলাম আমরা দুজনে। ওর কামনার আবেগ যেন ওর সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যায়।

উত্তাল ঢেউ তুলে ও আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কোন অজানায়। মনে হল, এর চেয়ে সুখের নীড় তিন ভুবনের কোথাও নেই।

অবশেষে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি রাজকীয় শয্যায়। কথা বলছি নরম গলায়। জানলাম, ওর নাম আয়েষা। ছেলেবেলা থেকেই ও কারেইন-এ মানুষ। ইংরেজি শিখেছে ওর বাবার কাছে। তারপর...।

আমি ওর কানের কাছে মুখ এনে ছোট্ট করে বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আয়েষা।

পলকে ওর নমনীয় শরীর শক্ত হয়ে গেল। আমি চমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর কাজল কালো চোখে অন্তত দুঃখের ঢল নেমেছে, সঙ্গে আতঙ্কের জটিল স্রোত।

ওকথা বোলো না কখনও।–আয়েষা বিষণ্ন স্বরে বলল।

কেন বলব না? আমাদের পরিচয় মাত্র একদিনের, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

না হিতেশ, তা হয় না। আমি শেখ হারিদের কয়েদি। আজ রাতের পর আর আমাদের দেখা হবে না।

কিন্তু কোন অপরাধে শেখ তোমাকে বন্দি করেছেন?–অধৈর্য হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

আয়েষার মুখ-চোখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল। বলল, অপরাধ আমি করিনি, করেছেন আমার বাবা। বাবার একটা খবরের কাগজ আছে কারেইন থেকে বেরোয়। সেই কাগজে এমন কিছু লেখা বেরিয়েছিল যা শেখ হারিদ মনে করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে।

তাতে তোমার কী করার আছে? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তুমি শেখকে চেনো না। নৃশংসতায় তাঁর জুড়ি নেই। বাবার ওপরে কী-ইবা প্রতিশোধ নিত শেখের লোকেরা! বড়জোর বাবাকে ওরা মেরে ফেলত। কিন্তু বাবা তো এমনিতেই অসুস্থ, যে-কোনওদিন মারা যেতে পারেন। সুতরাং বাবার অপরাধে যদি আমাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে বাবার ওপর ধাক্কাটা অনেক বেশি আসবে। তাই এই ব্যবস্থা। আজ সকালে যে-সব মেয়েদের তুমি বাগানে দেখেছ ওদের বেশিরভাগই নিরপরাধ। ওদের প্রাসাদে এনে বন্দি করে রাখা হয়েছে কারণ অন্যায়টা করেছে ওদের কোনও আত্মীয় অথবা বন্ধু। একের পাপের শাস্তি অন্যকে সইতে হচ্ছে।

কিন্তু এখন তোমাকে নিয়ে শেখ কী করবেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

আয়েষা মনমরা সুরে জবাব দিল, কেউ সঠিক জানে না। কিন্তু এমন সব কথা আমরা কানাঘুষোয় শুনেছি যে, সেগুলো উচ্চারণ করতেও ভয় হয়। তবে এটুকু জানি, এখানে

কোনও মেয়েকে এক বছরের বেশি আটকে রাখা হয় না। আর কোনও মেয়েকে যদি শেখের অতিথির সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে বেছে নেওয়া হয় তাহলে তারপর তাকে আর ওই বাগানে দেখা যায় না।

তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি থাকতে পারব না। বুঝতে পারছিলাম, আবেগে আমার স্বর বুজে আসছে।

শুধু-শুধু দুঃখ পেয়ো না। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কথা বিশ্বাস করো।

আয়েষা আমার কথা বিশ্বাস করল কিনা জানি না, তবে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর সুন্দর ঠোঁটে। বলল, হিতেশ, ওসব কথা ভুলে যাও। শুধু আজকের রাতটুকুই আমার কাছে সত্যি। এসো, এই সময়টুকু আমরা সবকিছু উজাড় করে ভালোবাসার খেলা খেলি।

সে-রাতে আরও কতবার যে আমরা একই খেলায় মেতে উঠেছিলাম আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, শেষবারের পর আয়েষার ধনী বুকের ওপর মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওর শরীরের সোঁদা গন্ধ নাকের ভেতরে ঢুকে আমাকে মাতাল করে দিচ্ছিল।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভেঙেছে তখন আয়েষা চলে গেছে।

.

প্রাতরাশের টেবিলে রোমিলা হালকা গলায় মন্তব্য করল, দাদা কাল সাত-তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও তোমাদের শরীরের কোনও উন্নতি হয়নি। ঠিক ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে।

আমি কোনও জবাব দিলাম না। শুধু মোহন খান্নার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল।

রোমিলা টেবিল ছেড়ে চলে যেতেই মোহন জিগ্যেস করল, কী দোস্ত, এখানকার হাওয়া এখন স্যুট করছে তো? তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কাল রাতটা বেশ ভালোই কেটেছে।

আমি উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, তোমার?

একগাল হেসে মোহন বলল, দারুণ! শুধু খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে, একটু পরেই শালা শেখের সঙ্গে তেলের দর নিয়ে মেছোবাজারের মতো দরাদরি করতে হবে। কিন্তু উপায় কী ব্রাদার, এর নাম চাকরি। চলো, তৈরি হয়ে নিই।

তেল নিয়ে কথাবার্তা সহজে মিটল না। চটপট কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল না। শেখ হারিদের সঙ্গে হাজির ছিলেন তার মন্ত্রণা পরিষদ। হাসান হাজির ছিলেন নীরব সাক্ষীর মতো। আর মোতায়েন ছিল শেখের বিশ্বস্ত কয়েকজন রক্ষী।

অত্যন্ত ছোটখাটো ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একরোখাভাবে জেদ ধরলেন কাহরেইন-এর বাণিজ্য মন্ত্রণা পরিষদের মুখপাত্ররা। সব দেখেশুনে মনে হল চটজলদি কোনও চুক্তি করতে তেলের কুমিররা রাজি নন।

সারাদিন ধকলের পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। মোহন বলল, ওরা মনে হয় অন্য কোনও পার্টির সঙ্গেও কথাবার্তা চালাচ্ছে।

হতে পারে।আমি ওর কথায় সায় দিলাম ও আমরা দরে যত পর্যন্ত উঠতে পারি সেই পর্যন্ত দেখব। তাতেও যদি ওরা রাজি না হয় তাহলে কোম্পানিতে টেলিগ্রাম করে ডিরেক্টরদের ডিসিশান জানতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অগত্যা। বলল মোহন।

সারাদিনের মিটিংয়ে আমি কম বকবক করিনি। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি মোহনকে সাহায্য করার। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে মিটিংয়ে আমি একাত্মভাবে জড়িয়ে পড়তে পারিনি।

আয়েষার কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল গত রাতের কথা। রাতের পুঙ্খানুপঙ্খ প্রতিটি স্মৃতি জুলজুল করছিল আমার চোখের সামনে, ভিড় করছিল আমার মনের ভেতরে। কেমন একটা অপরাধবোধ আমাকে জড়িয়ে ধরল। কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় আমি কোনও জালিয়াতি করে ফেলিনি তো? না কি আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই ওই শয্যাবিলাসের আয়োজন করেছিলেন শেখ হারিদ? কিন্তু এতটা শয়তানি প্যাঁচ কি খেলবে কাহ্রেইন-এর এই নির্লিপ্ত মানুষগুলো? তা ছাড়া আয়েষার কথাগুলো কি বানানো গল্প, মিথ্যে?

অনেক ভেবেও আয়েষার কথাগুলো মিথ্যে বলে মনে হল না।

ওর বাবার অপরাধে ও শাস্তি ভোগ করছে।

কী নৃশংস এই শেখের বিচার!

আয়েষার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। ওর সুন্দর মুখ, ওর অপরূপ অতুলনীয় দুটি বাহু, ওর জাদুমন্ত্রে ছোঁয়া লাগানো নগ্ন যৌবন।

যে করেই হোক আয়েষার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। কোনও বাধা, কোনও বিপদ আমাকে রুখতে পারবে না।

.

রোমিলা কাপুর

নির্দিষ্ট জায়গায় যখন পৌঁছলাম তখন নটা বেজে দশ মিনিট। আজও আকাশি ভ্যান আমার অনুসারী। বহু চেষ্টা করেও লেজ থেকে তাকে ছাড়াতে পারিনি।

আলফা থামিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই মহম্মদ ইলিয়াসের হাসিমুখ। আমার হাতে নাম না–জানা হলুদ ফুলের তোড়া। শেখ হারিদের চোখ-ভোলানো বাগান থেকে নিজে হাতে

তুলে এনেছি।

তোড়াটা ইলিয়াসের হাতে দিয়ে বললাম, গোলাপের বদলে।

ইলিয়াস দুহাত পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ডান হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে ফুলের তোড়াটা গ্রহণ করল। তারপর লুকনো বাঁ-হাত সামনে নিয়ে আসতেই লজ্জা পেলাম। ওর হাতে সদ্য ফোঁটা গোলাপের তৈরি একটা নতুন গুচ্ছ।

তোড়া দুটিকে হাতবদল করে মাথা ঝুঁকিয়ে আদাবের ভঙ্গিতে ওর গোলাপের তোড়াটা আমার দিকে এগিয়ে দিল ইলিয়াস। বলল, ইতনি আসান নহী হ্যায় কর্জ চুকানা ইয়ে বান্দেকি। এ বান্দার ঋণ শোধ করা অত সহজ নয়, মিস কাপুর।

তারপর গতকালের মতোই ও হাটের মাঝখানে হো-হো করে হেসে উঠল। আশেপাশের লোকজন বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল আমাদের দিকে।

ইলিয়াসের পোশাক আজ অন্যরকম। ফিনফিনে গোলাপি কাপড়ে তৈরি ফুলহাতা কাফতান আর আঁটোসাঁটো ব্লু জিন্স। কাঁধে ঝোলানো একটা চামড়ার ব্যাগ।

চলুন, কারনামায় গিয়ে বসি। ইলিয়াস বলল, ইন্টারভিউটা সঙ্গে এনেছি। আপনাকে পড়ে শোনাব।

আমি ওর পাশে হাঁটছি। কারনামা-র সুদৃশ্য দরজা ক্রমেই আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে ভারতের কথা ভাবলে দেশটার স্মৃতি কেমন আবছা মনে হয়। মনে হয়, কাহরেইন সত্যি, বাকি সব মিথ্যে।

গতকাল দাদা ও মোহনদার আচরণ আমার কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছে। বারবার মনে হয়েছে, কী একটা যেন ওরা গোপন করতে চেষ্টা করছে আমার কাছ থেকে। কোথায় চিন্তায় ছিলাম আমার কাহরেইন বেড়ানোর কতটুকু ওদের বলব, আর কতটুকু বলব না, উলটে

ওরা আমার বেড়ানোর গল্পকে মোটে পাত্তাই দিল না। সেই মুহূর্তে ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওদের ওপর।

আজ সকালেও দাদা আর মোহনদার মুখে অবসাদ ও ক্লান্তির ছাপ দেখেছি। সেই সঙ্গে যেন একটা আবছা অপরাধবোধও ছায়া ফেলেছিল ওদের মুখমণ্ডলে। দাদা এমনিতে মনের ভাব খুব একটা লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই ওকে দেখেই আমার সন্দেহটা গাঢ় হল। শেখ হারিদ কি ওদের দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে চলেছেন?

ইরান কথাটার অর্থ জানেন?

ইলিয়াসের আচমকা প্রশ্নে আমার চমক ভাঙল। দেখি কারনামা-র দরজায় পৌঁছে গেছি।

দরজা ঠেলে ভেতরের ঠান্ডা পরিবেশে ঢুকলাম দুজনে। আমি ছোট্ট করে বললাম, ইরান কথাটার আবার অর্থ আছে নাকি?

কাহরেইন-এর নেই, কিন্তু ইরানের আছে।

গতকালের টেবিলটার দিকে অজান্তেই চোখ চলে গেল আমাদের। টেবিলটা খালি। দুজনে চোখাচোখি হল। ইলিয়াসের কালো চোখের তারায় আশ্চর্য কৃতজ্ঞতার ইশারা। কিন্তু কেন, তা জানি না।

টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। তারপর আমি বললাম, আজ শুধু সবুজ চা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব।

ইলিয়াসের চোখ পলকের তরে সপ্রশ্ন হল। কিন্তু পরক্ষণেই বেয়ারাকে ডেকে সবুজ চা অর্ডার দিল। তারপর আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, এত তাড়া নিয়ে এলেন কেন?

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যি-সত্যি আমার বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া নেই। কিন্তু ইলিয়াসের সঙ্গে বেশিক্ষণ বসতে আমার ভয় হচ্ছিল। তা ছাড়া আমি জানি, রেস্তোরাঁর বিল কিছুতেই ও আমাকে মেটাতে দেবে না। সেইজন্যেই আরও বেশি খারাপ লাগছিল। সুতরাং প্রসঙ্গ পালটে ঠোঁটে হাসি টেনে ওকে প্রশ্ন করলাম, কী হল, ইরানের অর্থটা বললেন না তো!

ইলিয়াসের মুখ সামান্য গম্ভীর হল। বলল, ইরানের অর্থ হল, আর্যদের দেশ। কারণ প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া থেকে দলে-দলে যেসব মানুষ ইরানে এসেছিল, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আর্য। সেইজন্যেই ওই নাম। উত্তর ভারত আর ইউরোপের সঙ্গে সেইসব আর্যদের রক্তের সম্পর্ক ছিল। সেইজন্যে তাদের বংশধরদের সঙ্গে দক্ষিণ ইউরোপের মানুষদের মিল আছে। আর প্রায় খাঁটি আর্য বলতে ইরানে রয়ে গেছে কয়েকটি উপজাতি–যেমন, কুর্দ, সুর আর বখতিয়ারি।

আমি হেসে ওকে বললাম, আপনি যে একেবারে ইতিহাস মুখস্থ করে রেখেছেন দেখছি!

ভুলে যাবেন না আমি রিপোর্টার। খবর বেচে খাই।

সবুজ চা টেবিলে এসে গেল। আমি ছোট্ট গোলাপের তোড়াটা নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। দেখাদেখি ইলিয়াসও আমার দেওয়া হলুদ ফুলের গুচ্ছ তুলে ধরল মুখের সামনে। বলল, আপনি গোলাপ ভালোবাসেন?

আমি হেসে বললাম, কে না বাসে!

ইলিয়াস আনমনা হয়ে গেল। থেমে-থেমে বলল, আলেয়া…আলেয়া গোলাপের নামে পাগল ছিল…।

আলেয়া! ইলিয়াসের বোন! কিন্তু ও এভাবে কথা বলছে কেন? আলেয়া গোলাপের নামে পাগল ছিল!

আমি ছোট্ট করে জিগ্যেস করলাম, আলেয়া এখন গোলাপ ভালোবাসে না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ওর শরীরের গভীর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। পরদা ঢাকা জানলার দিকে তাকাল ইলিয়াস। অস্ফুট স্বরে বলল, এখন ও গোলাপ ভালোবাসে কিনা জানি না...

আমি চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলাম। অখণ্ড নীরবতায় চুমুকের ক্ষীণ শব্দটা কটু হয়ে কানে বাজল।

ইলিয়াস এবার আমার দিকে চোখ ফেরাল। বলল, আলেয়া কাছে নেই। এখন তেরো বছরের নামাই আমার সব। ওকে সুখী রাখার জন্যে আমি যা খুশি করতে পারি। ও আমার চোখের মণি, রোমিলানা ভুল বললাম, তার চেয়েও বেশি।

ইলিয়াসের ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেছে। এখুনি যেন রক্ত ফেটে বেরিয়ে ছিটকে পড়বে হলুদ ফুলের তোড়ার ওপর। ওর চোখ চকচক করছে কী এক অদ্ভুত আবেগে। আলেয়া ওর কাছে নেই কেন? আলেয়ার কি বিয়ে হয়ে গেছে? ইলিয়াসের চোখমুখ দেখে সে কথা জিগ্যেস করতে ভরসা হল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইলিয়াস চায়ে চুমুক দিল। ফুলের তোড়াটা নামিয়ে রাখল পাশের চেয়ারে। একটু পরেই ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, ইন্টারভিউটা তোমাকে পড়ে শোনাই।

আমি আগ্রহে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজকরা কয়েকটা কাগজ বের করল ইলিয়াস। সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হল। বলল, এটা পার্সি ভাষায় লেখা, কিন্তু আমি ইংরেজি অনুবাদ করে পড়ে শোনাচ্ছি। বোর করলে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবে, লজ্জা করবে না।

ও হাসল। আমিও হাসলাম। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে ইলিয়াস ইন্টারভিউটা আমাকে পড়ে শোনাতে লাগল। পড়া এবং শোনার ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল আমাদের চায়ের চুমুক।

চা এবং ইন্টারভিউ-পাঠ প্রায় একই সঙ্গে শেষ হল। তখন ইলিয়াস প্রশ্ন করল, কেমন লাগল?

দারুণ?—একটু থেমে আরও বললাম, এটা কিন্তু মোটেই মন-রাখা কথা নয়।

সত্যি, এত চমৎকার ও সাবলীলভাবে ইন্টারভিউটা ইলিয়াস লিখেছে যে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা বেরিয়ে আসে।

ওর নানান গুণ আমাকে বিপজ্জনকভাবে মুগ্ধ করে চলেছে।

প্রশংসার জন্যে নরম গলায় আমাকে পালটা ধন্যবাদ জানাল ইলিয়াস। তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তোমার তো আবার বাড়ি ফেরার তাড়া রয়েছে, নইলে…

হঠাৎই চুপ করে গেল ও।

আমি জানতে চাইলাম, নইলে কী?

ইলিয়াস একরাশ কুণ্ঠা নিয়ে নীচু গলায় বলল, কাল নাজমাকে তোমার কথা গল্প করেছিলাম। ও ভীষণ জেদ ধরেছে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। আসলে আমি চাকরিতে বেরিয়ে পড়ি। বাড়িতে ওর পিসির কাছে থাকে নাজমা। ফলে তেমন গল্পগুজব করার সঙ্গী পায় । তার ওপর তুমি ভারত থেকে এসেছ শুনে তো একেবারে আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছে।

কথা বলতে বলতে একটা খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ছিল ইলিয়াসের চোখে-মুখে। হঠাৎই সেটা দপ করে নিভে গেল। অনেকটা সাফাই দেওয়ার সুরে বিড়বিড় করে ও বলতে লাগল,

আসলে আমি নাজমাকে বলেছিলাম, বাড়িতে আনা যাবে না–হয়তো রাজি হবে না। অচেনা লোকের বাড়িতে হুট করে কে-ই বা আসতে রাজি হয়, বলো!

ইলিয়াস আমার কাছে ঝুঁকে এল, বলল, আমি অনেকভাবে ওকে নিরাশ করতে চেয়েছি, কিন্তু তবুও মেয়েটা আশা ছাড়েনি। বারবার একই কথা বলছিল..

আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম। নাজমার প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার দুঃখ যে ইলিয়াসের কাছে কতখানি সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছিল, ইলিয়াসের বাড়িতে গেলে আমার কষ্ট বাড়বে। আমি যেদিন ভারতে ফিরব সেদিন আমার পা টেনে ধরবে কাহরেইন এর মাটি। বহুদিনের পোষা পাখির মতো আমার ডানা ভারী হয়ে যাবে। আর উড়তে পারব না আমি।

হঠাৎই আমরা মনে হল, নাজমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল না কেন ইলিয়াস? তা হলে ওরও আশ মিটত, আর আমাকেও অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হত না।

এই চিন্তাটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় বলে ফেললাম ইলিয়াসকে।

নাজমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতে।

ইলিয়াস চোখ তুলে সরাসরি আমার দিকে তাকাল। বলল, সম্ভব হলে তো নিয়েই আসতাম, রোমিলা। ওর–ওর…।

আমি তীক্ষ্ণ নজরে ইলিয়াসকে জরিপ করছিলাম। হঠাৎই যেন অদ্ভুত এক বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে ওর চোখেমুখে।

আমি জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে নামার?

ইলিয়াস নীচু গলায় বলল, ও হাঁটতে পারে না। প্যারালিসিসে ওর দুটো পা বহুবছর ধরে অকেজো হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে?

ইলিয়াসের বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবুও সংক্ষেপে সব বলল আমাকে। নাজমার যখন তিন বছর বয়েস তখন কী একটা অসুখে হঠাৎ করেই ওর পায়ে প্যারালিসিস দেখা দেয়। তারপর সেটা ক্রমে বাড়তে থাকে। বহুরকম চিকিৎসা করেও কোনও কাজ হয়নি।

কথা বলতে বলতে ইলিয়াসের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

আমি ভারী গলায় বললাম, সরি, ইলিয়াস। অজান্তে তোমাকে ব্যথা দিয়ে ফেলেছি। চলো, আমি তোমার বাড়িতে যাব—নাজমাকে দেখতে যাব।

ইলিয়াসের জলভরা চোখ পলকে আনন্দে চকচক করে উঠল। ও অবিশ্বাসের সুরে বলল, সত্যি?

আমি হেসে বললাম, ট্রুথ, নাথিং বাট দ্য ট্রুথ।

ইলিয়াস আচমকা আমার হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল, গ্রেট। কাম অন, লেট্স গো।

ইলিয়াস চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। সেইসঙ্গে আমিও।

ওর ইচ্ছে পূরণ করতে পেরে আমার আনন্দ হচ্ছে। আমার একটা হাত কখন যেন ইলিয়াস বগলদাবা করে বন্দি করে ফেলেছে। গোলাপের তোড়াটা আমি আমার ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ইলিয়াসও হলুদ ফুলের গুচ্ছটা ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে। ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে আর পাকা গাইডের ভাবভঙ্গিতে ইরান, বাহরেইন ইত্যাদি সম্পর্কে লাগাতার বকবক করে চলেছে। যেন এক অদ্ভুত পাগলামি পেয়ে বসেছে ওকে।

বাজার এলাকাটা পেরিয়ে এসেই ইলিয়াস ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, রোমিলা, আলফা আলফার জায়গায় পড়ে থাক। আলফা সঙ্গে নিলে

পেছন পেছন ওই আকাশি ভ্যানও আসবে। না কি তোমার দেহরক্ষী চাই?

আমি প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। বললাম, একজনকেই সামলাতে পারছি না তার ওপর আরও দুজন এলে তো তুলকালাম কাণ্ড হবে। আমি ইশারায় ইলিয়াসের হাতে বন্দি আমার হাতটা দেখালাম।

ওঃ, সরি!—বলে ইলিয়াস চটপট হাতটা ফেরত দিল।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দিয়েছে ড্রাইভার। দুজনে চটপট উঠে বসলাম ভেতরে। ইলিয়াস দেশীয় ভাষায় কী যেন নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। তারপর আমাকে লক্ষ করে বলল, আমার বাড়ি একেবারে কাহরেইন-এর সীমানার কাছাকাছি। জায়গাটার নাম কানাম। তবে পৌঁছোতে মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।

ঠিক-ঠিক বলতে গেলে আট মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম দুজনে।

জায়গাটা বেশ কিছুটা ঘিঞ্জি। দেখে মনে হয় এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে নিম্নবিত্তের সংখ্যাই বেশি। ইলিয়াস বোধহয় আমার মনের কথা টের পেয়েই বলে উঠল, গোটা কাহ্‌রেইন তেলের ওপরে ভাসছে। অথচ সব পয়সাই ঢুকছে শেখ হারিদের পকেটে। দেশের লোক সব অভাবে ধুঁকছে।

ইলিয়াসের কথায় বেশ খানিকটা ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি শেখের অতিথি। তোমার সামনে এসব কথা বলে ফেললাম বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু সত্যি কথাটা কি জানো? দেশের লোকের সহ্যের সীমা পার হয়ে যেতে চলেছে। ধস একদিন নামবেই।

আগামী সেই দিনটার আশায় ওর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

বাড়ির সদর দরজা পেরিয়েই হাঁকডাক শুরু করে দিল ইলিয়াস, নাজমা! নাজমা। দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি।

সদর পেরিয়েই একটা খোলা উঠোন। তারপর বাড়ি।

একটু পরেই বাড়ির দোতলার বারান্দায় সাদা-চুল এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়ালেন। তার কাখে অপূর্ব রূপসী একটি মেয়ে। বয়েস বারো কি তেরো। নিশ্চয়ই নাজমা। আর বৃদ্ধা সম্ভবত ওর পিসিমা।

আমাদের দেখে মেয়েটা কোল থেকেই একেবারে হইহই শুরু করে দিল। ইলিয়াস ওর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল, সবুর কর, এক্ষুনি আমরা ওপরে যাচ্ছি।

সেকেলে জীর্ণ ঢঙের সিঁড়ি ভেঙে ইলিয়াস আমাকে ওপরে নিয়ে গেল। চলতে-চলতে বলল, কোথায় শেখ হারিদের প্রাসাদ, আর কোথায় এই বাহাত্তরে বাড়ি।

আমি মাথা নীচু করে সিঁড়ি ভাঙছিলাম, চট করে মুখ তুলে ওকে দেখলাম। তারপর বললাম, তুমি তো অবুঝ নও। ওই প্রাসাদ কাদের কান্না-ঘাম-রক্তে তৈরি তা নিশ্চয়ই তুমি জানো, আমার চেয়ে ভালো করেই জানো!

ইলিয়াস হেসে বলল, ইন্টারভিউতে একটা কথা জুড়ে দেব, ভারতীয় তরুণীদের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা মুশকিল।

দুজনেই চড়া গলায় হেসে ফেললাম।

অবশেষে নাজমার ঘরে এলাম।

ঘরটা আকারে মাঝারি। মেঝেতে রংচটা একটা পুরোনো কার্পেট পাতা। বড়-বড় দুটো জানলার জাফরি ঝোলানো। হয়তো রোদের তাত ও চোখ ঝলসানো আলো স্তিমিত করার জন্যে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা খাটো বিছানায় নাজমা এখন আধশোয়া অবস্থায়।

দুটো তাকিয়া ওর পিঠের কাছে গোঁজা। রঙিন সুতো দিয়ে কী একটা বোধহয় বুনছিল, সেটা বিছানার একপাশে রাখা। এখন মুগ্ধ একাগ্র চোখে ও শুধু আমাকে দেখছে।

নাজমা যেন কোনও স্বর্গীয় পুতুল। দুধে-আলতা ওর গায়ের রং। টানা-টানা কালো চোখ। ধারালো নাক ও চিবুক। পাতলা গোলাপি ঠোঁট। নাকে ছোট একটা লাল পাথর ঝিলিক মারছে। এছাড়া তেমন কোনও সাজগোজ বা প্রসাধন নেই। আমি থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েটার অপরূপ সৌন্দর্য আশ মিটিয়ে দেখতে লাগলাম।

ইলিয়াস আমার কনুই স্পর্শ করল, বলল, বিছানাতেই বোসো। নাজমা তোমাকে কাছ ছাড়া করবে বলে মনে হয় না।

নাজমা হাততালি দিয়ে উঠল, তোমার কথা কাল দাদার কাছে কত শুনেছি। তুমি আজ আমাকে সারাদিন ধরে ইন্ডিয়ার গল্প শোনাবে। নানান দেশের গল্প শুনতে আমার দারুণ লাগে।

ইলিয়াস বলল, ব্যস, এবারে আমার ছুটি। তবে রোমিলা, আর-একটা রিকোয়েস্ট, আজ আমাদের এখানে খেয়ে যাবে তুমি–অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

আমি মুখ ফিরিয়ে ইলিয়াসকে দেখলাম। অপরূপ সৌন্দর্য ওদের জন্মগত অধিকার। একটু থেমে ওকে বললাম, ভদ্রতার জন্যে যদি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হত তাহলে সেটা তোমার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, ইলিয়াস।

আমরা তিনজনেই হালকা গলায় হেসে উঠলাম। ইলিয়াস ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর আমি ফুটফুটে পুতুলটার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলাম।

ঘরের দেওয়ালে বাঁধানো বেশ কিছু ছবি রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি রঙিন পার্সিলিপি। কিন্তু যে-ছবিটির প্রতি আমার নজর পড়ল সেটা তিনজনের একটি গ্রুপ ফটো। ইলিয়াস ও

নাজমা দুপাশে। ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে বছর কুড়ির এক যুবতী। নিশ্চয়ই আলেয়া। একেবারে নাজমার মুখটি অবিকল কেটে বসানো।

আমি সেদিকে আঙুল দেখিয়ে নাজমাকে জিগ্যেস করলাম, মাঝখানে কে? তোমার দিদি আলেয়া?

হ্যাঁ। ছবির দিকে না তাকিয়েই নাজমা বলল। একটা দুঃখ ছায়া ফেলল ওর কণ্ঠস্বরে।

তোমার দিদি এখন কোথায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, জানি না...একটু থেমে আরও বলল, দাদা জানে।

ঠিক এই সময়ে ওর পিসিমা এক গ্লাস শরবত হাতে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দিলেন। তারপর নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নাজমা ছোট্ট করে বলল, আমার পিসিমা। খুব ভালো বাদামের শরবত তৈরি করে, খেয়ে দ্যাখো।

আমি সৌজন্যবশত গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে ইশারা করতেই নাজমা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, আমি তো ওটা রোজই খাই, ডাক্তারবাবু খেতে বলেছেন। বাদামের শরবত খেলে আমার পা ধীরে-ধীরে সেরে উঠবে।

কথাটা বিশ্বাস করতেই মন চাইল, কিন্তু ইলিয়াসের মুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয় নাজমাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যেই হয়তো ওকথা বলা হয়েছে। শরবতটা রোজ খেলে ওর শরীরের পুষ্টি বাড়বে।

শরবত শেষ করতেই আবার গল্প।

আমি নাজমাকে ভারতের নানান কথা শোনাই। পরক্ষণেই ও হাত-পা নেড়ে আমাকে ইরান বা কাহরেইন সম্পর্কে সাতকাহন করে শুনিয়ে দেয়। রাজ্যের বিষয় নিয়ে গল্পেগুজবে

ইরান ও ভারত দেশ দুটো ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। ঘড়ির কাটার কথা একেবারে ভুলে গেলাম দুজনে।

দুপুর একটা নাগাদ গল্পের ঢেউ থামল। কারণ ইলিয়াস ঘরে এসে হাজির হল। আমাদের দিকে তাকিয়ে মজাদার মুখভঙ্গি করে বলল, আসুন মেমসাহেবরা, খানা তৈরি। তারপর আবার আড্ডা দেওয়া যাবে।

সুতরাং তখনকার মতো গল্প থামল। ওই ঘরেই খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম আমরা।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর ইলিয়াসও আমাদের আসরে যোগ দিল। সোজা কথায়, গুলতানি একেবারে জমে উঠল। এহেন বিষয় নেই যা আমাদের আলোচনায় জায়গা পেল না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সময় একেবারে হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগল।

আকাশের আলো ম্লান হয়ে আসতেই আমি সচেতন হলাম। ইলিয়াসকে বললাম, এবারে আমি ফিরতে চাই। ও হেসে বলল, তোমার তো বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল।

বুঝলাম, ঠাট্টা করছে। তাই হেসে বললাম, তুমিও ইন্ডিয়াতে কখনও এসো, তখন মজা টের পাওয়াব।

আমরা দুজনে নাজমাকে ছেড়ে উঠলাম। ও হঠাৎই বলল, দিদি এক মিনিট। তোমাকে একটা জিনিস দিই।

তারপর তাকিয়ার নীচ থেকে রুমালের মতো একটা জিনিস বের করল। রুমালটা রঙচঙে সুতোয় বোনা।

নাজমা বলল, আমি বুনেছি।

আমি আলতো করে ওর কমনীয় গাল টিপে দিলাম। বললাম, ভাগ্যিস এসেছিলাম, তাই এমন সুন্দর জিনিসটা পেলাম।

ইলিয়াস আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমার গোলাপের তোড়ার চেয়েও সুন্দর?

আমি কপট রাগে ওর দিকে কটমট করে একবার দেখলাম।

নাজমা বারবার বলল, আবার এসো! আবার এসো!

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই আসব। তারপর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আর ইলিয়াস।

চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই। ইলিয়াস বলল।

একশোবার। না পৌঁছে দিলে আমি যাব কেমন করে?

ইলিয়াস বলল, সামনের বড় রাস্তায় পৌঁছলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

কিন্তু তার আর দরকার হয়নি।

আমি হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, আবার কবে দেখা হচ্ছে?

কেন, কাল নটায়!–চটপট বলে উঠল ইলিয়াস। শুনে আমার ভালো লাগল।

অবাক হয়ে ভাবলাম, মানুষের প্রত্যাশা কী দুরন্ত বেগেই না বাড়তে থাকে! বাড়তে বাড়তে যদি তা কখনও বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় তখন?

আর কয়েক পা এগোতেই আলেয়ার কথা মনে পড়ল আমার। ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে জানতে চাইলাম, আলেয়ার কী হয়েছে ইলিয়াস? ও এখন কোথায়?

একটা বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিয়াস বলল, আল্লা জানেন।

আমি কী বলব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎই লাল রঙের আলফা স্পোর্টস কারটা আমার চোখ পড়ল। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা কে নিয়ে এল এখানে?

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগেই আকাশি রঙের ভ্যানটা নজরে পড়ল। ইলিয়াসের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আচমকা দুটো ছায়া আমার সামনে এসে হাজির হল।

আমরা চমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভয়ে বুক কাঁপছে।

ইলিয়াস আমার বাহু আঁকড়ে ধরল শক্ত হাতে।

ছায়ামূর্তি দুজনের একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল, মিস কাপুর, আমরা আপনার দেহরক্ষী। আপনার গাড়িটা আমরা নিয়ে এসেছি। বাড়ি ফিরতে আপনার কোনও অসুবিধে হয়েছে শুনলে মাননীয় শেখ ভীষণ দুঃখ পাবেন।

আমি করুণ চোখে ইলিয়াসের দিকে একবার তাকালাম। ওর চোখে-মুখে ঘৃণা যন্ত্রণা ভয় আক্রোশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ইলিয়াসকে ছেড়ে আমি দেহরক্ষী দুজনের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। ইলিয়াস আচ্ছন্নের মতো আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল : বিদায়!

আলফায় উঠে যখন স্টার্ট দিলাম তখন আমার চোখ ঝাপসা হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। ইলিয়াসের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে একটু-একটু করে।

আকাশি ভ্যানটা আমার আগে-আগে যাচ্ছে, আর আমি সেটাকে অনুসরণ করে চলেছি।

এটুকু বুঝলাম, শেখ হারিদের অনুচরদের চোখে ধূলো দেওয়া নেহাত সহজ নয়। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ট্যাক্সি অনুসরণ করে ইলিয়াসের বাড়ি পর্যন্ত এসেছে। সে-কথা ভাবতেই দুশ্চিন্তা জুড়ে বসল মাথায়। আগামীকাল ইলিয়াসের সঙ্গে দেখা হবে তো?

ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখতেই দেখলাম, গাঢ় নীল আকাশে এক ফালি সুদৃশ্য চাঁদ আমার পাশে ছুটছে। পার্শিয়াল গালফ-এর নোনা বাতাস আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। ভাবতে অবাক লাগল, আমি দেশছাড়া হয়ে হাজার-হাজার মাইল দূরের এক বিদেশি রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি।

.

হিতেশ কাপুর

সে-রাতে শেখ আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নৈশভোজে। সুতরাং অস্থির মন নিয়েই মোহন ও রোমিলার সঙ্গী হলাম। রোমিলা একটু আগেই বেড়িয়ে ফিরেছে। ভীষণ ক্লান্ত ছিল ও। নৈশভোজে যেতে রাজি হচ্ছিল না। আমিই বলেকয়ে ওকে রাজি করিয়েছি। বলা যায় না, ওকে অনুপস্থিত দেখলে শেখ হারিদ কী থেকে কী ভেবে বসবেন।

ভোজের আসরে উপস্থিত ছিলেন শেখ হারিদ নিজে, পাশে তার প্রিয় বেগমদের একজন, আর দুই ছেলে। ছেলে দুটি চেহারায় বাপের মতো, তবে অনেক রোগা। এখনও ওদের দাড়ি গজায়নি। অবশ্য একজন যে বাবার মতো চমকদার দাড়ি তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেটা তার গাল দেখলেই বোঝা যায়।

আসরে আরও হাজির ছিলেন কয়েকজন মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। তাদের মধ্যে দুজন সকালে তেলের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া পার্টির তদারকিতে শশব্যস্ত হয়ে যথারীতি হাজির রয়েছেন সদা উপস্থিত বিশ্বস্ত অনুচর হাসান।

শেখ হারিদ বেশ খোশমেজাজে গল্প করছেন সবার সঙ্গে। তিনি কথা বলার সময় অন্য সবাই চুপ করে শুনছেন। তার কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। অতিথিসেবার দায়িত্ব তিনি যথাযথ পালন করে চললেন। বিশাল কারুকার্যময় ঘরে বেজে চলেছে দেশীয় সংগীতের সুর। স্বল্পবাস সুন্দরী মেয়েরা ঘুরেফিরে খাবার পরিবেশন করছে রুপোর পাত্রে। সব মিলিয়ে খাঁটি মধ্য প্রাচ্যের পরিবেশ।

ডাইনিং টেবিলে কাবাব, বিরিয়ানি, ফলসামগ্রীর আশ্চর্য সমাহার যে-কোনও খাদ্য-বিলাসীকে দিশেহারা করে দেওয়ার মতো। রোমিলা ও মোহন আনন্দের সঙ্গে এটা-ওটা চেখে চলল। প্রতিটি খাবারের পরই পরিবেশন করা হচ্ছে দেশি-বিদেশি পুরোনো-নতুন নানান রঙের নানান স্বাদের সুরা। সন্দেহ নেই ওই রাজকীয় নৈশভোজের স্মৃতি সহজে ভুলে যাওয়ার নয়।

আমার খাওয়ার ভঙ্গিতে হয়তো নির্লিপ্ত ভাব ধরা পড়েছিল। তা ছাড়া খেতেও যে তেমন আগ্রহ ছিল তা নয়। হয়তো সেই কারণেই হাসান বললেন, মিস্টার কাপুর, আপনি তো ঠিকমতো খাচ্ছেন না। আর তেমন কথাবার্তাও বলছেন না।

হাসান আমার পাশেই বসে ছিলেন।

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে আমি মনস্থির করে ফেললাম। তারপর মনের বোঝা হালকা করার জন্যে নীচু গলায় বললাম, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন, মিস্টার হাসান। গতকাল বাগানে যে-মেয়েটিকে আমি পছন্দ করেছিলাম মনে আছে?

নিশ্চয়ই মনে আছে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। অবশ্য সুন্দরী ছাড়া কাউকেই মাননীয় শেখ তাঁর উদ্যানে স্থান দেন না। একটু থেমে হাসান বললেন, মেয়েটি আপনার মনোরঞ্জন করতে পেরেছে আশা করি?

তার অনেক বেশিই করেছে। আমি জবাব দিলাম।

তা হলে আপনাকে অসুখী দেখাচ্ছে কেন, মিস্টার কাপুর?

শ্বাস টেনে বললাম, ওকে আমি আবার দেখতে চাই। শেখকে বলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না আপনি?

এই প্রথম শেখের একান্ত সচিবের ঠোঁটে হাসির আভাস দেখলাম। না, বন্ধুত্বের হাসি সেটা নয়, বরং তাকে ঠোঁটের বিকৃতি বলা যায়। এ-হাসি মন ছোঁয় না।

হাসান বললেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, মিস্টার কাপুর। আপনি ওকে এমনভাবে উপভোগ করেছেন যা কোনও পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সবই আল্লার ইচ্ছে, তাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইচ্ছে করলেও আমি অথবা মাননীয় শেখ, কেউই এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। সবই আল্লার মরজি।

হাসান মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ-বিষয়ে আর আলোচনা চালাতে তিনি নারাজ।

আমার অস্বস্তি ও অস্থিরতা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে এসেও হাসানের কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। যতই দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি বাড়ছে ততই যেন এক জেদ চেপে বসছে মনের গভীরে, আয়েষার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে।

এক সময় মন স্থির করে উঠে দাঁড়ালাম। তখন রাত কত জানি না, চুপিসারে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে।

অলিন্দে আবছা আলো জ্বলছে। হয়তো রাত বেড়ে ওঠায় এই ব্যবস্থা। ছায়ায়-ছায়ায় লুকিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম প্রাসাদের পেছন দিকে। প্রকাণ্ড অলিন্দ, বিশাল হলঘর, বারান্দা ইত্যাদি পেরিয়ে আসার সময় কেমন যেন গা-ছমছম করতে লাগল। লুকিয়ে চলার পথে যখনই শেখের কোনও ভৃত্য অথবা রক্ষী নজরে পড়ছে তখনই ঘন

অন্ধকারের আড়ালে চকিতে আত্মগোপন করছি। অপেক্ষা করছি রুদ্ধশ্বাসে। তারপর পথ পরিষ্কার হলে আবার এগিয়ে চলি গোপন অভিসারে।

এক সময় পেছনের মাঠে যাওয়ার দরজাটা আমার চোখে পড়ল। দরজা বন্ধ। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ আয়েষাকে উদ্যানে আর পাওয়া যাবে না। প্রাসাদের কোথাও ওকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে-ঘুরতে প্রাসাদের এক অন্দরমহলে পৌঁছে গেলাম। অন্দরমহল অথচ কড়া পাহারার ব্যবস্থা সেখানে নেই। এবং তার গঠনও বড় বিচিত্র। ঠিক যেন কোনও হোটেলের মতো সরু অলিন্দ। অলিন্দের দু-পাশে পরপর ছোট-ছোট ঘর। যেন জায়গা বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসাদের অন্যান্য অংশে যে-বিশাল ঘর-বারান্দা ইত্যাদি দেখেছি, এ-জায়গাটা ঠিক তার উলটোটা।

জানি, আমার অনুসন্ধান হয়তো হাস্যকর, নিছক পাগলামি। অনেকটা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। কিন্তু এক অদ্ভুত জেদ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। আয়েষার মিষ্টি মুখটা বারবার ভেসে উঠছে মনের পরদায়। কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। ফলে প্রত্যেকটা দরজা আমি খুলে দেখতে চেষ্টা করলাম। কোনও দরজা বন্ধ, কোনওটা খোলা। খোলা দরজায় উঁকি মেরে নজরে পড়ল ছিমছাম ঘর। পরিপাটি বিছানা বালিশ। সম্পূর্ণ খালি। ঘরে কেউ নেই।

হতাশ না হয়ে সরু অলিন্দ ধরে এগিয়ে চললাম। একটার পর একটা দরজা খুলে দেখতে চেষ্টা করছি, কিন্তু আয়েষা কোথাও নেই।

শেষপ্রান্তে পৌঁছে অলিন্দ যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। হতাশায় মন ভেঙে পড়তে চাইছে। ঠিক তখনই একটা চাপা গোঙানি আমার কানে এল।

খুব কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে গোঙানিটা আসছে। মনে হল সামনের একটা বন্ধ দরজার পেছন থেকেই। ঝটিতে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। হ্যাঁ, এই দরজাটাই। হাতলটা

ঘুরিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলতেই অ্যান্টিসেপটিক আর ইথারের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। চটপট ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আমি।

ঘরটা আধো অন্ধকার, কিন্তু তবুও ঘরের কোণে রাখা বিছানাটা আমার অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ল। আবার একটা হালকা গোঙানি ভেসে এল বিছানায় দিক থেকে। শব্দটা এখন অনেক জোরে, শোনাল, কারণ এখন আর দরজার আড়াল নেই, দূরত্বও ততটা নয়।

আমি বিছানায় দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। বিছানায় শোয়া মানুষটিকে দেখে চমকে উঠলাম। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল গলার কাছে। এ আমি কী দেখছি!

আয়েষা বিছানায় শুয়ে আছে। ওর দু-চোখ বোজা।

আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। পরক্ষণে আর একটা আর্ত গোঙানি বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে।

আয়েষা!—ওর কপালে হাত রেখে ফিসফিস করে ডেকে উঠলাম আমি। তাপে আমার হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে। কপাল থেকে গালে হাত সরালাম। সেখানেও একই উত্তাপ। আয়েষার জ্বর হয়েছে নাকি।

আয়েষা, চোখ খোলো। আমি হিতেশ। বলেছিলাম না তোমার সঙ্গে দেখা করব দ্যাখো, আমি এসেছি।

ও চোখ খুলল। ওর অপরূপ দৃষ্টি এখন শূন্য। কয়েক মুহূর্ত পরে যেন আমাকে দেখতে পেল। ওর নজর ক্রমে স্পষ্ট হল।

হিতেশ! ওঃ হিতেশ, তুমি কেন এলে?—ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল শুধু! অস্পষ্ট ফিসফিস শব্দগুলো বেরিয়ে এল কোনওরকমে।

মনে হল আয়েষাকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। ওর চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে বারবার। যেন অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে।

আমার ভীষণ অবাক লাগল। কী হয়েছে আয়েষার? ও কি অসুস্থ? ঘরটার মধ্যে কেমন যেন একটা হাসপাতাল-হাসপাতাল ভাব। আমি ওর বিছানার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম।

তোমার কী হয়েছে, আয়েষা?

আয়েষার শরীর হালকা-নীল চাদরে ঢাকা। অথবা আবছা আলোয় চাদরের রঙটা ওরকম মনে হচ্ছিল।

আমি একটা হাত রাখলাম ওর চাদরে ঢাকা বাহুর ওপর। কিন্তু হাত ঠেকল কোমরে। অবাক হয়ে ওর কাঁধের দিকে নিয়ে এলাম আমার অনুসন্ধানী হাত। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা শরীরে। আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। আতঙ্কঘন বরফের আঙুল যেন খেলে বেড়াচ্ছে আমার শিরদাঁড়ার ওপর। একটা অস্ফুট আর্তনাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

আয়েষার কাঁধের কাছে বাহুর কোনও অস্তিত্ব নেই। কাঁধের পর উদ্ধত বুক, পাঁজর, কোমর।

একটানে চাদরটা সরিয়ে দিলাম ওর শরীর থেকে।

স্পর্শের পর চোখে দেখা প্রমাণ পেলাম। আয়েষা এখনও সম্পূর্ণ নগ্ন। কিন্তু ওর যুবতী স্তন বা অন্যান্য দেহসৌষ্ঠব আমার নজর কাড়ল না। প্রচণ্ড অবিশ্বাসে আমি স্থবির হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর কাঁধের দিকে। কাঁধ, গলা ও বুক ঘিরে পুরু ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজে গৌরী স্তনের কিছু অংশও ঢাকা পড়েছে। কিন্তু কাঁধের পাশে বাহুর কোনও অস্তিত্ব নেই।

কাঁধের গা ঘেঁষে ওর অপরূপ হাত দুটো কেটে নেওয়া হয়েছে।

ও..আয়েষা! আমি গভীর শ্বাস ফেলে ডুকরে উঠলাম।

ও ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। মাথা তুলতে চেষ্টা করল। ওই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বুঝতে পারল, আমি সব দেখেছি, জেনেছি।

দুর্বল গলায় বিড়বিড় করে আয়েষা বলল, হিতেশ, তুমি এ-অবস্থায় কেন দেখতে এলে আমাকে? বাবাকে শাস্তি দিতে ওরা আমার হাত কেটে নিয়েছে।

ও ক্লান্ত হয়ে আবার এলিয়ে পড়ল বালিশে। কাঁপা হাতে চাদরটা টেনে দিলাম ওর নগ্ন দেহের ওপর। কিছুক্ষণ বসে রইলাম ওর বিছানায় পাশে। অপলকে চেয়ে দেখতে লাগলাম আয়েষার সুন্দুর ঘুমন্ত মুখ। আমার মনে পড়ল। মোহনের সঙ্গিনী মেয়েটির কথা। সেও বোধহয় আশেপাশে কোনও ঘরে একইরকম বিছানায় শুয়ে আছে।

এক সময় ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেলাম দরজায় কাছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম অলিন্দে। তারপর দরজা টেনে বন্ধ করে দিলাম। ঘেন্না ও হতাশায় আমার শরীরের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে। কিন্তু তার চেয়েও তীব্র হয়ে উঠছে অন্ধ রাগ। কী জঘন্য এই মানুষগুলো। একটা নিরপরাধ মেয়েকে ওরা এরকম পৈশাচিক শাস্তি দিল!

তখন আমার কাণ্ডজ্ঞান বোধহয় লোপ পেয়েছিল, কারণ বিন্দুমাত্রও লুকোনোর চেষ্টা না করে আমি সটান সেই অলিন্দ ধরে ফিরে চলেছি। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, দ্বিতীয় কোনও প্রাণীর সঙ্গে আমার মোলাকাত হল না। মৃত নিস্তব্ধ প্রাসাদ-পুরীতে আমি সম্পূর্ণ একা পথিক।

সামান্য অসুবিধে হলেও ফেরার পথ চিনে নিতে পারলাম। মোহনের ঘরের কাছে এসে দরজায় টোকা মারলাম। একটু পরেই ও দরজা খুলে দিল। গত রাতের সুখশয্যার পর

আজ বোধহয় গভীর ঘুমে ডুবে যেতে পারেনি।

ঘরে ঢুকেই তাড়াহুড়ো করে ওকে সব খুলে বললাম। রাগে উত্তেজনায় আমার কথা জড়িয়ে গেল, তেমন করে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কিন্তু মোহন খান্না মোটামুটি সব বুঝতে পারল।

কথা বলতে বলতে আমার কান্না পেয়ে গেল আয়েষার জন্যে।

শেখের লোকগুলো কি মানুষ, না জানোয়ার! তোমাকে তো প্রথমেই বলেছিলাম, কাহরেইন সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর পেয়েছি তাতে দেশটা সুবিধের নয়।

মোহন আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু ভাবতে দাও।

কিন্তু বুঝতে পারলাম, বাইরে যতই শান্ত ভাব দেখাক না কেন ভেতরে-ভেতরে মোহনও অস্থির হয়ে উঠেছে, আর সেইসঙ্গে ভয়ও পেয়েছে।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে পড়ল রোমিলার কথা।

মোহন! রোমিলাকে যে করে হোক এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আমি যে সব দেখে ফেলেছি এটা যদি শয়তানগুলো টের পায় তাহলে ওরা কী করবে বিশ্বাস নেই।

মোহন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে অত ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু আমার মন মানতে চাইল না। মোহন বারবার বলল, দ্যাখো, আমরা এখানে বিদেশি। আমাদের নিয়ে চট করে কিছু করে উঠতে পারবে না শেখের লোকেরা।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। কারণ রোমিলা আমার ভীষণ প্রিয়।

অবশেষে মোহন খান্না রাজি হল।

দুজনে মিলে ডাকাডাকি করে রোমিলাকে জাগালাম। বললাম, জলদি সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে।

রোমিলার মুখে আতঙ্ক ছায়া ফেলল। ঘুম-ঘুম চোখে তৈরি হয়ে নিতে লাগল ও। তারই মধ্যে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার দাদা?

এখন সময় নেই। পরে সব বুঝিয়ে বলব। আমি ও মোহন প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলাম।

রোমিলার মুখ-চোখ হতবিহ্বল। আমার এবং মোহনের দিকে তাকিয়ে ও বোধহয় বুঝতে পারল সত্যিই ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে আরও দ্রুত ব্যস্ততায় সব গুছিয়ে নিতে লাগল।

মিনিটকয়েক পরেই রোমিলাকে সঙ্গে করে আমরা প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

রোমিলার ব্যবহারের জন্যে যে-গাড়িটা শেখ হারিদ দিয়েছিলেন সেটা কতকগুলো ফুলগাছের পাশে দাঁড় করানো ছিল। রোমিলা গাড়ি চালাতে জানে। সুতরাং মালপত্র পেছনের সিটে চাপিয়ে ওকে চটপট ড্রাইভারের সিটে ঠেলে বসিয়ে দিলাম। তারপর জানলায় মুখ দিয়ে বললাম, শোন রোমু, সমুদ্রের গা ঘেঁষে যে-রাস্তাটা উত্তরে গেছে সেটা ধরে ছ-সাত মাইল গেলেই কাহরেইন-এর বর্ডার পড়বে। তারপর বাসিরায় দশ মাইল ভেতরে ঢুকলেই রাজধানী আনাম। সুতরাং সেখানে পৌঁছতে তোর বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে। তারপর সোজা চলে যাবি ইন্ডিয়াব এমব্যাসিতে। আমাদের কাছ থেকে কোনও খবর না পাওয়া পর্যন্ত সেখানই থাকবি। আমরা দু-একদিনের মধ্যেই তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

রোমিলা অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু এখন তোমরা কী করবে? তা ছাড়া আমি সরে পড়েছি সেটা টের পেলে শেখ কী ঝামেলা বাঁধবেন কে জানে!

আমি জ্বালাধরা গলায় বললাম, আমি কী ঝামেলা বাঁধাই সেটা আগে দ্যাখ! তাছাড়া গোলমানের সময় তুই এখানে থাকিস তা আমি চাই না। অতএব ঝটপট রওনা হয়ে যা। পথে কোথাও গাড়ি থামাবি না।

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোমিলা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল প্রাসাদের সিংহদুয়ার দিয়ে।

আমি আর মোহন চিন্তায় মশগুল হয়ে প্রাসাদে ফিরে এলাম।

ঘরে বসে দুজনে যখন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছি, তখন মোহন বলল, রোমিলা যে চলে গেল সে ব্যাপারে হারিদকে কী বলবে? মনে রেখো, এখনও আমাদের তেলের বৈঠকে কোনও ফয়সালা হয়নি।

আমি রাগে বিরক্তিতে বলে উঠলাম, তেলের বৈঠক গোল্লায় যাক, আমি শুধু ওই বেচারি মেয়েটার কথা ভাবছি। এখন কী হবে ওর?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। রোমিলা রওনা হওয়ার পর প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেছে। এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই বর্ডার পেরিয়ে গেছে। এখন ওর আর বিপদের ভয় নেই। একথা ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে মোহনকে বললাম, আমি আয়েষার কাছে যাচ্ছি। তুমি কি সঙ্গে আসবে, মোহন?

মোহন আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। বুঝল, কোনও কিছুতেই আমি নিরস্ত হব না। তখন সে রাজি হল।

বাইরে বেরিয়ে টিমটিমে অলিন্দ ধরে আমরা রওনা হলাম।

.

রোমিলা কাপুর

দাদার কথায় গাড়ি নিয়ে তো বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল।

গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি জনহীন রাস্তা ধরে। স্টিয়ারিংয়ের ওপরে আমার হাত কাঁপছে। সারা শরীর কাঁপছে। রাতের বাতাসে ঠান্ডা আমেজ গায়ে কাঁটা তুলছে।

বারবার করে ভেবে কোনও অনুমান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না, কী এমন বিপদে পড়েছে দাদারা। তবে এটুকু বুঝলাম, বিপদটা সাঙঘাতিক, নইলে আমাকে এভাবে সাত তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দিত না। আর বিপদের মূলে যে শেখ আবদুল অল হারিদ, সে-ইঙ্গিত তো দাদার কথাতেই পাওয়া গেল।

আমার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল।

হঠাৎই দুটো রাস্তার ক্রসিংয়ে এসে পৌঁছলাম। মনে সামান্য খটকা লাগতেই গাড়ি থামিয়ে দিলাম। দাদা বলেছে, উত্তর দিকের পথ ধরে ছ-সাত মাইল গেলেই কারেই-এর সীমান্তে পৌঁছে যাব। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে বাসিরা। বাসিরা থেকে ইন্ডিয়াব এমব্যাসি। তাহলে সামনের ডানদিকমুখী পথটাই কি বাসিরা যাওয়ার পথ?

মনের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা উঁকি মারতেই শেখ হারিদের দেওয়া রোড-ম্যাপটার কথা মনে পড়ল। ওটা সবসময় আমি কাছে কাছে রাখি, ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে। ঝোলা ব্যাগটা পাশেই সিটের ওপর রাখা ছিল। ওটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে রোডম্যাপটা বার করে নিলাম। একই সঙ্গে আরও একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ইলিয়াসের আজকের–উঁহু, বরং বলা ভালো, কাল সকালে দেওয়া গোলাপগুচ্ছ। সময়ে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে ওদের তাজা জলুস।

ফুলের তোড়াটা নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। গন্ধের মাদকতা যেন বেড়ে গেছে সময়ের তালে-তালে। আমার মনে পড়ল ইলিয়াসের কথা।

ইলিয়াসের কাছে গেলে কেমন হয়?

রোড-ম্যাপ দেখে বাসিরার পথ চিনে যেতে আমার অনেক সময় লাগবে। জানি না, শেখের রক্ষীবাহিনী ইতিমধ্যেই আমার পিছু নিয়েছে কিনা। সুতরাং এই মুহূর্তে আমার হাতে যে-জিনিসটা কম তা হল সময়। বাসিরার পথ চিনে যাওয়ার চেয়ে ইলিয়াসের বাড়িতে পৌঁছনো বোধহয় সহজ। কারণ একবার হলেও সেই পথে আমি গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করেছি।

মন স্থির করতে আর বেশিক্ষণ সময় লাগল না। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। আমার লক্ষ এখন কানাম, ইলিয়াসের বাড়ি।

স্মৃতিকে ঝালিয়ে পথ চিনে এগোতে শুরু করলাম। যদি বা পথ ভুলে যাই তা হলে সঙ্গে রয়েছে রোড-ম্যাপ। কেন জানি না, ইলিয়াসের কথা মনে পড়তেই দুশ্চিন্তার ভার অনেকটা কমে গেল। শুধু একটা জিনিসই খারাপ লাগছিল, এত রাতে গিয়ে ওদের বিব্রত করা। কিন্তু এই সঙ্গিন বিপদে আমি যে নিরুপায়!

আবছা চেনা রাস্তাগুলো দিয়ে ছুটে চলার সময় দাদা আর মোহনদার কথা মনে পড়ল। ওদের কোনও বিপদ হয়নি তো? আমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়ে ওরা পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারল কিনা কে জানে।

ভালো-মন্দ নানান ভাবনা ভাবতে-ভাবতে পথের নিশানা কখন হারিয়ে ফেলেছি জানি না। যখন খেয়াল হল তখন আমি অজানা এক বড় রাস্তায়। শিরা-উপশিরা দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইতে লাগল। মাথার ভেতরে ঝড় উঠল যেন। চিন্তা-স্মৃতি সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। পথের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিশ্রাম নিলাম। তারপর ড্যাশবোর্ডের

আলোর রোড ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম পুরোনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার। ইলিয়াসের বাড়ির রাস্তা যেমন করে হোক চিনে নিতেই হবে আমাকে।

আঘণ্টার চেষ্টায় সফলতা এল। সঠিক রাস্তা খুঁজে পেলাম। তারপর অত্যন্ত সতর্কভাবে ধীরে-ধীরে গাড়ি চালিয়ে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে যেতে লাগলাম। অবশেষে একসময় পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে।

এখন আমার চোখের সামনে ইলিয়াসের বাড়ি। রাতের আলো-আঁধারিতে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে।

আমি গাড়ি থেকে নামতেই নিজেকে কেমন অসহায় মনে হল। এতক্ষণ গাড়ির ভেতরে থাকায় এক ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করছিলাম। এখন সেই আড়াল ছেড়ে নির্জন রাতের দুনিয়ায় পা রাখতেই মনে হল, এক বিরূপ পরিবেশে আমি হাজির হয়েছি। আমার চারপাশে বিপদ। যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি আমি।

আতঙ্ক দ্বিধা ইত্যাদি কাটিয়ে উঠলাম কয়েক পলকেই। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেলাম ইলিয়াসের বাড়ির দরজা লক্ষ করে।

দরজায় পৌঁছতেই বুঝলাম যা আশা করেছিলাম তাই, দরজা বন্ধ!

নিশুতি রাতে দরজা ধাক্কা দিয়ে শোরগোল তুলতে একটু সঙ্কোচ হল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রয়োজন ছাপিয়ে গেল সঙ্কোচকে।

ইলিয়াস! ইলিয়াস! বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠলাম আমি।

কোনও সাড়া নেই। অন্ধকার বাড়িটা গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

ইলিয়াস! ইলিয়াস! আরও জোরে ডেকে উঠলাম আমি। একইসঙ্গে ধাক্কার তীব্রতাও বেড়ে গেল।

সচকিতে চারপাশে তাকালাম। আমাকে অনুসরণ করে কেউ এসে পৌঁছয়নি তো ইলিয়াসের বাড়ির কাছাকাছি? মনে পড়ল, গতকাল আমার আলফা স্পোর্টস অনুসরণ করে এখানে এসে হাজির হয়েছিল আকাশি রঙের ভ্যানটা। ওরা ইলিয়াসের বাড়ি চিনে গেছে। তা হলে...।

কে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। চোখ তুলে দেখি দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। একটা জানলার পরদা সরে গেছে। সেখানে এক পুরুষের সিট। এবং কণ্ঠস্বর ইলিয়াসের।

ইলিয়াস! দরজা খোলো! আমি রোমিলা!–আমার আশঙ্কা কেটে গিয়ে আশ্বাস ভরসা ফিরে এল। চোখে জল এসে গেল আমার। ভাবতে পারিনি পথ চিনে এখানে আমি আসতে পারব, দেখা পাব মহম্মদ ইলিয়াসের।

ছায়ামূর্তিটা দ্রুত জানলা থেকে সরে গেল। তারপর পায়ের শব্দ। অবশেষে সদর দরজা খুলল। আমি ইলিয়াসের দরাজ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বললাম, ইলিয়াস, ভীষণ বিপদ! আমাকে বাঁচাও।

সবল দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল ইলিয়াস। বুঝল আমার শরীর ক্লান্তিতে শিথিল হয়ে এলেও উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে।

কী হয়েছে, রোমিলা?–জানতে চাইল ইলিয়াস। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে বলল, না, থাক। আগে ওপরে চলো, তারপর কথা হবে।

সদর দরজা বন্ধ করে আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ইলিয়াস। তারপর উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম দুজনে।

যে-ঘরে এসে বসলাম, সে-ঘরটা গতকাল দেখিনি। ছিমছামভাবে সাজানো ইলিয়াসের ঘর। মাঝারি আলোয় ঘরটা কেমন এক রহস্যময় চেহারা নিয়েছে। বিছানার চাদর এলোমেলো। ইলিয়াস নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছিল। এখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে। তাতেই মনে হচ্ছে ও আবার কিশোর বয়েসে ফিরে গেছে। এই বিপদের মুহূর্তেও ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে, আদর করতে ইচ্ছে করছে। ও ছাড়া আমার যেন আর কেউ নেই।

আমাকে ধরে বিছানায় বসাল ইলিয়াস। নিজেও বসল। দেখলাম, সামনের একটা কারুকাজ করা টেবিলের ওপর রয়েছে আমার দেওয়া হলুদ ফুলের গুচ্ছ। সযত্নে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে। ইলিয়াস। মনে পড়ল, ওর লাল গোলাপের ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি।

কী হয়েছে রোমিলা? ইলিয়াস নরম স্বরে জানতে চাইল।

আমি যেটুকু জানি ওকে খুলে বললাম, আমার দাদা হিতেশ কাপুর ও তার অফিস কলিগ মোহন খান্না বোধহয় শেখ হারিদের সঙ্গে কোনও বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। কারণ, আমাকে ঘোর রাতে ডেকে ওরা গাড়ি নিয়ে রওনা করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তলে-তলে কী কাণ্ড ওরা করছে। তা জানি না। তবে এটুকু জানি, ওরা অন্যায় কোনও কাজে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়বে না। শেখ হারিদের সঙ্গে বোধহয় ওদের কোনও গোলমাল শুরু হবে। দাদার কথায় সেরকমই মনে হয়েছে।

ইলিয়াস একাগ্রমনে সব শুনতে লাগল।

ওকে আরও বললাম, দাদা আমাকে বাসিরায় যেতে বলেছিল। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়াব এমব্যাসিতে আশ্রয় নিতে বলেছিল। কিন্তু রাতবিরেতে আমি সেখানে পথ চিনে যেতে ভরসা পাইনি। সেইজন্যে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি, ইলিয়াস! আমাকে তুমি বাঁচাও, বাসিরায় পৌঁছে দাও!

ইলিয়াসের চোয়ালের রেখা ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। বুঝতে পারছি, সংশয় ও দ্বিধার কোনও আলোড়ন চলছে ওর বুকের ভেতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইলিয়াস বলল, শেখ হারিদকে তুমি কতটুকু চেনো?

আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ শেখ হারিদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ইলিয়াস যে যথেষ্ট খবর রাখে সেটা আমি দু-দিনের আলাপেই টের পেয়েছি।

ইলিয়াস অনেক অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কেটে কেটে বলল, রোমিলা, তুমি কাল জানতে চেয়েছিলে আমার বোন আলেয়ার কী হয়েছে ও এখন কোথায়। তখন তোমাকে কোনও উত্তর দিতে পারিনি আমি। কিন্তু এখন, নিজের প্রয়োজনেই সে-উত্তর আমাকে দিতে হবে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল ইলিয়াস। হাতে হাত ঘষল। মাথার চুলে আলতো করে হাত বোলাল। অবশেষে ভারী গলায় বলল, আলেয়ার কী হয়েছে তা জানি না, তবে ও কোথায় আছে তা জানি। ও শেখ হারিদের কাছে গত পাঁচ মাস ধরে বন্দি।

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ঘরটা যেন দুলছে। বুকের ভেতরে ভূমিকম্পের তোলপাড় শুরু হয়েছে যেন। আলেয়া শেখ হারিদের কাছে বন্দি! কী অপরাধে?

সেই কথাটাই ইলিয়াসকে জিগ্যেস করলাম। ও ক্লান্ত স্বরে বলল, অন্যায় আলেয়া করেনি, করেছিলাম আমি। কাগজে একটা লেখা লিখেছিলাম শেখ হারিদের শোষণের

বিরুদ্ধে। কাহ্রেইন এর জনসাধারণকে সচেতন করতে চেয়েছিলাম শেখের অন্যায়-অবিচার আর শোষণ সম্পর্কে। চেয়েছিলাম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল ইলিয়াস। ওর ফরসা গাল লাল হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। সামান্য দম নিয়ে ও বলল, সেটাই শেখ জানতে পারেন। কিন্তু আমার গায়ে উনি আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেননি। শুধু থাবা বসিয়েছেন আমার মনে। আলেয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল তার লোকেরা। হারিদের প্রাসাদে কোনও অন্তরালে বন্দি করে রাখল।

কিন্তু এ তো অন্যায়! আমি চিৎকার করে উঠলাম। ইলিয়াসদের নিস্তব্ধ বাড়ি কেঁপে উঠল ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে।

আমার কথায় তেতো হাসি হাসল ইলিয়াস ও অন্যায়! এখানে ন্যায়-অন্যায়ের মালিক তো শেখ হারিদ নিজে। তিনি যা করেন সেটাই আইন, সেটাই ন্যায়! একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেওয়াটা তাঁর শখ, যদিও সেটা আসলে একরকম মানসিক বিকৃতি।

আলেয়ার আর কোনও খোঁজ পাওনি?

না, খোঁজ পাইনি। আর কোনওদিন খোঁজ পাব কিনা জানি না। ইলিয়াস বলল, তা ছাড়া শেখ যে-ধরনের শাস্তি দেন বলে শুনেছি..।

আর কিছু বলল না ইলিয়াস। চুপ করে রইল।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কী বলব, কী বলা উচিত, তা যেন বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। খোলা জানলা দিয়ে দেখছি রাতের আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

একসময় আমি বললাম, আমি এখন কী করব, ইলিয়াস?

ইলিয়াস মুখ নীচু করে বসেছিল, সেই অবস্থাতেই বলল, তোমাকে কোনওরকম সাহায্য আমি করতে পারব না, রোমিলা। কারণ শেখের বিচারে সেটা আর-একটা অন্যায় হবে। আর তখন..তখন...ইলিয়াসের শরীর কেঁপে উঠল। মুখে হাত চাপা দিল ও। বিকৃত স্বরে বলল, তখন ওরা আমার ছোট বোনকে ধরে নিয়ে যাবে, নাজমাকে ধরে নিয়ে যাবে!

হঠাৎই মুখ তুলল ইলিয়াস। দু-হাতে আমার কাঁধ চেপে ধরল। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, রোমিলা–আমার রোমিলা, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু নাজমা যে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি। ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। আমি ছাড়া ওরও তো আর কেউ নেই! পিসির তো দিন ফুরিয়ে এল, কিন্তু নামার জীবন যে সবে শুরু।

আমি ইলিয়াসের সজল চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। নিজের বিপদের অনুভব ইলিয়াসের যন্ত্রণার তরঙ্গে কোথায় ভেসে যেতে লাগল। নাজমা–অপরূপ স্বর্গীয় পুতুল-পুতুল মেয়েটা, ওকে নৃশংস শেখ শাস্তি দেবেন একথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠল।

এমন সময় নিস্তব্ধতা ভেদ করে শুনতে পেলাম গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন। ইলিয়াস বিছানা ছেড়ে উঠল। জানলার কাছে গেল দেখতে।

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। রুমালে চোখ মুছে যখন তাকালাম তখন ইলিয়াস ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর গভীর দুটো চোখে অতল যন্ত্রণার ছায়া।

ওরা এসে গেছে। অস্ফুট স্বরে ইলিয়াস বলল।

আকাশি ভ্যানটা এসে গেছে! আমি জানতাম, ওরা আসবেই।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নাজমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

ইলিয়াস আমার কাছে এগিয়ে এল। ছোট্ট করে বলল, চলো।

ওর সঙ্গে নাজমার ঘরে এলাম। আকাশ আরও ফরসা হয়েছে। জানলা খুলে পরদা সরিয়ে দিল ইলিয়াস। ভোরের পবিত্র আলো এসে পড়েছে বিছানায় ঘুমন্ত নাজুমার মুখে। ওর পাশেই শুয়ে বৃদ্ধা পিসিমা। আমি প্রাণভরে নাজমাকে দেখলাম। ও ভালো হয়ে উঠুক।

একসময় ইলিয়াসকে বললাম, চলো, নীচে যাওয়া যাক।

ইলিয়াস আমাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নামতে লাগলাম।

উঠোনে এসে ইলিয়াস হঠাৎ ডুকরে উঠল। আমাকে জাপটে ধরল দু-হাতে। বলল, না রোমিলা, এ হয় না। চলো, পেছনের দরজা দিয়ে আমরা পালিয়ে যাই!

আমি হাসলাম। ওর মাথার চুল আদর করে ঘেঁটে দিলাম। বললাম, তা হয় না। নাজমাকে আমার ভালোবাসা দিয়ো।

ইলিয়াস আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল আর বলতে লাগল, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, রোমিলা! চিরকাল অপেক্ষা করব! একদিন তুমি ফিরে আসবেই। বলো, আসবে না?

আমি হেসে বললাম, রিপোর্টার, তুমি এত সুন্দুর, তোমার চোখ এত সুন্দর, তোমার মন এত সুন্দর...যেখানেই থাকি, ফিরে আমাকে আসতেই হবে।

তারপর ইলিয়াসের বাঁধন ছাড়িয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আমি।

ভোরের আলোর দেখলাম, আকাশি ভ্যানটা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে, তার দু-পাশে দুজন প্রহরী।

ওদের সঙ্গে ভ্যানে ওঠার আগে গাড়িতে রাখা ঝোলা-ব্যাগ থেকে আমি ইলিয়াসের দেওয়া গোলাপের তোড়াটা নিয়ে নিতে চাই। সেটাই আমার সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরতম প্রেমের একমাত্র স্মৃতি।

.

হিতেশ কাপুর

দ্বিতীয়বার পথ চিনে যেতে কোনও কষ্ট হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আয়েষার ঘরের দরজায় সামনে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে উঁকি মারতেই কারণটা পরিষ্কার হল। হাসান বিছানায় পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, জরিপ নজরে দেখছেন আয়েষার শিথিল দেহ। তার সঙ্গে দুজন সশস্ত্র প্রহরী। সকলেই দরজায় দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে।

নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। ঘৃণাভরা স্বর ছিটকে বেরোল আমার মুখ থেকে ও আপনারা মানুষ না পশু? এ জঘন্য কাজ আপনারা কেন করলেন?

বিদ্যুৎগতিতে হাসান ও তার দুজন অনুচর ঘুরে তাকাল। কিন্তু আমাদের দুজনকে দেখামাত্রই ওদের ভাবভঙ্গি সহজ-স্বাভাবিক হয়ে গেল।

হাসান গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাদের এখানে আসা উচিত হয়নি, মিস্টার কাপুর। কী করে এ-ঘর আপনারা খুঁজে পেলেন?

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, আমার কথার জবাব দিন! দেখুন তো কী অবস্থা করেছেন মেয়েটার!—আঙুল তুলে বিছানায় শোয়া অসহায় মেয়েটিকে দেখালাম।

আপনারা শেখ হারিদের অতিথি, কিন্তু অতিথির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। হাসান ঠান্ডা স্বরে বললেন, ছিঃ, এ বড়ই লজ্জার কথা! যান, এখনই চলে যান।

কিন্তু ইতিমধ্যে মোহন খান্নার জেদ চেপে গেছে, ও বলল, যাব, কিন্তু তার আগে এই জঘন্য অত্যাচারের কারণ জানতে চাই। আপনাকে বলতেই হবে।

হাসান একই রকম গলায় বললেন, আপনাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই, কিন্তু আপনারা যখন এত পীড়াপীড়ি করছেন তখন শুনুন। তবে তারপর কিন্তু চলে যেতে হবে। আয়েষার দিকে মুখ ফিরিয়ে আঙুল তুললেন হাসান : এই মেয়েটির বাবা মাননীয় শেখ হারিদ সম্পর্কে অসম্মানজনক কিছু মন্তব্য করেন তার পত্রিকায়। সুতরাং তাকে উচিত শাস্তি দিতে তার মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে দেশের আরও দশজন নাগরিক সাবধান হবে। শেখের বিরুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা দশবার ভাববে।

কিন্তু এর এ-অবস্থা করলেন কেন?–উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলাম।

হাসান সহজ সুরে বললেন, সবই আল্লার ইচ্ছে। আমাদের শেখ একজন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর বিশ্বাস এসব ব্যাপারে কোনও উপযুক্ত শাস্তি বেছে দেওয়া তাঁর একার পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি মহান আল্লার শরণাপন্ন হয়েছেন। এই মেয়েটিকে রাখা হল পোষা পাখির বাগানে। সঙ্গে রাখা হল আরও অনেক মেয়েকে। তাদের প্রত্যেকের বন্ধু অথবা আত্মীয়, কেউ না কেউ শেখের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করেছে। পোষা পাখিদের অনেকেই অক্ষত অবস্থায় এক বছর পরে ছাড়া পায়। কিন্তু শেখ হারিদের অতিথিরা যাদের বেছে নেয় তাদের শাস্তি পেতে হয়। প্রত্যেক অতিথিকে বলা হয় শয্যাসঙ্গিনী বেছে নিতে। বেছে নেওয়ার পর প্রত্যেককে জিগ্যেস করা হয়। সঙ্গিনীর দেহের কোন অংশ তার চোখে সবচেয়ে সুন্দর। তারপর সেই অঙ্গগুলো অস্ত্রোপ্রচার করে বাদ দেওয়া হয় পাখিদের শরীর থেকে অবশ্য অতিথির সঙ্গে সে রাত কাটানোর পর, আগে নয়। পরে যখন মেয়েটি মোটামুটি সেরে ওঠে তখন তাকে পৌঁছে দেওয়া হয় তার বাড়িতে। সেখানে সে হয়ে থাকে আল্লার ন্যায়বিচারের জীবন্ত প্রমাণ।

একটু থেমে হাসান আবার বললেন, মিস্টার কাপুর, আয়েষাকে আপনিই পছন্দ করে বেছে নিয়েছিলেন, শেখ হারিদ নয়। আর ওর সুন্দর হাতের তারিফ আপনি নিজের মুখেই

করেছেন, যেমন মিস্টার খান্না করেছেন তার সঙ্গিনীর পায়ের তারিফ। অতএব আল্লার বিচারের বাণী আপনাদের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মহামান্য শেখ হারিদকে দয়া করে এর জন্যে দায়ী করবেন না।

আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। চিৎকার করে ফেটে পড়লাম হাসানের ওপর ও নির্লজ্জ শয়তান কোথাকার! তোমরা ওই মেয়েগুলোকে নিয়ে নৃশংস খেলায় মেতেছ আর দায়ী করছ ভগবানকে? এর মাশুল তোমাদের কড়ায় গণ্ডায় গুণতে হবে।

হাসান এবারে সত্যি-সত্যি হাসলেন, নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি। আমার শরীরে যেন আগুন ধরে গেল।

মাননীয় শেখকে আপনাদের অভিযোগের কথা জানানো হবে এবং তাতে যে তেলের চুক্তির বিশেষ সুবিধে হবে তা মনে হয় না। হাসান তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে লাগলেন, ভারতের আর্থিক অবস্থার কথা সারা দুনিয়ার সবাই জানে। তেলের চুক্তি সফল হওয়াটা আপনাদের পক্ষে খুব জরুরি। সুতরাং এখনও যদি সব হম্বিতম্বি ছেড়ে ক্ষমা চেয়ে নেন তা হলে এ-ব্যাপারটা যাতে বেশিদূর না গড়ায় সেদিকে আমি নজর দিলেও দিতে পারি।

লোকটার স্পর্ধা আর নিশ্চিন্ত ভাব আমাকে জ্ঞানহীন ক্ষিপ্ত করে তুলল। সমস্ত ধৈর্য ও সহ্যশক্তির বাঁধন পলকে ছিঁড়ে গেল। চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম একজন সশস্ত্র রক্ষীর ওপর। চোখের নিমেষে তার রিভলভারটা তুলে নিলাম হোলস্টার থেকে। কিন্তু সেটা উঁচিয়ে ধরার আগেই হাসান লাফিয়ে পড়লেন আমার ওপর। রিভলভারটা কবজার জন্যে শুরু হল দুজনের ধস্তাধস্তি।

জড়াজড়ি হুটোপাটির মধ্যে হঠাৎই গুলি ছুটে গেল—গুড়ুম!

এবং একই সঙ্গে হাসানের মুখে বিস্ময়ের স্থির অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তারপর বিস্ময় ধীরে ধীরে পরিণত হল অসহ্য যন্ত্রণায়। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

সর্বনাশ করেছে!—মোহন খান্না আশঙ্কাভরা গলায় বলে উঠল।

আমি ওকে গুলি করতে চাইনি, কিন্তু যাই বলো ছুঁচোটা উচিত শিক্ষা পেয়েছে।

কথা বলতে-বলতেও আমি রিভলভার তাক করে রেখেছি দুই রক্ষীর দিকে। না, আমার মনে কোনও দুঃখ বা অনুশোচনা জাগেনি! বরং বারবার মনে পড়ছিল আয়েষার কথা।

ওর মালিকটাকে শেষ করতে পারলে আরও খুশি হতাম।

আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে।—মোহন বলল!

কিন্তু আয়েষার কী হবে?

আমরা যদি ধরা পড়ি তাহলে ওর কোনও উপকারেই আসব না। শিগগির চলো, তর্ক করার সময় নেই।

ভেবে দেখলাম, মোহনের কথায় যুক্তি আছে। সুতরাং রাজি হলাম। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সেটা বাইরে থেকে লক করে দিলাম। দুই প্রহরী ঘরে বন্দি রইল।

তারপর অলিন্দ ধরে ছুটতে শুরু করেছি দুজনে।

আমাদের কানে আসছিল চিৎকার, কোলাহল, ছুটন্ত পায়ের শব্দ। কারা যেন ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে আসছে আমাদের লক্ষ করে। বাইরে যাওয়ার একটা দরজা খুঁজে পেতেই সেদিকে ছুটে গেলাম। দরজা পার হতেই আমরা চলে এলাম প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বাগান পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম প্রাসাদের ঘেরা পাঁচিলের কাছে। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো নিমেষে পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়লাম বাইরে।

ছায়া আর অন্ধকারের আড়ালে-আড়ালে সরু রাস্তা ধরে উদভ্রান্তের মতো ছুটে চললাম। ঢালু রাস্তা এঁকেবেঁকে নেমে গেছে বন্দরের দিকে। প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসার পর

পেছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ আর শুনতে পেলাম না। ছুটতে ছুটতে একসময় আমরা পৌঁছে গেলাম সাগরের কিনারায়।

জলে ছোট-বড় নানান মাপের নৌকো ভাসছে। সেদিকে তাকিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে মোহন খান্না বলল, নৌকো নিয়ে পালানোই সহজ হবে।

আমারও সেইরকমই মনে হল। সুতরাং একটা ছোট্ট পালতোলা নৌকো বেছে নিয়ে আমরা ভেসে পড়লাম।

জলে খানিকটা এগোতেই সমুদ্রের হাওয়া এসে সাদা পালটা ফুলিয়ে দিল। বাতাস আমাদের ঠেলে নিয়ে চলল উপকূল থেকে সাগরে।

এত সহজে পালাতে পারব ভাবিনি। হয়তো সৌভাগ্য আমাদের সহায় ছিল। ধীরে ধীরে তীরের আলোকবিন্দুগুলো আরও ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল। ক্রমে মিলিয়ে গেল শেখ হারিদের ছায়াময় বিশাল প্রাসাদ। কিন্তু মনে হল, প্রাসাদের কাছাকাছি অনেকগুলো উজ্জ্বল আলোর ফুটকি ব্যস্তভাবে চলেফিরে বেড়াচ্ছে। অনুসন্ধান কি এখনও চালিয়ে যাচ্ছে ওরা?

চারদিক এখন শূন্য, শান্ত। শুধু ছলছল সাগরের জল চাঁদের আলোর চিকচিক করছে।

উত্তর দিকে যাব ঠিক করেছিলাম, তারপর পাড়ে নৌকো ভেড়াব। কিন্তু ওলটপালট বাতাস সব পরিকল্পনা তছনছ করে দিল। বাতাস আমাদের রাতের আঁধারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে—অসহায় ভাবে ছেড়ে দিল থইথই সাগরের অকূল পাথারে।

একদিন একরাত পরে একটা ট্যাঙ্কার আমাদের উদ্ধার করল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, চেহারা সূর্যের খরতাপে ঝলসে গেছে। দরকারি পরিচর্যার পর ট্যাঙ্কারটা আমাদের পৌঁছে দিল আবাদানে।

রোমিলা! রোমিলা! ওর কথা ভেবে-ভেবে আমি শুধু ছটফট করছি। ও ঠিকমতো পৌঁছতে পেরেছে তো ভারতীয় দূতাবাসে?

আবাদান থেকে অবশেষে আমরা যখন বাসিরায় পৌঁছলাম তখন তিন-তিনটে দিন কেটে গেছে। আমরা সোজা চলে গেলাম ভারতীয় দূতাবাসে।

কিন্তু...।

.

ঘটনার পর তিন মাস কেটে গেছে। রোমিলার কোনও খবর পাইনি। বহু চেষ্টা করেছি, বহু লেখালিখি করেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কাহরেইন-এ লোক মারফত খবর নিয়েছি, না, ওই বর্ণনা অনুযায়ী কোনও মেয়েকে কেউ দেখেনি। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব কিছুই করতে বাকি রাখিনি। মোহন খান্নাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, কিন্তু ফলাফল তাতেও শূন্য। আমাদের আদরের ছোট বোনের কোনও হদিস আজও পাইনি।

তাই শুধু ভাবি, এর জন্যে কে দায়ী? নিয়তি, না আমি নিজে?

.

উপসংহার

আকাশি ভ্যান যেখানে এসে থামল সেটা শেখ হারিদের প্রাসাদ।

রোমিলাকে রক্ষীরা ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখল একটা ছোট ঘরে। প্রথমবার প্রাসাদে এসে যে-বিলাসবহুল আপ্যায়ন ও পেয়েছিল এ যেন তার ঠিক বিপরীত।

পরের দিনটা রোমিলার জীবনে এক অতুলনীয় আতঙ্কের দিন।

সকালবেলা শেখ হারিদ এলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আগেকার ভদ্র নম্র ব্যবহারের ছিটেফোঁটাও এখন নেই তার মধ্যে। খুব কর্কশ রুক্ষ ভঙ্গিতে তিনি বললেন, মিস কাপুর, আপনার দাদা অত্যন্ত অন্যায় একটা কাজ করেছেন। যদি তার ভালো চান তাহলে বিনা মতলবে যা বলা হবে অক্ষরে-অক্ষরে শুনবেন। নইলে বিপদে পড়বেন।

শেখ চলে গেলেন। তখন প্রাসাদের ভৃত্যরা এসে রোমিলাকে নিয়ে গেল একটা স্নান ঘরে। ওর পোশাক খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করা হল, তারপর সুবাসিত সাবানে ওকে স্নান করিয়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেওয়া হল ওর নগ্ন দেহে। এবং ওই নগ্ন অবস্থাতেই ওকে নিয়ে যাওয়া হল প্রাসাদের পিছনদিকের এক মনোরম উদ্যানে। সেখানে ওরই মতো জনা কুড়ি নগ্ন রূপসী ঘোরাফেরা করছে। ঠিক যেন উর্বশীদের নন্দনকানন।

দুটোদিন রোমিলার স্বচ্ছন্দে কেটে গেল।

তৃতীয় দিন শেখ হারিদ বাগানে এলেন। সঙ্গে দুজন প্রৌঢ় বিদেশি অতিথি এবং একজন অনুচর। ওঁরা চারজন পায়চারি করতে লাগলেন বাগানের মধ্যে।

অতিথি দুজন রোমিলার সামনে এসে বহুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওর নগ্ন যৌবনসম্পদ।

রোমিলার মুখ লজ্জায় লাল হল।

কিন্তু আরও দুর্ভাগ্য বোধহয় ছিল ওর কপালে।

একটু পরেই ওকে ডাকা হল শেখদের কাছে। ওকে পায়চারি করতে বলা হল তাদের সামনে। সবদিক থেকে পরখ করে দেখা হল ওর দেহসৌষ্ঠব।

অবশেষে মেজাজি গলায় শেখ হারিদ বললেন, আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়, সিনর রোমানি।—শেখ রেমিলার কোমল মসৃণ স্তন স্পর্শ করলেন চঞ্চল আঙুলে? কিন্তু

এবারে দয়া করে বলুন, ওর দেহের কোন অংশটা আপনার চোখে সবচেয়ে আকর্ষণীয়?

হারিদের অতিথি হোঁচট খাওয়া ইংরেজিতে বললেন, ওর সব সুন্দর...তবে আমার মনে হয় এরকম লোভনীয় বুক আমি আগে দেখিনি...।

একটু থামলেন সিনর রোমানি।

আর?–শেখ উৎসাহ দিয়ে জানতে চাইলেন।

আর ওর টানা-টানা চোখদুটোর কোনও জবাব নেই।

বাঘের নখ

বাঘের নখ

০১.

রোহিত রায় আচমকা অনুভব করল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। প্রথমে সে এতটা নিশ্চিত হতে পারেনি। কারণ রফি আহমেদ কিদওয়াই স্ট্রিট থেকে পার্ক স্ট্রিটে মোড় নেওয়ার পর পায়ের শব্দটা আর কানে আসেনি। সামনের দিকে অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেও শিকারী কুকুরের মতো সে সর্বক্ষণ কান খাড়া করে রেখেছে। বিভিন্ন মানুষের পদক্ষেপের বিচ্ছিন্ন শব্দে সেই বিশেষ শব্দটা যেন হারিয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ভাঙা বাড়িটা ছাড়িয়ে পেট্রল পাম্পের কাছে পৌঁছতেই শব্দটা আবার শুনতে পেয়েছে রোহিত। হায়েনার মতো হালকা অথচ তৎপর পায়ের শব্দ। সুতরাং বিশাল ঝুঁকি নিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল সে। শীতের কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যা এবং দূরের নিওন সাইনের আলোয় স্পষ্টভাবে কারও মুখ নজরে পড়ল না।

অফিস ছুটির সময়। তাই পথচারীর সংখ্যাও কিছু বেশি। তার মধ্যে সেই বিশেষ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা রোহিতের পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু শব্দটা পিছনে যেন আঠার মতো লেগে রইল। বিচিত্র এক অনুসরণের ছন্দঃ ডট-ড্যাশ, ডট-ড্যাশ…। যেন চাবি টিপে মর্স কোডে ইংরেজি বর্ণমালার এ অক্ষরটাকে কেউ অবিরামভাবে বাজিয়ে চলেছে।

পার্ক হোটেলের নীচে পৌঁছে ফুটপাতে বসা বইয়ের দোকানের কাছে থমকে দাঁড়াল রোহিত। বিচলিত কালো চোখজোড়া মেলে ধরল সামনের কাচের শো-কেসের দিকে। সেই আয়নায় লক্ষ করে চলল পথচারীদের ঝাপসা মুখগুলো। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকেই নজরে পড়ল না। অবশেষে বই দেখার ভান করে সে যখন আবার চলতে শুরু করল তখন হঠাৎই তার খেয়াল হল, অনুসরণের অদ্ভুত শব্দটা থেমে গেছে। তা হলে কি তাকে থামতে দেখে অনুসরণকারীও থমকে দাঁড়িয়েছে?

রোহিত রায়ের চলার গতি সামান্য দ্রুত হল। একটা শূন্য অনুভূতিতে তার পাকস্থলীটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। সে বুঝল, সে ভয় পেয়েছে। যেমন পেয়েছিল কাশ্মীর সীমান্তে দাঁড়িয়ে সাইরেনের আচমকা বুক কাঁপানো শব্দে। অজস্র গাড়ির হর্নের শব্দ তার কানে দামামা বাজাতে লাগল। এতগুলো তীক্ষ্ণ শব্দের মিলিত স্বননে পা টেনে চলার অদ্ভুত শব্দটা ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে গেল।

চৌরঙ্গী রোডে পড়ে ডান দিকে বাঁক নিল রোহিত। মনে হল, হঠাৎই যেন আলোয় রাজত্ব ছেড়ে আবছা অন্ধকার সীমানায় এসে সে দিয়েছে। ওপারে গান্ধীজির মূর্তির কুয়াশাচ্ছন্ন ফ্যাকাসে আলোয় বৃত্তে ডান্ডি অভিযানের মুহূর্তে কিছুটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত। এ-দিকটায় দোকানপাটের সংখ্যা কম থাকায় রাস্তার আলোগুলোই অন্ধকারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ফুটপাত ধরে চলতে-চলতে রোহিত এবার স্পষ্ট শুনতে পেল পায়ের শব্দটাও—এবং পিছন ফিরে তাকাল।

এখানে পথচারী কম। কিন্তু তার মধ্যেও রোহিতের এমন কাউকে চোখে পড়ল না, যার চলায় কোনও অসঙ্গতি নজরে পড়ছে। অথচ এই পা টেনে চলার ডট-ড্যাশ ছন্দ তাকে যেন ক্রমশ পাগল করে তুলছে।

রোহিতের হাতের চেটো ঘামে ভিজে উঠল। ওর সন্দিহান চোখজোড়া প্রথমে জরিপ করল গোলাপী গাউন পরা জনৈকা বৃদ্ধা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাকে। তার হাতে একটা সাদা ঠোঙা, ধবধবে সাদা চুল, এবং সঙ্গে একটা পিকিনিজ কুকুর। তার একটু পিছনেই

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। হাতে ব্রিফকেস। সম্ভবত অফিস থেকে ফিরছেন। আর যে-দুজনকে রোহিতের চোখে পড়ল, তারা অল্পবয়েসী তরুণ-তরুণী। সাজে আধুনিক, এবং একান্ত-সংলাপে মগ্ন।

এ ছাড়া কাছাকাছি আর কোনও পঞ্চম ব্যক্তি নেই।

রোহিত এবার কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ল। চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। পশ্চিম দিকের খোলা মাঠের হাওয়াকে রুখতে জ্যাকেটের কলার তুলে কান ঢাকতে চাইল। দূরে সারি সারি আলোর ইশারা চোখে পড়ছে : এসপ্ল্যানেড় অঞ্চলের সন্ধের জাঁকজমক। ভয়ার্ত রোহিত যেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল পিছনের অনুসরণকারীর কথা, প্যান্টের ডান পকেটে রাখা অমূল্য চুনিটার কথা...।

সংবিৎ ফিরতেই রোহিত টের পেল তার ডান হাত প্যান্টের পকেটে রাখা চুনিটাকে ঘামে ভেজা মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে। ও জানে, ওর সব আশঙ্কা, আতঙ্কের একমাত্র চাবিকাঠি এই চুনিটা। কী করে এটা রোহিতের হাতে এল সে-ইতিহাস দীর্ঘ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রপেলারের ব্লেডে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া সুখেন বর্মার দলা পাকানো শরীরটা। সে-স্মৃতি বড় নৃশংস, বীভৎস। এই যে গত চারদিন ধরে পুলিশ তার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে, সে শুনতে পাচ্ছে এই অদ্ভুত অনুসরণের ছন্দ—এ সবের কারণ একটাই—এই রক্ত-চুনি-বহ্নিশিখা।

সুতরাং এত সব চিন্তার পর একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো সম্ভব হয় পুলিশ, না হয় ওরা এই মুহূর্তে রোহিতকে অনুসরণ করছে। তা হলে কি পুলিশ তার গতিবিধির সন্ধান পেয়েছে? নাকি ওরা শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করেছে?

ওরা কারা রোহিত জানে না। শুধু জানে ওরা বহ্নিশিখাকে পেতে চায়—তা সে যেভাবেই হোক। দরকার হলে রোহিতকে ওরা স্বর্গের সিঁড়ি দেখাতেও ছাড়বে না।

গত চারদিন ধরে শত অনুসন্ধানী নজর চালিয়েও সন্দেহজনক কাউকে রোহিত খুঁজে পায়নি। শুধু অনুভব করেছে শীতার্ত হাওয়ার শীতল প্রলেপ। এবং ভয় পেয়েছে।

লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে পৌঁছে আর-একবার পিছন ফিরে তাকাল রোহিত। সেই বৃদ্ধা এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোক এখনও তার পিছন-পিছনই আসছেন। হয়তো তারা রোহিতকে চেনেনও না। হয়তো তারা নির্দোষ। কিন্তু রোহিত এখন কোনওরকম ঝুঁকি নিতে পারে না। মর্স কোডের শব্দ তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষের নিঃশ্বাস। তাদের কেমন দেখতে, কী তাদের পরিচয় এসব রোহিতের অজানা হলেও এই পায়ের শব্দ যে তার খুব চেনা।

সুতরাং রোহিত এখন আশ্রয় চাইল। জনারণ্যের আশ্রয়। তাই সে মোড় নিল ডান দিকে। এগিয়ে চলল লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে। কিন্তু হ্যান্ডলুম হাউসের কাছে পৌঁছেই সে বুঝল শত্রুপক্ষকে সে ধোঁকা দিতে পারেনি। কারণ সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সেই পায়ের শব্দও মোড় নিয়েছে তার পিছু পিছু।

চোরাচাউনিতে পিছনে তাকাল রোহিত। আগের দুজনের সঙ্গে তৃতীয় একজন যুবক এখন যোগ দিয়েছে।

এবার আতঙ্কে উদভ্রান্তের মতো হয়ে পড়ল রোহিত রায়। আজ কি তার আর নিস্তার নেই? অন্যান্য দিন আগে তোক পরে তোক ওই পায়ের শব্দকে নানান কায়দায় ঠকাতে পেরেছে। কিন্তু আজ সেই কালান্তক ডট-ড্যাশ শব্দ যেন অমোঘ নিয়তির মতো রোহিতের পিছনে প্রতিটি মুহূর্তে হাজির। কিন্তু যেভাবেই হোক এই পাথরটাকে বাঁচাতেই হবে। পুলিশ যদি তাকে অনুসরণ করে থাকে তা হলে পাথরবিহীন রোহিতকে গ্রেপ্তার করে কোনওরকম কেসই ওরা দাঁড় করাতে পারবে না। আর অনুসরণকারী যদি পুলিশ না হয় এবং রোহিতের বিশ্বাস, পুলিশ নয়—তা হলে বিপদের ধরন আরও ভয়ঙ্কর। ওরা পাথরটাও চায়, সঙ্গে চায় রোহিত রায়কে। কিন্তু মরে গেলেও বহ্নিশিখা ওদের হাতে রোহিত তুলে দেবে না। কিছুতেই না। বহ্নিশিখা শুধু তার। তার একার।

হাতঘড়িতে চোখ রাখল রোহিত। ছটা বাজতে কুড়ি। এই মুহূর্তে কোথায় লুকোনো যায় চুনিটাকে? চকিতে চারপাশে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে পেল রোহিত।

নিউ মার্কেট।

মার্কেটের কোনও স্টেশনারি কিংবা ইমিটেশন গয়নার দোকানে এই চুনির লকেট বসানো হারটা লুকিয়ে ফেলবে সে। তারপর নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে নিউ মার্কেটের জনতার ভিড়ে। পরে, নিশ্চিন্তে, অবসর সময়মতো ফিরে এসে সেই দোকান থেকে দাম দিয়েই কিনে নেবে পাথরটা। পঁচিশ টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নেবে পঁচিশ হাজার টাকার জিনিস।

সুতরাং নিউ মার্কেট লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি পা চালাল রোহিত। এই চেষ্টাই তার শেষ চেষ্টা।

মার্কেটের দরজায় সামনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। কান পেতে শুনতে চাইল মর্স কোডের ছন্দ। কিন্তু না, কোনওরকম বিশেষ শব্দই তার কানে এল না। সম্ভবত চলমান পথচারী ও যানবাহনের কলগুঞ্জনে সেই শব্দ হারিয়ে গেছে।

আর অপেক্ষা না করে আলোয় পরিবেশে পা রাখল রোহিত। সতর্ক অথচ দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

অনুসরণের শব্দ শুনে বিচলিত হয়েছিল রোহিত রায়। এখন সেই শব্দ শুনতে না পেয়ে ত্রাসে উন্মাদ হয়ে উঠল। কে জানে অনুসরণকারী তার ঠিক কতটা পিছনে রয়েছে। দিভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল রোহিত।

ক্রিসমাস আর বেশি দূরে নেই। তা ছাড়া গত কয়েকদিন হঠাৎ করে বৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় বেরোতে পারেনি। এই দুটো কারণেই আজ এমন অমানুষিক ভিড়। এত লোক, এত পায়ের শব্দ কিন্তু এর মধ্যে সেই চেনা পায়ের শব্দ কই?

হঠাৎই রোহিতের মনে হল, অনুসরণকারীকে সে হয়তো ঠকাতে পেরেছে। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ভিড়ের মাঝে ভাসতে ভাসতে সে এগিয়ে চলল একটা ইমিটেশন গয়নার দোকানের দিকে।

নাথানি রোল্ড-গোল্ড এম্পোরিয়াম।

ভেতরে ঢুকল রোহিত।

চূড়ান্ত ভিড়ের মাঝে সুবেশা যুবতীদের সংখ্যাই বেশি। অন্যসময় হলে রোহিতের মনোযোগের অনেকটাই খরচ হত দোকানের সুন্দরীদের জন্য, কিন্তু এই সংকটকালে হৃদয়ের তুলনায় মাথা বেশি কাজ করছিল।

সুতরাং দোকানের একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল সে। আড়চোখের সতর্ক নজর দোকানের সদরের দিকে। কানের মনোযোগও একই দিকে যদি চোখ ও কানের যুগলবন্দিতে অনুসরণকারীকে চিনতে পারে রোহিত।

হঠাৎ সেই পথে-দেখা যুবক ভিড় ঠেলে ঢুকল দোকানে। দু-চোখে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

তাকে চিনতে পারল রোহিত এবং বুঝল সে রোহিতের অনুসরণকারী নয়, তার পায়ে নেই মর্স কোডের ছন্দ। কিন্তু সাবধানের মার নেই। তাই সকলের অমনোযোগের সুযোগে পকেট থেকে চুনি বসানো বিচেহারটা বের করে এনেছে রোহিত।

একটা সরু চেনের ঠিক মাঝখানে মাঝারি নুড়ির মাপের একটা রক্ত-লাল চুনি।

পাথরটা একপলক দেখে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেলল রোহিত। তারপর তাকাল সামনের সেল্‌সম্যানের দিকে। তার ঠিক পিছনে এবং পাশে হুকের গায়ে ঝুলছে রাশি-রাশি ঝুটো পাথরের মালা।

মনে-মনে হাসল রোহিত। সরাসরি তাকাল সেল্‌সম্যানের চোখে।

ইয়েস? সৌম্য হেসে রোহিতকে আপ্যায়ন করল সেল্সম্যান।

একটা পাথরের লকেট বসানো মালা কিনতে চাই—দেখাবেন?

উইথ প্লেশার।

হুক থেকে একের পর এক মালা নেমে আসতে লাগল ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক লাগানো কাউন্টারে। ক্ষিপ্র হাতে মালা বাছতে শুরু করল রোহিত। এবং তারই ফাঁকে নিজের হাতের মালাটাকে অন্যান্য মালার ভিড়ে লুকিয়ে ফেলল।

কেনাকাটায় দোকানের ক্রেতাও বিক্রেতা সকলেই ব্যস্ত। সুতরাং এই সামান্য ব্যাপারটা কারও নজরে পড়ল না।

একটু পরেই অস্পষ্ট গলায় মনের মতো হচ্ছে না—থ্যাংক্স ইউ। বলে কাউন্টার থেকে সরে এল রোহিত। বেরোনোর মুখে ফিরে তাকিয়ে দেখল, সেল্সম্যানটি মালাগুলো আবার হুকে সাজিয়ে রাখছে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রোহিতের বুক ঠেলে। বহ্নিশিখা এখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। নাথানি এম্পোরিয়াম যদি ক্রিসমাস সেলের জন্য আটটার জায়গায় রাত দশটাতেও বন্ধ হয়, তা হলেও এই কয়েক ঘণ্টা সময়ে কেউ যে এসে বহ্নিশিখাকে ঝুটো পাথরের দাম দিয়ে কিনে নেবে, সে-সম্ভাবনা কম। সামান্য এই ঝুঁকিটুকু রোহিতকে নিতেই হবে। কাল সকাল দশটায় দোকান খোলার সময়ে সে আসবে, ফিরিয়ে নেবে তার বহ্নিশিখাকে।

হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে দোকানের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বাইরে এল রোহিত। ভিড়ের মধ্যে সেই যুবক তখনও চঞ্চল চোখে বোধহয় তাকেই খুঁজছে।

নিউ মার্কেটের বাইরে এসে দাঁড়াল রোহিত। এই মুহূর্তে পায়ের শব্দ শোনার জন্যে সে মনোযোগ দিল না। কারণ অসংখ্য গাড়ির তীব্র হর্নের শব্দ সেই পায়ের শব্দকে ঢাকা দিয়েছে। একপলক থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হতে লাগল রোহিত। সতর্ক চোখ দু-পাশের গাড়ির দিকে।

রাস্তা পার হয়ে সে এগিয়ে চলল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে।

এ-দিকটার তুলনায় সেখানে আলোর রোশনাই অনেক কম চোখে পড়ছে। অন্ধকার ও তার অনুসঙ্গী কুয়াশা ধীরে-ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। শীতের ঠান্ডা আমেজটাও যেন তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠছে। দূরের আলোর সারির দিকে একপলক দেখল রোহিত, পায়ের গতি দ্রুত করল।

সেই মুহূর্তে খুব চেনা মর্স কোডের ছন্দটা আবার তার কানে এসে বাজল।

বহ্নিশিখাকে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকোতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল রোহিত। এমনও ভেবেছিল, অনুসরণকারীকে সে ধোঁকা দিতে পেরেছে। কিন্তু পারেনি। ওরা এখনও রোহিতের পিছু ছাড়েনি। কিন্তু ওরা হয়তো জানে না বহ্নিশিখা এখন তার কাছে নেই। মনে-মনে আরও একবার হাসল রোহিত। এসে থামল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মুখে। কিছুক্ষণ আগের উজ্জ্বল পরিবেশের তুলনায় এ-জায়গাটা বড় বেশি অন্ধকার হলেও গাড়ি চলাচলের কমতি নেই। সার বেঁধে ঝকমকে গাড়িগুলো পিচের কালো রাস্তায় পিছলে যাচ্ছে।

গাড়ি চলাচল একটু ফিকে হলেই সে রাস্তা পার হবে, ভাবল রোহিত। কয়েকটা মুহূর্ত সুখ-স্বপ্নে মগ্ন হয়ে রইল সে। কিন্তু স্বপ্নের ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই জীবনে শেষবারের মতো চমকে উঠল রোহিত রায়।

আঘাতটা এল তার পিছন থেকেই। ঠিক ঘাড় ও পিঠের ওপর—একইসঙ্গে। প্রচণ্ড আঘাতে সামনের রাস্তার দিকে ছিটকে পড়ল রোহিত। তার চোখের সামনে গোটা সড়কটা

বনবন করে ঘুরে উঠল–ঠিক প্রপেলারের ব্লেডের মতো। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই তার চোখের সামনে চলে এল একটা বিশাল কালো শেভ্রলে গাড়ি। দুরন্ত গতি নিয়ে গাড়িটা ছুটে এল টলায়মান রোহিতের শরীর লক্ষ করে। আতঙ্কবিকৃত রোহিতের মুখে পলকের জন্য ফুটে উঠল বিস্ময়। এই ঘটনা–অথবা দুর্ঘটনা–যে তার জীবনে সত্যিসত্যিই ঘটতে চলেছে, সম্ভবত সেই কথা ভেবেই।

জীবনে আর্ত চিৎকার শব্দের ঠিকঠাক মানে রোহিত কোনওদিনই বুঝতে পারেনি। কিন্তু এই-অন্তিম মুহূর্তে তার বুক চিরে বেরিয়ে এল এক বিকট বীভৎস আর্ত চিৎকার। সে-চিৎকার প্রতিধ্বনিত হল রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো বাড়িগুলোর জীর্ণ দেওয়ালে। সে-চিৎকারের তীক্ষ্মতায় বুঝি কেঁপে উঠল রাতের শীতার্ত কুয়াশা।

আশ্চর্যের কথা, রোহিতের অন্তিম চিন্তায় বহ্নিশিখার ছায়া পড়ল না। রোহিতের মনে পড়ল তার তিন বছরের ছোট ছেলে সুমনের কথা। রোহিত স্পষ্ট দেখল, শেষবারের মতো, সুমন ললিপপ খাচ্ছে।

.

০২.

আধুনিক প্রসাধনের কিছু জিনিসপত্র আর টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করতে নিউ মার্কেটে এসেছিল সারিকা।

এখানে এলে কেনাকাটায় চেয়ে ঘুরে-ফিরে দেখাটাই হয়ে যায় বেশি। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হেয়ার স্প্রে, ফাউন্ডেশন, কোল্ড ক্রিম, ম্যাক্স ফ্যাক্টর, মাসকারা, আর ছোটখাটো কয়েকটা জিনিসে সারিকার পলিথিন ব্যাগ তখন ভরতি, ওর নজরে পড়ল নাথানি রোল্ড-গোল্ড এম্পোরিয়ামের ক্রিসমাস-আলোকসজ্জা। প্রয়োজনের শেষে উদ্দেশ্যহীন পথ চলা মানেই বাড়তি খরচ–অন্তত নিউ মার্কেটে। এখনও তাই হল। পলিথিন ব্যাগকে সযত্নে আঁকড়ে ধরে দোকানে। ঢুকেই পড়ল সারিকা।

আজ চেনা কাউকে ওর নজরে পড়েনি। পড়লে হয়তো গল্পে মশগুল হয়ে উদ্দেশ্যহীন অলস ভ্রমণের হাত থেকে রেহাই পেত। এই তো, গত সপ্তাহেই নিশীথের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গিয়েছিল।

নিশীথ সান্যাল। নামটা অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে সেতারের মূছনার কোনও সম্পর্ক আছে কি? ছমাস আগেও তো এমন ছিল না। আপনমনেই হাসল সারিকা। কীভাবে দিন কেটে যায়, আশ্চর্য।

নাথানি এম্পোরিয়ামে অসম্ভব ভিড়। কানে আসছে কলগুঞ্জনের শব্দ। অপছন্দের এই দুটো কারণ থাকা সত্ত্বেও সারিকার আকর্ষণ কমেনি। রূপসী দোকান ওর ভালো লাগে।

ভিড়ের স্রোতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অনেকটা ভেতরে পৌঁছে গেল সারিকা। তখনই ওর চোখ পড়ল দেওয়ালের গায়ে হুকে ঝোলানো লকেটগুলোর ওপর।

কাউন্টারে দাঁড়ানো সেল্সম্যানের মনোযোগ সারিকার ওপর পড়ল। প্রশ্ন করল সে, ইয়েস, মিস?

না, এমনি দেখছি। একটু বিব্রত হল সারিকা।

উত্তরে হাসল সে : উইথ প্লেশার।

সারিকা ছোট্ট হাসিতে জবাব দিল।

ওর চোখ খেলে বেড়াতে লাগল লকেট থেকে লকেটে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চরম সর্বনাশটা ঘটে গেল। ওর নজরে পড়ল আগুন-রং চুনিটা।

পাথরটা হারের সারিতে বেমানান এবং অত্যন্ত খাপছাড়া। দেখে আকাটা বলেই মনে হয়। সঙ্গের সোনালি চেনটা দু-পাশ থেকে এসে দুটো সাপের মাথার মাঝখানে আঁকড়ে ধরেছে পাথরটা। আকাটা হলেও তার জেল্লা কম নয়। বড় বেশি করে চোখ টানে।

সম্মোহিতের মতো নিজের সর্বনাশকে হাতে তুলে নেওয়ার তীব্র ইচ্ছে হল সারিকার। ওর অনুরোধে সেল্‌সম্যানটি লকেটটা তুলে দিল ওর হাতে।

রক্তাভ শীতল তার দীপ্তি।

পাথরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎই ওর চোখ পড়ল দোকানের দরজার দিকে। ভিড়ের মাঝে ভাসমান একটা মুখের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। চেনা মুখ। নিশীথের মুখ। সুতরাং সম্মোহনের অতল সাগর থেকে ভেসে উঠল সারিকা। পরিচয়ের হাসি হাসল। আজও তা হলে দেখা হয়ে গেল নিশীথের সঙ্গে।

সারিকার ভালো লাগল।

মাত্র এক মাস হল ও দিল্লি থেকে আবার কলকাতায় এসেছে। কলকাতায় ভবানীপুরে ওর পিসিমারা থাকেন। পিসিমা, পিসেমশাই আর ওঁদের একমাত্র ছেলে সম্রাট। ওঁদের ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটেই থাকে নিশীথ-নিশীথ সান্যাল।

সারিকা যখনই কলকাতায় আসে তখনই নিশীথের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। ওর সঙ্গে সারিকার পরিচয় প্রায় বছরখানেকের। তবে সে-পরিচয় নেহাতই সাধারণ ছিল। কিন্তু এবারে কেন যেন সারিকার মনটা বদলে যাচ্ছে, বদলে গেছে।

কলকাতায় বেড়াতে এসে শহরটার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করেছে সারিকা। আগের চেয়ে আরও জমকালো হয়েছে কলকাতা। ভিড়ও বেড়েছে।

বাবা মারা যাওয়ার পর, বছর চারেক হল, ও মাকে সঙ্গে করে চলে গেছে দিল্লিতে। সেখানে ওর মামারা থাকেন। ছোটমামা আর বড়মামা। তাঁদের পরিবারে একসঙ্গে থেকে ও বি. এসসি, পাশ করেছে দিল্লি ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর, রীতি অনুযায়ী, সারিকাকে পাত্রস্থ করতে তৎপর হয়েছেন মা এবং মামারা। সারিকা নীরবে মত দিলেও প্রয়োজনের বেশি উৎসাহ দেখায়নি। তারপর পেল পিসেমশাইয়ের চিঠি ও

অনেক দিন তোদের দেখি না। তোর মাকে নিয়ে বেড়াতে চলে আয়। তোর পিসিমার শরীর বিশেষ ভালো নেই। তোদের কাছে পেলে খুশি হবে।

সুতরাং মাকে নিয়ে সাময়িকভাবে কলকাতায় এসেছে সারিকা।

নিশীথের সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়েছিল অদ্ভুতভাবে।

পাতিল ম্যানসনের ছতলায় তিন-বেডরুমের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন পিসিমারা। আর সাততলায় নিশীথ। একদিন মাকে নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছিল সারিকা। সন্ধে নাগাদ ফিরে এসে একতলার লিফটে যখন উঠল, তখন দেখল ওঁদের সহযাত্রী পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবক। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, সরু গোঁফ। ঠোঁট দুটো যেন কম কথা বলব প্রতিজ্ঞায় অবিচল। চশমার কাচের পিছনে কালো চোখের তারা ভীষণ অস্থির।

ক'তলায় যাবেন?

ছ'তলায়। যুবকের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিয়েছিল সারিকা।

অটোমেটিক এলিভেটর। বোতাম টিপতেই নিঃশব্দে ওপরে উঠতে শুরু করেছে যন্ত্রযান। সারিকার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে না তো লিফটটা! ওর মুখে সম্ভবত আশঙ্কার ছাপ ফুটে থাকবে, কারণ হঠাৎ সামান্য হেসে স্পষ্ট স্বরে যুবকটি বলে উঠল, মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, যন্ত্র করে না।

লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়েছিল সারিকা। ছতলায় লিফট থামতেই তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। লিফটের দরজা তখন আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

সেই প্রথম।

তারপর থেকে যখনই কলকাতায় আসে যাওয়া-আসার পথে নিশীথের সঙ্গে ইতস্তত কথাবার্তা হয়। এরই নাম কি গভীরতর আলাপ? তখন সারিকা জেনেছে নিশীথ মডার্ন

মেশিন টুস-এর সেলস অ্যান্ড সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। সাততলায় মাসতুতো দাদা-বউদির সঙ্গে থাকে। তবে এবারে ওঁরা শান্তিনিকেতনে নিশীথের নিজের দিদির বাড়ি বেড়াতে যাওয়ায় নিশীথ একাই আছে। রান্নাবান্নার জন্য রয়েছে শুধু একজন ঠিকে কাজের লোক।

নিশীথ সম্পর্কে এই প্রথম সারিকার একটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। নিশীথের দিকে ও আগের মতো আর সরাসরি তাকাতে পারে না। কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। কিন্তু তবুও নিশীথের সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগে। নিশীথ ওর সম্পর্কে কী ভাবে তা ও স্পষ্ট জানে না, তবে...।

সারিকার পরিচয়ের হাসির উত্তরে কয়েক মুহূর্ত নির্বিকার রইল যুবকটির মুখ। তারপর বিব্রতভাবে একটা আধো-হাসি ছুঁড়ে দিল সে।

আরে, নিশীথবাবু, আপনি! বিস্ময় মেশানো খুশিতে বলে উঠল সারিকা, দেখলেন তো, আবার কেমন এখানে দেখা হয়ে গেল!

হতভম্ব যুবকের মুখমন্ডলে কয়েক সেকেন্ড ধরে অভিব্যক্তির খেলা চলল। তারপর হঠাৎই দিলখোলা হাসল সে।

আপনাকে দেখেই তো ঢুকে পড়লাম। ভিড় ঠেলে সারিকার কাছে এগিয়ে এল নিশীথ। চুনিটার দিকে চোখ পড়তেই ও থমকাল।

নিশীথের কথায় খুব অবাক হয়েছে সারিকা। নিশীথ ওকে তুমি বলে। তা হলে আজ হঠাৎ এ আপনির দূরত্ব কেন! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না তো? ভাবল ও।

নিশীথের নজর অনুসরণ করে হাতের মালাটার দিকে চোখ নামাল সারিকা। প্রশ্ন করল, পছন্দ হয়?

অপূর্ব! প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত নিশীথ। হয়তো প্রয়োজনের বেশিই উচ্ছ্বসিত।

পাথরটার প্রশংসা করতেই হয়, বলল সারিকা, তবে এই সরু চেনের সঙ্গে এটা বড় বেমানান।

আপাতত বেমানান লাগছে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। দারুণ মানাবে আপনার গলায় চোখ বুজে কিনে ফেলুন। এ-সুযোগ ছাড়বেন না।

এবার অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল সারিকা। এ তো ঠাট্টা নয়! যে নিশীথ ওর সঙ্গে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে বেশ কিছুদিন, আজ হঠাৎ কোন আজব কারণে ওর তুমি থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে আপনিতে প্রত্যাবর্তন!

সারিকার বিস্ময় নিশীথের নজরে পড়ল। অস্বস্তিভরে ও প্রশ্ন করল, কী হল?

না, কিছু না।

দোকানের বাইরে বেরিয়েই প্রশ্নটা নিশীথকে করা যাবে। এখন এই ভিড়ের মাঝে নয়। ভাবল সারিকা। তারপর সামনে দাঁড়ানো সেল্সম্যানকে জিগ্যেস করল মালাটার দাম। সে জানাল, ওই সারির সব মালার দামই পঁচিশ টাকা।

পলিথিনের ব্যাগটা নিশীথের হাতে তুলে দিতে গেল সারিকা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল ও পকেট থেকে টাকা বের করছে বোধহয় পাথরের লকেটটার দাম দেওয়ার জন্যে।

এ কী, আপনি দাম দিচ্ছেন কেন! সারিকার স্বরে কিছুটা তিরস্কার লুকিয়ে ছিল।

থতমত খেয়ে গেল নিশীথ। পকেট হাতড়ানো ছেড়ে এগিয়ে দেওয়া পলিথিনের ব্যাগটা হাতে নিল।

সন্দেহ আর বিস্ময়ের কাঁটা মনে চেপে রেখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট সেলসম্যানটির হাতে দিল সারিকা। সে টাকা ও মালাটা নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে চলে গেল।

মালাটা আমার কেনার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না। ভাবল সারিকা, শুধু নিশীথের আগ্রহের জন্যেই–ওকে খুশি করার জন্যেই আমি লকেটটা কিনে ফেললাম।

সেল্‌সম্যান আবার ফিরে আসায় ওর চিন্তায় বাধা পড়ল।

হিয়ার ইট ইজ, মিস। ক্যাশমেমো, ফেরত টাকা ও একটা সুদৃশ্য বাক্স সারিকার দিকে এগিয়ে দিল সে। নিশীথের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ একটু হাসল, বলল, আবার আসবেন।

ওরা দুজনে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। সামনের রাস্তায় শ্লথগতি গাড়ির সার। তারপরেই কার পার্ক। ক্রিসমাসের সময় বলেই হকারের সংখ্যা অনেক বেশি। কারও হাতে কাগজের ফুল, কারও হাতে বাঁশের ঝুড়ি। সব মিলিয়ে ব্যস্ত পরিবেশ। ক্রিসমাসটা ক্রমে বাঙালিদের উৎসবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবল সারিকা। পাশ ফিরে নিশীথের মুখের দিকে দেখল ও।

এত কাছ থেকে এত খুঁটিয়ে নিশীথকে আগে কি কখনও ও দেখেছে? সরু ফ্রেমের চশমা, সরু গোঁফ, ফরসা বাঁ-গালে একটা ছোট আঁচিল। সত্যিই আশ্চর্য! একটা লোককে খুঁটিয়ে দেখা আর এমনি রোজ দেখার মধ্যে কত না পার্থক্য!

লজ্জা পেয়ে হাসল সারিকা। কিন্তু পরমুহূর্তেই আসল প্রশ্নটা মনে উঁকি মারতেই ও বলে বসল, নিশীথবাবু, আমাদের এতদিনের আলাপ, অথচ আপনি আজ আমাকে হঠাৎ আপনি করে কথা বলছেন কেন?

অ্যাঁ? হ্যাঁ–মানে এমনি, অপ্রস্তুতের চূড়ান্ত নিশীথ : হঠাৎ কী খেয়াল হল, তাই– তুমি রাগ করোনি তো, সু?

সু মানে! নতুন সম্বোধন শুনে সারিকা হতবাক।

কেন, ছোট্ট এই নামটা অপছন্দ? হেসে জিগ্যেস করল নিশীথ, তুমি রেগে গেলে নাকি?

না, রাগ করব কেন! সারিকার বিস্ময় তখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। সরল হাসল নিশীথ। ওর কথায় অন্তরঙ্গতার সুর হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে পড়ল।

পাশাপাশি হেঁটে রাস্তা পার হল ওরা।

ঠিক সেই সময়েই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিক থেকে লোকজনের চিৎকার আর গোলমালের শব্দ ওদের কানে ভেসে এল।

নিশীথ তাকিয়ে দেখল এফ. সি. আই. অফিসের সামনে এক বিরাট জটলা। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে-মধ্যে হেলমেট পরা ট্রাফিক পুলিশের মাথা উঁকি মারছে।

সারিকা চিরকালই গন্ডগোল এড়িয়ে চলতে ভালোবাসে। জনকোলাহল ওর দু-চক্ষের বিষ, কিন্তু আগ্রহ দেখাল নিশীথই। বলল, চলো, দেখা যাক কী হল।

সারিকা নীরবে নিশীথকে অনুসরণ করল।

ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে সারিকাকে এক পাশে দাঁড়াতে বলল নিশীথ।

তুমি এখানে দাঁড়াও। এখানে একটা বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সে-দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না।

ওকে রেখে ভিড় ঠেলে ঢুকে গেল নিশীথ। কোনওরকমে অকুস্থলে উঁকি মারল।

চামড়ার জ্যাকেট পরা একটা মানুষের দেহ তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। নিঃসন্দেহে মারা গেছে। লোকটিকে শনাক্ত করার তেমন কোনও উপায় আর নেই। ভাঙাচোরা মুখটা রক্তে ভেজা।

নিশীথের মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। এ-জ্যাকেট ওর অনেক চেনা। এই বিধ্বস্ত অবস্থাতেও মরা মানুষটাকে ও বোধহয় চিনতে পারছে। কী করে মারা গেল লোকটা? তা হলে কি...?

মনে হয় মাল টেনে রাস্তা পার হচ্ছিল। জনৈক দর্শক মন্তব্য করল।

কে জানে, কেউ হয়তো পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। কারণ ভদ্রলোককে আমি এই লাইট পোস্টটার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। বক্তা জনৈক কাঁচা পাকা চুল প্রৌঢ়।

গাড়িটা চাপা দিয়ে এস. এন. ব্যানার্জি রোডের দিকে পালিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, একটা কালো রঙের শেভ্রলে গাড়ি।

ভিড় সরিয়ে বাইরে এল নিশীথ। পা দুটো কেমন অসম্ভব ভারি ঠেকছে। ওর চোখে পড়ল, সামনেই একটা পানের দোকানের সামনে গোলাপী গাউন পরা একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটা সাদা ঠোঙা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, সঙ্গে একটা পিকিনিজ কুকুর। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাশে দাঁড়ানো এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছেন। ভদ্রলোকের চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, হাতে ব্রিফকেস।

সারিকার পাশে এসে দাঁড়াল নিশীথ। বলল, চলো, ওখানে একটা লোক গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।

গাড়িটাকে পুলিশ ধরতে পারেনি? জানতে চাইল সারিকা।

না, সু, পালিয়ে গেছে। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল নিশীথ।

নিশীথকে আজ যেন ভীষণ অচেনা লাগছে। ভাবল সারিকা। অবশ্য নিশীথকে ও কখনও ওর মনের কথা বুঝতে দেয়নি। আসা-যাওয়ার পথে ওর সঙ্গে দেখা হলে নিশীথ

যেসব কথা বলে তা নিতান্তই মামুলি। তার মধ্যে কোনওরকম দুর্বলতা কখনও সারিকা টের পায়নি। কিন্তু নিশীথ কি সারিকার মনের কথা আঁচ করতে পারে না? এতই সরল ও! তা হলে ওকে আজ হঠাৎ ছোট্ট নতুন নামে ডাকছে কেন?

লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে ওরা চৌরঙ্গী রোডের দিকে এগোতে শুরু করল। ওদের পাশ কাটিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একটা নীল রঙের পুলিশ-ভ্যান ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে ছুটে গেল।

হটাৎই সারিকা প্রশ্ন করল, বাড়ি ফিরবেন তো?

এ-প্রশ্নের উত্তর থেকেই নিশীথের মনের আসল ইচ্ছেটা জানা যাবে। বোঝা যাবে সারিকার সঙ্গ ওর ভালো লাগছে কি না। সারিকার মুখে কিশোরীর আগ্রহ কি ও খুঁজে পাচ্ছে না? লাজুক ছেলেদের নিয়ে এই এক মুশকিল! মনে-মনে হাসল সারিকা। নাকি ও নিজেই বড় বাড়াবাড়ি করছে?

বাড়ি? ভীষণভাবে চমকে উঠল নিশীথ। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বাড়ি কেন? চলো, কোথাও একটু বসা যাক। একটু চা-টা খাওয়া যাক। একটু থেমে তারপর ও আপত্তি নেই তো?

চলুন– বেশি আগ্রহ দেখানোটা ঠিক হবে না। নিশীথের কাছ থেকে এ ধরনের আমন্ত্রণ এই প্রথম। মনের খুশিকে অতি কষ্টে চেপে রাখল সারিকা।

গ্লোব, দেজ মেডিকেল পার হয়ে বাদশায় পৌঁছোল ওরা।

ভেতরে ম্লান আলোর খেলা। ফ্রাই ও রোলের সুগন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারছে।

দু-পাশের কাচের দেওয়ালের মাঝে সরু প্যাসেজে পা রাখল নিশীথ। সারিকা ওকে অনুসরণ করল।

একটা চারজনের টেবিল সৌভাগ্যবশত খালি পাওয়া গেল। ওরা বসল।

সারিকা নিশীথকে লক্ষ করতে লাগল।

নিশীথের গায়ে ফুলহাতা হলুদ সোয়েটার। তার ওপরে কালো কাজ করা।

এই সোয়েটারটা আগে কখনও ওকে পরতে দেখিনি। ভাবল সারিকা, ওকে যেন বড় বেশি অস্থির মনে হচ্ছে।

হাতের পলিথিন ব্যাগটা নিশীথ টেবিলের এক পাশে নামিয়ে রাখল। দেখাদেখি সারিকাও লকেটের বাক্সটা তার পাশে রাখল। এমন সময় বেয়ারা এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল। খাবারের অর্ডার দিল নিশীথ। অবশ্য দেওয়ার আগে সারিকার পছন্দ জেনে নিতে ভুলল না। চিকেন রোল আর কফি।

দুজনেই চুপচাপ। যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে। হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নিশীথ। বলল, এক মিনিট, সু, আমি এক্ষুনি আসছি।

সারিকার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল সারিকা।

মিনিটপাঁচেক কেটে গেল, নিশীথের ফিরে আসার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মালার বাক্সটা খুলল সারিকা। ভেতর থেকে বের করল লাল পাথর বসানো হারটা।

এই অল্প আলোতেও পাথরটা হায়নার চোখের মতো ধকধক করে জ্বলছে। এরপর সব মেয়েই যেটা করত সেই কাজই করে বসল সারিকা। মালাটা গলায় পরল। আর ওর গলার সাদা পুঁতির হারটা খুলে ভরে রাখল বাক্সে। নিশীথ এলে জিগ্যেস করবে ওকে কেমন মানিয়েছে।

সারিকার পরনে সবুজ প্রিন্টের শাড়ি, তার ওপর কালচে ফারের কোট। দিল্লিতে যাওয়ার পর বড়মামা কিনে দিয়েছিলেন। কলকাতার শীতে হয়তো সামান্য বাহুল্য।

কোটটা পরতেই জ্বলন্ত লাল পাথরটা হারিয়ে গেল ওর ফারের কলারের আড়ালে। বুকের কাছে পাথরটার ঠান্ডা পরশ অনুভব করল ও। আর বুকের ভেতরে নিশীথের জন্য চিন্তা।

বসতে পারি?

কানের কাছে আচমকা সম্বোধনে চমকে উঠল সারিকা। চোখ ফেরাতেই দেখল ওর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একজন বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ পুরুষ। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা। পরনে ফুলহাতা শার্ট, কালো সোয়েটার, গরম প্যান্ট। চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকম ছোট। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। মুখে এক অদ্ভুত সবজান্তা হাসি।

সারিকা-নিশীথের টেবিলটা চারজনের। রেস্তরাঁর অন্যান্য টেবিলও খালি নেই। সুতরাং ঘাড় নেড়ে আগন্তুককে বসতে বলল সারিকা।

সারিকার অনুমতি পেয়ে নিখুঁত ভঙ্গিতে গুছিয়ে বসল লোকটি। দু-হাত টেবিলে রাখল।

ম্যাডাম কি একাই আছেন? ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করল লোকটি। তার কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত ফিসফিসে।

না, সঙ্গে আমার এক বন্ধু আছেন। এখুনি এসে পড়বেন। নিজের বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে মনে সাহস আনতে চেষ্টা করল সারিকা। এমন সময় ওর চোখ পড়ল আগন্তুকের ডান হাতের উলটোপিঠে। ফরসা হাতে অদ্ভুত স্পষ্টভাবে উল্কি দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা আক্রমণোদ্যত বেড়ালের ছবি।

জীবন্ত ছবিটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কতক্ষণ যে তাকিয়ে ছিল সারিকার খেয়াল নেই। চমক ভাঙল লোকটির কথায়, জীবন্ত ছবি, তাই না?

হ্যাঁ অস্বস্তি-আশঙ্কা মেশানো স্বরে বলল সারিকা।

এর একটা বিশেষ অর্থ আছে, ম্যাডাম, হাসল লোকটি : যে-লোকের ঊরুতে এই বেড়ালের ছবি উল্কি দিয়ে আঁকা থাকে, তার চলাফেরার সময় কোনওরকম শব্দ হয় না। আর যার হাতে এই উল্কি থাকে, তার নখের আঁচড় হয় গভীর। কখনও সে-আঁচড়ের দাগ মিলিয়ে যায় না।

সারিকার মনে পড়ল, লোকটি যখন ওর টেবিলে এসে হাজির হয়, তখন কোনওরকম পায়ের শব্দ ও পায়নি। ও চুপ করে রইল। বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডের টিপটিপ শব্দ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে।

লোকটি হঠাৎই উঠে দাঁড়াল।

চলি, ম্যাডাম। একজনের এখানে আসবার কথা ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হল না। হয়তো ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গেই আর-একবার দেখা হয়ে যাবে। মৃদু হাসল সে।

এবার বিরক্ত হল সারিকা। বলল, সেরকম কোনও চান্স নেই।

ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, ম্যাডাম। কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না লোকটি। ক্ষিপ্র নিঃশব্দ পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল সারিকা।

হঠাৎই ও দেখতে পেল নিশীথকে।

বাদশার দরজায় একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে। সেটা থেকে নেমে দাঁড়াল নিশীথ। ইশারায় ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে রেস্তরাঁর ভেতরে ঢুকল ও। ঢোকার মুখে অচেনা আগন্তুকের সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লাগল নিশীথের।

সরি বলে পাশ কাটিয়ে গেল আগন্তুক।

বেয়ারা ইতিমধ্যে টেবিলে চিকেন রোল সার্ভ করে গেছে। নিশীথ হন্তদন্তভাবে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে।

সারিকা নির্বিকার মুখে অভিমান ভরা চোখে চুপচাপ বসে ছিল। নিশীথ বলল, রাগ কোরো না, সু, প্লিজ। ট্যাক্সি করে এক বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে এক্ষুনি আসছি। পাঁচ মিনিট। তুমি দেখো-।

ঝড়ের মতোই আবার বেরিয়ে গেল নিশীথ।

প্রথমবার ও না হয় ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিল, কিন্তু এখন কোথায় যাচ্ছে? ভাবল সারিকা। তারপর বেয়ারাকে ডেকে নিজেই বিল মিটিয়ে দিল।

আশ্চর্য, ওকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে নিশীথ সান্যালের লজ্জা করল না! সারিকার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু তবুও অপেক্ষায় রইল ও।

মিনিটদশেক পর হঠাৎই সারিকার নজরে পড়ল টেবিলে হারের বাক্সটা নেই।

কোথায় গেল? নীচু হয়ে টেবিলের তলায় দেখল সারিকা।

নেই।

আশেপাশে কোথাও পড়ে যায়নি তো! খোঁজাখুঁজি করে বুঝল, না পড়ে যায়নি। তবে কি কেউ নিয়ে গেছে বাক্সটা? ওর মধ্যে যে সারিকার সাদা পুঁতির মালাটা রয়েছে। এ পর্যন্ত

টেবিলের কাছে এসেছে তিনজন।

বাদশার বেয়ারা। সেই আগন্তুক। এবং নিশীথ।

প্রথমজনকে সহজেই বাদ দেওয়া যায়। দ্বিতীয়জন টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও বাক্সটা যে টেবিলে ছিল সেটা সারিকার স্পষ্ট মনে আছে। তা হলে কি…?

দ্বিধাগ্রস্ত বহু মুহূর্তের পর সিদ্ধান্তে এল সারিকা। বাক্সটা নিশীথই হাতে করে নিয়ে গেছে। কিন্তু কেন?

আরও দশ মিনিট কেটে গেল, নিশীথ এল না।

এতক্ষণ ধরে করছে কী ও?

চিন্তিতভাবে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সারিকা। খাওয়ার ইচ্ছে আর নেই। পলিথিনের ব্যাগটা গুছিয়ে হাতে নিল। এগিয়ে গেল রেস্তরাঁর ক্যাশ কাউন্টারের দিকে। চকিত দৃষ্টিতে বাদশার বাইরের ফুটপাতে বারকয়েক নজর রাখল ও। না, নিশীথের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। যে-ট্যাক্সি করে নিশীথ ফিরে এসেছিল সে-ট্যাক্সিটাও নেই।

কাউন্টারের ভদ্রলোককে সংক্ষেপে সব ঘটনা জানিয়ে ও বলল, তিনি যদি ফিরে আসেন, তা হলে বলে দেবেন আমি বাড়ি চলে গেছি। এই যে ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা।

একটা সাদা প্যাডের কাগজে নিশীথের নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখে দিল ও। তারপর সৌজন্যের মিষ্টি হাসি হেসে বেরিয়ে এল বাদশা থেকে।

নিশীথ বলে গেল, এক্ষুনি আসছি। তা হলে এতক্ষণেও ফিরে এল না কেন? হারের বাক্সটাই বা ও নিয়ে গেল কেন? কোনও বিপদে পড়েনি তো নিশীথ!

সারিকার বুক কেঁপে উঠল। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরল ও। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

অবশেষে চিন্তিত মুখে ও রওনা দিল বাড়ির দিকে। নিশীথের ওপর রাগ আর অভিমান কেটে গিয়ে এখন দুশ্চিন্তা ক্রমশ ওর মনে জায়গা করে নিচ্ছে।

ভিড়ে ঠাসা ফুটপাত ধরে হেঁটে চলল সারিকা। নিজের অন্যমনস্কতায় আর চারদিকের কলগুঞ্জনে একটা বিশেষ শব্দ ওর কান এড়িয়ে গেল।

সারিকা যদি কান পেতে শুনত, তা হলে শুনতে পেত মর্স কোডে ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নিটোল ছন্দঃ ডটড্যাশ.. ডট-ড্যাশ…।

যেন কেউ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাটছে, পা টেনে এগিয়ে চলেছে জনবহুল ফুটপাত ধরে– ঠিক সারিকার পিছু পিছু।

.

০৩.

সাতচল্লিশের এ বাস থেকে এলগিন রোডে ভবানীপুর কলেজের কাছে নামল সারিকা। পিসেমশাইয়ের কাছে শুনেছে কলেজটা অ্যাংলো গুজরাট সোসাইটির পুরোভাগে আছেন বিড়লা এবং মাত্র বছরদশেকের পুরোনো। এঁদেরই অ্যাংলো গুজরাট স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে সম্রাট। ওকে স্কুল পালটে সেন্ট জেভিয়ার্সে দেওয়ার কথা ভাবছেন পিসেমশাই, কিন্তু স্কুলটা দূরে বলে পিসিমার আপত্তি।

এখন এলগিন রোড নির্জন। কারণ সময় প্রায় সাড়ে সাতটা, তার ওপর শীতকাল। এই নির্জনতা সারিকার চেনা। দিল্লি যাওয়ার আগে ওরা কলকাতার সি.আই.টি. রোডে থাকত। সেখানেও নির্জনতা। আর দিল্লি তো নির্জনতার জ্বলন্ত উদাহরণ! এখন, অবশেষে, এই এলগিন রোড অ্যালেনবি রোড অঞ্চল।

রাস্তা পার হয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করল সারিকা। নতুন তৈরি হওয়া একটা বাড়ি পার হয়ে বাঁদিকে অ্যালেনবি রোডে ঢুকল। দুটো বাড়ি পরেই দাঁড়িয়ে আছে পাতিল ম্যানসন।

সাদা রং করা বিশাল লোহার দরজা। সেখান থেকে সিমেন্ট বাঁধানো ফুটপাত ঢালু হয়ে এসে মিশেছে রাস্তায় গাড়ি ঢোকা-বেরোনোর জন্য। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে বিরাট ড্রাইভওয়ে। তার একপাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বড় লন। লনের পরিসীমায় মরসুমি ফুলের বাহার। এবং ঠিক মাঝখানে নিঃসঙ্গ চোখের মতো সিমেন্ট বাঁধানো একটা ছোট্ট আইল্যান্ড। তার মাঝে এক বিশাল পলাশ গাছ, ডান দিকে, ড্রাইভওয়ের পাশে, দাঁড়িয়ে রয়েছে সাততলা পাতিল ম্যানসন। তার বিভিন্ন ফ্ল্যাটের আলো কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে। সে-আলো এসে মিশেছে লনের লাইটপোস্ট দুটোর আলোর সঙ্গে। তারপর তারা অন্ধকার-অভিযানে বেরিয়ে মিলিত হয়েছে সদর দরজার ওপরে ঘষা প্লাস্টিকের মুখোশ পরা প্রহরী বাবের সঙ্গে।

লোহার দরজা কিছুটা ভোলা—যেমনটা রোজই থাকে। সুতরাং ভেতরে ঢুকল সারিকা। দারোয়ানগুলোর একটাকেও নজরে পড়ল না। বোধহয় কোনও সান্ধ্য মজলিসে ফুর্তি করতে গেছে।

সহজ পায়ে ড্রাইভওয়ে পার হয়ে পাতিল ম্যানসনে ঢুকল সারিকা। পালিশ করা ভারী কাঠের সদর দরজা অতিক্রম করেই দু-ধাপ সিঁড়ি। তারপর বাঁ-দিকে অটোমেটিক এলিভেটর। এলিভেটরে ঢুকে বোতাম টিপতেই স্বয়ংক্রিয় রবারের লাইনিং দেওয়া দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর পাঁচ নম্বর সুইচ টিপল সারিকা। একটা আচমকা মৃদু ঝাঁকুনি। ধাতব দরজায় বসানো একটুকরো চৌকো কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল সরীসৃপের মতো নীচে নেমে যাওয়া দেওয়াল। তার গায়ে বিভিন্ন তলায় ইংরাজিতে এক, দুই...লেখা।

নিশীথের কথা ভাবতে-ভাবতেই মাথার ওপরে তাকাল সারিকা। একটা উজ্জ্বল বা ঘোলাটে সিলিংয়ের গায়ে দপদপ করে জ্বলছে। কিন্তু কোথাও কোনও ভেন্টিলেটার নজরে পড়ছে না তো! শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস কোনদিক দিয়ে ঢুকবে? ভেতরে যা বাতাস আছে তা এইটুকু সময়ের জন্য যথেষ্ট তো? মনে পড়ল, নিশীথ বলেছিল, মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, যন্ত্র করে না। না করলেই ভালো।

কিন্তু নিশীথ হঠাৎ উধাও হল কোথায়? ও কি বাড়িতে ফিরে এসেছে? হয়তো সেই বন্ধু ওকে ছাড়তে চায়নি। আর দেরি হওয়ায় নিশীথ ভেবেছে, সারিকা নিশ্চয়ই বাড়ি চলে গেছে।

হঠাৎই খুব গরম মনে হল এলিভেটরের আবহাওয়া। সারিকা গা থেকে কোটটা খুলে হাতে নিল। চোখ বোলাল এলিভেটরের চারপাশে। যদি মাঝপথেই আচমকা এই যন্ত্রযান বন্ধ হয়ে যায়! একটা অদ্ভুত আতঙ্ক ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইল।

অবশেষে লিফট যখন ছতলায় এসে থামল, তখন স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল সারিকার বুক ঠেলে। লিফটের দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। বাইরের করিডরে এসে দাঁড়াল ও। এগিয়ে চলল নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা লক্ষ্য করে। তারপর দরজার কলিংবেল টিপল।

এ-বাড়িতে প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। ডানদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন এক মহিলা। নাম জারিন আগরওয়াল। একটা নামকরা গারমেন্ট কোম্পানির ডিজাইনার। সারিকার সঙ্গে ওর আলাপ মোটামুটি পুরোনোই বলা চলে।

নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগোনোর সময় সারিকা লক্ষ করল জারিনের দরজার নীচ দিয়ে আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, জারিন ফ্ল্যাটেই আছে।

দরজা খুলে দিল মা। মাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল সারিকা। মা দরজা আবার বন্ধ করে দিল।

কী রে, ফিরতে এত দেরি হল! মা উদ্বেগের গলায় জিগ্যেস করল।

সারিকা বসবার ঘরের টেবিলের ওপরে পলিথিনের ব্যাগটা রাখল।

মাকে কি সব কথা বলা যায়? বলা যায়, নিশীথ কীরকম আশ্চর্যভাবে উধাও হয়ে গেল!

উঁহু, বললে পরে মা অনর্থক দুশ্চিন্তা করবে। রাতে হয়তো ঘুমোতেই পারবে না।

তাই ও পলিথিনের ব্যাগের জিনিসগুলো একে একে বের করে টেবিলে রাখল, বলল, এসব কেনাকাটা করতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। দ্যাখো, এই টুপিটা সম্রাটের–ও কোথায়?

ভেতরের ঘরে–পড়ছে–দিদিমণি এসেছে?

তুমি এগুলো পিসিমাদের দেখাও। আমি জামাকাপড় ছেড়ে নিই। সম্রাটের পড়া হয়ে গেলে ওকে টুপিটা দেব।

সারিকা ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াল। যেতে-যেতে শুনতে পেল রান্নার শব্দ। রান্নাঘরে পিসিমা রান্না করছেন।

পিসেমশাইয়ের শোওয়ার ঘরটায় উঁকি মারল সারিকা। পিসেমশাই বিছানায় জমিদারি কায়দায় আধশোওয়া হয়ে রেডিয়োতে খবর শুনছেন।

সারিকাকে দেখে হেসে বললেন, কী, গোটা নিউ মার্কেটটা কেনা হল?

হ্যাঁ–প্রায় সেইরকমই, হেসে বলল সারিকা, ক্রিসমাসের জন্যে যা ভিড়!

মাকে নিয়ে সারিকা যে-ঘরটায় শোয় সেটা একেবারে কোনার দিকে। তার পাশের ঘরটায় সম্রাট পড়তে বসেছে। দিদিমণি ওকে পড়াচ্ছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলেও সম্রাটের ছুটি মেলেনি। অঙ্কে ও ভীষণ কঁচা। এখন পিসিমার হুকুমে তারই মেরামতি চলছে।

সম্রাটের পড়ার ঘরের দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ল সারিকা।

তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে গিয়ে বসে পড়ল ও।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল সারিকা। লক্ষ্য গলার চুনিটা। এটা মাকে দেখাতে ও ভুলে গেছে।

এক অদ্ভুত ঘোরে সারিকা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই সামান্য নকল পাথরের দীপ্তি ওকে বারবার অবাক করল। একইসঙ্গে আবার মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া নিশীথের কথা। ও বাড়ি ফিরে এল কি না সেটা খোঁজ করা দরকার।

প্রথমে ও ঠিক করল, সোজা ওপরে নিশীথের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখবে ও ফিরেছ কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে মত পালটাল। ও সোজা এগিয়ে গেল বসবার ঘরে। ঘরের এক কোনে ছোট টিপয়ের ওপর বসানো টেলিফোন। পাশেই ছোট মাপের টেলিফোন-বই।

নিশীথের ফোন নম্বর খুঁজে বের করে সতর্ক আঙুলে ডায়াল করল ও।

একটু পরেই কানে-চাপা রিসিভারে শোনা গেল ক্রিং ক্রিং শব্দ।

সেকেন্ড দশেক পর কেউ এসে অপর প্রান্তে রিসিভার তুলে নিল।

সারিকা উৎকণ্ঠ, কৌতূহলে উদগ্রীব।

হ্যালো গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠস্বর।

কে, নিশীথ?

আপনার কত নম্বর চাই?

৪৬-৩৫১৬। ভয়ে-ভয়ে বলল সারিকা।

সরি, রং নম্বর–।

কট করে লাইন কেটে দেওয়ার শব্দে ভীষণ অপমানিত বোধ করল ও। সেইসঙ্গে মনে একটা সন্দেহও দানা বাঁধতে শুরু করল। সত্যিই কি ওর রং নম্বার হয়েছে?

উঁহু–অসম্ভব। কিন্তু নিশীথই যদি ফোন ধরে থাকবে, তা হলে অমন অভদ্রের মতো লাইন কেটে দেবে কেন? তা হলে কি অন্য কেউ নিশীথের ফ্ল্যাটে ঢুকেছে?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে আবার নিশীথের নম্বর ডায়াল করল ও।

কিন্তু ফোন বেজেই চলল, কেউ আর ধরল না।

ফোন রেখে দিতে যাবে, এমন সময় ওপরের ঘরে একটা ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে চমকে উঠল সারিকা। তা হলে কি ওর সন্দেহই সত্যি? নিশীথ কোনও বিপদে জড়িয়ে পড়েনি তো!

চট করে ফোন নামিয়ে রাখল ও। মাকে বলল, আমি জারিনের ঘর থেকে একটু আসছি। তারপর একটা শাল নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল, জারিনের ঘরে তখনও অলো জ্বলছে। ও এগিয়ে গিয়ে জারিনের দরজায় ধাক্কা মারল। একবার, দুবার।

দরজা খুলতেই সারিকা দেখল স্লিপিং গাউন পরা জারিন ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

কী ব্যাপার, সারি?

জারিন, আমার–আমার মনে হয়, ওপরে নিশীথবাবুর ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকেছে।

যদি পুরো ব্যাপারটাই আমার মনের ভুল হয়, তা হলে! মনে-মনে ভাবল সারিকা। তা হলে এ নিয়ে হাসাহাসির সীমা থাকবে না।

তার মানে? জারিনের ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল।

সারিকা সংক্ষেপে ওকে সন্ধেবেলার সব ঘটনা জানাল।

সব শুনে জারিন হাসলঃ চিন্তার কিছু নেই, সারি। এই ভ্যানিশ হওয়ার ব্যাপারটার একটা সিম্পল এক্সপ্লানেশান আছে–অবশ্য যদি তুমি কিছু মনে না করে তা হলে বলছি।

আমি জানি তুমি কী বলবে। জারিনকে বাধা দিয়ে বলে উঠল সারিকা, কিন্তু একটা কথা তুমি হয়তো ঠিক জানো না, জারিন–নিশীথবাবুর সঙ্গে আমার রিলেশন এমন কিছু থিক নয় যে, আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্যে ওঁকে ওরকম চালাকি করতে হবে। নেহাত উনি আমাদের জানাশোনা, তাই চিন্তা করছি তার বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া, একটু আগেই আমি ওঁর ফ্ল্যাটে ফোন করেছিলাম। কে যেন ফোন ধরে ভারি গলায় বলে দিল, রং নম্বর।

হতে পারে, হয়তো সত্যিই তোমার রং নম্বর হয়েছে। জারিন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল।

তা পারে– চিন্তিত মুখে জবাব দিল সারিকা, কিন্তু তার ঠিক পরেই আমি আবার ফোন করেছিলাম। তখন কেউ ফোন ধরল না। অথচ নিশীথবাবুর ফ্ল্যাটে ভারি কিছু উলটে পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি।

তাই নাকি? জারিন এবার অবাক হল।

হ্যাঁ। চলো, আমরা দুজনে একবার ওপরটা দেখে আসি।

সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল জারিন। সারিকার দিকে চেয়ে হাসল ও চলো। নিশীথের খোঁজ নেওয়া উচিত। আই লাইক হিম।

সারিকা অবাক চোখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জারিনের দিকে।

চুপচাপ ওরা দুজনে পাশাপাশি সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। সারিকার বুক দুরুদুরু–যদি সত্যিই নিশীথের ঘরে কেউ ঢুকে থাকে, তা হলে! ওরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই রাতের আগন্তুক যদি কোনও অস্ত্র নিয়ে ওদের আক্রমণ করে। তা ছাড়া পিসিমা-পিসেমশাই জানতে পারলেই বা কী ভাববেন!

এই সব এলোমেলো কথা ভাবতে-ভাবতে নিশীথের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল ওরা। এক মুহূর্ত এ-ওর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর বুক ভরে এক গভীর শ্বাস টেনে নিয়ে দরজায় নক করল সারিকাই।

কোনও উত্তর নেই।

নিশীথ-নিশীথ কিন্তু জারিনের ডাকের কোনও উত্তরই ভেসে এল না ঘরের ভেতর থেকে।

অগত্যা দরজায় হাতল ঘোরাল সারিকা। এবং ওদের অবাক করে দিয়ে বিনা বাধায় দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার–শুধু বাইরের ল্যান্ডিংয়ের একফালি আলো গিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতরে। নিশীথের ফ্ল্যাটের ওপরেই বাড়ির ছাদ। সুতরাং সাতনম্বর তলায় ফ্ল্যাটের সংখ্যা একটাই। সাহায্য করার মতো প্রতিবেশী সাততলায় কেউ নেই।

একইসঙ্গে পা ফেলে ঘরের ভেতর পা রাখল জারিন ও সারিকা। হাত বাড়িয়ে জারিন আলোর সুইচ অন করল। উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ল ঘরের মেঝেতে। এবং সেই আলোর ঘরের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখে একটা অস্ফুট চাপা আর্তনাদ করে উঠল সারিকা।

ঘরটা যেন আধুনিক কুরুক্ষেত্র। সমস্ত আসবাবপত্র জামাকাপড় খুশিমতো যেখানে-সেখানে ছড়ানো। টেবিলের ড্রয়ার, আলমারি সব ভোলা। একটা ভারি চেয়ার ঘরের এক পাশে উলটে পড়ে আছে।

জারিনের দিকে চোখ ফেরাল সারিকা। দেখল, জারিন স্তম্ভিত।

তা হলে দেখছি আমার কথাই ঠিক। নিশীথবাবুর ঘরে কেউ ঢুকেছিল। আলতো গলায় বলল সারিকা।

জারিন কোনও জবাব না দিয়ে সোজা চলে গেল নিশীথের শোওয়ার ঘরে।

কেউ নেই।

তারপর বাথরুম, কিচেন।

এবং সেখানেও কেউ নেই।

জারিন একটু পরেই ফিরে এল সারিকার কাছে। ওর মুখে এখন ভয়ের ছাপ।

ভেতরে কেউ নেই। জারিনের স্বর স্বাভাবিক নয়, আমরা কি পুলিশে খবর দেব?

তা ছাড়া আর তো উপায় দেখছি না। সারিকার মনে তখন চিন্তার ঝড় ও আমার মনে হয় ওই চেয়ারটা উলটে পড়ার শব্দই আমি শুনেছি। আর, ওই লোকটা নিজের গলার স্বর সাপ্রেস করার জন্যেই অমন গম্ভীর টোনে ফোনে কথা বলছিল।

জারিন কোনও জবাব দিল না। ও তখনও ঘরের উদ্ধৃঙ্খল চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

সারিকার মনে পড়ল বাদশার দেখা লোকটির কথা : যে লোকের উরুতে এই বেড়ালের ছবি উল্কি দিয়ে আঁকা থাকে, তার চলার সময় কোনওরকম শব্দ হয় না, আর, যার হাতে এই উল্কি থাকে, তার নখের আঁচড় হয় গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

সত্যিই তো, এই শক্ত বাঁধানো মেঝেতে চলাফেরা করলে একটু-আধটু শব্দ হবেই। অথচ সারিকা শত চেষ্টাতেও সেরকম কোনও শব্দ শোনেনি। তা হলে কি...?

কিন্তু কেন? তবে কি নিশীথ কোনওরকম বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়েছে?

আর বেশি কিছু ভাবতে পারল না সারিকা। তার আগেই জারিনের অস্ফুট চিৎকারে ও চমকে উঠল।

এটা–এটা তুমি কোথায় পেলে? জারিনের আঙুল সারিকার গলার দিকে।

কোনটা? গলার দিকে চোখ নামাল সারিকা, হাসল : ও এটা! এটা আজই কিনেছি নিউ মার্কেট থেকে।

জারিনের চোখে পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। পাথরটা নকল। দাম মাত্র পঁচিশ টাকা। সারিকা বলল।

অসম্ভব! সারিকার কাছে সরে এল জারিন। হাতে নিয়ে পাথরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করে দেখতে লাগল? কে দিয়েছে, নিশীথ?

উঁহু-আমি নিজেই কিনেছি। সারিকার মনে এবার সন্দেহ দেখা দিল।

জারিন হঠাৎই প্রসঙ্গ পালটাল : চলো, নীচে গিয়ে থানায় ফোন করা যাক।

নিশীথের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে ওরা দুজন নেমে এল নীচে–জারিনের ঘরে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল জারিন, ডায়াল ঘোরাল : হ্যালো, পুলিশ স্টেশন?..

.

০৪.

পরদিন সকালটা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে দিতেই কেটে গেল।

পুলিশ ব্যাপারটাকে একেবারেই তেমন গুরুত্ব দিল না। কেবলই সন্দেহের নজরে সারিকার দিকে তাকাতে লাগল। যেন এই তুচ্ছ ব্যাপারে পুলিশে খবর দিয়েই ও একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে।

নিশীথ সম্পর্কে জারিন আর সারিকা যতটুকু জানে পুলিশকে জানাল। কিন্তু শত খোঁজাখুঁজি করেও নিশীথের কোনও ছবি পাওয়া গেল না।

পুলিশ-দলকে বিদায় দিয়ে ভীষণ ক্লান্তি বোধ করল সারিকা। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে এলোমেলো ভাবনা ভেবে চলল।

গতকাল জারিনের ফ্ল্যাট থেকে ফিরে এসে অনেকক্ষণ দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছিল ও। সম্রাট ওকে জোর করে লুডো খেলতে বসিয়েছিল, কিন্তু সারিকার খেলার দিকে মন ছিল না।

কী হচ্ছে, দিদি! তোমার পাঞ্জা পড়েছে–ছক্কা পাঞ্জা নয়! ঠিক করে দান দাও! সম্রাট অনুযোগ করে বলল।

এমন সময় পিসিমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন কী রে, তুই কোথায় বেরিয়েছিলি?

একটু জারিনের সঙ্গে গল্প করতে গিয়েছিলাম।

সারিকা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না পিসিমাদের সবকিছু বলবে কি না।

কিন্তু কাল তো পুলিশ আসবে! তখন জানাজানি তো হবেই! পিসেমশাই যেরকম ভীতু লোক–হয়তো চিন্তার অস্থির হয়ে পড়বেন! সারিকাকে হয়তো সাত-তাড়াতাড়ি দিল্লিতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু নিশীথকে বিপদের মধ্যে ফেলে ও এখন দিল্লি যেতে চায় না।

চা খেতে-খেতে ও পিসিমাকে নিশীথের ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা বলল। বলল যে, ও আর জারিন ওপরে নিশীথের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ওরা থানায় খবর দিয়েছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মা, পিসিমা, পিসেমশাই আর সারিকা আলোচনায় বসল।

সারিকা বারবার করে সবাইকে বোঝাল যে, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। সেরকম কোনও সমস্যা হলে ও কর্নেল বিক্রম সেনকে সব জানাবে। কর্নেলকাকু অতি সহজেই এসব সামাল দিতে পারবেন।

সারিকার পিসেমশাইয়ের কীরকম যেন ভাই হন কর্নেল বিক্রম সেন। বেশ কিছুদিন হল মিলিটারি থেকে রিটায়ার করেছেন। কলকাতার বেড়াতে এসে ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সারিকা। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে কর্নেলের ঝুলিতে। ভদ্রলোক বিপত্নীক, নিঃসন্তান, আর ভীষণ স্নেহপ্রবণ। মাত্র কয়েকবার দেখা-সাক্ষাতেই সারিকাকে ঠিক যেন নিজের মেয়ের মতোই ভালোবেসে ফেলেছেন।

কর্নেল পঙ্গু। এখন সারাটা দিন হুইলচেয়ারে বসে কাটান। বাড়িতে আয়া, চাকর-বাকরের অভাব নেই। তা ছাড়া বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রোজ সন্ধেবেলা নিজের ড্রইংরুমে তাসের আড্ডা বসান।

সারিকার এখন মনে হল, কর্নেলকাকুকে সব জানানো দরকার।

মা, পিসিমা, পিসেমশাই শুধু দুশ্চিন্তাই করতে পারবেন। তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। কর্নেল সেনের অনেক যোগাযোগ আছে। তিনি হয়তো এ-রহস্যের জট ছাড়ানোয় সাহায্য করতে পারবেন।

কিন্তু হঠাৎই কেন যে সারিকার মন ঝুঁকে পড়ল নিশীথ সান্যালের দিকে!

এই সহজ কথাটা নিশীথ নিরুদ্দেশ হওয়ার আগেও কেউ যদি সারিকাকে বলত—তা হলে ও হয়তো খুব একটা পাত্তা দিত না। কিন্তু এই মুহূর্তে ও নিশীথের সঙ্গে বন্ধুত্বের অন্যরকম অর্থ যেন খুঁজে পাচ্ছিল। নিশীথের কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও।

স্বপ্নে দেখল, হাতে উল্কি আঁকা সেই আগন্তুক যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র হাসি, হাতের দীর্ঘ জান্তব নখ, বাঁকানো আঙুল–সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস দৃশ্য।

আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল সারিকার। হাতের উলটোপিঠ দিয়ে গলার ঘাম মুছতে গিয়েই হাত ঠেকল লকেটটার।

এতক্ষণ এটার কথা খেয়ালই ছিল না ওর। মা-পিসিমাকে ও লকেটটা পরে দেখিয়েছে। পাথরটা দেখে ওঁরা কেউই ওটার দাম বিশ্বাস করতে পারেননি। সারিকারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল।

সারিকা ভেবে দেখল, যে-মুহূর্ত থেকে এই হারটা ও কিনেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই সব অস্বাভাবিক ঘটনার শুরু। ও ঠিক করল আজ সন্ধেবেলা কর্নেল সেনের বাড়িতে যাবে। তাঁর কাছে এ-ব্যাপারে সাহায্য চাইবে। জানতে চাইবে–এক্ষেত্রে ওর কী করা উচিত।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সারিকা। এগিয়ে গেল ড্রইংরুমের টেলিফোনের দিকে। ফোন তুলে ডায়াল করল কর্নেল সেনের নম্বর।

একটু পরেই ও-প্রান্তে রিসিভার তোলার শব্দ হল।

কর্নেল সেন স্পিকিং।

আমি–আমি সারিকা।

ও—কী খবর বল? রণেন কেমন আছে?

ভালো–। রণেন সারিকার পিসেমশাইয়ের নাম।

হঠাৎই যে ফোন করলি! বয়স হলেও বিক্রম সেনের গলা থেকে গাঢ় সবুজ আত্মীয়তার স্বরটি কিন্তু মিলিয়ে যায়নি।

আজ সন্ধেবেলা তুমি ঘরে থাকছ তো? সারিকা ফোনে পাথরের ব্যাপারটা জানাতে চাইল না।

ঘরে থাকব না তো যাব কোথায়! ও-প্রান্তে হাসির শব্দ হল : ভগবান কি আর সে ক্ষমতা রেখেছে! তুই সন্ধেবেলা আয়, চুটিয়ে তাস খেলা যাবে। আরও দু-একজন আসবেন–তাদের সঙ্গে আলাপ করে তোর ভালো লাগবে। চলে আয়।

আচ্ছা–তা হলে সন্ধে সাতটা নাগাদ যাব। তোমার সঙ্গে দেখা করাটা ভীষণ দরকার।

কর্নেল সেন অবাক হয়ে কিছু বলে ওঠার আগেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছে সারিকা।

.

কর্নেল সেনের বাড়িতে পৌঁছোনো পর্যন্ত নিশীথ আর সেই অদ্ভুত আগন্তুকের চিন্তায় সারিকার মন ডুবে রইল।

কলিংবেল টিপতেই সবসময়ের আয়া মেরিয়ন দরজা খুলে দিল। তারপর সারিকাকে দেখেই একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, কর্নেল সেন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন।

মেরিয়ন বাঙালি খ্রিস্টান। এতদিনকার আলাপ-পরিচয়ে সারিকা বুঝেছে, ও ভীষণ ধর্মভীরু। কর্নেল সেনের তত্ত্বাবধানের ভার মেরিয়নের ওপরে। বয়েস হয়েছে ওর, কিন্তু নানান আকর্ষণ এখনও ভোতা হয়ে যায়নি।

ড্রইংরুমে পা রাখতেই সারিকা অবাক হল। ঘরে খুব অল্প পাওয়ারের একটা নীল আলো জ্বলছে। ঘরের দূরপ্রান্তে, বুক-শেফের পাশে, হুইলচেয়ারে বসা একটা ছায়ামূর্তি। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

সারিকা ঢুকতেই ছায়ামূর্তি সরব হল, কে, সারি এসেছিস? আয়, বোস।

কর্নেল বিক্রম সেন।

ঘরের আলো নেভানো কেন, কাকু?

এমনিই। তা ভীষণ দরকার বলছিলি ব্যাপারটা কী?

সারিকা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মেরিয়নের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রম সেনের ভরাট স্বর শোনা গেল, মেরিয়ন, বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে তুমি একটু ও-ঘরে যাও।

মেরিয়ন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই সারিকা একটা চেয়ার টেনে কর্নেল সেনের কাছে বসল। পাথরের হার কেনা থেকে শুরু করে নিশীথের নিরুদ্দেশ হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা এক নিশ্বাসে বলে গেল। সবশেষে প্রশ্ন করল, এখন আমার কী করা উচিত বলো। সেটা জানতেই তোমার কাছে এসেছি।

সারিকার শেষ কথাগুলো কর্নেল সেনের কানেও ঢোকেনি। তিনি তখন অবাক চোখে চেয়ে আছেন সারিকার গলায় ঝোলানো পাথরের লাল লকেটটার দিকে। তার মুখ দিয়ে প্রশংসার একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল : অপূর্ব!

ঘরের আলো ঠিকরে পড়ছে রক্ত-লাল চুনিটার গা থেকে। ঠান্ডা আগুনের মতো ধকধক করে জ্বলছে পাথরটা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের দরজা খুলে গেল। একটা তরল স্বর ভেসে এল দরজার কাছ থেকে, কী অপূর্ব, সেনসাহেব?

মুখ তুলে তাকালেন বিক্রম সেন। দেখলেন দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে জনৈক দীর্ঘকায় পুরুষ।

হাত বাড়িয়ে তাকে আহ্বান জানালেন কর্নেল : এসো, কাপুর–এসো।

কাপুর ঘরে ঢুকতেই তার প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল সেন, অপূর্ব এই পাথরটা। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করতে লাগল চুনিটা।

কৌতূহলী হয়ে সারিকা চোখ ফেরাল আগন্তুকের দিকে। দীর্ঘকায় সুদর্শন চেহারা। চোখজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল।

সারিকার উৎসুক দৃষ্টিকে অনুসরণ করে হাসলেন কর্নেল সেন ও সারি–ইনি আমার বন্ধু–প্রতিদিনকার তাস খেলার সাথী আনন্দ কাপুর।...কাপুর, এ আমার ভাইয়ের ক্লোজ রিলেটিভ। দিল্লিতে পড়াশোনা করেছে। এখন ছুটিতে মাসখানেকের জন্যে মাকে নিয়ে কলকাতার বেড়াতে এসেছে। সারিকা মুখার্জি।

সারিকার নমস্কারের উত্তরে আনন্দ কাপুর প্রতি-নমস্কার জানালেন। বললেন, ওই পাথরটার ব্যাপারে আমি কিন্তু কর্নেল সেনের সঙ্গে একমত, মিস মুখার্জি। সত্যিই অসাধারণ।

কিন্তু পাথরটা নকল। সারিকা সহজভাবে কথাটা বললেও ভীষণভাবে চমকে উঠলেন আনন্দ কাপুর।

মাই গুডনেস! ইটস জাস্ট ইম্পসিবল! সারিকার দিকে এগিয়ে এসে তিনি কাছ থেকে ওর গলায় ঝোলানো পাথরটা ভালো করে দেখলেন : অসম্ভব! এটা যদি ঝুটো পাথর হয়, তাহলে আমার জুতোজোড়াও সোনার তৈরি!

সারিকা হতবাক। ওর বিস্ময়ের ভাবটা মুখ থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কর্নেল সেন গম্ভীর গলায় বললেন, সারি, কাপুর ইজ রাইট। পাথরটা আসল, যেমন আসল আমার আঙুলের এই চুনিটা। বলে নিজের ডান হাতের অনামিকাটা সারিকার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন কর্নেল সেন। তার অনামিকায় জুলজুল করছে একটা ছোট চুনি।

কিন্তু কিন্তু কী করে এই হারটা ওই দোকানের শো-কেসে গেল? সারিকার প্রশ্ন।

বলা কঠিন। চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন বিক্রম সেন, তুই তো বলছিলি রাস্তায় কেউ তোকে ফলো করছিল। সে হয়তো এই পাথরটার জন্যেই। এটার দাম হবে কম করেও পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা!

সারিকা এবার সম্পূর্ণ নতুন আলোর সমস্ত ঘটনা ভাবতে শুরু করল।

একটা ঝুটো পাথরের দোকানে এই মহামূল্য চুনিটা গেল কেমন করে! বাদশার দেখা ওই লোকটাই বা কে? নিশীথের নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছনে এই চুনির কি কোনও ভূমিকা আছে?

ভাবতে-ভাবতে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল ও। ওর মনে পড়ল, বাদশার নিশীথ যখন হারের বাক্সটা টেবিলে রেখে ট্যাক্সি ডাকতে যায়, তখন বাক্স থেকে হারটা বের করে সারিকা যেখানে আশ্চর্য। এই পচিমনটাকে ঘুরিয়ে ফিগালমাল হয়ে যেতে গলায় পরেছিল। ওর গায়ে ফারের কোট থাকায় চুনিটা লোমের কলারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। নিশীথ আবার ফিরে এসে হারের বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পকেটে ভরে। হয়তো ও তখনও ভেবেছে হারটা বাক্সের ভেতরই আছে। তারপর সারিকাকে ফেলে রেখে নিশীথ বাক্স নিয়ে সরে পড়ে।

তা হলে কি নিশীথ জানত, চুনিটা নকল নয়, আসল, নিশ্চয়ই জানত। নইলে ওরকমভাবে সারিকাকে ফেলে চুনিটা নিয়ে কেন সরে পড়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু নিশীথের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী? কেউ কি তখন নিশীথকে বাক্সটা নিয়ে পকেটে রাখতে দেখেছিল? তারপর সেই হয়তো নিশীথকে ফলো করেছে–আবিষ্কার করেছে বাক্সটা খালি। তাই হয়তো গত রাতে এসেছিল নিশীথের ফ্ল্যাটে।

ভাবতে-ভাবতে সারিকার সব কিছু গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। ও গলা থেকে হারটা খুলে নিয়ে নতুন করে চুনিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

আশ্চর্য! এই পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা দামের পাথরটাকে অবহেলাভরে সঙ্গে নিয়ে ও যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে!

হঠাৎই আনন্দ কাপুরের কথায় সারিকার ঘোর কাটল? মিস মুখার্জি, আপনি যদি পারমিশন দেন তা হলে এই পাথরটার একটা ভ্যালুয়েশন করিয়ে আনতে পারি। আমার চেনাশোনা একজন জুয়েলার আছে।

তার কোনও দরকার নেই, কাপুর। বাধা দিলেন কর্নেল সেন, সারি তো আর ওটা বেচতে যাচ্ছে না! তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে, পাথরটার দাম অনেক সাধারণের কল্পনার বাইরে।

আপনি ঠিকই বলেছেন, কর্নেল, পাথরটা জেনুইন।

মেরিয়নের স্বরে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন কর্নেল সেন। ও যে কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি টেরই পাননি।

একটু বিরক্ত হয়েই হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে মেরিয়নের মুখোমুখি হলেন তিনি।

তোমাকে এ-ঘরে আসতে কে বলেছে? রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

না–মানে–আপনি অনেকক্ষণ একা রয়েছেন…তাই ভাবলাম যদি কোনও দরকার হয়–

শাট আপ গর্জে উঠলেন কর্নেল সেন, ঢের হয়েছে, আর এক্সপ্লেইন করতে হবে না। তোমাকে মেজর চৌধুরী আয়া হিসেবেই দিয়েছেন, বডিগার্ড হিসেবে নয়।

মেরিয়নের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। ও মাথা নীচু করল।

এই জটিল মুহূর্তে হঠাৎই শোনা গেল কারও দরাজ কণ্ঠস্বর, আরে, কাপুর পৌঁছে গেছে। দেখছি! কিন্তু ব্যাপার কী, বিক্রম, তোমাকে দেখে বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছে। মেরিয়ন কিছু করেছে। নাকি?

আগন্তুক কথা বলতে বলতে খোলা দরজা ছেড়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কপালে বলিরেখা, চোখে-মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ। ঠোঁটের কোণে সব সময়েই একটুকরো হাসি।

এসো, নীরেন। গভীর স্বরে আহ্বান জানালেন কর্নেল সেন, আজ একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনি তোমাকে শোনাব। তারপর সারিকার দিকে ফিরে বললেন, আমার আর-এক বন্ধু–নীরেন বর্মা।

উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে একপলক চোখ বুলিয়ে নিল আগন্তুক। তারপর মেরিয়নের দিকে ঘুরে বলে উঠল, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, মেরিয়ন–এক গ্লাস জল।

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেরিয়ন।

ও চলে যেতেই মুখ খুললেন বিক্রম সেন। সারিকার পরিচয় দিয়ে বললেন ঝুটো পাথরের দোকান থেকে ওর আসল চুনি বসানো হার কেনার কথা।

কর্নেলের কথা শুনে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে পড়লেন নীরেন বর্মা। বললেন, মিস মুখার্জি, পাথরটা একবার দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই। গলা থেকে হারটা খুলে নীরেন বর্মার হাতে তুলে দিল সারিকা।

সেটাকে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। আপনমনেই বলে উঠলেন, হু–দাম হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিরিশ হাজার টাকা। কিন্তু আশ্চর্য! এই পাথরটা নিউ মার্কেটের দোকানে গেল কী করে! ডক্টর কাপুর, আপনার কী ধারণা?

সারিকা অবাক হয়ে আনন্দ কাপুরের দিকে তাকাতেই তিনি হাসলেন : মানুষের ডাক্তার নই : ইতিহাসে ডাক্তার। আমি জয়পুরিয়া কলেজের জনৈক প্রফেসর–এবং নিঃসন্দেহে ছাত্রদের কৃপার পাত্র।

সারিকা তার কথা বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারল না। সেই হাসিতে সকলে যোগ দিলেন।

আপনার জল। মেরিয়নের দৃষ্টি নীরেন বর্মার হাতের পাথরটার দিকে।

থ্যাংক ইউ, গেলাসটা নিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলেন নীরেন বর্মা। গ্লাসটা রাখলেন সামনের টেবিলের ওপর। তারপর পাথরটা বিক্রম সেনের হাতে দিলেন বিক্রম, লক্ষ করো, পাথরটা কাটা হয়নি। অর্থাৎ, একটা বিশেষ কোনও কারণে এটাকে কাটা হয়নি। তা ছাড়া কারও পক্ষে এটাকে চুরি করাও মিনিংলেস। কারণ, এ-পাথর বিক্রি করাটা নেহাত সহজ হবে না। বাপারটা পুলিশের নজরে পড়বেই।

আমার মনে হয় এটা পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া ভালো।

না, না—ভুলেও ও-কাজ করবেন না। কর্নেল সেনকে বাধা দিলেন আনন্দ কাপুর, ওরা ভাববে এ-ব্যাপারে আপনারাই দোষী। পাথরটা হজম করতে না পেরে পুলিশে ফেরত দিচ্ছেন।

আমার কাছে হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু আছে এমন সব মণিমুক্তো পাথরের একটা ক্যাটালগ আছে। আমি বরং দেখতে পারি পাথরটা সেরকম কোনও দরের পাথর কি না। হয়তো ঘটনাচক্রেই কলকাতার এসে পড়েছে—ঠিক কোহিনুরের মতো। বলে সারিকার দিকে ফিরলেন নীরেন বর্মা ও মিস মুখার্জি, আমার একটা কিউরিয়ো শপ আছে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে একটা ছোট ল্যাবরেটরিও আছে। যদি পারমিশন দেন, তা হলে আমি পাথরটার ওপর দিনদুয়েক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে আপনাকে তার রেজাল্ট জানাতে পারি।

সারিকা ইতস্তত করছে দেখে কর্নেল সেন ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন না, বর্মা, তাতে লাভ কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। তার চেয়ে আমার মনে হয়, পুলিশে জমা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

স্যার, আমি একবার দেখব– ঘাড় ফেরাতেই বিব্রত মেরিয়নের চোখে চোখ পড়ল কর্নেল সেনের। কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, নাও, দ্যাখো।

সারি– এবার সারিকাকে লক্ষ করে তিনি বললেন, নিশীথ সান্যাল ফিরে এলে আমাকে একটা খবর দিস। আগে থেকেই মন খারাপ করিস না। হয়তো কোনও রিলেটিভের বাড়িতে গিয়ে বসে রয়েছে।

মিস মুখার্জি, আশা করি পাথরটার একটা ছবি তুলতে চাইলে আপনার কোনও আপত্তি থাকবে না? আনন্দ কাপুর জিগ্যেস করলেন।

না, না, আপত্তির কী আছে!

নীরেন বর্মা এবার প্রস্তাব দিলেন? বিক্রম, আর দেরি করে লাভ কী। নাও, তাসের প্যাকেট বের করো।

বিক্রম সেন করছি বলে ফিরলেন মেরিয়নের দিকে ও মেরিয়ন, দেখি, হারটা দাও।

আমি তো ওটা ডক্টর কাপুরের হাতে দিলাম। মেরিয়ন যেন বিস্মিত।

আমি ওটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখেছি। সহজ স্বরে জবাব দিলেন কাপুর।

হ্যাঁ, আমি আপনাকে টেবিলে নামিয়ে রাখতে দেখেছি। সারিকা গম্ভীর গলায় বলল, তবে ব্যাপারটা কী জানেন, চুনিটা সেখানে আর নেই।

সত্যিই, চুনি বসানো হারটা আর কোথাও নজরে পড়ছে না। যেন চোখের পলকে পাথরটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

.

০৫.

নিশ্চয়ই টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেছে। আনন্দ কাপুর যেন সম্ভাবনাটা সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত।

অতএব সারিকা, নীরেন বর্মা, মেরিয়ন এবং ডক্টর কাপুর–চারজনেই উবু হয়ে বসে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন।

কিন্তু বহুক্ষণ পরিশ্রমের পরও চুনিটা পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধান পর্ব-শেষ করে ওঁরা চারজনেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সকলেই চুপ।

মিনিটপাঁচেক কেটে গেল নীরবতায়।

অবশেষে কথা বললেন কর্নেল সেন, মেরিয়ন, সদর দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মেরিয়ন যন্ত্রের মতো এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমাকে এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বলতে হবে তা বলতে হচ্ছে বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। শান্ত স্বরে বলে চললেন কর্নেল সেন, আমার ধারণা একটা কঠিন জড় পদার্থ কখনওই জ্যান্ত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। এর জন্যে আমাদের পাঁচজনের একজনই দায়ী। জানি না, এটা কেউ অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়েছে কি না, তবে একটা সুযোগ আমি তাকে দিতে চাই। আমরা এখন সেই পুরোনো টেকনিকই ব্যবহার করব। আশা করি, সেই চান্সটা যে নেওয়ার সে নেবে।

তার মানে! আনন্দ কাপুরের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছে।

তার মানে এই ঘরের আলো দুমিনিটের জন্যে নিভিয়ে দেওয়া হবে। চুনিটা যে-ই নিয়ে থাকুক, আশা করি, দুমিনিট বাদে ঘরের আলো জ্বলে ওঠার পর চুনি বসানো হারটাকে আমরা আবার টেবিলের ওপরেই দেখতে পাব। অতএব...মেরিয়ন, ঘরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দাও।

সেই একই যান্ত্রিক ভঙ্গিতে দরজার পাশে বসানো আলোর সুইচের দিকে এগিয়ে গেল মেরিয়ন। সুইচ অফ করে দিল।

মুহূর্তে নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘরে ভরে গেল।

কান খাড়া করে প্রতীক্ষা করে রইল সারিকা। কিন্তু কই, কোনও শব্দই তো ওর কানে আসছে না! শুধু শোনা যাচ্ছে সকলের ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

নিজের রেডিয়াম ডায়াল হাতঘড়িতে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিলেন বিক্রম সেন। দুমিনিট সময় পার হতেই তিনি স্পষ্ট স্বরে বললেন, মেরিয়ন, আলো জ্বেলে দাও।

খুট করে সুইচ অন করার শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। সকলেই চোখ ফেরালেন টেবিলের দিকে।

না, চুনিটা তখনও অদৃশ্যই থেকে গেছে।

কাপুর, নীরেন—তোমরা আশা করি আমার পজিশনটা বুঝতে পারছ। আনন্দ কাপুর ও নীরেন বর্মার মুখের ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে নিলেন কর্নেল সেনঃ সুতরাং, তোমরাই বলো, আমার নেক্সট স্টেপ কী হওয়া উচিত।

একটু আমতা-আমতা করে বলেই ফেললেন নীরেন বর্মা, নিজেদের সার্চ করা ছাড়া আমি তো আর কোনও উপায় দেখছি না।

নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে সেটাই তো একমাত্র পথ। সমর্থন জানালেন আনন্দ কাপুর।

তা হলে তাই হোক। সারি সারিকার দিকে ফিরলেন কর্নেল সেন : তুই আর মেরিয়ন একটু পাশের ঘরে যা। আশা করি দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের সার্চ করার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

সারিকা কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল পাশের ঘরের দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেরিয়ন ওকে অনুসরণ করল।

ওরা দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বিক্রম সেন বললেন, কাপুর, তুমি আর নীরেন এ-ওকে সার্চ করার কাজটা আগে সেরে নাও। আমি নজর রাখছি। তারপর তোমাদের হয়ে গেলে, তুমি অথবা নীরেন, যে-কেউ আমাকে সার্চ করতে পারো।

ডোন্ট টক রট! বিক্রম সেনকে ধমক দিলেন নীরেন বর্মা : তোমাকে আমরা সার্চ করতে যাব কোন দুঃখে! আর ওই চুনিটা নিয়েই বা তুমি কী করবে! তোমার কাছে মণিমুক্তো কি নেহাত কম আছে?

বর্মা ঠিকই বলছে, বিক্রম। আনন্দ কাপুর বললেন।

তা হোক। তবুও আমি চাই আমাকেও সার্চ করা হোক। নিজের বক্তব্যে বিক্রম সেন অবিচল।

অতএব তার কথামতোই কাজ হল। বিক্রম সেনের চোখের সামনেই পরস্পরকে তন্নতন্ন করে সার্চ করলেন আনন্দ কাপুর ও নীরেন বর্মা। এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই অনুসন্ধানের ফলাফল হল শূন্য।

তারপর ওঁরা দুজনে এগিয়ে এসে কর্নেল সেনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। দ্রুত হাত চালিয়ে তার শরীর অনুসন্ধান করলেন নীরেন বর্মা। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

কর্নেল বিক্রম সেন এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন ও নীরেন, ও-ঘর থেকে সারিকা আর মেরিয়নকে ডেকে পাঠাও।

নীরেন বর্মা চটপট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেন, নীরবতা ভাঙলেন ডক্টর কাপুর, জানি, আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু বর্মার যে একটা কিউরিয়ো শপ আছে একথাটা তুমি একেবারে ভুলে যেয়ো না।

বিক্রম সেন হাসলেনঃ আমার মনে হয় পাথরটা টেবিল থেকে গড়িয়ে কোথাও পড়ে গেছে। কাল সকালেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

এমন সময় মেরিয়ন, সারিকা, আর নীরেন বর্মা একসঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল।

কর্নেল সেনের কাছে এসে থামল সারিকা ওকাকু, ও-ঘরে গিয়ে আমি আর মেরিয়ন এ ওর পোশাক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি—পাথরটা কোথাও নেই।

তার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কেন নয়? কর্নেল সেনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল মেরিয়ন, এ-ধরনের দামি কোনও জিনিস চুরি গেলে সন্দেহটা স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির কাজের লোকদের ওপর আসে, তাই না? মুখে কিছু না বললেও, আপনাদের মনে হয়তো একটা সন্দেহ থেকেই যাবে। ভাববেন হয়তো আমিই...। আর, এই খবরটা শোনার পর মেজর চৌধুরী হয়তো আমাকে আর কোথাও পার্সোনাল নার্স হিসেবে রেকমেন্ড করবেন না!

মেরিয়নের কথায় যুক্তি আছে। সারিকা সমর্থন জানাল, সেইজন্যেই আমি ওর প্রোপোজালে রাজি হয়ে ওকে সার্চ করেছি।

তা হলে মোদ্দা ব্যাপারটা হল, চুনিটা আমাদের পাঁচজনের কারও কাছেই নেই। সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করলেন কর্নেল সেন, কাপুর, বর্মা আমি দুঃখিত যে, আজ তাসের আসর বসানোর মতো মেন্টালিটি আমাদের কারও নেই। অতএব, গুড নাইট। ..সারিকা, সারিকার দিকে চোখ ফেরালেন কর্নেল, তুই পরশু সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস কথা আছে।

এবার হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে এগোলেন বিক্রম সেন। শুধু একবার মেরিয়নের দিকে ঘাড় ফেরালেন : মেরিয়ন, আমার খাবার দেওয়ার সময় হয়েছে।

কর্নেল সেন ঘর ছেড়ে বেরোতেই আনন্দ কাপুর বললেন, মিস মুখার্জি, যদি আপত্তি না করেন তো আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সারিকা। সম্ভবত সেই মর্স কোডের বিচিত্র ছন্দটার কথা, তারপর রাজি হল।

সুতরাং ওরা তিনজনেই বিক্রম সেনের বাড়ি ছেড়ে সতীশ মুখার্জি রোডে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তা নির্জন। নীরেন বর্মা মৃদু স্বরে বিদায় নিয়ে হনহন করে পা চালালেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দিকে। সারিকা ও আনন্দ কাপুর বড় রাস্তার দিকে পা বাড়াল ট্যাক্সির খোঁজে।

পথে যেতে-যেতে নিশীথ আর অনুসরণের ব্যাপারটা কাপুরকে জানাল সারিকা।

সব শুনে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। পরে বললেন, মিস মুখার্জি, আপনি তো শুনলেন, নীরেন বর্মার একটা কিউরিয়ো শপ আছে। হয়তো চুনিটা আসল শোনার পর একটা নতুন কিউরিয়ো কালেকশনের লোভে ও নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। আমি তো বাজি ফেলে বলতে পারি, ওই পাথরটা বর্মা ছাড়া আর কেউ নেয়নি।

কী জানি! অনিশ্চিত স্বরে জবাব দিল সারিকা।

আনন্দ কাপুরের ট্যাক্সি সারিকাকে নামিয়ে দিল ল্যান্সডাউন রোডে। রাত তখন পৌনে দশটা। রাস্তা নির্জন। সুতরাং একটু ভয় যে মনকে দোলা দিল না তা নয়, তাড়াতাড়ি পা চালাল সারিকা।

প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর বেশ স্পষ্টই সারিকার কানে এল শব্দটা : ঠক–তারপরই পা টেনে চলার একটা অদ্ভুত শব্দ, আবার ঠক–এবং একই পুনরাবৃত্তি। যেন মর্স কোডের সংকেত।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সারিকা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। কেউ নেই।

ভয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল সারিকা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে থামল এসে একেবারে ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায়। পিছনে অনুসরণের শব্দ তখন ফিকে হয়ে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে এলিভেটরে উঠল সারিকা। দারোয়ান বা কাউকেই কাছাকাছি নজরে পড়ল না। বোতাম টিপতেই যন্ত্রযান নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল। সেই সঙ্গে সারিকার বুকের টিপঢ়িপ শব্দও বেড়ে চলল।

হঠাৎই থেমে গেল লিফট। দরজা খুলে গেল। সামনেই সারিকার পিসিমাদের ফ্ল্যাটের করিডর। করিডরের আলোটা নেভানো।

আশ্চর্য! কে নেভালো আলোটা!

লিফট ছেড়ে বাইরে আসতেই সারিকা লক্ষ করল জারিনের ফ্ল্যাটে কোনও আলো জ্বলছে না। তা হলে ও হয়তো কোথাও বেরিয়েছে।

অন্ধকারেই দেওয়ালে হাত রেখে নিজেদের দরজার কাছে এগিয়ে চলল ও।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার থাকায় কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

কিন্তু কে দরজা খুলল!

মা-পিসিমা ওরা সব কোথায়?

আবছা আলো-আঁধারে সারিকার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। একইসঙ্গে অবাকও হল।

আন্দাজে ধীরে-ধীরে আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

ঠিক তখনই একটা জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দু ওর নজরে পড়ল। আর একটা গাঢ় ছায়া কোথা থেকে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়াল। এক ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে কানফাটানো চিৎকার করে উঠল সারিকা। ওর চিৎকারে গোটা ফ্ল্যাটটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু সেই আর্তনাদের রেশ শেষ হওয়ার আগেই একটা লোমশ বলিষ্ঠ কালো থাবা এসে পড়ল সারিকার মুখে মাঝপথেই থামিয়ে দিল ওর চিৎকার। একটা ভরাট কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন সারিকার কানে আছড়ে পড়ল, এতক্ষণ ধরে আপনার অপেক্ষাই করছিলাম, মিস মুখার্জি।

.

০৬.

একটু পরেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল। আগন্তুক তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মেঝেতে ফেলল, পায়ের চাপে নিভিয়ে দিল আগুন।

সারিকা এবার তাকে স্পষ্ট চিনতে পারল।

বাদশার সেই বিচিত্র আগন্তুক।

একটা বিশেষ দরকারে আমি আপনার কাছে এসেছি, মিস মুখার্জি। আপনার কোনও ভয় নেই। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসল লোকটি : আপনার কাছে যে-লাল

পাথরটা আছে, ওটা আমি ফেরত চাই।

সারিকা ওর হতবুদ্ধি আতঙ্কের ভাবটা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। ও জানতে চাইল : আমার মা-পিসিমা সব কোথায়?

আগন্তুক শান্ত গলায় বলল, আপনার রিলেটিভরা সবাই ভেতরের ঘরে আছেন। আমি ওঁদের সবাইকে ও-ঘরে আটকে রেখেছি। বলেছি, ভয়ের কিছু নেই। মিস মুখার্জির সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা বলেই আমি চলে যাব। অনেস্টলি বলছি, মিস মুখার্জি মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশি সময় আমি নেব না। আর কথাগুলো সত্যিই খুব জরুরি...।

আমি মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করব। সারিকা অনুনয়ের গলায় বলল।

শুধু-শুধু কমপ্লিকেশন বাড়াবেন না। আমি চাই না, যেসব কথা আমি বলব সেগুলো বেশি লোক জানাজানি হোক। তাতে আপনার বিপদ আরও বাড়বে। আপনাকে সব খুলে বললেই আপনি ক্লিয়ারলি সব বুঝতে পারবেন। আপনি আমাকে জাস্ট পনেরো মিনিট সময় দিন..প্লিজ... আপনার কোনও ভয় নেই...।

সারিকা বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগন্তুক বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

কিন্তু কিন্তু আপনি আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কী করে? কী চান আপনি? সারিকা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ও সামান্য হাঁফাচ্ছিল।

সব বলছি–তার আগে চুনিটা আমাকে ফেরত দিন। সামনের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল আগন্তুক।

সারিকার স্পষ্ট নজরে পড়ল বেড়ালের নিখুঁত ছবিটা।

ও শিউরে উঠল, বলল, ওটা আর আমার কাছে নেই। আজ সন্ধেবেলা একজনের বাড়িতে আমরা কয়েকজন আড্ডা মারছিলাম। তখন পাথরটা হারিয়ে গেছে।

মিথ্যে কথা! চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

বিশ্বাস না হয় আপনি এই ফোন নম্বরে ফোন করে জিগ্যেস করতে পারেন। ব্যাগ থেকে পেন বের করে খসখস করে কর্নেল সেনের ফোন নম্বরটা লিখে দিল সারিকা।

কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল আগন্তুক। তারপর বলল, না, আপনি সত্যি কথাই বলছেন। তবে ওই চুনির সঙ্গে রিলেটেড পুরো ঘটনাটা আপনার জানা দরকার–তা হলে আপনি সিচুয়েশনটা বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া ওই বহ্নিশিখার জন্যে আপনি বিপদে পড়ুন তা আমি চাই না।

বহ্নিশিখা! সারিকা অবাক হল।

হ্যাঁ, ওই চুনিটার নামই বহ্নিশিখা। সে এক লম্বা ইতিহাস। একটা সিগারেট ধরাল আগন্তুক, একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলল, আমার নাম প্রেমনাথ ধর, আমি কাশ্মীর থেকে এসেছি কলকাতায়– শুধু ওই বহ্নিশিখাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

নিশীথ কোথায়? সারিকা প্রশ্ন করল।

আপনার সব প্রশ্নের উত্তরই পাবেন, মিস মুখার্জি। নিশীথ সান্যাল সম্পর্কে যতটুকু আমার জানা আছে বলছি। প্রেমনাথ ধর সিগারেটে এক গভীর টান দিল। মাথার কালো চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, রোহিত রায়কে আপনি চেনেন?

অভিব্যক্তিহীন মুখে মাথা নাড়ল সারিকা।

গত যুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান আর্মির রোহিত রায় আর সুখেন বর্মা কাশ্মীরে ছিল। যুদ্ধ চলার সময় কোনওরকম বিপদ দেখা দেয়নি। দেখা গেল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। রোহিত রায় আর

সুখেন বর্মা এমনিই বেড়াতে বেড়াতে হরওয়ান জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছোয়। ওই জায়গা থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা বিশাল মন্দির আছে–তখনও সেটা তৈরি হচ্ছিল। সেই মন্দিরের ভেতরে ভগবানের আসনে সাজানো ছিল বহ্নিশিখা। ওটা পাহারা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমরা ভাবপ্রবণ হিন্দুরা খুবই ধর্মভীরু লোক। তাই ওই পাথর চুরি করার কথা কেউ কখনও ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি। অথচ রোহিত রায় লোভ সামলাতে পারেনি। সে একদিন চুপিসারে ওই চুনিটা তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। তখন হাতেনাতে ধরা পড়লে তার অবস্থা কী হত, সে একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু ধরা সে পড়েনি।

একটা ছোট প্লেনে করে পালানোর মতলব করেছিল রোহিত রায়। সুখেন বর্মা বরাবরই এই পাথর চুরিতে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে রোহিতের অনুরোধ-উপরোধে রাজি না হয়ে পারেনি। এরপর একটা নৃশংস দুর্ঘটনা ঘটল। এক সকালে আমরা দেখলাম সুখেন বর্মার ছিন্নভিন্ন দেহটা মাংসপিণ্ড হয়ে প্লেনের কাছে পড়ে রয়েছে। রোহিত জানাল, প্লেনের চলন্ত প্রপেলারে ধাক্কা লেগে সুখেনের ওই অবস্থা হয়েছে। দুর্ঘটনা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। চুনির লোভে সুখেন বর্মাকে খুন করেছিল রোহিত রায়। তখনও আমরা পাথর চুরির ব্যাপারে রোহিতকে সন্দেহ করে উঠতে পারিনি। সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আগেই কাশ্মীর ছেড়ে সরে পড়ল রোহিত রায়। কিন্তু আমরাও অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই। তাই আর্মিতে গোপনে খোঁজ করে আমরা রোহিতের ঠিকানা বের করলাম। তারপর থেকেই আমি ছায়ার মতো ওকে ফলো করতে লাগলাম।

অবশেষে এলাম এই কলকাতায়। রোহিত শত চেষ্টাতেও চুনিটা তখনও পর্যন্ত বেচে উঠতে পারেনি। এদিকে এই পুকুর চুরির ব্যাপারটা ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে জানাজানি হয়ে গেছে। তাই পুলিশের কর্তারা উঠে পড়ে রোহিতের পেছনে লাগলেন।

শুধু যে আমি এবং পুলিশ, তাই নয়। আরও একজন যুবককে আমি লক্ষ করেছি, রোহিতকে অনুসরণ করছে। কিন্তু রোহিত আমাদের কাউকেই ভয় পায়নি। ও ভয় পেত চার নম্বর কাউকে। সে কে বা কারা আমি কিছুই জানি না। শেষদিকে রোহিত পাগলের মতো

হয়ে গিয়েছিল। এমন করত যেন ওকে ভূতে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। তারপর গতকাল সন্ধ্যায় একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল রোহিত। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সুখেন বর্মার অ্যাক্সিডেন্ট আর রোহিত রায়ের অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় এক টাইপের। তবে আমি জানি না, রোহিতকে কারা শেষ করেছে। একটা বড় শেভ্রলে গাড়ি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ওপর রোহিতকে চাপা দিয়ে চলে যায়।

থামল প্রেমনাথ ধর। পোড়া সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দিল।

প্রেমনাথ ধরের শেষ কথাটায় তড়িৎস্পৃষ্টের মতোই চমকে উঠল সারিকা। তা হলে কি পাথর বসানো হারটা কেনার পর ও আর নিশীথ যে-অ্যাক্সিডেন্টটা দেখেছিল তাতেই রোহিত রায় মারা গেছে।

প্রেমনাথ ধর যেন সারিকার মনের কথা বুঝতে পারল। বলল, হ্যাঁ, রোহিত যখন মারা যায়, তখন আপনি আর নিশীথ সান্যাল স্পটে ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে রোহিত হয়তো টের পেয়েছিল আজ আর তার রেহাই নেই। তাই সে পাথরটাকে নিউ মার্কেটের একটা দোকানে লুকিয়ে ফেলে। বয়ে বেড়ানোর সুবিধের জন্যে সে পাথরটা দিয়ে একটা বিছেহার বানিয়ে নিয়েছিল। যাই হোক, ঘটনাচক্রে সে-হার কিনে ফেললেন আপনি। অগত্যা রোহিতকে ছেড়ে আপনাকেই আমি ফলো করতে শুরু করলাম।

আপনারা বাদশার ঢুকলেন। আমিও ঢুকলাম। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। নাটকীয়ভাবে আপনার সঙ্গে দেখাও করলাম। কিন্তু লাভ হল না। একটু পরেই আমার নজরে পড়ল মিস্টার সান্যাল চুনির বাক্সটা পকেটে ভরলেন, তারপর রেস্তোঁরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অতএব আমিও তাকেই ফলো করলাম। তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন সামনের একটা ওষুধের দোকানে। কাকে যেন ফোন করলেন। আমি দূর থেকে লক্ষ করতে লাগলাম। একটু পরেই তিনি ফোন সেরে বেরিয়ে এলেন। আমি হাতসাফাই করে তার পকেট থেকে চুনির বাক্সটা তুলে নিলাম।

বাক্স নিয়ে আমি আর ওয়েট করিনি। সোজা রওনা হয়েছি আমার হোটেলের দিকে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখি মিস্টার সান্যাল পাগলের মতো পকেট হাতড়াচ্ছেন। তারপরই তিনি দৌড় লাগালেন ওষুধের দোকানটার দিকে। আমি হেসে আবার চলতে শুরু করলাম।

কিন্তু ভাগ্যদেবীও সেই মুহূর্তে বোধহয় হেসেছিলেন। কারণ, হোটেলে গিয়ে বাক্স খুলে দেখি ফক্কিকার। কিছু নেই। তখন ভাবলাম, পাথরটা অন্য পকেটে সরিয়ে রেখে আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে মিস্টার সান্যাল অভিনয় করেননি তো! তাই রাত গম্ভীর হতেই গেলাম নিশীথ সান্যালের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট চেনার জন্যে আমাকে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। খোঁজখবর করার জন্যে বাদশায় আবার ফিরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ওঁর নাম-ঠিকানা বের করে নিয়েছি।

তা হলে কাল রাতে আপনিই নিশীথের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন? প্রেমনাথ ধরকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল সারিকা।

হ্যাঁ, বহ্নিশিখার খোঁজে। জবাব দিল সে, তবে কীভাবে ঢুকেছি তা জেনে আপনার লাভ নেই, যেমন লাভ নেই কীভাবে আপনাদের ঘরে ঢুকেছি তা জেনে।...যাক, যে কথা বলছিলাম। চুনির খোঁজ করতে গিয়ে আবারও আমি হতাশ হলাম। অবশেষে অনেক চিন্তার পর মনে হল, পাথরটা স্বাভাবিক ইমপাসে আপনি গলায় পরেননি তো! একথা মনে হতেই আজ এখানে এসে আপনার জন্যেই এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন দেখছি, সে সব বৃথাই।

প্রেমনাথ ধরের স্বরে হতাশার সুর সারিকার কান এড়াল না। ও মনে-মনে কী যেন ভাবল। তারপর বলে বসল, আমার মনে হয়, আজ কর্নেল বিক্রম সেনের বাড়িতে কেউ ওটা চুরি করেছে।

কী! ভীষণভাবে চমকে উঠল আগন্তুক, কী বললেন! চুরি করেছে!

হ্যাঁ। সারিকার স্বর অবিচল।

কে?

সম্ভবত আনন্দ কাপুর, অথবা নীরেন বর্মা।

ধন্যবাদ। যদি সত্যিই এঁদের কেউ বহ্নিশিখাকে হাতিয়ে থাকে, তা হলে আমার হাত এড়িয়ে তারা বাঁচতে পারবেন না। চলি, মিস মুখার্জি। আপনাকে অসময়ে বিব্রত করার জন্যে মাপ করবেন। বলে কোনওরকম সময় নষ্ট না করেই দরজার হাতল ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল প্ৰেমনাথ ধর।

সে বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল সারিকা। ছুটে গেল ভেতরের ঘরের দিকে।

দরজা খুলে দিতেই মা-পিসিমা-পিসেমশাই আর সম্রাটকে দেখতে পেল ও।

সম্রাট ছুটে এসে ওকে জাপটে ধরল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মা কাঁদতে কাঁদতে সারিকার কাছে এসে দাঁড়ালঃ এসব কী শুরু হয়েছে, সারি! তুই শিগগিরই থানায় খবর দে। নইলে চল, আমরা দিল্লি ফিরে যাই।

সারিকা ঠিক কী বলবে বুঝতে পারছিল না। কারণ, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা সাহস আর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। একবার কোনও ব্যাপার মাথায় ঢুকলে সকাল বিকেল একই কথা বলে যাবে।

পিসেমশাই এবার কাছে এগিয়ে এলেন, ভয় পাওয়া গলায় বললেন, সারি, ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস। রাত নটার সময় কেউ আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে রিভলবার উঁচিয়ে শাসাবে এটা কোনওদিন ভাবিনি…।

হঠাৎই কী ভেবে সারিকা এক মিনিট—আসছি। বলে ছুটে চলে গেল রাস্তার দিকের জানলার কাছে। পরদা সামান্য সরাতেই সে দেখল উলটোদিকের একটা বাড়ির বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্তি। মাথায় কালো টুপি। পরনে গাঢ় রঙের পোশাক। চেহারাটা যেন খুব চেনা মনে হল সারিকার।

প্ৰেমনাথ ধর রাস্তায় পা দিয়ে চলতে শুরু করতেই শব্দটা শুনতে পেল। অতি সন্তর্পণে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। গতি এবং যতি মিলিয়ে অনুসরণের ছন্দটা যেন মর্স কোডের ডট ড্যাশেরই মতো। তাড়াতাড়ি পা চালাল প্ৰেমনাথ ধর।

সারিকা দেখল প্রেমনাথ ধর রাস্তায় পা দিতেই ছায়ামূর্তি নড়েচড়ে দাঁড়াল। তারপর একটু পরেই একান্ত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করল।

ঠিক তখনই আগন্তুককে চিনতে পারল সারিকা।

ডক্টর আনন্দ কাপুর!

.

০৭.

পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল সারিকার। মনে অনেক দুশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও কাল রাতে ঘুমটা খারাপ হয়নি। তার একটা কারণ বোধহয় রাতে শুতে অনেক দেরি হয়েছে।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পিসিমা-পিসেমশাইকে নিয়ে সারিকা আবার আলোচনায় বসেছে। সারিকা একরকম বাধ্য হয়েই চুনির ব্যাপারটা ওঁদের বলেছে।

শুনে পিসেমশাই তো ভয়েই অস্থির। ভয় সারিকারও করছে। কিন্তু ও তো এখন একেবারে জড়িয়ে গেছে। প্ৰেমনাথ ধর যা বলে গেছে তাতে দিল্লি পালিয়েও সারিকা রেহাই পাবে না। এখন একমাত্র কর্নেলকাকুই ভরসা।

পিসিমার ভয়-ডর একটু কম। একবার দেশের বাড়িতে ডাকাতদলকে চেঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে রুখে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তুই পুলিশকে সব খুলে বল। আর আমার মিলিটারি ভাসুরকে সব জানিয়ে দে। উনি সব্বাইকে ঠান্ডা করে দেবেন।

সারিকা তখন কর্নেল বিক্রম সেনের কথা বলল। বলল, কর্নেলকাকু সব জানেন। উনি এই মিস্ট্রি সলভ করার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন। তোমাদের কোনও ভয় নেই। পুলিশ রয়েছে, কর্নেলকাকু রয়েছেন। তা ছাড়া যে-ভদ্রলোক আজ এসেছিলেন তিনিও আমার ফরে-এগেইনস্টে নন। সুতরাং কোনও ভয় নেই।

এইরকম বহু তর্ক-বিতর্ক আলোচনার পর সারিকা শুতে গেছে। যাওয়ার আগে পিসিমাদের বারবার করে বলেছে, মাকে যেন ওঁরা এত কথা না জানান। তা হলে দুশ্চিন্তায় মা শেষ হয়ে যাবে।

এখন মুখ-হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় সারিকা হঠাৎই একটা শব্দ শুনতে পেল।

কেউ ওপরতলায় নিশীথের ফ্ল্যাটে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একটু চিন্তিত মনেই ব্রেকফাস্ট সারল ও। তারপর পোশাক পরে বেরোতে যাবে, শুনল দরজায় কারও নক করার শব্দ। শব্দের কম্পাঙ্কের সাংখ্যমান নিঃসন্দেহে সেকেন্ডে দুবারেরও বেশি। অতএব যে-ই ওর দরজায় এসে থাকুক, তার প্রয়োজনটা খুব জরুরি।

দরজা খুলতেই সারিকা জারিন আগরওয়ালের মুখোমুখি হল। ওর চোখেমুখে তীব্র উত্তেজনার ছায়া। যেন ভীষণ কিছু একটা দেখে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

সারিকা প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

নিশীথ-নিশীথ ফিরে এসেছে।

সারিকা বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। খুশির মুহূর্তটাকে কাটিয়ে উঠেই ও বলে উঠল, চলো তো, দেখি।

ওরা দুজনে ক্ষিপ্রপায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায় উঠতে শুরু করল।

নিশীথের ফ্ল্যাটের কাছে এসে দরজায় ধাক্কা মারল ও।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে বিস্মিত নিশীথ। ওদের দেখেই ওর মুখে পরিচয়ের হাসি ফুটে উঠল। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ও আহ্বান জানাল, এসো, ভেতরে এসো।

ওরা ইতস্ততভাবে ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকল।

দরজা ভেজিয়ে দিল নিশীথ। ফিরে এসে চেয়ারে বসল। ওদেরও বসতে অনুরোধ করল।

কিন্তু সারিকা আর জারিন তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে দেখছে। মাঝে-মাঝেই ফিরে তাকাচ্ছে নিশীথের দিকে। যেন কোনও অপরিচিত মানুষের অপরিচিত ফ্ল্যাটে ঢোকার প্রথম সুযোগ পেয়েছে ওরা।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠে চেয়ারে বসল জারিন ও সারিকা। ওদের সামনে বসা নিশীথ সান্যাল যেন এক দূরের মানুষ। ওদের মাঝের অদৃশ্য দেওয়াল এই দু-দিনেই যেন অনেক শক্তপোক্ত হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সারিকা গম্ভীর গলায় বলল, এ কদিন কোথায় ছিলে জানতে পারি? নিজের অজান্তেই নিশীথকে তুমি করে কথা বলে ফেলল সারিকা।

কলকাতার বাইরে শান্তিনিকেতনে। নিশীথের স্বর অত্যন্ত সহজ, দ্বিধাহীন।

কারণ? এবারের প্রশ্ন জারিনের।

এই, ব্যাপার কী বলো তো? চমকে উঠল নিশীথ। উঠে দাঁড়াল, তোমরা দুজনে এমনভাবে জেরা শুরু করেছ, যেন আমি কোনও বিরাট অপরাধ করে ফেলেছি। কী ব্যাপার?

অপরাধ করেছ, তবে বিরাট কি না বলতে পারি না। সারিকা বাঁকা সুরে জবাব দিল। নিশীথের চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি বাদশা থেকে উধাও হওয়ার পর এখানে পিকিউলিয়ার অনেক কিছু ঘটে গেছে।

বাদশা! পিকিউলিয়ার! কী সব আবোলতাবোল বকছ, সারিকা? নিশীথ এবার সত্যিই অবাক। বোধহয় ভাবছে, সারিকার মাথা ঠিক আছে কি না কে জানে।

নিশীথের কথায় সারিকা চমকে উঠল? সে কী! তোমার কি মেমারি লস হয়েছে, নিশীথ? আমরা বাদশায় খেতে ঢুকলাম। ট্যাক্সি করে এক বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে আসার নাম করে তুমি সেই যে বেপাত্তা হলে, তারপর এই হাজির হলে। এরপরও তুমি বলবে ব্যাপারটা স্বাভাবিক? শান্তিনিকেতনে তোমার কী দরকার ছিল যে, অমন না বলে কয়ে হুট করে চলে গেলো।

জারিন, কী ব্যাপার! সারিকার মাথায় কোনও গন্ডগোল হয়নি তো? জারিনের দিকে ফিরে কপট সুরে প্রশ্ন করল নিশীথ।

তা হলে আশা করি পাথরের মালা কেনার ব্যাপারটাও তোমার মনে নেই।

সারিকার স্বর এবার রূঢ়, রাস্তায় দেখা সেই অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটাও বোধহয় তোমার অস্বীকার করতে ইচ্ছে করছে? সারিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মাই গড! এসব তুমি বলছ কী, সারিকা? নিশীথ শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকাল জারিনের দিকে, তারপর চোখ ফেরাল সারিকার দিকে।

জারিন, আমার মনে হয় নিশীথের ফিরে আসার ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার। তুমি কাইন্ডলি থানায় ফোনটা করো, তারপর ইন্সপেক্টর দেশাইকে ডেকে পাঠাও। বলো, ব্যাপারটা জরুরি।

পুলিশ! এর মধ্যে পুলিশ আসছে কোত্থেকে! নিশীথের ধৈর্যের বাঁধন যেন ছিঁড়ে গেছে। আমি যে দিদির বাড়ি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, তার জন্যেও পুলিশের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল জারিন, তোমার উধাও হওয়ার খবরটা পুলিশে জানিয়েছিল সারিকা। তারাও হয়তো তোমার খোঁজ করছে। তাই তোমার ফিরে আসার খবরটা তাদের জানানো দরকার। জারিন আর দাঁড়াল না। পা বাড়াল নিশীথের ফোনের দিকে।

জানি না, তুমি ঠাট্টা করছ, না সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গম্ভীরভাবে বলল সারিকা, কিন্তু তোমার এ-ঘরে কাল রাতে প্রেমনাথ ধর নামে একজন লোক এসেছিল– বহ্নিশিখার খোঁজে।

নিশীথের দু-চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। মাথাটা গুঁজে দিল দু-হাতের ফাঁকে।

জারিন ফোন রেখে ফিরে এসে বসল চেয়ারে? মিস্টার দেশাই এখুনি আসছেন। সংক্ষিপ্তভাবে জানাল ও।

তারপর ওরা তিনজনেই চুপচাপ বসে রইল। যেন কেউ কাউকে চেনে না।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর দরজায় নক করার শব্দ শোনা গেল। সারিকা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। নিশীথের দিকে একপলক দেখে এগিয়ে গেল দরজায় দিকে।

দরজা খুলতেই এক দশাসই প্রবীণ পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি হল সারিকা। গতকাল সকালে তিনিই নিশীথের নিরুদ্দেশের তদন্তে এসেছিলেন। সারিকাকে দেখেই পরিচিতের একফালি হাসি হাসলেন মিস্টার সান্যাল ফিরেছেন?

হ্যাঁ। ভেতরে আসুন। সারিকা সরে দাঁড়াল একপাশে।

ইন্সপেক্টর দেশাই এগিয়ে এসে বিনা আহ্বানেই একটা চেয়ার দখল করলেন। নিশীথের দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার সান্যাল, নিশীথ মাথা তুলে তাকাল, আপনাকে এই মিসিং হওয়ার ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে।

লিখে নিন। বিরক্ত স্বরে জবাব দিল নিশীথ।

এখানে নয়–থানায় গিয়ে।

চলুন–। নিশীথ উঠে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তেই নিশীথের জামার হাতার দিকে নজর পড়ল সারিকার। ও চমকে উঠল। সমস্ত কিছুর যোগফল যা দাঁড়াচ্ছে তাতে...উঁহু, অসম্ভব। কিন্তু...একটা সন্দেহের ঝোঁকে নিশীথের সামনে এসে দাঁড়াল সারিকা : এক মিনিট, ইন্সপেক্টর দেশাই–এই নিশীথ সান্যালকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আমি করতে চাই।

করুন। দেশাই সম্মতি দিলেন।

নিশীথ, একটু পাশ ফিরে দাঁড়াও প্লিজ।

নিশীথ পাশ ফিরে দাঁড়াল। ওর বাঁ-গালটা কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে খুঁটিয়ে দেখল সারিকা। তারপর ঘুরে তাকাল ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের দিকে।

ইন্সপেক্টর, গোড়াতেই একটা বিশাল ভুল আমরা করে বসে আছি। এই লোকটি আদৌ নিশীথ সান্যাল নয়।

.

০৮.

তার মানে! ইন্সপেক্টরের ভুরুজোড়া কপালে উঠল।

তার মানে, এই লোকটি একটি তৃতীয় শ্রেণির জালিয়াত। সারিকা শক্ত গলায় জবাব দিল।

নিশীথের শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে।

কী বলছ সারিকা! জারিনের হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল।

ঠিকই বলছি। এ পর্যন্ত যে কটা কথা আমি বলেছি, তার সবকটাই এই লোকটি অস্বীকার করেছে। বলেছে, বাদশায় সে আমার সঙ্গে যায়নি, নিউ মার্কেট তো দূরের কথা। অথচ পরশু সন্ধ্যায় আমি আর নিশীথ একসঙ্গে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ঘুরেছি। তারপর কীভাবে সে হঠাৎ আসছি বলে উধাও হয়ে যায়, সে-কথা তো আপনাকে কালই বলেছি, ইন্সপেক্টর দেশাই।

হ্যাঁ, তা বলেছেন। দেশাই স্বীকার করলেন, কিন্তু ইনি কি সেসব কথা ডিনাই করছেন নাকি?

হ্যাঁ, করছেন।...তা ছাড়া আরও প্রমাণ রয়েছে–অবশ্য সেগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা যায় কি না জানি না। আসল নিশীথ সবসময় কাফলিঙ্ক ব্যবহার করত, কিন্তু এর বেলা তার ব্যতিক্রম দেখছি। আর সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট হল, আসল নিশীথের বাঁ-গালে একটা ছোট

আঁচিল আছে। অথচ, এর গালে সেরকম কিছু আমার নজরে পড়ছে না। জানি না, আমার চোখ খারাপও হতে পারে।

হু– চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন দেশাই, আচ্ছা, মিস মুখার্জি, মিস্টার সান্যালকে খুব ভালোভাবে জানেন এমন কোনও লোক আপনার সন্ধানে আছে? তা হলে তাকে দিয়েও আমরা আসল-নকল শনাক্ত করতে পারি।

আপনি কি আমার কথায় সন্দেহ করছেন, ইন্সপেক্টর? সারিকা একটু অভিমানী স্বরে বলে উঠল, আপনি এখুনি একে অ্যারেস্ট করুন।

আপনার কথায় সন্দেহ না করলেও আমার নিঃসন্দেহ হওয়ার দরকার, মিস মুখার্জি। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমার পক্ষে কোনওরকম লিগাল স্টেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

এবার নকল নিশীথ মুখ খুলল, ইন্সপেক্টর, আপনি আমার অফিসে খোঁজ করতে পারেন। মডার্ন মেশিন টুল্‌স কোম্পানিতে আমি চাকরি করি। নাকি সেটাও বানিয়ে বলছি, সারিকা? সারিকার দিকে ফিরে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল ও।

আসল নিশীথ সান্যাল ওই কোম্পানিতেই চাকরি করে। ভাবলেশহীন মুখে যান্ত্রিক স্বরে বলল সারিকা।

...অথবা আপনি এই পাতিল ম্যানসনেরই অন্যান্য বাসিন্দাকে ডেকে আনতে পারেন আমাকে শনাক্ত করার জন্যে।

তারা শনাক্ত করতে হবে ভেবে কোনওদিন আসল নিশীথের দিকে তাকায়নি। স্বীকার করছি, তোমার সঙ্গে আসল নিশীথের চেহারার অনেকটা মিল আছে, কিন্তু তাই বলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে এমন আশা করা অন্যায়।

জারিন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সারিকার কথা শেষ হতেই ও বলে উঠল, তোমারই হয়তো ভুল হচ্ছে, সারিকা। আমি তো সন্দেহ করার কিছু দেখছি না।

না, ভুল আমার হচ্ছে না। বরং তোমার এই আচমকা সাপোর্টের পেছনে কি ইন্টারেস্ট আছে ভেবে অবাক হচ্ছি। সারিকা তিক্তস্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

ইন্সপেক্টর দেশাই এবার এগিয়ে এসে বাধা দিলেনঃ আপনাদের উত্তেজিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। এখুনি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মিস্টার সান্যাল নিশীথের দিকে ফিরলেন দেশাই গেট রেডি। এখন প্রায় দশটা বাজে। আমরা এখন মডার্ন মেশিন টুল্স-এ যাব।

জারিন আর সারিকা একইসঙ্গে চোখ রাখল নিশীথের চোখে। বুঝতে চাইল, ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের এই সরাসরি চ্যালেঞ্জে সে দ্বিধাগ্রস্ত কি না।

কিন্তু নিশীথ যেন ইন্সপেক্টরের কথা লুফে নিল। সাগ্রহে বলল, চলুন, সেই ভালো। মেয়েগুলো তা হলে পাগলামি থেকে একটু রেহাই পাবে।

নিশীথ, আমি কিন্তু তোমাকে মোটেই সন্দেহ করছি না। অনুযোগের সুরে জারিন প্রতিবাদ করল।

তা করছ না, তবে মন খুলে সাপোর্ট করছ বলেও তো মনে হচ্ছে না! নিশীথের বাঁকা জবাবে চুপ করে গেল জারিন।

ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের ইঙ্গিতে ওরা তিনজনে ঘর ছেড়ে বেরোল।

ছতলায় নেমে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের কাছে একমিনিট সময় চাইল সারিকা। তারপর চটজলদি পিসিমাকে জানিয়ে এল, জরুরি কাজে ও ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরোচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।

বাইরের রাস্তায় পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়েছিল। দেশাইয়ের দেখাদেখি সকলেই চুপচাপ জিপে গিয়ে উঠল। দেশাই নিজেই গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন।

জিপের পিছনের আসনে বসে ওরা তিনজন। একেবারে নিশ্চুপ। একটা বিশ্রী থমথমে আবহাওয়া গাড়ির ভেতরে যেন জমাট বেঁধেছে।

মডার্ন মেশিন টুলস-এর সামনে গাড়ি যখন থামল, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। দেশাই স্টার্ট বন্ধ করে জিপ থেকে নামলেন। নিশীথকে লক্ষ করে বললেন, মিস্টার সান্যাল, আপনি এগোন—আমরা পেছন-পেছন যাচ্ছি।

নিশীথ সামান্য ভ্রূকুটি করেই অফিস বিল্ডিংয়ের ভেতরে পা বাড়াল। চলার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই মনে হল এ-অফিস ওর বহুদিনের চেনা।

নিশীথকে অনুসরণ করে ওরা তিনতলায় এসে পৌঁছোল। সুদৃশ্য কাচের সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল নিশীথ। পিছনে জারিন, সারিকা ও ইন্সপেক্টর দেশাই।

ঘরে ঢুকতেই নিশীথ এক সুন্দরী মহিলার মুখোমুখি হল। ওকে দেখেই মেয়েটি একগাল হাসলঃ কোথায় ছিলেন এ-দুদিন। একেবারে নো ট্রেস!

নিশীথ মৃদু হেসে চোখ ঠারল : এ স্পেশাল ট্রিপ অন নটি বিজনেস। তারপর সারিকার দিকে ফিরে বলল, আমাদের স্টেনো, সোনালি অরোরা।

মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে চলল একটা পার্টিশনের দিকে।

সারিকা ইতিমধ্যেই চিন্তিত এবং গম্ভীর হয়ে পড়েছে। তা হলে কি ওর ভুল হয়েছে। কিন্তু সেটাই বা কী করে সম্ভব! যে-নিশীথের সঙ্গে ও প্রায় সারাটা সন্ধে ঘুরে বেড়িয়েছে, পরে সে-ই কিনা আজ সব অস্বীকার করছে! না, এই লোকটা যে নিশীথের নাম ভাড়িয়ে ওর জায়গা নিতে এসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলে আসল নিশীথের কী হল। তেমন

গুরুতর কিছু হয়নি তো! তা ছাড়া, অফিসের স্টেনোরা নেহাত প্রয়োজন ছাড়া অফিসের কর্মীদের কাছে যাতায়াত করে না। হয়তো তেমনভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাদের চেহারাও জরিপ করে দ্যাখে না। সুতরাং সোনালি অরোরার ভুলও হতে পারে। এমন একজন লোককে সারিকার দরকার, যে ছোটবেলা থেকেই নিশীথের সঙ্গে মিশেছে, তাকে হাড়ে হাড়ে চেনে, জানে এবং বোঝে। কিন্তু হাতের কাছে সেরকম কাউকে ও পাচ্ছে কোথায়! তবে নিশীথের মুখেই তো ও শুনেছে যে, ওর এক দিদি আছেন। শান্তিনিকেতনে থাকেন। এ-দু-দিন তার কাছেই তো ও ছিল বলে বলছে! দেখা যাক, দরকার হলে ইন্সপেক্টর দেশাই এবং এই নকল নিশীথকে নিয়ে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত দৌড়তেও ও রাজি আছে। কিন্তু আসল নিশীথের কী হল? নিশ্চয়ই সে কোনও বিপদে পড়েছে।

সারিকার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল নকল নিশীথের কণ্ঠস্বরে, সারিকা, ইনি আমার সঙ্গে আজ ছবছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছেন জয়দীপ মিত্র।

সারিকা হাত তুলে নমস্কার জানাল।

জয়দীপ মিত্রের বয়েস নিশীথের কাছাকাছি হবে। তার সুদর্শন চেহারায় কেমন একটা বেপরোয়া ভাব। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সে অবাক হয়ে তাকাল সারিকা, জারিন ও ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের দিকে। তারপর নিশীথের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, কী রে, কী ব্যাপার!

ব্যাপার গুরুতর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল নিশীথ, এদের হঠাৎ ধারণা হয়েছে, আমি নাকি কোনও জালিয়াত, এবং আমার নাম নিশীথ সান্যাল নয়।

তা হলে এক কাজ কর। আমার রাঁচিতে জানাশোনা আছে। লিখে দিচ্ছি। মনে হয় তিনটে সিট খালি পেয়ে যাবি। গম্ভীর স্বরে বলল জয়দীপ।

মিস্টার মিত্র, ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক। ইন্সপেক্টর দেশাই সামনে এগিয়ে এলেন : মিস্টার সান্যালের আইডেন্টিফিকেশনের ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে।

ও। তা হলে আমি জয়দীপ মিত্র, বক্ষদেশে হাত রাখিয়া বলিতেছি, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান যুবকের নাম শ্রীনিশীথ সান্যাল। ইহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ও.কে.?

জয়দীপের নাটকীয় স্বরে নিশীথ হেসে উঠল। দেশাইয়ের দিকে ফিরে একটা শ্রাগ করলঃ ইন্সপেক্টর আমার মনে হয় আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। চলুন, এবার ফেরা যাক।

কিন্তু যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নিশীথ। জয়দীপের দিকে ফিরল জয়, এ-ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত আমি অফিসে আর আসছি না।

তোমার ইচ্ছে। তবে যাওয়ার আগে তোমার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ করার কপিরাইটটা বড়সায়েবকে দিয়ে যেয়ো।

মডার্ন মেশিন টুলস থেকে বেরিয়ে এল ওরা চারজন।

ইন্সপেক্টর দেশাই এখন যেন ততটা দ্বিধাগ্রস্ত নন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তাঁর অবিশ্বাসের ভিতটা টলে গেছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি জিপে উঠলেন। ওরাও উঠল।

জিপ আবার ফিরে চলল পাতিল ম্যানসনের দিকে।

নিশীথের সাততলার ঘরে এসে জমায়েত হল সবাই। এতক্ষণ ধরে যে অদৃশ্য উৎকণ্ঠা সকলের কণ্ঠরোধ করেছিল, এখন সেটা মিলিয়ে গেল নিশীথের স্বরে, সারিকা, এর পরেও কোনও প্রমাণ তোমার দরকার?

সারিকা পালটা প্রশ্ন করল, শুনেছিলাম তোমার এক দিদি আছেন। বলো তো কোথায় থাকেন তিনি?

কেন? নিশীথ যেন প্রশ্নের তাৎপর্য খুঁজে পেল না।

দরকার আছে। তিনি কোথায় আছেন এখন? দিল্লিতে? ইচ্ছে করেই নিশীথকে গুলিয়ে দিতে চাইল সারিকা।

না। শান্তিনিকেতনে–তার কাছেই আমি গিয়েছিলাম গত পরশু।

তাই নাকি! সারিকা অবিশ্বাসের সুরে বলল, দেখা যাক–

এবার ইন্সপেক্টর দেশাই গলাখাঁকারি দিলেন : মিস মুখার্জি, আমি আইনের নাগপাশে বাঁধা। সুতরাং আমি প্রমাণসাপেক্ষে যা বুঝেছি, ইনি যে আসল নিশীথ সান্যাল, সে-বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। আশা করি ভবিষ্যতে আপনি আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। তবে ওঁর হ্যান্ডরাইটিং আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমি টেস্ট করে দেখব। গুড নাইট এভরিবডি।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর দেশাই।

জারিন ঘৃণাভরা চোখে তাকাল সারিকার দিকে ও ঢের রঙ্গ হয়েছে, সারি। নিশীথকে তুমি যে কখনও এভাবে হ্যারাস করতে পারো আমি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। সমস্ত প্রমাণ তোমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি কেন যে এরকম গোঁয়ার্তুমি করছ জানি না। এখন নিশীথকে একটু রেস্ট করতে দাও।

সারিকা হাসল, বলল, বেশ তো, এই নিশীথের সঙ্গে তুমি যদি একা থাকতে চাও, তাতে আমি বাধা দেওয়ার কে! তবে জারিন আগরওয়াল, মনে রেখো, এর শেষ আমি দেখবই। ইন্সপেক্টরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও এই লোকটার চালাকিতে আমি ভুলছি না। যারা একে নিশীথের জায়গা নিতে পাঠিয়েছে, বেশ শিখিয়ে-পড়িয়েই পাঠিয়েছে দেখছি! কিন্তু আগামীকাল ইন্সপেক্টর দেশাই আবার আসবেন। নিশীথের ফিঙ্গারপ্রিন্ট অরা হ্যান্ডরাইটিং টেস্ট করলেই এই জালিয়াতটার আসল রূপটি সুড়সুড় করে বেরিয়ে পড়বে। তখন দেখব, এ-ঠাট কোথায় থাকে। গুড নাইট, মিস্টার নিশীথ সান্যাল-আজকের অভিনয়ের জন্যে

আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। তবে আগামীকালের জন্যে এখন থেকেই জারিনের সঙ্গে রিহার্সালে নেমে পড়ুন–আর সময় নষ্ট করবেন না।

গটমট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সারিকা। সশব্দে বন্ধ করে দিল ফ্ল্যাটের দরজা।

ঘরে দাঁড়ানো নিশীথ সান্যালের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। সে কি হাতের লেখা আর হাতের ছাপ যাচাই করার কথায়? কে জানে।

.

০৯.

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে কর্নেল সেনকে ফোন করল সারিকা।

ফোন ধরল মেরিয়ন। সুরেলা গলায় প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

কে, মেরিয়ন? আমি সারিকা বলছি।

বলুন।

কাকু আছেন ঘরে?

হ্যাঁ, খেতে বসেছেন।

তা হলে এক কাজ করো। কাকুকে বললো, আমি দুপুরে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব জরুরি দরকার।

আচ্ছা।

ফোন নামিয়ে রাখল সারিকা। তারপর ফোনগাইডটা টেনে নিল তাক থেকে। খুঁজে খুঁজে বের করল নীরেন বর্মার ফোন-নম্বর। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল।

একটু পরেই ও-প্রান্ত থেকে কোনও অভ্যস্ত নারীকণ্ঠ ভেসে এল, অজন্তা কিউরিয়ো শপ।

মিস্টার বর্মা আছেন?

আপনি কে কথা বলছেন?

বলুন মিস সারিকা মুখার্জি ফোন করছেন। বিশেষ দরকার।

প্লিজ হোল্ড অন–।

মিনিটখানেক পর শোনা গেল নীরেন বর্মার ভরাট কণ্ঠস্বর, কে, মিস মুখার্জি?

হ্যাঁ, আপনি কি এখন দোকানেই আছেন?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে। ফোনে বলা সম্ভব নয়। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আপনার দোকানে যাচ্ছি।

আসুন, আমি অপেক্ষা করব।

রিসিভার নামিয়ে রাখল সারিকা। প্রেমনাথ ধরের ব্যাপারটা মিস্টার বর্মাকে জানানো দরকার। কারণ, প্রেমনাথ ধর বহ্নিশিখার খোঁজে হয়তো আজ রাতেই নীরেন বর্মা বা আনন্দ কাপুরের বাড়িতে হাজির হবে। ওঁদের সাবধান করে দেওয়া সারিকার কর্তব্য। তা ছাড়া, এই নকল নিশীথের ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছে ও। কী করবে ঠিক করতে পারছে না। নীরেন বর্মাকে সব কথা জানানো কি ঠিক হবে?

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্তে এল সারিকা। ও আনন্দ কাপুরকে না বললেও মিস্টার বর্মা এবং বিক্রম সেনকে সবকিছু খুলে বলবে। গতকাল রাতে ডক্টর কাপুর প্রেমনাথ ধরকে অনুসরণ করছেন দেখে ও ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। তা হলে রোহিত রায়কেও কি অনুসরণ করছিলেন আনন্দ কাপুর। কিন্তু তার হাঁটা-চলা দেখে তো স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। পা টেনে তো তিনি চলেন না! তা হলে কি প্রেমনাথ ধরই...?

আর ভাবতে পারল না সারিকা। সব কিছু যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে মাকে বলে ও বেরিয়ে পড়ল। গন্তব্য কিউরিয়ো শপ।

গভর্নমেন্ট প্লেসে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কাছাকাছি দোকানটা। দোকানের মাপ নেহাত অগ্রাহ্য করার মতো নয়। গেটের বাইরে উর্দিপরা দারোয়ান থেকে শুরু করে সেস-গার্ল সবই আছে।

একটু আড়ষ্ট পায়ে দোকানে ঢুকল সারিকা। দোকানের ভেতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। বেশ কয়েকটা উলঙ্গ বা সিলিংয়ে লাগানো। তাদের কর্কশ আলো সাজানো কিউরিয়োগুলোর ওপর ঠিকরে পড়ছে! অর কিউরিয়োগুলো যেন সেই ঠিকরে পড়া আলোকে শুষে নিচ্ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীরেন বর্মাকে খুঁজে বের করার আগে তিনিই দেখতে পেলেন সারিকাকে। সহাস্যে এগিয়ে এলেন। আলো পড়ে তার কপালের দুপাশে রুপোলি রেখা চিকচিক করে উঠল। পরনের কালো স্যুট এবং গলায় লাগানো রক্ত-লাল টাই তাঁর পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দিচ্ছে।

আসুন, মিস মুখার্জি, ওয়েলকাম টু মাই বিজনেস প্লেস।

সারিকা হেসে বলল, আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা ছিল। যদি...।

চলুন, পেছনের অফিসে বসেই কথা বলা যাবে।

দোকানের বাঁ দিকে ভারি পরদা দেওয়া একটা দরজা। পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে সামনে দাঁড়ানো একজন সেল্‌সম্যানকে ডাকলেন নীরেন বর্মা ও মেহ্‌রো, যদি কেউ আমার খোঁজ করে তা হলে বলবে আমি নেই–অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে।

পরদা সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল সারিকা। নীরেন বর্মা হাত বাড়িয়ে আলো জ্বাললেন। তারপর ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলেন। টেবিলে রাখা কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন, বসুন, মিস মুখার্জি, বলুন, জরুরি ব্যাপারটা কী?

কাল রাতে একজন লোক আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিল–ওই পাথরটার খোঁজে।

বলেন কী! তারপর?

প্রেমনাথ ধরের সমস্ত ঘটনাই বলে গেল সারিকা। রোহিত রায়ের প্রসঙ্গও বাদ দিল না। সবশেষে বলল, সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, ডক্টর কাপুরকে অত রাতে দেখে–? প্রেমনাথ ধরকে অনুসরণ করার ব্যাপারটা বলল ও।

তাই নাকি! তা হলে তো আর সন্দেহ নেই। বহ্নিশিখা নির্ঘাত ওই কাপুর সরিয়েছে। লোকটার হাঁটা-চলাই যেন আমার কেমন-কেমন লাগে।

আমি কিন্তু প্রেমনাথ ধরকে আপনার আর কাপুরের নাম বলেছি। সে আপনাদের কাছে হয়তো আসবে। তাই আগে থাকতেই জানিয়ে গেলাম।

ও–। একটু যেন থমতো খেয়ে গেলেন নীরেন বর্মা। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি ফুটিয়ে বললেন, যাকগে চুনিটা তো আর আমার কাছে নেই! বিপদে পড়লে আনন্দই পড়বে। তবুও সাবধান থাকা ভালো।...আচ্ছা, এইমাত্র যে নিশীথ সান্যালের ব্যাপারটা বললেন, মানে– আপনি কি শিয়ের যে, লোকটা একটা ইম্পস্টার?

আমি শিয়োর বলেই তো ইন্সপেক্টরকে বলব, আগামীকাল নিশীথ সান্যালের হাতের লেখার সঙ্গে এই জালিয়াতটার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে। তখনই সব ধরা পড়ে যাবে।

কিন্তু এই লোকটি নিশীথের জায়গা নিতে চাইছে কোন উদ্দেশ্যে? নীরেন জানতে চাইলেন।

মনে হয় বহ্নিশিখার খোঁজে। কারণ আগেই তো আপনাকে বলেছি, নিশীথের কাছে খালি বাক্স দেখে প্রেমনাথ ধর কেমন ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিল। এই লোকটি হয়তো ভাবছে চুনিটা নিশীথের কাছেই আছে। দেখি, কাল মনে হয় সব জানতে পারব। সারিকা উঠে দাঁড়াল : আজ তা হলে চলি। পরে একদিন ফোন করে সব জানাব আপনাকে।

আচ্ছা। ডক্টর কাপুরের কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন। লোকটা সুবিধের নয়। নীরেন বর্মাও উঠে দাঁড়ালেন : ও–ভালো কথা। আমি ওই যে ক্যাটালগের কথা বলেছিলাম না, সেটাতে একটা বড় চুনির ছবি আছে। তার নামও বহ্নিশিখা। তবে কোনওরকম হার বা চেন ওটার সঙ্গে লাগানো নেই।

তা হলে হয়তো এই পাথরের ছবিই হবে। তা ছাড়া পেৰমনাথ ধর তো বলেইছে, চেনটা রোহিত রায় নিজে লাগিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু…।

আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। পকেট থেকে একটা মুখভোতা অটোমেটিক বের করলেন নীরেন বর্মা। হাসলেন : লাইসেন্স করা আত্মরক্ষার অস্ত্র-অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন।

বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল সারিকা। বাড়ির দিকে রওনা দিল। স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে ওকে আবার বেরোতে হবে। দেখা করতে হবে কর্নেল সেনের সঙ্গে।

.

দুপুর দুটো নাগাদ সতীশ মুখার্জি রোডে কর্নেল সেনের বাড়িতে পৌঁছোল সারিকা। বাগান এবং বাড়ির সমন্বয়কে যদি বাগানবাড়ি বলা যায়, তা হলে কর্নেল সেনের বাড়িটা

তাই। লম্বা টানা সিমেন্ট বাঁধানো পথ গিয়ে শেষ হয়েছে একফালি বাগানের প্রান্তে। সেখানে ফুলের চেয়ে সবুজ পাতার সমারোহই বেশি। বাগানের গায়েই টান-টান হয়ে দাঁড়ানো তিনতলা সাদা ধবধবে বাড়িটা।

শুরুর গ্রিলের দরজাটা পার হয়ে বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়াল সারিকা।

কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল।

দরজা খুলল মেরিয়ন। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল সারিকা। মেরিয়ন দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

কর্নেল বিক্রম সেন ড্রইংরুমেই বসেছিলেন। গায়ে জড়ানো একটা ধূসর শাল। হাতে একটা বই মনে হল গল্পের বই।

সারিকাকে দেখতে পাননি কর্নেল সেন। গল্পের বইটায় একেবারে ডুবে ছিলেন। সারিকা কাছে এগিয়ে যেতেই ওর উপস্থিতি টের পেলেন। মুখ তুললেন।

কী রে, এসেছিস? হেসে হাতের বইটা বন্ধ করে রাখলেন তিনি।

সারিকা দেখল, ওটা একটা গোয়েন্দা গল্পের বই। ওর নজর অনুসরণ করে বিক্রম সেন কিছু একটা যেন আঁচ করলেন, বললেন, একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিলাম। দেখলাম কী জানিস! শুধু বিশ্লেষণ আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণই একজন গোয়েন্দাকে জাতে তুলতে পারে– যাগকে, তুই কী বিশেষ দরকার আছে বলেছিলি মেরিয়নকে?

সারিকা চোখ ফেরাতেই দেখল মেরিয়ন তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। শুধুই মেয়েলি কৌতূহল, না আর কিছু?

কর্নেল সেনও ব্যাপারটা লক্ষ করলেন। তারপর বেশ গম্ভীরস্বরে বললেন, মেরিয়ন, যাও হাতের কাজ সেরে নাও গিয়ে।

সব কাজ হয়ে গেছে আমার। মেরিয়ন জবাব দিল।

ওর ইচ্ছেটা বুঝতে বিক্রম সেনের অসুবিধে হল না। বললেন, সব কাজ যখন হয়ে গেছে, তখন দাড়ি কামানোটা সেরে নাও। বিকেলের জন্যে আর ফেলে রাখবে কেন!

সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল মেরিয়ন।

সারিকা আর হাসি চাপতে পারল না। গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

কর্নেল সেনও হাসলেন ঃ মাঝে-মাঝে এমন গোঁয়ার্তুমি করে মেয়েটি, কড়া কথা না বলে উপায় থাকে না।...তা বল। কী বলবি?

কাকু নিশীথ সান্যাল ফিরে এসেছে।

তাই নাকি?...তবে আর তোর চিন্তা কী?

কিন্তু এ-নিশীথ সে-নিশীথ নয়—একজন জালিয়াত। সারিকা মাথা নীচু করে বলে চলল, আমার চিনতে ভুল হয়নি।

কর্নেল সেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরপর ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলোকে একটা ছকে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু জটিল ঘটনার সমারোহ আরও জটিল হয়ে গেল।

গতরাতের পেৰমনাথ ধরের ঘটনা থেকে শুরু করে আনন্দ কাপুরের অনুসরণ নিশীথের আবির্ভাব, অফিসে অনুসন্ধান—সব কিছু একে-একে বলে গেল সারিকা।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে চললেন বিক্রম সেন। সারিকার কথা শেষ হলে বললেন, আচ্ছা, সারি সারিকা মুখ তুলে তাকাল, নিউ মার্কেটের দোকানটায় তোর সঙ্গে নিশীথের যখন দেখা হয়, তখন তুই আগে ওকে চিনতে পারিস, না ও তোকে দেখে এগিয়ে আসে?

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সারিকা। তারপর নিশ্চিত স্বরে বলে উঠল, কাকু, সত্যি বলতে কী, নিশীথ আমাকে দেখে প্রথমটা ঠিক চিনতে পারেনি। আমি ওকে ডাকতেই ও বেশ একটু ইতস্তত করে এগিয়ে আসে। ও যে প্রথমটা কেন অমন অপরিচিতের ভান করল, ঠিক বুঝতে পারিনি।

কর্নেল সেন তখনও একইভাবে চোখ বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সারিকা থামতেই তিনি চোখ খুললেন দেখি তোর হাতটা।

সারিকা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। হতভম্ব মুখে ওর ডান হাতটা ধীরে ধীরে সামনে বাড়িয়ে ধরল।

কর্নেল সেন ওর হাতটা হাতে নিয়ে দেখলেন। অনামিকায় একটা আংটি–তাতে কারুকাজ করে সারিকার নামের প্রথম অক্ষর এস লেখা।

তা হলে আমার সন্দেহই দেখছি ঠিক আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করলেন বিক্রম সেন।

সারিকা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাতেই কর্নেল সেন হাসলেন : তুই তো বলছিলি নিশীথের এক দিদি শান্তিনিকেতনে থাকে?

হ্যাঁ।

তা হলে এক কাজ কর। আগামীকাল সকালে আমার বাড়িতে তাকে যেমন করে হোক নিয়ে আয়। তারপর এই নকল নিশীথকে এখানে ডাক। নিজের ভাইকে চিনতে নিশ্চয়ই কেউ ভুল করবে না! আর নিশীথও আগে থাকতে জানতেই পারবে না, ওকে কেন ওই সময়ে আমার বাড়িতে ডাকা হয়েছে।

প্রস্তাবটা সারিকার মনে ধরল। ও সানন্দে সম্মতি জানাল : ঠিক আছে, আমি আজই অনন্যাদেবীকে একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। বলছি, কাল দশটার সময় তোমার বাড়িতে

আসতে।

কী কী নাম বললি? বিক্রম সেন হঠাৎই কৌতূহলী হয়ে পড়লেন।

অনন্যা-অনন্যা রায়। নিশীথের দিদির নাম।

ফেমাস সোসাল ওয়ার্কার? আর পশ্চিমবঙ্গ নারী সমিতির সেক্রেটারি?

হ্যাঁ, কেন? সারিকা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

তা হলে তাকে টেলিগ্রামে জানাবি, তার মহিলা তহবিলে জনৈক কর্নেল সেন হাজারদশেক টাকা চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। তা হলে এখানে আসার কারণ সম্পর্কে ওঁর মনে কোনওরকম সন্দেহ থাকবে না। আর আমিও আমার কাজটা সেরে নিতে পারব।

গ্র্যান্ড আইডিয়া, কাকু। সারিকা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলঃ আমি তা হলে এখনই যাই–নিশীথের কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে টেলিগ্রামটা করে দিই।

এক মিনিট, সারি– গম্ভীরভাবে বললেন বিক্রম সেন, একটা জরুরি কথা তোকে জানানো হয়নি।

কী কথা? সংশয়ে সারিকার ভুরু কুঁচকে উঠল।

কথাটা কাল সন্ধ্যায় হারানো বহ্নিশিখাকে নিয়ে মাথার কাঁচা-পাকা চুলে হাত চালালেন কর্নেল সেনঃ ওটা হারায়নি, সারি, কেউ চুরি করেছে।

আমি আগেই জানতাম! উত্তেজিত হয়ে সামনের টেবিলে একটা চাপড় কষিয়ে দিল সারিকা। আমিও ঠিক সেই সন্দেহই করেছি।

বহ্নিশিখাটা আমিই চুরি করেছি, সারিকা।

ঘরের মধ্যে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

.

১০.

প্রায় সাতাশ সেকেন্ড সারিকা বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইল কর্নেল সেনের দিকে। তারপর অস্ফুষ্ট চাপা স্বরে বলল, কাকু-তুমি-তুমি!

হাঁ–আমিই। মুচকি হাসলেন বিক্রম সেন ও বহ্নিশিখা এখন আছে আমার সিন্দুকে। দেখবি?

সারিকা চুপ।

হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ালে গাঁথা সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কম্বিনেশন চাকতি ঘুরিয়ে লোহার ভারি দরজাটা খুলে ধরলেন। সারিকা যন্ত্রচালিতের মতো এসে দাঁড়াল কর্নেল সেনের পিছনে।

সিন্দুকের ওপরের তাকেই নিরীহভাবে পড়ে রয়েছে বহ্নিশিখা।

সারিকার দিকে ফিরে হাসলেন কর্নেল সেন। তারপর সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কাল রাতে আনন্দ আর নীরেন যখন আমাকে সার্চ করেছিল, তখন পাথরটা আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম আমার হুইলচেয়ারে গদির নীচে। সবাই চলে যাওয়ার পর আবার বের করে নিই। পাথরটা। কিন্তু, সারি, পাথরটা আমি কেন চুরি করেছিলাম জানিস? কারণ, আমি জানতাম এই পাথরটার জন্যেই তুই বিপদে পড়বি। তা ছাড়া কাল সন্ধেবেলা প্রথম নজরেই আমি বুঝতে পারি পাথরটা নকল নয়, আসল। এখন নীরেন আর আনন্দ থেকে শুরু করে প্রেমনাথ ধর পর্যন্ত জানে বহ্নিশিখা উধাও হয়ে গেছে। তাই কেউই আর

পাথরটার জন্যে তোকে বিরক্ত করবে না। সবাই ভাববে পাথরটার হদিস আর সকলেরই মতো তোরও অজানা।

সারিকার থমথমে মুখে ধীরে-ধীরে হাসি ফুটল। সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য ক্রমশ স্পষ্ট হল ওর কাছে। কর্নেল সেন যে ওকে বাঁচানোর জন্যই চুনিটা লুকিয়েছেন, সে-বিষয়ে ওর মনে আর কোনও সন্দেহই রইল না।

একটা ব্যাপারে তোকে কথা দিতে হবে। কর্নেল সেন বলে চললেন, তুই এই বহ্নিশিখার সন্ধান কাউকেই আর বলবি না। এটা যে আমার কাছে আছে, তোর মুখ থেকে একথা যেন না বেরোয়। আমাকে কথা দে।

কথা দিলাম। হাসল সারিকা তবে একটা জিনিস আমি আজ আবিষ্কার করেছি, কাকু। যত রাজ্যের গোয়েন্দাকাহিনি পড়ে-পড়ে তুমি নিজেও একজন পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ।

তার আরও পরিচয় আগামীকাল সকালে তুই পাবি। একটা সাঙ্ঘাতিক কিছুর জন্যে নিজেকে তৈরি করে রাখ।

সারিকা স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কর্নেল সেনের মর্মভেদী নজরের দিকে। তারপর বলল, আমি এখন তা হলে যাই, টেলিগ্রামটা করে দিই গিয়ে..।

বিদায় নিয়ে সারিকা এসে নামল রাস্তায়। ওর মনে বয়ে চলল চিন্তার ঝড়। হারানো বহ্নিশিখাকে ঘিরে যেন ছত্রিশ লোকের জটলা। প্রেমনাথ ধর, নীরেন বর্মা, আনন্দ কাপুর, মেরিয়ন, নকল এবং আসল নিশীথ সান্যাল, জারিন আগরওয়াল। কিন্তু এর জট কে খুলবে?

এ পর্যন্ত সারিকা শুধু জেনেছে বহ্নিশিখার ইতিহাস আর প্রেমনাথ ধরের পরিচয়—অবশ্য তার বলা কাহিনি যদি সত্যি হয়। তা ছাড়া হারানো চুনির জন্যই মারা গেল রোহিত রায়। কে খুন করল তাকে? কেন খুন করল? বহ্নিশিখার জন্য? নীরেন বর্মা আর ডক্টর আনন্দ কাপুর

দুজনে চুনিটা চুরির ব্যাপারে পরস্পরকে সন্দেহ করছেন। এ কি শুধুই সন্দেহ? নাকি এর পিছনে যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য আছে? তার ওপর রয়েছে নকল এবং আসল নিশীথের জটিল সমস্যা, অনুসরণকারীর সেই ছন্দোময় অদ্ভুত অনুসরণ।

সারিকা হার মানল। না, এ-জটিলতার সমাধান করা ওর পক্ষে অসম্ভব। রাস্তার যান্ত্রিক পরিবেশে মনকে ভাসিয়ে দিয়ে বাস স্টপের দিকে হেঁটে চলল সারিকা।

টেলিগ্রামের কাজ সেরে যখন ও বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। শীতের হাওয়া অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় তার রাজত্ব বিছিয়ে দিচ্ছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে অনন্যাদেবী আসবেন কি না কে জানে! তবে কর্নেল সেনের দশহাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছেটা তার কাছে নেহাত অগ্রাহ্য করার মতো হবে বলে মনে হয় না।

এলিভেটরে উঠে সুইচ টিপল সারিকা।

নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্রযানের দরজা। শুরু হল আরোহণ।

সারিকার বুকটা অনিশ্চয়তায় বারকয়েক কেঁপে উঠল। ভাবল, যেখানে মানুষকে বিশ্বাস করাটাই মুশকিল, সেখানে মানুষের তৈরি একটা যন্ত্রকে বিশ্বাস কী! যদি এই মুহূর্তে এটা বন্ধ হয়ে যায়! তখন কে শুনতে পাবে সারিকার চিৎকার! এলিভেটরের দরজার ফ্রেমে মোটা রবারের লাইনিং দেওয়া রয়েছে। সেটা ভেদ করে কোনও শব্দ বাইরে বেরোবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সারিকার সমস্ত দুশ্চিন্তাকে মিথ্যে প্রমাণ করে ছতলায় এসে এলিভেটর থামল।

আজ করিডরের আলো ঠিক মতোই জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল সারিকা।

পিসিমা দরজা খুলে দিলেন। ওকে দেখেই জিগ্যেস করলেন, কীরে, এত দেরি হল! আমরা এদিকে চিন্তা করছি...।

সারিকা হেসে বলল, এখন আর চিন্তার কিছু নেই। কর্নেলকাকুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনি সব প্রবলেম সম্ভ করে দেবেন বলেছেন।

সারিকা ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

সারিকা মনে এক অপ্রত্যাশিত আঁকুনি খেল। কে ফোন করছে! নিশীথ নয় তো? হয়তো ও কোনও বিপদে পড়েই সারিকাকে ফোন করছে। হয়তো এই মুহূর্তে ওর সাহায্যের প্রয়োজন।

কিন্তু ফোন তুলতেই ওর ধারণা এবং আশঙ্কা আরও একবার মিথ্যে বলে প্রমাণিত হল। কারণ ডক্টর কাপুরের স্বরের তারল্য সারিকার কানে ধরা পড়ল হ্যালো বলামাত্রই।

আশা করি আমার রং নাম্বার হয়েছে? ও-প্রান্তের কণ্ঠ ভেসে এল দূরভাষে।

উত্তরে নিজের ফোন নম্বর বলল সারিকা।

অসম্ভব! ডক্টর কাপুরের স্বরে একরাশ বিস্ময়, এরপর আপনি হয়তো বলে বসবেন আপনার নাম সারিকা মুখার্জি?

আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে! ঠাট্টা করে বলল সারিকা।

মাই গড! অবশেষে আপনাকে পাওয়া গেল! আমি আনন্দ কাপুর বলছি।

আমিও সেইরকম আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রথমে অমন অসম্ভব, অসম্ভব, বলছিলেন কেন? আমাকে কি এক্সপেক্ট করেননি?

আর বলবেন না। গত আধঘণ্টা ধরে পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর আপনার নম্বরে ফোন করে যাচ্ছি। রেজাল্ট তো বুঝতেই পারছেন! তাই আপনি যখন ফোন তুললেন, তখন ভাবলাম–নির্ঘাত রং নম্বর হয়েছে।

সারিকা হাসলঃ হঠাৎ এত জরুরি টেলিফোন? প্রয়োজনটা কী?

প্রয়োজনটা গুরুতর–এবং আপনাকে জড়িয়েই। কাল রাতে আমি আপনাকে ফলো করেছিলাম। কারণ, শুনেছিলাম ওই পাথরটার জন্যে আপনার নাকি বিপদে পড়ার পসিবিলিটি আছে। আপনার বাড়ির কাছে পৌঁছে আমি উলটোদিকের একটা গাড়ি বারান্দার নীচে অপেক্ষায় রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখলাম একজন বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা লোক পাতিল ম্যানসন থেকে বেরিয়ে আসছে। জানি না, তার সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়েছে কি না, তবে জানবেন লোকটি সুবিধের নয়।

ধন্যবাদ। কিন্তু ওইরকম কোনও লোককে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল সারিকা : ডক্টর কাপুর, আজ সকালে আমি মিস্টার বর্মার দোকানে গিয়েছিলাম।

বহ্নিশিখা চুরির ব্যাপারে উনি কিন্তু আপনাকেই সাসপেক্ট করছেন।

কী? এতবড় সাহস! রাগে ফেটে পড়লেন ডক্টর কাপুর ও পাথরটা যদি কেউ চুরি করে থাকে, তো ওই আনঅর্থোডক্স বিজনেস ম্যানটাই করেছে! জানেনই তো, কিউরিয়ো কেনা বেচার লাইনটাই দুনম্বরি! খবরদার, ওই লোকটার সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করবেন না। ব্যাটা কথায় লোককে ভোলাতে ওস্তাদ।

সারিকা মনে-মনে হাসল। ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল।

সারা সন্ধেটা কীভাবে কাটাবে ভেবে পেল না সারিকা। কাজ যখন নেই, তখন ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়?

যা ভাবা সেই কাজ। ফোন তুলে থানায় যোগাযোগ করল ও। শুনল ইন্সপেক্টর দেশাই থানাতেই আছেন। বাইরের পোশাক ওর পরাই ছিল। সুতরাং মাকে ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়ল সারিকা। বলে গেল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।

ফ্ল্যাটের বাইরে আসতেই দেখল নিশীথ আর জারিন আগরওয়াল সিঁড়ি ভেঙে ওপর থেকে নেমে আসছে।

সারিকার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিল জারিন। নিশীথ কিন্তু হাসল; সারিকা, তোমার রাগ এখনও পড়েনি বলে মনে হচ্ছে?

পড়েছে! অভিসন্ধি নিয়ে হাসল সারিকা ও আমি আর তোমাকে নকল বলে সন্দেহ করছি না। তখন কী যে হয়েছিল হঠাৎ...।

যাক বাবা, বাঁচালে নিশীথও হাসল। কারণ হাসি সংক্রামক বিশেষ করে কোনও প্রমীলার উপস্থিতিতে।

নিশীথ, কাল সকাল দশটায় এক জায়গায় তোমাকে আমি নিয়ে যাব। আশা করি তোমার আপত্তি হবে না?

কোথায়? প্রেসিডেন্সি জেলে?

না। আমার এক কাকা কর্নেল বিক্রম সেনের বাড়িতে। সারিকার মুখে দুষ্টুমির হাসিঃ তিনি বলেছেন, এত ঝড়-ঝাপটার নায়কটিকে তিনি একটিবার দেখতে চান।

নিশীথ সানন্দে ঘাড় নাড়ল : রাজি। তবে ডান হাতের ব্যাপার-ট্যাপারের কথা তোমার কাকাকে মনে করিয়ে দিয়ো। কারণ, অনশনে আমি অভ্যস্ত নই।

নিশীথ এবং সারিকার হাসিতে জারিনও যোগ দিল। মনে হল, ও আগের চেয়ে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

ওদের পাশ কাটিয়ে লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সারিকা। বোতাম টিপে এলিভেটর উঠে আসার অপেক্ষায় রইল।

নিশীথ সুযোগ পেয়ে রসিকতা করতে ছাড়ল না, কী ব্যাপার, তোমার যন্ত্র-আতঙ্ক তা হলে কমেছে।

না, কমেনি। তবে উপায় কী?...তা ছাড়া, আগামী অলিম্পিকের ওয়েট লিফটিংয়ে আমি নাম দিচ্ছি না। সুতরাং ছতলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা করে লাভ নেই।

এলিভেটরে উঠে বোতাম টিপল সারিকা। যন্ত্রযান নিঃশব্দে নামতে শুরু করল। সেই সঙ্গে সারিকার চিন্তাও নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল।

কাল সকালে কর্নেল সেনের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে নিশীথকে রাজি করাতে পেরেছে বলে প্রথমে ও খুশি হল। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল এই নিশীথ যদি আসল নিশীথ না হয়, তা হলে সে ওর লিফট-আতঙ্কের কথা জানল কেমন করে! সারিকার স্পষ্ট মনে আছে, ওর এই যন্ত্র-আতঙ্কের মনস্তত্ত্বের কথা নিশীথ ছাড়া বাইরের আর কেউ জানত না। তা হলে?

থানায় পৌঁছে দরজার দাঁড়ানো কনস্টেবলকে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের নাম বলল সারিকা। লোকটা যেভাবে ওর আপাদমস্তক জরিপ করল তাতে মনে হল সে জীবনে এই প্রথম কোনও যুবতীকে দেখছে।

আধমিনিট পর্যবেক্ষণের পর সে সংবিৎ ফিরে পেল। বলল, আসুন।

হয়তো কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল হওয়ার আশায় লোকটি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে চর্চা করছে। উন্নতি করার একমাত্র অস্ত্র।

কনস্টেবলকে অনুসরণ করে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের ঘরে এসে ঢুকল সারিকা। সারিকাকে ওপরওয়ালার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেন বিরাট একটা উপকার করে গেল, এরকম মুখভাব

করে সে বেরিয়ে গেল।

বিরলকেশ মস্তকে একবার হাত চালিয়ে ইন্সপেক্টর দেশাই বললেন, বসুন, মিস মুখার্জি খবর আছে।

সারিকা একটা চেয়ার দিয়ে টেবিলের এ-প্রান্তে ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের দিকে মুখ করে বসল।

টেবিলে রাখা পেপারওয়েটটাকে দশ আঙুলে নাড়াচাড়া করতে করতে ইন্সপেক্টর দেশাই সারিকার দিকে চোখ তুলে তাকালেন ও মিস মুখার্জি, নিশীথ সান্যালের আইডেন্টিফিকেশন সম্পর্কে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। কারণ আঙুলের ছাপ আর হাতের লেখা মিলিয়ে দেখার কাজটা আমি ফেলে রাখিনি–আজই সেরে ফেলেছি। আপনার সমস্ত সন্দেহ ভুল।

আমি নিশীথের হাতের লেখা মোটামুটি চিনি। সুতরাং এই জাল নিশীথের হাতের লেখাটা যদি আমাকে একটু দেখান, তা হলে হয়তো চিনতে পারব–আসল কি নকল।

চলুন–আমার কোনও আপত্তি নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর দেশাই? আই হোপ ইউ উইল চেঞ্জ ইয়োর মাইন্ড।

.

হতাশ ও বিভ্রান্ত সারিকা যখন চক্রবেড়িয়া রোডে পা দিল, রাত তখন পৌনে নটা। এই মুহূর্তে নিশীথের পরিচয় নিয়ে সারিকা বেশ দ্বিধায় পড়েছে। ইন্সপেক্টরের দেখানো সাক্ষ্য প্রমাণ ও নিজের চোখে দেখেছে। দুজনের আঙুলের ছাপে বা হাতের লেখায় এতটুকু ফারাক নেই। কিন্তু তা হলেও সংশয়ের ছায়াটা সারিকার মন থেকে এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। শেষে হয়তো দেখা যাবে…।

সারিকার কানের পরদা কেঁপে উঠল সুপরিচিত যতি ও গতির ছন্দে। মর্স কোডের প্রথম অক্ষরটা যেন ছায়ার মতো ওকে অনুসরণ করছে। এ-অঞ্চলে রাস্তাঘাট এমনিতেই নির্জন

থাকে। তার ওপর শীতের রাতে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না ও। শুধু চলার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ওই অদ্ভুত শব্দটা ওর সঙ্গে আঠার মতো লেগে রইল।

শেষ পর্যন্ত পাতিল ম্যানসনে ঢুকতেই কিছুটা ভরসা পেল সারিকা। লিফটে উঠে চটপট বোতাম টিপল। এই মুহূর্তে যন্ত্রের চেয়ে মানুষের ভয়টাই ওর কাছে বেশি হল। মনে হল, ছতলা যেন আর আসতেই চায় না।

মনে হল, এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিজের ল্যান্ডিংয়ে ও পা রাখল। অবাক চোখে দেখল, ওদের ঘরের দরজার ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা লোক। বারান্দার আলো পড়েছে তার পিঠে, গায়ের জামায় এবং তার ফুলহাতা জামায় লাগানো ধাতব কাফলিঙ্কের ওপর।

সারিকার হৃৎপিণ্ড উন্মাদের মতো ঘুরপাক খেয়ে আচমকা থামল। কাঁপতে লাগল থরথর করে। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চাপা অস্ফুট আর্তনাদ।

সেই শব্দে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক। ঘুরে তাকাল। তার বাঁ-গালের ছোট্ট আঁচিলটা উত্তেজনায় কাঁপছে।

সারিকা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। এ কদিনের অষ্টপ্রহর দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, সমস্ত কিছু ভাবাবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে ও বলে উঠল, নিশীথ–তুমি তা হলে ফিরে এসেছ! এ কদিন কোথায় ছিলে! জানো, সবাই আমাকে...।

আর কথা শেষ করতে পারল না সারিকা–শরীর এলিয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু ঝাপসাভাবে ও যেন দেখল, অনুভব করল, দুটো বলিষ্ঠ হাতের আশ্বাস, আশ্রয়, ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরল। বোজা চোখের ওপর আঙুলের উষ্ণ স্পর্শ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারাল সারিকা।

.

১১.

সারিকা যেন স্বপ্নের ঘোরে সাগরের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। ওর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটা বুদবুদের মতো ধীরে-ধীরে ভেসে উঠতে লাগল চেতনার জগতে।

ওর জ্ঞান যখন ফিরল, বিস্ময় তখনও ওর পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। ব্যাপারটা যে অলীক অথবা মিথ্যে স্বপ্ন নয়–সেটা ও বুঝতে পারল নিশীথের স্পর্শে। ও এমন দৃষ্টিতে নিশীথকে দেখতে লাগল, যেন দীর্ঘ কয়েক বছর পর সে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিশীথ হাসলঃ ভয় নেই, আমি এসে গেছি।

সারিকার স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি। ও শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে দেখতে লাগল।

ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা মুখগুলো ক্রমশ চেনা হয়ে যেতে লাগল।

মা, পিসিমা, পিসেমশাই, সম্রাট আর নিশীথ।

ওঃ, নিশীথ, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম।

অনেকক্ষণ পর ঘরটাকে নিজেদের ড্রইংরুম বলে চিনতে পারল সারিকা। ও তাড়াতাড়ি উঠে বসল। দেখল, এতক্ষণ ও ড্রইংরুমের সোফায় শুয়ে ছিল।

মা সঙ্গে-সঙ্গে এক গ্লাস জল ওর সামনে ধরে দিলেন : এই জলটুকু খেয়ে নে, ভালো লাগবে।

পিসেমশাই বললেন, আমি ডক্টর ভট্টাচার্যকে খবর দিচ্ছি।

পিসিমা বললেন, চল, ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোকে শুইয়ে দিই…।

সারিকা কোনও কথা বলতে পারছিল না। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।

মা আর পিসিমা ওকে সাবধানে ধরে-ধরে শোওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

সারিকা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল। সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে সকলের সামনে আকুলভাবে ডেকে উঠল, নিশীথ!

নিশীথ আশ্বাসের হাসি হাসল, বলল, আজ শুধু বিশ্রাম। কাল সব কথা হবে।

পিসেমশাই নিশীথকে বললেন, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। তা না হলে একটা বিরাট বিপদ হতে পারত।

নিশীথ সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, আসলে ও বোধহয় খুব টেনশনে আছে। কাল সকালে আমি এসে ওর সঙ্গে কথা বলব। তা হলেই বুঝতে পারব কীসের জন্যে এত টেনশন।

পিসেমশাই আনমনাভাবে বললেন, আমি কিছু-কিছু শুনেছি। আপনি কথা বলে দেখুন।

নিশীথ আসি বলে চলে গেল।

.

পরদিন নিশীথের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে বসল সারিকা।

চা-বিস্কুটের পালা শেষ হতেই ও কোনওরকম ভূমিকা না করে সরাসরি প্রশ্ন করল, এ দু-দিন তুমি কোথায় ছিলে?

সবই বলছি, সু। নিশীথের কণ্ঠে ব্যগ্র সুর : কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, যে পাথরটা তুমি নিউ মার্কেট থেকে কিনেছিলে, সেটা কোথায়?

সারিকা ভীষণভাবে একটা মানসিক ধাক্কা খেল। একটা অজানা সংশয় ওর মনের গহনে ছায়া ফেলে গেল। গলার স্বরকে সংযত করে সংক্ষিপ্তভাবে ও জবাব দিল, কিন্তু সে কথা বলার আগে তোমার এই উধাও হওয়ার কারণ আমার জানা দরকার।

রাগ কোরো না, সু। ওকে বোঝাতে চাইল নিশীথ ও সেসব কথা বলে তোমার বিপদকে আমি আর বাড়াতে চাই না। শুধু-শুধু তুমি।

চুনিটার নাম বহ্নিশিখা। ওই পাথরটার জন্যেই রোহিত রায় খুন হয়েছে। আমি সবই জানি, নিশীথ। সারিকা শান্ত স্বরে বলল।

আকস্মিক ভূমিকম্পেও বোধহয় এতটা চমকে উঠত না নিশীথ। বিস্ময়ে তার চোখজোড়া বুঝি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

তুমি তুমি কী করে জানলে!

বললাম তো, আমি সবই জানি। শুধু জানি না, প্রেমনাথ ধর, সুখেন বর্মা আর রোহিত রায়ের মধ্যে তুমি কেমন করে আসছ।

নিশীথ বিস্ময়ে বোবা।

বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে কী যেন ভাবল নিশীথ। অনুভব করল, ওর দিকে সারিকার স্থির দৃষ্টি।

তারপর হঠাৎ একসময় ও মুখ খুলল, রোহিত রায় আমার বন্ধু ছিল। কাশ্মীর থেকে পাথরটা যখন ও এখানে নিয়ে আসে তখন আমি জানতে পারি, ওটা কোত্থেকে কীভাবে রোহিতের হাতে এসেছে। তার কিছুদিন পর রোহিতের মুখে শুনলাম, পুলিশ ওর পিছু নিয়েছে। আমি ওকে বারবার বোঝালাম, পাথরটা জায়গামতো ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া, ওই চুনিটা কোথাও বিক্রি করা ওর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, কলকাতার

ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টও চুনিটার খোঁজে ক্ষিপ্ত হাউন্ডের মতো ঘুরছে। এরপর অবস্থা আরও জটিল হল–আরও দুটো দল এসে হাজির হল চুনির সন্ধানে। তার মধ্যে একজন কাশ্মীরের এজেন্ট–প্রেমনাথ ধর। আর দ্বিতীয়জনের পরিচয় আমি জানি না। শুধু জানি মারা যাওয়ার কয়েকদিন থেকে রোহিত ভীষণ ভয়ে ভয়ে ছিল। ও বলত একটা অদ্ভুত শব্দ নাকি ওকে অষ্টপ্রহর ফলো করে বেড়ায়। সেই শব্দের মালিককে ও কখনও চিনতে পারেনি। একবার ভাবত পুলিশ, আবার ভাবত, হয়তো অন্য কেউ।

আমার বরাবরের চেষ্টা ছিল চুনিটা ফেরত দেওয়া। তাই রোহিতকে আমিও ফলো করতাম। সেদিন নিউ মার্কেটের ওই দোকানে আমি ঢুকেছিলাম রোহিতকে ফলো করে। তার পরের ঘটনা তো তুমি সবই জানো থামল নিশীথ। সারিকা চুপচাপ কী ভাবতে লাগল। তারপর আচমকা জিগ্যেস করল, রোহিতকে কে খুন করেছে?

সারিকার স্বরে চমকে উঠল নিশীথ। অবাক হয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সন্দেহ করছ না। তোমার মনে আছে, যখন সেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, তখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে? তা হলে তুমিই বলো, আমাকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয়। তা ছাড়া রোহিত আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল।

সারিকার মুখ থেকে সংশয়ের ভাবটা কেটে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম, নিশীথ।

সু, এবার চুনিটা আমাকে দাও। সেদিন তুমি যে কখন ওটা বাক্স থেকে নিয়ে গলায় পরেছিলে, আমি টেরই পাইনি। পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি বাক্সটা খালি।

চুনিটা আমার কাছে নেই, নিশীথ।

তা হলে কার কাছে? নিশীথ উদগ্রীব, আমি চাই না, ওই পাথরটার জন্যে কেউ বিপদে জড়িয়ে পড়ুক।

সারিকা ভাবছিল কর্নেল সেনের কথা। প্রাণ থাকতে চুনিটার সন্ধান কাউকে জানাতে তিনি বারণ করেছেন। কাউকে নয়।

তা হলে সারিকা কি নিশীথকে বলে দেবে, ওটা কর্নেল সেনের কাছে আছে? নাকি।

কী হল–জবাব দাও! চুপ করে থেকো না। নিশীথ একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

চুনিটা চুরি গেছে। সারিকা গত সন্ধ্যার কাহিনি খুলে জানাল নিশীথকে। শেষে বলল, এই একই কথা প্রেমনাথ ধর আমাকে জিগ্যেস করছিলেন কাল রাতে। কে যে ওটা চুরি করেছে বলা মুশকিল। আমার মনে হয়, আনন্দ কাপুরই হয়তো পাথরটা সরিয়েছেন।

মিনিটদুয়েক গুম হয়ে রইল নিশীথ। তারপর আপন মনেই বলে উঠল, যে করেই হোক বহ্নিশিখা আমার চাই।

সারিকা অবাক চোখে চেয়ে রইল নিশীথের মুখের দিকে। দেখল, ওর চোয়াল কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে।

সু, যদি চুনিটার কোনও খোঁজ পাও, তা হলে এই নম্বরে আমাকে ফোন করে জানাবে। একটা কাগজে খসখস করে একটা ফোন নম্বর লিখে সারিকার হাতে তুলে দিল নিশীথ ও আমাকে এখন কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে।

হঠাৎই নকল নিশীথের কথা মনে পড়ল সারিকার। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, নিশীথ, একটা মজার ব্যাপার তোমাকে জানাতে একদম ভুলে গেছি। তুমি উধাও হওয়ার একদিন পর আর একজন লোক এসে তোমার ফ্ল্যাট দখল করেছে। বলছে, সে-ই নিশীথ সান্যাল। তার সঙ্গে তোমার চেহারার কিছুটা মিল আছে তা ঠিক। কিন্তু আমি সঙ্গে-সঙ্গেই ধরে ফেলেছি লোকটা জালিয়াত। তাই পুলিশে খবর দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা সবরকম টেস্টেই অদ্ভুতভাবে উতরে যাচ্ছে। এমনকী তোমার সঙ্গে তার হাতের লেখা পর্যন্ত মিলে

গেছে। তবে আমি এখনও হাল ছাড়িনি। কাল সকালেই আছে এক চরম অ্যাসিড টেস্ট। তোমার দিদি কাল আসছেন নকল নিশীথকে শনাক্ত করতে।

সর্বনাশ করেছ, সু! ভীষণভাবে চমকে উঠল নিশীথ, ওই লোকটার নাম রূপক চৌধুরী। ওকে আমিই পাঠিয়েছি। কারণ, আমার অ্যাবসেন্স বিশেষ কয়েকজনের চোখে পড়ুক, তা আমি চাইনি।

কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই, নিশীথ। তীর আমার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। কাল সকাল দশটায় রূপক চৌধুরী ধরা পড়বেই।

নিশীথ চিন্তান্বিতভাবে বলল, সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি কী যে করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না...আচ্ছা, সু, আমি চলি। চুনিটার কোনও হদিস পেলে আমাকে ফোন করতে ভুলো না।

সারিকার হাতে আস্তে চাপ দিয়ে হাসল নিশীথ। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ও চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সারিকা। সত্যিই, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। রূপক চৌধুরীকে নিশীথই তা হলে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন এই লুকোচুরি?

ভাবতে-ভাবতে ঘুমে চোখ বুজে এল সারিকার। কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল ও। দরজা বন্ধ করে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে।

অনন্যাদেবী যদি সত্যিই কাল সকালে এসে পড়েন, তা হলে রূপক চৌধুরীকে বাঁচানোর কোনও রাস্তা সারিকা দেখতে পাচ্ছে না। ধরা তাকে পড়তেই হবে।

জারিনের কথা ভেবে দুঃখ হল সারিকার।

.

১২.

দশটা বাজতে তখনও মিনিটকয়েক বাকি।

কর্নেল সেনের বসবার ঘরে সারিকা বসে। বুকে একরাশ উৎকণ্ঠা।

অনন্যাদেবী এখনও এসে পৌঁছননি। আসেনি রূপক চৌধুরীও।

গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলেন কর্নেল সেন। পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরেন বর্মা। আনন্দ কাপুর আপনমনে কার্পেটের ওপর পায়চারি করছিলেন–একটু অধৈর্যভাবে।

সারিকা এসেছে সবার আগে। এসেই গতকাল রাতে আসল নিশীথের সঙ্গে ওর কথাবার্তার কথা বলেছে কর্নেল সেনের কাছে। তিনি শুধু চুপচাপ মাথা নেড়েছেন। হয়তো কিছু একটা আন্দাজও করেছেন, কিন্তু সারিকাকে কিছু বলেননি।

এরপর এসেছেন নীরেন বর্মা এবং আনন্দ কাপুর। কর্নেল সেনই ওঁদের দুজনকে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ডেকে আনার উদ্দেশ্য বা আসন্ন নাটক সম্পর্কে কোনও আভাস ওঁদের দেননি।

এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। ডক্টর কাপুরই এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলে দিলেন।

ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন, তাকে চিনতে সারিকার অসুবিধে হল না। কারণ অনন্যা রায়ের পরিচয় রোজকার খবরের কাগজের মাধ্যমে কম-বেশি সকলেরই জানা।

ভদ্রমহিলার চেহারা একটু ভারির দিকেই। সিঁথির সিঁদুর কষ্ট করে দেখতে হয়। সাজগোজ তেমন দৃষ্টিকটু নয়। চোখে চশমা, হাতে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ।

অনন্যাদেবীকে দেখেই হাতের বইটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলেন কর্নেল সেন। বললেন, আসুন, মিসেস রায়–আমারই নাম কর্নেল বিক্রম সেন। হাত তুলে নমস্কার জানালেন তিনি।

উত্তরে অনন্যাদেবীও প্রতি-নমস্কার জানালেন। এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন।

আপনি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি, মিসেস রায়। তা ছাড়া, দেখছেনই তো আমার অবস্থা–গত যুদ্ধের পুরস্কার। কর্নেল সেন হাসলেন।

অনন্যাদেবী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তার চোখ পড়ল নিশীথের ওপরে।

খোলা দরজার ফ্রেমে নিশীথ দাঁড়িয়ে। ও কখন এসেছে কেউ খেয়াল করেনি।

কীরে, তুই এখানে। তিনি নিশীথকে দেখে রীতিমতো অবাক।

নিশীথও কম অবাক হয়নি। সে সোজা এগিয়ে এল সারিকার কাছে ও সারিকা, এসব কী ব্যাপার! তুমি শেষ পর্যন্ত দিদিকে এখানে টেনে এনেছ!

কর্নেল সেন নিশীথকে বাধা দিলেন না, মিস্টার সান্যাল, মিসেস রায়কে আমিই আসতে বলেছিলাম সামান্য কিছু চাঁদা দেওয়ার জন্যে।

নিশীথ চুপ করে গেল। কর্নেল সেন এবার ফিরলেন অনন্যা রায়ের দিকে। ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন : মিসেস রায়, এই নিন–চেকটা রাখুন।

ধন্যবাদ। টাকার অঙ্কের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মিসেস রায় বললেন, এই দশহাজার টাকায় আমাদের অনেক নতুন পরিকল্পনা বাস্তব হয়ে উঠবে।

এমন সময় চা-জলখাবার নিয়ে ঘরে এল মেরিয়েন।

মিসেস রায় তখন একমনে নিশীথের সঙ্গে গল্প করছেন। সারিকা কান খাড়া করে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করল। বেশিরভাগ কথাই পুরনো দিনের, আত্মীয়স্বজন সংক্রান্ত।

না, এরপর নিশীথের পরিচয় সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহই থাকা উচিত নয়। কিন্তু...।

নানান আলোচনার পর প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ অনন্যাদেবী রওনা হলেন। যাওয়ার আগে কর্নেল সেনকে আরও একবার ধন্যবাদ জানালেন। নিশীথকে ওঁর বাড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অনন্যা রায় ঘর ছেড়ে বেরোতেই ফেটে পড়ল নিশীথ সান্যাল ও সারিকা, এসব নাটকের অর্থ কী! এখনও কি আমার সম্পর্কে তোমার সন্দেহ যায়নি?

নিশীথের প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল সেন, নিরুপায় হয়েই আমাদের এই অ্যাসিড টেস্ট করতে হয়েছে এবং এখন আমরা শিওর হয়েছি।

আমি হইনি। কাটা স্বরে বলে উঠল সারিকা, কারণ, আসল নিশীথ কাল রাতে আমার কাছে এসেছিল। ও বলেছে, এর নাম রূপক চৌধুরী নিশীথ সান্যাল নয়। আর এই রূপক চৌধুরীকে নিশীথই পাঠিয়েছে ওর জায়গায় অভিনয় করতে।

চমৎকার! নিশীথের স্বরে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল, চমৎকার। অ্যাক্টিং লাইনে গেলে তোমার সম্ভাবনা দেখছি আমার চেয়েও বেশি!

মিস মুখার্জি, যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির একটা পসিবল সলিউশন আমি করতে চাই। ধরুন ইনিই নিশীথ সান্যাল...।

থাক, নীরেন, আমি জানি তুমি কী বলবে। নীরেন বর্মাকে বাধা দিলেন কর্নেল সেন, কিন্তু সেটা আমি ঠিক এই মুহূর্তেই শুনতে চাই না। আগামীকাল রাতে আমরা প্রথম থেকে শুরু করে সমস্ত অদ্ভুত সমস্যারই সমাধান করার চেষ্টা করব। সারি, কাল সন্ধ্যায় তুই আসবি–

আর তোর আসল নিশীথকেও ডেকে আনিস। কারণ, শেষ দৃশ্যে ওর থাকার দরকার আছে।

সভাভঙ্গের স্পষ্ট ইঙ্গিত। সুতরাং একে-একে সকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। একমাত্র সারিকা অবুঝের মতো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে রইল।

কর্নেল সেন সারিকার মাথায় হাত রাখলেন? নীরেন তোকে যে কথাটা বলতে যাচ্ছিল, সেটা আমিই তোকে বলতে পারি। তখন সবাই ছিল বলে আমি নীরেনকে বাধা দিয়েছি। শোন– সারিকা মুখ তুলে তাকাল ও অ্যালজেব্রার বহু প্রবলেম এক অদ্ভুত উপায়ে সলভ করা হয়। তাকে বলে মেথড অফ ইনভারশন বা বিপরীত অনুপাত পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। তুই শুধু নির্শীথ সান্যাল আর রূপক চৌধুরীর নামটা ওলটপালট করে দে, তা হলেই দেখবি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

সারিকা থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল হঠাৎই পৃথিবীটা উন্মাদের মতো ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। তারপর আচমকা সব থেমে গেল। ঘরের পরিবেশে নেমে এল নিস্তব্ধতার রাজত্ব।

হ্যাঁ, সারি। তুই যাকে এতদিন নিশীথ ভেবেছিস, সে আসলে রূপক চৌধুরী। আর যাকে তুই রূপক চৌধুরী মনে করেছিস, সে সত্যি-সত্যিই নিশীথ সান্যাল। তা ছাড়া, সে-ই যে আসল তুই তার নানান প্রমাণ পেয়েছিস। নকল নিশীথের কাজগুলো খুঁটিয়ে অ্যানালাইজ করলেই তার জালিয়াতি অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। মনে করে দেখ, তুই-ই আমাকে বলেছিলি যে, নিউ মার্কেটের দোকানে নিশীথ প্রথমে তোকে চিনতে পারেনি। তুই তাকে ডাকার পর সে ইতস্তত করে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ, রোহিত রায়কে অনুসরণ করে সে ওই দোকানটায় ঢোকে। একরাশ নকল পাথরের মধ্যে থেকে আসল পাথরটাকে চিনে নিয়ে সে হয়তো খুঁজে বের করতে পারত, কিন্তু গোলমাল বাঁধালি তুই। তুই ওকে নিশীথ বলে ডাকার পর সে তোর কাছে এগিয়ে আসে। অথচ তোর নাম জানা তো দুরের কথা, তোকে সে জীবনে কোনওদিন দেখেইনি। কিন্তু রূপকের– জানি না, ওটা ওর আসল নাম কি না–

উপস্থিত বুদ্ধি আছে। সে তোর হাতের আংটি দেখে বুঝল তোর নামের প্রথম অক্ষর এস। সুতরাং স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুযায়ী শর্টে সু নামে তোকে ডাকতে শুরু করল। তুই কিছুটা অবাক হলে সে তোকে একটা ঠাট্টা করে থামিয়ে দেয়।

নিশীথ সান্যালের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে তুই আগে কোনওদিন মিশেছিস বলে আমার মনে হয় না। তাই চেহারার সামান্য তফাত আর আচার-ব্যবহারের আকাশ-পাতাল ডিফারেন্স তোর চোখে পড়ল না। তুই ওই রূপক চৌধুরীকেই আসল নিশীথ বলে ভাবতে শুরু করলি। তার স্বভাব, চেহারা সব তোর মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলল। তাই যখন আসল নিশীথ হাজির হল, তুই তাকেই নকল বলে মনে করলি।

তাই যদি হয়, তা হলে রূপক তো চুনিটা নিয়েই সরে পড়তে পারত! আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর ওর কী দরকার ছিল? সারিকা জানতে চাইল।

ছিল–দরকার ছিল। কর্নেল সেন বললেন, কারণ, যখন সে তোকে দেখতে পায়, তখন তুই চুনিটা হাতে নিয়ে পছন্দ করে ফেলেছিস। সে তো আর দোকানের একঘর লোকের সামনে তোর হাত থেকে পাথরটা ছিনিয়ে নিতে পারে না। তা ছাড়া, মনে করে দেখ, পাথরটা কেনার জন্যে সেও তোকে যথেষ্ট রিকোয়েস্ট করেছিল। কারণ, তুই পাথরটা কিনলে সে পরে কোনও ছলছুতোয় সেটা নিয়ে সরে পড়তে পারবে। সে-চেষ্টাও রূপক করেনি তা নয়। কিন্তু তুই যে রেস্তরাঁয় চুনিটা গলায় পরে বসেছিলি, তা সে বুঝতে পারেনি। তাই ভুল করে খালি বাক্স নিয়েই সরে পড়েছে। পরে যখন দেখেছে বাক্সে পাথরটা নেই, তখন আবার ফিরে এসেছে তোর কাছে ছদ্ম পরিচয়ে কাল রাতে। কর্নেল সেন থামলেন।

সারিকার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সমস্ত ঘটনা আবার প্রথম থেকে ও ভাবতে শুরু করলসম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে।

কর্নেল সেনের সিদ্ধান্তে যে ভুল নেই সেটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। তা হলে কি রূপকই ওকে কাল রাতে রাস্তায় অনুসরণ করেছিল? রোহিত রায়কে অনুসরণ করার কথা ও তো

নিজের মুখেই সারিকার কাছে স্বীকার করেছে। কিন্তু রোহিত রায়কে খুন করল কে?

কর্নেল সেন জবাব দিলেন, রোহিতকে কে খুন করেছে, তাও আমি জানি।

সারিকা চমকে উঠল। বুঝল, ওর শেষ চিন্তাটা নিজের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কৌতূহলী হয়ে ও জানতে চাইল, কিন্তু কাকু, ওরকমভাবে কে ফলো করছে বলে তোমার সন্দেহ হয়?

সন্দেহ নয়, সেটা সরাসরি জানা যাবে কাল রাতে। তুই বলেছিলি, পেছনে তাকিয়ে তুই কাউকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখিসনি। সেই কারণেই আমার মনে হয়, অনুসরণকারীর পায়ে কোনওরকম দোষ নেই। কিন্তু ওই অদ্ভুত ডট-ড্যাশের মতো পা টেনে চলার শব্দ যখন হয়, তখন নিশ্চয়ই তার পায়ে এমন কোনও ব্যথা আছে, যার জন্যে সে ওইভাবে চলতে বাধ্য হয়। নইলে সাধ করে কেউ ওভাবে একটা স্পেশাল সাউন্ড করে তোর অ্যাটেনশন চাইত না। মোটামুটি সবই আমার জানা হয়ে গেছে, সারি। কাল রাতে তুই রূপককে নিয়ে আয় সব জানতে পারবি।

কিন্তু রূপক চৌধুরী এর মধ্যে কী করে জড়িয়ে পড়ল? ওর এক্সপ্লানেশনে তোমার বিশ্বাস হয়, কাকু, যে রোহিত ওর বন্ধু ছিল, তাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই...?

না। বিশ্বাস হয় না। তবে সত্যি-মিথ্যে আমরা সবই জানতে পারব কাল রাতে।

.

১৩.

সে-রাতে সারিকার বহুদিনের আশঙ্কা সত্যি হল।

এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে ওর একটু দেরিই হয়েছিল।

পাতিল ম্যানসনের সামনে এসে ও দেখল দরজার কেউ নেই। এতে ও তেমন অবাক হয়নি। অবাক হল লিফটের কাছে এসে।

লিফট অন্ধকার।

ভেতরের ঘোলাটে বাল্বটা কেটে গেছে।

লিফটে উঠবে কি না সেটা দুবার চিন্তা করল সারিকা। কিন্তু না উঠেও উপায় নেই। কারণ এই ক্লান্ত শরীরে ছ-তলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই দরজার কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ পেল সারিকা। কিন্তু ঘুরে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই।

সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে ও লিফটে উঠল। বোতাম টিপতে যাবে, শুনল একটা পায়ের শব্দ। যেন কেউ পা টেনে-টেনে হেঁটে আসছে লিফটের দিকে।

আর ভাবতে পারল না সারিকা। চট করে বোতাম টিপে দিল। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের ধাতব দরজা। যন্ত্রযান উঠতে শুরু করল।

একইসঙ্গে সারিকার সেই পুরোনো আতঙ্কটা দানা বাঁধতে লাগল। যত সব বাজে ম্যানিয়া ভাবল ও। মানুষের ভুল হতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের কখনও ভুল হয় না। এইসব লিফট তৈরি হওয়ার পর বারবার পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনও খুঁত আছে কি না। সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনও মানে নেই। এতদিন কেন যে ও ভয় পেয়ে এসেছে কে জানে!

কিন্তু আজ লিফটের ভেতরে ঘন অন্ধকার। দরজাটা যে কোন দিকে সেটা ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না সারিকা। এমন সময় হঠাৎই লিফট থামল!

দরজাটা তক্ষুনি একপাশে সরে যাওয়ার কথা, কিন্তু সরল না।

এই শীতেও সারিকা ভয়ে ঘামতে শুরু করল। প্রাণপণে লিফটের দেওয়ালে একটানা ধাক্কা দিয়ে চলল। কিন্তু যে-শব্দ তাতে হল, মনে হয় না কেউ তা শুনতে পাবে। তা ছাড়া,

লিফটের ভেতরে বসানো কাচের চাকতিতে শেষ নম্বর ও দেখেছিল পাঁচ। অর্থাৎ, লিফট এসে ছতলাতেই থেমেছে। আর পরমুহূর্তেই সেই চাকতির আলোও নিভে গেছে।

আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেল সারিকা। দু-হাতে এলোপাতাড়ি আঘাত করে চলল লিফটের ধাতব দেওয়ালে। আর একইসঙ্গে একটানা চিৎকার। সে-চিৎকারের শব্দ বদ্ধ ধাতব খাঁচায় যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো মনে হল।

একসময় একটু দম নেওয়ার জন্য থামল সারিকা। আর তখনই শুনতে পেল কারও গলা। যেন ফিসফিস করে কেউ কথা বলছে।

উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই, মিস মুখার্জি। আপনার চিৎকার কেউই শুনতে পাবে না।

সারিকা প্রথমে ভাবল, এই ফিসফিসে শব্দটা আসছে লিফটের ওপর থেকে। কিন্তু একটু পরেই বুঝল, না, শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। দরজার জোড়ে মুখ চেপে কেউ কথা বলছে।

....কারণ ছ-তলার দুটো ফ্ল্যাটের দরজাতেই তালা। লিফট যে ছ-তলায়, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

সারিকা জানে কথাটা মিথ্যে নয়। ওর চিৎকার শোনার লোক ছ-তলায় কেউ নেই। বিকেলেই ও দেখেছে, জারিন নিশীথের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। পিসিমারাও নিশ্চয়ই মাকে সঙ্গে করে কোথাও বেরিয়েছেন। নইলে ওর ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হয়তো শুনতে পেতেন।

কিন্তু কে এই অদৃশ্য শত্রু?

মিস মুখার্জি, লিফটের ফিউজ আমি খুলে নিয়েছি। ভেতরের বাল্বটাও আমিই খুলে রেখেছি। কেন জানেন? আপনার কাছ থেকে একটা খবর চাই বলে। আশা করি নিজের

অবস্থার কথা ভেবে আপনি ঠিকঠাক উত্তর দেবেন।...বহ্নিশিখা কোথায়?

আমি—আমি জানি না। ঢোক গিলে জবাব দিল সারিকা। মনে-মনে অনুমান করার চেষ্টা করল এই গলা কার। সে কি ওর পরিচিত, না অপরিচিত?

জানেন না?...তা হলে জেনে রাখুন, লিফটের ভেতরে দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে সাধারণ মানুষের মিনিটদশেক লাগে। আপনার কমিনিট লাগবে বলতে পারি না।

তার মানে! চিৎকার করে উঠল সারিকা।

তার মানে এই লিফটে হাওয়া চলাচলের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ। ওপরের ভেন্টিলেটারটা আমি অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্টটা আপনি বেশ স্পষ্টভাবে টের পাবেন।...দেখুন তো, এবার মনে পড়ছে কি না, বহ্নিশিখা কোথায়!

সারিকা চোখ তুলে ভেন্টিলেটারটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই নজরে এল না।

তবে নেপথ্য ব্যক্তির কথা যে ঠিক সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। সত্যিই, ক্রমশ ওর শ্বাস-প্রশ্বাস যেন ঘন হয়ে উঠছে। লিফটের আবদ্ধ বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে।

কিন্তু না, শত বিপদেও কর্নেল সেনকে এই নৃশংস শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না সারিকা। মনের সমস্ত শক্তি এক করে সারিকা বলে উঠল, বহ্নিশিখা চুরি গেছে। ওটা কে নিয়েছে আমি জানি না। কথা বলতে এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল সারিকার।

মিথ্যে কথা! দরজার বাইরে আগন্তুক হিসহিস করে গর্জে উঠল, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন! এখনও সময় আছে, মিস মুখার্জি। নয়তো মনে করে দেখুন, আপনার মোমের মতো শরীরটা সামান্য অক্সিজেনের অভাবে ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠবে। তারপর আপনার

নাকের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে রক্ত। চোখজোড়া লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। এখনও বলুন বহ্নিশিখা কোথায় আছে।

উত্তরে সারিকা প্রচণ্ড জোরে দরজার ধাক্কা মারল। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে।

আবার কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

তারপর হাসির শব্দ ভেসে এল দরজার বাইরে থেকে। আগন্তুকের ফিসিফিসে স্বরে বেজে উঠল সম্মোহনের সুর, এভাবে চেঁচিয়ে কোনও লাভ হবে না, মিস মুখার্জি। শুধু-শুধু হাঁপিয়ে পড়বেন। যত হাঁফিয়ে পড়বেন তত বেশি অক্সিজেন আপনার দরকার হয়ে পড়বে। অর্থাৎ মৃত্যুর দরজার দিকে আপনি আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবেন।...পাথরটা কোথায়, বলুন। এই আপনার লাস্ট চান্স। তারপরও যদি চুপ করে থাকেন, তা হলে আমি সোজা এবাড়ি ছেড়ে চলে যাব– অফ কোর্স, আপনাকে এ অবস্থায় রেখেই। সুতরাং জীবন অথবা মৃত্যু, যে-কোনও একটা বেছে নিন।

লিফটের অন্ধকারে ভীষণ অসহায় বোধ করল সারিকা। ধীরে-ধীরে ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কোনওরকমে উত্তর দিল, পাথরটা কর্নেল সেনের কাছে আছে। এখন দরজাটা খুলে দিন– সারিকা মাথা ঝুঁকিয়ে পড়ে রইল।

আচমকা আলো জ্বলে উঠল, এবং দরজা খোলার শব্দ হল। মুখ তুলল সারিকা। দেখল দরজা খুলে গেছে। ল্যান্ডিংয়ের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে লিফটের ভেতরে।

চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সারিকা। ওর সামনে কেউ নেই। তা হলে কি লোকটি সিঁড়ি দিয়েই সরে পড়েছে?

বাইরে এল ও।

কী করবে ভেবে ওঠার আগেই দেখল, লিফট নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। বোধহয় নীচ থেকে কেউ বোতাম টিপেছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখল সারিকা। না, কেউ নেই।

একটু পরেই লিফট আবার ছতলায় এসে থামল। লিফট থেকে বেরিয়ে এল নিশীথ এবং জারিন। সারিকার অবস্থা দেখে ওদের দুজনের চোখে ফুটে উঠল বিস্ময় এবং সংশয়।

কী হয়েছে, সারি? জারিন এগিয়ে এল ওর কাছে? তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে!

সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বলল সারিকা। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে দাঁড়াল নিশীথ। তীরবেগে সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করল।

সারিকা আর জারিন একবার ফিরে তাকাল নিশীথের চলে যাওয়া শরীরের দিকে, তারপর আবার পরস্পরের চোখে চোখ রাখল।

কর্নেল সেনকে ফোন করে এখুনি সাবধান করা দরকার। সারিকা বলল।

চলো–তা হলে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

জারিনের ঘরে ঢুকে কর্নেল সেনকে ফোন করল সারিকা।

ও-প্রান্ত থেকে সাড়া পেতেই ও রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, কে, কাকু? আমি সারি বলছি।

কী ব্যাপার? কর্নেল সেনের ভরাট কণ্ঠস্বরে কিছুটা উদ্বেগ।

সারিকা সমস্ত ঘটনা গড়গড় করে বলে গেল। শেষে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, লোকটা পুরুষ কি মহিলা সেটাও আমি বুঝতে পারিনি। কারণ, সবসময় সে ফিসফিসে স্বরে কথা বলছিল। আমি শেষ পর্যন্ত সইতে পারিনি, কাকু। লোকটাকে চুনিটার কথা বলে দিয়েছি।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল, তুই এক কাজ কর। ফোন করে নীরেন, আনন্দ এবং ইন্সপেক্টর দেশাইকে এখুনি আমার এখানে আসতে বল। আর তুইও দুই নিশীথকে নিয়ে চলে আয়। রহস্যের শেষ অঙ্কের অভিনয় আমি আর আগামীকালের জন্যে ফেলে রাখতে চাই না।

সুতরাং ফোন করে নীরেন বর্মা, ইন্সপেক্টর দেশাই এবং রূপক চৌধুরীকে কর্নেল সেনের বাড়িতে আসতে বলল সারিকা। অবাক হলেও তারা মুখে কিছু বলেননি।

কিন্তু আনন্দ কাপুরকে ফোনে পাওয়া গেল না।

একটু পরেই জারিনের ঘরে ঢুকল নিশীথ।

নাঃ, কাউকেই দেখলাম না। নিশীথ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, আর, সারিকা, লিফটের ভেন্টিলেটার তো ঠিকই আছে, কোনও অ্যাডেসিভ টেপ-ঠেপ কিছু লাগানো নেই!

ও–তা হলে স্রেফ সাইকোলজিক্যালি ভয় দেখানোর জন্যেই লোকটা অমন মিথ্যে কথা বলেছিল। চিন্তিতমুখে বলল সারিকা, যাকগে, নিশীথ, তুমি আর জারিন এখুনি আমার সঙ্গে চলো কাকুর বাড়িতে যেতে হবে। তিনি বলেছেন, এই সব রহস্যের শেষ অঙ্কটা আর আগামী রাতের জন্যে ফেলে রাখবেন না। অতএব গেট রেডি কুইক!

মিনিটখানেক পরেই একটা ট্যাক্সি ওদের তিনজনকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল সতীশ মুখার্জি রোডের দিকে।

.

১৪.

সারিকা, নিশীথ আর জারিন যখন কর্নেল সেনের বাড়িতে পৌঁছোল, তখন রাত প্রায় নটা।

বসবার ঘরে ঢুকে ওরা দেখল টেবিলের কাছে রাজকীয় ভঙ্গিতে শাল গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন কর্নেল সেন। হাতে একটা গল্পের বই। সামনের টেবিলে রাখা বহ্নিশিখা—আর তার পাশেই একটা কুৎসিত শ্মিসার মেশিন পিস্তল।

দরজা খোলার শব্দে বই থেকে মুখ তুললেন কর্নেল সেন, বললেন, আয়, সারি—আর কেউ এখনও আসেনি—তবে এসে পড়বে।

ওরা লক্ষ করল, ঘরের পুরু কার্পেট তুলে ফেলা হয়েছে। ঘরের এক কোণে চুপচাপ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে মেরিয়ন।

ওরা তিনজন একইসঙ্গে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেশিন পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরেছেন কর্নেল সেন ও ওয়ান বাই ওয়ান, প্লিজ। সারি, তুই আগে আয়—জুতো খোলার কোনও প্রয়োজন নেই।

সারিকা অবাক হয়ে এক-পা এক-পা করে ঘরের ভেতরে এগিয়ে এল। চেয়ারে বসল।

তারপর একই ভঙ্গিমায় জুতোর খটখট শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল জারিন এবং নিশীথ।

কর্নেল সেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল : এর জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার সান্যাল। কিন্তু সেই অদ্ভুত ফলোয়ারকে ধরতে গেলে তার বিচিত্র পায়ের শব্দ আমার শোনা দরকার। তাই আজ ঘরের কার্পেট সরিয়ে ফেলেছি।

কর্নেল সেনের কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে থেকে ভেসে এল ভারী বুটের শব্দ।

ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর দেশাই। একইসঙ্গে বহ্নিশিখা এবং শ্মিসার মেশিন পিস্তল দেখে চমকে উঠলেন।

বিক্রম সেন হাসলেন : এই পাথরটা একটা নটোরিয়াস জুয়েল, ইন্সপেক্টর—এবং শ্মিসার মেশিন পিস্তল ইজ অলসো আ নটোরিয়াস ডার্টি থিং—।

ইন্সপেক্টর দেশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন বিক্রম সেন দিস ইজ মাই শো, ইন্সপেক্টর। আপনার ভূমিকা এখানে শুধুমাত্র দর্শকের।

চুপচাপ একটা চেয়ারে বসলেন দেশাই। মুখে তার হতবুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট।

এমন সময় দেখা গেল দরজায় দাঁড়িয়ে নীরেন বর্মা, আনন্দ কাপুর, রূপক চৌধুরী এবং পে্রমনাথ ধর।

সারিকা চমকে উঠে দাঁড়াল : আপনি–আপনি এখানে কী করে এলেন?

প্রেমনাথ ধর হাসলঃ আপনাদের ফলো করে। আমি নীরেন বর্মা এবং ডক্টর কাপুরের সঙ্গে দেখা করে জেনেছিলাম বহ্নিশিখা তাঁদের কাছে নেই। তখন ভাবলাম আপনাকে নজরে রাখলে হয়তো পাথরটার সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে–তাই।

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন নীরেন বর্মা। কিন্তু কর্নেলের বজ্রকঠিন স্বরে থমকে দাঁড়ালেন।

একসঙ্গে কেউ ঘরে ঢুকবেন না। একে একে আসুন। নীরেন–তুমিই প্রথমে এসো।

নীরেন বর্মা অবাক হয়ে ছোট-ছোট পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ারে বসলেন।

নেক্সট-আপনি কর্নেল সেন প্মিসার উচিয়ে ধরলেন রূপক চৌধুরীর দিকে।

রূপক ধীরে-ধীরে সারিকার পাশে এসে বসল।

একইভাবে ঘরে ঢুকল পে্রমনাথ ধর।

সব শেষে এল ডক্টর কাপুরের পালা।

ডক্টর কাপুর একটা চেয়ার লক্ষ করে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সারিকা। রূপক চৌধুরী ও প্রেমনাথ ধর দু-চোখে অপার

বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল ডক্টর কাপুরের দিকে।

ডট-ড্যাশ। ডট–ড্যাশ।

মর্স কোডের শব্দটা হাজার মেশিনগানের শব্দের মতো এসে বাজল সারিকার কানে। ও বিকৃতকণ্ঠে এক আর্তচিৎকার করে ছুটে গেল কর্নেল সেনের কাছে। তাঁকে ভয়ে আঁকড়ে ধরল। ডুকরে উঠল অস্ফুট স্বরে, না-না–এ হতে পারে না!

ডক্টর কাপুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নীরেন বর্মা। শান্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন আনন্দ কাপুরের দিকে। ঘরের আলোয় তাঁর টেরিনের কালো স্যুট ঝলসে উঠল। তিনি আনন্দ কাপুরের সামনে গিয়ে থামলেন। মৃদুস্বরে বললেন, কাপুর, তোমাকে আমি বন্ধু বলেই জানতাম। সঙ্গে-সঙ্গে তার বাঁ-হাত শূন্যে ঝলসে উঠল। সপাটে এসে আছড়ে পড়ল কাপুরের চোয়ালে।

মেঝেতে ছিটকে পড়লেন আনন্দ কাপুর। তার ঠোঁট কেটে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। নীরেন তাকে টেনে তুলতে যাচ্ছিলেন, বিক্রম সেনের কথায় থমকে দাঁড়ালেন।

নীরেন, দিস ইজ মাই শো। ফিরে এসে চেয়ারে বসো।

নীরেন বর্মা চুপচাপ ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। কর্নেল সেন ডক্টর কাপুরকে লক্ষ করে শ্লিসার মেশিন পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন ও কাপুর, বহ্নিশিখাকে কবজা করার জন্য বহু পরিশ্রম তোমাকে করতে হয়েছে। সারিকাকে আমার আদরের সারিকাকে তুমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও ছাড়োনি। কিন্তু এখন তোমার অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। এগিয়ে এসে টেবিল থেকে বহ্নিশিখা তুলে নাও-ওঃ, কাম অন–।

আনন্দ কাপুর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন।

এসো কাপুর-আমার বাড়িতে আমার হুকুম শোনা ছাড়া তোমার উপায় নেই। গর্জে উঠলেন বিক্রম সেন।

আনন্দ কাপুর জামাকাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। পা টেনে-টেনে এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাত বাড়ালেন বহ্নিশিখার দিকে।

বিকট শব্দে গর্জে উঠল বিক্রম সেনের হাতের শ্লিসার।

আনন্দ কাপুরের হাত থেকে বহ্নিশিখা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাপুর রক্তাক্ত ডান হাত চেপে মেঝেতে বসে পড়লেন।

আই ক্যান্ট টলারেট এনি মোর। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর দেশাই।

বিক্রম সেন হাসলেন : তা হলে দরজা খোলাই আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন। তা ছাড়া, আপনি তো দেখলেন, কাপুর চুনিটা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। ঘরের সবাই দেখেছে। জিগ্যেস করুন।

দেশাই গম্ভীর মুখে ধক করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

সারিকা ফিরে এল ওর চেয়ারে।

রূপক চৌধুরী সারিকার কানে কানে বলল, সু, মনে আছে, যেদিন রোহিত রায় মারা যায়, সেদিন ওই স্পটের কাছেই একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই আনন্দ কাপুর?

সারিকার দৃশ্যটা মনে পড়ল। তখন ডক্টর কাপুর এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ও ঘাড় নাড়লঃ মনে পড়েছে।

কর্নেল সেনকে সেকথা জানাল সারিকা। তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন। আনন্দ কাপুরকে লক্ষ করে বললেন, রোহিত রায়কে খুন করা হয়েছিল, কাপুর। এখন আমার প্রশ্ন ওকে পেছন থেকে ধাক্কাটা কে দিয়েছিল, তুমি?

আনন্দ কাপুর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। ঠোঁটজোড়ার কাপুনি দেখে মনে হল, তিনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।

কাপুর, তুমি আমাকে চেনো। শান্ত স্বরে বললেন বিক্রম সেন, সত্যি কথা না বলা পর্যন্ত এই স্মিসারের গুলি একটা-একটা করে তোমার শরীরে ঢুকবে। না, মারা তুমি যাবে না। তবে বাকি জীবনটা তোমাকে হ্যাঁন্ডিক্যাল্ড হয়ে কাটাতে হবে। স্মিসার তাক করলেন কর্নেল সেন : প্রথমে বাঁ-হাত। এক..দুই...।

দু-হাতে চোখ ঢাকল জারিন এবং সারিকা। কর্নেল সেন কি পাগল হয়ে গেছেন!

বিক্রম, প্লিজ স্টপ স্টপ! আকুতি ঝরে পড়ল কাপুরের গলায়, বলছি, সব বলছি!..হ্যাঁ, রোহিত রায়কে ধাক্কা আমিই দিয়েছি!

দ্যাট ইজ উইলফুল মার্ডার। অতএব, ইন্সপেক্টর দেশাই, আপনি খুনের চার্জে আনন্দ কাপুরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরলেন কর্নেল।

ইন্সপেক্টর দেশাই উঠে এলেন চেয়ার ছেড়ে। আনন্দ কাপুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ও মিস্টার কাপুর, আপনাকে খুনের চার্জে অ্যারেস্ট করা হল।

আনন্দ কাপুর মাথা নীচু করে এসে বসলেন দেশাইয়ের পাশে। রক্তাক্ত ডান হাতে রুমাল চাপা দিলেন।

কর্নেল সেন আবার মুখ খুললেন, মিস্টার প্রেমনাথ ধর, আপনার চুনি আপনি ফেরত নিতে পারেন। এই চুনিটাকে নিয়ে যে পরিশ্রম আপনাকে করতে হয়েছে, তার জন্যে আমি

আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

প্রেমনাথ ধর এগিয়ে এসে বহ্নিশিখাকে তুলে নিল। পকেটে রাখল। তারপর কর্নেলকে একটা ছোট্ট ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল।

মিস্টার রূপক চৌধুরী! রূপক চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল? আশা করি আপনার নামের ব্যাপারে আমরা কোনও ভুল করিনি?

না। কর্নেল সেনের প্রশ্নের জবাব দিল সে। স্বর অকম্পিত : আমার নাম রূপক চৌধুরীই।

সারিকার কাছে আপনি যেসব কথা বলেছেন, তার কতটা সত্যি বলে আমরা মনে করতে পারি?

আংশিক।

যথা?

যথা, রোহিত রায় শুধু আমার বন্ধুই ছিল না–ও আমার ছোট বোনকে বিয়েও করেছিল। ওদের সুমন নামে একটা ছেলে আছে। রোহিত চুনিটা নিয়ে যখন কলকাতায় আসে তখন ওর বিপদের কথা আমরা জানতে পারি। আমার বোন এবং আমি ওকে অনেক বোঝাই। কিন্তু ও তখন লোভে অন্ধ। তাই আমাদের অনুরোধ-উপরোধ ওর কাছে বিরক্তিকর মনে হল। দিনের পর দিন ও পালিয়ে বেড়াতে লাগল। বলত, বিভিন্ন গ্যাং নাকি ওর পিছু নিয়েছে। অর্থাৎ প্রেমনাথ ধর, ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট, আর–এখন জানলাম–ডক্টর আনন্দ কাপুর।

আমি আমার ছোট বোনের কান্নাকাটি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম, যেভাবে হোক ওই চুনি আমি রোহিতের কাছ থেকে নিয়ে জায়গামতো ফেরত দেব। তাই শেষে আমিও ওকে ফলো করতে লাগলাম। তারপর রোহিত একদিন সন্ধ্যায় মারা গেল।

বহ্নিশিখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই সূত্রেই। রূপক চৌধুরী বসল। সারিকার দিকে ফিরে বলল, সু, তোমার সঙ্গে সেদিনের অভিনয়ের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, এই বহ্নিশিখার ব্যাপারে পুলিশ আমার বোনকে সাসপেক্ট হিসেবে এখনও হ্যারাস করছে। তাই এই পাথরটা ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো, সু–।

সারিকা আশ্বাসের হাত রাখল রূপকের হাতে। রূপক হাসল : নিশীথ সান্যালকে আমি জীবনে কোনওদিন দেখিনি। কিন্তু কী উপায় ছিল, বলো? তুমিই আমাকে নিশীথ বানিয়ে ছাড়লে!

সারিকা সলজ্জভাবে হাসল।

রূপক চৌধুরীর কথার সঙ্গে তাঁর কাজ হুবহু মিলে গেছে। অতএব সারি, তোর সব রহস্যের সমাধান এইখানেই শেষ। তবে মিস্টার সান্যালের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে তোর ক্ষমা চাওয়া উচিত। কর্নেল স্নিসারটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

সারিকা নিশীথের দিকে ফিরল : নিশীথ, সরি, আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না।

নিশীথ আর জারিন হাসল।

আশা করি সেই মাথার ঠিক না থাকার জন্যে মিস্টার চৌধুরীই পুরোপুরি দায়ী। নিশীথ রসিকতা করতে ছাড়ল না।

সারিকা মাথা নীচু করল।

সো গুড নাইট টু এভরিবডি। কর্নেল সেন ঘোষণা করলেন।

সকলেই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বিক্রম সেন সারিকাকে লক্ষ করে বললেন, সারি, কাল আমাকে একবার ফোন করিস।

ঘাড় হেলিয়ে দরজার দিকে এগোল সারিকা।

হঠাৎই আনন্দ কাপুর বাঁ-হাতের এক হ্যাঁচকায় ইন্সপেক্টর দেশাইয়ের রিভলভারটা টেনে নিলেন। বিকৃতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, খবরদার! কেউ এক পা নড়বেন না! ইন্সপেক্টর, আপনি তো আমাকে রোহিতের খুনের দায়ে অ্যারেস্ট করলেন, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, সে-বিষয়ে পুলিশকে আমার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার বলার আছে। ইন্সপেক্টরের দিক থেকে কর্নেলের দিকে ফিরলেন তিনি। বাঁ-হাতের রিভলবার নাচিয়ে বলে উঠলেন, বিক্রম, আমার ডান হাতের বদলে তোমার ডান হাত আমার পাওনা। সুতরাং... হয়তো রিভলবারের ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিলেন ডক্টর কাপুর, কিন্তু তার আগেই নীরেন বর্মার ভোঁতা অটোমেটিক গর্জে উঠল।

মুহূর্তের জন্যে একটা অপার বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল আনন্দ কাপুরের মুখে। তারপর তার নিপ্রাণ দেহটা মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

এ স্যাড বিজনেস। বললেন বিক্রম সেন, ধন্যবাদ, নীরেন–তুমি গুলি না করলে কাপুর হয়তো সত্যিই আমাকে গুলি করত।

নীরেন বর্মা শুধু হাসলেন। রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

ইন্সপেক্টর দেশাই উঠে টেলিফোনের কাছে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্স কল করে ফোন করলেন।

সকলেই চুপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

.

ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল বসবার ঘরে অতিথিরা কেউ নেই। সবাই চলে গেছেন– শুধু নীরেন বর্মা অধৈর্যভাবে পায়চারি করছেন। কর্নেল সেন হাতের গল্পের বইয়ে মগ্ন। মেরিয়নও

কখন যেন ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রাত প্রায় এগারোটা।

কর্নেল হঠাৎ মুখ তুললেন : নীরেন, অনেক রাত হল। তুমি বাড়ি যাও।

চমকে উঠলেন নীরেন বর্মা। থমকে দাঁড়ালেন। ও হ্যাঁ, যাব। কিন্তু শেষকালে আনন্দ এই কাজ করল! আমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

ও তো করেনি। আবার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন বিক্রম সেন।

তার মানে!

সুখেন এখন কোথায়, নীরেন? কর্নেল হাতের বইটা বন্ধ করে শ্নিসারের পাশে রাখলেন? শুনেছিলাম ও আর্মিতে আছে।

নীরেন বর্মা অবাক চোখে তাকালেন তার বন্ধুর হাসিখুশি মুখের দিকে। বললেন, ও, তুমি সবই জানো দেখছি! তার গলার স্বর ভারি হয়ে এল। ঘরের ছাদের দিকে আঙুল তুলে। দেখালেন, বললেন, ওপরে। ভগবানের কাছে গেছে।

তোমার একটা কালো শেভ্রলে গাড়ি আছে?

আছে। রোহিত রায় তোমার কী ক্ষতি করেছিল, নীরেন?

অনেক। সুখেনকে আমি সারা জীবনে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি। আমাকে বাবা বলে ডাকতে পর্যন্ত ও ঘেন্না করত। তাই ওর মা মারা যাওয়ার পর ও আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে মিলিটারিতে জয়েন করল। আমি বাধা দিতে পারিনি। সে-জোর আমার ছিল না। কিন্তু যখন শুনলাম, সুখেন প্রপেলারের ঘায়ে মারা গেছে, আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না। ক্রমশ জানলাম, ব্যাপার আরও গভীর। রোহিত রায় আমার ছেলেকে ব্রুটালি

মার্ডার করেছে। তাই প্রায় একইভাবে রোহিতকে আমি গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছি। তুমিই বলো, বিক্রম, যদি ওর মৃত্যুর শোধ আমি না নিতাম, তা হলে সুখেন কি কোনওদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারত! আমার যে নরকেও ঠাঁই হত না! নীরেন বর্মার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল ও একাজে আমি সাহায্য চাইলাম আনন্দের। ও স্রেফ চুনিটার লোভে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হল। যখন ও রোহিতকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়, তখনও ও জানত না, রোহিতকে আমি সত্যি-সত্যিই খুন করতে চলেছি। কিন্তু পরে ওই চুনিটার লোভে কাপুর যেন খেপে গেল। সারিকাকে হেনস্থা করতে পর্যন্ত ও ছাড়েনি। সারিকা বড় ভালো মেয়ে–ওর লিফট-আতঙ্কের কথা তোমার কাছেই শুনেছিল কাপুর।

কাপুর মারা যাওয়ার আগে তা হলে এইসব কথাই বলতে চাইছিল!

হ্যাঁ। মাথা নাড়লেন নীরেন বর্মা।

নীরেন, তুমি আমার ছোটবেলার বন্ধু। তা ছাড়া, একটু আগেই তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তাই একঘর লোকের সামনে আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি। কিন্তু...।

তুমি কী বলবে, আমি জানি। বিক্রম, আমার রিভলবারের গুলি এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আশা করি এটুকু বিশ্বাস তুমি আমাকে করবে। তা ছাড়া, সংসারে আমার আর কে আছে! সুখেন নেই, কবিতা নেই–সবাই অভিমানে আমাকে পৃথিবীতে একা রেখে ছেড়ে চলে গেছে। তা ছাড়া, কাপুরকে আমি ওর ঋণ শোধ করে দিয়েছি। আমার মনে আর কোনও দুঃখ নেই। শুধু শেষ ইচ্ছে, একা-একা চলে যাওয়ার সময় তোমাদের কয়েক ফোঁটা চোখের জল যেন আমার সঙ্গে থাকে। গুড নাইট।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন নীরেন বর্মা। রুদ্ধ কান্নায় তার সমস্ত শরীর ফুলে-ফুলে উঠছিল।

বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। ওপরের আকাশের দিকে তাকালেন। ঝকঝকে নক্ষত্রের উজ্জ্বল সমারোহ তার চোখের তারায় প্রতিফলিত হল। মাথা নামিয়ে নির্জন কালো রাস্তা ধরে তিনি বিজয়ীর মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেন। যেন নিঃসঙ্গ আলেকজান্ডার গ্রিসের রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছেন।

দূরে কোথাও কোনও ঘড়িতে শব্দ করে ঘণ্টা বাজল।

বিশ্বাসঘাতকদের জন্য

বিশ্বাসঘাতকদের জন্য

০১.

ড. নীতিন জোয়ারদার প্যারিসে একটি চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী রিনি। বিয়ের পর এই প্যারিসেই দুজনে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এসেছিলেন। তখনই এই শহরটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন ওঁরা দুজনে। তারপর কেটে গেছে কুড়িটি বছর। এবার এই সম্মেলনের সুযোগে নীতিন সস্ত্রীক এসেছেন প্যারিসে—দ্বিতীয়বার।

নড়বড়ে মান্ধাতার আমলের ট্যাক্সি চড়ে ফ্রান্সের রাজধানীর সদ্য-ঘুম-ভাঙা রাজপথ ধরে ওঁরা এসে উঠলেন বিলাসবহুল গ্র্যান্ড হোটেলে। খানিকক্ষণ পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের রঙ্গ-রসিকতায় ডুবে গেলেন দুজনে।

তারপর রিনি স্নান সেরে নিল। তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। নীতিন বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলেন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, রিনি কার্পেট পাতা মেঝের ওপর দিয়ে জামাকাপড়ের সুটকেসটা টেনে নিয়ে গেল চোখের আড়ালে। এবার পোশাক-টোশাক পরে ও তৈরি হয়ে নেবে। তারপর ওঁরা দুজনেই সম্মেলনের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

দাড়ি কামাতে কামাতে বাথরুম থেকেই নীতিন গলা উঁচু করে কথা বলছিলেন রিনির সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎই খেয়াল করলেন, রিনির কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তিনি স্ত্রীর

নাম ধরে ডাকলেন—একবার, দুবার।

কিন্তু কোনও সাড়া নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন নীতিন জোয়ারদার। হতবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, ঘরে আর কেউ নেই। রিনির ভেজা পোশাক একপাশে পড়ে আছে। আর তার কাছেই একটা সুটকেস– এই সুটকেসটা নীতিন আগে কখনও দেখেননি। তন্নতন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না তিনি।

একজন নিরীহ ছাপোষা ডাক্তারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হোটেলের ফ্ল্যাটে তিনি একা—আর কেউ নেই!

ড. নীতিন জোয়ারদারের স্ত্রী নামি হোটেলের দামি ঘর থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে উধাও হয়ে গেছেন।

এরপরই শুরু হল খোঁজ।

হোটেলের রিসেপশনের লোকজন বলল, মিসেস জোয়ারদারকে তারা হোটেল ছেড়ে বেরোতে দেখেননি।

ফরাসি পুলিশ অফিসার মুচকি হেসে বললেন, আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে হোটেলে এসে উঠেছিলেন তো!

কেউ বা বললেন, উনি হয়তো কোনও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ইলোপ করেছেন।

মধ্যবয়স্ক একটি মানুষ বিদেশ-বিভুঁই শহরে পাগলের মতো স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে গ্র্যান্ড হোটেলের একজন পরিচারকের দেওয়া সূত্র ধরে নীতিন জানতে পারলেন, দুজন লোক তার স্ত্রীকে একটা লাক্সারি সিডানে করে তুলে নিয়ে গেছে। সিডানটা

যে-গলিতে পার্ক করা ছিল সেখানে গিয়ে নীতিন খুঁজে পেলেন রিনির ব্রেসলেট। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ মানতে রাজি নয় যে, রিনিকে কেউ কিডন্যাপ করেছে।

হোটেলে ফিরে এসে হতাশভাবে বসে রইল একজন বিপন্ন মানুষ। নীতিন এখন কী করবেন? কার কাছে যাবেন সাহায্যের জন্য?

পরদিন ড. জোয়ারদারকে ফোন করল একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ।

ড. জোয়ারদার?

কথা বলছি।

আপনার স্ত্রী আমাদের কাছে রয়েছেন।

নীতিন জোয়ারদার পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলেন অচেনা লোকটিকে।

তারপর জানতে পারলেন, ওরলি এয়ারপোর্টে তার হাতব্যাগটি পালটে গেছে আর একজনের হাতব্যাগের সঙ্গে। সেই হাতব্যাগে একটা জিনিস আছে। সেটা নিয়ে এই লোকটির সঙ্গে কোথাও দেখা করে জিনিসটা দিলে ফেরত পাওয়া যাবে রিনিকে। আর নীতিন যদি পুলিশে খবর দেন তা হলে পাওয়া যাবে রিনির লাশ। এখন যেটা ড. জোয়ারদারের পছন্দ...।

.

অন্ধকার ঘরের বিশাল পরদায় বয়ে চলেছে রঙিন চলচ্চিত্র। রোমান পোলানস্কির রুদ্ধশ্বাস ছবি ফ্রানটিক-এর বাংলায় ডাব করা সংস্করণ। নায়ক ড. নীতিন জোয়ারদারের ভূমিকায় হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড। সিরাজ হোটেলের বলরুমের আবছায়া অন্ধকারে বসে বিশিষ্ট দর্শকরা ছবি দেখছেন।

বার্ষিক রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক সম্মেলন এইবার তৃতীয় বছরে পা দিল। উদ্যোক্তারা এ বছরে কয়েকটি ক্রাইম ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। ফ্লিম আর্কাইভ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে জিঘাংসা ও চিড়িয়াখানা। এ ছাড়া বাছাই করা কয়েকটি বিদেশি ছবি বাংলায় ডাব করে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আজ, প্রথমদিনের ছবি ছিল ফ্রানটিক।

ছবি যখন শেষ হল তখন ঠিক পৌনে তিনটে।

বলরুমের সাবেকী ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল। এ ছাড়াও অন্যান্য বাড়তি আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক।

অজস্র সাদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে সুদৃশ্য মঞ্চ। সাদা ফুলের ঘন পটভূমিতে গল্পের গোয়েন্দা শার্লক হোমসের বিখ্যাত ছবি। মাথায় চেক-চেক টুপি। পরনে একই নকশার কোট। ঠোঁটে পাইপ। বাঁকানো লম্বা নাক। ব্যক্তিত্বময় প্রোফাইল। চোয়ালের শক্ত রেখা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কাঁধ পেরোনোর পরই প্রখ্যাত গোয়েন্দার ছবিটা শেষ। কিন্তু অনায়াসেই বাকিটা কল্পনা করে নেওয়া যায়।

অনেকক্ষণ আধো-আঁধারির পর হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় বেঙ্গলি ক্রাইম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি ভাস্কর রাহা চোখ পিটপিট করছিলেন। চোখের আর দোষ কী! ওদেরও তো বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি হল! পাঁচ বছর আগেই ওদের রিটায়ার করা উচিত ছিল। কিন্তু পুরু লেন্সের চশমা ওদের প্রতি পদে সাহায্য করায় ওরা এখনও হাল ছাড়েনি।

হাল ছাড়েননি ভাস্কর রাহাও। সেই কোন কালে, বলতে গেলে কিশোর বয়েসে, লেখালিখি শুরু করেছিলেন। তারপর আর থামা হয়নি। নিষ্পাপ গল্প-কবিতার পথ থেকে কবে যেন পদস্খলিত হয়ে অপরাধ জগতে পা দিয়ে ফেলেছিলেন। ব্যস, তারপরই ফেরা-যায়-না এমন বিন্দুতে পৌঁছে গেছেন। অপরাধী সাহিত্য চর্চা করতে করতে কখন যেন ডুবে

গেছেন পাপের বোঝায়। আর কয়েক দশকের মধ্যেই জুটে গেছে কয়েকটা খেতাব। তার মধ্যে একটা হল রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট। একদিন রসিকতা করেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আড্ডায় কথাটা বলেছিলেন উৎপলেন্দু সেন। তারপর সেটাই যেন কেমন করে টিকে গেছে।

হ্যারিসন ফোর্ডকে ড. নীতিন জোয়ারদার বলে ভাবতে বেশ কষ্ট হয়– ভাস্কর রাহার পাশ থেকে উৎপলেন্দু মন্তব্য করলেন।

রাহা উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ডাব করা ছবি দেখতে বসে এসব ভাববেন, উৎপল। আমরাও তো গল্পের আইডিয়া যখন সাহেবদের থেকে লোন নিই তখন জোনাথানকে করি যতীন, ক্যাথারিনকে রীনা, আর রবার্টকে করি রবি। ধীরে-ধীরে এসব গা সওয়া হয়ে যাবে।

বলরুমে সুন্দর করে সাজানো সারি-সারি আধুনিক চেয়ার। চেয়ারে আমন্ত্রিত অতিথিরা বসে আছেন। লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, পাঠক, সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার–সব ধরনের অতিথিই হাজির হয়েছে এই সম্মেলনে। গত দু-বছরের তুলনায় এবারের সম্মেলনে জাঁকজমক ও আয়োজন একটু বেশি। কারণ, এবার বেশ কয়েকটি ভালো স্পনসর পেয়েছেন উদ্যোক্তারা। এ ছাড়া এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশকরা অন্তত তিরিশটি ক্রাইমজাতীয় বই প্রকাশ করেছেন। বলরুমের পাশের হলে একটি ছোট বইমেলারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভাস্কর রাহার বাঁদিকেই বসেছিলেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে এইবার শুরু হবে গল্প পাঠ। চার জন লেখক গল্প পড়বেন, তারপর সেই গল্পগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। চারজনের মধ্যে প্রথম নামটিই রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ভাস্কর রাহার কথায় তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন, আপনি হয়তো গল্পের আইডিয়া লোন নেন, ভাস্করবাবু, কিন্তু সবাই নেয় না। আপনি তো আমার বহু গল্প

পড়েছেন। বলতে পারবেন, তার একটাও আমি বিদেশি গল্প থেকে আইডিয়া নিয়ে লিখেছি!

রাহা হাসলেন। বললেন, রতনদা, বয়েস কত হল?

একটু থতিয়ে গিয়ে রতন বললেন, সাতষট্টি—আপনার চেয়ে দু-বছরের বড়। কেন?

ভাস্কর রাহা হেসে বললেন, এখনও সেই বিতর্ক! পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। না সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে! আরে দাদা, আমার কাছে ঘুরছে এটাই বড় কথা। সুতরাং আইডিয়া যেখান থেকেই আসুক, শেষ পর্যন্ত সাহিত্য হল কিনা সেটাই বড় কথা।

উৎপলেন্দু চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন। তারপর ভাস্কর রাহার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা ঠাট্টার গলায় বললেন, সে কী! আপনি অ্যাদ্দিন ধরে এ-লাইনে রয়েছেন, জানেন না রতন বাঁড়ুজ্জের সব গপ্পো-উপন্যাসই সেন্ট-পারসেন্ট ওরিজিন্যাল। সাহেবরা পর্যন্ত এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেছে।

ভাস্কর রাহা ছোট্ট করে হাসলেন। উৎপলেন্দু বেশ মজা করে কথা বলতে পারেন। এর একটা কারণ বোধহয়, তিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে রূপান্তর নাটকের দলের সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে যুক্ত। লেখালিখি আর অভিনয়, এই নিয়েই আছেন। কিন্তু ষাটের দোরগোড়ায় এসে স্পষ্ট বুঝতে পারেন, দুটোর কোনওটাই তাকে কিছু দেয়নি। বরং আলেয়া হয়ে তিরিশ বছর ধরে তাকে অক্লান্ত ছুটিয়েছে, ছুটিয়েছে।

মঞ্চের ওপরে ঘোষক অনুষ্ঠানসূচি ঘোষণা করে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করল।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ-দিকে বসেছিল পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই লেখক অর্জুন দত্ত। সে নাকে সামান্য নস্যি গুঁজে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একরকম ঠেলা মারল, রতনদা, চটপট যান। আপনাকে ডাকছে।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে রতন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে জামাইটি সেজে এসেছেন। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় তাঁকে বেশ মানিয়েছে। ধবধবে সাদা কোচানো ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেন। তার আশেপাশে পাউডারের ছোঁয়া। পাকা চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। সরু গোঁফজোড়া দেখলেই বোঝা যায় মালিক রোজ এদের যত্ন নেন।

ফোলিয়ো ব্যাগ থেকে গল্পটি বের করে ব্যাগ চেয়ারে রেখে মঞ্চের দিকে হাঁটা দিলেন রতন। সামনের সারিতে বসেছিলেন বর্ষীয়ান রহস্য-রোমাঞ্চ লেখিকা রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়। ওঁর পাশেই অনামিকা সেনগুপ্ত। ওঁরা দুজনে হেসে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উইশ করলেন।

উৎপলেন্দু লম্বা হাই তুলে বললেন, নিন, এবার একটা ওরিজিন্যাল ক্রাইম গল্প শুনুন, ভাস্করবাবু।

ভাস্কর রাহা হাত নেড়ে বললেন, এত চটে যাচ্ছেন কেন? রতনদা সত্যিই হয়তো সব ওরিজিন্যাল লেখেন–।

উৎপলেন্দু শুধু তাচ্ছিলের একটা হুঁ শব্দ করলেন।

অনামিকা ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, ভাস্করদা, অনিমেষবাবু আমার কাছে ব্যাগ রেখে কোথায় গেলেন বলুন তো! আধঘণ্টা হয়ে গেল–আমার তো কোল ব্যথা করছে।

অনামিকার বয়েস অল্প। লম্বা, ফরসা, সুন্দরী। লেখালিখি করে কম, কিন্তু সেগুলো নামি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। দুজন প্রকাশকের ঘর থেকে এ-বছরের শেষে ওর দুটো বই বেরোনোর কথা।

একটা চুরুট ধরানোর জন্য ভাস্কর রাহার ঠোঁট আর আঙুল নিশপিশ করছিল। কিন্তু এয়ার কন্ডিশন্ড বলরুমে স্মোক করার উপায় নেই।

তিনি বললেন, সত্যিই তো! পান কিনতে যাচ্ছি বলে যে চলে গেল তা তো প্রায় চল্লিশ মিনিট হবে। এই অধ্যাপকগুলোর না কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে! দাও, তুমি ব্যাগটা আমার কাছে দাও–।

অনামিকা বলল, না, থাক। এখুনি হয়তো এসে পড়বেন।

অনিমেষ চৌধুরি ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন বাঙুর কলেজে। লম্বায় ছোটখাটো। তবে দৈর্ঘ্যের খামতি পুষিয়ে দিয়েছেন প্রস্থ দিয়ে। তার ব্যাগটির বপুও নেহাত কম নয়। ব্যাগ হাতে যখন তিনি হেঁটে যান তখন ভারি অদ্ভুত দেখায়।

ভাস্কর রাহা উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, এতক্ষণ ধরে প্রফেসর কী পান কিনছে বলুন তো?

উৎপলেন্দু হাসলেন। বললেন, দেখুন গিয়ে, সস্তার পান খুঁজতে খুঁজতে হয়তো এ-গলি ও গলি করে তিন কিলোমিটার পথ পার হয়ে কোথাও হারিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, যেরকম অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড…হতেও পারে…।

থামুন তো, আর বলবেন না। অন্যের বেলা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, আর নিজের বেলা টনটনে জ্ঞান। দেখছেন না, ব্যাগ রাখার জন্যে কী সুন্দর কোল বেছেছে। শেষ মন্তব্যটা উৎপলেন্দু করেছেন চাপা গলায়।

সব কিছুতেই তেতো মন্তব্য করা উৎপলেন্দু সেনের একরকম স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে ওঁর সব মন্তব্যই যে উড়িয়ে দেবার মতো তা নয়। আসলে লেখালিখিতে ব্যর্থতা ওঁকে খানিকটা সিনিক করে তুলেছে। ওঁর চশমার পুরু কাঁচ অনেক বছর ধরেই ক্রোধ আর ঈর্ষায় নীল হয়ে গেছে।

এ-পর্যন্ত উৎপলেন্দুর মোট বারোটা বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে ন-টা অনুবাদ, আর বাকি তিনটে নিজের লেখা। বইগুলো খারাপ চলেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকাশকরা কেন যে ওঁর লেখা ছাপতে চায় না কে জানে!

উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবছিলেন ভাস্কর রাহা। ওঁর সঙ্গে রাহার আলাপ প্রায় পঁচিশ বছরের। রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের অনেক ওঠানামা দেখেছেন দুজনে।

অনামিকা উৎপলেন্দুর শেষ মন্তব্যটা ভালো করে শুনতে পায়নি। ও গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, কী বললেন, উৎপলদা?

উৎপলেন্দু ভাস্কর রাহার দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, না...ওই অধ্যাপকদের ব্যাপার আর কী...।

মঞ্চে তখন রতন বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প পড়ছেন। প্রায় সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন সেই গল্প।

গত বিশ বছর ধরে রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য চর্চা করলেও রতন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতির পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র দশ বছর। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। তার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা কিছু গল্প-উপন্যাসও আছে।

লেখনী চর্চার বহু আগে থেকেই শরীর চর্চা করতেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-বার নাকি ইন্টার কলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ানও হয়েছেন। বক্সিং নিয়ে ওঁর লেখা দুটো উপন্যাস বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এ ছাড়া একটা বক্সিং শেখার বই লিখেছেন।

এইসব কারণেই ভাস্কর রাহা অনেক সময় ওঁকে ঠাট্টা করে বলেন, দাদা, আপনি হলেন আমাদের লাইনের সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক।

উত্তরে রতন হাসেন। বলেন, যে-অর্থেই বলুন, ভাস্করবাবু, কথাটা কি খুব মিথ্যে!

এ-সম্পর্কে উৎপলেন্দুর চাপা মন্তব্য ও শক্তিশালী তো বটেই! নইলে কি আর ওই ফোলিও ব্যাগের মধ্যে হাফ ডজন নানান সাইজের রেডিমেড লেখা নিয়ে সম্পাদক আর প্রকাশকের দপ্তরে দপ্তরে ঘোরা যায়!

ভাস্কর রাহা মনোযোগ দিয়ে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প শুনছিলেন। উৎপলেন্দু তাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী বুঝছেন? ওরিজিন্যাল?

মঞ্চের দিকে চোখ রেখেই ভাস্কর বললেন, জন কোলিয়ারের একটা গল্পের আবছা ছায়া আছে।

আপনার কাছে ছায়াটা আবছা মনে হতে পারে, তবে আমার কাছে ছায়াটা বেশ স্পষ্ট এবং লম্বা। ইংরিজি গল্পটা আমারও পড়া।

ভাস্কর রাহা গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, কারণ প্রথম সুযোগেই রতন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে গল্প সম্পর্কে মতামত চাইবেন। মুকুটহীন সম্রাট হওয়ার এই জ্বালা!

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের আগাথা ক্রিস্টি। গত পনেরো বছর ধরে একের পর এক চমকে দেওয়া গল্প-উপন্যাস লিখে চলেছেন। অথচ ওঁর প্রথম দিককার লেখা নিয়ে সমালোচকরা খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। আবার ইদানিং কয়েকটা লেখাও বেশ হতাশ করেছে।

রত্নাবলী গৃহবধূ। ফরসা গোলগাল গিন্নিবান্নি চেহারা। কথাবার্তায় মেজাজে একটু সেকেলে। তবে লেখায় ভীষণ আধুনিক। গত পাঁচ বছরে ওঁর উপন্যাস নিয়ে তিনটে হিট ছবি তৈরি হয়েছে। এখন একটা ছবি হচ্ছে হিন্দিতে। ওঁর উপন্যাস ইংরিজিতে অনুবাদ হয়ে পেঙ্গুইন থেকে বেরিয়েছে। ওঁর লেখায় রহস্য-রোমাঞ্চ উপাদানের পাশাপাশি জীবন-দর্শন এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে মুগ্ধ হতে হয়। ভাস্কর রাহা বাংলা গল্প-উপন্যাস খুব বেছে

পড়েন। রত্নাবলীর লেখা ওঁর খুব পছন্দের। তা ছাড়া ভদ্রমহিলা সংসারের নানান দায়দায়িত্ব সামাল দিয়ে কী করে যে সময় বের করে নিয়ে লেখেন কে জানে!

মঞ্চের দিকে রওনা হওয়ার আগে রত্নাবলী স্মিত হেসে পরিচিতজনদের দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, নতুন গল্প পড়ব।

রত্নাবলী চলে যেতেই অনামিকা পিছনের সারির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এই বয়েসেও প্রচুর লিখতে পারেন। হিংসে করার মতো।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পরিতৃপ্ত মুখে ফিরে আসছেন নিজের চেয়ারে। ভাস্কর রাহার দিকে একবার উৎসুক চোখে তাকালেন। অর্থাৎ, গল্প কেমন লাগল। ভাস্কর রাহা ইশারায় জানালেন, পরে এ নিয়ে আলোচনা করবেন।

উৎপলেন্দু তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, ওঁর গল্পটা নিয়ে কী আলোচনা করবেন? বলবেন, কোলিয়ারের লেখা থেকে ঝেড়েছে?

রাহা হেসে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, উঁহু–প্রশংসা করব। বলব, খুব ভালো লেখা হয়েছে।

উৎপলেন্দু ব্যঙ্গভরে বললেন, বাঃ!

রাহা এতটুকু বিচলিত না হয়ে বললেন, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই, উৎপল। আপনি কি চান, আমি ওঁকে বলি এখন থেকে ওরিজিন্যাল লেখা শুরু করতে! ওঁর লেখকজীবনের আর কতটুকু বাকি আছে! অনামিকা হলে সত্যি কথাটা বলতাম। বাংলা রহস্য সাহিত্যকে ওর এখনও অনেক কিছু দেবার আছে।

অনামিকা গলা লম্বা করে জানতে চাইল, কী বলছেন, ভাস্করদা?

না, না কিছু না। তুমি রত্নাবলীর গল্প শোনো।

এমন সময় দেখা গেল অনিমেষ চৌধুরি ফিরে এসেছেন।

মানুষটা চেহারায় খাটো। বেশ গোলগাল চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পরনে গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি। কচমচ করে পান চিবোচ্ছেন। ঘামে তামাটে মুখ চকচক করছে। ইতি-উতি তাকিয়ে বোধহয় অনামিকাকে খুঁজছেন।

দু-সারি চেয়ারের ফাঁক দিয়ে অধ্যাপক চৌধুরি কোনওরকমে নিজের স্থূলকায় চেহারাটিকে টেনে নিয়ে আসছিলেন, উৎপলেন্দু তড়িঘড়ি তাঁকে কাছাকাছি একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। অধ্যাপক অনামিকার কাছে আসতে চাইছিলেন। কিন্তু উৎপলেন্দু খালি চেয়ার দেখিয়ে দেওয়ায় ফাঁপরে পড়ে গেলেন। অনামিকাও চট করে দাঁড়িয়ে উঠে পেটমোটা চামড়ার ব্যাগটা বাড়িয়ে দিল অনিমেষ চৌধুরির দিকে।

অনিমেষদা, আপনার ব্যাগ।

অসহায়ভাবে ব্যাগটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা হুম শব্দ করে ব্যাগটা ধরলেন অধ্যাপক। তারপর ব্যাগসমেত ধপাস করে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। একই সঙ্গে ফোঁস করে একটা শব্দ করলেন।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাস্কর রাহাকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনই রত্নাবলী মুখোপাধায়ের গল্প পড়া শেষ হল। সারা হলে শোনা গেল ভদ্র করতালির শব্দ। ভাস্কর রাহা, উৎপলেন্দু, অধ্যাপক সকলেই তাতে হাত মেলালেন।

রত্নাবলী হাসিমুখে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিপর্যয়টা ঘটে গেল।

মোটামুটি নিস্তব্ধ হলে একটি মাত্র মানুষ উদ্ধত ভঙ্গিতে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে অশ্লীলভাবে হাততালি দিতে লাগল।

রত্নাবলী তার দিকে তাকালেন।

শুধু রত্নাবলী কেন, হলঘরের প্রায় প্রতিটি মানুষ চোখ ফেরাল সেই দুর্বিনীত তরুণীর দিকে। কে এই অসভ্য রমণী? উপস্থিত দর্শকদের কেউ কেউ তাকে চেনে হয়তো, কিন্তু সকলেই নয়।

মেয়েটির বয়েস ছাব্বিশ কি সাতাশ। গায়ে টকটকে হলদে ঢোলা-টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকের ওপরে নীল হরফে লেখা : এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই। মেয়েটির চুল স্টেপ কাট করা। ছোট-ছোট ঢেউ তুলে ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠের ওপরে নেমে গেছে। চুলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে। কানের শৌখিন দুল। গলায় আটোসাঁটো কালো পুঁতির মালা।

মেয়েটির গায়ের রং ময়লা হলেও নাক-চোখ ধারালো। বিশেষ করে দু-চোখে যেন দুটো হিরের কুচি বসানো। ফ্যাকাসে জিনসের প্যান্টের কোমরের কাছে এক হাত রেখে আর এক হাতের আঙুলে গলার মালা অনুভব করছিল।

ও হাততালি বন্ধ করলেও সেই বেপরোয়া শব্দস্রোত সকলের কানে বাজছিল।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎই যেন সাড় ফিরে পেয়ে ভাস্কর রাহাকে জিগ্যেস করলেন, ভাস্করবাবু, মেয়েটা কে বলুন তো? চেনেন নাকি?

ভাস্কর রাহা নীচু গলায় বললেন, আমি ভালো করেই চিনি। দেবারতি মানি। সুপ্রভাত পত্রিকার ক্রাইম জার্নালিস্ট।

অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজন মাইকে বললেন, আপনার কিছু বলার থাকলে মঞ্চে এসে বলতে পারেন।

দেবারতি মাথা ঝাঁকাল। ওর চুল সাপের মতো নড়ে উঠল এপাশ-ওপাশ। তারপর বলল, আমার বলার জন্যে মঞ্চ দরকার হয় না। একটু থেমে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ও আমার নাম দেবারতি মানি। সুপ্রভাত পত্রিকায় ক্রাইম জার্নালিস্ট। আমি রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা গল্প উপন্যাস গোগ্রাসে গিলি। এখানে যেসব লেখক-লেখিকাকে নেমন্তন্ন করা

হয়েছে তাদের অলমোস্ট সব লেখা আমি পড়েছি। তবে মিসেস রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের কোনও তুলনা নেই। ওঁর লেখার রহস্য একমাত্র ওঁর ডিটেকটিভ করঞ্জাক্ষ রুদ্র ছাড়া আর কেউ ধরতে পারে না। ওঁর লেখা আমার সবচেয়ে ফেভারিট। সুপার্ব! ওঁর এখনকার গল্পটাও আমার ফ্যানট্যাসটিক লেগেছে। ইউ আর সিম্পলি আনপ্যারালাল, মিসেস মুখার্জি।

পাশে বসা কেউ একজন দেবারতির হাত ধরে টান মেরে ওকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করল। আর তখনই দেবারতির সুঠাম দেহ সামান্য বেসামাল হয়ে টলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে বুঝতে পারলেন দেবারতি দিনদুপুরে নেশা করেছে।

ভাস্কর রাহা দেবারতির কথাগুলোর মধ্যে অন্য কোনও মাত্রা খুঁজছিলেন। মেয়েটা তাহলে লাঞ্চের সময়েই মদ গিলেছে! মেয়েটার কিসের কষ্ট?

হলঘরের গুঞ্জনের ডেসিবেল মাত্রা ক্রমে চড়তে লাগল।

দেবারতি মানি জড়িয়ে-জড়িয়ে অস্পষ্টভাবে আরও কীসব কথা বলছিল। তারই মধ্যে ওকে টেনে বসিয়ে দিল কেউ। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এখন আবার নিজের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন। ঠোঁটে সম্রাজ্ঞীর স্মিত হাসি ফুটিয়ে তুলে ছোট-ছোট পায়ে নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। তাঁর কাঁচাপাকা চুল, রিমলেস আধুনিক ছাঁদের চশমা, পরনের হালকা গোলাপি কালোয় কাজ করা জামদানি শাড়ি, মাথা সামান্য হেলিয়ে হাঁটার ভঙ্গি এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে। বোঝা যায়, তাকে বাংলা সাহিত্যের আগাথা ক্রিস্টি বলার সঙ্গত কারণ আছে।

সম্মেলনের তাল কেটে গেল।

এরপর গল্প পড়ার কথা রূপেন মজুমদার আর রঞ্জন দেবনাথের। সেইমতো ঘোষণাও করা হল মাইকে। কিছুক্ষণ চাপা গুঞ্জনের পর রূপেন মজুমদার মঞ্চে গেলেন। খানিকটা

কল্পবিজ্ঞান মেশানো একটা ক্রাইম গল্প পড়ে শোনালেন। তারপর কেমন-লাগল-গোছের ভঙ্গিতে হাসলেন। শ্রোতাদের কেউ যখন গল্প নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললেন না, তখন নেমে এলেন মঞ্চ থেকে।

রূপেন মজুমদারের বয়েস প্রায় পঞ্চান্নছাপ্পান্ন। পনেরো-ষোলো বছর বয়েস থেকেই তার লেখা ছাপা হচ্ছে। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, তাই বাইশ বছর বয়েসেই নিজের টাকায় পরপর দুটো উপন্যাস ছেপে বের করেছিলেন। সেই বই দুটোর ভূমিকায় স্পষ্ট করে লেখা ছিল, উপন্যাস যুগল সম্পূর্ণভাবে তাঁর মৌলিক চিন্তার ফসল। অবশ্য যে-কোনও পাঠক বই দুটো পড়ে তার সঙ্গে একমত হবেন। কারণ, লেখা দুটোর প্লট যেমন দুর্বল, তেমনই সেকেলে তার ভাষা। পড়লেই মনে হয়, লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছাতার নীচ থেকে এখনও বেরোতে পারেননি।

কিন্তু এসব ব্যাপার রূপেন মজুমদারকে এতটুকু দমিয়ে রাখতে পারেনি। ভদ্রলোক একের পর এক বই লিখে গেছেন। সেগুলো যে-করে-হোক ছাপাও হয়েছে। শত্রুরা বলে সম্পাদক-প্রকাশককে তোয়াজের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে তার জুড়ি নেই। তবে গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে রূপেন মজুমদারের একটাই স্লোগান : তিনিই রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের একমাত্র মৌলিক লেখক। দুষ্টজনে ফিসফিসিয়ে বলে, রূপেন মজুমদারের ইংরেজি পড়ার অভ্যেস নেই, তাই এখনও সতী রয়ে গেছেন। আর উৎপলেন্দু সেন ওঁকে বলেন, বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের একমাত্র ভার্জিন রাইটার। এখনও ওঁর ধর্ম নষ্ট হয়নি।

রঞ্জন দেবনাথকে বারবার মাইকে ডেকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন কর্মকর্তারা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তখনই হুট করে সে কোত্থেকে এসে হাজির হল। স্মার্ট ভঙ্গিতে মঞ্চে উঠে গিয়ে গল্প পড়তে শুরু করল।

রঞ্জন দেবনাথের চেহারা সুন্দর। লেখালিখির লাইনে না এসে অভিনয় জগতে গেলেও সে হয়তো ছাপ ফেলতে পারত। বয়েস বড়জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। চোখে এখনও চশমা ওঠেনি। গায়ের রং ফরসা, তবে সামান্য চাপা। মাথায় কোঁকড়া চুল। গালে চাপ দাড়ি, সঙ্গে

মানানসই সরু গোঁফ। ধারালো নাক। উজ্জ্বল সপ্রতিভ চোখ। পরনে নীল-সবুজ স্ট্রাইপ দেওয়া ফুলহাতা শার্ট আর গাঢ় রঙের টেরিনের প্যান্ট।

রঞ্জনের গল্প পড়ার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে বেরোচ্ছে। ভাস্কর রাহা ওর গল্পের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি লাইন গভীর মনোযোগে শুনছিলেন। গল্পের নাম সংসারে পাপ আছে। বেশ নতুন ধরনের নাম।

রঞ্জন দেবনাথের প্রথম উপন্যাস অন্ধকারে বাঘবন্দী খেলা প্রকাশিত হয়েছিল কম করেও বারো-তেরো বছর আগে। তারপর ওর একটা গল্প সঙ্কলন বেরোয়, এবং তার বছরখানেকের মধ্যেই একটা গোয়েন্দা উপন্যাস পায়ের শব্দ নেই প্রকাশিত হয়।

রঞ্জন পত্র-পত্রিকায় কম লিখলেও পাঠকেরা ওর লেখার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তারপর একরকম আচমকাই ও লেখা ছেড়ে দেয়। বলতে গেলে, মঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় গ্রিনরুমে। সম্পাদক-প্রকাশকদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু তারপর...।

তারপর, প্রায় এগারো বছর পর, রঞ্জন এ-বছর মাসিক গোয়েন্দা পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় খুনির নাম অজানা নামে একটা নভেলেট লেখে। ক্ষুরধার বুদ্ধি মেশানো স্মার্ট লেখা। পড়লেই বোঝা যায়, রঞ্জন এগারো বছর ধরে ওর লেখার তরোয়ালে শান দিতে ভোলেনি। এই লেখাটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদক ও প্রকাশকরা ওর বাড়িতে হানা দিয়ে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলেন। তারা রঞ্জন দেবনাথকে গ্রিনরুম থেকে আবার ঠেলে দেন মঞ্চের দিকে।

কিন্তু এগারো বছর বড় সুদীর্ঘ সময়। ভাবলেন ভাস্কর রাহা। এই লম্বা সময় নষ্ট করে ছেলেটা ভীষণ ভুল করেছে। নইলে এতদিনে ও প্রথম সারিতে নিজের জায়গা করে নিত।

রঞ্জন দেবনাথের গল্প পড়া শেষ। সেই সঙ্গে সম্মেলনের প্রথমদিনের কর্মসূচিতেও ইতি পড়ল। মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, বাইরের লাউঞ্জে চা-কফির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া পাশের হলে যে বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে সেটা দেখতেও যেন কেউ না ভোলেন।

দর্শক-আসন থেকে সকলে উঠে পড়ে রওনা হলেন দরজার দিকে। ছাই রঙের উর্দি পরা হোটেলের কয়েকজন বেয়ারা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অনুরোধ করছে চা-কফির কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে।

ভিড় ঠেলে ভাস্কর রাহা এগোচ্ছিলেন। ওঁর পাশে উৎপলেন্দু সেন। আর পিছনে অর্জুন দত্ত আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এয়ার কন্ডিশন্ড বলরুমে চুরুটের জন্য ভাস্কর রাহার আঙুল নিশপিশ করছিল, কিন্তু তিন তারা হোটেলের আদব-কায়দা লঙ্ঘন করতে পারেননি। এখন, দরজার বাইরে বেরোনো মাত্রই, তিনি তিনবারের চেষ্টায় একটা সস্তা চুরুট ধরালেন। উৎপলও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, কী ভাস্করবাবু, কেমন বুঝছেন?

রাহা বেশ উৎসাহ নিয়ে খুশি-খুশি মুখে বললেন, ভালোই তো! কে ভেবেছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ক্রাইম ফিকশন এরকম একটা জায়গায় চলে আসবে! যাই বলুন উৎপল, এই সম্মেলনে এসে আমার বেশ লাগছে। ধরুন পশ্চিমে মডার্ন ক্রাইম স্টোরি শুরু হয়েছে ভলতেয়ারের হাতে– প্রায় আড়াইশো বছর আগে। তার প্রায় একশো বছর পর এডগার অ্যালান পো নিয়ে এলেন গোয়েন্দা দুপাঁকে। আর আমাদের এখানে ক্রাইম কাহিনির পত্তন একশো বছরের কিছু বেশি। মানে বাঁকাউল্লার দপ্তর, গিরিশচন্দ্র বসুর সেকালের দারোগার কাহিনি এইসব বইগুলো ধরলে। তার মানে, আমরা পশ্চিমের চেয়ে প্রায় দেড়শো বছর পিছিয়ে থেকে দৌড় শুরু করেছি। সে হিসেবে এখনকার অবস্থাকে তো রীতিমতো রমরমা ব্যাপার বলা যায়—

উৎপলেন্দু হুম করে ছোট্ট একটা শব্দ করলেন। তারপর বললেন, চলুন, কফি নিই–

ভিড় ঠেলে ওঁরা এগোতে যাবেন, পিছন থেকে কেউ ভাস্কর রাহার জামা ধরে টানল।

রাহা একটু অবাক হয়েই পিছন ফিরে তাকালেন।

দেবারতি মানি। চোখ সামান্য কুঁচকে হাসছে।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে! যদি বয়েসটাকে চোখের পলকে চল্লিশটা বছর কমানো যেত, তাহলে খুব ভালো হত। ভাস্কর রাহা ভাবলেন। না, দেবারতির শরীর ভাস্কর রাহাকে লোভাতুর করেনি। মেয়েটার জীবনীশক্তি, টগবগে চনমনে ব্যাপার, উচ্ছল হাসি কেমন যেন হাতছানি দেয়। বলে, কাম অন, হানি, তোমাকে দেখাব জীবন কাকে বলে! আর তখনই বয়েসটা কেমন যেন কমাতে ইচ্ছে করে।

ভাস্কর রাহা দেবারতির বুকের লেখাটা পড়লেন। বললেন, এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই। এখন চায়ের সময়। তারপর হেসে জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার, কিছু বলবে?

দেবারতিকে এখন দেখে নেশা করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। ওকে দেখে উৎপলেন্দু কেমন যেন একটু সিঁটিয়ে গেছেন। অর্জুন দত্ত আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতূহল নিয়ে দেবারতিকে দেখছেন।

দেবারতি হেসে বলল, মুকুটহীন সম্রাট, আপনার সঙ্গে আমার গোপন মন্ত্রণা আছে। টপ সিক্রেট। ওদিকটায় চলুন

দেবারতি আঙুল তুলে হোটেলের খোলা বারান্দার দিকে দেখিয়েছে। আধখানা চাঁদের মতো গোল বারান্দা। তার রেলিঙে সুন্দর পোর্সিলেনের টবে বসানো নানান গাছ। একটা পাতাবাহার গাছে বিকেলের রোদ খেলা করছে। দুটো চড়ুই লাফাচ্ছে তার ডালে।

দেবারতিকে ভাস্কর রাহা চেনেন প্রায় চার বছর ধরে। মেয়েটাকে দেখলেই তার মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু সব সময়েই ওর মধ্যে কিসের যেন একটা কষ্ট টের পান তিনি। সেটা কী সত্যি, না তার কল্পনা কে জানে!

উৎপল, আপনারা কফি খান, অমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।

হলের লোকজনকে পাশ কাটিয়ে ভাস্কর রাহা এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। দেবারতি পিছন পিছন আসছে। পিঠে ওর হাত টের পেলেন রাহা।

বারান্দার টবের পাশে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। কী যেন নাম? ফুল ফুটে আছে টবের গাছে। সাদা আর গোলাপি।

নীচে তাকালেই চোখে পড়ে হোটেল চত্বর। সেখানে গাড়ির আনাগোনা। চত্বরের শেষে কয়েকটা পাম গাছ, তারপর বাহারি রেলিং, আর রেলিং পেরোলেই বড় রাস্তা। রাস্তায় সা-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি, বাস, মিনিবাস। হর্ন বেজে উঠছে থেকে থেকেই। বোঝা যায় জনজীবন কত ব্যস্ত।

ভাস্কর রাহার খুব কাছে এসে দেবারতি বলল, ভাস্করদা, সরি, লাঞ্চের সময় একটু খেয়েছি দু-আঙুলে মাপ দেখাল দেবারতি।

চায়ের জন্যে গলা শুকিয়ে কাঠ। জলদি বলো, কী তোমার সিক্রেট।

চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছিল। সেটায় বারকয়েক ঘন-ঘন টান দিয়ে রাহা যখন বুঝলেন লাভ নেই, তখন দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ছাই ঝেড়ে চুরুটটা পকেটে রেখে দিলেন। পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।

ভাস্করদা, আমি একটা টপ সিক্রেট জানতে পেরেছি। শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না।

ভাস্কর রাহার প্রশস্ত কপালে ভাঁজ পড়ল। কী সিক্রেট জানতে পেরেছে মেয়েটা? নাকি ওর স্বভাব অনুযায়ী ইয়ারকি মারছে?

দেবারতি মানি থেকে থেকেই লাউঞ্জের দিকে দেখছিল। সেখানে চা-কফির কাপ হাতে নিয়ে অতিথিদের জটলা।

বাতাসে ভাস্কর রাহার লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি, তাই শীতের ব্যাপারটা একটা ঠান্ডা আমেজের বেশি কিছু নয়। তবে বাতাসে ঝরাপাতার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

দেবারতি ঘাড়ের কাছে আলতো আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করার চেষ্টা করল। তারপর একটু চিন্তার সুরে বলল, এটা জানাজানি হলে কনফারেন্স একেবারে মাটি হয়ে যাবে। খবরের কাগজগুলোয় নির্ঘাত ফ্রন্টপেজ নিউজ

তার মানে! কী বলছে মেয়েটা! নেশার ঘোরে ভুল বকছে না তো?

দেবারতির মুখ থেকে হালকা হুইস্কির গন্ধ পাচ্ছিলেন রাহা। তিনি জরিপ নজরে দেখতে লাগলেন মেয়েটাকে।

ভাস্কর রাহা কী ভেবে বললেন, দেবারতি, আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে?

কী বলুন।

এসব সিক্রেট ব্যাপারগুলো এখন সিক্রেটই থাক। আর চারদিন পরেই এই কনফারেন্স শেষ তখন যা হয় কোরো।

দেবারতি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হবে। ইউ আর দ্য বস–।

প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য রাহা জিগ্যেস করলেন, আজকের গল্প তোমার কেমন লাগল?

ওঃ, মিসেস মুখার্জি ওয়াজ গ্রেট। আমি ছোটবেলা থেকেই ওঁর লেখার ফ্যান। তবে রঞ্জন দেবনাথের লেখাও আমার ভালো লাগে। ভদ্রলোকের লেখায় শুধু একটাই গোলমাল-রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের অসম্ভব প্রভাব। এটা কেউ যদি ওঁকে স্ট্রেটকাট বলতে পারে তবে ওঁর পক্ষ ভালো হবে। কিন্তু জানেন তো, নাম-টাম হয়ে গেলে এই লেখকগুলো কেমন স্নব হয়ে যায়।

দেবারতি মানি, তুমি কিন্তু আমাকে স্নব বললে–

ওঃ নো, ভাস্করদা। আপনি এসবের বাইরে। আপনি তো জানেন, এ আমার সাজানো কথা নয়। নাইনটি টু-তে আপনার টিভি ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় আমি পাবলিকলি একথা বলেছি। একটু থেমে দেবারতি ভাস্কর রাহার হাত চেপে ধরল। বলল, ডিয়ার ওল্ড ম্যান, আই লাভ ইউ সো মাচ

তারপর জোর পায়ে হেঁটে চলে গেল অতিথিদের ভিড়ের দিকে। ভাস্কর রাহা প্রাণবন্ত এই মেয়েটার চলে যাওয়া দেখলেন।

কী সিক্রেট জেনে ফেলেছে দেবারতি? এমন সিক্রেট যা জানাজানি হলে কনফারেন্স পণ্ড হয়ে যাবে, খবরের কাগজের হেডলাইন হয়ে যাবে!

ভাস্কর রাহা পকেট থেকে আধপোড়া চুরুটটা বের করে আবার ধরালেন। বিকেলের রোদ মরে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলো ছায়া-ছায়া হয়ে গেছে।

মাথার লম্বা-লম্বা সাদা চুলে হাত বুলিয়ে তিনি ভাবলেন, দেবারতি মানি হয়তো তার অনুরোধ রাখবে। কিন্তু চারদিন পরে ও যদি সেই গোপন খবরটা ফাস করে তা হলেও কী বিপদ কম হবে!

ষাটের দশক থেকে বহু ঝড়ঝাপটা সহ্য করে রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য আজকের এই অভিজাত জায়গায় উঠে এসেছে। গত তিরিশ বছরে লড়াই কম হয়নি। সমালোচক, সম্পাদক আর প্রকাশকদের অবজ্ঞা-উপেক্ষা ছিল নিয়মিত ব্যাপার। তাদের প্রায় সকলেরই বক্তব্য, ১৯৭০ সালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা সাহিত্যের শাখাঁটিরও অপমৃত্যু ঘটেছে। সাহিত্যের কোনও একটি শাখা যদি মাত্র একজন লেখকের ওপরে নির্ভরশীল হয়, তা হলে সেই শাখার অপমৃত্যু হওয়াই ভালো। সাহিত্যের এই শাখাঁটি সম্পর্কে যাঁরা ভাবেন, সেইসব সম্পাদক প্রকাশকরা তো পরে অন্যান্য লেখককে সুযোগ দেননি, প্রশ্রয় দেননি, আশকারা দেননি! নামি পত্র পত্রিকায় সূচিপত্রে তো কোনওদিনই রহস্য-গোয়েন্দা গল্পের কোনও জায়গা ছিল না!

ভাস্কর রাহা ভোলেননি সেই উপেক্ষার দিনগুলো, অবজ্ঞার দিনগুলো, অবহেলার দিনগুলো। নাকি বলা যায় লাঞ্ছনার দিনগুলো?

তারপর অনেক পথ মাড়িয়ে বহু কান্না-ঘাম-রক্তের পর মাত্র পাঁচ-সাত বছর হল রহস্য গোয়েন্দা সাহিত্য মর্যাদার জায়গা পেয়েছে। পাঠকরা এখন রত্নবলী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জন্য অপেক্ষা করেন। তারা চান ভাস্কর রাহার নভেলেট, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমাঞ্চকর কাহিনি। গত বছরে ভাস্কর রাহার আটটা গোয়েন্দা গল্প নিয়ে টিভিতে দেখানো হল তেরো এপিসোডের সিরিয়াল তৃতীয় নয়ন। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় ওই প্রোগ্রাম যখন শুরু হত তখন পথঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। হাজার-হাজার চোখ অপেক্ষা করত টিভির সামনে কখন ছোট পরদায় দেখা দেবে ভাস্কর রাহার শখের গোয়েন্দা সুরজিৎ সেন।

আজ ভাস্কর রাহার খ্যাতি, বাড়ি, গাড়ি–সব কিছুই লেখালিখি থেকে। কিন্তু বিলাসিতা তিনি ঘৃণা করেন। তাই হয়তো খেয়ালখুশি মতো লেখেন। যখন লিখলে প্রচুর টাকা পাওয়া যেতে পারে তখন তিনি লেখেন না। সম্পাদক-প্রকাশককে অনায়াসে হতাশ করেন। সংসারের কোনও চাহিদার দিকেই কখনও মনোযোগ দিয়ে তাকাননি। সবরকম

বিলাসিতাকে বর্জন করে একটিমাত্র বিলাসিতাকে আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি–লেখার বিলাসিতা। এই তৃপ্তির জায়গাটা তিনি নষ্ট করতে চান না।

রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের এই সফলতাও তাকে ভীষণ তৃপ্তি দেয়। এ যেন সুদীর্ঘকাল লড়াইয়ের পর শ্রান্ত ক্লান্ত-রক্তাক্ত অবস্থায় হঠাৎ জিতে যাওয়া। এর আনন্দই আলাদা।

অথচ সত্তর দশকের শুরুতে অবস্থাটা কী করুণ ছিল! ক্রাইম পত্রিকার সম্পাদক এবং কর্ণধার রামচন্দ্র সাহার কাছে লেখকরা সকলে মিলে দাবি জানিয়েছিলেন, প্রকাশিত লেখার জন্য প্রত্যেক লেখককে পাঁচ টাকা করে হলেও সম্মান-দক্ষিণা দিতে হবে। সে কি ভয়ংকর যুদ্ধের কাল! ভাস্কর রাহা, উৎপলেন্দু সেন, অনিমেষ চৌধুরি, অর্জুন দত্ত, রূপেন মজুমদার–সকলেই সামিল ছিলেন সেই দাবিতে। এঁদের জন্য বড় কাগজের দরজা ছিল বন্ধ। ছোট কয়েকটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকাই একমাত্র সম্বল। প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মান-দক্ষিণা না-দেওয়াটা যখন ক্রমে-ক্রমে সেই সব পত্রিকার অভ্যাস ও অধিকারে দাঁড়িয়ে গেছে, ঠিক তখনই এই স্লোগান : টাকা ছাড়া আমরা লিখব না। অন্তত পাঁচটাকা হলেও দিতে হবে।

রামচন্দ্র সাহা সেই দাবি মেনে নিয়েছিলেন। চাঁদের মাটিতে পা দেওয়ার মতোই সেটা ছিল রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ক্ষণ। রামচন্দ্র সাহা অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ১৯৭৪ সালে। কিন্তু ভাস্কর রাহাদের কাছে এই মানুষটা এখনও মরেনি। কখনও মরবে না।

দেবারতি মানি এসব লড়াইয়ের কী জানে! সুতরাং ওর পক্ষেই সম্ভব, পাথরের এক ঘায়ে রহস্য-গোয়েন্দা সাহিত্যের স্ফটিক-সৌধটিকে চুরমার করে দেওয়া। ওকে বারণ করতে হবে, দরকার হলে বাধা দিতে হবে। গোপন কথা গোপনই থাক। তা নইলে এই ঝড়ের ধাক্কা হয়তো সামলে ওঠা মুশকিল হবে।

ভাস্কর রাহার কপালে ভাঁজ পড়ল, চোখ ছোট হল।

কী তোর গোপন খবর, দেবারতি মানি?

.

০২.

রাত নটা নাগাদ তিনতলায় নিজের ঘরে বসে ছিলেন উৎপলেন্দু সেন। সামনে ছোট গোল টেবিলে ঠান্ডা জলের বোতল, ম্যাকডাওয়েলের ছোট খোকা, আর কাচের গ্লাস। গ্লাসে অল্প হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। ওর নেশার সঙ্গী হয়ে বসে আছেন আরও দুজন ও ভয়ঙ্কর পত্রিকায় সম্পাদক প্রেমময় চৌধুরি, আর রহস্য প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রধান মালিক কৌশিক পাল।

কৌশিক পাল বয়েসে তরুণ। সবসময় মোটর বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত স্কুল বইয়ের ব্যাবসা করে। আর আগস্ট থেকে জানুয়ারি রহস্য-রোমাঞ্চ বইয়ের ব্যাবসা। কলকাতা বইমেলার সময় কৌশিক অন্তত পঁচিশটা বই বের করে। ওর মুখে কখনও কেউ হা-হুঁতাশ শোনেনি। সবসময়েই উৎসাহে টইটম্বুর।

নিজের গ্লাসে ছোট চুমুক দিয়ে কৌশিক বলল, উৎপলদা, আপনি তা হলে ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে কপি রেডি করে দিচ্ছেন। দেখবেন, যেন পনেরো ফর্মার বেশি না হয়। আমি পঞ্চাশ টাকার বেশি দাম করব না।

উৎপলেন্দু খানিকটা জড়ানো গলায় বললেন, তোমার কোনও চিন্তা নেই। আঠারো-বিশটা গল্প জোগাড় করা তো–ও ঠিক হয়ে যাবে।

উৎপলেন্দু সেনকে সম্পাদক করে একটা ভৌতিক গল্পের সংকলন বের করতে চায় কৌশিক। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গার বইমেলার ওর স্টল থাকে। তাতে ও দেখেছে, ভূতের গল্পের বেশ চাহিদা আছে। যে-বস্তুর কোনও অস্তিত্বই নেই, দেখা যাচ্ছে, তার সম্পর্কেই পাঠকের আগ্রহ বেশি। এই মন্তব্যটা করে কৌশিক হাসল।

উৎপলেন্দু কৌশিককে দেখছিলেন। বয়েসে তার প্রায় অর্ধেক। এরই মধ্যে কারণবারির ব্যবহারে ঘাগু হয়ে গেছে। বলে, এটা নাকি অ্যারিস্টোক্র্যাসির লক্ষণ। এই অল্প বয়েসেই ও পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন কেউকেটা। ফলে তিন বছর ধরেই এই সম্মেলনে নেমন্তন্ন পাচ্ছে। তা ছাড়া কৌশিক ব্যাবসার নানারকম অন্ধিসন্ধি জানে। সরকারি মহল থেকে বইপত্র কেনা হলে সেই লিস্টে শতকরা দশভাগ অন্তত কৌশিকের বই থাকবেই। গভর্নমেন্ট পারচেজের কথা মনে রেখেই ও অপরাধশাস্ত্রের নানা বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বইও ছেপেছে।

সম্মেলনের প্রথমদিনের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে নানান মন্তব্য করছিল কৌশিক। উৎপলেন্দু ওর চপলতার জবাবে হু, হাঁ, শব্দ করছিলেন শুধু। আর প্রেমময় চৌধুরি গম্ভীরভাবে গ্লাসের তরলের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, গ্লাসে হুইস্কি নয় রয়েছে কারও চোখের জল।

রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের সবচেয়ে সফল পত্রিকা ভয়ঙ্কর। পত্রিকার বয়েস বাহান্ন বছর। তার মধ্যে প্রেমময় চৌধুরি সাঁইতিরিশটা বছর জুড়ে এর সম্পাদক হিসেবে। বলতে গেলে এই পত্রিকাতে লেখালিখি করেই রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় অধিষ্ঠিত আজকের জায়গায় পৌঁছেছেন। একটা সময়ে প্রেমময় ও রত্নাবলী যথেষ্ট কাছাকাছি ছিলেন। তখন রত্নাবলীর বয়েস ছিল–আজ নেই। তবে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখনও অটুট। ভয়ঙ্কর-এর পুজো সংখ্যায় রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় বছরের সেরা এবং সুদীর্ঘ উপন্যাসটি লেখেন। ওঁর এবারের উপন্যাস দু-নয়নে ভয় আছে পাঠক মহলে অন্যান্যবারের মতোই সাড়া ফেলেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রেমময় হঠাৎই মুখ খুললেন।

উৎপলেন্দুবাবু, বিকেলে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন?

কী ব্যাপার?

দোতলার বারান্দার দাঁড়িয়ে ওই দো-আঁশলা ডবকা রিপোর্টারটা ভাস্করবাবুকে আড়ে-আড়ে কী যেন বলছিল–

দেবারতির বাবা দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা ছিলেন। মদের ব্যবসায়ী। আর বাঙালি। পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তরাঁয় গান গাইতেন। কী করে যেন দুজনের দেখা হয়েছিল, ভালোবাসা হয়েছিল, এবং বিয়ে হয়েছিল। দেবারতি নিজেই সবিস্তারে সবাইকে এ কথা বলে। মেয়েটার জিভ বড় আলগা। ছোটবেলায় একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ওর বাবা মারা যান। ওর মা বিয়ের পর গান-টান ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার পর নিরুপায় হয়ে আবার ফিরে গেছেন পুরোনো পেশায়। সন্ধেবেলা ঝিমঝিমে আলোয় নেশাগ্রস্ত শ্রোতাদের সামনে মেরি হোঠ ভি সেক্সি, মেরি আঁখে ভি সেক্সি…।

দেবারতি গতবারের কনফারেন্সে একঘর লোকের সামনে চেঁচিয়ে বলেছিল, আমার যা পেডিগ্রি তাতে আমার ক্যাবারে ডান্সার হওয়ার কথা। কিন্তু কী যে হল, লেখাপড়া-টড়া শিখে আই বিকেম আ রিপোর্টার। ক্রাইম জার্নালিস্ট।

কৌশিক উৎসাহ দেখিয়ে বলল, কী বলছিল, প্রেমদা? কিছু শুনতে পাননি?

গ্লাসটা নাচিয়ে তরলে ঢেউ তুললেন প্রেমময়। ঝাপসা চোখে দেখছিলেন দেবারতির শরীর নাচছে। অনেক কিছু দুলছে। বয়েস প্রায় সত্তর হতে চলল, তবুও শরীরের জ্বালা কমে না। ভেবেছিলেন ষাট পেরোলেই এই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন, কিন্তু…।

বিড়বিড় করে তিনি কৌশিকের কথার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, শুনেছি। ও নাকি কী একটা টপ সিক্রেট জেনে ফেলেছে। সেটা ফঁস করে দিলে নাকি একটা এক্সপ্লোশন হবে।

কী সিক্রেট? উৎপলেন্দু জিগ্যেস করলেন।

দেবারতিকে তিনি এড়িয়ে চলেন। একবার তার একটা রেডিও ইন্টারভিউর সময় মেয়েটা এমনভাবে অ্যাটাক করেছিল যে, ইন্টারভিউটাই শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। কিন্তু

গতবারের সম্মেলনের সময় ফাজিল মেয়েছেলেটা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাতিল ইন্টারভিউর ক্যাসেটটা বাজিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, উৎপলেন্দুবাবু, এই ক্যাসেটটা আমার পার্সোনাল কালেকশনে থাকবে। দ্য গ্রেট মিস্ট্রি রাইটার উৎপ-লেন্দু সেন।

লেন্দু শব্দটার ওপরে অহেতুক অশ্লীলভাবে জোর দিয়েছিল মেয়েটা।

রাগে অপমানে উৎপলেন্দুর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। একে তো সুপ্রভাত খুব নামী পত্রিকা, তার ওপর দেবারতির নিজস্ব কানেকশনও কিছু কম নেই।

উৎপলেন্দু সেন একরকম হেরেই গিয়েছিলেন দো-আঁশলা মেয়েটার কাছে।

উৎপলের প্রশ্নে প্রেমময় বললেন, সেটা শুনতে পাইনি।

ঠিক তখনই ঘরের কলিংবেল বেজে উঠল।

উৎপল কৌশিককে ইশারা করতেই ও উঠে গেল দরজা খুলতে।

প্রেমময় বা উৎপল গ্লাস বোতল ইত্যাদি আড়াল করার কোনওরকম চেষ্টাই করলেন না।

কৌশিক দরজা খুলতেই দেবারতি মানিকে দেখা গেল। অদ্ভুত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দরজায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে। পরনে কালো-সাদা নকশার সালোয়ার কামিজ। কাঁধে ঝোলানো লেডিজ ব্যাগ।

প্রেমময় শরীরের জ্বালাটা আবার টের পেলেন। যৌবনে রত্নাবলী কি এতটা লোভনীয় ছিল?

কৌশিক ফিরে এসে আবার ওর জায়গায় বসে পড়ল।

ভেতরে আসতে পারি? ঠোঠের কোণে সামান্য হেসে জানতে চাইল দেবারতি।

প্রেমময় চৌধুরি উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত সামনে বাড়িয়ে এক গাল হেসে বললেন, এসো, এসো। এ আবার জিগ্যেস করার কী আছে!

দেবারতি ঘরে ঢুকে খুব সপ্রতিভ ভাবে উৎপলেন্দুর পরিপাটি বিছানায় বসে পড়ল। সিরাজ হোটেলের তারার সংখ্যা তিন হলেও ঘরদোর বেশ ঝকমকে সুন্দর। আর দুটো তারা যোগ করে ফেলতে পারলেই অনায়াসে পাঁচ তারা হয়ে যেতে পারে।

প্রেমময় চৌধুরির ভয়ঙ্কর কাগজে দেবারতি বেশ কয়েকবার কটা ফিচার লিখেছে। সবগুলোই সত্যঘটনার অন্তর্দন্ত। লেখাগুলো তখন বেশ সাড়া ফেলেছিল। প্রেমময়ের মনে পড়ল, একবার নিজের দপ্তরে কাচের ঘরে মেয়েটাকে লেখালিখি সম্পর্কে নানান উপদেশ দেবার পর জিগ্যেস করেছিলেন, তোমার কবে যেন অফ ডে?

দেবারতি নিষ্পাপ মুখে জবাব দিয়েছিল, কাল মঙ্গলবার।

কাল দুপুরটা ফ্রি আছ?

হ্যাঁ, কেন?

মানে, তোমাকে দিয়ে আগামী পুজোয় আমি একটা বড় গল্প লেখাতে চাই। তোমার ফিচারগুলো আমি খুঁটিয়ে পড়েছি–ওর মধ্যে ফিকশনাল কোয়ালিটি আছে। কাল দুপুরে তোমার বাড়ি গিয়ে সেই লেখাটার ব্যাপারে ডিটেইলসে ডিসকাস করতে পারলে ভালো হত। একটু থেমে আবার বলেছেন, তোমার মা কি তখন বাড়িতে থাকবেন?

দেবারতি জানে, ভয়ঙ্কর পত্রিকায় পুজোয় বড়গল্প লিখলে চারহাজার টাকা পাওয়া যায়। ও পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে পোড় খাওয়া সম্পাদকটিকে জরিপ করল। তারপর খুব সহজ গলায় বলল, আপনার কাগজে পুজোয় বড়গল্প লিখতে গেলে শুতে হয়?

প্রেমময় হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কান দুটো কেমন গরম লাগছিল। দেবারতির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু দেবারতি মানির বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি। ও হাসতে হাসতেই বলেছে, শোওয়া নিয়ে আমার কোনও শুচিবায়ু নেই। তবে যার-তার সঙ্গে শুতে আপত্তি আছে। আপনার মতো বুড়ো কোলাব্যাঙের সঙ্গে শোওয়া মানে তো আমি ঘেন্নায় বলো হরি, হরি বোল হয়ে যাব।

উঠে দাঁড়িয়েছিল দেবারতি। ঠান্ডা গলায় বলেছিল, জানি আপনার কাগজে আমার লেখা আর ছাপা হবে না। কিন্তু কী করব প্রেমময়দা, বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে শুতে আমার আপত্তি আছে।

মেয়েটা চলে গিয়েছিল কাচের ঘর থেকে। কিন্তু প্রেমময় চৌধুরি মাথা গরম করেননি। মাথা গরম করলে কখনও কাগজ চালানো যায় না, আর কাজও হাসিল হয় না। শিকার করতে গেলে ধৈর্য ধরতে হয়।

তিনি দেবারতির কাছে দুঃখপ্রকাশ করে সম্পর্কটা ওপর-ওপর ঠিক করে নিয়েছিলেন। তারপর দেবারতির লেখাও ছেপেছেন নিয়মিত। আর দেবারতিও ওর কাগজে প্রেমময় চৌধুরিকে নিয়ে টুকটাক নিউজ ছাপিয়ে গেছে, পাবলিসিটি দিয়েছে।

কিন্তু প্রেমময় ভোলেননি। দেবারতি মানিকে একটা চরম শাস্তি দেবার জন্য শুধু লাগসই সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন।

দেবারতি বসবার পর প্রেমময় এক চুমুকে গ্লাসের তরলটুকু শেষ করে জিভ বুলিয়ে নিলেন ঠোঁটে। তারপর বললেন, বলো, কী ব্যাপার?

দেবারতি আঙুল তুলে উৎপলেন্দু সেনকে দেখাল। বলল, ওঁর একটা ইন্টারভিউ নেব।

উৎপলেন্দুর চোখে মুখে প্রথমে দেখা দিল বিস্ময়, তারপরই সন্দেহ।

সেটা লক্ষ করেই দেবারতি হাসল। টান মেরে পোশাকের কয়েকটা ভাঁজ ঠিক করে নিয়ে বলল, এবারের এই কনফারেন্স নিয়ে আমি একটা বড় স্টোরি করব। সন্ধেবেলা ফোন করে এডিটরের সঙ্গে কথা বলে গ্রিন সিগনাল নিয়ে নিয়েছি। অনিমেষ চৌধুরির ইন্টারভিউ দিয়ে শুরু করেছি। সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট উৎপলেন্দু সেন। কী উৎপলবাবু, ইন্টারভিউ দেবেন তো?

শেষ প্রশ্নটা উৎপলের দিকেই। অতএব উৎপলেন্দু সেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তারপর প্রেমময় চৌধুরি আর কৌশিক পালের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তা হলে ডাইনিং হলে দেখা হবে। সওয়া দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে যাচ্ছি।

ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। যাবার আগে প্রেমময় দেবারতিকে একবার দেখলেন। ইন্টারভিউ নেবার ছল করে মেয়েটা উৎপলেন্দুর সঙ্গে শুতে আসেনি তো! মনে হয় না। কারণ বাজারে ওকে আর রঞ্জন দেবনাথকে নিয়েই যত গুজব শোনা যায়।

ঘরের দরজা বন্ধ হতেই দেবারতি একটা খালি গ্লাস টেনে নিয়ে তাতে হুইস্কি ঢালল। তারপর তাতে খানিকটা জল মিশিয়ে নিল ঢকঢক করে। চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বলল, এটা কি আপনি খাওয়াচ্ছেন, না কনফারেন্সের স্পনসররা খাওয়াচ্ছে?

উৎপলেন্দু সবজান্তা হাসি হেসে খানিকটা সহজ হতে চাইলেন। বললেন, আমি খাওয়াচ্ছি। জানেন না, কনফারেন্সের এই পাঁচ দিন স্পনসররা শুধু ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার খাওয়াচ্ছে। অবশ্য পাঁচদিন বিনিপয়সায় থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে এই আরামের হোটেলে।

দেবারতি বাঁকা চোখে তাকাল উৎপলেন্দুর দিকে। তারপর নোংরা সুরে বলল, বিখ্যাত সম্পাদক আর প্রকাশককে হুইস্কি খাইয়ে লাইন করছিলেন?

উৎপলেন্দু আক্ষেপের হাসি হাসলেন। মেয়েটা সাহসী, বেপরোয়া—তবে অভিজ্ঞতা কম। জানে না, প্রেমময় চৌধুরির মতো সম্পাদকরা সহজে গলে না। নইলে এত খাওয়ানো সত্ত্বেও পুজো সংখ্যা ভয়ঙ্কর-এ প্রতিবারে উৎপলেন্দু সেনের ছোট গল্প! একটা বড় গল্প বা উপন্যাসের জন্য উৎপল প্রেমময়কে ঠারেঠোরে কম বলেছেন! কিন্তু হা হতোস্মি! প্রেমময় চৌধুরি নির্বিবাদে উৎপলেন্দুর আতিথ্য গ্রহণ করেন—যেন সেটা তার চৌদ্দ পুরুষের অধিকার। অথচ উৎপলেন্দুর ইশারাগুলো দিব্যি ন্যাকা সেজে না বোঝার ভান করেন।

আর কৌশিক! প্রকাশক হিসেবে সেদিনের ছোকরা—সে-ও কিনা সেয়ানা হয়ে গেছে! ভাস্কর রাহা, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়, রূপেন মজুমদার, এঁদের একটার পর একটা উপন্যাস ছেপে যাচ্ছে, অথচ উৎপলেন্দুর বেলায় সম্পাদিত বই। এ যেন ছোটবেলার সান্ত্বনা পুরস্কার। কিন্তু তবুও উৎপল নিরাসক্ত হতে পারছেন কোথায়! একটা ক্ষীণ লোভাতুর আশা ওঁকে এখনও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কৌশিক আর প্রেমময়ের সঙ্গে যথাসাধ্য সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওঁরা যেন খুড়োর কল তৈরি করে উৎপলকে তাতে জুতে দিয়ে দৌড় করাচ্ছে।

উৎপলেন্দু সামান্য শব্দ করে হাসলেন, বললেন, ম্যাডাম, আপনার তো জানা উচিত, এখনকার যুগে শুধু ভালো লিখলেই লেখা ছাপা যায় না, তার জন্যে যোগাযোগ দরকার, যোগাযোগ।

যোগাযোগ শব্দটার ওপরে বেশ জোর দিলেন উৎপলেন্দু।

ব্যাগ থেকে প্যাড আর পেন বের করল দেবারতি। সরলভাবে জিগ্যেস করল, আপনার কি ধারণা আপনি ভালো লেখেন—তাও আপনার লেখা ছাপা হয় না?

উৎপলেন্দুর পুরোনো ইন্টারভিউটার কথা মনে পড়ল। মেয়েটা কি আবার সেই শয়তানি পথ নিয়েছে? মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছে, কিন্তু তাও গ্লাস তুলে নিলেন উৎপল। হতাশার ক্ষতের জ্বালা বড় ভয়ঙ্কর। মেয়েটা কি তার মধ্যে নুনের ছিটে দিতে এসেছে?

ঠকাস করে টেবিলে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন উৎপলেন্দু। একটা পঁচিশ-ছাব্বিশের মেয়েকে ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আক্রমণই করতে হবে।

সুতরাং অকুতোভয়ে মনের কথা বললেন, ধারণা নয়, আমি ভালো করেই জানি যে আমি অনেকের চেয়ে ভালো লিখি। কিন্তু পত্রিকাগুলো কখনও ভালো লেখা ছাপবে না। ছাপলে ওদের মাইনে করা জনপ্রিয় লেখকগুলোর নাম-ডাকে টান পড়বে। একটু থেমে আবার বললেন, জানেন, সেই চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে আমার লেখা ছাপা হচ্ছে!

জানি। কিন্তু তাও দেখুন, এই কনফারেন্সে আপনাকে মাঝারি লেখক হিসেবে ডাকা হয়েছে। আপনাকে গল্পপাঠের লিস্টে রাখা হয়নি।

উৎপলেন্দুর কান গরম হল। মেয়েটা আহত মর্যাদায় ঘা দিয়েছে। তাঁকে এইভাবে হেনস্থা করার পিছনে অনুষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের নিশ্চিত হাত রয়েছে। উৎপলকে ওঁরা কিছুতেই প্রথম সারিতে আসতে দেবে না। কিন্তু তাও তিনি অনুষ্ঠানে এসেছেন। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

সেই চোদ্দো বছর বয়েস থেকে তেতাল্লিশ বছর ধরে লেখালিখি! কী কষ্টের সব দিন, কী অপমানের সব দিন! চুনোপুঁটি, ক-অক্ষর-গোমাংস সব সম্পাদক-প্রকাশকরা কী হেনস্থাটাই না করেছে। ভাস্কর রাহার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়। যখনই উৎপল তাঁর প্রথম ছাপা লেখার কথা বলেন, তখনই রাহা মন্তব্য করেন, কী আর করবেন, উৎপল। জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।

তার মানে! জ্যেষ্ঠ হলেই কি তাহলে নিকৃষ্ট হতে হবে?

উৎপলেন্দুর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে দেবারতি হাসল। সুন্দর দাঁতে পেনটাকে আলতোভাবে কামড়ে ধরল। সামনের বড় আয়নায় উৎপলেন্দু সেনের বাঁ দিকের প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল। ফরসা মুখে লালচে আভা। চওড়া কপাল। যাত্রাদলের নায়কের মতো বাবরি

চুল। তবে বয়েসের জন্য কঁচাপাকা এবং পাতলা হয়ে গেছে। গোটা মুখে কেমন যেন ক্লান্ত, আহত, পরাজিত সৈনিকের ছাপ। তবে আত্মমর্যাদা ও অহঙ্কারের ইশারাও স্পষ্ট।

মাথা নেড়ে এক ঝটকায় চুল সরাল দেবারতি। ওর বুক নড়ে উঠল। হাতের পেনটা বিছানায় রেখে টেবিল থেকে গ্লাস তুলে চুমুক দিল। তারপর জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে জিগ্যেস করল, রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য তাহলে আপনাকে কিছু দেয়নি?

উৎপলেন্দু মুখ তুলে মেয়েটাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর ও বিশেষ কিছু দেয়নি।

আচ্ছা, এটা না হয় গেল। তিরিশ বছর তো মাঝারি এক নাটকের দলে অভিনয় করলেন। যদ্দূর জানি, খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেননি। নাটকের মেজর রোল সেরকমভাবে পাননি। সিনেমা বা টিভিতেও কোনও চান্স পাননি। এরকমটা হল কেন?

ভেতরে-ভেতরে একটা অদ্ভুত রাগ হচ্ছিল উৎপলেন্দুর। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, ম্যাডাম, নাটক তোক আর লেখালিখি হোক, ব্যাপারটা আসলে একই। সম্পাদক বলুন, প্রকাশক বলুন আর নাটকের দলের চিফ বলুন কালচারাল লাইনের লোকগুলো বেসিক্যালি একরকম। ওরা কাউকে সহজে উঠতে দেয় না।

দেবারতি পেন নিয়ে প্যাডে কিছুক্ষণ কী সব লিখল। তারপর ছোট্ট করে মন্তব্য করল, তা হলে আপনাকে মোটামুটিভাবে ব্যর্থ বলা যায়?

হ্যাঁ, ব্যর্থ—কিন্তু সমর্থ। আমাকে ক্ষমতা প্রমাণ করার কেউ সুযোগই দিল না।

সমর্থ? ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল দেবারতি। তারপর চাপা গলায় বলল, তাহলে বিয়ে করেননি কেন?

উৎপলেন্দু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, এমনিই—

প্রথম প্রেমের ন্যাকামি না আর কিছু? অর্থপূর্ণ নজরে উৎপলকে দেখল দেবারতি।

না, না, প্রথম প্রেম-টেম কিছু না।

তাহলে?

বড় অবাধ্য এই যুবতী। ভাবলেন উৎপলেন্দু। তাঁর বিয়ে না করার পিছনে কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা সবাইকে বলার নয়। কাউকে বলার নয়। যারা জানে তারা জানে। আর কারও জানার দরকার নেই।

উত্তর না পেয়ে দেবারতি বলল, নাটকের দলে তো মেয়ে আছে। সেখানে মজা লুটছেন?

উৎপলেন্দুর চোখে মুখে রক্তকণিকার দল হইহই করে ভিড় করল। কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। একবার তার মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গেছে। উত্তেজিত হওয়াটা ডাক্তারের বারণ।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে উৎপলেন্দু উত্তর দিয়েছেন, ম্যাডাম, এটুকু আপনাকে বলি, আমি কনফামড় ব্যাচেলার। আর মজা লুটতে গেলে নাটকের দল কেন, অন্য ঢের জায়গা আছে।

চোখ নাচাল দেবারতিঃ আছে জানি, কিন্তু আপনার যাওয়ার সাহস নেই। গ্লাসে শব্দ করে একবার চুমুক দিয়েঃ সে-সাহস থাকলে অ্যাদ্দিনে আপনার মুখেভাত হয়ে যেত। খিলখিল করে হেসে উঠল দুর্বিনীত নারী।

কান আরও বেশি গরম হল। ঘরটা যেন দুলে উঠল চোখের সামনে। সেই অবস্থাতেই বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। জল মেশাতে ভুলে গেলেন বোধ হয়। গ্লাসে চুমুক দিতেই জ্বলন্ত কাঠকয়লা গলা বেয়ে নেমে গেল পাকস্থলীতে।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে উৎপলেন্দু সেন হয়তো ধৈর্য ও সংযম ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে পালটা জবাব দিলেন, কী করে জানলেন হয়নি?

দেবারতি মানি উৎপলের কথায় একটুও আমল না দিয়ে বলল, এ-বছরটা কিসের বছর বলুন তো?

উৎপলেন্দু খানিকটা বিস্মিত হলেন। চুপ করে থেকে বুঝতে চাইলেন, এর পরের আঘাতটা কোন দিক থেকে আসবে।

ওঁকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল দেবারতি। হাসতে-হাসতেই বলল, ও মা! তাও জানেন না! প্রতিবন্ধী বর্ষ।

তাতে কী হয়েছে?

গ্লাসে চুমুক এবং উচ্চুঙ্খল হাসির পর ও আই থিঙ্ক ইউ আর ওয়ান, মিস্টার সেন। যৌন প্রতিবন্ধী।

উৎপলেন্দু আর সইতে পারেননি। তার ওপরের ভদ্রতার পোশাক খসে পড়ল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে অভিনেতার ঢঙে শব্দ করে হেসে বলেছেন, যদি সাহস থাকে তাহলে পরীক্ষা প্রার্থনীয়, মিস মানি। মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। অপমানের আগুন। দাঁতে দাঁত চেপে বাঁকা হেসে তিনি আরও যোগ করলেন, গ্যারান্টি দিচ্ছি, আনন্দ পাবেন।

আশ্চর্য! দো-আঁশলা মেয়েটা এ-কথায় এতটুকু বিব্রত হল না। বরং বিদ্রোহের হাসি হেসে বলল, আপনাদের মতো হিপোক্রিটদের কথার কী দাম আছে! পরীক্ষার সময়ে হয়তো ভয়ে পিছিয়ে যাবেন।

উৎপলেন্দু কিছু বলে ওঠার আগেই দরজায় কলিংবেলের শব্দ।

দেবারতি চট করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

খানিকটা বেসামাল পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন উৎপলেন্দু সেন।

অধ্যাপক অনিমেষ চৌধুরি।

পরনে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। ভুঁড়ির ওপরে গেঞ্জিটা খানিকটা তুলে পাজামার দড়িটা টেনে ধরে আছেন ভদ্রলোক। উৎপলেন্দুর দিকে কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, উৎপলেন্দুবাবু, আপনার কাছে একটা কাচি হবে?

কাঁচি! কাঁচি দিয়ে কী করবেন?

দেখুন না, পাজামার দড়িটায় একটা গেঁট পড়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে উৎপলেন্দুকে পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল দেবারতি মানি।

অনিমেষ চৌধুরি ওকে দেখে যেন বোবা হয়ে গেলেন। একবার উৎপলের দিকে, আর একবার দেবারতির দিকে দেখতে লাগলেন। তারপর উৎপলের দশাসই শরীরের পাশ দিয়ে ঘরের ভেতরটায় একবার উঁকি মারার চেষ্টা করলেন।

দেবারতি অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে হাত নাড়ল। বলল, হাই, প্রফেসর!

তারপর হোটেলের করিডর ধরে হাঁটা দিল। সালোয়ার কামিজ পরার ফলে ওর শরীরের রেখাগুলো জোরালো আলোয় বড় চোখে লাগছিল। অধ্যাপক সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

উৎপলেন্দু তাকে বললেন, পাজামার গেঁট আর খুলে কাজ নেই। যান, ঘরে যান। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

করিডরের দেওয়ালে লাগানো ঘড়িতে সাড়ে দশটার ইলেকট্রনিক মিউজিক বেজে উঠল।

.

০৩.

ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে দেবারতি মানি এলোমেলো চিন্তা করছিল। ঘরে হালকা সবুজ রঙের নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। রহস্যময় আলোয় ঘরের ছায়া ছায়া আনাচ-কানাচগুলো কেমন যেন ভয় দেখাচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু হঠাৎ কখনও ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বড় রাস্তা থেকে।

লেসের কাজ করা গোলাপি নাইটি পরে বিছানায় শুয়েছিল দেবারতি। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। একটা ডিসপ্রিন ট্যাবলেট খেয়ে নিলে হয়। রাত কত এখন? বারোটা?

মাত্র তিনজনের ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ হয়েছে ওর। অনিমেষ চৌধুরি-উৎপলেন্দু সেন আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাল কনফারেন্সের ফাঁক-ফোকরে বাকি ইন্টারভিউগুলো সেরে নেবার চেষ্টা করবে। এগুলো মিলিয়ে সত্যি সত্যিই একটা স্টোরি লিখবে দেবারতি। কিন্তু অন্য একটা মতলবও আছে ওর। টপ সিক্রেট বোমাটি ফাটানো। কনফারেন্সের শেষ দিনে ভ্যালিডিক্টরি ফাংশানের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে সভার মাঝখানে ও ডিনামাইটের পলতেয় আগুন দেবে। তারপর যা হয় তোক।

রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসে বলেই এ-নিয়ে নোংরা কাজ দেবারতি সহ্য করতে পারে না। তাই পরশুরামের কুঠার হাতে ও লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। জালিয়াত অক্ষম ভন্ড লেখকগুলোকে ও চুরমার করে দেবে। এইসব লেখকদের জন্যই রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য দীর্ঘদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছে। এখন এ-লাইনের অনেক লেখক সফল। তাই এখনই সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর হতে হবে। আর সেই কারণেই ইন্টারভিউ নেবার ছল করে ওর টপ সিক্রেট খবর সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নিতে চায় দেবারতি।

আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলেই হোটেলে রয়েছেন। উদ্যোক্তারা তাদের জন্য মাথাপিছু একটা করে ঘর যেমন বরাদ্দ করেছেন, তেমনই দিয়েছেন রোজকার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের কুপন। এছাড়া আজ সকালে কনফারেন্সের রেজিস্ট্রেশনের সময় পাওয়া গেছে

সুদৃশ্য ব্যাগ, পেন, প্যাড, আর একটা ব্যাজ। দেবারতি ব্যাজটা ব্যাগেই রেখে দিয়েছিল–বুকে লাগায়নি। লাগানোর দরকারও নেই, কারণ উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই ওকে চেনেন। তা ছাড়া ওর দৈনিক পত্রিকা সুপ্রভাত এই সম্মেলনের অন্যতম স্পনসর।

কলিংবেল বেজে উঠল টুং-টাং।

অবাক হল দেবারতি। ওর ঘরে কে এল এত রাতে?

বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলতে গেল। অত সহজে কাউকে ভয় পায় না দেবারতি। আর তিন তারা এই হোটেলে ডাকাত পড়ার ভয় নিশ্চয়ই নেই!

কিন্তু দরজা খুলতেই ডাকাতের মুখোমুখি হল।

রঞ্জন দেবনাথ। পরনে কক্সউলের হাওয়াই শার্ট আর জিন্স।

কী ব্যাপার! এত রাতে।

দেবারতি মানির বিস্ময়কে আমল দিল না রঞ্জন। হেসে বলল, শুনলাম জনগণের ইন্টারভিউ নিয়ে বেড়াচ্ছ–তাই ভাবলাম ঘরে গিয়েই ইন্টারভিউটা দিয়ে আসি। নইলে আমার মতো খাপছাড়া খামখেয়ালি লেখক...কে আর পাত্তা দেয়...হয়তো বাদই পড়ে যাব।

রঞ্জনটা ইয়ারকি মারতেও জানে! ভাবল দেবারতি! ও কি জানে না, ওকে দেখলেই দেবারতির বুকের ভেতরটা কেমন করে!

দেবারতি চোখের নমনীয় ইশারায় রঞ্জনকে ভেতরে ডাকল। অস্ফুটে বলল, এসো–।

রঞ্জন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। চোখ নাচিয়ে মজা করে বলল, কী দেবারতি মানি, বলো তোমার মিষ্টি রাইটারদের নামের লিস্টে অধমের শুভনাম আছে কি না। এগারো বছর

লেখালেখি ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে গিয়েছিলাম বলে কেউ আর পাত্তা-টাত্তা দেয় না, বুঝলে।

দেবারতি কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই রঞ্জনের খুব কাছে চলে এল। বিড়বিড় করে বলল, বাংলা মিস্ট্রি রাইটারদের মধ্যে তুমিই একমাত্র পুরুষ লেখক। ইউ অলওয়েজ রাইট লাইক আ ম্যান। সত্যিকারের পুরুষের মতো লেখো।

রঞ্জন দেবারতিকে জাপটে ধরল দু-হাতে। বলল, শুধু লেখা নয়, সত্যিকারের পুরুষের মতো আমি আরও অনেক কিছু করতে পারি।

জানি। একটু থেমে ও আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে!

কানাঘুষোয় দেবারতি শুনেছে, রত্নাবলীর সেই শুরুর জীবন থেকেই রঞ্জনের সঙ্গে তার একটা গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। ইদানিং দেবারতি মানির জন্যেই হয়তো সেই বন্ধুত্ব কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। রঞ্জন আর রত্নাবলীর অসমবয়েসি বন্ধুত্ব নিয়ে লেখক মহলে, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আচ্ছায় কম আলোচনা হয় না। কিন্তু আলোচনায় কী যায় আসে! রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় দেবারতির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়। অন্তত এখন।

দেবারতি রঞ্জনের আদর খেতে-খেতেই জিগ্যেস করল, গল্প লেখার কদ্দূর?

সম্মেলনের শেষ দিন সকালে একটা ওয়ার্কশপ আছে। তখন আমন্ত্রিত লেখকদের একটা করে লেখা পড়ে শোনাতে হবে। সেটা অসম্পূর্ণ লেখা হলেও চলবে। তারপর সেই লেখা নিয়ে চুলচেরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

রঞ্জন ততক্ষণে দেবারতির কানের কাছে মুখ ঘষছিল। ওর জড়ানো স্বর শোনা গেল, টু হেল উইথ ওয়ার্কশপ..ফর গডস সেক, হোল্ড ইয়োর টাঙ অ্যান্ড লেট মি লাভ...।

আবছায়া সবুজ আলোয় দুটো শরীর এক হয়ে এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। আচমকা ধসে পড়া জীর্ণ বাড়ির মতোই ওরা পড়ে গেল বিছানায়।

অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে কোনওরকমে পোশাক-আশাকগুলো খুলে ফেলল ওরা। তারপর নগ্ন দেবারতিকে দেখে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে রইল রঞ্জন। সবুজ আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে।

কী ভাবছ? রঞ্জনের গালে, দাড়িতে, আঙুল চালাল দেবারতি।

পথের পাঁচালি।

পথের পাঁচালি! অবাক হল দেবারতি।

হ্যাঁ! বিভূতিভূষণের কলমে আঁকা সজীব প্রকৃতি। ভার্জিন নেচার। তুমি।

খিলখিল করে হাসি : আমি ভার্জিন নই।

ভার্জিনিটি কি শুধু শরীরে থাকে?

আলো-আঁধারেই পুরুষ-লেখককে দেখল দেবারতি। কী সুন্দর করে কথা বলে রঞ্জন! দেবারতি জানে, শতকরা নিরানব্বইজন পুরুষই ওর শরীরের মধ্যে কৌমার্য খুঁজবে। তারা অনন্তকাল ধরে শুধু খুঁজেই যাবে, কিন্তু পাবে না।

রঞ্জনের আদরে দেবারতি আর গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছিল না। নাঃ, লোকটা অন্যরকম করে আদর করতেও জানে!

রঞ্জন! রঞ্জন! আমাকে জড়িয়ে ধরো, আরও জোরে।

আবছা আলোয় ওরা লড়াইয়ে মেতে ওঠে। ঠান্ডা বাতাস ওদের শরীরের তাপ শুষে নিতে পারে না। ওদের মসৃণ ত্বক ভিজে যায় ঘামে।

রঞ্জনকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দেবারতি। যেন ওকে ছেড়ে দিলেই ও ছিটকে পড়ে যাবে অতল খাদে। আর রঞ্জন যেন শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে দেবারতিকে। কিন্তু ওর প্রচণ্ড ঝটকাতেও দেবারতির হাতের বাঁধন শিথিল হয় না। ওর মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত গোঙানি বেরিয়ে আসে। তুমুল ভূমিকম্পে সবকিছু দুলে যায়, মেঝে কেঁপে ওঠে, আলো ঝাপসা হয়ে যায়।

তারপর…একসময়…সবকিছু আবার সুস্থির হয়। দেবারতির চোখ আবার ফিরে পায় স্বাভাবিক দৃষ্টি। ওর শরীর হালকা লাগে। রঞ্জন পাশ থেকে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

দেবারতি, আই লাভ ইউ।

আই লাভ ইউ টু। নরম গলায় বলল দেবারতি, তোমার লেখার মতোই শক্তিশালী তুমি।

এরপর উঠে বসে ওরা। দেবারতির সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায় দুজনে। একে অপরের গা ঘেঁষে বসে সিগারেটে আকুল টান দেয়।

দেবারতির মাথা ধরা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। এখন আর সহজে ঘুম আসবে না ওর।

রঞ্জনের খোলা পিঠে আলতো নখের আঁচড় কেটে দেবারতি বলল, ইউ আর এ জিনিয়াস। এগারো বছর বনবাসে থাকা তোমার ঠিক হয়নি। তুমি জানো কী করে রহস্য গল্প লিখতে হয়।

সিগারেটে গভীর টান দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়ল রঞ্জন দেবনাথ, বলল, দেবী, তুমি জানো না একটা সময়ে আমাকে টাকার জন্যে কী লড়াই করতে হয়েছে! একগাদা ছোট ছোট ভাই বোন রেখে বাবা মারা গেলেন। আমি তখন সবে একটা ফার্টিলাইজার কোম্পানির মার্কেটিং এ ঢুকেছি। তখন থেকেই লেখালিখির চেষ্টা করেছি। লেখা ছাপতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। তারপর… তারপর হঠাৎ করেই অভাবের গল্পটা ঘুরে গেছে…।

জানো, নাইনটি ওয়ান আর নাইনটি টু-তে রবীন্দ্র পুরস্কারের লিস্টে ফাইনাল রাউন্ডে রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের জীবন যখন ফুরিয়ে যায় উপন্যাসটা ছিল! তোমার ইচ্ছে করে না, তোমার একটা উপন্যাস ওই পুরস্কারের ফাইনাল লিস্টে যাক কিংবা পুরস্কার-টুরস্কার পেয়ে যাক?

চাপা গলায় হেসে উঠল রঞ্জন দেবনাথ এই ইচ্ছেটা আমার গতবছর থেকে হয়েছে–আগে ছিল না। ওই এগারোটা বছর ধরে টাকার জন্যে আমি পাগলা কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি।

তোমার লেখাগুলো খুব ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে সরলতা আছে, হৃদয়ের ব্যাপারটা আছে। পুরোপুরি সেরিব্রাল নয়, একটু-আধটু কার্ডিয়াক কোয়ালিটিও হ্যাঁজ খিলখিল করে হাসল দেবারতি।

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে দেবারতিকে আবার জাপটে ধরল রঞ্জন। বলল, এই মুহূর্তে কিন্তু সেরিব্রাল ব্যাপার একটুও নেই। সবটাই কার্ডিয়াক। আচমকা পাগলের মতো চুমু আঁকতে লাগল দেবারতির শরীরে।

তুমি আমার বুদ্ধিজীবী শিশু।

শিশু তখন দেবারতিতে প্রায় ডুবে গেছে। আজকের সুযোগ সে হারাতে রাজি নয়। অনেক অনেক দিন পর দেবারতি মানিকে সে এইভাবে কাছে পেয়েছে। এই সম্মেলনের দিনগুলোর জন্য কীভাবে যে ওরা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে ছিল তা শুধু ওরাই জানে!

সবুজ আলোয় শুরু হয়ে গেল দেবারতি আর রঞ্জনের ব্যস্ত দ্বিতীয় সম্মিলন।

.

সাড়ে দশটা বাজতেই চায়ের জন্য দশ মিনিটের বিরতি।

সকালের সেশানে ভাস্কর রাহার বক্তৃতা ছিল। তিনি শুনিয়েছেন তার যৌবনকালের নানা ঘটনার কথা। কী কষ্ট করে দিন কাটিয়েছে রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকাগুলো! লাল নিউজপ্রিন্টে ভাঙা টাইপ আর কাঠের বা জিঙ্কের ব্লক ব্যবহার করে ছেপে একহাজার কি দু-হাজার কপি কোনওরকমে বিক্রি হত। দারিদ্র্যরেখায় পা ফেলে তারা পথ হাঁটত।

ষাটের দশকের শেষে আর সত্তরের দশকের শুরুতে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল পিন আঁটা যৌন পত্রিকায়। সে-সব পত্রিকা বিক্রিও হত রমরম করে। নামী লেখকদের দু-একজন ছাড়া আর প্রায় সবাই লিখেছেন পিন আঁটা ওইসব পত্রিকায়।

তারপর একসময় হোম ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে শুরু হয়ে গেল ধরপাকড়। তখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বেশিরভাগ মালিক-সম্পাদক চালু করেন রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা পত্রিকা। সেটা ছিল ওঁদের কাছে বেঁচে থাকার লড়াই। আর নড়বড়ে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে আঁকড়ে ধরে আশ্রয় খুঁজেছিল তখনকার রহস্য-রোমাঞ্চ লেখকরা। তখনকার অবস্থা, আর এখনকার অবস্থা! এ-যেন বস্তি থেকে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ে রূপান্তর।

ভাস্কর রাহার বক্তৃতার পর শুরু হয়েছে চলচ্চিত্র। সত্যজিৎ রায়ের চিড়িয়াখানা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী আর উত্তমকুমারের অভিনয়। তারই মাঝখানে এই-চা পানের বিরতি।

অনামিকা সেনগুপ্তের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভাস্কর রাহা। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন আর এক আমন্ত্রিত রহস্য লেখক জ্যোতিষ্ক সান্যাল। অফিসের মিটিংয়ে বাইরে ছিলেন বলে কাল আসতে পারেননি। আজ এসে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। জ্যোতিষ্ক নীচু গলায় গল্প করছিলেন কুয়াশা প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার কল্পনা সেনের সঙ্গে। সম্প্রতি কুয়াশা থেকে জ্যোতিষ্কর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জন গ্রিশাম এর টার্মিনেশন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাস্কর রাহা বললেন, শোনো অনামিকা, তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলি।

অনামিকা চা খায় না। সম্ভবত ফরসা রং ময়লা হয়ে যাবে বলে। ও আগ্রহ নিয়ে তাকাল ভাস্কর রাহার দিকে।

রাহা একটা আধপোড়া চুরুট পকেট থেকে বের করে ধরালেন। তারপর তাতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, অনেক আগের কথা। তুমি তখন বোধহয় জন্মাওনি। কবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সচিত্র তোমার জীবন পত্রিকার একটা সংখ্যায় একবার মপাসাঁর একটা গল্প অনুবাদ করেছি। ম্যাগাজিন বেরোনোর পর দপ্তরে গেছি কপি নিতে। কবিরঞ্জনবাবু ছিলেন না। ছিল তাঁর হেড কম্পোজিটার বলাইবাবু। তাঁকে সবিনয়ে বললাম যে, এই সংখ্যায় আমার একটা লেখা আছে– কপি নিতে এসেছি। তিনি জিগ্যেস করলেন, কী লেখা? বললাম, মপাসাঁর একটা গল্প আছে…।

আবার চায়ের কাপে চুমুক এবং চুরুটে গভীর টান।

…তাতে বলাইবাবু কী বলেছিলেন জানো?

ততক্ষণে জ্যোতিষ্ক সান্যাল আর কল্পনা সেন ভাস্কর রাহার কাছাকাছি এসে গল্প শোনায় মন দিয়েছেন।

কী বলেছিলেন? আগ্রহের সুরে অনামিকা জানতে চাইল।

ভাস্কর রাহা গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, বলাইবাবু আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, আপনিই কি মোসা?

একথা শুনে সবাই হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল।

হইচই শুনে কখন যেন ওঁদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল দেবারতি মানি। চোখ সামান্য লাল। চোখের কোল বসা। কিন্তু সেজেছে খুব সুন্দর করে। হালকা নীলের ওপরে কালো ফুল বসানো একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে। কানে নতুন একজোড়া দুল। কপালে নীল টিপ। ঠোঁটে হালকা লিপগ্লস। চোখে সূক্ষ্ম কাজলরেখা।

ভাস্কর রাহা ওর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী, আমার রিকোয়েস্ট মনে আছে তো?

ও হেসে মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, মনে আছে। তারপর বলল, আজ লাঞ্চের ফাঁকে আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব, ভাস্করদা।

আমার কথা সবই তো তুমি জানো। নতুন আর কী বলব।

তবুও–।

এমন সময় কোথা থেকে যেন প্রেমময় চৌধুরি এসে উদয় হলেন। কোনওরকম ভণিতা না করেই বেশ উঁচু গলায় জিগ্যেস করলেন, এই, দেবারতি, তুমি নাকি কী একটা টপ সিক্রেট জানতে পেরেছ?

দেবারতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে তাকাল প্রেমময়ের দিকে। লোকটা ওকে হাটের মাঝে অপ্রস্তুত করতে চায়?

ভাস্কর রাহা ভয় পেলেন। মেয়েটা খেপে গিয়ে সাঙ্ঘাতিক কিছু না বলে বসে।

হ্যাঁ, জানতে পেরেছি। সো হোয়াট?

না, মানে, আমরা সিক্রেটটা জানতে পারব না?

সময় হলেই জানতে পারবেন। একটু ধৈর্য ধরুন। তারপরই কী ভেবে দুষ্টুমি চোখে মেয়েটা বলল, একটু হিন্ট দিতে পারি–।

সর্বনাশ। ভাস্কর রাহা প্রমাদ গুনলেন। মেয়েটা যে যা-হোক-একটা সিক্রেট জেনেছে, এ কথা দেখছি একেবারেই সিক্রেট থাকবে না। তিনি দেবারতিকে বাধা দেবার জন্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বেপরোয়া প্রগলভা মেয়েটা মুখ খুলল।

পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস।

তার মানে! ভাস্কর রাহা অবাক হলেন। সিক্রেটের হিন্ট পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস! একজন উনিশ শতকের বাঙালি ডিটেকটিভ কাহিনী লেখক। কোনান ডয়েল-এর দ্য সাইন অফ ফোর কাহিনী অনুবাদ করে প্রথম বাঙালি পাঠকের কাছে শার্লক হোমসকে হাজির করেন। আর দ্বিতীয়জন ১৮৭৫ সালে জন্ম নেওয়া ব্রিটিশ লেখক। দুজনের মধ্যে মিল আছে? দুজনেই ক্রাইম কাহিনীর লেখক এবং যথেষ্ট সফল ও জনপ্রিয় ছিলেন।

ভাস্কর রাহা খালি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন পাশের টেবিলে। বিস্মিত চোখে দেবারতি মানির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রেমময় চৌধুরি কেমন আমতা-আমতা করে সরে গেলেন।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল ভাস্কর রাহার স্নেহভাজন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশ পেরোলেও ভাস্কর রাহার চোখে ছোট ভাই। প্রশ্রয় যেমন দেন, প্রয়োজন হলে বকুনিও ততটাই। জ্যোতিষ্ক খুব সৎ আর পরিশ্রমী। আজকের যুগে যে-দুটো গুণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হয়। তাই রাহা ওকে পছন্দ করেন।

জ্যোতিষ্ক ভাস্কর রাহার কাছে এসে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, এই পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস পাবলিক দুটো কে বলুন তো?

ভাস্কর রাহার দু-চোখে তিরস্কারের অভিব্যক্তি। জ্যোতিষ্কের দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে নিলেন। বললেন, তুই কি কোনও দিনই বইটইয়ের পাতা ওলটাবি না!

অনামিকার কান বেশ প্রখর। ও সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল, ওমা, এঁদের নাম জানেন না! একজন তো…।

মাইকে ঘোষণা করা হল, সিনেমা আবার শুরু হচ্ছে।

চুরুট নিভিয়ে দিয়ে রাহা সেদিকে এগোলেন। পিছনে অনামিকা আর জ্যোতিষ্কের কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। দেবারতি আবার তাঁর পাশে এসে বলে গেল, মুকুটহীন সম্রাট, ভুলবেন না যেন লাঞ্চের সময়।

রাহা হেসে মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মনে আছে।

ঠিক তখনই রঞ্জন দেবনাথ এসে দেবারতিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে চলে গেল এলিভেটরের দিকে। ওরা বোধহয় নির্জনতা খুঁজছে।

বলরুমে ঢুকে নির্দিষ্ট চেয়ারের দিকে যাবার সময় রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাস্কর রাহার।

কী মিসেস মুখার্জি, এখন নতুন কী লিখছেন?

আমার আর লেখালিখি! ওই ওয়ার্কশপের গল্পটাই এখন লেখার চেষ্টা করছি। বয়েস হয়ে গেছে, এত ধকল আর সয় না।

কী সুন্দর করে কথা বলেন রত্নাবলী! এত যশ আর খ্যাতি—অথচ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অহঙ্কার সেভাবে বাড়তে পারেনি। ওঁর ব্যবহার এত নরম আর মিষ্টি। অথচ লেখেন যখন

তখন ঝকঝকে স্মার্ট গদ্য। লেখায় বলতে গেলে কোনও বাড়তি শব্দ থাকে না। অবশ্য দেড়-দু-বছর ধরে ওঁর লেখার ধার কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। সেটা হয়তো বয়েসের জন্য।

দেবারতির ইন্টারভিউ দিয়েছেন?

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন রত্নাবলী। বললেন, সুপ্রভাত-এর ওই জার্নালিস্ট মেয়েটি তো! হ্যাঁ, একটু আগে আমাকে বলেছে। ওকে বলেছি, সাতটার সময় আমার ঘরে আসতে। ও তো ঠিক আমার নীচের ঘরটাতেই থাকে। একটু থেমে বললেন, মেয়েট বেশ স্মার্ট। ওর একটা ফিচার পড়েছিলাম–মন্দ লেখেনি। আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন?

না। বলেছি লাঞ্চ আওয়ারে কথা বলব।

সারাদিন কনফারেন্সের এই ধকলের পর সন্ধেবেলাটা একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। কাল ভাবছি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব। একজন টেলিফিল্ম প্রোডিউসারের আসার কথা আছে। তা ছাড়া আমার বৃদ্ধ কর্তাটি একা একা কী করছে সেটাও একবার দেখে আসা দরকার। হেসে কথা শেষ করলেন রত্মাবলী।

বলরুমের আলো নিভে গেল। শুধু ঝাড়লণ্ঠনের আলো টিমটিম করে জ্বলছে।

রত্নাবলী নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল ভাস্কর রাহার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ম্যাডাম ঠিকই বলেছে। পুরুষ মানুষ–চিতায় না ওঠা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

অনামিকার কান আবার তার দক্ষতার পরিচয় দিল। ও নীচু গলায় জ্যোতিষ্ককে বলল, সেইজন্যেই তো কোনও পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না।

জ্যোতিষ্ক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন অনামিকার দিকে, বললেন, সকালে যে দেখলাম রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছিলে!

ওই গল্প পর্যন্তই। আমি সবসময় কেয়ারফুল থাকি।

আধো-আঁধারিতে অনামিকার মন্তব্যটা ভাস্কর রাহার কানে গেল। তিনি আপনমনেই হাসলেন। রূপেন মজুমদারের মতো অনামিকা সেনগুপ্তও তাহলে ভার্জিন রাইটার হতে চলেছে! সবাই কেন যে বিশেষ্যকে উপেক্ষা করে বিশেষণের ওপরে জোর দেয় কে জানে! কী করে তিনি অনামিকা বা রূপেন মজুমদারকে বোঝাবেন, ভার্জিন থাকার চেয়ে রাইটার হওয়াটা অনেক বেশি জরুরি– অন্তত বাংলা সাহিত্যের পক্ষে।

ততক্ষণে গোলাপ কলোনীর গল্প আবার শুরু হয়ে গেছে পরদায়।

.

০৪.

দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

হোটেল সিরাজ-এর রেস্তরাঁর জগঝম্প মিউজিক ছাপিয়েও শোনা গেল শব্দটা। বিশেষ করে হোটেলে বাইরের দিকে পশ্চিমমুখো ঘরে যাঁরা ছিলেন তারা প্রায় সকলেই শুনতে পেলেন। যাঁরা এই অল্প রাতেই ঘুমে ঢলে পড়েছেন, তারা দুর্ঘটনার মাহেন্দ্রক্ষণটি জানতে পারলেন না। তারা জানতে পারলেন না, সংঘর্ষের শব্দ কী বিশ্রী শোনায়।

প্রচণ্ড তীব্র অথচ ভোঁতা শব্দটা তিনতলার ঘরে বসেই শুনতে পেলেন ভাস্কর রাহা। ওয়ার্কশপের জন্য একটা গল্প লিখতে বসেছিলেন। গোটা চারেক পৃষ্ঠা কাটাছেঁড়া করে কোনওরকমে একটা গল্পের শুরুটা খাড়া করেছেন। সেটা পড়ে মন্দ লাগছে না। লেখালিখির ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে তিনি। এটাই বোধহয় তার সাফল্যের চাবিকাঠি।

সম্মেলনের জন্য একটা বিমূর্ত গল্প লিখছেন তিনি। কখনও কখনও সাদামাঠা গোয়েন্দা বা রহস্য কাহিনী লেখেন বটে, তবে লিখে তৃপ্তি পান দুর্বোধ্য, জটিল, বিমূর্ত রহস্য গল্প। এ

যেন পাঠকের সঙ্গে তাঁর লুকোচুরি খেলা, বুদ্ধির খেলা। তাঁর গল্প পড়াটা এখন পাঠক সমাজে এক ফ্যাশান।

লিখতে বসলেই তার মনে পড়ে যায় ছোট ছেলে লালটুর কথা। লালটু প্রায় দশবছর হল চাকরি নিয়ে আমেদাবাদে। বছর তিরিশ আগে, তার লেখালিখির শিক্ষানবিশীর সময় ভাস্কর রাহা নিয়মিতভাবে বিদেশি গল্প অনুবাদ যেমন করেছেন, তেমনি সেগুলো অবলম্বন করে, সেগুলোর বিষয় ও ভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব গল্পও কম লেখেননি। এতে তার কোনও লজ্জা নেই। কারণ, পাঁচকড়ি দে-র প্রথম লেখা সতী-শোভনা-ও বিদেশি গল্প অবলম্বনে লেখা। তা ছাড়া, রাহার বরাবরের লক্ষ্য ছিল ভালো লেখা। শুধু প্লট আত্মসাৎ করেই ভালো লেখা যায় না।

যখন তিনি বাঁ দিকে বিদেশি বই রেখে মনোযোগ দিয়ে লিখতেন, তখন লেখক পিতার একান্ত অনুগত পুত্র লালটু এসে চুপটি করে বসে থাকত তার কাছে। হঠাৎই একদিন সেই বালক তাকে প্রশ্ন করেছিল, বাবা তুমি সবসময় বই দেখে দেখে লেখো কেন?

ভাস্কর রাহা কোনও উত্তর দিতেও পারেননি।

লিখতে লিখতে এসব কথাই ভাবছিলেন, আর তখনই শুনতে পেলেন শব্দটা।

প্রথমটা সামান্য চমকে উঠেছিলেন। কাগজের ওপরে কলম কেঁপে উঠেছিল। কারণ ভেবেছিলেন, ঘটনা হয়তো অসামান্য। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ উকর্ণ হয়ে থেকেও তখন স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক আর কোনও শব্দ কানে এল না, তখন আবার মন দিয়েছেন লেখায়। খেয়াল করেননি, হাতের চুরুট কখন নিভে গেছে।

একটু পরেই নীচ থেকে কয়েকজনের কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল। তারপর, ক্রমে-ক্রমে, সেটা ছোটখাটো হইচইয়ে দাঁড়াল।

কলম থামালেন ভাস্কর রাহা। মোটা ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে নামালেন। বিস্তৃত কপালে হাত ঘষলেন একবার। তারপর হাত চালালেন মাথার চুলে। লম্বা ধবধবে সাদা অথবা রুপোলি চুল। সিলভার ব্লন্ড যাকে বলা যায়। কিছুদিন আগেও তার চুলে জাতীয় পতাকার মতো তিন-তিনটে রং খেলা করত ও সাদা, লাল আর কালো। এর মধ্যে দুটো রঙের কারণ তার জানা ছিল। সাদা ও বয়েসের জন্য। কালো ও কলপের জন্য। কিন্তু লাল? সে কি বয়েস আর কলপের দ্বৈত প্রভাব? জীবনের সাদা-কালো রংসুখ-দুঃখ সকলেই সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু এমন কিছু রং জীবনে থেকে যায়–এমন কিছু অনুভূতি ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর চুলের ওই লাল রঙের মতো।

এখন তার শুধু সাদামাঠা জীবন। তাতে আর কোনও রং নেই।

নীচ থেকে ভেসে আসা হইচইটা যেহেতু বাড়ছিল সেহেতু লেখার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন ভাস্কর রাহা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন পশ্চিমের জানলার কাছে। বড় মাপের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। নক্ষত্রখচিত হোটেলে যেমন হয়। জানলার পাল্লা ভোলাই ছিল। তিনি ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাঁচ-সাতজন মানুষের জটলা ছাড়া অস্বাভাবিক আর কিছু দেখতে পেলেন না। কারণ কার্নিশে তাঁর নজর কিছুটা বাধা পাচ্ছিল।

হোটেলের বাইরের রাস্তা নির্জন, হোটেলের শান বাঁধানো টেরাস নির্জন, আর পাম গাছগুলোকেও বড় নিঃসঙ্গ নির্জন বলে মনে হল। তাহলে শব্দটা কিসের?

এমন সময় তার ঘরের কলিংবেল বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললেন তিনি।

দরজায় দাঁড়িয়ে উৎপলেন্দু সেন। ফরসা মুখ সামান্য লালচে। পরনে পাজামা আর হাওয়াই শার্ট। চশমার পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে চোখ দুটো বেশ ছোট দেখাচ্ছে।

কী ব্যাপার, উৎপল? এত রাতে? ওঁকে ভেতরে ডাকলেন রাহা, আসুন, ভেতরে –।

উৎপলেন্দু ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, নীচে কী একটা গোলমাল হয়েছে শুনেছেন?

ভাস্কর রাহা উৎপলেন্দুকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। এখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা। সুতরাং উৎপলেন্দু এখন পুরোপুরি স্থলপথের বাসিন্দা নন। কিন্তু রঙিন জলপথে তিনি কতটা ডুবে আছেন সেটাই আঁচ করতে চেষ্টা করলেন রাহা।

হ্যাঁ, খানিক আগে একটা শব্দ শুনলাম মনে হল। রাহা বললেন।

আমি একটা পুরোনো লেখা নতুন করে মকশো করছিলাম, হঠাৎই যেন–।

ঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন সিরাজ-এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার প্রশান্ত রায়। সম্মেলনের শুরুতেই তাঁর সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সতেরো জন অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনওরকম অসুবিধে হলে তারা যেন তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত রায়কে খবর দেন।

কিন্তু রাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কোনও ত্রুটি তো হয়নি–শুধু একটু আগের ওই শব্দটুকু ছাড়া!

এক্সট্রিমলি সরি, মিস্টার রাহা, ভাস্কর রাহাকে লক্ষ করে প্রশান্ত রায় বললেন, আপনার গাড়ির নম্বর কি ডব্লিউ এন ডব্লিউ ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন?

হ্যাঁ, কেন? নিভে যাওয়া চুরুটটাকে দু-আঙুলে ঘোরাতে লাগলেন রাহা।

খুব আনফরচুনেট। ইতস্তত করে প্রশান্ত রায় বললেন, আপনার গাড়িটা একটা অ্যাকসিডেন্টে জখম হয়েছে।

ভাস্কর রাহা হাসলেন : ও, এই ব্যাপার! আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমার অ্যামবাসাডর গাড়িটার নিয়মিত জখম হওয়া দিব্যি অভ্যেস আছে। একটু থেমে বললেন, তা কোথায় চোট লাগল। সামনে, পেছনে, না পাশে?

আবার ইতস্তত করলেন প্রশান্ত রায়। শুকনো মুখে বললেন, সামনে, পেছনে, বা পাশে নয়। আপনার গাড়ির ছাদটা জখম হয়েছে।

ভাস্কর রাহার হাসি মিলিয়ে গেল এই উত্তরে। উৎপলেন্দু সেনও বেশ অবাক হলেন। প্রশান্ত রায় কি এখন জল-পুলিশের আন্ডারে? ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই চিহ্নই খুঁজলেন উৎপল।

ভাস্কর রাহা ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকালেন। তারপর ঠাট্টা করার চেষ্টা করে বললেন, তাহলে কি বাজ পড়েছে?

বিনা মেঘে বজ্রপাত উৎপলেন্দু অস্ফুট স্বরে মন্তব্য করলেন।

প্রশান্ত রায় রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক দুই বুদ্ধিজীবীকে পর্যায়ক্রমে দেখলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় উত্তর দিলেন, না বাজ নয়। আমাদের হোটেলের চারতলা থেকে একজন মেয়ে পড়েছে। হোটেল রেজিস্টারের রেকর্ড অনুযায়ী মেয়েটির নাম দেবারতি মানি–আপনাদের কনফারেন্সের একজন গেস্ট। আমরা থানায় খবর দিয়েছি। পুলিশ এখুনি এসে পড়বে।

কথা শেষ করে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার আর দাঁড়াননি। ব্যস্ত পায়ে চলে গেছেন সিঁড়ির দিকে।

দেবারতি টপ সিক্রেট তাহলে সিক্রেটই থেকে গেল! ভাবলেন ভাস্কর রাহা। তারপর উৎপলেন্দুকে বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।

উৎপল বসলেন একটা সোফায়। ভাস্কর চুরুট ধরালেন। তারপর অ্যাশট্রেটা হাতে নিয়ে বসে পড়লেন বিছানায়। বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, দেবারতি কী একটা সিক্রেট জানতে পেরেছিল। বলেছিল, সেটা জানাজানি হলে নাকি এই কনফারেন্স পন্ড হয়ে যাবে। দেখুন, নিয়তির কী অদ্ভুত পরিহাস! মেয়েটা নিজে মারা গিয়ে কনফারেন্স পন্ড করল।

নীচের কথাবার্তা, চাপা হইচই, ঘরে বসেই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া করিডর ও সিঁড়িতে ব্যস্ত পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ঘন ঘন।]

মেয়েটা আত্মহত্যা করেনি তো? উৎপলেন্দু গলা নামিয়ে জিগ্যেস করলেন।

আত্মহত্যা! দেবারতি! অসম্ভব! তিনটে শব্দে নিজের মতামত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে চুরুটে গভীর টান দিলেন রাহা।

যে-মেয়েটার আর এক নাম জীবন, সে করবে আত্মহত্যা! তা ছাড়া ওর বেঁচে থাকার আরও একটা জোরালো কারণ ছিল? গোপন রহস্য ফাঁস। গল্প-উপন্যাসে বহু খুন এবং খুনের সমাধান নিয়ে লিখেছেন ভাস্কর। কিন্তু বাস্তবে কখনও খুনের এত কাছাকাছি আসেননি। গল্পের খুন হয় লেখকের ইচ্ছেয়, খুনিও চলে লেখকের মরজি মতো। কিন্তু বাস্তবে?

ভাস্করবাবু, ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট নয় তো? উৎপলেন্দু মনে-মনে বুঝতে পারছেন সবই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবের ঘরে চুরি করছেন দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে।

দেবারতিকে ঘিরে এই দু-দিনের ঘটনাগুলো ভাবছিলেন ভাস্কর রাহা। মাত্র দুটো দিন। তবু মনে হয় যেন কত দিন!

উৎপলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন একটু দেরি করে। বললেন, অ্যাকসিডেন্ট কেমন করে হবে?

ঠিক তখনই দরজায় কেউ নক করল।

পুলিশ কি এরই মধ্যে এসে পড়ল? ভাস্কর রাহা গলা তুলে বললেন, দরজা খোলা আছে। ভেতরে আসুন।

নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল অর্জুন দত্ত আর অনির্বাণ ঘোষ, অর্জুনের চোখেমুখে ভয় ও আশঙ্কা। আর অনির্বাণের মুখে চাপা উত্তেজনা।

অনির্বাণ ঘোষের বয়স পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ। পরনে আধুনিক কাটের শার্ট-প্যান্ট। ও ছায়াময় পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদক হিসেবে যত না সুনাম, তার চেয়ে বেশি সুনাম ভদ্রলোক হিসেবে। সম্ভাবনাময় শক্তিমান লেখকদের উৎসাহ দিতে ওর জুড়ি নেই। বিক্রির হিসেবে ছায়াময়-এর জায়গা ভয়ংকর-এর পরই। তাতে অনির্বাণের কোনও আক্ষেপ নেই। কারণ প্রেমময় চৌধুরিকে ও ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

অর্জুন দত্তের হাতে সিগারেট ছিল। সেটায় শেষ টান দিয়ে সে ভাস্কর রাহার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। সিগারেটের টুকরোটা ঝুঁকে পড়ে ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। তারপর বিপদে পড়া মানুষের আর্ত গলায় বলল, ভাস্করদা, দেবারতি মানি বোধহয় আত্মহত্যা করেছে।

ভাস্কর রাহা ও উৎপলেন্দু সেন অবাক হয়ে তাকালেন অর্জুনের দিকে।

অর্জুন একটু দম নিয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি। আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি দরজায় কেউ কলিংবেল বাজাচ্ছে। দরজা খুলেই দেখি অনির্বাণ। ও-ই আমাকে দেবারতি মানির ইয়ের…খবরটা..দিল। তারপর চলে গেল নীচে। একটু থামল অর্জুন। তারপর? মিনিট কুড়ি পরে ও ঘোরাঘুরি করে সব খবর এনে আমাকে দিল। কী হয়েছে জিগ্যেস করুন ওকে অনির্বাণের দিকে আঙুল দেখাল অর্জুন।

ছায়াময় পত্রিকায় নিয়মিত লেখক অর্জুন দত্ত। পত্রিকায় বয়েস প্রায় ষোলো, কিন্তু এই ষোলো বছরে কোনও সংখ্যাতেই অর্জুনের লেখা বাদ পড়েনি। কফি হাউসের আড্ডায় শোনা যায় অর্জুন নাকি ছায়াময়-এর মালিক ভবতারণ পোদ্দারের মেয়েকে পড়াত। সেই সূত্রেই নাকি ষোলো বছর আগে পত্রিকায় সূচিপত্রে নাম ঢুকেছে। তারপর ফরমায়েশি লেখা যোগান দেবার গুণে তার নামটা সূচিপত্রে স্থায়ী হয়ে গেছে।

সদাগরী অফিসে চাকরি করলেও যৌবন বয়েসে অর্জুন দত্ত প্রচুর টিউশানি করত। হয়তো টাকার খুব দরকার ছিল। পরে চাকরি করা এক মহিলার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। বিয়েতে ভাস্কর রাহা আর উৎপলেন্দু সেন গিয়েছিলেন। বোধহয় বিয়ের পরে পরেই অর্জুন টিউশানি করা ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপর থেকেই ওর লেখার পরিমাণ অন্তত তেরোগুণ বেড়ে যায়। সেটা লক্ষ করে একদিনের আড্ডায় ভাস্কর রাহা, জ্যোতিষ্ক সান্যাল, রূপেন মজুমদার ইত্যাদিকে উৎপলেন্দু বলেছিলেন, আসুন মাইরি, আমরা মাসে মাসে চাঁদা তুলে অর্জুন দত্তকে ওর টিউশানির টাকাটা দিয়ে দিই। দিয়ে বলি, তুই আর লিখিস না, বাপ। আমরা যে তোর লেখার বানে ভেসে গেলাম।

যে যাই বলুক, অর্জুন দত্ত থামেনি। অনুবাদ, ফিচার, গল্প, উপন্যাস, পাজল, কুইজ– যখন যে-ফরমায়েশ এসেছে লিখে গেছে। সে জানে, লিখে খ্যাতি আসেনি। না আসুক– লেখার তৃপ্তি তো আছে। লেখা ছেড়ে দিলে অর্জুন আর কী নিয়ে থাকবে! সবাইকে তো আর নিজের দুঃখের কথা বলা যায় না। বলা যায় না ব্যক্তিগত সমস্যার কথা। ওর স্ত্রী মনিকা চাকরি আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছে। আর অর্জুনের আছে চাকরি আর লেখা। ওদের দুজনের মাঝে ভয়ঙ্কর এক ফাঁক।

অর্জুন জানে, সেই ফাঁক আর ভরাট হবে না।

অনির্বাণের চোখমুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, ও কিছু বলার জন্য ছটফট করছে। অর্জুন দত্তকে ও মানুষ হিসেবে পছন্দ করে। তবে লেখক হিসেবে মোটেই সম্ভাবনাময় বলে ভাবে না। পত্রিকার বহু আপন্ন মুহূর্তে অর্জুন দত্ত প্রায় যে-কোনও বিষয়ে যে-কোনও ধরনের লেখা যোগান দিয়েছে। সেই সার্ভিসটাকে অনির্বাণ কখনও অস্বীকার করে না। তাই ভেতরে-ভেতরে অনেক কিছু বলার জন্য ছটফট করলেও অর্জুনকে ও প্রথমে কথা বলতে দিয়েছে। এবার ওর পালা। তিনজনেই ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

আগামীকাল সেমিনারে আমার বলার কথা আছে সে তো জানেন। বিষয় হল, আধুনিক রহস্য সাহিত্য। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ ঝামেলার বলে মনে হচ্ছিল। তাই ঘরে বসে

বক্তৃতার পয়েন্টসগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলাম। তখনই শব্দটা শুনতে পেলাম। তো জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ছুটে নীচে গেলাম। গিয়ে দেখি ভাস্করদার গাড়ির ছাদের একপাশটা তুবড়ে গেছে। গাড়ির গায়ে রক্ত। আর তার পাশেই বাঁধানো চত্বরে পড়ে আছে দেবারতি মানি। মুখটা একেবারে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে। চেনা যাচ্ছে না।

তুমি তাহলে বুঝলে কী করে যে, ইয়ে..মানে…ওটাই দেবারতি? উৎপলেন্দু যুক্তি চেয়ে নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন। যতটা দুঃখ পাওয়া উচিত ঠিক ততটা দুঃখ কি উৎপলেন্দু অনুভব করতে পারছেন?

বুঝতে পারলাম ওর সেই হলদে টি-শার্টটা দেখে। কাল কনফারেন্সে যেটা পরে ছিল। ওই যে বুকের কাছটায় লেখা, এক কাপ…।

অনির্বাণকে বাধা দিয়ে ভাস্কর রাহা বললেন, বুঝেছি। আজ সন্ধেবেলা এই টি-শার্টটা পরেই ওকে হোটেলের লবিতে ঘুরতে দেখেছি।

তারপর কী হল?

সেখানে তখন ম্যানেজার প্রশান্তবাবু সমেত বেয়ারা বাবুর্চি অনেকেরই ভিড় জমে গেছে। ডেডবডিটা ওরা প্রথমটায় চিনতে পারেনি। তখন আমিই দেবারতির কথা বললাম। প্রশান্তবাবু তাড়াতাড়ি রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে খাতা-টাতা কী সব দেখে এলেন। তারপর তিনজন লোককে ডেকে নিয়ে লিফটের দিকে এগোলেন। কী ভেবে আমিও ওঁদের সঙ্গে গেলাম। ওঁরা চারতলায় উঠে দেবারতির ঘরের কাছে গেলেন। তারপর প্রশান্তবাবু কলিংবেল বাজালেন বারবার। কোনও সাড়া নেই। তখন দরজায় ধাক্কা দিলেন। তারপর দরজার নব ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাভ হল না। নিজেরা কিছুক্ষণ আলোচনা করে তারপর ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে ফেললেন। আমাদের সবাইকে বাইরে দাঁড়াতে বলে একজন লোককে সঙ্গে করে প্রশান্তবাবু ঘরে ঢুকে তন্নতন্ন করে সব জায়গা খুঁজলেন। খাটের নীচ, আলমারির পেছন, বাথরুম কোনও জায়গা বাদ দিলেন

না। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। শুধু পশ্চিম দিকের জানলাটা হাট করে খোলা। আর জানলার কাছেই একটা গোল টেবিল–টেবিলে কাগজপত্র, বই, পেন এইসব…।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত রায় বললেন, যা ভেবেছি তাই সুইসাইড। ঘরে কেউ নেই। আর ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। স্যাড বিজনেস। ঘরের ভাঙা দরজার কাছে দুজন। লোককে মাতায়েন করে প্রশান্তবাবু তখন নীচে চলে আসেন। রিসেপশন থেকে থানায় ফোন করে খবর দেন। তারপর ভাস্করদাকে খবর দিতে যান। আমি আবার নীচে গিয়েছিলাম দেবারতির ডেড বডি দেখতে সত্যিই খুব স্যাড ব্যাপার। আমি ওপরে এসে অর্জুনদাকে সব বললাম। তারপর আপনাকে খবর দেবার জন্যে এসেছি।

একদমে অনেকক্ষণ কথা বলে অনির্বাণ থামল। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে একটা খালি সোফায় অবসন্নের মতো বসে পড়ল।

ভাস্কর রাহা চুরুটে শেষ টান দিলেন। ধোঁয়ার স্বাদটা কেমন তেতো হয়ে গেছে। সিরাজ এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার তাহলে ব্যাপারটা সুইসাইড ভাবছেন! কিন্তু তিনি তো নিশ্চিত যে, দেবারতি আত্মহত্যা করেনি করতে পারে না। গম্ভীর চাপা স্বরে তিনি বললেন, উৎপল, চলুন, হতভাগা মেয়েটাকে একবার দেখে আসি। তার বুকের ভেতরে কেমন এক কষ্ট হচ্ছিল? এত হাসিখুশি, প্রাণবন্ত উচ্ছল ছিল মেয়েটা..।

এত হারামজাদী, ছেনাল, শয়তান ছিল দো-আঁশলা ওই মাগীটা! উৎপলেন্দুর মগজের ভিতরে কিলবিল করে উঠল এই নোংরা কথাগুলো। তার মনে পড়ল গতকাল রাতের ইন্টারভিউর কথা। মরা মেয়েটার জন্য তাঁর খুব সামান্য খারাপ লাগছে। আর মনের বাকি অংশটায় গজগজ করছে অপমান আর জানোয়ারের মতো রাগ। কিন্তু উপায় কী! আমাদের মনের বেশিরভাগটাই জানোয়ার, আর অল্পটুকু মানুষ–ভাবলেন উৎপলেন্দু। মুখে বললেন, হ্যাঁ, নীচে চলুন। একবার দেখে আসি।

নীচে নামতেই অনিমেষ চৌধুরির সঙ্গে দেখা। রিসেপশন লাউঞ্জের এখানে ওখানে ভদ্রলোক ঘুরঘুর করছেন। এর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, ওর কথা শুনছেন। দেখে মনে হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

উৎপলেন্দুবাবু, খবর শুনেছেন? দেবারতি মানি মারা গেছে।

উৎপলেন্দু গম্ভীরভাবে ভাস্কর রাহা আর অর্জুন দত্তের দিকে একবার দেখলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, হুম শুনেছি। একটু থেমে : কিন্তু আপনি এখানে কী করছেন?

চোখেমুখে ঘুম জড়িয়ে থাকায় অধ্যাপকের গাল দুটো আরও বেশি ফুলে রয়েছে। তা ছাড়া তার অন্যমনস্ক স্বভাবের প্রমাণ হিসেবে বাঁ-চোখের কোলে পিচুটিও দেখতে পেলেন উৎপলেন্দু।

উৎপলেন্দুর কানের কাছে মুখ এনে অধ্যাপক বললেন, ডেটা কালেক্ট করছি। যদি তা থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

অধ্যাপকের যে শখের গোয়েন্দাগিরির শখ আছে তা কেউই জানতেন না। অর্জুন দত্ত জিগ্যেস করল, সূত্র পেলে কী করবেন?

পুলিশের তদন্তে সাহায্য করব। ক্রাইম রাইটার হিসেবে এটা আমাদের ডিউটি নয় কি? আমাদের এই কনফারেন্সে গেস্ট হয়ে এসেছেন আর যে-দুজন রিপোর্টার–প্রীতম নন্দী আর সুজন সরকার–ওঁদের বলেছি, ক্রাইম রাইটাররা যে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিয়ে পুলিশকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন, সেকথা কাল ওঁদের কাগজের রিপোর্টে লিখতে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল ভাস্কর রাহার কাছে। সেলফ পাবলিসিটির চেষ্টা। রহস্য-রোমাঞ্চ দিয়ে শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর বেশিরভাগই ভৌতিক আর হরর গল্প লিখেছেন, মাঝে মাঝে কল্পবিজ্ঞান। লেখেন সাবেকী ভাষায়, তবে কলমের গতি বোধহয় অর্জুন দত্তকেও হার মানাবে। তা ছাড়া প্রকাশকের চাপে স্কুল-কলেজের ইতিহাস বইও কম

লেখেননি। সেখানে লেখক হিসেবে নাম দেন এ. চৌধুরি। আর আয়কর বাঁচানোর জন্য প্রত্যেকটি বইতেই সহলেখক হিসেবে স্ত্রী অথবা ছেলের নাম জুড়ে দিয়েছেন।

ভাস্কর রাহা হাসলেন মনে-মনে। একেই বোধহয় বলে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর!

আপনার পাজামার দড়ির গেট খুলেছে? একটু হেসে জিগ্যেস করলেন উৎপলেন্দু।

অ্যাঁ!…ওহ্, হ্যাঁ হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে খুলেছি। থতমত খেয়ে জবাব দিলেন অনিমেষ চৌধুরি।

অর্জুন, অনির্বাণ ও ভাস্কর রাহা অবাক হয়ে তাকালেন উৎপলেন্দু সেনের দিকে। অর্থাৎ, কী ব্যাপার!

উৎপল হেসে জবাব দিলেন চাপা গলায়, ও কিছু নয়, তদন্তের একটা সূত্র আর কি!

অধ্যাপককে তার গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে ব্যস্ত রেখে ওঁরা চারজন হোটেলের বাইরের চত্বরে এলেন।

বাইরের সবকটা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চত্বরের নানা জায়গায় ভিড় এবং জটলা। দেখে মনেই হয় না, রাত বারোটা বেশ কিছুক্ষণ হল পেরিয়ে গেছে।

ভিড় ঠেলে দেবারতির মৃতদেহের কাছে গেলেন ওঁরা। এক পলক দেখেই চোখ সরিয়ে নিলেন। মৃতদেহ সব সময়েই অসুন্দর।

এমন সময় একটা গুঞ্জন শোনা গেল পুলিশ এসে গেছে।

প্রশান্ত রায় কোথা থেকে এসে হাজির হলেন ভাস্কর রাহার সামনে। হাত-মুখ নেড়ে বললেন, মিস্টার রাহা, আপনারা কাইন্ডলি যে যার ঘরে চলে যান। বুঝতেই পারছেন, একে এই কনফারেন্স তার ওপরে সুপ্রভাত কানেক্টেড। লোকাল থানা ছাড়াও ডিসি-সাউথ আর

ডিসি-ডিডি-ওয়ান এসে হাজির হয়েছেন। এছাড়া এসেছেন লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন ইন্সপেক্টর। সঙ্গে আরও লোকজন। এখন নাকি ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোকজন কাজ করবে, ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলবে। ওঁরা বলছেন, কাল সকাল থেকে আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। এখন তাহলে ঘরে চলে যান। প্লিজ।

কোনও কথা না বলে ওঁরা চারজন ফিরে চললেন লিফটের দিকে।

উৎপলেন্দু লক্ষ করলেন, খুব তাড়াতাড়ি ভিড় ফিকে হতে শুরু করেছে।

লিফটের কাছে অনেকের সঙ্গে দেখা হল। প্রেমময় চৌধুরি, রঞ্জন দেবনাথ, সুজন সরকার, অনামিকা সেনগুপ্ত, কল্পনা সেন। রঞ্জন ছাড়া বাকি সকলেই নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন। শুধু রঞ্জন চুপচাপ।

ভাস্কর রাহাকে দেখেই কল্পনা সেন জিগ্যেস করলেন, ভাস্করবাবু, কাল থেকে সেমিনারের কী হবে?

রাহা বিষণ্ণভাবে জবাব দিলেন, কী জানি। কাল সকালেই হয়তো অরগানাইজাররা জানিয়ে দেবে। এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার।

মেয়েটা কিন্তু বড্ড বেড়েছিল।

অনামিকার আকস্মিক মন্তব্যে চমকে ওর দিকে তাকালেন রাহা। কই, এই মেয়েটার মধ্যে এরকম আবেগ লুকিয়ে আছে এটা তো আগে টের পাওয়া যায়নি!

তিনি শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন, বেড়েছিল মানে?

অনামিকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বোধহয় বুঝতে পারল, এখন এই মন্তব্য করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।

না, মানে, ক্রাইম ফিকশনের জন্যে মেয়েটা বড্ড বেশি দরদ দেখাত।

দরদ দেখাত বটে, কিন্তু সেটা মেকি দরদ নয়। নারী পরশুরাম দেবারতি সাহিত্যের এই শাখাঁটির উন্নতিই চেয়েছিল। তাই ফাঁকিবাজ ছদ্মবেশী লেখকদের ও সহ্য করতে পারত না। যেসব বুদ্ধিজীবী রহস্য সাহিত্যের নামে নাক সিটকান তাঁদের অনুকম্পাকে ঘেন্না করত দেবারতি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি যে-সাহিত্য করে গেছেন, সেই সাহিত্য চর্চা করতে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই। এই কথাটা বারবার সবাইকে শোনাত দেবারতি। ভাস্কর রাহাকে বলত, মুকুটহীন সম্রাট, এই সাহিত্যকে ভালোবাসাটাই হচ্ছে আসল। ওয়ার্থলেস ফঁকিবাজরাই এটার সর্বনাশ হয়ে দাঁড়াবে।

না, দেবারতি মানির ভালোবাসায় কোনও ফাঁকি ছিল না। আজ লাঞ্চের সময় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ভাস্কর রাহা সেটা আর একবার অনুভব করেছেন। তখন কি ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া গিয়েছিল মেয়েটা এখন আর থাকবে না, নেই হয়ে যাবে!

লিফটে লোকজন উঠছিল। প্রেমময় চৌধুরি লিফটে ওঠার আগে নেশা জড়ানো গলায় বললেন, এ গ্রেট লস ফর ক্রাইম লিটারেচার অ্যান্ড জার্নালিজম। মেয়েটা এভাবে সুইসাইড করবে ভাবিনি।

ভাস্কর রাহা কোনও জবাব দিলেন না। তার শুধু মনে হল, সবাই যেন এটাকে আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনা বলে চালাতে পারলেই বেঁচে যায়। কিন্তু কেন?

লিফট আবার খালি হয়ে নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা পাঁচজন ও ভাস্কর রাহা, রঞ্জন দেবনাথ, অনামিকা সেনগুপ্ত, উৎপলেন্দু সেন আর কল্পনা সেন।

রঞ্জনের চোখ লাল, সামান্য ফোলা। মুখে একটা হাসি মাখিয়ে রাখার চেষ্টা করেও নিজের ঝোড়ো অবস্থাটা লুকোতে পারেনি। তা ছাড়া অল্পবিস্তর যাঁরা লেখালিখি করেন

তাঁদের কাছে এটা লুকোনো মুশকিল। কারণ তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশি দেখতে পান।

ভাস্কর রাহা রঞ্জনের পিঠে হাত রাখলেন।

ছেলেটার শরীর সামান্য কেঁপে উঠল, কিন্তু ও ভেঙে পড়ল না। দেবারতির সঙ্গে ওর গোপন ভালোবাসার কথা গোপন রাখতে চায়। কিন্তু গোপন ভালোবাসাও তো ভালোবাসা! রঞ্জনের জন্য কষ্ট হল ভাস্কর রাহার।

দেবারতি সুইসাইড করেনি, ভাস্করদা—একটু ধরা গলায় রঞ্জন বলল, আর এটা অ্যাকসিডেন্টও নয়।

এই প্রথম একজন স্পষ্ট করে ভাস্কর রাহার মতে মত দিল। দেবারতি মানির মতো মেয়েরা কখনও জীবনের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যায় না।

উৎপলেন্দু বললেন, দেবারতি কী একটা সিক্রেট জানতে পেরেছিল। সেটার জন্যেই কি…

রঞ্জন দেবনাথ তাকাল উৎপলেন্দুর দিকে, বলল, হতে পারে। পুলিশ তদন্ত করে নিশ্চয়ই বের করতে পারবে।

কল্পনা সেন এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এমনিতে তিনি কম কথা বলেন। তার ওপর চেহারা ভীষণ খাটো এবং রোগা হওয়ায় তাকে খুব একটা কেউ গুরুত্ব দেয় না। আবার ঠিক সেই কারণেই জ্যোতিষ্ক সান্যাল তাকে গুরুত্ব দেন। ইদানিং ভাস্কর রাহাকে তিনি প্রায়ই বলেন, বুঝলেন ভাস্করদা, আমি ডিপ্লোম্যাসি শিখে গেছি! এটা তাঁর অহঙ্কার। চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাস্কর রাহা অন্তরালে হাসেন। শিশু তার সরলতা হারালে সেটা কোনও কৃতিত্বের কথা নয়। কূটনীতি আর সততা বোধহয় দুই সতীন, একসঙ্গে ঘর করতে পারে না। তাই তিনি ছোট ভাইকে জবাব দেন, তুই সত্যিকারের ডিপ্লোম্যাট হলে সে কথা বোকার মতো

জাহির করে বলতিস না। কূটনীতির সম্পর্ক ছাড়াই কল্পনা সেন জোতিষ্কের বই ছেপেছেন– হয়তো আরও ছাপবেন।

কল্পনার ফরসা মুখে আবছা কালো ছাপ। সরু সরু আঙুলে সরু ফ্রেমের চশমাটাকে নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, এটা নিয়ে কাগজে খুব নোংরামি হবে।

তা তো হবেই। ভাস্কর রাহা ভাবলেন। খুন যে ভীষণ নোংরা কাজ।

.

০৫.

দরজায় কেউ জোরে জোরে ধাক্কা দিতেই উৎপলেন্দুর ঘুম ভাঙল।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। দেবারতি মানিকে নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক স্বপ্ন। শরীরটা ঝিমঝিম করছে, ক্লান্ত লাগছে। চোখ খুলে ঝাপসাভাবে দেখতে পেলেন ডিসটেম্পার করা দেওয়ালে টাঙানো দেওয়াল-ঘড়ি। মনে হচ্ছে সাড়ে আটটা। বালিশের পাশ থেকে চশমাটা নিয়ে চোখে দিলেন। আবার দেখলেন? সাড়ে আটটাই বটে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন উৎপলেন্দু। মাথা দপদপ করছে। মনে হচ্ছে টলে পড়ে যাবেন। কাল মাঝরাত পেরিয়ে ঘরে ফিরে এসে আর এক দফা বোতল নিয়ে বসেছিলেন। গ্লাসে চুমুক দিয়ে গত দু-দিনের জ্বালাটা অনেক কমে গিয়েছিল। তারপর একসময় ঘুমনোর চেষ্টা। কিন্তু ঘুম স্বল্পবসনা ক্যাবারে ডান্সারের মতো লীলায়িত ভঙ্গিতে ছলনা করেছে। ঘুম আসেনি ঠিকঠাক কিন্তু দেবারতি এসেছে– রতি এসেছে।

লুঙ্গির কষি ঠিক করে গেঁট দিয়ে স্যান্ডো গেঞ্জির ওপরে একটা হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে নিলেন উৎপলেন্দু। তারপর বেসামাল ক্লান্ত পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুললেন।

অনিমেষ চৌধুরি। পরনে গেরুয়া রঙের একটা লুঙ্গি এবং বিচিত্র এক হাতাওয়ালা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা বোধহয় প্রফেসরের ছেলেবেলার কারণ সাঙ্ঘাতিকভাবে এঁটে বসেছে তার শরীরে, এবং তাঁর স্ফীত মধ্যপ্রদেশকে স্বমহিমায় আংশিক প্রকাশিত করে রেখেছে।

অধ্যাপকের মনে যে শান্তি নেই সেটা তার মুখচোখ দেখেই দিব্যি বোঝা যাচ্ছে।

উৎপলেন্দুবাবু, খবর শুনেছেন।

কী খবর? উৎপল অবাক হয়ে অধ্যাপককে দেখছিলেন। ভদ্রলোকের ঘর চারতলায়, দেবারতির ঘরের ঠিক পাশে। সেখান থেকে এই অদ্ভুত পোশাকেই নেমে এসেছেন উৎপলেন্দুর তিনতলার ঘরে!

পুলিশ এসে পড়েছে ছাত্র পড়ানোর ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে অধ্যাপক চৌধুরি বললেন, ওরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে। একটু আগে একজন বেয়ারা এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা দিয়ে গেল। বলল, দুশো আট নম্বর ঘর—মানে, ভাস্করবাবুর ঘরে যেতে। ম্যানেজারবাবু নাকি বলেছেন। তাই আপনাকে ডাকতে এলাম। আসার সময় দেখলাম ভাস্করবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ।

উৎপলেন্দুর পাশের ঘরটা অর্‌জুন দত্তের। আর তার পাশেরটাই দুশো আট নম্বর। গলা বাড়িয়ে সেদিকে একবার উঁকি দিয়ে অন্য কথা জিগ্যেস করলেন উৎপলেন্দু, কাল আপনার ডেটা কালেকশন কেমন হল? কোনও সূত্র-টুত্র পেলেন?

অনেক ডেটা জোগাড় করেছি। পুলিশ যদি হেল্প চায় তো ওদের দেব। তা না হলে ওগুলোই জোড়াতালি দিয়ে একটা উপন্যাস লিখে ছায়াময় পত্রিকায় চালিয়ে দেব। অনির্বাণ ছেলেটি বড় ভালো।

ভাবতে অবাক লাগে, এই লেখকও অর্ধেক সফলতা পেয়েছে। আর উৎপলেন্দুর রচনাবলীতে শুধুই ট্র্যাজেডি। গোলমালটা যে কোথায়, এত বছরেও উৎপল সেটা ঠিক

বুঝে উঠতে পারলেন না।

কী হল, চলুন! ভাস্করবাবুর ঘরে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।

আপনি কি এই পোশাকেই যাবেন না কি। যান, জামাটা অন্তত গায়ে দিয়ে আসুন... বাইরের লোকজন থাকবে...।

কেন? নিজের গেঞ্জি আর লুঙ্গির দিকে দেখলেন অধ্যাপক ও গেঞ্জি পরে আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?

না, তা দেখাচ্ছে না। তবে লেখক মানুষ বলে কথা, এই পোশাক পরে ওখানে গেলে লোকে পালোয়ান বলে ঠাওরাতে পারে।

অনিমেষ চৌধুরিকে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিব্রত বলে মনে হল।

এমন সময় একজন উর্দি পরা বেয়ারা দরজায় কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, স্যার, ম্যানেজারসাহেব আপনাদের দুশো আট নম্বর ঘরে যেতে বলেছেন। ওখানে পুলিশের লোকজন সব এসেছে।

জরুরি খবরটি দিয়ে বেয়ারাটি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বাকিদের তলব করতে।

অনিমেষ চৌধুরি ছটফট করছিলেন। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একটু ইতস্তত করে বললেন, আমি তাহলে যাই, চটপট ড্রেস করে আসি। দেরি করে হাজির হলে আবার আমাকেই না সন্দেহ করে বসে। স্ট্রেটকাট সুইসাইড কেস। সেটাকে ওরা হয়তো তখন মার্ডার বলে চালিয়ে দেবে...।

সুইসাইড নয়। সবাই বলছে এটা নাকি স্ট্রেট কাট মার্ডার কেস। অধৈর্যভাবে শেষ কথাটা যোগ করলেন উৎপলেন্দু, এখন যান, জলদি জামাকাপড় পরে আসুন।

আর অপেক্ষা করলেন না উৎপল। ঘরে ঢুকে, বলতে গেলে অনিমেষ চৌধুরির মুখের ওপরেই, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে তৈরি হওয়ার সময় অবাক হয়ে তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর হাত সামান্য কাঁপছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘরের দরজা লক করে করিডর ধরে হাঁটা দিলেন উৎপলেন্দু। ভারি শরীর নিয়ে ধীরে-ধীরে পথ চলেন তিনি। অর্জুন দত্তের ঘরের দরজার কাছে পৌঁছোনো মাত্র দরজা খুলে বেরিয়ে এল অর্জুন, হাতে নস্যির কৌটো। আর তার ঠিক পিছনেই জ্যোতিষ্ক সান্যাল। ওঁরাও বোধহয় দুশো আট নম্বরের দিকে চলেছেন।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কোথায় চললেন, দুশো আট?

উৎপলেন্দু ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ। এখন সব রাস্তাই দুশো আট নম্বর ঘরের দিকে।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষ্ক চাপা গলায় বললেন, বেয়ারাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি। গল্পের গোয়েন্দাকে তো বহুবার গাছে চড়িয়েছেন–এবার সে গাছ থেকে নেমে এসেছে আমাদের টাইট দেবার জন্যে…

অর্জুন দত্ত শব্দ করে নস্যি নিয়ে নস্যির ডিবে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। নাকে আঙুল ঘষল কয়েকবার। একটা হাঁচি আসব আসব করায় সেটা সামলাতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তারপর হাঁটা দিল। বাকি দুজনও পা মেলালেন ওর সঙ্গে। কোনও মন্তব্য করলেন না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দুশো আটের দরজায় এবং কলিংবেলের বোতামে আঙুল। দরজা খুলে দিল উর্দি পরা একজন কনস্টেবল। ওরা তিনজন ঢুকে পড়লেন ভাস্কর রাহার ঘরে।

এবং একটা ধাক্কা খেলেন তিনজনেই।

হোটেল সিরাজ-এর পশ্চিমদিকের সতেরোটা ঘরে রয়েছেন সম্মেলনে আমন্ত্রিত সতেরোজন অতিথি। তার মধ্যে দশজন রহস্য কাহিনীকার, দুজন সম্পাদক, দুজন প্রকাশক ও তিনজন সাংবাদিক। এছাড়া অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছেন শুধুমাত্র সম্মেলনের রোজকার অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য। তাদের জন্য আয়োজকরা চা ও লাঞ্চের ব্যবস্থা রেখেছেন। এর মধ্যে আবার বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথিকে কর্তৃপক্ষ সামান্য সম্মান-দক্ষিণা দেবারও বন্দোবস্ত করেছেন।

পশ্চিমমুখো সতেরোটা ঘর ভাগাভাগি হয়েছে এইভাবে?

পাঁচতলার পাশাপাশি চারটে ঘরে আছেন অনামিকা সেনগুপ্ত, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ্ক সান্যাল ও রূপেন মজুমদার।

চারতলায় পরপর পাঁচটা ঘরে রয়েছেন অনিমেষ চৌধুরি, দেবারতি মানি, কল্পনা সেন, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঞ্জন দেবনাথ।

তিনতলায় আছেন প্রেমময় চৌধুরি, ভাস্কর রাহা, অর্জুন দত্ত ও উৎপলেন্দু সেন।

আর দোতলায় পরপর চারটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন কৌশিক পাল, অনির্বাণ ঘোষ, সুজন সরকার ও প্রীতম নন্দী।

এই সতেরোজনের মধ্যে একজন অতিথি আছেন থেকে ছিলেন হয়ে গেছেন।

বড় রাস্তা থেকে দেখলে সতেরোটা ঘরের মধ্যে ষোলোটা ঘরের জানলা একটা চার বাই চার দাবার ছক তৈরি করেছে বলে মনে হবে। শুধু চারতলায় রঞ্জন দেবনাথের ঘরটাই ডান দিকে বাড়তি একটা চৌখুপি। অবশ্য আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও হোটেলে অন্যান্য বোর্ডার রয়েছে।

তিনতারা হোটেলের ঘর যেমন হওয়া উচিত ঘরগুলো সেরকমই। তবে সতেরোটা সিঙ্গল রুম পাওয়া যায়নি বলে আয়োজকরা নটা ডাবল রুম ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু কোনও অতিথির গোপনীয়তায় যেন আঁচড় না পড়ে তার জন্য ডাবল রুমগুলোকেও সিঙ্গল রুমের মতো ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাস্কর রাহার ঘরটা ডাবল রুম। ঠিক তার নীচের ডাবল রুমটা পেয়েছেন অনির্বাণ ঘোষ। রাহার ওপরের ডাবল রুম ছিল দেবারতির। আর তার ঠিক ওপরের ডাবল রুমেই আছেন রত্নাবলী।

ঠিক একইরকম ডাবল রুম পেয়েছেন রুপেন মজুমদার, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন দেবনাথ, উৎপলেন্দু সেন ও প্রীতম নন্দী।

তবে রুম সিঙ্গল হোক আর ডাবলই হোক, তাদের চেহারা ও চরিত্রে কোনও তফাত নেই– শুধু আয়তনের সামান্য ফারাকটুকু ছাড়া। সুতরাং তিনতারা হোটেলের একটি অভিজাত ঘরের চরিত্র যদি হঠাৎ করে লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কোনও ঘরের মতো হয়ে যায়, তা হলে ধাক্কা খাওয়ারই কথা।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল, অর্জুন দত্ত এবং উৎপলেন্দু সেন ভাস্কর রাহার ঘরে ঢুকে ঠিক সেই ধাক্কাটাই খেলেন।

ঘরে এত লোকজন যে, ঘরের অক্সিজেন বোধহয় নাভিশ্বাস তুলছে।

বিছানায় বসে আছেন কয়েকজন। তিনজন টেবিলের কাছে। এ ছাড়া ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেউ কেউ। আর পশ্চিমের খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন মানুষ। তার মধ্যে একজনের মাথার চুল ধবধবে সাদা। রোগা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং শ্যামলা। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। পরনে খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা। ডান হাতের লম্বা আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

আর দ্বিতীয়জন বেশ লম্বা, শক্ত পোক্ত। বয়স চল্লিশের এপিঠেই। ছোট করে ছাঁটা চুল। কঁচাপাকা চওড়া গোঁফ। ফরসা মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। পরনে ছাই রঙের ফুলপ্যান্ট, আর সাদা নীল চেক কাটা হাওয়াই শার্ট। হাতের শিরা এবং পেশি–দুই-ই প্রকট। আর তার চোয়ালের উদ্ধত রেখা যেন সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে : হুশিয়ার!

টেবিলের কাছাকাছি একটা সোফায় বসে ছিলেন সিরাজ-এর এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার। জ্যোতিষ্কদের ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সূৎৰধারের ঢঙে বলতে শুরু করলেন, আপনারা তো সকলেই জানেন যে, কাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মিস দেবারতি মানি– আমাদের হোটেলের তিনশো আট নম্বর রুমের বোর্ডার–তার ঘরের জানলা থেকে লাফ দিয়ে সুইসাইড করেছেন। যেহেতু তিনি এই কনফারেন্সের পার্টিসিপ্যান্ট ছিলেন সেহেতু এই দুর্ঘটনা মানে, মিসহ্যাপের সঙ্গে আপনাদের ইনভমেন্টটাই বেশি। একটু দম নিলেন ম্যানেজারসাহেব তারপর ও আমাদের হোটেলের একটা রেপুটেশন আছে। মানে, সুনাম আছে। তাই আমরা চাই খুব একটা শোরগোল না তুলে পুলিশের ইনভেস্টিগেশন শেষ হোক–

লম্বা অফসানা জলদি খতম করুন, ম্যানেজারসাহেব। জানলার কাছ থেকে দ্বিতীয়জন আকস্মিকভাবে রুক্ষ মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছে। তার কপালে বিরক্তির ভাঁজ। হাতে কয়েকটা কাগজ, আর ভোলা বলপয়েন্ট পেন।

প্রশান্ত রায় থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্রকেশ ভদ্রলোক জ্বলন্ত সিগারেটসমেত ডান হাতটা ওপরে তুলে মাস্টারি ভঙ্গিতে বললেন, আঃ, রঘুপতি। টেক ইট ইজি। এত অল্পেতে অধৈর্য হয়ে পড়ো কেন।

রঘুপতি অবাক চোখে তাকাল বৃদ্ধের দিকে ও একটা ইয়াং মেয়ে কথা নেই বার্তা নেই একজন আনোন কাতিলের হাতে কোতল হয়ে গেল–আর আপনি সেটাকে বলছেন অল্প!

অল্প মাই ফুট, গুপ্তাসাব। আমি খুনিকে চাই, ব্যস।

বৃদ্ধ সিগারেটে টান দিলেন। বাঁ হাতে রঘুপতির পিঠ চাপড়ে দিলেন দু-বার। তারপর সামান্য হেসে বললেন, রঘুপতি যাদব, আমার গায়ের জোর নেই মানছি, কিন্তু আমার বুদ্ধির জোরের ওপরেও তোমার ভরসা নেই! তুমি আমার কাছে সিম্পলি খুনিকে চাইছ, এই তো! কোনও চিন্তা নেই, পাবে। শুধু এক-দু দিন সময়ের ব্যাপার।

ঘরের দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল, দরজা খুলল।

ঘরে ঢুকলেন রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় সঙ্গে অনামিকা।

রত্নাবলী ঘরে ঢুকেই ইতস্তত করে বললেন, কিছু মনে করবেন না, একটু দেরি হয়ে গেল। রাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শোওয়া অভ্যেস। অনামিকা দরজায় ধাক্কা না দিলে হয়তো ঘুম এখনও ভাঙত না—চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি।

অনামিকা এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল বিছানায় বসে থাকা ভাস্কর রাহার দিকে।

হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে অপরিচিত সাদা-চুল বৃদ্ধ হাসি মুখে দু-হাত নেড়ে স্বাগত জানালেন রত্নাবলীকে।

আসুন, ম্যাডাম বসুন।

সাংবাদিক প্রীতম নন্দী নিজের সোফাটা ছেড়ে দিল রত্নাবলীকে।

রত্নাবলী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বৃদ্ধের দিকে। সেই জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝতে পেরে বৃদ্ধ স্মিত হেসে বললেন, ম্যাডাম, আমি আপনার লেখার একান্ত ভক্ত। এই সম্মেলনে আপনারা যে দশজন লেখক এসেছেন তাদের প্রত্যেকের লেখাই আমি পড়েছি। উইলিয়াম উইকি কলিন্সের দ্য ওম্যান ইন হোয়াইট থেকে শুরু করে এডগার অ্যালান পো,

আর্থার কোনান ডয়েল, রিচার্ড অস্টিন ফ্রিম্যান, জি. কে. চেস্টারটন, আগাথা ক্রিস্টি, জর্জ সিমেনন, নিকোলাস ব্লেক, জন ডিক্সন কার, পি. ডি. জেমস ছুঁয়ে আজকের রুথ রেন্ডেল পর্যন্ত সকলের লেখা আমি পড়েছি। গোয়েন্দা কাহিনি আমার পড়তে ভালো লাগে। ভালো লাগে খুনির সঙ্গে গোয়েন্দার বুদ্ধির লড়াই।

ঠিক একইভাবে বাঁকাউল্লার দপ্তর থেকে শুরু করে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্তের বুড়ি ছুঁয়ে আজকের অনামিকা সেনগুপ্ত পর্যন্ত আমার পড়া। একটু দম নিলেন বৃদ্ধ। হাতে হাত ঘষলেন। তারপর শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমি কে?

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা। ঘরের সবাই চুপ। আর ঠিক তখনই দরজার কলিংবেল আবার বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন অনিমেষ চৌধুরি। ধুতি পাঞ্জাবি পরে একেবারে কেতাবী অধ্যাপকটি সেজে এসেছেন।

সুতরাং ষোলো কলা পূর্ণ হল, যেহেতু অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ষোলোজন বিশেষ অতিথিই এখন এই ঘরে হাজির।

শুভ্রকেশ বৃদ্ধ আপনমনেই হাসছিলেন মুখ টিপে, আর ছোট ছোট পা ফেলে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন ঘরের মাঝখানে। হঠাৎই পায়চারি থামিয়ে মুখ তুলে তিনি ভরাট গলায় ঘোষণা করলেন, আমি এক হুনুর–থিঙ্কিং মেশিন–এখানে হুনুরি করতে এসেছি।

ঘর আবার নিস্তব্ধ।

হুনুর! প্রেমময় চৌধুরি অবাক হয়ে উচ্চারণ করেছেন।

সেদিকে ঘুরে তাকালেন বৃদ্ধ ও হ্যাঁ, হুনুর। ফারসী ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। যার অর্থ হল তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দক্ষ ব্যক্তি—অথবা, সহজ কথায় গোয়েন্দা।

জ্যোতিষ্ক পাশে দাঁড়ানো অর্জুন দত্তকে চাপা গলায় বললেন, বুঝলেন, এই সেই মাল গাছ থেকে নেমে এসেছে।

বৃদ্ধ তখনও বলছিলেন, আমি এখানে হুনুরি করতে এসেছি। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল বইতে হুনুরি শব্দটা আছে। সেখানে তার অর্থ শিল্পকর্ম বা সূচিকর্ম। হাসলেন বৃদ্ধ, চোখ বুলিয়ে নিলেন সকলের মুখের ওপরে : আমি এখানে অনেকটা সেই কাজই করতে এসেছি। শিল্পকর্ম মানে গোয়েন্দাগিরি।

আমার নাম অশোকচন্দ্র গুপ্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এসিজি। কারণ বয়েসকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতাম। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। চিন্তা করতে আমি ভালোবাসি বরাবরই। আর ভালোবাসি দেশি-বিদেশি ডিটেকটিভ ফিকশন বা ক্রাইম ফিকশন পড়তে। এছাড়া আর একটা আজব শখ আমার আছে—পাখি আর পাখির ডাক। রঘুপতি যাদবের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন অশোকচন্দ্র : রঘুপতি যাদব এক সময়ে আমার ছাত্র ছিল। তারপর কী করে যেন লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর হয়ে গেছে। এই ছেলেটা খুন একদম পছন্দ করে না—আর আমার নেশার কথা জানে। সেইজন্যেই হোটেল সিরাজ থেকে প্রশান্তবাবুর টেলিফোন পাওয়ার পর ও আমাকে ফোন করে। বলে, এসিজি, ইন্টেলেকচুয়ালদের কনফারেন্সে একটা ইয়াং মেয়ে মার্ডার হয়ে গেছে। ক্রাইম রাইটারদের কনফারেন্স। ফিল ইন্টারেস্টেড?

তারপর, রাইটারদের নামের সূচিপত্র শুনে, আই বিকেম ইন্টারেস্টেড। যাঁদের লেখা সবসময় পড়ি তাদের দশ-দশজনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে! ভাবাই যায় না। সুতরাং কাল রাত থেকেই রঘুপতি যাদবের সঙ্গে আমি এখানে হাজির। রঘুপতির খালি এক কথা : পাখি যেন পালাতে না পারে।

অশোকচন্দ্র গুপ্তসংক্ষেপে এসিজি-হাসলেন, বললেন, বুঝতেই পারছেন, ও আমার পাখির নেশার কথা জানে। জানে, অনেকরকম পাখির ডাকই আমার চেনা। দ্যাটস অল।

এসিজির কথা বলার ঢং দেখেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, বক্তৃতা দেবার অভ্যেস তার আছে। কথা শেষ করে দুটো হাত একজোট করে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। সকলের উদ্দেশেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, কারও কোনও প্রশ্ন আছে?

কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপচাপ। তারপর অনামিকা ফস করে বলে বসল, আপনাকে দেখে। ডিটেকটিভ বলে মনেই হয় না।

অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে পঁয়ষট্টি পেরোনো বৃদ্ধ ঘুরে তাকালেন অনামিকার দিকে। তার চোয়ালের রেখা পলকের জন্য শক্ত হল। তারপর সুন্দর করে হেসে বললেন, ওটা আমার ছদ্মবেশ, মা-মণি। আদর করে মা-মণি বললাম বলে রাগ কোরো না, অনামিকা। তুমি আমার মেয়ে ঊর্মিলার মতো। ঊর্মিলা কিছুতেই মানতে চায় না আমি ডিটেকটিভ। আসলে কী জানো? চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া ছুঁচলো গোঁফ আমার নেই। দেবেন্দ্রবিজয়, হুঁকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের মতো প্রতিভা আমার নেই। এমনকি রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের বুদ্ধিমান গোয়েন্দা করঞ্জাক্ষ রুদ্র কিংবা ভাস্কর রাহার স্মার্ট ক্ষুরধার বুদ্ধি গোয়েন্দা সুরজিৎ সেনের সঙ্গেও কোনও তুলনা আমার চলে না। কারণ আমি ছাপোষা মানুষ। কোনও করিশমা আমার নেই। বাঁ-হাতটা মাথার পিছনদিকে ঘোরালেন তিনি? দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার মাথার পেছন থেকে কোনও জ্যোতি বেরোয় না। তবে একটু বিরতি দিলেন এসিজি। রূপেন মজুমদার, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় আর ভাস্কর রাহার দিকে একবার দেখলেন। তারপর? তবে আমরা, মানে, বাস্তব জীবনের গোয়েন্দারা মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। যা হোক করে শেষ পর্যন্ত খুনিকে ধরে ফেলতে পারি। তদন্ত করার সময়ে আমার ব্যবহারে যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে আপনারা দয়া করে সেটা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

এসিজি এমন সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল সকলকেই তিনি চেনেন। অনামিকা মা-মণি সম্বোধনে বেশ অপমানিত এবং আহত হয়েছিল। কিন্তু ও খানিকটা খুশি হয়েছিল অশোকচন্দ্র ওর লেখা পড়েছেন বলে। নতুন লেখকদের পক্ষে পাঠক পাওয়া যে কী শক্ত! কিন্তু ভদ্রলোক সকলকে অনায়াসে চিনে ফেলেছেন কেমন করে? এ কি ওর হুনুরির নমুনা, না কি...।

উত্তরটা পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ছোট-ছোট পা ফেলে এসিজি ঘরের গোল টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলেন। টেবিলে পড়ে থাকা নানান কাগজপত্রের মধ্যে থেকে সাদা মলাটের একটা চওড়া ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটাতে লাগলেন ও বার্ষিক রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক সম্মেলন-এর সুভেনির। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে এক কপি করে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তিকায় প্রত্যেক লেখকের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া আছে। গতকাল মাঝরাত থেকে এটুকু সময়ের মধ্যে এসিজি তার হোমওয়ার্ক বেশ ভালোভাবেই শেষ করেছেন।

ভাস্কর রাহা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। জ্বলন্ত চুরুটে টান দিচ্ছিলেন আর কৌতুকভরা চোখে প্রায় সমবয়েসি এই গোয়েন্দাকে দেখছিলেন। গল্প-কাহিনির গোয়েন্দাদের সঙ্গে কত অমিল!

এমন সময় ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। ভাস্কর রাহা বিছানা থেকে উঠে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিছানার মাথার কাছে ছোট টেবিলে রাখা সবুজ টেলিফোনটার দিকে, কিন্তু তাকে বাধা দিল রঘুপতি যাদব। চট করে তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। বলল, মাফ কিজিয়েগা, সাহাব। ইনভেস্টিগেশন চালু হয়ে গেছে। এখন থেকে আপনাদের সব চিঠি আর ফোন কল আমরা ইন্টারসেপ্ট করব। মানে, চেক করব।

রাহার মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দিলেও রঘুপতি সেটাকে আমল দিল না।

অশোকচন্দ্র রঘুপতির পুরো কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেননি। ছোট্ট করে সরি, মিস্টার রাহা বলে ম্যাগাজিনটা টেবিলে আবার রেখে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেছেন টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নিয়ে স্বাভাবিক ভারি স্বরে কথা বললেন। তারপর রিসিভার বাড়িয়ে দিলেন প্রশান্ত রায়ের দিকে ও আপনার ফোন

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার কথা বললেন টেলিফোনে। তার কথার শতকরা নিরানব্বই ভাগই শুধু ইয়েস আর ওকে। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তারপর ঘরের সকলের মুখের ওপর একদফা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, অনেকগুলো ইমপরট্যান্ট খবর আছে। আপনাদের কনফারেন্স আজ সাড়ে দশটায় স্টার্ট হবে। অরগানাইজাররা জানিয়েছেন–

ম্যানেজারসাহেব। ভাস্কর রাহার পথ ছেড়ে প্রশান্ত রায়ের দিকে তাকিয়েছে রঘুপতি ও আপনার সিলেবাসে কি সামারি বলে কিছু নেই? কাল রাত থেকে দেখছি চার লাইন ইনফরমেশন দিতে গিয়ে চাল্লিস লাইন ইনট্রোডাকশন। আপনাদের বাংলায় একে কী বলে যেন, এসিজি? বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত কী যেন?

ওঃ রঘুপতি! হাত তুলে ইন্সপেক্টর যাদবকে ক্ষান্ত করতে চাইলেন এসিজি : তোমার এখনও সেই স্টুডেন্ট লাইফের মতো মাথা গরম। প্রশান্ত রায়ের দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি, বললেন, মিস্টার রায়, যা বলার সংক্ষেপে সারুন।

প্রশান্ত রায় সুট পরে ছিলেন। কোটের পকেটের কাছটায় দুটো হাত ঘষলেন কয়েকবার। তার গোলগাল ফরসা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এইমাত্র কেউ তার গালে রুজ মাখিয়ে দিয়েছে। কাল রাত থেকে এই অভদ্র ইন্সপেক্টরটা তাকে কম অপমান করেনি। যেমন গাধার মতো খাঁটিয়েছে তেমনই শাসন করেছে। শুধু হোটেলের রেপুটেশনের কথা মনে রেখে তিনি সব সহ্য করেছেন। তা ছাড়া ম্যানেজমেন্টও তাকে অর্ডার দিয়েছে পুলিশের সঙ্গে টু হান্ড্রেড পারসেন্ট কোঅপারেট করতে। অগত্যা...।

প্রশান্ত রায় একেবারে টেলিগ্রামের ভাষায় বলতে শুরু করলেন, আজ থেকে কনফারেন্স শুরু হবে রোজ সাড়ে দশটায়। পুলিশকে না জানিয়ে আপনারা কেউ হোটেল ছেড়ে যাবেন না। আর পুলিশের ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা বাইরের কোনও লোকের কাছে। এ-বিষয়ে মুখ খুলবেন না। কোনও পত্রপত্রিকায় কিছু লিখবেন না। ব্রেকফাস্ট রেডি। সাড়ে দশটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ব্রেকফাস্ট শব্দটা শোনার পর বোধহয় সকলের খেয়াল হল খিদে পেয়েছে।

রঘুপতি অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে চোখ নাচাল। অর্থাৎ, এবার কী হবে?

অশোকচন্দ্র গুপ্ত হাত তুলে গলা উঁচিয়ে বললেন, উপস্থিত রহস্য ভদ্রমন্ডলী, আপনাদেরই একজন, মিস দেবারতি মানি, গতকাল রাতে তার চারতলায় ঘরের জানলা থেকে নীচে লাফ দিয়েছে। আপনারা অনেকেই হয়তো ভেবেছেন, ব্যাপারটা আত্মহত্যা কিন্তু আসলে তা নয়। কেউ তাকে নীচে লাফিয়ে পড়তে সাহায্য করেছে। সম্ভবত আপনাদেরই কেউ। একটু থেমে অশোকচন্দ্র আনমনাভাবেই তার মাথার একগোছা চুল টানলেন। তারপর বললেন, ব্যাপারটা যে খুন–আত্মহত্যা নয়–তার ডেফিনিট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ফলে এখন একটা কাজই বাকি? খুনি পাকড়াও করা। আমি আর রঘুপতি মিলে এর মধ্যেই আপনাদের ষোলোজন সম্পর্কে ছোটখাটো একটা ডোসিয়ার তৈরি করে ফেলেছি। আপনারা তো জানেন, খুনের ব্যাপারে ডিটেকটিভ বা পুলিশের একটা জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপার থাকে। সেইজন্যেই আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা দরকার। আপনারা এখন ব্রেকফাস্ট, কনফারেন্স, এইসব সেরে নিতে পারেন। আমি লাঞ্চের সময় যতটা পারি কাজ সেরে নেব। তারপর সন্ধে থেকে আবার বিরক্ত করব। অতএব, আপাতত আপনারা যেতে পারেন।

এসিজির কথা শেষ হতেই ঘরে শুরু হল গুঞ্জন।

অতিথিরা কথা বলতে বলতে রওনা হলেন ঘরের দরজার দিকে। রঘুপতি যাদব বাজপাখির চোখে তাদের লক্ষ করছিল।

অনিমেষ চৌধুরি রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে পাশে হাঁটছিলেন। বললেন, আমার সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট খাওয়া অভ্যেস। আজ ভীষণ দেরি হয়ে গেল।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকের বপু নিরীক্ষণ করে হাসতে হাসতে বললেন, বুঝতে পারছি আপনার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু খুনের তদন্ত বলে কথা।

খেয়াল করেছেন, ওই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের নামের মধ্যে কেমন একটা ইতিহাসের গন্ধ রয়েছে।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলে ওঠার আগেই কথা বলল কৌশিক পাল, হা– অশোক আর চন্দ্রগুপ্ত। তবে বুদ্ধি বোধহয় চাণক্যের মতো।

ভাস্কর রাহা ওঁদের চলে যাওয়া দেখছিলেন। ওঁদের সকলের মনে ভয় আছে, আশঙ্কা আছে। কিন্তু দেবারতি মানির জন্য কতটুকু শোক-দুঃখ-তাপ রয়েছে? মেয়েটা মরেছে বারো ঘণ্টাও হয়নি– অথচ এরই মধ্যে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে! হাসি-ঠাট্টা করা যাচ্ছে অনায়াসে! যেন দেবারতির মৃত্যু এক আচমকা টান মেরেছিল জীবনযাত্রার তারে, তারটা কাঁপতে শুরু করেছিল অনুপ্রস্থ তরঙ্গ গঠন করে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের বিস্তার কমতে কমতে এই ন-দশ ঘণ্টায় সেই কম্পন একেবারে থেমে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে না দেবারতি মানি নেই–কোনওদিন ছিল।

অথচ রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের প্রতি কী দারুণ ভালোবাসা ছিল মেয়েটার!

আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এইরকম এক ভালোবাসা থেকেই এই সাহিত্যের টানে গা ভাসিয়েছিলেন ভাস্কর রাহা। এমনি গল্প-উপন্যাস যে লিখতে পারতেন না তা নয়। বেশ কয়েকটা লেখা তো ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু অ্যালান পো, মপাসা, মম, কোনান

ডয়েল, ব্রাম স্টোকার, অ্যামব্রোজ বিয়ার্স, ব্র্যাডবেরি, রোল্ড ড্যাল এবং আরও অনেকের লেখা পড়তে-পড়তে মনের ভেতরে কী সব যেন হয়ে গেল। পথ বাঁক নিল। এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন ভালোবাসা নিয়ে এই অপরাধী সাহিত্যে পা রাখলেন ভাস্কর রাহা। সেই ভালোবাসা নিয়ে দুর্দিনে পথ হেঁটেছেন, ক্রমাগত লড়াইয়ে পৌঁছে গেছেন সফলতার সোনার দিনে। কিন্তু অদ্ভুত সেই ভালোবাসা–এত বছরেও এক বিন্দু কমেনি।

এরকম কম-বেশি ভালোবাসা নিয়ে আরও অনেক লেখক এসে যোগ দিয়েছেন সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায়। তারা একনিষ্ঠভাবে এই সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন। সে-সময়ে নামি পত্রপত্রিকায় রহস্য গল্প-উপন্যাস ছাপা হত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব প্রেমিক লেখকরা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে গিয়ে সেইসব নামী পত্রিকার দরজায় কড়া নাড়েননি। বরং ছোট পত্রিকার লিখেছেন নিয়মিত। মাসিক রহস্য পত্রিকা, মাসিক রোমাঞ্চ, মাসিক গোয়েন্দা, মাসিক ক্রিমিনাল, ভয়ংকর, ক্রাইম, অপরাধ–এইসবই ছিল তাদের প্রিয় পত্রিকা। স্বর্গের দাসত্ব করার চেয়ে নরকের রাজত্ব তাদের পছন্দ ছিল।

দিনের পরে দিন কেটে গেল। সময়ও তার রং বদলাতে লাগল ধীরে-ধীরে। বেশ কয়েকটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল লড়াইয়ে হেরে গিয়ে। কিন্তু জন্ম নিল কয়েকটি নতুন পত্রিকা ও ছায়াময়, রহস্য-রোমাঞ্চ, ভৌতিক। আবার নতুন করে শুরু হল লড়াই।

ইতিমধ্যে কয়েকটি নামি পত্রিকা রহস্য গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করে পাঠকের সাড়া পেয়েছে। টিভিতে প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছে রহস্যকাহিনি। ফলে রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রকাশকরা এ-জাতীয় বই প্রকাশে মন দিলেন। লেখকরা যেন নতুন করে কোরামিন ইনজেকশান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের কলম নিয়ে।

তারপর…গত পাঁচ সাত বছরে ছবিটা একেবারে বদলে গেল। সফলতার স্বাদ এখন রহস্য সাহিত্যিকদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু সেই ভালোবাসা? সেটা কি সকলের মধ্যে রয়েছে? সহজে সফলতা পাওয়ার লোভে কেউ কেউ কি এসে যোগ দেননি এই স্রোতে? আর পুরোনো লেখকরা এখনও কি ভাস্কর রাহার মতো বুকে হাত রেখে বলতে পারেন, রহস্য-সাহিত্য, তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। বোধহয় না। তবে দেবারতি মানি পারত।

আর সেইজন্যেই কি খুন হয়ে গেল মেয়েটা!

মিস্টার গুপ্ত, ভাস্কর রাহা শান্ত গলায় বললেন, দেবারতির ঘরটা আমি একবার দেখতে পারি?

ভুরু বাঁকিয়ে আড়চোখে রাহার দিকে তাকাল রঘুপতি যাদব মতলব?

ভাস্কর রাহা রঘুপতির দিকে ফিরেও তাকালেন না। অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়েই কথা বললেন আবার, যদি অবশ্য আপনাদের তদন্তের কোনও অসুবিধে না হয়। একটু থেমে যেন স্বগত মন্তব্য করলেন, মেয়েটাকে আমি বড় ভালোবাসতাম…

রঘুপতি এবার ভাস্কর রাহার কাছাকাছি এগিয়ে এল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট থাকা সত্ত্বেও ওর ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল। চোয়াল শক্ত করে ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে রঘুপতি চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, মোহাব্বত! ইন্টারেস্টিং।

উৎপলেন্দু সেন রত্নবলী মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, একেবারে আনকালচারড়। রূপেন মজুমদার ইশারায় উৎপলকে থামতে বললেন।

রত্নাবলী অনেকক্ষণ ধরেই অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। তাই গলা তুলে রঘুপতি যাদবকে লক্ষ করে কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু ভাস্কর রাহা ইশারায় তাকে থামালেন। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে চুরুট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে আরামের ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, মিস্টার যাদবের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারটা আপনিই

ভালো বলতে পারবেন– আপনি ওর মাস্টারমশাই ছিলেন। তা ছাড়া এখানে আমি সহবত শেখানোর ইস্কুল খুলিনি–এটা বাড়ি থেকেই শিখে আসতে হবে।

মিস্টার রাইটার– গর্জন করে উঠল ইন্সপেক্টর যাদব।

তার মুখ অপমানে লাল হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চোখ ছোট করে সে কিছু একটা বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু তাকে সময়মতো বাধা দিয়েছেন এসিজি।

রঘুপতি, তুমি কি আমাকে একটু শান্তিতে কথা বলতে দেবে না! প্লিজ, একটু চুপ করে থাকো।

রঘুপতি যাদব নিজেকে সামলে নিল।

ভাস্কর রাহা চুরুটে টান দিয়ে সামান্য শব্দ করে হাসলেন। হাতের চুরুটের দিকে নজর রেখেই স্পষ্ট স্বরে বললেন, মিস্টার গুপ্ত গত বিশ-পঁচিশ বছরে এই ক্রাইম ফিকশন লেখালিখি নিয়ে অনেক লড়াই আমরা দেখেছি। আমরা বলতে, আমি, উৎপলেন্দু সেন, রূপেন মজুমদার, আর মিসেস মুখার্জি তো বটেই– ওঁদের তিনজনের দিকে ইশারা করে দেখালেন রাহা। মুখ তুলে আবার হাসলেন, বললেন, কারও চোখ রাঙানিতে আমরা ভয় পাই না। তা সে সম্পাদকই হোক, প্রকাশকই হোক, কিংবা রঘুপতি যাদবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে পেটি কোনও পুলিশ অফিসারই হোক।

রঘুপতি একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছিল, কিন্তু সে চেতনা হারায়নি। কারণ সে জানে, সেরকম বেচাল কিছু করে ফেললেই পরদিন সেটা খবরের কাগজের নিউজ হবে। বিশেষ করে যেখানে ভাস্কর রাহা আর রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় হাজির রয়েছেন।

এসিজি প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঠিক সময়েই প্রস্তাব দিয়েছেন, ভাস্করবাবু। কারণ আমরা মিস মানির ঘরে এখন একবার যাব। আপনি

সঙ্গে এলে আমার বা রঘুপতির কোনও আপত্তিই নেই। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম হাসলেন এসিজি।

রঘুপতি যাদব তখন মনে-মনে ঈশ্বরকে ডাকছিল। স্যার যদি এই পাকাচুল রাইটারটাকে শেষ পর্যন্ত খুনি বলে ঠাওরান তা হলে দারুণ হবে। ওই যে সহবত-টহবত কী সব বলল, সেগুলো ওকে হাড়ে-হাড়ে শিখিয়ে দেওয়া যাবে।

চলুন, তাহলে আমরা ওপরে যাই– রঘুপতির হাত ধরে টান মারলেন অশোকচন্দ্র ও চলো, রঘুপতি–।

আ-আমি সঙ্গে গেলে কি কোনও অসুবিধে হবে? ইতস্তত করে এই অনুরোধটি পেশ করেছেন রত্নাবলী। চশমার কাচের পিছনে ওঁর চোখ সামান্য ফোলা। নীল সরু পাড়, বুটির কাজ করা, একটা সাদা টাঙ্গাইল শাড়িতে ওঁকে প্রশান্ত দেখাচ্ছে। দেবারতির ব্যাপারটার জন্য আজ যে বাড়িতে যেতে পারবেন না সেকথা স্বামীকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন। দেবারতি মেয়েটা বেশ হাসিখুশি ছিল। তা ছাড়া তাঁর লেখার ভক্ত ছিল। অকারণে একজন ভক্ত পাঠক কোন লেখক হারাতে চায়।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত চলার পথে থমকে দাঁড়িয়েছেন। ফিরে তাকিয়ে বলেছেন, আসুন না, আপনারা সবাই আসুন। রঘুপতিদের ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট আর ক্যামেরাম্যানরা কাল রাতেই তাদের সব কাজ সেরে ফেলেছে। এখন আর কোনও সূত্র খোওয়া যাওয়ার ভয় নেই।

অতএব অশোকচন্দ্র এবং রঘুপতিকে অনুসরণ করে রওনা হলেন চারজন অভিজ্ঞ লেখক। এই প্রথম ওঁরা সরাসরি কোনও তদন্তে জড়িয়ে পড়েছেন।

ওঁরা ছ-জন চলে যেতেই ভাস্কর রাহার ঘর খালি। দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলটিকে রঘুপতি ঘরের বাইরে পাহারা দেবার জন্য নির্দেশ দিল। তারপর ঘর থেকে

বেরিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে।

ওপরে রওনা হওয়ার আগে ল্যান্ডিং-এর বারান্দা দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখলেন রূপেন মজুমদার। না, গত রাতের কোনও চিহ্নই চোখে পড়ছে না। ভাস্কর রাহার গাড়িটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। হয়তো শান বাঁধানো টেরাসে হুমড়ি খেয়ে আতসকাঁচ নিয়ে পরীক্ষা করলে তবেই খুঁজে পাওয়া যাবে এক তরুণীর শরীরের রক্তবিন্দুর সূক্ষ্ম চিহ্ন।

পাঁচতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে বাঁক নেবার সময় বাঁ দিকের ভোলা বারান্দার দিকে তাকালেন ভাস্কর রাহা। সুন্দর ঝকঝকে সকাল। নীল আকাশে কোনও মলিনতা নেই। মনেই হয় না, গতকাল রাতে এই হোটেলেই ঘটে গেছে এক বিশ্রী মলিন ঘটনা।

সত্যি, দেবারতি মানি এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন গ্রহান্তরের বাসিন্দা হয়ে গেছে!

.

০৬.

তিনশো আট নম্বর ঘরে ঢুকতেই এক অশরীরী অনুভূতির তরঙ্গ যেন ঝাঁকুনি দিল ভাস্কর রাহাকে।

চেহারা অথবা বিলাসিতার দিক থেকে ভাস্কর রাহার ঘরের সঙ্গে কোনও তফাত এই ঘরের নেই। অথচ ঘরটার চরিত্র যেন অন্যরকম। একটু আগেই যাকে গ্রহান্তরের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিল, এখন সে যেন দুরন্ত গতিবেগে মহাকাশের দুস্তর দূরত্ব চোখের পলকে অতিক্রম করে ধূমকেতুর মতো ছুটে এসে আছড়ে পড়েছে এই ঘরের মধ্যে। দেবারতির অশরীরী আত্মা যেন কাতর স্বরে বলছে, মুকুটহীন সম্রাট, আপনাদের ছেড়ে আমি যেতে চাইনি। বাট সামওয়ান ফোর্সড মি টু লিভ ইউ অল। আপনাদেরই একজন আমাকে…।

সে কে, দেবারতি? মনে-মনে প্রশ্ন করলেন রাহা।

দেবারতি মানির ঘরের দরজায় একজন কনস্টেবল পাহারায় মোতায়েন ছিল। রঘুপতি যাদবকে দেখে সে জোড়াতালি দেওয়া ভাঙা দরজা সতর্কভাবে ঠেলে খুলে দিয়েছে। ওঁরা ঘরে ঢুকেছেন একে-একে।

ভাস্কর রাহা শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে দেবারতিকে অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন। পারফিউমের হালকা গন্ধ তার নাকে আসছিল।

সোজাসুজি তাকালেই বড় মাপের জানলা। পশ্চিমদিকের এই জানলা দিয়েই পড়ে মারা গেছে দেবারতি।

রূপেন মজুমদার আর উৎপলেন্দু সেন এসিজির অনুমতি নিয়ে দেবারতির বিছানায় এক কোণে বসে পড়লেন। গত পরশুর রাতের কথা উৎপলের মনে পড়ল। মেয়েটা তাকে যৌন প্রতিবন্ধী বলে অপমান করেছিল। একজন ব্যর্থ লেখক, একজন ব্যর্থ অভিনেতা বলেছে বলে কিছু মনে করেননি উৎপল। নাথিং সাকসিস লাইক সাকসেস। সফলতার চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছু হয় না। উৎপল সাফল্য পাননি। সুতরাং এই বাস্তবটুকু না মেনে তার উপায় নেই। কিন্তু তিনি অসমর্থ নন—কোনও দিক থেকেই অসমর্থ নন।

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! ভাবলেন উৎপলেন্দু। যে-মেয়েটার ওপরে তার এত রাগ এত জ্বালা, তাকেই তিনি স্বপ্নের ঘোরে নায়িকা বলে কামনা করেন! স্বপ্নের ভেতরে ঘটে যাওয়া ঊরুতাড়িত মহাযুদ্ধে তিনি দেবারতি মানিকে পরাস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন! ফ্রয়েড দিয়ে কি এই অদ্ভুত মানসিকতার কোনও ব্যাখ্যা করা যায়?

দেবারতির বিছানার ভারি চাদর ছুঁয়ে এইসব কথাই ভাবছিলেন উৎপল। রূপেন মজুমদার তার পাশে চুপটি করে বসে। চোখেমুখে সামান্য অস্বস্তির ছাপ। রত্নাবলী সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বোধহয় কল্পনায় দেখছেন, দেবারতি ভুরুতে হালকা কাজল ছোঁয়াচ্ছে। আর ভাস্কর রাহা চুরুট হাতে খুব ধীরে পা ফেলে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার সামনে। জানলা তো নয়, মরণের দরজা।

এসিজি কখন যেন সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে। চোখ কার্পেটের নকশার দিকে। আর রঘুপতি যাদব কাগজে কী সব নোট করতে করতে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল। সোজা চলে গেল ওয়ার্ডরোবের দিকে। দরজার পাল্লা খুলে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

অনেকগুলো থমথমে মুহূর্ত কেটে যাবার পর অশোকচন্দ্র গুপ্ত কথা বললেন, জানেন, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম দেবারতি মানি আত্মহত্যা করেছে– বাঁ হাত চুলের ভেতরে চালিয়ে দিলেন। কয়েক গোছা চুল ধরে আলতো করে টান মারলেন কয়েকবার। তারপর ও ...কারণ, এই ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, এইসব আধুনিক হোটেলের দরজা বাইরে থেকে অথবা ভেতর থেকে দু-দিক থেকেই লক করা যায়, কিন্তু মিস মানির ক্ষেত্রে প্রবলেম হল, ওর দরজার চাবিটা আমরা পেয়েছি ওই টেবিলের ওপরে। তার অর্থ, মিস মানি নিজেই দরজা লক করেছিল ভেতর থেকে। আর তারপর ও...।

এসিজির কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করল রঘুপতি যাদব। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা বন্ধ করে ও চট করে ঘুরে তাকিয়েছে এদিকে : ...তারপর মিস মানি লাফ দিয়েছেন ওই খিড়কি দিয়ে। সিধা গিয়ে পড়েছেন ওঁর মোটরের ছাদে। রাহার দিকে আঙুল তুলে দেখাল যাদবঃ তারপর মোটর থেকে শান বাঁধানো টেরাসে। কোয়াইট আ মেসি জব। মাথাটা একেবারে চুরচুর হয়ে গেছে। একটু থেমে যাদব আবার বলল, লেকিন তাজ্জব কী বাত হল, দেবারতি মানির ঘরের ওই দরজা– আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখিয়ে সে বলেছে, অন্দরসে লক করা ছিল। আর চাবিটা ছিল ওই টেবিলের ওপরে জানলার কাছাকাছি রাখা গোল টেবিলটাকে ডান হাতের তর্জনী ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছে রঘুপতি যাদব।

কেন, তাজ্জব কী বাত কেন? প্রশ্নটা করেছেন রূপেন মজুমদার, সুইসাইড যদি হয় তা হলে তো এরকমটাই হওয়ার কথা– রূপেন মজুমদার এখনও বোধহয় এই ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারছিলেন না।

এইরকম ভোলাটাইল মেমোরি নিয়ে আপনি ডিটেকটিভ ফিকশন লেখেন! ব্যঙ্গের হাসি হাসল রঘুপতি যাদব ও একটু আগেই তো নীচে স্যার আপনাদের বললেন, ইটস আ কেস অফ মার্ডার-প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল। সেইজন্যেই বলেছি তাজ্জব কী বাত।

উৎপলেন্দু সেন মাথা ঝুঁকিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, প্রশান্তবাবু তো শুনলাম দরজা ভেঙে এ-ঘরে ঢুকেছেন। তারপর কেউ এসে চাবিটা টেবিলের ওপরে রেখে যায়নি তো?

অশোকচন্দ্র গুপ্ত উৎপলের কথার জবাব দিলেন, না, সেরকম কোনও সুযোগ ছিল না। এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত এই ঘরের দরজায় কড়া পাহারা ছিল। আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে, উৎপলেন্দুবাবু।

উৎপলেন্দুর দিশেহারা অভিব্যক্তি দেখে ভাস্কর রাহা এই প্রথম কথা বললেন, অর্থাৎ, ইমপসিল প্রবলেম–জন ডিকসন কার।

ভাস্কর রাহা মন্তব্যটি করেছিলেন নীচু গলায়। কিন্তু অশোকচন্দ্রের প্রখর কান সেটা শুনতে পেয়েছে। আর উৎপলেন্দু রাহার কাছাকাছি থাকায় তারও শুনতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

পায়চারি থামিয়ে একটা সোফায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন এসিজি। পাকা চুলের গোছায় বাঁ হাতের আঙুল ডুবিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হাসলেন তিনি? চমৎকার বলেছেন, ভাস্করবাবু। জন ডিকসন কার। ডিকসন কার নিজের নামে অথবা কার্টার ডিকসন ছদ্মনামে সারাজীবন শুধু অসম্ভব রহস্য নিয়েই গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন। ব্যবহার করেছেন দুই গোয়েন্দা ও ড. গিডিয়ন ফেল, আর স্যার হেনরি মেরিভেল। একটু থামলেন অশোকচন্দ্র, সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন : .সুতরাং ভাস্করবাবু, একটা জিনিস তো আপনি ভালোই জানেন…এই ইমপসিব প্রবলেমগুলোর সমাধান খুব সাদামাঠা হয়। আমার ধারণা, দেবারতি মানির বেলাতেও এই জেনারাল রুলের কোনও হেরফের হবে না। শুধু প্রবলেমটা সল্ভ করতে একটু সময় লাগবে, এই যা।

উৎপলেন্দু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। বেশ বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, সেই কাল রাত থেকে এর-ওর মুখে শুনে আসছি দেবারতি খুন হয়েছে। আবার দু-একজন বলছেন সুইসাইড। আজ সকালে আপনারা বললেন ব্যাপারটা খুন–তার ডেফিনিট প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। অথচ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হয়েছে। দরজার চাবি পাওয়া গেছে ওই টেবিলে। এরপরেও যদি ব্যাপারটা সুইসাইড না হয়, তা হলে কোথায় সেই ডেফিনিট প্রমাণ? আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

কথা শেষ করার পরেও উৎপলেন্দুর মুখ সামান্য লাল। তা ছাড়া কথা বলার সময়ে বিরক্তি ছাড়াও কিছুটা রাগের ছোঁওয়া পাওয়া গিয়েছিল তার ভঙ্গিতে।

উৎপলেন্দুর কথা শেষ হতেই শুরু হল নিস্তব্ধতা।

ভাস্কর রাহার চুরুট নিভে গিয়েছিল। সেটা তিনি ছাই ঝেড়ে পকেটে ঢোকালেন। এসিজি চুপচাপ তার হাতের সিগারেটের অগ্নিবিন্দুর দিকে তাকিয়ে। রূপেন মজুমদার বেশ অপ্রস্তুত কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আর রঘুপতি যাদব জরিপ নজরে উৎপলেন্দুকে দেখছে।

নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল সে-ই।

ওয়ান্ডারফুল! ইনভেস্টিগেশনে হেল্প করার মতো এই প্রথম একটা ইমোশনাল রিঅ্যাকশান পাওয়া গেল। তারপর অশোকচন্দ্রের দিকে ফিরে : স্যার, ইসকে বারে মে আপকা কেয়া রায় হ্যায়? এসবই তো আমরা চাই ইমোশন্যাল রিঅ্যাকশন। কারণ এরকম জোশ থেকেই হয়তো মিস মানি খুন হয়ে গেছেন।

এসিজি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল।

এবার ভাস্কর রাহা রিসিভার তুললেন।

রঘুপতি যাদব যথারীতি চটপটে পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাহা টেলিফোনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরাস্ত রঘুপতি ফোঁস করে একটা শব্দ করল। ভাস্কর রাহা আড়চোখে ইন্সপেক্টরকে একবার দেখলেন, তারপর টেলিফোনে কথা বললেন। ঘরের সিলিং-এ আধুনিক ডিজাইনের পাখা ঘুরছিল। তার বাতাসে ভাস্কর রাহার চওড়া কপালে শনের মতো চুল উড়ছিল।

ও-প্রান্ত থেকে প্রশান্ত রায় কথা বলছিলেন, ডাইনিং হলে আসার দরকার নেই। ছজনের ব্রেকফাস্ট পাঠাচ্ছি। তিনশো আট নম্বরে। ওকে?

পাঠিয়ে দিন, বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহা। ভাবলেন, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারসাহেব এখনও টেলিগ্রাফিক ল্যাঙ্গুয়েজের ছক থেকে বেরোতে পারেননি। পুলিশি ধমক বলে কথা!

ব্রেকফাস্টের খবরটা সকলে শুনলেন।

উৎপলেন্দুর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। অকালমৃত এক তরুণীর ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট! কিন্তু রাহা তা ভাবেননি। দেবারতির ঘরে ব্রেকফাস্ট খেলে ও ভীষণ খুশি হত। প্রাণ ভরে গল্প করত মুকুটহীন সম্রাট-এর সঙ্গে। গল্পে। গল্পে সময় কেটে যেত।

এখন তফাতের মধ্যে শুধু ও নেই।

উৎপলেন্দু সেনের প্রশ্নটা তখনও ঘরের বাতাসে ভাসছিল। তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে অশোকচন্দ্র রঘুপতিকে বললেন, রঘুপতি, আর চেপে রেখে লাভ নেই। মিস মানির লেখাটা ওঁদের পড়ে শোনাও।

দেবারতি মানির লেখা! রত্নাবলী রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন? কী লেখা? সুইসাইড নোট?

সুইসাইড নোটই বটে– তেতো হাসলেন অশোকচন্দ্র। তারপর রঘুপতিকে ইশারা করলেন কাজ শুরু করতে।

রঘুপতি যাদব তার হাতের কাগজপত্র একটা সোফার ওপরে নামিয়ে রেখেছিল। ব্যস্ত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড সেগুলো হাঁটকে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করে নিল। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। বলল, এই কাগজটা আমরা পেয়েছি ওই গোল টেবিলের ওপরে আঙুল তুলে জানলার কাছে রাখা টেবিলটা দেখাল রঘুপতি ও ..চাবিটা যেখানে ছিল, সেইখানে। ওই টেবিলে বহত সারে কাজাত ছিল। ওই সব কাজাতের ভেতর থেকে এই শিটটা আমরা পেয়েছি। এতে মিস মানির হাফ ফিনিল্ড একটা লেখা রয়েছে। সেটাই আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।

সিগারেট আর চুরুটের ভারি গন্ধে হালকা পারফিউমের গন্ধ কখন যেন ঢাকা পড়ে গেছে। রূপেন মজুমদার, উৎপলেন্দু সেন, রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় আর ভাস্কর রাহা–এই চারজন প্রবীণ লেখক একরাশ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন রঘুপতি যাদবের দিকে।

রঘুপতি যাদব পড়তে শুরু করল।

বাংলা ডিটেকটিভ ফিকশন কখনও এরকম সাকসেসফুল জায়গায় আসবে সেটা সাত-আট বছর আগেও কেউ ভাবেনি। পনেরো-বিশজন লেখকের অক্লান্ত চেষ্টার পুরস্কার বলেই এটাকে মানতে হবে। অবশ্য তার সঙ্গে সম্পাদক আর প্রকাশকের ভূমিকাও রয়েছে। ওঁরা প্যাট্রনাইজ না করলে লেখকরা কী করে সামনে আসতেন।

এইসব চেষ্টার পাশাপাশি চলেছে রেডিও-টিভির পাবলিসিটি। তার ওপর যোগ হয়েছে এই অ্যানুয়াল কনফারেন্স। বলতে গেলে বাংলা ক্রাইম ফিকশনের এখন আর কোনও অভাব নেই। শিক্ষিত পাঠকও এটাকে এখন অ্যাকসেপ্ট করেছে। এটা আমার দারুণ তৃপ্তির জায়গা। ব্লিসফুল স্যাটিসফ্যাকশন।

রহস্য-সাহিত্য নিয়ে আন্দোলনের ব্যাপারটাকে আমি বরাবর শ্রেণি-সংগ্রাম হিসেবে দেখেছি। মেইনস্ট্রিম লিটারেচারের সঙ্গে একই সারিতে কখনও একে জায়গা দেওয়া হয়নি। কুলিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই সারিতে কি হরিজনকে বসানো যায়। জন্মসূত্র ধরেই মানুষকে যেমন জাতপাতের বিভেদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, এটার বেলাতেও যেন ঠিক তাই ও জন্মসূত্রেই রহস্য-সাহিত্য তৃতীয় শ্রেণির সাহিত্য। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে নাক উঁচু সমালোচকদের কোনও যুক্তির দরকার হয় না। এ তো সবাই জানে, যুক্তি দেখাতে গেলে শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন। সুতরাং অশিক্ষিত সমালোচকের কাছে যুক্তির চেয়ে মতামতই হল বড় হাতিয়ার।

এরকম একটা অবস্থা থেকে যে করে তোক সেই হরিজন তার জায়গা করে নিতে পেরেছে কুলীন ব্রাহ্মণ-এর পাশে। নিশ্চয়ই কাজটা খুব সহজে হয়নি। যারা জানে তারা জানে।

এরকম একটা সিচুয়েশনে একটা খবর আমাকে চমকে দিল। একজন বিশ্বাসঘাতক লেখক হাজির রয়েছে এই কনফারেন্সে। খবরটা আমি যার কাছ থেকে

শুনেছি তা মোটেই মিথ্যে হওয়ার নয়। ইটস ট্রুথ—বিটার ট্রুথ। আমি…।

.

উর্দি পরা দুজন বেয়ারা ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে এসে ঢুকতেই থেমে গেল রঘুপতি। আয়তাকার ব্রেকফাস্ট টেবিলে খাবার-দাবারগুলো নামিয়ে নীচু গলায় ম্যানেজারসাব পাঠিয়ে দিলেন। বলে তারা চলে গেল।

চোখের সামনে খাবার দেখে খিদেটা টের পেলেন সকলে। ভাস্কর রাহা রত্নাবলীর দিকে একপলক তাকালেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের আগাথা ক্রিস্টি প্রথাগত বাঙালি গৃহিণী হয়ে গেলেন। খাবারের প্লেটগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে দিতে লাগলেন প্রত্যেকের হাতে।

রঘুপতি যাদব আবার পড়তে শুরু করল,

...আমি যে তাঁকে চিনে ফেলেছি সেটা প্রথমটায় বুঝতে দিইনি। কিন্তু তাঁর ইন্টারভিউ নেবার সময় তিনি বোধহয় আমার ঘেন্না রাগ এগুলো সাসপেক্ট করতে পেরেছেন। তবে আই ডোন্ট কেয়ার। আজ রাতেই আমি সেই লেখককে সরাসরি সব জানিয়ে দেব। জানিয়ে দেব, কনফারেন্সের শেষ দিনে ডায়াসে উঠে আমি তাঁর সবকিছু ফাঁস করে দেব। এরকম একটা শয়তানির পানিশমেন্ট হওয়া দরকার। তা ছাড়া এতগুলো বছর ধরে...।

থামল রঘুপতি। বলল, লেখাটা এখানেই শেষ। তারপর কাগজটা আবার রেখে দিল অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে।

রত্নাবলী ওর হাতে ব্রেকফাস্টের প্লেট তুলে দিলেন। তারপর নিজের প্লেটটা নিয়ে এসিজির কাছাকাছি একটা সোফায় বসলেন।

অশোকচন্দ্র হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল চিন্তায় ডুবে আছেন।

বাকি সবাই চুপচাপ খাচ্ছিলেন। বোধহয় ভাবছিলেন দেবারতির শেষ লেখাটার কথা। কে সেই বিশ্বাসঘাতক লেখক? কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে?

লেখাটা আর একটু থাকলে হয়তো জানা যেত দেবারতি মানি কোন লেখক সম্পর্কে অভিযোগ করছিল। খেতে-খেতেই হঠাৎ বললেন রূপেন মজুমদার।

এই মন্তব্যের জবাব দিল রঘুপতি ও লেখাটার শেষের দিকে দু-লাইন মতো হিজিবিজি করে কেটে দেওয়া। সেখানে কী লেখা ছিল কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা কালি কমপেয়ার করে দেখেছি কাটাকুটিটা মিস মানির পেন দিয়েই করা হয়েছে। হো সকতা হ্যায় কে মিস মানি লাইন দুটো কেটে দিয়েছেন, নহী তো...।

তার মার্ডারার রঘুপতির অসম্পূর্ণ কথা শেষ করলেন রত্নাবলী।

অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট, মিসেস মুখার্জি। এসিজি বললেন। তারপর ঘুরে তাকালেন উৎপলেন্দু সেনের দিকে মিস্টার সেন, এটাই আমাদের ডেফিনিট প্রমাণ। আশা করি আপনার আর কোন সংশয় নেই। তবে এ ছাড়াও বাড়তি কয়েকটা ইনডায়রেক্ট প্রুফ আমাদের হাতে আছে। যেমন, ওই টেবিলে একটা বই আধখোলা অবস্থায় পড়ে ছিল–

কী বই? প্রশ্ন করলেন রূপেন মজুমদার।

ভাস্কর রাহাও কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলেন অশোকচন্দ্রের দিকে। খুন হওয়ার আগে কী বই পড়ছিল মেয়েটা?

অশোকচন্দ্রের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তৃপ্তির ছোট্ট শব্দ তুলে তিনি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের খালি প্লেটটা ব্রেকফাস্ট টেবিলের এক কোণে রেখে মিসেস মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকালেন। মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে অনুরোধের সুরে বললেন, মিসেস মুখার্জি, যদি কাইন্ডলি আমাদের চায়ের ব্যবস্থাটা করেন।

টেবিলে টি-পট, মিল্ক পট, শুগার কিউব এবং সুদৃশ্য পেয়ালা-পিরিচের সেট রাখাই ছিল। সুন্দর করে হেসে আরও একবার গৃহিণী হয়ে গেলেন রত্নাবলী। তাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, তার বয়েস আর কোনওদিন পঁয়ষট্টিতে পা দেবে না। তিনি সপ্রতিভভাবে চলে এলেন ব্রেকফাস্ট টেবিলের কাছে। চায়ের আয়োজন শুরু করলেন।

মিস্টার গুপ্ত, কী বই পড়ছিল দেবারতি? ভাস্কর রাহা প্রশ্ন করলেন এবার।

অশোকচন্দ্র মাথার চুলে হাত চালালেন। আপন খেয়ালেই মাথা নাড়লেন এপাশ ওপাশ। তারপর বললেন, খুব ইন্টারেস্টিং বই। দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড–আগাথা ক্রিস্টির লেখা। একটু থেমে মাথাটা বাঁ দিকে সামান্য হেলিয়ে এসিজি আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন : বইটা ইন্টারেস্টিং বললাম কেন বলুন তো?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন উৎপলেন্দু সেন, ড. ওয়াটসন অ্যাজ মার্ডারার–এটাই বইটার বিশেষত্ব। যে-চরিত্র আমি হয়ে গল্পটা বলছে, সে-ই খুনি। আর মজা হল, গল্প বলার সময় খুন করার ব্যাপারটাও সে কায়দা করে পাঠককে বলে গেছে। একটু থেমে উৎপল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আরও একটা কারণে বইটা উল্লেখযোগ্য।

কেন? জিগ্যেস করেছে রঘুপতি যাদব।

উৎপল উত্তর দিলেন অশোকচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে, এই বইটা থেকে গল্প মেরে বিখ্যাত লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত ঘুম নেই নামে একটা ওরিজিন্যাল উপন্যাস লিখে গেছেন। খুকখুক করে হেসে কথা শেষ করলেন উৎপলেন্দু সেন।

রত্নাবলী একে-একে সকলের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছেন, নিজেও নিয়েছেন। তারপর বসেছেন গিয়ে দেবারতির বিছানায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এসিজি বললেন, উৎপলেন্দুবাবু দেখছি নির্ভুল খবর রাখেন। আর আপনি বলেছেনও ঠিক : এই বইটা আগাথা ক্রিস্টির অন্য সব বইয়ের চেয়ে আলাদা। সেইজন্যেই ব্যাপারটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়েছে।

এবারে আসা যাক দেবারতি মানির লেখাটার প্রশ্নে– শব্দ করে কাপে চুমুক দিলেন। অশোকচন্দ্র : লেখাটা থেকে আমরা কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন পাচ্ছি। একঃ দেবারতি মানির চোখে আপনাদের দশজনের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক–বেইমান। সুতরাং, শুনতে খারাপ লাগলেও এই কনফারেন্সে ইনভাইটেড দশজন লেখকের মধ্যে কোনও একজন দেবারতিকে খুন করেছেন…।

রূপেন মজুমদার একটু একটু করে ভয় পাচ্ছিলেন। ভয় পাচ্ছিলেন ভাস্কর রাহাও। ধীরে ধীরে, একটু-একটু করে, ওঁদের উলঙ্গ সত্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রকাশক, সম্পাদক

আর সাংবাদিকরা সন্দেহের আওতার বাইরে চলে গেলেন। বাকি রইলেন দশজন লেখক। শুধু দশজন লেখক।

ভাস্করবাবু, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেউ এই জঘন্য কাজ করতে পারে না। রূপেন মজুমদার নীচু গলায় নিজের অবিশ্বাসের কথা ভাঙলেন রাহার কাছে।

ভাস্কর রাহা কিছু বলে ওঠার আগেই জ্বলে উঠল রঘুপতি যাদব। বেপরোয়া সুরে সে বলে উঠল, মিস্টার রাইটার, ডোন্ট ট্রাই টু প্লে সন্ত যুধিষ্ঠির। এখানে সন্ত কেউ নেই সারে কে সারে পাপী হ্যায়। কিউ, গুপ্তাসাব? শেষের কথাটা এসিজিকে উদ্দেশ্য করে, তার সমর্থনের আশায়।

রত্নাবলী একটু সিঁটিয়ে গেলেন। উৎপলেন্দুর গলাটা কেমন শুকিয়ে গেছে। একটু ভিজিয়ে নিতে পারলে ভালো হত।

এসিজি এবারে আর উত্তেজিত রঘুপতিকে সামাল দেবার চেষ্টা করলেন না। বরং রঘুপতির কথা যেন শুনতেই পাননি এমন ভান করে বলে চললেন, ফ্যাক্ট নাম্বার টু : যে-ই হোক একজন দেবারতি মানিকে সেই খবরটা দিয়েছে। তিন : দেবারতি সেই বেইমান লেখকটিকে চিনত। চার : দেবারতি তার ইন্টরাভিউ নিয়েছে। ঠিক কবে কখন ইন্টারভিউটা ও নিয়েছিল সেটা লেখা না থাকলেও অনুমানে মনে হয়, গত দু-দিনের মধ্যে এই হোটেলেই ও ইন্টারভিউটা নিয়েছে। কারণ, ওর কাগজপত্র ঘেঁটে আমরা কিছু শর্টহ্যান্ড নোটস পেয়েছি—সেগুলো আমরা ডিসাইফার করতে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি।

একটু দম নিলেন এসিজি। চায়ের কাপ খালি হয়ে গিয়েছিল। সেটা টেবিলে আলতো করে নামিয়ে রেখে উদাস চোখে তাকালেন জানলার বাইরে। সেখানে দূরের ঘরবাড়ি, টিভি অ্যান্টেনা, পাম গাছের পাতা, নীল আকাশ আর চড়া রোদ্দুর। জানলার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। শান্ত স্বরে শেষ কয়েকটা কথা বললেন, লাস্ট এবং পাঁচ নম্বর

ইনফরমেশন হল, কাল রাতে হয়তো সেই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে দেবারতির একটা মোকাবিলা হয়েছিল। হয়তো এই ঘরেই। তারপর...তারপর নটে গাছটি মুড়োল।

ঘরের সবাই চুপ। শুধু কারও কারও চায়ের কাপে শেষ চুমুকের শব্দ।

কিছুক্ষণ পর অশোকচন্দ্র পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সিগারেট এবং চুরুট ধরালেন উৎপলেন্দু এবং ভাস্কর। ওঁদের দুজনের কপালেই চিন্তার ছাপ। নাকি দুশ্চিন্তার ছাপ?

কুলকুল করে ধোঁয়া ছাড়লেন অশোকচন্দ্র। কাশির দমক এল হঠাৎ। কাশলেন কয়েকবার। ঊর্মিলা সামনে থাকলে নির্ঘাত হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিত। ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। ওর মা চলে গেছে প্রায় নবছর। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে ঊর্মিলা সেই শূন্যস্থানটা বুঝতে দেয়নি। অথচ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট না থাকলে কি থিঙ্কিং মেশিন কখনও কাজ করতে পারে।

অনেকক্ষণ পর অশোকচন্দ্র গুপ্ত কথা বললেন আবার, আমাদের যা বলার মোটামুটি বললাম। এবার আপনাদের পালা। ভাস্করবাবু, আপনাকে দিয়ে কি আমরা এখনই শুরু করতে পারি?

ঘরের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় একেবারে ডুবে ছিলেন ভাস্কর রাহা। এসিজির কথায় চমকে উঠে ফিরে তাকালেন তার দিকে। দুচোখে প্রশ্ন।

এসিজি আবার কথাটা বললেন।

অদ্ভুত হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ভাস্কর রাহা। ক্লান্ত স্বরে বললেন, বলুন, কী জানতে চান।

ঘটনার সবচেয়ে নোংরা অস্বস্তিকর অংশ শুরু হল তাহলে এইবার। ভাবলেন রত্নাবলী। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত কি আমাদের সামনেই ভাস্করবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? আলাদাভাবে হলে কি ব্যাপারটা ভালো হত না।

অশোকচন্দ্র একটা সোফা টেনে নিলেন বিছানার দিকে, ভাস্কর রাহার কাছাকাছি। মেঝেতে কার্পেট থাকায় কোনওরকম শব্দ হল না। সোফায় আরাম করে বসে পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেটে টান দিলেন। চোখ থেকে সরু ফ্রেমের চশমাটা খুলে শূন্যে উঁচু করে ধরে অদৃশ্য কিছু একটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর চশমাটা আবার ঠিকঠাক করে বসালেন নাকের ওপরে। বারকয়েক নাক কুঁচকে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, ভাস্করবাবু, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আবেগ আছে। একটু আগে উৎপলেন্দুবাবু সে-প্রমাণ দিয়েছেন। তা সেই আবেগগুলো হল ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের মতো। দুটো মানুষের মধ্যে যখন সম্পর্ক তৈরি হয় তখন তাদের আচরণ কীরকম হবে সেটা নির্ভর করে তাদের পোটেনশিয়াল বা আবেগের ওপরে। অর্থাৎ, কোনও কন্ডাক্টরের দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের মান অনুযায়ী যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় অনেকটা সেইরকম আর কী! আপনারা, লেখকরা, সাধারণত আবেগপ্রবণ মানুষ। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তীব্র আবেগ—হাই পোটেনশিয়াল। এই তীব্র আবেগ থেকেই হয়তো ঘটে গেছে দেবারতি মানির খুনের ঘটনা। ঘটনার পর খুনি হয়তো অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে, অনুতাপে সে হয়তো মর্মাহত, কিন্তু... একটু থামলেন এসিজি। তারপর ও কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। রঘুপতি যাদব অনেক আশা নিয়ে আমাকে ডেকে এনেছে।

ভাস্কর রাহা নীরবে চুরুটে টান দিচ্ছিলেন। এসিজি তাকে এখনও কোনও প্রশ্ন করেননি। গল্পে-উপন্যাসে আর্মচেয়ার ডিটেকটিভরা প্রচুর প্রশ্ন করে থাকেন, অনেক জবানবন্দী আদায় করেন গোপনে। কিন্তু এই অহঙ্কারী পলিতকেশ বৃদ্ধ কোন পথে হাঁটতে চাইছেন?

ভাস্করবাবু, আপনারা লেখক মানুষ আবার কথা শুরু করেছেন অশোকচন্দ্র, খুন খারাপি আপনাদের রোজকার অভ্যাসের ব্যাপার মানে, কাগজে কলমে। সুতরাং আপনারাই

ভালো বুঝবেন, কোনও খুনের ঘটনায় কোন-কোন তথ্য তদন্তের পক্ষে জরুরি। আমি সেই তথ্যগুলোই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি। পরে যদি নিতান্ত দরকার হয়, তখন দু-চারটে প্রশ্ন-টশ্ন করা যাবে।

ভাস্কর রাহা নিজেকে গুছিয়ে নিলেন মনে-মনে। চুরুটে কয়েকবার ঘনঘন টান দিলেন। তারপর বললেন, মিস্টার গুপ্ত, আপনার স্টাইলেই কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন আপনাকে দিই। কনফারেন্সের প্রথম দিন আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেবারতি বলে, ও একটা টপ সিক্রেট জানতে পেরেছে। সেটা জানাজানি হলে কনফারেন্স মাটি হয়ে যাবে, খবরের কাগজে ফ্রন্টপেজ নিউজ হবে। তবে দেবারতি তখন মদ খেয়েছিল, একটু টিপসি অবস্থায় ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, কনফারেন্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও যেন কিছু না করে। যাই হোক, ও আমার কথায় রাজি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছে, ওর সেই সিক্রেট ফাস হলে বাংলা ক্রাইম ফিকশনের মারাত্মক ক্ষতি হবে, একটা বিরাট সেটব্যাক হবে। ষাটের দশক থেকে এই সাহিত্য নিয়ে কম লড়াই হয়নি। দেবারতি সেদিনের মেয়ে ও সে-সব লড়াইয়ের কী জানে! সুতরাং, আমি ভেবেছিলাম, পরে ওকে বুঝিয়ে নিরস্ত করব। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম কোথায়!

ওর এই সিক্রেট জেনে ফেলার খবরটা আপনি ছাড়া আর কে কে জানতেন? এসিজি প্রশ্ন করলেন।

ভাস্কর রাহা মাথা ঝুঁকিয়ে বসে ছিলেন, মুখ তুলে বললেন, বোধহয় সবাই জেনে ফেলেছিল। কারণ, ও খুব একটা রাখো-ঢাকো মেয়ে ছিল না। তা ছাড়া ওর ভয়ডরও কম ছিল। যেমন, কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে-মানে, কালও একরকম হাটের মাঝে ওর সেই সিক্রেট নিয়ে প্রেমময় চৌধুরিকে একটু হিন্ট দিয়েছিল। ভারি অদ্ভুত হিন্টস –।

কৌতূহল ফুটে উঠল অশোকচন্দ্রের উজ্জ্বল চোখে? কী হিন্স? শুধু দুজন লেখকের নাম–পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেস।

এসিজি রঘুপতি যাদবের দিকে তাকালেন। রঘুপতি প্যাড আর পেন নিয়ে নোট নিতে ব্যস্ত ছিল। মুখ তুলে এসিজির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাথা হেলিয়ে জানাল, সে লিখে নিয়েছে।

এই হিন্টসের মানে?

কী জানি! বলতে পারব না। দেবারতি কখন যে সিরিয়াসলি কথা বলত আর কখন ঠাট্টা করত, সেটা বোঝা মুশকিল ছিল।

আচ্ছা, এই কনফারেন্সের শুরুর দিন থেকে দেবারতি মানিকে যেভাবে দেখেছেন, যা যা ও করেছে, বলেছে—সেগুলো একটু গুছিয়ে বলুন তো।

চুরুট নিভে গিয়েছিল। ছাই ঝেড়ে ফেলে সেটাকে পকেটে রেখে দিলেন রাহা। ছোট্ট করে গলাখাঁকারি দিয়ে নীচু গলায় অত্যন্ত ধীরে সব বলে গেলেন। অশরীরী দেবারতি মানি আবার চলেফিরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে—অন্তত ভাস্কর রাহার চোখের সামনে।

ভাস্কর রাহার কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়েছেন এসিজি। ফুরিয়ে আসা সিগারেটটা খুঁজে দিয়েছেন টেবিলের অ্যাশট্রেতে। তারপর মাথা নীচু করে একমনে শুনে গেছেন ভাস্করের কথা।

রাহার কথা শেষ হল একসময়। রত্নাবলী চোখ ঢেকে বসে রইলেন। রূপেন মজুমদার দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলেন। আর উৎপলেন্দু কেমন এক অস্বস্তি অনুভব করছিলেন।

মিস মানি আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন?

প্রশ্নটা করেছে রঘুপতি যাদব। দেবারতির শেষ লেখায় ইন্টারভিউর ব্যাপারে একটা ইঙ্গিত ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, রঘুপতির সন্দেহভাজনের তালিকায় প্রথম স্থানটি এখনও পর্যন্ত কে দখল করে রয়েছে।

রাহা মুখ তুলে রঘুপতিকে দেখলেন। দেখে যতটা আই কিউ.র মালিক বলে মনে হয় আসলে তার চেয়ে বেশি।

শান্ত স্বরে ভাস্কর রাহা বললেন, হ্যাঁ, কাল লাঞ্চের সময় ও আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল। তখন আমরা একেবারেই মামুলি কথাবার্তা বলেছি। কারণ, দেবারতি সময়-সুযোগ পেলেই আমার ইন্টারভিউ নিত। একটু থেমে আবার মুখ খুললেন? তবে দেবারতি আমার একার ইনটারভিউ নেয়নি। ও আমাকে বলেছিল, আমাদের দশজন লেখক-লেখিকার ইন্টারভিউ ও নেবে। তারপর সবগুলো মিলিয়ে একটা স্টোরি করবে ওর কাগজে।

সহযোগিতা করার জন্যে ধন্যবাদ, ভাস্করবাবু, এসিজি বললেন, তবে এবার আপনাকে লাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করব। আপনারা গোয়েন্দা কাহিনির লেখক সুতরাং, বলতে গেলে আপনারা নিজেরাই এক-একজন গোয়েন্দা। যেমন, আপনার গোয়েন্দা সুরজিৎ সেন। দেবারতি মানিকে কেমন করে খুন করা হয়েছে সেটা আমি সুরজিৎ সেনের কাছে জানতে চাই। আশা করি আপনি এ-আর্জিটুকু মঞ্জুর করবেন।

অশোকচন্দ্র গুপ্তের কথা বলার ঢঙে কৌতুক ছিল বটে, কিন্তু ঠাট্টা অথবা ব্যঙ্গ ছিল না।

সুতরাং রাহার চওড়া কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়ল। সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে কয়েক মিনিট সময় নিলেন। সচেতনভাবেই তিনি ইয়ান ফ্লেমিং-এর জেমস বন্ড আর ড্যাশিয়েল হ্যাঁমেটের গোয়েন্দা স্যাম স্পেডের আদলে সৃষ্টি করেছেন সুরজিৎ সেনকে। অধ্যাপক অশোকচন্দ্র গুপ্ত যে সুরজিৎ সেনকে মনে রেখেছেন সেটা লেখকের পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়। সামান্য হেসে ক্রাইম কাহিনির অসামান্য লেখক থেমে-থেমে পেশ করলেন সুরজিৎ সেনের সমাধান।

সুরজিতের মনে প্রথম যে-প্রশ্নটা জাগত সেটা হল : এ-হোটেলের সব ঘরের লক একই চাবি দিয়ে খোলা যায় না তো! কারণ–।

সরি, জনাব, রাহাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠেছে ইন্সপেক্টর যাদব, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজারের কাছ থেকে আমরা ইনফরমেশন নিয়েছি। নো মাস্টার কি। আপনার কেতাবি জাসুসকে অওর একবার কৌশিশ করতে হবে, মিস্টার রাহা।

রাহা রঘুপতি যাদবের দিকে একবার তাকিয়েছেন, তারপর ঠোঁটের এক চিলতে হাসি বজায় রেখেই বলেছেন, তা হলে সুরজিতের প্রথম অনুমান ভুল হল। দ্বিতীয় চেষ্টা হিসেবে বলা যেতে পারে, খুনি কাজ সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে শক্ত কোনও তার বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে তিনশো আট নম্বরের দরজা লক করে দেয়।

মাথা নাড়লেন এসিজি ও সরি, ভাস্করবাবু। কাল রাতে আমি আর রঘুপতি হাতেকলমে সে-চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। তা ছাড়া আতসকাঁচ দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমরা দেবারতি মানির দরজার লকের গায়ে সন্দেহজনক কোনও আঁচড়ের দাগ দেখতে পাইনি।

ভাস্কর রাহা একটু অপ্রস্তুত হলেন। তাঁর গালে রক্তের উচ্ছ্বাসের ছোঁওয়া লাগল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, ধরা যাক, দেবারতিকে খুন করার পর খুনি দরজার চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর দরজা লক করে চাবিটা…বাইরের টেরাস থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল দেবারতির ঘরের জানলা দিয়ে। তখনই চাবিটা গিয়ে পড়ে জানলার কাছে রাখা টেবিলের ওপরে।

কিন্তু কথা শেষ করেই আপনমনে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন ভাস্কর রাহা। বললেন, নাঃ, এই সলিউশনটা বড্ড কষ্টকল্পিত…

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, রত্নাবলী বলে উঠলেন তড়িঘড়ি করে, নীচের টেরাস থেকে পাঁচতলার ঘরের জানলা দিয়ে চাবি ছুঁড়ে দেওয়াটা হয়তো অসম্ভব নয়, তবে অবাস্তব। তা ছাড়া কেউ দেখে ফেলার ভয়ও রয়েছে। বিশেষ করে মেয়েটা নীচে পড়ার সময় যখন অমন সাঙ্ঘাতিক একটা শব্দ হয়েছে।

কারেক্ট অবজারভেশন, মিসেস মুখার্জি, বললেন অশোকচন্দ্র, সুতরাং সুরজিৎ সেন হার মানলেন। হাসলেন তিনি । তবুও সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, ভাস্করবাবু।

একমাত্র কাতিলই জানে কীভাবে সে মেয়েটাকে কোতল করেছে। ভাবল রঘুপতি। আর জানলেও স্যারের কথায় সে থোড়াই অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা বলবে! বরং উলটোপালটা আজগুবি কোনও থিয়োরি ঝটপট বাতলে দেবে।

.

০৭.

সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটা নতুন সিগারেট ধরালেন এসিজি। এভাবেই পুরোনোরা পুড়ে ছাই হয়–নতুন আসে তার শূন্যস্থান পূরণ করতে। দেবারতির জায়গাও কেউ একজন দখল করে নেবে। কিন্তু ওর মা? ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এসিজি সংক্ষেপে যতটুকু জেনেছেন, তাতে দুঃখ হয়। ওঁর লড়াই কখনও বিশ্রাম পেল না। স্বামী আর একমাত্র মেয়ের শ্মশানে ওঁকে শ্মশানবন্ধু হতে হল। আর বেঁচে থাকার জন্য এখনও ওঁকে নীল আলোয় শরীর দুলিয়ে গান গেয়ে সকলের মনোরঞ্জন করতে হবে।

ঘরের প্রত্যেকেই অশোকচন্দ্রের কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কয়েক মিনিট একমনে সিগারেটে টান দিয়ে তিনি ইশারায় রঘুপতি যাদবকে কাছে ডাকলেন। যাদব তার হাতের কাগজপত্র একটা সোফায় নামিয়ে রেখে পেন পকেটে গুঁজে এগিয়ে এল এসিজির কাছে।

তুমি লালবাজারে ফোন করে দেবারতি মানির পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি রেডি করার জন্যে একটু তাগাদা দাও। আজ রাতের মধ্যেই পেলে ভালো হয়। বুঝতেই পারছ, সুপ্রভাত পত্রিকা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আর শোনো, লাঞ্চের পর আমরা দশজন রাইটারের দশটা রুম একটু ঘুরেফিরে দেখব।

আমাদের রুম সার্চ করবেন? রূপেন মজুমদার আহত স্বরে জিগ্যেস করলেন।

অশোকচন্দ্র তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, এটাকে ঠিক সার্চ বলা যায় না। কারণ, কী খুঁজতে হবে সেটাই আমার জানা নেই।

রঘুপতি যাদব ঘরের টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে রিসেপশনে লালবাজারের লাইন চাইল।

রত্মাবলী অশোকচন্দ্রকে দেখছিলেন। বয়েসে তার চেয়ে হয়তো দু-চার বছরের ছোটই হবেন, কিন্তু কী অদ্ভুত পরিশ্রম করতে পারেন!

এছাড়া আরও একটা ব্যাপার তাকে অবাক করছিল। এরই মধ্যে কতরকম তথ্য জোগাড় করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। সব তথ্য খতিয়ে দেখে একটা তত্ত্বে সেগুলোকে খাপ খাওয়াতে হবে। তবেই মিলবে অঙ্কের উত্তর। তখন উনি নিষ্ঠুর তর্জনী তুলে ধরবেন দশজনের মধ্যে একজনের দিকে। অশোকচন্দ্রকে দেখে রত্মাবলী কেমন এক ভরসা পাচ্ছিলেন। উনি নিশ্চয়ই পারবেন বেচারি মেয়েটার খুনিকে ধরতে। কিন্তু করঞ্জাক্ষ রুদ্র হলে কি পারত?

ভাস্কর রাহা উসখুস করছিলেন। হঠাৎই যেন ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হত।

এসিজি বোধহয় ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। ভাস্কর রাহার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনি ইচ্ছে হলে এখন যেতে পারেন, ভাস্করবাবু। পরে দরকার হলে আমি দুশো আট নম্বর ঘরে যাব। আপনি অনেক তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

রত্নাবলী এইবার জিগ্যেস না করে পারলেন নাঃ কিন্তু এইসব তথ্য আপনি মাথায় রাখেন কী করে?

রত্নাবলীর দিকে তাকিয়ে মোলায়েম করে হাসলেন এসিজি ও মিসেস মুখার্জি, এ-ব্যাপারে আমার পদ্ধতি হুবহু শার্লক হোমসের মতো। অন্তত সেভাবে চেষ্টা করি। যেসব তথ্য আমার কোনওদিনও কাজে লাগবে না, সেগুলো আমি মন থেকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করি। যেমন, আলু-পেঁয়াজের দাম, কলকাতার জনসংখ্যা, কিংবা চাঁদের মাটিতে প্রথম কোন মহাকাশচারী পা দিয়েছিলেন। এর কারণ, আমাদের ব্রেন হল একটা ছোট্ট ঘরের মতো। সেটা আমরা পছন্দসই ফার্নিচার মানে, তথ্য দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারি। সুতরাং সব তথ্যই যদি সেখানে গাদাগাদি করে ঢাকাই তাহলে দরকারি তথ্যটা সেই ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে। তখন সেটা কাজের সময় খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। সেইজন্যে আমি খুব হিসেব করে সেই ঘরে নতুন ফার্নিচার ঢোকাই। কারণ, ঘরের দেওয়ালগুলো তো আর রবারের নয় যে চাইলেই জায়গা বেড়ে যাবে! বরং একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন—ব্রেনে তথ্য সঞ্চয় করতে করতে এমন একটা সময় আসবে, যখন নতুন কোনও তথ্য ঢোকানো মানেই হচ্ছে পুরোনো কোনও তথ্যকে বিসর্জন দেওয়া। অর্থাৎ, নতুন তথ্যটা মনে থাকবে বটে, কিন্তু পুরোনোটা কমপ্লিটলি ভুলে যাবেন।

দারুণ বলেছেন, মিস্টার গুপ্ত—প্রশংসার সুরে বললেন রূপেন মজুমদার।

বিনয় করে হাসলেন অশোকচন্দ্র : আগেই তো বলেছি, এটা আমার কথা নয়, গোয়েন্দা সম্রাট শার্লক হোমসের কথা। আ স্টাডি ইন স্কারলেট-এ আছে। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই পড়েছেন হয়তো ভুলে গেছেন।

না, না, আমি পড়িনি। রূপেন মজুমদার তাড়াতাড়ি তার মৌলিকত্ব জাহির করলেন।

অশোকচন্দ্র বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি তাহলে উঠছি, বলে উঠে দাঁড়ালেন ভাস্কর।

এসিজি আবার তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

উৎপলেন্দু সেনও বোধহয় উঠতে যাচ্ছিলেন, এসিজি তাকে বাধা দিলেন : আপনি বসুন, মিস্টার সেন। আপনার সঙ্গে তো এখনও সেরকম কথা বলাই হয়নি। উৎপলেন্দু বসে পড়লেন। তাঁর চোখেমুখে অস্বস্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। খানিকটা অসহায়ভাবে তিনি ভাস্কর রাহার চলে যাওয়া দেখলেন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি উৎপলেন্দু সেনকে প্রথম প্রশ্ন করলেন, দেবারতি মানিকে কীভাবে খুন করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

বোধহয় কেউ ধাক্কা-টাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। দায়সারা উত্তর দিলেন উৎপল। তারপর আবার বললেন, আসলে অনেকদিন আমি কোনও গোয়েন্দা গল্প লিখিনি। কারণ, গোয়েন্দা গল্প লিখতে হলে একটু বড় জায়গা দরকার–ততটা জায়গা কোনও পত্রিকা দিতে চায় না। মানে, আমাকে দিতে চায় না।

উৎপলের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন তেতো হতাশা সূক্ষ্মভাবে যেন অনুভব করতে পারলেন অশোকচন্দ্র। কিছুক্ষণ কী ভাবলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে একটা কথার সরাসরি জবাব দিন…দেবারতিকে কে খুন করেছে?

কে খুন করেছে সেটা উৎপলেন্দুর জানা নেই। কিন্তু যে-ই করুক, কাজটা কি খুব একটা খারাপ হয়েছে। তা ছাড়া, সত্যিই যদি উৎপলেন্দু সেন খুনিকে চিনতেন, তাহলেও কি এ-প্রশ্নের জবাবে ফস করে বলে দিতেন খুনির নাম! মনে মনে হাসলেন তিনি। মুখে বললেন, কে খুন করেছে। জানি না। তবে আমরা যখন গোয়েন্দা গল্প লিখি তখন এমন কাউকে খুনি সাজাই যাকে কেউ কখনও খুনি বলে ভাবতেই পারবে না। ওই দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড-এর মতো।

বেশ বলেছেন, ছোট্ট করে মন্তব্য করলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। তারপর ও দেবারতি মানি আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিল?

হ্যাঁ, নিয়েছিল। লেখালিখি নিয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্ন।

ও.কে.। থ্যাংক ইউ, উৎপলেন্দুকে ধন্যবাদ জানালেন সহযোগিতার জন্য। তারপর রূপেন মজুমদারকে লক্ষ করে একই কথা জানতে চাইলেন ও কীভাবে খুন করা হয়েছে দেবারতিকে।

রূপেন মজুমদার জিভের ডগা দিয়ে মাড়ির দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন। এসিজির প্রশ্নে ছোট্ট করে একটা জড়ানো শব্দ করলেন। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা সুপুরির কুচি বের করে মুখে ছুঁড়ে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড চোয়াল নেড়ে বললেন, মিস্টার গুপ্ত, কোনও সাহেবী আইডিয়া ধার করে আমি আপনাকে কিছু বলব না—যা বলব সবই নিজের। আমার প্রথম বই ডাকিনীর হাতছানি তে এই ধরনের একটা খুন ছিল। একটা বন্ধ ঘরের ভেতরে একজন যুবতী নিহত হয়ে পড়ে আছে। তার বুকে ছুরির গভীর ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু দরজায় খিল আঁটা আর জানলায় বেশ ঘন মোটা মোটা গরাদ। মেয়েটি মরে পড়ে আছে জানলা থেকে অনেক দূরে। মানে, একটু আগে আপনি যা বললেন ইম্পসিবল প্রবলেম। কিন্তু ওই জন ডিকসন কার নামে কোনও এক সাহেবের কথা আপনি যে বললেন, তার বই পড়া তো দুরের কথা, তাঁর নামই আমি কোনওদিন শুনিনি। আমার ব্যাপারটা সবসময়েই ওরিজিন্যাল। নইলে আমাদের একটা হ্যাংলাপনা আছে দেখবেন, সাহেবদের কথা গদগদ হয়ে মেনে নেওয়া। সাহেব বলিয়াছেন, তাই উহা সত্য...।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন রূপেন মজুমদার। আড়চোখে রত্নাবলী আর উৎপলেন্দুকে একবার দেখে নিয়ে আবার বললেন, স্পষ্ট কথা বললাম বলে কিছু মনে করবেন না জানেন, সাহেবদের লেখার প্রভাবের জন্যেই আমাদের বাংলা ক্রাইম ফিকশানকে কেউ আমল দিতে চায় না। ভাবে, আমরা সবাই চোর। সেইজন্যেই তো আমার সব বইতেই লেখা থাকে, কাহিনিটি সম্পূর্ণ মৌলিক—।

রত্নাবলী বেশ বুঝতে পারছিলেন, রূপেন মজুমদারের কথার খোঁচাটা তাকে লক্ষ করে যতটা উৎপলেন্দুকে লক্ষ করে ততটা নয়। আর উৎপলেন্দু হতবাক হয়ে রূপেন

মজুমদারের নির্লজ্জ ঢাক পেটানো দেখছিলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন লোকের সামনে কেমন অনায়াসে নিজেকে জাহির করছেন। আজকের যুগে নির্লজ্জতাও বোধহয় একটা আর্ট।

রূপেন মজুমদারের অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বিরক্ত হচ্ছিলেন এসিজি। কিন্তু পেশেন্টদের ওপর বিরক্ত হওয়া নার্সদের ধর্ম নয়। কারণ গূঢ় রোগলক্ষণগুলো জানতে হলে ধৈর্য ধরে পেশেন্টের সব কথা শুনতে হয়। সুতরাং মজুমদারের কথা শেষ হতেই তিনি জিগ্যেস করলেন, কিন্তু আপনার ওই প্রথম বইতে যুবতীটি খুন হয়েছিল কীভাবে?

ডাকিনীর হাতছানি আপনি পড়েননি? অবাক হওয়া হাসিতে মুখ ভরিয়ে রূপেন বললেন, ঠিক আছে, আপনাকে এক কপি প্রেজেন্ট করব। আমার ঘরে বই আছে। তারপর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রঘুপতি যাদবের দিকে তাকিয়ে : আপনাকেও এক কপি দেব। পড়ে দেখবেন। এমন নতুন সব আইডিয়া দিয়েছি যে, তাজ্জব হয়ে যাবেন।

রঘুপতি যাদব পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সকলের কথা শুনছিল। কোনও মন্তব্য করেনি। কিন্তু রূপেনের কথার পর সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। রূঢ় গলায় বলে উঠল, আপনার ওই কিতাবের মতো আপনার ব্রেনটাও কি ঘরে জমা করে এসেছেন, মজুমদারবাবু? স্যার আপনাকে তখন থেকে কী জিগ্যেস করছেন তা আপনার মাথায় ঢুকছে না?

রূপেন মজুমদার চোখের পলকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে এসিজিকে বললেন, খুনটা হয়েছিল জানলা দিয়ে। ছুরির হাতলে নাইলনের দড়ি বেঁধে খুনি ছুরিটা ছুঁড়ে মেরেছিল মেয়েটাকে লক্ষ করে। তারপর কাজ হাসিল হয়ে যেতেই দড়ি টেনে ছুরিটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বাঃ, কায়দাটা বেশ নতুন তো! ডিকসন কারের কোনও গল্পে এরকম ইনজিনিয়াস মোডাস অপার্যানডাই-এর কথা বলা নেই– প্রশংসা করলেন রত্নাবলী। কিন্তু উৎপলেন্দুর

যেন মনে হল, ওঁর প্রশংসার মধ্যে কোথায় যেন বিদ্রুপের তীর লুকোনো রয়েছে।

প্রশংসায় রূপেন মজুমদার খানিকটা বেপরোয়া হয়ে ঢাক পেটাতে শুরু করলেন? তাহলেই দেখুন, ওই সাহেবের চেয়ে বুদ্ধিতে আমি কিছু কম যাই না! তা ছাড়া আমার গল্পে এরকম গরাদ ছাড়া জানলা আর দু-দিক থেকেই লক করা যায় এমন সাহেবী দরজা ছিল না। এসব থাকলে খুনের কায়দা তৈরি করা তো জলের মতো সহজ! নাটকীয়ভাবে একটু থামলেন রূপেন মজুমদার। তৃপ্তির অহঙ্কার আর এক চিলতে হাসি তার চোখেমুখে। পাতলা হয়ে আসা মাথার চুল ডান হাতের আলতো ছোঁয়ায় ঠিক করে নিলেন। তারপর সরাসরি তাকালেন এসিজির চোখে।

এসিজি বেশ বুঝতে পারছিলেন, অহঙ্কারে ভদ্রলোকের আলুথালু অবস্থা। অফিসে রূপেন মজুমদারের অধীনে যারা কাজ করেন তাঁদের হয়তো বাধ্য হয়ে ওঁর লেখা বই কিনতে হয়। আর অসহায়ভাবে সবিস্তারে শুনতে হয় একজন মৌলিক প্রতিভার নানান কৃতিত্বের কথা।

ওই জলের মতো সহজ ব্যাপারটা যদি দয়া করে আমাদের খুলে বলেন–, অশোকচন্দ্র বিনয়ের সুরে কথাটা বলেছেন বটে, কিন্তু সেটা যে পুরোপুরি বিনয় নয় তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

রূপেন মজুমদার নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, কেন, খুনি খুন করেছে, ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করেছে। তারপর চাবিটা ওই টেবিলের ওপরে রেখে জানলা দিয়ে পালিয়ে গেছে। এ-হোটেলের কোনও ঘরের জানলাতেই গরাদ নেই–ওটাই তো সাহেবি জানলায় সুবিধে।

গতকাল রাতে ঘটনাস্থলে এসে সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখেছেন এসিজি। রূপেন মজুমদার যত সহজ ভাবছেন, এই ঘরের জানলা দিয়ে পালানো তত সহজ নয়। কারণ জানলার

বাইরে কার্নিশ বলতে কিছু নেই। তা ছাড়া জানলা দিয়ে পালাতে গেলে নীচে দাঁড়ানো লোকজনের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

যেসব কিছু না বলে এসিজি ধন্যবাদ জানালেন মৌলিক রহস্য-লেখককে।

উৎপলেন্দু অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন কিছু একটা বলার জন্য। এখন ফাঁক বুঝে কথা বললেন, রূপেনবাবু, একটা কথা তখন থেকে ভাবছি। আপনার ডাকিনীর হাতছানি-তে খুনি ওই নাইলনের দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছুরিটা ঠিকমতো টিপ করে ছুঁড়তে পারল!

রূপেন মজুমদার বিজ্ঞের মতো হেসে চটপট জবাব দিলেন, খুনি তো সার্কাসের নাইফ থ্রোয়ার ছিল, সেইজন্যেই ব্যাপারটা ইজি হয়ে গেছে। আপনাকে তো ডাকিনীর হাতছানি বই দিয়েছিলাম, পড়েননি?

উৎপলেন্দু একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার ভাইপোকে পড়তে দিয়েছিলাম। ওর খুব ভালো লেগেছিল। তারপর ও যে কাকে পড়তে দিল... রূপেন মজুমদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। এসিজিকে লক্ষ করে বললেন, আমি একটু উঠব। ঘরে যেতে হবে। কাজ আছে।

একটা কথা, মিস্টার মজুমদার। কাল বা পরশু দেবারতি কি আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিল?

ভাস্কর রাহার মন্তব্য মনে পড়ল রূপেন মজুমদারের। তাই বললেন, হ্যাঁ, পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলেছিল। একেবারেই, মামুলি ইন্টারভিউ।

ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন, এসিজি রূপেন মজুমদারকে অনুমতি দিলেন। তখন উৎপলও অস্পষ্টভাবে এসিজিকে কী যেন বললেন। তারপর রূপেন মজুমদার আর উৎপলেন্দু সেন রওনা হলেন ঘরের দরজার দিকে।

যেতে-যেতে রূপেন উৎপলেন্দুকে বলছিলেন, বুঝলেন, ওয়ার্কশপের জন্যে একটা নতুন আইডিয়া ভেবেছি। এমন লিখব না, সাহেবদেরও তাক লেগে যাবে…।

ভদ্রলোকের সাহেব নিয়ে অবসেশনটা এল কোথা থেকে? ভাবছিলেন উৎপলেন্দু। ওঁর অফিসের ডিরেক্টরদের মধ্যে দু-তিনজন সত্যিকারের সাহেব এখনও আছে বলে ওঁর মুখেই শুনেছেন। অবসেশনটা সেই কারণে বলে তো মনে হয় না। তাহলে কি রূপেন মজুমদার আগের জন্মে-স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন?

.

অশোকচন্দ্র গুপ্ত আবার নতুন সিগারেট ধরিয়েছেন। ঘরের সিলিং-এর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। এর মধ্যেই অনেক তথ্য পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সব তথ্যের সঠিক অর্থ এখনও স্পষ্ট নয়। তার জন্য কিছুটা হোমওয়ার্ক দরকার।

তিনি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছিলেন। রঘুপতি যাদব দূর থেকে তার স্যার কে লক্ষ করছিল। সে গোয়েন্দা কাহিনির তেমন ভক্ত না হলেও এটুকু বুঝতে পারছে, স্যারের এবারের লড়াইটা অন্যরকম। যাঁরা কাগজে-কলমে সকাল বিকেল খুন করেন, সেরকম দশজন লেখকের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই। কাল রাত থেকে এখন, এই মুহূর্ত পর্যন্ত রঘুপতি কম নোট নেয়নি। সেগুলো ঠান্ডা মাথায় বসে খতিয়ে দেখা দরকার। দেবারতি মানি সুপ্রভাত-এর আপকামিং ক্রাইম জার্নালিস্ট ছিল। নেহাত কম বিখ্যাত ছিল না। আজকের সব কাগজেই ওর মারা যাওয়ার খবর ছাপা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনার মোড়কে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া এই খুনের সুপারফাস্ট সলিউশনের জন্য পলিটিক্যাল প্রেসারও আসতে শুরু করেছে।

অশোকচন্দ্রকে দেখে বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল। অতএব রঘুপতি যাদবও মোটামুটি দিশেহারা। তবে এটা ঠিক, আর দু-তিন দিনের মধ্যে যদি সে কাউকে অ্যারেস্ট করতে না পারে তাহলে প্রচুর ঝামেলা হবে, হইচই হবে।

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় কেমন এক টেনশনে ভুগছিলেন। উৎপলেন্দু আর রূপেন চলে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর ভীষণ একা একা লাগছে। ভুরুর কাছটা টনটন করছে। বোধহয় চশমার পাওয়ার পালটেছে। আর বুকের ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করছে। গত সপ্তাহে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। এখন সেই ওষুধ চলছে। গাদা-গুচ্ছের ট্যাবলেট। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। দুপুরে সামান্য কিছু খেয়ে ওষুধ খেতে হবে। তারপর বিশ্রাম। আজ আর কনফারেন্সে যাবেন না। তাতে খুব একটা ক্ষতিও নেই। কারণ আজ তার শুধু শ্রোতার ভূমিকা। কিন্তু কেন যেন শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। এখন অশোকচন্দ্র তাঁকে কী জিগ্যেস করবেন কে জানে!

মিসেস মুখার্জি, এসিজি পায়চারি থামিয়ে ঘুরে তাকিয়েছেন রত্নাবলীর দিকে জানি, আপনার খুব ক্লান্ত লাগছে। তাই পাঁচ মিনিট কথা বলেই আপনাকে আমি ছেড়ে দেব। আপনার কাহিনির নায়ক গোয়েন্দা করঞ্জাক্ষ রুদ্রের নাম আজ সব পাঠকের মুখে মুখে ফেরে। আপনার খ্যাতি প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে গেছে। করঞ্জাক্ষ রুদ্র ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিক হলেও আসলে সে-বুদ্ধি আপনারই কাছ থেকে ধার করা। সুতরাং আপনার কাছেই আমি জানতে চাইছি, দেবারতি কীভাবে খুন হয়েছে।

রত্নাবলী একেবারে বালিকার মতো অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, যেন চাকরির ইন্টারভিউতে তাকে খুব শক্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। শাড়ির নীল পাড়ের কাছটায় আলতো করে নখের আঁচড় কাটতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর বিব্রতভাবে হেসে তিনি মিহি গলায় বলতে শুরু করলেন, মানে, এক্ষুনি হুট করে কিছু বলা সম্ভব নয়...তবে...ইয়ে, ভেবে দেখা যেতে পারে। আবার কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর ও ধরা যাক, খুনি দেবারতির সঙ্গে ওর ঘরে ছিল। আর, ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। একথা-সেকথা বলতে বলতে ওরা দুজনে ওই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর খুনি আচমকা ওকে এক ধাক্কা মেরে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় নীচে। খুনের ঠিক পরেই খুনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই টেবিলের আধখোলা বই বা কাগজপত্রের

দিকে ঠিকমতো খেয়াল করেনি। সোজা দরজা খুলে সে চলে এসেছে বাইরে। দরজায় চাবি দিয়ে চলে গেছে নিজের ঘরে।

লেকিন ওই টেবিলের ওপরে যে-চাবিটা পাওয়া গেল সেটা এল কোথা থেকে প্রশ্ন করেছে রঘুপতি।

ওর দিকে সরল চোখে তাকালেন রত্নাবলী। আলতো গলায় বললেন, খুনি একটা নকল চাবি তৈরি করে সেটা দিয়ে দরজা লক করে চলে গেছে। আর আসল চাবিটা রেখে গেছে ওই টেবিলের ওপরে।

অশোকচন্দ্র বেশ একটু হতাশভাবেই দেখছিলেন রত্নাবলীকে। ওঁর গল্প-উপন্যাসে করঞ্জাক্ষ রুদ্রের যে-ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সেই তুলনায় এই সমাধানটা যেন বড় সাদামাঠা। অবশ্য ডিকসন কারের বইতেও বন্ধ ঘরের রহস্যের এ-জাতীয় সাদামাঠা সমাধানই পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলেও...। বরং অবাস্তব হলেও রূপেন মজুমদারের ডাকিনীর হাতছানি-র সমাধান অনেক অভিনব।

এসিজি জিভ দিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ করলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন, ধন্যবাদ, মিসেস মুখার্জি। তবে আমার ধারণা, দেবারতি মানির খুনের ঘটনা ঘটে গেছে হঠাৎই। মানে, আগে থেকে কোনওরকম পরিকল্পনা খুনির ছিল না। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে তা হলে নকল চাবি তৈরি করার ব্যাপারটা খুব সলিড গ্রাউন্ডের ওপরে দাঁড়াচ্ছে না। একটু চুপ করে থেকে অস্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন, হয়তো দেবারতি মানির সিক্রেট যাতে ফাঁস না হয়, তার জন্যেই খুনিকে খুনটা করতে হয়েছে। ওই সিক্রেটটা জানতে পারলেই খুনের মোটিভ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রত্নাবলী কোনও কথা বললেন না। হঠাৎই ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। ভাবছিলেন, কখন শেষ হবে এই জিজ্ঞাসাবাদ? দেবারতিকে নিয়ে এত কথা এত আলোচনা

আর একটুও ভালো লাগছে না। নিজে খুন হয়ে মেয়েটা আমাদের কী বিপদেই না ফেলে গেছে!

আচ্ছা মিসেস মুখার্জি, এই কনফারেন্সে যেসব রাইটার এসেছেন তাদের কারও সঙ্গে মিস মানির ইশ্যু ছিল—মানে, ভালোবাসা ছিল? নীল আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছে। রঘুপতি।

এ-ব্যাপারে এসিজি গতকালই হোটেলের লোকজনের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাতে মোটামুটিভাবে একটা নাম তিনি পেয়ে গেছেন। তাই সে-বিষয়ে লেখকদের কাউকে আর কোনও প্রশ্ন করেননি। কিন্তু রঘুপতি বোধহয় সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চায়।

স্পষ্টতই রত্নাবলীর ফরসা মুখ লালচে হয়। কয়েক সেকেন্ড মাথা নীচু করে বসে রইলেন তিনি। তারপর আমতা-আমতা করে বললেন, সেরকমভাবে কিছু জানি না, তবে…রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে ওকে প্রায়ই দেখা যেত। আপনারা রঞ্জন দেবনাথকে বরং জিগ্যেস করে দেখবেন।

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর মন আর শালীনতাবোধ এসিজিকে অবাক করল। মাথার চুলের গোছায় টান মেরে তিনি বললেন, আপনার এই ডিসেন্সি নিয়ে কী করে আপনি ওইসব ভয়ঙ্কর পাচালো গোয়েন্দা কাহিনিগুলো লেখেন! ভাবতে অবাক লাগে, মিসেস মুখার্জি।

রত্নাবলী মুখ তুলে সরাসরি দেখলেন বৃদ্ধ হুনুরের দিকে। ধীরে ধীরে বললেন, মিস্টার গুপ্ত, আমরা, গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা, বোধহয় অদ্ভুত জাতের মানুষ। কাগজে-কলমে তারা অনায়াসে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটাতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে ওইসব ঘটনার মুখোমুখি হলে তারা আপাদমস্তক শিউরে ওঠেন। ফলে অদ্ভুত এক পরস্পর-বিরোধী মানসিকতা নিয়ে তাঁদের দিন কাটাতে হয়…।

না, না, সবাই তা নন, আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়লেন এসিজি। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, সবাই যে একরকম হয় না তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দেবারতি। ও খুন হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে, আপনাদের দশজন লেখকের মধ্যে অন্তত একজন কাগজ-কলম হোক কিংবা বাস্তব, দু জায়গাতেই অনায়াসে খুন করতে পারেন।

কী শকিং ভাবুন তো! রত্নাবলীর মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

শকিং–কিন্তু সত্যি। ঠান্ডা গলায় বললেন অশোকচন্দ্র। তারপর একটু সময় নিয়ে? দেবারতি কি কাল-পরশু আপনার কোনও ইন্টারভিউ নিয়েছিল, মিসেস মুখার্জি?

হ্যাঁ, কাল রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ও আমার ঘরে এসেছিল কথা বলতে। নেহাতই সাধারণ কথাবার্তা হয়েছিল। নাইনটি ওয়ান আর নাইনটি টু-তে পরপর দু-বছর রবীন্দ্র পুরস্কারের ফাইনাল লিস্টে আমার একটা উপন্যাসের নাম উঠেছিল। সেটা নিয়েই ও বেশি কথাবার্তা বলেছিল…আমার রিঅ্যাকশন জানতে চাইছিল।

ধন্যবাদ, মিসেস মুখার্জি। আপনি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বোঝাই যাচ্ছে। এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন। দরকার হলে পরে কথা বলব।

অতএব সভা শেষ।

লোহার পায়ে ঘরের কার্পেট অতিক্রম করে দরজার কাছে এলেন রত্নাবলী। মনে হল যেন দরজা পেরোলেই মুক্তি। কিন্তু কিসের হাত থেকে মুক্তি?

দরজা পেরিয়ে করিডর। তারপর শ্লথ পায়ে সিঁড়ির দিকে। তার ঘরটা পাঁচতলায়, না পাঁচশো তলায়? ভুরুর কাছটা এখনও ব্যথা করছে। আর মনে পড়ছে বেপরোয়া প্রাণোচ্ছল মেয়েটার কথা। কাল রাতে ইন্টারভিউ নেবার সময় ব্যক্তিগত আক্রমণই ছিল দেবারতির প্রধান হাতিয়ার। মনেই হচ্ছিল না, কনফারেন্সের প্রথম দিনে মেয়েটা তাঁর গল্পের অমন প্রশংসা করেছিল।

ঘড়িতে তখন কটা হবে? সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটা। নিজের ঘরে অনামিকার সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন, এমন সময় দরজার কলিংবেল বেজে উঠেছে।

অনামিকা উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখে দেবারতি মানি। একটা কালো কর্ডের প্যান্ট আর হলুদ টি-শার্ট পরে আছে। হাতে সিগারেট।

ওকে দেখে হাসল দেবারতি। একটু ভারি গলায় বলল, হাই–

অনামিকাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে এল দেবারতি। কোনওরকম ভূমিকা না করেই বলল, মিসেস মুখার্জি, আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে এলাম। আপনাদের সবার ইন্টারভিউ নিয়ে একটা স্টোরি করব।

রত্নাবলী হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আর অনামিকাকে বলেছেন, অনামিকা, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব। ওঁর সঙ্গে কাজটা একটু সেরে নিই।

অনামিকা আর দাঁড়ায়নি, চলে গেছে নিজের ঘরে। দেবারতি মেয়েটাকে দেখলেই ওর কেমন অস্বস্তি হয়। ওর সামনে থেকে সরে গিয়ে অনামিকা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এরপর শুরু হয়েছে ইন্টারভিউ।

টেলিফোন করে রুম সার্ভিসকে কফি দিতে বলেছেন রত্নাবলী। দেবারতির মদ খাওয়ার দুর্বলতা তিনি জানেন..সকলেই জানে। কিন্তু রত্নাবলী কফির কথাই বললেন, কফির বদলে হুইস্কি বললে সৌজন্যটা বদলে যেতে পারে তোয়াজে। অন্তত লোকে তাই ভাববে।

কাগজ-কলম আর জ্বলন্ত সিগারেট যুত করে বাগিয়ে প্রথম প্রশ্ন করল দেবারতি, আপনার লেখায় বিদেশি প্রভাব কতটুকু, মিসেস মুখার্জি?

হাসলেন রত্নাবলীঃ এমন নয় যে বলা যাবে চুরি করেছি। মানে, স্টাইল, ফর্ম এসবের প্রভাব আছে।

মেইনস্ট্রিম লিটারেচার ছেড়ে হঠাৎ এই অপরাধ-সাহিত্যে এলেন কেন?

ভালো প্রশ্ন করেছেন। কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলেন রত্নাবলীঃ ছোটবেলো থেকেই দেখতাম বাড়িতে মাসিক রোমাঞ্চ পত্রিকা রাখা হত। ওগুলো পড়তাম। ভালো লাগত। তারপর হঠাৎই, ১৯৪৬ নাগাদ, হাতে এল রহস্য রোমাঞ্চ–সম্পাদক বিমল কর–গত বিশ বছর ধরেই যিনি মেইনস্ট্রিম লিটারেচারের ফিনোমিনন। এই পত্রিকার গল্পগুলো পড়ে বেশ অন্যরকম লাগল। তখন আমার বয়স কত? এই উনিশ কি বিশ। মনে হল, লেখালিখি করলে এইরকম গল্প টক্সই লিখব। তারপরই আমি টুকটাক লিখতে শুরু করি। বছর তিন-চারেকের মধ্যে কয়েকটা গল্প ছাপাও হল মাসিক রোমাঞ্চ পত্রিকায়। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন রত্নাবলী। তারপর ও ঠিক মনে পড়ছে না...বোধহয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার তদন্ত নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন। তখন আমি মোটামুটি লিখি। ওই কাগজে আমার একটা গল্প বেরিয়েছিল।

মুচকি হেসে দেবারতি জিগ্যেস করল, এই সাহিত্য করেন বলে কোনওরকম ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগেন?

মিষ্টি শব্দ করে হাসলেন রত্নাবলী। বললেন, কেন, কমপ্লেক্সে ভুগব কেন? শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, কমলকুমার মজুমদার, সমরেশ বসু–এঁরা যখন রহস্য গোয়েন্দা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তখন আমার ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সটা আসবে কোথা থেকে! বরং সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স যদি আমার থাকত তাহলে সেটা খুব একটা দোষের হত না।

দেবারতি খুশি হয়ে হাসল। তারপর বলল, আপনার গল্পগুলো পড়ে আপনাকে যেরকম ইন্টেলিজেন্ট মনে হয় আসলে আপনি ততটা ইন্টেলিজেন্ট নন। আই. কিউ.-র ঘাটতি আছে। এর কারণ কী?

অপমানে মুখ লাল হয়ে গেছে রত্নাবলীর। কী জবাব দেবেন এই অভদ্র দোআঁশলা ক্রাইম জার্নালিস্টের অশালীন প্রশ্নের? রাগে কপালের পাশের শিরা দপদপ করে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞান হারাননি রত্নাবলী। সংযত গলায় বলেছেন, আপনার মনে হওয়ার ওপরে তো আমার হাত নেই।

হাসল দেবারতি মানিঃ কার পেছনে কখন কোন হাত থাকে কে জানে!

কী বলতে চাইছে মেয়েটা? কাল কনফারেন্সে এই মেয়েটাই না হাততালি দিয়ে তার গল্পের প্রশংসা করছিল!

দরজায় মিষ্টি সুরে কলিংবেল বেজে উঠল।

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল দেবারতি। দরজা খুলল। কফি এসে গেছে। উর্দি পরা বেয়ারা কফির কাপ সাজিয়ে দিয়ে গেল রত্নাবলীর সামনে, টেবিলের ওপরে।

দেবারতি ফিরে এল নিজের জায়গায়। কোনও কথা না বলে কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

আবার শুরু হল প্রশ্নঃ আপনার লেখায় এত পুরুষালী ভাব কেন?

কী করে জানব! এরকম কথা আগে কেউ বলেনি।

প্রেমময় চৌধুরির সঙ্গে এককালে আপনার সম্পর্ক ছিল?

হাসলেন রহস্য-সম্রাজ্ঞী? ছিল কেন, এখনও আছে–লেখক সম্পাদক সম্পর্ক।

ও– একটু থমকে গেল দেবারতি মানি। তারপর? তা হলে রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে সম্পর্কটা কিসের?

মেয়েটা আমার মনের ক্ষতচিহ্নগুলো বেছে নিচ্ছে একে একে। আচ্ছা, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন? রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তিনি কখনও অস্বীকার করেননি, এখনও করলেন না। সেকথাই স্পষ্ট করে বললেন সাংবাদিককে।

সিগারেটে গভীর টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল দেবারতি। তারপর থুতনি সামান্য উঁচু করে বলল, ধরুন, আপনাকে রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়া হল। তখন আপনার কেমন লাগবে?

হঠাৎ কেন যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল রত্নাবলীর মাথার ভেতরে। অপমানে লাল চোখমুখ নিয়ে কাঁপা হোঁচট খাওয়া গলায় বললেন, ধরুন, এক্ষুনি আপনাকে গলা ধাক্কা দিয়ে এই ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল। তখন আপনার কেমন লাগবে?

জ্বলন্ত সিগারেটটা কফির কাপে আচমকা ডুবিয়ে দিল দেবারতি। ছ্যাক করে শব্দ হল একটা। তারপর ঘাড় কাত করে তাকাল : নাঃ, আপনার আই, কিউ, সত্যিই কম! সেটা এখন আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছে।

রত্নাবলী আর থাকতে পারলেন না। সপাং করে মুখের মতো জবাব দিলেন, আই. কিউ. কী করে বাড়বে বলুন! আমার মা তো আর হোটেলে গান গাইত না আর বাবারও মদের দোকান ছিল না!

নীচুজাতের গালাগালিতে সাংবাদিকদের ধৈর্য হারালে চলে না, উঠে দাঁড়িয়েছে দেবারতি ও নমস্কার, মিসেস মুখোপাধ্যায়। আবার আমাদের দেখা হবে সময় মতো।

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায়নি দেবারতি। হনহন করে চলে গেছে দরজার বাইরে। আর যাওয়ার সময় দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেছে ঘরের দরজা।

এরই নাম সাধারণ কথাবার্তা! একটু আগে অশোকচন্দ্রকে তিনি সেরকমই বলেছেন।

আপনার এই ডিসেন্সি নিয়ে কী করে আপনি ওই সব ভয়ঙ্কর প্যাচালো গোয়েন্দা কাহিনিগুলো লেখেন! ভাবতে অবাক লাগে, মিসেস মুখার্জি।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত বিজ্ঞানী হতে পারেন, গোয়েন্দা হতে পারেন কিন্তু উনি জানেন না, বাইরে যে যা-ই হোক, মেয়েরা আসলে মেয়েই।

.

০৮.

হোটেল সিরাজ-এ এসিজি আবার যখন পা দিলেন তখন সন্ধে সাতটা।

দুপুর পর্যন্ত কাজ সেরে বিদায় নিয়েছিলেন এসিজি আর রঘুপতি। তারপর ঘণ্টা চার-পাঁচ যা সময় পেয়েছেন তার খানিকটা কেটেছে বিশ্রামে, আর বাকিটা খরচ হয়েছে হোমওয়ার্কের পিছনে। বিশেষ করে পাঁচকড়ি দে আর এডগার ওয়ালেসের লেখাগুলো খতিয়ে দেখার জন্য বেশ কয়েকটা লাইব্রেরিতে এসিজি টু মেরেছেন। এই দুই লেখকের নাম উচ্চারণ করে কোনও সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছে দেবারতি? নাকি পুরো ব্যাপারটাই ছিল ওর ফাজলামি? মনে-মনে যেন একটা রুবিক কিউব নাড়াচাড়া করছিলেন অশোকচন্দ্র। কিউবের ছটা পিঠে খুদে কিউবগুলো তাদের নানান রং নিয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। কিউবে ঠিকঠাক মোচড় দিয়ে খুদে কিউবগুলোকে নিয়ে আসতে হবে ঠিক ঠিক জায়গায়। তবেই পাওয়া যাবে হারানিধি নকশা। তখনই বোঝা যায়, কীভাবে খুন হয়েছে দেবারতি মানি, কে খুন করেছে ওকে, আর কেনই বা খুন করেছে।

রঘুপতি যাদব তার কাজ করে গেছে নির্ভুলভাবে। দশজন লেখকের দশটা ঘরের সঙ্গে যুক্ত বেয়ারাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সে একেবারে ভাজা-ভাজা করে ছেড়েছে। তারপর প্রত্যেকটা ঘরের নম্বর লিখে সে হাসপাতালের বেডের মতো প্রতিটি ঘটনার আনুমানিক টাইম-চার্ট তৈরি করেছে। সেই চার্ট সামনে রেখে বহুক্ষণ বুঁদ হয়ে ছিলেন এসিজি, কিন্তু রুবিক কিউবের নকশা মেলেনি।

হোটেলের রিসেপশনে তাঁর দেখা হয়ে গেল অনিমেষ চৌধুরির সঙ্গে। ভদ্রলোক কেমন যেন সন্দেহজনকভাবে এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করছিলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

এসিজিকে দেখেই তিনি একেবারে আঁতকে উঠলেন। কাছে এসে বললেন চাপা গলায়, আমি একটা সিক্রেট জানি–।

হোটেলের লবিতে রঙিন টিভি চলছে। সোফায় গা ডুবিয়ে অনেকেই সেই ছোট পরদায় মন দিয়ে বসে আছেন। লবির বাঁ দিকে একটা বড় প্যানেলে সিরামিক টাইলসের বিমূর্ত কাজ। তার ঠিক নীচেই সুদৃশ্য টবে সাজানো রয়েছে কয়েকটা গাছ।

অশোকচন্দ্রের পাঞ্জাবির হাত ধরে তাকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইলেন অধ্যাপক। এসিজি মনে-মনে প্রমাদ গুনলেন : আবার সিক্রেট।

পান চিবোতে চিবোতে অধ্যাপক এসিজির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, কাল রাত এগারোটা নাগাদ দেবারতি মানির ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল।

আপনি তখন কী করছিলেন? এসিজি জিগ্যেস করলেন। তিনি জানেন, অধ্যাপক চৌধুরির ঘর দেবারতির ঘরের ঠিক পাশেই।

শ-শ-শ। আস্তে ঠোঁটে আঙুল তুলে এসিজিকে সাবধান করলেন অনিমেষ। বললেন, সাবধানে বলুন, কেউ হয়তো ওভারহিয়ার করে ফেলতে পারে। তারপর চারপাশে একবার সতর্ক নজর বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আমি তখন একটা ক্লাস সেভেনের ইতিহাস বইয়ের প্রুফ দেখছিলাম…।

তারপর?

…ভাবছি কে ধাক্কা দিচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেলাম উৎপলেন্দু সেনের গলা। দেবারতি মানিকে ডাকছেন। কী যেন পরীক্ষা করার বিষয়ে কীসব বলছেন। ওঁর গলা জড়ানো ছিল,

তাই কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু মিস মানির উত্তরটা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি আমি। উনি একটু ধরা গলায় চেঁচিয়ে বললেন, মাতাল অবস্থায় এ-পরীক্ষা দেওয়া যায় না। যান, ঘরে গিয়ে বোতল নিয়ে শুয়ে পড়ুন। ব্যস, আর কিছু শুনতে পাইনি আমি। তবে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মাতাল অবস্থায় কোন পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। আমিও তো লেখাপড়া নিয়েই আছিজীবনে কম পরীক্ষা দিতে হয়নি। আর পরীক্ষার খাতাও কম দেখি না। মাতাল অবস্থায় যে-কোনও পরীক্ষাই শক্ত। তা উৎপলেন্দুবাবু রাত এগারোটায় দেবারতিদেবীর ঘরে কী পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন কে জানে!

ধন্যবাদ, অনিমেষবাবু, অশোকচন্দ্র অমায়িক হাসলেন ও আপনার মতো সহযোগিতা সকলের কাছ থেকে পেলে এতক্ষণে খুনি ধরা পড়ে যেত।

উৎপলেন্দুবাবু কিন্তু খুন করেননি– ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন অনিমেষ চৌধুরি, ওঁকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। আর…ওঁকে…ইয়ে, বলবেন না যে, এ-খবরটা আমি দিয়েছি একটু চুপ করে থেকে সময় নিয়ে ও যতই বন্ধু হোক, সত্যি কথা তো আর গোপন রাখা যায় না!

দেবারতি মানিকে জীবিত অবস্থায় শেষ কে দেখেছিল? ভাবলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। গতকাল আটটা নাগাদ রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ঘরে কফি নিয়ে গিয়েছিল একজন বেয়ারা। তখন দেবারতি ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। এরপর পৌনে নটা নাগাদ দেবারতিকে রূপেন মজুমদারের ঘরে ঢুকতে দেখেছেন জ্যোতিষ্ক সান্যাল। সেটাও ইন্টারভিউর ব্যাপার ছিল বোধহয়। তারপর, রাত সাড়ে নটা নাগাদ, ওকে দেখা যায় করিডোরে দাঁড়িয়ে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছে। আর সব শেষে পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাত দশটার সময় ঘরে ডিনার চেয়ে পাঠায় দেবারতি, সঙ্গে ড্রিঙ্কস। ব্যস, এইটুকুই।

কিন্তু এখন প্রফেসর চৌধুরি যা বলছেন তাতে উৎপলেন্দু সেনই বোধহয় দেবারতিকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছেন–মানে, ওর সঙ্গে কথা বলেছেন।

অশোকচন্দ্রের কপালের ভাঁজ ঘন হল। এখনও তো অনিমেষ চৌধুরিকে নিয়ে মোট ছজন লেখকের সঙ্গে তার কথা বলা বাকি। তাদের কথা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আচ্ছা, অনিমেষবাবু, দেবারতি কীভাবে খুন হয়েছিল বলতে পারেন?

থতমত খেয়ে গেলেন অধ্যাপক। তারপর সতর্ক চোখে এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে পানের পিক ফেললেন একটা টবের গোড়ায়। কয়েক সেকেন্ড ধরে উম্ম্ শব্দ করে অবশেষে বললেন, আমি জীবনে গোয়েন্দা গল্প লিখেছি একটাই ও আমার লেখা প্রথম গল্প। তারপর থেকে শুধু কল্পবিজ্ঞান আর...।

পিশাচতন্ত্র, তাই তো! হাসলেন এসিজি : আপনার লেখা আমি পড়েছি। বলতে দ্বিধা নেই, আপনি পিশাচসিদ্ধ। কিন্তু তবুও যদি আমাকে একটু সাজেশন দিয়ে সাহায্য করেন।

অধ্যাপক চৌধুরি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, এটা ভিনগ্রহের কোনও প্রাণীর কীর্তি নয়তো!

অশোকচন্দ্র অতি কষ্টে হাসি চাপলেন। কিন্তু তার মগজের ভেতরে একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল : অধ্যাপক অনিমেষ চৌধুরি হয় নিপাট ভালোমানুষ, নয়তো ধুরন্ধরের জাসু। তিনি স্বাভাবিক সুরে বললেন, থ্যাংক ইউ প্রফেসর, আমি তা হলে এবার আসি।

অধ্যাপক চৌধুরি হাত তুলে থামালেন এসিজিকে ও একটা কথা, মিস্টার গুপ্ত। আমি এই মার্ডারের ব্যাপারে কিছু তথ্য জোগাড় করেছি। ওগুলো আপনাকে দেব। যদি আপনার কোনও কাজে লাগে। কাজে লাগলে কিন্তু আমার হেল্প করার ব্যাপারটা সবাইকে বলবেন– মানে, অ্যানলেজ করবেন...।

এসিজি একটু অবাক চোখে ভদ্রলোককে দেখলেন। আশ্চর্য! এত নাম-ডাক খ্যাতি হওয়া সত্ত্বেও কী নির্লজ্জ খ্যাতিলোভাতুর।

এ-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব, বলে অধ্যাপককে এড়িয়ে গেলেন অশোকচন্দ্র।

অনিমেষ চৌধুরি তাকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এসিজি দ্রুতপায়ে পিঠটান দেওয়ায় সে-সুযোগ আর পেলেন না।

.

তিনতলায় ভাস্কর রাহার দুশো আট নম্বর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। এসিজি সপ্রতিভ পায়ে ঢুকে পড়লেন ঘরে।

জমজমাট আসরে বোধহয় কনফারেন্স চলছিল অথবা দেবারতির রহস্যময় মৃত্যুর ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল, এসিজিকে দেখেই নিমেষে সব স্তব্ধ। ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল পলকে।

ভাস্কর রাহা জ্বলন্ত চুরুট হাতে কিছু একটা বলছিলেন। তাকে ঘিরে বসে-দাঁড়িয়ে রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সেনগুপ্ত, রঞ্জন দেবনাথ আর প্রেমময় চৌধুরি। খানিকটা দূরে একা একটা সোফায় বসে উৎপলেন্দু সেন কী একটা লেখায় চোখ বোলাচ্ছেন। আর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে উঁকি মেরে কী যেন দেখছিল প্রীতম নন্দী। পাশে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিলেন কল্পনা সেন।

ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত, ভাস্করবাবু। আপনাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার কথা বলা বাকি আছে—সেটা এখন সেরে নিতে চাই। কথাগুলো বলে অশোকচন্দ্র গুপ্ত পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে কী যেন দেখলেন। তারপর ও রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সেনগুপ্ত, রঞ্জন দেবনাথ, জোতিষ্ক সান্যাল আর অর্জুন দত্ত। শেষ দুজন ঘরে নেই দেখতে পাচ্ছি…ভাস্করবাবু, যদি কাইন্ডলি ওঁদের একটু খবর পাঠান এ-ঘরে আসার জন্যে। কথা দিচ্ছি, খুব সংক্ষেপে কাজ সারার চেষ্টা করব।

ঘরের সবাই এখন অশোকচন্দ্রের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। বাস্তবের এই গোয়েন্দা এবার কী নির্দেশ দেবে কে জানে!

যাঁদের নাম বললাম তারা ছাড়া আর সবাই ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারেন। তবে ভাস্করবাবু অবশ্যই থাকবেন। কারণ, ওঁর ঘরে আমরা অতিথি।

ভাস্কর রাহা বিনীত হেসে অশোকচন্দ্রের দেওয়া সম্মান গ্রহণ করলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন টেলিফোনের দিকে।

প্রেমময় চৌধুরি সোফায় যেমন বসে ছিলেন তেমন বসেই রইলেন। তাঁর দু-চোখে কৌতূহল আর শিরা-বেরকরা আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে।

উৎপলেন্দু, প্রীতম আর কল্পনা চুপচাপ চলে যাচ্ছিলেন ঘর ছেড়ে। অশোকচন্দ্র উৎপলেন্দুর পিঠে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, আপনি থাকুন, উৎপলেন্দুবাবু। কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

উৎপলেন্দু ছোট্ট করে ঘাড় হেলিয়ে বসে পড়লেন একটা সোফায়।

ভাস্কর রাহা অশোকচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, খবর দিয়েছি–ওরা আসছে।

সিগারেটে শব্দ করে টান দিয়ে বারকয়েক কেশে উঠলেন অশোকচন্দ্র। তারপর গলা উঁচু পরদায় তুলে বললেন, ভাস্করবাবু, সবার কাছে প্রশ্ন আমার একটাই ও কীভাবে খুন হয়েছে দেবারতি মানি–।

এসিজি প্রশ্নটা প্রথমে রাখলেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখেমুখে বেশ দুশ্চিন্তার ছাপ। প্রথম দিনের হাসিখুশি ফুলবাবু চেহারাটি আর নেই। আজ তার বয়েস বোঝা যাচ্ছে।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাল্পনিক গোয়েন্দা শিবদাস সরখেল—অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি। সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরা পাইপ খাওয়া এই গোয়েন্দা যেন উত্তম-সুচিত্রার পুরোনো আমলের হিট ছবির বড়লোক নায়িকার রাশভারি পিতা। শিবদাস সরখেলের জনপ্রিয়তা করঞ্জাক্ষ রুদ্রের মতো মারাত্মক না হলেও মাঝারি গোছের বলা যায়।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকবার চোখ পিটপিট করলেন। চোখের কোনও দোষ নয়, মুদ্রাদোষ। তারপর বলতে শুরু করলেন, আমার গোয়েন্দা শিবদাস সরখেল হলে কী ভাবতেন সেটা বলি। সকলের মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ধরুন, দেবারতিকে খুন করার পর খুনি ওর চাবি দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে গোটা দরজাটাকে খুলে ফেলল ফ্রেম থেকে। দরজা লক করল চাবি দিয়ে। চাবি রেখে এল ঘরের ভেতরে, টেবিলে। তারপর বন্ধ দরজাটাকে ঠিকমতো সেট করে আবার স্ক্রু এঁটে বসিয়ে দিল দরজার ফ্রেমে।

চমৎকার! চমৎকার। প্রশংসার সাধুবাদ জানালেন এসিজি ও কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই হোটেলের দরজাগুলো বন্ধ অবস্থায় স্ক্রুর নাগাল পাওয়া যায় না। ওগুলো দরজা আর ফ্রেমের ভাঁজে লুকিয়ে পড়ে। শুধু এই হোটেলের কেন, বেশিরভাগ দরজার ডিজাইনই তাই। তবু আপনার মৌলিক চিন্তার জন্যে ধন্যবাদ।

উৎপলেন্দু সেন সোফা ছেড়ে উঠে ভাস্কর রাহার কাছে গেলেন। রাহার কাছ থেকে লাইটার চেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এবং সেই সুযোগে চাপা গলায় তাকে বললেন, মৌলিক চিন্তাই বটে! জন ডিকসন কারের ডেড ম্যান্স নক উপন্যাসে এ-নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ভাস্কর রাহা কোনও জবাব না দিয়ে উৎপলকে ইশারায় থামতে বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন জোতিষ্ক সান্যাল আর অর্জুন দত্ত। আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদব।

এসিজি ওঁদের তিনজনকেই স্বাগত জানালেন।

রঘুপতির হাতে একটা মোটাসোটা ফাইল ছিল। সেটা ইশারায় দেখিয়ে অশোকচন্দ্রকে একপাশে ডেকে নিল সে। ফাইলটা খুলে কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে কীসব বলল। সব শুনে অশোকচন্দ্র কিছুক্ষণ থম মেরে রইলেন। তারপর হাত তুলে ইশারা করে জানালেন, পরে হবে।

এরপর এসিজি বাকি চারজনকে একে-একে একই প্রশ্ন করলেন? কেমন করে খুন করা হয়েছে দেবারতি মানিকে? ওঁরা একে-একে উত্তর দিলেন।

অনামিকা সেনগুপ্তঃ আমার মনে হয়, খুন করার পর খুনি ওই ওয়ার্ডরোব অথবা বাথরুমের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। তারপর দরজা ভাঙাভাঙি হইচই সব মিটে গেলে সে লুকিয়ে সটকে পড়ে।

জ্যোতিষ্ক সান্যালঃ ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি সুইসাইড নয়তো! দেবারতি মানি হয়তো আমাদের নাকাল করার জন্যে একটা চরম মশকরা করে গেছেন!

অর্জুন দত্তঃ সরি, আমি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার কাছে ইমপসিল প্রবলেম হয়েই রয়ে গেছে।

সবার শেষে রঞ্জন দেবনাথ। ওর উত্তর এসিজিকে নাড়া দিল। এমনকি চমকে দিল আর সবাইকেও।

রঞ্জন দেবনাথ ইতিমধ্যেই বোধহয় ধাক্কা সামলে উঠেছে। এসিজি লক্ষ করেছেন, একটু আগেই ও গায়ে হাত ছুঁইয়ে অনামিকাকে ডেকে হেসে কী একটা বলেছে। তা ছাড়া এখন ওকে বেশ স্মার্ট সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল দুটো চোখে ঝিলিক মারছে আত্মবিশ্বাস।

অশোকচন্দ্র রঞ্জনের অন্ধকারে বাঘবন্দী খেলা, পায়ের শব্দ নেই এবং খুনির নাম অজানা–সবকটা লেখাই পড়েছেন। বেশ ভালো লেখা। এই সাহিত্যের প্রথম সারিতে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতা যে ওর আছে সেটা বোঝা যায়। ওর লেখা থেকে সবসময় একটা অদৃশ্য শক্তি ঠিকরে পড়ে চারিদিকে।

দরজা লক করা হয়েছিল ভেতর থেকে রঞ্জন সিরিয়াস সুরে বলল, আর খুনি পালিয়েছে। জানলা দিয়ে।

হাততালি দিয়ে উঠল রঘুপতি যাদব। আজ সকাল থেকে এই লক্ড রুম প্রবলেমের কত উদ্ভট সমাধান যে তাকে শুনতে হল তার কোনও হিসেব নেই। জন ডিকসন কারের বইতেও বোধহয় এত ভ্যারাইটি পাওয়া যেত না! রঘুপতি ক্রমেই ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছিল। সুতরাং এবার ও মুখ খুলল : সাবাশ, রাইটারসাহেব, বহত খুব। খুনি তা হলে খিড়কি দিয়ে উড়ে পালিয়েছে!

রঞ্জন দেবনাথ ঝটিতি ঘুরে তাকাল রঘুপতি যাদবের দিকে ঃ কেন, দড়ি বেয়ে সে নীচের তলার কোনও ঘরে পালিয়ে যেতে পারে না?

তা হলে, পরে দড়ির গেটটা কে এসে খুলে দিয়ে যাবে সেটাও একটা প্রশ্ন– এই মন্তব্য করেছেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

রঘুপতি হেসে বলল, কেন, ভগওয়ান এসে খুলে দিয়ে যাবেন! খুনির এই সঙ্কটে ওপরওয়ালা যদি তরস না খান, রহম না করেন, তা হলে তার ওপর বিসওয়াস রেখে ফায়দা কী?

ঘরের অনেকেই হেসে উঠলেন একথায়।

রঞ্জন দেবনাথের মুখ লাল হল। উত্তেজনা আর অপমানে সে এক পা এগিয়ে গেল রঘুপতির দিকে।

রঘুপতি ওকে সাবধান করল : রাইটার, ডোন্ট মেক এনি মিসটেক।

এসিজি হাত তুলে শান্ত করতে চাইলেন রঞ্জনকেঃ মিস্টার দেবনাথ, টেক ইট ইজি।

একটা ফুটো পয়সার ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে এর বেশি বুদ্ধি আমি আশাও করি না, রাগে থরথর করছে রঞ্জনের গলা : কারণ আই. কিউ. খুব বেশি হলে বোধহয় পুলিশে চাকরি দেওয়া হয় না। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত, আপনার কাছে থেকে এ-প্রশ্ন শুনব এটা ভাবিনি। মনে হয় আপনার থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেছে রিপেয়ার করতে হবে।

এসিজি একফোঁটাও বিচলিত হলেন না রঞ্জনের কথায়। শুধু ভাবলেন, দেবারতি মানির প্রেমিক এইবার আলট্রাহাই পোটেনশিয়ালের প্রদর্শনী শুরু করেছে। সুতরাং নতুন ফার্নিচার সংগ্রহের জন্য তিনি তার মাথার কুঠরিটাকে তৈরি রাখলেন।

কিন্তু এগিয়ে এল রঘুপতি যাদব। শক্তির মোকাবিলা করার অভ্যেস ওর অছে। চোয়াল শক্ত করে ও বলে উঠল, রাইটার কে বাঁচে! বি কেয়ারফুল! পুলিশি দাওয়াই পড়লে এরপর থেকে হাতের বদলে পা দিয়ে লিখতে হবে। হুঁঃ, মুন্না আমার বুদ্ধিতে নোবেল প্রাইজ জিতে নিয়ে এসেছে!

ভাস্কর রাহা অনেকক্ষণ মুখ বুজে থেকেছেন। আর পারলেন না। এসিজিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, অভদ্রতা ছাড়া কি খুনের তদন্ত করা যায় না, মিস্টার গুপ্ত? শুনেই দেখুন না রঞ্জন কী বলতে চায়।

এসিজি হাত তুলে শান্ত করলেন দুজনকেই। তারপর রঞ্জনকে লক্ষ করে বললেন, বলুন, মিস্টার দেবনাথ, কী বলতে চান আপনি।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করল রঞ্জন। তারপর নীচু গলায় বলতে শুরু করল, আমি বহুদিন লিখিনি ঠিকই, তবে তার বলে গর্ভ হয়ে যাইনি। দড়ি বেঁধে নেমে পড়ার অনেক টেকনিক আছে। তারই একটা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে পারে। এই টেকনিকে দড়িটাকে

ঠিক বাঁধার দরকার হয় না। ভারি এবং শক্ত কোনও জিনিসের ফাঁক দিয়ে দড়িটাকে ঠিক ছুঁচে সুতো পরানোর মতো করে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর তার দু-মাথা এক করে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় জানলা দিয়ে। সেই জোড়া দড়ি ধরে খুনি নেমে যেতে পারে নীচে মানে, নীচের কোনও ঘরে। তারপর দড়ির একমাথা ধরে টান মারলেই সেটা সড়সড় করে চলে আসবে খুনির হাতে। যেমন ধরুন– ভাস্কর রাহার খাটের কাছে এগিয়ে গেল রঞ্জন দেবনাথ। একটা কারুকাজ করা ভারী পায়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই পায়াটাকে ঘিরেও দড়িটা পরানো যেতে পারে কোনও অসুবিধে নেই। তখন ভগওয়ানকে আর তরস খেয়ে রহম করে কষ্ট করে দেবারতির ঘরে নেমে এসে দড়ির গেট খুলে দিয়ে যেতে হবে না–শেষ কথাটা বাঁকা চোখে রঘুপতি যাদবের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বক্তব্য শেষ করল রঞ্জন।

আপনাকে অভিনন্দন জানাই, মিস্টার দেবনাথ, এসিজি হাসিমুখে প্রশংসা উপহার দিলেন রঞ্জনকে, রূপেন মজুমদারও আমাদের জানলা দিয়ে খুনির পালানোর কথা বলেছিলেন, তবে এত সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। কিন্তু সমস্যা হল, দেবারতির ঘরের জানলা দিয়ে নেমে খুনি শেষ পর্যন্ত যাবে কোথায়! হয় সে খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়বে ভাস্কর রাহা কিংবা অনির্বাণ ঘোষের ঘরে...অথবা, সে নেমে পড়বে একেবারে নীচেভাস্করবাবুর গাড়ির ওপরে। এ তিনটে পথই সমান বিপজ্জনক কারণ, দেবারতির খুন নিঃশব্দে হয়নি। একটু দম নিয়ে মাথার চুলে বারতিনেক টান মেরে তারপর? সে যা-ই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। খোলা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। নীচ থেকে ভেসে আসছে। র‍্যাপ মিউজিক–হোটেল সিরাজ-এর রেস্তরাঁয় আমোদ-প্রমোদ চলছে।

এসিজি একটা সিগারেট ধরিয়ে রঞ্জন দেবনাথকে দেবারতির ইন্টারভিউর কথা জিগ্যেস করলেন। কিন্তু ওর উত্তরে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল একই প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, দেবারতি তার ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় শুধুই খোঁচা দিয়েছে, অপমান করেছে।

সন্ধের ঠিক মুখোমুখি জ্যোতিষ্ক সান্যালকে ধরেছিল দেবারতি। কনফারেন্স রুমের বাইরের করিডরে একপাশে সরে গিয়ে কথা বলেছিলেন ওঁরা।

আপনি লেখেন কেন, মিস্টার সান্যাল?

লিখতে ইচ্ছে করে, তাই।

কখনও মনে হয় না, শুধু-শুধু পাতার পর পাতা ভরিয়ে লিখে গিয়ে কী লাভ!

না, মনে হয় না।

চোখ ছোট করে, ঘাড় কাত করে হেসেছে রমণী। তারপর ও অনেক সিরিয়াস লেখক ভালো লিখতে চান, অথচ পারেন না। তাই তাঁরা লেখা ছেড়ে দেন। ভাবেন, এরকম লিখে কী লাভ! আর আপনাদের মতো লেখকদের লজিক ঠিক উলটো আপনারা ভাবেন, লিখলে কী-ইবা ক্ষতি। তাই না?

আপনি কি লেখকদের লেখার লাইসেন্স ইস্যু করার ঠিকে নিয়েছেন? জ্যোতিষ্ক বেশ বুঝতে পারছিলেন, ব্লাড প্রেশার ক্রমেই ওপর দিকে উঠছে।

দেবারতি মোটেই রেগে যায়নি। খিলখিল করে হেসে বলেছে, আপনি লেখা ছাপানোর জন্যে যতটা সিরিয়াস লেখার জন্যে মোটেই ততটা নন।

এইখানেই শেষ হয়েছে অপমানজনক সাক্ষাঙ্কার। কারণ, জ্যোতিষ্ক সান্যাল যবনিকা টেনেছেন অকস্মাৎ। দেবারতির সামনে থেকে হনহন করে চলে গেছেন।

অর্জুন দত্ত আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তাদের ইন্টারভিউ নেহাতই মামুলি ছিল।

এসিজির গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা গেল না, তিনি সে কথা কতটা বিশ্বাস করলেন। তার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল : সকলের সঙ্গে কথা বলে দেবারতি মানির চরিত্র যতটুকু

জানা গেছে, তাতে ও সাদামাঠা ইন্টারভিউ নেওয়ার মতো সাংবাদিক ছিল না। কিন্তু এখন তো আর সঠিক সত্য জানার উপায় নেই! তা ছাড়া দেবারতির ঘর থেকে পাওয়া শর্টহ্যান্ড নোট্‌সগুলো রঘুপতি এর মধ্যে ডিসাইফার করিয়ে ফেলেছে। তাতে খাপছাড়াভাবে অনেক কথা লেখা আছে। বিষয় : রহস্য-সাহিত্য আর রহস্য-সাহিত্যিক। তবে সেই নোটগুলো ঠিক কোন কোন লেখক সম্পর্কে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

মোটামুটি হতাশ হয়ে অনামিকা সেনগুপ্তকে ইন্টারভিউর কথা জিগ্যেস করলেন অশোকচন্দ্র। কিন্তু কোনও লাভ হল না। অনামিকাও মামুলি শব্দটার সাহায্য নিল।

অথচ সাক্ষাত্কারটা বোধহয় ঠিক মামুলি ছিল না, ভাবল অনামিকা।

আপনাকে লেখা ছাপানোর জন্যে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। মন্তব্য করেছিল দেবারতি মানি।

কেন? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল অনামিকা।

সম্পাদক, প্রকাশক, সিনিয়ার লেখক–দেখবেন, সবাই আপনাকে হেল্প করবে। আড়াল আর সুযোগ পেলে আপনার লেখা সামনে-পেছনে কারেকশন করে দেবে। প্রগলভ হাসি–যার সবটাই অর্থময় আপনাকে দেখতে-শুনতে খারাপ নয়। এ যেন ভগবানের দেওয়া লাখ টাকার চেক। শুধু ভাঙাবেন আর খাবেন। সেরকম কোনও পরিশ্রম করার দরকার নেই।

আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ ঠোঁট টিপে জবাব দিয়েছে অনামিকা।

তারপর অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আক্রমণ করেছে দেবারতি। আর শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউটার ডাকনাম হয়ে গেছে ঝগড়া।

কিন্তু এসব কথা কি প্রকাশ্যে বলা যায়। তা ছাড়া খুনের সঙ্গে কী-ইবা সম্পর্ক আছে এর।

ঘরে হাজির সাতজন লেখককে জরিপ করলেন অশোকচন্দ্র। আপাতভাবে সবাইকেই খুব শান্ত আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ওই প্রশান্ত অভিব্যক্তির আড়ালে চলেছে সর্বনাশা ঢেউয়ের উথালপাথাল।

অনিমেষ চৌধুরিকে ইন্টারভিউর কথা জিগ্যেস করা হয়নি—আর জিগ্যেস করে বোধহয় লাভও নেই। তবে অধ্যাপকের দেওয়া সূত্র ধরে উৎপলেন্দু সেনকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

রঘুপতিকে কাছে ডাকলেন এসিজি। চাপা গলায় বললেন, এখানকার কাজ শেষ হলেই তুমি ঘরগুলো সার্চ করার কাজ শুরু করে দাও। ঘরের নম্বর ধরে লিস্ট তৈরি হলে তারপর তোমার ওই টাইম-চার্টগুলো নিয়ে আর একবার বসব। তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে : আচ্ছা, পি.এম. রিপোর্টের খবর কী?

কাল পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ফোরেনসিক রিপোর্টও মিলে যাবে। রঘুপতি উত্তর দিল।

নিজের ঠোঁটে তর্জনী দিয়ে টোকা মারলেন এসিজি। মাথার পাকা চুলের গোছা টানলেন কয়েকবার। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, তা হলে কাল বাদ পরশু…সম্মেলনের শেষ দিন…।

শেষ দিন কী, গুপ্তাসাব?

ওই শেষ দিন আমাদেরও কাজ শেষ করতে হবে। পাখি ধরতে হবে, রঘুপতি, পাখি।

রঘুপতি যাদব একটু অবাক চোখে তার পুরোনো স্যার-কে দেখল।

এইবার উৎপলেন্দু সেনের দিকে ঘুরে তাকালেন এসিজি। চোখ ছোট করে সিগারেটে টান দিয়ে হঠাৎই কেশে উঠলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, মিস্টার সেন, কাল রাতে আপনি কটায় শুতে গেছেন?

একটু সময় নিয়ে ভেবে তারপর উত্তর দিলেন উৎপলেন্দু, এই এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

শুতে যাওয়ার আগে দেবারতিকে আপনি ডাকতে গিয়েছিলেন?

না, কেন বলুন তো? শান্ত স্বরে কথা বললেন উৎপল।

এসিজি বেশ কয়েক সেকেন্ড উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, মিথ্যে কথা বলার অভ্যেসটা আপনার কবে থেকে হয়েছে—লেখক হওয়ার আগে, না পরে?

উৎপলেন্দু সেনের মুখ লাল হল। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

আমরা খবর পেয়েছি, আপনি কাল রাত এগোরোটা নাগাদ দেবারতির ঘরের দরজায় গিয়ে ওকে ডেকেছিলেন। কী একটা রহস্যময় পরীক্ষার ব্যাপারে আপনাদের কথা হয়েছিল। একটু থেমে এসিজি আবার যোগ করলেন, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দেবারতি মানি আপনার সঙ্গেই শেষ কথা বলেছিল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর মুখ খুললেন উৎপলেন্দু সেন ও বুঝেছি, অনিমেষ চৌধুরি এসব খবর আপনাকে দিয়েছে…ওর ঘর দেবারতি মানির পাশেই। নির্ঘাত আড়ি পেতে সব শুনেছে.. মেয়েছেলেরও অধম!

উৎপলেন্দু ঘরে হাজির সকলের দিকে একবার তাকালেন। সবার সামনে কি বলা যায় কথাগুলো? বিশেষ করে অনামিকার সামনে? কিন্তু তার বেলা তো সৌজন্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি দেবারতি। তা হলে তিনি কেন মধ্যবিত্ত সৌজন্য নিয়ে সঙ্কোচ পাবেন? যা হওয়ার হাটের মাঝেই হোক।

দেবারতি মেয়েটা ভীষণ বাজে ছিল…।

উৎপলদা, প্লিজ, একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন! প্রতিবাদে মুখ খুলেছে রঞ্জন দেবনাথ।

সত্যি কথা চিরকাল একটু অভদ্রই শোনায়, উৎপলেন্দু প্রথমে রঞ্জনের দিকে তাকালেন, তারপর এসিজির দিকেঃ এই কারণেই প্রথমে মিথ্যে বলেছিলাম, কারণ সত্যি কথা আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। ভালো করে শুনুন– গলার স্বর কয়েক পরদা উঁচু হল তারঃ দেবারতি আমার পুরুষত্ব পরীক্ষা করতে চেয়েছিল…।

সে-সাহস থাকলে অ্যাদ্দিনে আপনার মুখেভাত হয়ে যেত। কথাটা মনে পড়ে গিয়ে রাগে গা রি-রি করতে লাগল উৎপলেন্দুর।

রঘুপতি যাদব মাথা নীচু করে ডায়েরিতে কীসব নোট করছিল। সেদিকে আঙুল তুলে উঁচু গলায় বললেন উৎপলেন্দু, ভালো করে লিখে নিন–যেন কিছু বাদ না যায়। এইমাত্র যা বললাম, সেই পরীক্ষা দিতেই ওর ঘরে কাল রাতে গিয়েছিলাম। দরজা খুললে বুঝিয়ে দিতাম, মুখেভাত হয়েছে কি হয়নি।

ভাস্কর রাহা উত্তেজিত উৎপলেন্দুকে শান্ত করার জন্য কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। উৎপলের শেষ কথাটা শুনে অবাক হয়ে বললেন, মুখেভাত! তার মানে!

এসিজি আর রঘুপতিও একইসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে উৎপলেন্দু বললেন, ও কিছু নয়, আপনারা বুঝবেন না তেতো হাসলেন তিনিঃ তা মেয়েটা দরজা খোলেনি। হয়তো ঘরে অন্য কেউ ছিল। মেয়েটা তো একা শুতে পারত না। ওর কাছে সব মাসই ভাদ্রমাস।

উৎপল! আপনি কি কাণ্ডজ্ঞান হারালেন! তিরস্কার করে উঠেছেন ভাস্কর। কারণ তিনি লক্ষ করেছেন, কিছুক্ষণ আগেই অনামিকা সরে গেছে সামনে থেকে। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখার ভান করছে। ওর খানিকটা পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঞ্জন দেবনাথ।

উৎপলেন্দুর মুখের ওপর দিয়ে লু বইছিল। অসহ্য এক তাপে তার কান আর গাল যেন পুড়ে যাচ্ছিল। সম্পাদক-প্রকাশকদের উপেক্ষা আর অবহেলার অপমান তিনি সয়ে চলেছেন বহু বছর ধরে। কিন্তু তাই বলে একটা হাঁটুর বয়েসি মেয়ে-জার্নালিস্টের খোঁচাও তাকে একইভাবে সইতে হবে। সহ্যের একটা সীমা থাকা দরকার!

একটু সময় নিয়ে শান্ত গলায় অশোকচন্দ্র জিগ্যেস করলেন, দেবারতির কথাবার্তা কি আপনার স্বাভাবিক মনে হয়েছিল?

না, একটু জড়ানো মনে হয়েছিল–তবে সেটা বোধহয় ড্রিঙ্ক করার জন্যে।

এসিজি ছোট্ট একটা শব্দ করলেন মুখ দিয়ে। মাথার চুলের গোছায় টান মারলেন দুবার। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, উৎপলেন্দুবাবু, হিসেব মতো বলতে গেলে আপনার সঙ্গে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই দেবারতি মানি জানলা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়েছে। তার মানে, ওই সময়ে কেউ যদি দেবারতির ঘরে থেকে থাকে তা হলে সে-ই ওকে খুন করেছে।

তো যান, তাকে গিয়ে ধরুন... উৎপলেন্দু শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। দেবারতির খুনি ধরা পড়ল কি পড়ল না তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। অসহ্য একটা বিরক্তি আর রাগ ফুলে ফুলে উঠছিল তার বুকের ভেতরে।

ভাস্কর রাহা এগিয়ে এসে উৎপলেন্দুর হাত ধরে আলতো করে টান মারলেন। বললেন, চলুন, বাইরে যাই– তারপর এসিজিকে লক্ষ করে? মিস্টার গুপ্ত, আমরা একটু বাইরের বারান্দায় যাচ্ছি। এখানে কেমন দম আটকে আসছে।

ওঁদের দুজনকে দেখলেন এসিজি। তারপর ঘাড় নাড়লেন। অনেক ধকল যাচ্ছে এই দুই প্রবীণ লেখকের ওপর দিয়ে।

উৎপলেন্দু সেনকে নিয়ে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন ভাস্কর রাহা। গত বিশটা বছর তিনি পথ হেঁটেছেন উৎপলের সঙ্গে। ওর মধ্যে কী সুন্দর একটা রসিক মানুষ ছিল।

ক্রমাগত আঘাত পেয়ে-পেয়ে সেই মানুষটা রূঢ়ভাষী বেরসিক হয়ে গেছে।

মনে পড়ে, প্রায় আঠেরো-বিশ বছর আগে মাসিক গোয়েন্দা পত্রিকার সম্পাদক তথা মালিক শুভব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের পইতের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন ওঁরা দুজনে। খেতে বসে সামনের একটা লম্বা করিডর দেখিয়ে উৎপলেন্দু বলেছিলেন, বুঝলেন ভাস্করবাবু, ওটা হচ্ছে উৎপলেন্দু সেন সরণি–।

ভাস্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। অবাক হয়ে বলেছিলেন, মানে?

উৎপলেন্দু খাওয়া থামিয়ে হেসে জবাব দিয়েছেন, মানে আর কী! শুভব্রতদার কাগজে গত পাঁচ বছরে বিনিপয়সায় এত লেখা লিখেছি যে, ওগুলোর পাওনা টাকা দিয়েই ওঁর বাড়ির ওই করিডরটা তৈরি হয়েছে…সোজা বাংলায় ওই করিডরটুকুর মালিক আমি।

এরপর প্রাণখোলা হেসে উঠেছেন দুজনে।

এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ভাস্করের মনে হল, গত বিশ বছর ধরে উৎপলেন্দু সেন সরণির সব জায়গাতেই শুধু ব্যর্থতা, দুঃখ আর হতাশার তেতো ছাপ পড়েছে। আর উৎপলের সেদিনের সেই প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে কবে থেকে যেন চাপা কান্না মিশে গেছে।

ভাস্কর আর উৎপলেন্দু ঘর থেকে চলে যেতেই উঠে দাঁড়ালেন প্রেমময় চৌধুরি। অশোকচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, আমি আসি, মিস্টার গুপ্ত। এতদিন ধরে রহস্য-গোয়েন্দা কাগজ চালাচ্ছি, তাই ব্যাপারটা নেশার মতো হয়ে গেছে। সেইজন্যেই এতক্ষণ ধরে আপনাদের কথাবার্তা শুনছিলাম। এখন যাই খুব টায়ার্ড লাগছে। তা ছাড়া ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

এসিজি সৌজন্যের হাসি হাসলেন কিছু বললেন না।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল অর্জুন দত্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, বুঝেছেন, বুড়োর ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। শালা এমন পাবলিক, আমার একটা গল্প নিয়ে সাত মাস ধরে চেপে বসে আছে।

অর্জুন দত্ত শুধু বললেন, চলুন, আমরাও যাই। আমার একটু লেখালিখির কাজ আছে।

ওঁরা তিনজন প্রায় একসঙ্গেই বেরোলেন ঘর ছেড়ে। যেতে-যেতে জ্যোতিষ্ক প্রেমময়কে বললেন, প্রেমদা, শুনলাম আপনি নাকি কী একটা কাজে সাতাশ তারিখে দিল্লি যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, তিনদিনের জন্যে যাব..কিন্তু এখনও টিকিটটা কাটা হয়নি।

তাই নাকি! তা হলে আপনি এক কাজ করুন। আপনার ঘরে চলুন, জার্নির ডিটেইলসটা আমাকে দিয়ে দিন। আমার সেজ শালা রেলে কাজ করে। আমি ওকে দিয়ে টিকিটটা করিয়ে আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব।

তা হলে তো খুব ভালো হয়, হাসলেন প্রেমময় ও বুড়ো হাড়ে আর ধকল পোষায় না।

.

ওরা চলে যাওয়ার পর ঘরে এখন মাত্র তিনজন লেখক : রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সেনগুপ্ত আর রঞ্জন দেবনাথ।

এসিজি রঘুপতি যাদবকে কাছে ডাকলেন। বললেন, রঘুপতি, তুমি বরং ঘরগুলো সার্চ করার কাজ শুরু করে দাও। আমি এদিকে শেষ করে তারপর যাচ্ছি। তা না হলে শুধু-শুধু রাত হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুমি এখন অনেককেই ঘরে পেয়ে যাবে।

ওকে, স্যার। কাগজপত্র আর ফাইল গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল রঘুপতি।

এসিজি তখন অনামিকা আর রতনকে বললেন যে, রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে তিনি আলাদাভাবে কয়েকটা কথা সেরে নিতে চান।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় নিলেন। যাবার আগে বললেন, কোনওরকম দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন…

অনামিকাও চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎই ও থমকে দাঁড়াল। ফিরে এসে রঞ্জনকে নীচু গলায় কী একটা বলল। তারপর চলে এল এসিজির কাছে প্রায় মুখোমুখি।

মিস্টার গুপ্ত একটা কথা বলার ছিল।

বোসো, একটা সোফায় ওকে বসতে বললেন এসিজি। নিজেও আর-একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরালেন। তারপর ও বলো, কী বলবে–

অনামিকার নাকের ডগায় কয়েকটা সূক্ষ্ম ঘামের ফোঁটা। চোখ গভীর অথচ চঞ্চল। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে রঞ্জনের দিকে।

দেবারতি ঠিক কটার সময় খুন হয়েছে বলুন তো?

ভাস্করবাবু আর হোটেলের লোকজন যা বলছেন তাতে মনে হয় রাত সোয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন?

না, মানে, কাল রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। একটু আগে উৎপলদার কথা শোনার পরই ব্যাপারটা আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

কী ব্যাপার?

কাল রাতে উৎপলদা দেবারতির ঘরের কাছ থেকে চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচ-সাত পর আমি দেবারতির কাছে গিয়েছিলাম…মানে, তখন এগারোটা বেজে বড়জোর পাঁচ-সাত কি দশ মিনিট হবে–

এসিজি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কী বলছে অনামিকা!

তোমার টাইমের ব্যাপারটায় কোনও ভুল নেই তো?

অনামিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না–আমি ঘড়ি দেখেছি।

তুমি দেবারতির কাছে গিয়েছিলে কেন? এসিজি জানতে চাইলেন। সিগারেটে বারকয়েক ঘন-ঘন টান দিলেন।

আসলে…ওর সঙ্গে… একটু ইতস্তত করে অনামিকা বলল, আমার একটু ইয়ে, মানে, ঝগড়া মতন হয়েছিল–ওই ইন্টারভিউ নেবার সময়। ওর কথায় আমি একটু মাথা গরম করে ফেলেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, কাজটা ঠিক হয়নি। মানে, আমি তো সবে লেখালিখি করছি…সুপ্রভাত এর রবিবারের পাতাতেও গল্প দিয়েছি। ওই পাতাটা যিনি দেখেন, মানে, রমাতোষ ভৌমিক, তার সঙ্গে দেবারতি মানির রিলেশন বেশ ভালো। তাই মনে হল, ব্যাপারটা মিটমাট করে নিই। দেবারতি মনখোলা মেয়ে–ওকে বুঝিয়ে রিকোয়েস্ট করলে হয়তো আর কিছু মাইন্ড করবে না। সেইজন্যেই ওর ঘরে গিয়েছিলাম।

একটু দম নিয়ে রুমালে নাক-মুখ আলতো করে মুছে অনামিকা আবার বলল, তো দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজিয়ে দেখি কোনও সাড়া নেই। তখন নব ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। দরজা খুলল না–লক করা।

ভেতর থেকে কোনও কথাবার্তার শব্দ পাওনি? প্রত্যাশায় চকচক করে উঠেছে বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখ।

না।

কিন্তু আমার ধারণা, সেই সময়ে ঘরের ভেতরে দেবারতির সঙ্গে কেউ ছিল। সে-ই খুন করেছে দেবারতিকে।

উঁহু, ওইখানেই তো যত গোলমাল।

তার মানে? তুমি কি কিছু দেখেছ নাকি?

আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত করল অনামিকা। তারপর বলল, না, কিছু দেখিনি। আর সেইজন্যেই তো ব্যাপারটার মধ্যে কেমন একটা হেঁয়ালি আছে বলে মনে হচ্ছে। ওর ঘর থেকে কোনওরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি দরজার চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম, দরজার সোজাসুজি পশ্চিমের জানলাটা হাট করে খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

হয়তো দেবারতি তখন টয়লেটে গিয়ে থাকতে পারে।

না। কারণ চাবির ফুটো দিয়ে বাথরুমের দরজাটাও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ওটা খোলা ছিল। আর, বাথরুমে কোনও আলো জ্বলছিল না। মাথা নাড়ল অনামিকা : না, মিস্টার গুপ্ত, তখন তিনশো আট নম্বর ঘরে কেউ ছিল না।

মাথার চুলের গোছায় টান মারতে লাগলেন এসিজি। উঠে পড়লেন সোফার আরাম ছেড়ে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! অনামিকা দেবারতির ঘরে কাউকে দেখেনি! অথচ তার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই খুন হয়েছে মেয়েটা। তার মানে, উৎপলেন্দুবাবু চলে যাওয়ার ঠিক পরেই দেবারতি মানি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, আবার অনামিকা চলে যাওয়ার পরে-পরেই ঘরে ফিরে এসেছে খুন হওয়ার জন্য। নাঃ, একেবারে অস্বাভাবিক!

এসিজির মগজের ভেতরে রুবিক কিউবের খুদে কিউবগুলো বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর একইসঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করছিল তার। ঘরেই ছিল না মেয়েটা, অথচ পট করে খুন হয়ে গেল!

রঞ্জন দেবনাথ এসিজির কাছে এগিয়ে এল। বলল, থিঙ্কিং মেশিন, দিস ইজ আ রিয়েল প্রবলেম ফর ইউ। ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

আ-আমি তা হলে যাই... অনামিকা বলল।

এসিজির অন্যমনস্কতার ঘোর কেটে গেল হঠাৎ। একটু চমকে উঠেই বললেন, হ্যাঁ–যাও।

অনামিকা চলে যেতেই রঞ্জন দেবনাথ একা। ওকে দেখে একটু অবাক লাগল এসিজির। সবে কাল রাতে মারা গেছে দেবারতি মানি। অথচ এর মধ্যেই রঞ্জন বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

দেবারতিকে কীরকম ভালোবাসতেন, রঞ্জনবাবু? আচমকা প্রশ্ন করেছেন এসিজি।

রঞ্জনকে হঠাৎই একটু অপ্রস্তুত দেখাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ, ভালোবাসতাম, তবে তার শ্রেণিবিভাগ করতে পারব না।

পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করল রঞ্জন। মুখ আড়াল করে সিগারেট ধরাল।

দেবারতি সম্পর্কে দু-চারকথা বলুন, অনুরোধ করলেন অশোকচন্দ্র।

নতুন কী আর বলব বলুন! সিগারেটে গভীর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রঞ্জন ও ও রহস্য সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। আর আমাদের মধ্যে কোনও-কোনও লেখককে বলত

রেস্তোরাঁর বেয়ারা। মানে, লেখার প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা, যত্ন, কিস্যু নেই…পাঠকরা যখন যা চায় রেস্তোরাঁর বেয়ারার মতো সেটাই প্লেটে সাজিয়ে দেয়…।

আপনি কি সেই বেয়ারাদের একজন? রঞ্জনকে একটু খোঁচা দিতে চাইলেন এসিজি।

জানি না। ও কখনও আমাকে নামগুলো বলেনি।

আপনার সঙ্গে ওর শেষ কখন দেখা হয়েছিল?

ওই সাড়ে নটা দশটার সময়ে…এই লেখাটেখার ব্যাপার নিয়ে ওর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল…

এসিজি সরাসরি তাকালেন রঞ্জনের চোখে? তা হলে ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য করার মতো আর কিছু আপনার বলার নেই?

রঞ্জন দেবনাথের চোখের পাতা এতটুকু কঁপল না। ও উদ্ধতভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনি হুনুর–এখানে হুনুরি করতে এসেছেন। খুনি ধরা আপনার কাজ, আমার নয়। বুদ্ধি থাকলে যেসব তথ্য পেয়েছেন তা থেকেই খুনি ধরা যায়। ইট ইওর গেম। গুড বাই।

রঞ্জন দেবনাথ দ্রুতপায়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে। সিগারেটের ধোঁয়ার রেখার মাঝে অশোকচন্দ্র গুপ্ত দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। একা।

চোখ বুজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পলিতকেশ বৃদ্ধ হুনুর প্রাণপণে চেষ্টা করলেন খুনির ছবিটা দেখতে, কিন্তু অদৃশ্য এক পাগল করা ঢেউ বারবার ছবিটাকে ঝাপসা করে দিচ্ছিল। তবে এটুকু বুঝতে পারছিলেন, দেবারতি কীভাবে খুন হয়েছে সেটা ধরতে পারলেই বাকিটা ধরে ফেলা যাবে অনায়াসে।

কিন্তু ঠিক কীভাবে খুন হয়েছে দেবারতি মানি?

.

০৯.

আজ সম্মেলনের শেষ দিন।

দেবারতি মানির ঘটনার পরদিন থেকেই সম্মেলনের সুর কেটে গেছে। যেন যান্ত্রিকভাবে কয়েকটা রোবট তাদের মাস্টার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে চলেছে। দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই চাপা আলোচনা করে চলেছেন দেবারতির মৃত্যু নিয়ে। খবরের কাগজগুলো এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনা বলে চালাতে চেষ্টা করছে। তবে পাঠকদের বেশিরভাগই সেটা মেনে নিতে নারাজ। তার প্রধান কারণ, সাধারণ মানুষ, যাদের রোজকার জীবন নিতান্তই সাধারণ, তারা সবসময় রহস্য-রোমাঞ্চ পছন্দ করে। কোনও খবর চাঞ্চল্যকর হলে তবেই সেটা তাদের আগ্রহ জাগায়, তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই খবরের ওপরে।

সুতরাং বলরুমে মোটামুটি একটা অশান্তভাব ছিল। গত পরশু সকালে ভাঙা হাটে সম্মেলন শুরু হওয়ার সময়ে দেবারতি মানির আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, আর পালন করা হয়েছিল এক মিনিট নীরবতা। ব্যস, তারপর থেকেই আসর জুড়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে একটাই প্রশ্ন : দেবারতি মানির মৃত্যুর পিছনে রহস্যটা কী?

আজ, বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের শেষ দিনেও, সেই একই প্রশ্ন কুরে কুরে খাচ্ছে সবাইকে।

হলের একেবারে পিছনের সারিতে বসেছিলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। চোখের কোণে, কপালে আর নাকের দুপাশে বলিরেখা প্রকট। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করছিলেন একটা সিগারেট ধরানোর জন্য। কিন্তু এয়ার কন্ডিশন্ড বলরুমে ধূমপান নিষেধ।

এসিজির পাশেই বসে ছিল রঘুপতি যাদব। হাতে যথারীতি কাগজপত্রের ফাইল। একদিনের ধকলে বেচারার মুখেও ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

ওয়ার্কশপে গল্পপাঠের আসর বসেছে। প্রত্যেক লেখক নিজের লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন। এই লেখা প্রত্যেকে লিখেছেন গত চারদিনের মধ্যে অর্থাৎ, কনফারেন্স শুরু হওয়ার দিন থেকে তারা লেখায় হাত দিয়েছেন।

এসিজি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল অনামিকা সেনগুপ্ত। গল্পের বিষয় লড় রুম প্রবেলম। জানলা-দরজা বন্ধ একটা ঘরের ভেতরে একজন মানুষ মরে পড়ে আছে। বুকে বিধে আছে তীর। জানলা বা দরজার এমন কোনও ফাঁক-ফোকর নেই যা দিয়ে তীর ছোঁড়া যায়।

এসিজির মনে পড়ে গেল কার্টার ডিকসনের লেখা দ্য জুডাস উইন্ডো উপন্যাসটার কথা। সেখানেও সমস্যাটা একইরকম ছিল। আর সমাধান ছিল ভারি অদ্ভুত! দরজার হাতলের প্লেটের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলেছিল খুনি। তারপর প্লেটসমেত হাতলটা সরিয়ে নিয়েছে। ফলে দরজার গায়ে যে-ছোট্ট ফোকর তৈরি হয়েছে তাতে ক্রসবো লাগিয়ে সে তীর ছুঁড়েছে নির্ভুল লক্ষ্যে। তারপর আবার হাতলটা লাগিয়ে দিয়েছে জায়গা মতো। অভিনব, তবে বড় কষ্টকল্পিত সমাধান।

কিন্তু অনামিকার সমাধানটা অনেক সহজ-সরল এবং বাস্তব। খুন হওয়ার আগে মানুষটা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। হঠাৎই খুনির ছুঁড়ে দেওয়া তীর এসে লাগে তার বুকে। সেই অবস্থায় সে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতরে। দরজা বন্ধ করে দেয়। জানলাগুলো সব আগে থেকেই বন্ধ করা ছিল। সুতরাং আহত লোকটি যখন ছটফট করতে করতে বন্ধ ঘরের মধ্যে মারা যায়, তখনই তৈরি হয়ে যায় বন্ধ ঘরের রহস্য।

এসিজি শুনছিলেন আর অবাক হয়ে ভাবছিলেন। একই ঘটনার কতরকম সমাধান সম্ভব! দেবারতি মানির বেলাতেও তাই। দশজনের মধ্যে অন্তত ছজন লেখক ছরকম

সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকটা সমাধানের মধ্যেই কোনও না কোনও ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সাহায্য নিয়েই তিনি খুঁজে পেয়েছেন সঠিক উত্তর। বিশেষ করে অনামিকার শেষ কথাগুলো শোনার পর আর কোনও অসুবিধে হয়নি। চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ও ঘরে কাউকে দেখতে পায়নি, এই তথ্যটাই এসিজিকে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া রঞ্জন দেবনাথের কাছ থেকেও তিনি কম সাহায্য পাননি। রঞ্জন উদ্ধত, তবে বুদ্ধিমান লেখক তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এত সত্ত্বেও লকড রুম প্রবলেমের কিছুটা অংশ এখনও ঝাপসা থেকে গেছে।

রঘুপতির কাছ থেকে দুটো কাগজ চেয়ে নিলেন তিনি। গত দুদিনে দশটা ঘর সার্চ করে যা-যা পাওয়া গেছে তারই একটা নির্বাচিত তালিকা। আগেও অনেকবার দেখেছেন, তবু আরও একবার চোখ বোলালেন অশোকচন্দ্র।

অনামিকা সেনগুপ্ত (রুম নাম্বার ৪০৭) : রঞ্জন দেবনাথের উপহার দেওয়া দুটো গানের ক্যাসেট আর একটা বই সমরেশ মজুমদারের প্রেমের গল্প। পাঁচ মিটার লম্বা একটা লাল রঙের নাইলনের দড়ি। একটা খালি বিয়ারের বোতল।

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় (রুম নাম্বার ৪০৮) : দেড় ডজন ভ্যালিয়াম ফাইভ ট্যাবলেট। ছটা সিপ্লক্স ক্যাপসুল। চুলে কলপ করার মেহেদি পাতার গুঁড়োর প্যাকেট। ম্যাকডাওয়েল হুইস্কির একটা ছোট বোতল–তার অর্ধেকের বেশি খালি। এক কাটিম সাদা সেলাইয়ের সুতো। একটা মাঝারি মাপের ছুঁচ। রূপেন মজুমদারের উপহার দেওয়া এক কপি ডাকিনীর হাতছানি।

জ্যোতিষ্ক সান্যাল (রুম নাম্বার ৪০৯) : একটা এয়ার পিস্তল। একটা ছোট ছুরি। একটা রহস্য উপন্যাসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিনাম খুন জখম রাহাজানি।

রূপেন মজুমদার (রুম নাম্বার ৪১০) : বাইশ কপি ডাকিনীর হাতছানি। চারটি ছোট গল্প, একটি নভেলেট এবং একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি : প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় ওপরে বাঁদিকে বড় বড় করে লেখা সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনি। এক শিশি থার্টি প্লাস ট্যাবলেট। সবকটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকার নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লেখা একটি ডায়েরি।

রঞ্জন দেবনাথ (রুম নাম্বার ৪১১) : অনামিকা সেনগুপ্তের দেওয়া জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। কয়েকটা বিদেশি রহস্য উপন্যাস। একটা ক্রসওয়ার্ড পাজুলের বই। দুটো প্রেমের কবিতা–অর্ধেকটা করে লেখা। একটা বড় কঁচি আর হাত তিনেক লম্বা একটা সাদা দড়ি। চারটে রঙিন কাচের পুতুল। তিনটে কামসূত্র কন্ডোম।

অনিমেষ চৌধুরি (রুম নাম্বার ৩০৭) : সতেরোটি বিদেশি কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস–প্রত্যেকটা বইয়ের টাইটেল পেজে ইংরেজি নামের পাশে হাতে লেখা সম্ভাব্য বাংলা নাম। দুটি বিদেশি সক্ট পর্নো ম্যাগাজিন। এক ফাইল বলবর্ধক শিলাজিৎ ট্যাবলেট। নটা অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (রুম নাম্বার ৩১০) : নিজের লেখা বিভিন্ন বই–মোট সাতষট্টি কপি। দুটি উপন্যাস, তিনটি নভেলেট এবং সাতটি ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি। বিভিন্ন পাঠকের লেখা একতাড়া প্রশংসাপত্র। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে পাওয়া বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপের জরাজীর্ণ দুটো সার্টিফিকেট আর তার পাঁচটি করে ফটোকপি। (এই সার্টিফিকেট দুটোর ফটোকপি দেবারতি মানির ঘর থেকে পাওয়া গেছে– সম্ভবত ইন্টারভিউ নেবার সময় লেখক দিয়েছিলেন)।

ভাস্কর রাহা (রুম নাম্বার ২০৮) : হুইস্কির একটা খালি বোতল। কয়েকটা বিদেশি সাহিত্য পত্রিকা। খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া রহস্য-সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটা খবরের কাটিং। দেবারতি মানির লেখা একটা ফিচারের খসড়া। ভয়ংকর আর ছায়াময় পত্রিকার প্রথম বছরের চারটি পুরোনো সংখ্যা। কয়েকটা আধপোড়া চুরুট। এক বাক্স

আলপিন। একটা নীল রঙের রেনল্ডস বলপয়েন্ট পেন (দেবারতি মানির ঘরে টেবিলের ওপরে পাওয়া পেনটার মতো)।

অর্জুন দত্ত (রুম নাম্বার ২০৯) : তেরোটি বিদেশি রহস্য-রোমাঞ্চ সত্যকাহিনি জাতীয় পত্রিকা। মহিলাদের চারটে ফ্যাশান ম্যাগাজিন। ব্যায়াম করার জন্য একটা বুলওয়ার্কার। দশটা ক্যামপোজ ট্যাবলেট। নাম-না-জানা দুজন মহিলার ফটো। ছায়াময় পত্রিকার এ-বছরের পুজো সংখ্যা।

উৎপলেন্দু সেন (রুম নাম্বার ২১০) : বাংলা সাহিত্যের নামি কয়েকজন লেখকের লেখা পাঁচটি উপন্যাস–পাঁচটি বই-ই লাল কালি দিয়ে দাগ কেটে নানান মন্তব্যে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর রাহা এবং রতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা করে উপন্যাস (এগুলোও লাল কালিতে যথেষ্ট কলঙ্কিত)। দুটো প্লেওয়ে আর একটা ফ্যানটাসি পত্রিকা–তাতে ন্যুড পোস্টারের পাতাগুলো ব্যবহারে ব্যবহারে কোঁচকানো। দেবারতি মানি সম্পর্কে কটু মন্তব্য লেখা দুটো প্যাডের পাতা। পুরুষালী চিহ্নে কলঙ্কিত একটা লুঙ্গি আর একটা পাজামা। চারটে অসমাপ্ত লেখার পাণ্ডুলিপি। এক প্যাকেট ৭৭২ তাস। তিনটে বিদেশি নাটকের বই।

এই তালিকার কোথাও কি লুকিয়ে রয়েছে খুনের উদ্দেশ্য বা কৌশলের কোনও ইঙ্গিত, কোনও সূত্র? অশোকচন্দ্র গুপ্ত ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিলেন চিন্তার। দেবারতি মানিকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন চোখের সামনে। খিলখিল হেসে মেয়েটা বলছিল, ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো আর হুনুরি এক ব্যাপার নয়, স্যার। ফর ডিটেকশন ইউ নিড রিয়েল ব্রেইন। হিণ্ডলো মনে আছে তো!

মনে আছে। সেগুলো নানানভাবে খতিয়ে দেখেছেন এসিজি, কিন্তু তার মধ্যে খুনির স্পষ্ট পরিচয় বা সেরকম কোনও ইশারা লুকিয়ে নেই।

আরও একটা ব্যাপার ভাবিয়ে তুলেছে তাঁকে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট।

হাতের কাগজ দুটো রঘুপতি যাদবকে ফিরিয়ে দিয়ে পি.এম. রিপোর্টের কপিটা দেখতে চাইলেন এসিজি।

খুন হওয়ার আগে মদ খেয়েছিল দেবারতি। তা ছাড়া ওর পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে ঘুমের

মেয়েটা কি অনিদ্রায় ভুগত? তা হলে ওর ঘর সার্চ করে স্লিপিং পিল্স পাওয়া গেল না কেন?

এসিজির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এক্ষুনি একটা সিগারেট ধরাতে না পারলে তিনি মরে যাবেন। রঘুপতিকে রিপোর্টের কপিটা ফেরত দিয়ে বললেন নীচু গলায়, আমি বাইরের বারান্দায় আছি। তুমি কান খাড়া করে শোনো কে কী বলছে। এখন আমাদের কোনও ইনফরমেশন মিস করা চলবে না।

রঘুপতি বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় নাড়ল। এসিজি বেরিয়ে গেলেন বলরুম ছেড়ে।

বাইরের বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরাতেই দেখতে পেলেন, বলরুমের আর-একটা কাচের দরজা ঠেলে ভাস্কর রাহাও বেরিয়ে আসছেন। উদ্দেশ্য বোধহয় একই ধূমপান।

এসিজি ভাস্কর রাহাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়লেন।

চুরুট ধরিয়ে খোলা বারান্দায় এসিজির কাছে চলে এলেন ভাস্কর। চারপাশে সোনা-রোদ, নীল আকাশ, হালকা ঠান্ডা বাতাস, টবে সাজানো গাছ। সামনের বড় রাস্তায় বেলা সাড়ে এগারোটার ব্যস্ততা।

এক মুখ ধোয়া ছেড়ে স্মিত হেসে ভাস্কর রাহা সপ্রশ্নে তাকালেন এসিজির দিকে। দেবারতি খুন হওয়ার পর থেকে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক তাদের কম জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

গতকালও তার প্রশ্নবাণের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি, তার ওপর ঘর তল্লাশি করার নাজেহাল ব্যাপার।

আজই তো শেষদিন ভাস্করবাবু, শেষদিন শব্দটার ওপরে একটু জোর দিয়ে যেন বললেন এসিজি।

ভাস্কর রাহা ঘাড় নাড়লেন নীরবে।

আপনি কখনও রুবিক কিউব দেখেছেন, ভাস্করবাবু?

না– মাথা নাড়লেন ভাস্কর।

হাঙ্গেরির এক অধ্যাপক ছাত্রদের গ্রুপ থিয়োরি পড়াতে গিয়ে একটা কিউব তৈরি করেছিলেন ১৯৭৫ সালে। সেই অধ্যাপকের নাম আর্নো রুবিক। এই কিউবে কতকগুলো খুদে-খুদে রঙিন কিউব জুড়ে তৈরি করা হয়েছে একটা বড় কিউব। খুদে কিউবের থাকগুলোকে নানানভাবে ঘুরিয়ে বড় কিউবটার ছটা পিঠে নানানরকম নকশা তৈরি করা যায়। ভারি মজার ধাঁধা…।

ভাস্কর রাহা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না এখন তার কী বলা উচিত। এই বৃদ্ধ গোয়েন্দা হঠাৎই বা তাকে রুবিক কিউবের গল্প শোনাচ্ছেন কেন?

এসিজি রুবিক কিউব নিয়ে যেন আপনমনেই নানান কথা বলছিলেন আর সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন ক্রমাগত। তার মাথার ভেতরে খুদে কিউবগুলো বনবন করে ঘুরপাক খেয়ে দেবারতি মানির খুনের নকশা তৈরি করার চেষ্টা করছিল।

আচ্ছা ভাস্করবাবু, আপনাদের মধ্যে কারা কারা ড্রিঙ্ক করেন বলতে পারেন? হঠাৎই জানতে চাইলেন এসিজি।

মজা করে হাসলেন ভাস্কর, বললেন, ঠিক বলতে পারব না–তবে অনেকেই এ-রসে অভ্যস্ত। এটা না হলে লেখালিখি ঠিক জমে না…।

তার মানে? নেশা না করলে আপনার লিখতে অসুবিধে হয়?

আবার প্রসন্ন হাসলেন রাহা : ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা খুব মুশকিল। মানে, আমার লেখার মূল সূত্র হচ্ছে, রহস্যের প্রত্যেকটি টুকরোকে কল্পনার সুতোয় গেঁথে খুশিমতো খেলিয়ে তারপর সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া সাদা কাগজের পৃষ্ঠায়। একটু-আধটু নেশা করলে লাগামছাড়া কল্পনার সুতো খুশিমতো খেলা করতে পারে–অন্তত আমার তাই মনে হয়…।

মাই গড! অবাক হয়ে বলে উঠলেন এসিজি। তার চোখের নজর ভাস্কর রাহার শরীর ভেদ করে যেন চলে গেছে কোন দিগন্তে। কপালে বয়েসের কারুকাজ। বাতাসে সাদা চুল উড়ছে। দূরে পাখি ডাকছে কোথাও। আর তার মগজের ভেতরে বনবন করে পাক খাওয়া খুদে কিউবগুলো চোখের পলকে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে ফুটিয়ে তুলল রুবিক কিউবের অভিনব এক নকশা দেবারতি মানির খুনের নকশা।

কী আশ্চর্য! এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এ কদিন কী নাজেহালটাই না হয়েছেন অশোকচন্দ্র! এখন তো বলতে গেলে সব জলের মতো স্পষ্ট! ঝাপসা যেটুকু আছে তা অতি সামান্য। রঞ্জন দেবনাথ পরশুদিন ঠিকই বলেছিল? আপনার থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেছে রিপেয়ার করতে হবে।

ভাস্করবাবু, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ– এসিজির গলার স্বর কাঁপছিল।

কেন? ভাস্কর রাহা এই বৃদ্ধ হুনুরের আচরণের কোনও থই পাচ্ছিলেন না।

এখন আমি জানি, দেবারতি মানিকে কে খুন করেছে, কীভাবে খুন করেছে। আজ সন্ধে সাতটার সময় আপনার ঘরে সবাইকে থাকতে বলবেন–

নাটকের শেষ দৃশ্য? ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলেন রাহা।

আপনাদের সাহিত্যের ভাষায় হয়তো তাই একটু থেমে সিগারেটে টান দিয়ে এসিজি বললেন, তবে আমার কাছে পাখি ধরার কাজ। বুঝলেন, দেবারতি মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতী ছিল।

কেন?

খুব মজার হিন্টস দিয়েছিল। দারুণ! আপনমনেই হাসতে শুরু করলেন এসিজি।

রঘুপতি যাদব কখন যেন এসে হাজির হয়েছিল খোলা বারান্দায়। অশোকচন্দ্রকে হাসতে দেখে সে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কিউ স্যার, কেয়া বাত হ্যায়? কোই খাস বাত হ্যায় কেয়া?

ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ডান হাত তুললেন এসিজি। হাসতে-হাসতেই বললেন, ওহে আমার প্রাক্তন ছাত্র, অতি দুর্লভ প্রজাতির একটি পাখি আজ সন্ধেবেলা তুলে দেব তোমার হাতে...।

রঘুপতি যাদব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার প্রাক্তন স্যার-এর দিকে।

.

প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় যেন ধৈর্যচ্যুতির সীমারেখায় পৌঁছে গেছেন প্রত্যেকে। কারণ, ঘড়িতে এখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। ভাস্কর রাহার দুশো আট নম্বর ঘরে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে বা বসে অপেক্ষা করছেন দশজন রহস্য-লেখক। তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস এখন বোধহয় স্বাভাবিক নয়। বার্ষিক রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক সম্মেলন শেষ হয়ে গেলেও এখন হয়তো শুরু হবে তার আসল সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

অনামিকা একটা পালিশ করা কাঠের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। আর মাঝে-মাঝেই নীচু গলায় কথা বলছিল পাশে দাঁড়ানো রঞ্জন দেবনাথের সঙ্গে।

রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় বসে ছিলেন বিছানায়। তাঁর পাশে রূপেন মজুমদার আর রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সোফায় বসে আছেন অধ্যাপক অনিমেষ চৌধুরি, জ্যোতিষ্ক সান্যাল আর অর্জুন দত্ত।

পশ্চিমের খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাস্কর রাহা আর উৎপলেন্দু সেন। বাইরের গাঢ় আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা আলতো গলায় কী একটা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘরের বাতাসে সিগারেট আর চুরুটের ভারি গন্ধ। আবহাওয়ায় উৎকণ্ঠার পরত জমতে জমতে মাখনের মতো পুরু হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে প্রথম নীরবতা ভাঙল রঞ্জন দেবনাথ। শোনা যায় এমন স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, মিস্টার গুপ্তের এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছ থেকে শোনা গেল, উনি এসে গেছেন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছেন হোটেলের এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার প্রশান্ত রায়। কথাটা বলেছেন। তিনিই। তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকলেন অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঘুপতি যাদব। সঙ্গে দুজন উর্দি পরা কনস্টেবল।

প্রশান্ত রায়ের কপালে ঘামের ফোঁটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে তিনি বললেন, মিস্টার গুপ্ত, এখন গোটা ব্যাপারটাই আপনার হাতে।

হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালেন এসিজি। ঘরের প্রায় মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, একটা সুতো খুঁজতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

সুতো! অবাক হয়ে বলে উঠেছেন রত্নাবলী।

ওঁর দিকে তাকিয়ে বিনীত হেসে এসিজি বলেছেন, হ্যাঁ, ম্যাডাম, সুতো। মানে, সূত্র– দেবারতি মানির খুনের সূত্র। কারণ, দেবারতির হত্যারহস্য বলতে গেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুতোর ওপরে। প্রত্যেকটি লেখককে বেশ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন এসিজি। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, দেবারতি মানি ছিল সাংবাদিক। ক্রাইম জার্নালিস্ট। রহস্য-সাহিত্যকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসত ও। কী একটা টপ সিক্রেট ও জেনে ফেলেছিল কেমন করে। তাই এই কনফারেন্সে এসে ওকে খুন হতে হল। ব্রুটাল অ্যান্ড ন্যাস্টি মার্ডার। এবং খুনের পদ্ধতি বেশ জটিল এবং অভিনবজন ডিকসন কারের বইতেও যা নেই। একটু থেমে তারপর তবে খুনি যে আগে থেকে প্ল্যান করে খুন করেছে তা নয়। বরং হঠাৎই খুনিকে এমন একটা নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর অনেকটা ঘটনাচক্রেই বলা যায়–খুনের পদ্ধতিটা হয়ে যায় ইনজিনিয়াস। ঠিক রূপেন মজুমদারের ডাকিনীর হাতছানি র মতো।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে শব্দ করে টান দিলেন অশোকচন্দ্র। তারপর বললেন, দেবারতির টপ সিক্রেট জেনে ফেলার ব্যাপারটা মোটেই গোপন ছিল না, বরং সকলেই জেনে গিয়েছিলেন– এমনকী খুনিও। সম্পাদক প্রেমময় চৌধুরির উসকানিতে দেবারতি সকলের সামনেই একটু হিস দিয়েছিল ও পাঁচকড়ি দে এবং এডগার ওয়ালেস। আমি অনেক বইপত্তর ঘেঁটে মাত্র একটাই মিল পেয়েছি এই দুজন লেখকের মধ্যে। সমালোচকরা সন্দেহ করেন, এই দুজন লেখকেরই গোস্ট রাইটার বা ছায়ালেখক ছিল। অর্থাৎ, ওঁদের নামে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলোই প্রকৃতপক্ষে অন্য কেউ ওঁদের হয়ে লিখে দিয়েছেন।

ছায়ালেখক! ভাস্কর রাহা অবাক হয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়েছেন।

কিন্তু অন্যের নামে লিখে সেই ছায়ালেখকের লাভ কী? প্রশ্ন করেছেন জ্যোতিষ্ক সান্যাল।

উত্তর অতি সহজ। টাকার জন্যে ছায়ালেখকেরা হয়তো বেনামে বই লিখতে রাজি হয়েছিলেন।অশোকচন্দ্র সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আবার শুরু করলেন, পাঁচকড়ি দে-র প্রধান ছায়ালেখক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ পাল–পাঁচকড়ি দে-র বইয়ের প্রকাশক পাল ব্রাদার্স-এর একজন স্বত্বাধিকারী। আর এডগার ওয়ালেস এত উর্বর-লেখনীর মালিক ছিলেন যে, এক-একসময় বছরে পাঁচটা, সাতটা, আটটা কিংবা নটা পর্যন্ত বই প্রকাশ করেছেন। তার এই অনর্গল লেখার স্রোত দেখে অনেকে মনে করতেন–বা বলা ভালো, এখনও সন্দেহ করেন–তাঁর অনেক গুপ্তলেখক বা ছায়ালেখক ছিল। বুঝতেই পারছেন, সমালোচকরা শুধু সন্দেহই করতে পেরেছেন, প্রমাণ করতে পারেননি। কারণ, এই ধরনের ব্যাপার কখনও প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবারতি যদি ঠাট্টা না করে থাকে তা হলে বোধহয় ও গোস্ট রাইটারের কথাই বলতে চাইছিল। অর্থাৎ, এই সম্মেলনে–মানে, এখন এই ঘরে–এমন একজন লেখক হাজির রয়েছেন যিনি ছায়ালেখক ব্যবহার করে একের পর এক বই প্রকাশ করে চলেছেন এবং রহস্য সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছেন।

আজকের যুগে কি এই ছায়ালেখকের ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়, মিস্টার গুপ্ত? রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় জিগ্যেস করেছেন এসিজিকে।

এসিজি হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছেন, ম্যাডাম। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলেই সেই সিক্রেট জানাজানি হলে সেটা নিউজপেপারের হেডলাইন হয়ে যেত। তখন আপনার তো সুইসাইড করা ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। বলুন, ভুল বলেছি?

রত্নাবলীর মুখের রক্ত ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ শুষে নিল পলকে। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটা কান্নার মতো দেখাল। শাড়ির আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। এপাশ-ওপাশ কয়েকবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিলেন। ওঁর শরীরটা একটু-একটু কাঁপছিল।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়িয়েছেন ভাস্কর রাহা। তার দু-চোখে বিস্ময়। কোনওরকমে বলতে গেলেন, মিস্টার গুপ্ত, বোধহয় কোথাও একটা.... কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাংলা রহস্য-সাহিত্যের সম্রাজ্ঞীর দিকে। সৌম্য, স্নিগ্ধ, শান্ত। অথচ শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবেও খুন করার ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু এসব কী বলছেন আপনি! এসিজিকে লক্ষ্য করে বলে উঠেছে অনামিকা সেনগুপ্ত, রত্নাদির হয়ে কে বই লিখে দেয়? কে সেই গোস্ট রাইটার?

হাত তুলে অনামিকাকে আশ্বাস দিলেন এসিজি, বললেন, একটু ধৈর্য ধরো, মা-মণি, সব বলছি।

মাপ করবেন, মিসেস মুখার্জি মাপ করবেন, ভাস্করবাবু। আপনাদের দক্ষ গোয়েন্দা করঞ্জাক্ষ রুদ্র বা সুরজিৎ সেনের মতো গুছিয়ে নাটকীয়ভাবে হয়তো এই শেষ দৃশ্য আমি জমাতে পারব না, তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই। আমি আগেই তো আপনাদের বলেছি, চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া ছুঁচলো গোঁফও আমার নেই। মানে, আপনাদের কাহিনির গোয়েন্দাদের মতো সর্ববিষয়ে বিশারদ আমি নই–তবে আমি কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। আমার হুনুরি খুব সাদামাঠা, সহজ-সরল।

ঘরে গুঞ্জন চলছিল। প্রায় সকলেই বিধ্বস্ত রত্নাবলীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

শুধু রঘুপতি যাদব চোয়াল শক্ত করে ঘরের এককোণে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

প্রথমে বলি লকড রুম প্রবলেমের সলিউশনের কথা। মানে, কী করে খুন হয়েছিল দেবারতি মানি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্যে আমি আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম–এবং আপনাদের অনেকেই যথাসাধ্য সাহায্য

করেছেন। আপনাদের কথাবার্তা থেকেই বন্ধ ঘরের রহস্যের আসল উত্তর খুঁজে পেয়েছি আমি। তবে সেই রহস্য ফাঁস করার আগে উৎপলেন্দুবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই– এসিজি ঘুরে তাকালেন উৎপলেন্দু সেনের দিকে? মিস্টার সেন, খুব ভেবে একটা কথা বলুন তো। খুনের দিন রাত এগারোটা নাগাদ আপনি যখন তিনশো আট নম্বর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেবারতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন ওর গলার স্বর নিয়ে আপনার কোনওরকম সন্দেহ হয়নি? মনে হয়নি, দেবারতির বদলে অন্য কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলছে?

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর উৎপলেন্দু জবাব দিলেন, না, সন্দেহ হয়নি। তবে গলাটা একটু জড়ানো মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, আমিও তো নেশা করে ছিলাম...।

রত্নাবলী এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছেন। শুকনো হেসে বললেন, সন্দেহ হওয়ার কথা নয়, মিস্টার গুপ্ত। আমার গলা শুনে বয়েস বোঝা যায় না। তা ছাড়া একটু জড়িয়ে কথা বলেছিলাম। একটু ইতস্তত করে আবার বললেন, তখন উৎপলেন্দুবাবুর কথার জবাবও দিয়েছি আন্দাজে। কারণ তখন তো আর পরীক্ষা বলতে কিসের পরীক্ষা বুঝিনি...।

এই কথাবার্তায় ঘরের সকলেই বেশ অবাক হয়েছেন। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় কেন দেবারতি মানির ঘরে এসে ওকে নকল করে অভিনয় করার চেষ্টা করবেন, এই ব্যাপারটা অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়নি।

অশোকচন্দ্র ফুরিয়ে আসা সিগারেট দিয়ে নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। তাতে কয়েকবার টান দিলেন। সিগারেটের ডগায় অগ্নিবিন্দু দপদপ করে উঠল তালে-তালে। গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি বলে উঠলেন, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে আমি আন্দাজ করলাম, উৎপলেন্দুবাবু দেবারতির সঙ্গে কথা বলেননি কথা বলেছেন অন্য কারও সঙ্গে, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গালে কয়েকবার হাত বুলিয়ে নিলেন এসিজি ও এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে অনামিকা। উৎপলেন্দুবাবু চলে যাওয়ার পাঁচ-সাত মিনিট পরেই ও দেবারতির ঘরের দরজার চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ঘরে কাউকে দেখতে পায়নি।

দেখতে পায়নি, কারণ ঘরে সত্যিই তখন কেউ ছিল না। উৎপলেন্দুবাবু দরজার কাছ থেকে সরে যাওয়ার পরই রত্নাবলীদেবী বেরিয়ে আসেন দেবারতির ঘর থেকে। দরজা বন্ধ করে সেটা বাইরে থেকে লক করে চটপট রওনা হয়ে যান পাঁচতলায় নিজের ঘরের দিকে। তার দু-চার মিনিট পরেই অনামিকা এসেছিল দেবারতিকে ডাকতে, এবং স্বাভাবিক কারণেই ও ঘরে কাউকে দেখতে পায়নি।

রূপেন মজুমদার অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, কিন্তু দেবারতি তখন কোথায়? ও কি তখন খুন হয়ে গেছে?

হাসলেন এসিজিঃ না, খুন হয়নি। ও তখন—সম্ভবত মদের সঙ্গে মেশানো—ঘুমের ওষুধ খেয়ে মিসেস মুখোপাধ্যায়ের ঘরে খুন হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রত্নাদি দেবারতি মানির ঘরে এসেছিলেন কী করতে? অনামিকা।

উনি দেখতে এসেছিলেন, দেবারতির ঘরের পশ্চিমদিকের—মানে, টেরাসের দিকের জানলাটা খোলা আছে কি না। অর্থাৎ জানলাটা ভোলা থাকাটা তার প্ল্যানের পক্ষে খুব জরুরি ছিল। যাতে সবাই ভাবে, দেবারতি ওর ঘরেরই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছে।

অনেকের মুখেই হতবুদ্ধি ভাব। শুধু রঞ্জন দেবনাথ নির্বিকার। আর অনিমেষ চৌধুরি।

স্মিত হাসলেন এসিজি। রত্নাবলীর দিকে একপলক তাকিয়ে বললেন, ম্যাডাম, আমার যদি কোথাও ভুল হয় তা হলে দয়া করে শুধরে দেবেন। তারপর অধ্যাপকের দিকে ফিরে : দেবারতি ভাস্করবাবুর গাড়ির ওপরে পড়েছে রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের পাঁচতলার ঘরের পশ্চিমের জানলা দিয়ে, চারতলা থেকে নয়। গালিলেও আর নিউটনের সূত্রের সাহায্য নিয়ে, ভাস্করবাবুর গাড়ির আঘাতের পরিমাণ মাপজোখ করে, মাধ্যাকর্ষণের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে হয়তো সহজেই বোঝা যেত, দেবারতি হোটেলের পাঁচতলা থেকে নীচে

পড়েছে চারতলা থেকে নয়। কিন্তু যেহেতু এসব মাপজোখ বা পরীক্ষা আমরা করে দেখতে পারিনি, তাই ব্যাপারটা বুঝতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বাঁ হাতে মাথার পাকা চুলের গোছায় টান মারলেন অশোকচন্দ্র। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অনামিকা যখন দেবারতির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকাডাকি করছে, তখন, ঠিক তার ওপরের ঘরে, রত্নাবলী ভীষণ পরিশ্রমের কাজ করছেন : প্রায় অচেতন দেবারতিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছেন জানলার কাছে। অচেতন কেন? এর উত্তর খুব সহজ-সচেতন থাকলে রত্নাবলীর পক্ষে ওকে কায়দা করা সম্ভব হত না।

হোটেলের বেয়ারাদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে আমরা আপনাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা করে টাইম-চার্ট তৈরি করেছি। সেই চার্ট অনুযায়ী দেবারতি মানিকে রাত সওয়া দশটা নাগাদ রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ঘরে ঢুকতে দেখা গেছে। আর-একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন হল, রাত দশটা নাগাদ রুম সার্ভিসকে ফোন করে মিসেস মুখার্জি হুইস্কির একটা ছোট বোতল আনিয়েছিলেন। অর্ধেকের বেশি খালি বোতলটা পাওয়া গেছে তার ঘরে। কিন্তু আমরা যতদূর খোঁজখবর নিয়েছি তাতে উনি ড্রিঙ্ক করতে অভ্যস্ত একথা কেউ বলেননি। তা হলে তিনি হুইস্কি আনিয়েছিলেন কার জন্যে? দেবারতি মানির জন্যে। অর্থাৎ, সেই মুহূর্ত থেকেই খুনের পরিকল্পনা বাসা বেঁধেছে রত্নাবলীর মনে। তবে দেবারতিকে তিনি ঠিক কোন অজুহাতে ঘরে ডেকেছিলেন তা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, সেই হুইস্কিতেই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে যেভাবেই হোক সেটা দেবারতিকে খাইয়ে দিয়েছিলেন রত্নাবলী। তারপর অচেতন দেবারতিকে ঘরে বন্ধ করে রেখে তিনি ওর ঘরে গিয়েছিলেন জানলাটা খুলতে।

উৎপলেন্দু সেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু আমার ডাকাডাকিতে দেবারতির ঘর থেকে রত্নাবলী সাড়া দিলেন কেন?

উৎপলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এসিজি : সাড়া না দিয়ে ওঁর উপায় ছিল না। কারণ, আপনি যদি দেবারতির সাড়া না পেয়ে নেশার ঝেকে শোরগোল শুরু করে দিতেন তা হলে

রত্মাবলীর সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেত। অচেতন দেবারতি মানিকে খুঁজে পাওয়া যেত ওঁর ঘরে, আর তারপর, প্রথম সুযোগেই দেবারতি ওঁর লেখালিখির সব রহস্য নিষ্ঠুরভাবে ফাস করে দিত।

টুকরো-টুকরো সব ছবিগুলো এক অদ্ভূত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পরপর জুড়ে নিচ্ছিলেন ভাস্কর রাহা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই। রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ই সেই বিশ্বাসঘাতক –যাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল দেবারতি।

ভাস্কর রাহা টের পাচ্ছিলেন, চুরুটের প্রিয় স্বাদ কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে তার মুখে।

অনিমেষ চৌধুরি শব্দ করে পান চিবোচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই অতি সাবধানে মুখ নেড়ে বললেন, কিন্তু চাবি? চাবিটা বন্ধ ফ্ল্যাটের টেবিলের ওপরে গেল কী করে?

এসিজি মাথা নাড়লেন, চুল টানলেন কয়েকবার। তারপর যেন আপনমনেই বললেন, হুম...চাবি...লড রুম প্রবলেম। মুখ তুলে একে একে দেখলেন সবাইকে ও এ-ব্যাপারে আপনাদের অনেকের সাহায্যই আমি পেয়েছি। তবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন ভাস্করবাবু। কারণ দেবারতির খুনের বেলায় খুনি বেরিয়ে গেছে দরজা দিয়েই, তবে চাবিটা ওর ঘরে ঢুকেছিল জানলা দিয়ে। ভাস্করবাবু বলেছিলেন, খুনি টেরাস থেকে চারতলার ঘরের জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল চাবিটা। আসলে চাবিটা জানলা দিয়ে ঢুকলেও সেটা নীচ থেকে আসেনি–এসেছে ওপর থেকে।

এলোমেলো গল্পটা এবারে খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে নেওয়া যাক। যেভাবেই হোক দেবারতি মানি জেনে ফেলেছিল রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় একজন ছায়ালেখক ব্যবহার করে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছেন। এতে দেবারতি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কারণ সত্যি-সত্যিই ও রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ভাস্করবাবুর কাছেই শুনেছি, কনফারেন্সের প্রথম দিনে রত্নাবলীর গল্পপাঠের সময় ও কীরকমভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিল। আপনারা হয়তো সেটা প্রশংসা ভেবেছেন, কিন্তু আমার শুনে মনে হয়েছে, সেটা তীব্র ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু

নয়। কারণ, দেবারতি স্পষ্টভাষী বেপরোয়া দেবারতি তখন ভেতরে-ভেতরে জ্বলছিল। আমার ধারণা, দেবারতি যখন রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের ইন্টারভিউ নেয় তখন এ-নিয়ে কথা তোলে, হিন্টস দেয়, হয়তো ওর স্বভাব অনুযায়ী আক্রমণও করে। ঠিক কী হয়েছিল তা এখন একমাত্র রত্নাবলীই বলতে পারবেন।

দেবারতি হুমকি দিয়ে শাসিয়ে চলে যাওয়ার পর রত্নাবলী বোধহয় দুশ্চিন্তায় পড়েন। তারপর, একটা প্ল্যান ছকে নিয়ে, সেদিনই রাত দশটা নাগাদ দেবারতিকে আবার নিজের ঘরে ডাকেন। অর্থাৎ, সমঝোতা ইত্যাদির নাম করে মেয়েটাকে ফাঁদে ফেলেন। তারপর স্লিপিং পিল মেশানো হুইস্কি খাইয়ে ওকে অজ্ঞান করে দেন। দেবারতির সঙ্গে বোধহয় কোনও ব্যাগ ছিল–আর ব্যাগেই ছিল ওর ঘরের চাবি। রত্নাবলী ওর ব্যাগটা নিয়ে নিজের ঘর বন্ধ করে চলে আসেন দেবারতির ঘরে। চাবি দিয়ে দরজা খুলতে কোনও অসুবিধে হয়নি ওঁর। তারপর পশ্চিমের বড় জানলাটা খোলার ব্যবস্থা করে গোল টেবিলটাকে সরিয়ে নিয়ে যান জানলার কাছে। টেবিলের কাগজপত্র ঘেঁটে দেবারতির অসমাপ্ত লেখাটা দেখতে পান। আর ঠিক সেই সময়েই হয়তো উৎপলেন্দু সেন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে ডাকাডাকি শুরু করেন ঘরের দরজায়।

রত্নাবলীর তখনকার মনের অবস্থাটা আপনারা সকলে একবার ভেবে দেখুন। ওপরের তলায় ওঁর ঘরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে এক দুর্বিনীত জার্নালিস্ট–যে সুযোগ পেলেই সারা দুনিয়াকে রহস্য-সম্রাজ্ঞীর রহস্য জানিয়ে দেবে। চুরমার করে দেবে ওঁর মান-সম্মান, তছনছ করে দেবে ওঁর এতদিনের সাজানো বাগান। অর্থাৎ, রত্নাবলী ধ্বংস হয়ে যাবেন…চিরকালের জন্যে। সুতরাং বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন রত্নাবলী। একজন বয়স্ক গৃহবধু শুধুমাত্র নিজের, নিজের পরিবারের, সামাজিক সম্মান আর প্রতিষ্ঠা অকলঙ্ক রাখার জন্যে কী করুণভাবে হিংস্র হয়ে উঠলেন! করুণ বলছি এই কারণে যে, ওঁর সেই অবস্থার কথা ভাবলে করুণা ছাড়া আর কোনও শব্দ মনে আসে না।

যাই হোক...উৎপলেন্দুবাবুকে সামাল দিয়ে রত্নাবলী দেবারতির লেখাটার শেষ দুটো লাইন কেটে দেন ওরই পেন দিয়ে। আমার ধারণা, ওই দুটো লাইনের কোথাও হয়তো রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়ের কীর্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু লেখাটা একেবারে লোপাট করতে ভরসা পাননি তিনি। কারণ, দেবারতি হয়তো পরিচিত অনেককেই বলে রেখেছে যে, ও একটা লেখা লিখছে। লেখাটা হয়তো ও কনফারেন্সের শেষ দিনে মানে, আজ–পড়ার মতলব করেছিল। সুতরাং সেই লেখা যদি ওর ঘর থেকে খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে মুশকিল হতে পারে। আবার ওই লেখা অর্ধেকটা লিখে কেউ যে আচমকা আত্মহত্যা করতে পারে না, সেটাও তো ঠিক। তাহলে? সেই মুহূর্তে বিপর্যস্ত রত্নাবলী কী করবেন বুঝে উঠতে পারেননি। ওঁর তখন উদভ্রান্ত অবস্থা। তাই আধখোলা দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড নিয়েও তিনি কিছু ভেবে ওঠার সুযোগ পাননি...।

একটু হাসলেন এসিজি। কুণ্ঠিতভাবে বললেন, তা ছাড়া খুনি একটু-আধটু ভুল না করলে আমাদেরই বা চলে কী করে!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম...দেবারতি মানির ব্যাগটা বিছানার ওপরে রেখে দিয়ে চাবিটা নিয়ে তিনশো আট নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রত্নাবলী। ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে সোজা চলে যান নিজের ঘরে। অজ্ঞান দেবারতিকে টেনেহিঁচড়ে অতিকষ্টে নিয়ে যান জানলার কাছে। তারপর ওকে জানলা দিয়ে ফেলে দেন সোজা নীচেভাস্করবাবুর গাড়ির ছাদে।

রত্নাবলী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ওঁর বিশ্রাম নেওয়ার সময় ছিল না। কারণ, আরও একটা জরুরি কাজ তখনও বাকি। সেটা হল : দেবারতির ঘরের চাবিটা ওর ঘরে পাঠানো। সুতরাং, তাড়াতাড়ি একটা লম্বা সুতো নিয়ে ছুঁচে সুতো পরানোর মতো দেবারতির চাবির রিঙে পরিয়ে দিলেন রত্নাবলী। সুতোর দুটো মাথা এক করে–মানে, ঠিক যেভাবে রঞ্জন দেবনাথ খুনির দড়ি বেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি আমাদের শুনিয়েছিলেন–চাবির রিংটাকে জানলা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন বাইরে। তারপর সেটাকে সামনে পেছনে দোল খাইয়ে কিছুক্ষণের চেষ্টায় চাবিটাকে দেবারতির জানলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন ঘরের ভেতরে। রত্নাবলীর প্ল্যানমাফিক চাবিটা গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরে, তবে মেঝেতে পড়লেও

কোনও ক্ষতি ছিল না। এইবার সুতোর একটা মাথা ছেড়ে দিয়ে অন্য মাথাটা ধীরে-ধীরে টানতে শুরু করলেন তিনি। একসময় লম্বা সুতোটা চলে এল ওঁর হাতে, আর চাবিটা পড়ে রইল ভেতর থেকে লক করা ঘরের মধ্যে : জন্ম নিল বন্ধ ঘরের রহস্য। সব কাজ শেষ হওয়ার পর রত্নাবলী ধকল কাটাতে দু-এক ঢোক হুইস্কি হয়তো খেয়েও থাকতে পারেন—ঠিক বলতে পারব না।

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে কয়েকবার কাশলেন এসিজি। তারপর বললেন, আজ সকালে তার লেখালিখি নিয়ে ভাস্করবাবু আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে একটা কথা ছিল অনেকটা এইরকম :..রহস্যের প্রত্যেকটি টুকরোকে কল্পনার সুতোয় গেঁথে খুশিমতো খেলিয়ে...ইত্যাদি। ইত্যাদি। এই কথাটা শুনেই আমার বিগড়ে যাওয়া থিঙ্কিং মেশিন মুহূর্তে ঠিকঠাক হয়ে যায়। চাবি জানলা দিয়ে ঢোকানোর রহস্যটা পলকে ফাঁস হয়ে যায় আমার কাছে। এজন্যে ভাস্করবাবুর কাছে আমি ঋণী।

ভাস্কর রাহার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকালেন এসিজি।

উত্তরে ভাস্কর ছোট্ট করে হাসলেন।

আশা করি আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব আপনারা পেয়ে গেছেন? এসিজি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন সকলের জন্য।

উত্তরে উৎপলেন্দু বললেন, না, একটা প্রশ্নের জবাব পাইনি। কে সেই ছায়ালেখক? আমাদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয়ই?

অশোকচন্দ্র গুপ্ত রত্নাবলীর দিকে তাকালেন। নীচু গলায় বিড়বিড় করে বললেন, জানি না। একমাত্র মিসেস মুখার্জি বলতে পারেন।

রত্নাবলী মুখে আঁচল গুঁজে মাথা নীচু করে বসেছিলেন। ওঁর শরীরটা সামান্য কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মুছে কয়েকবার নাক টেনে মুখ তুললেন তিনি।

চোখ লাল, চোখের কোল ফোলা। সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা।

চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে মাথা সামান্য হেলিয়ে ভাঙা গলায় কথা বললেন তিনি, এগারো বছর ধরে আমার সব লেখা রঞ্জন লিখে দিয়েছে। যেসব বইয়ের জন্যে আমার এত নামডাক সেগুলো সব রঞ্জনের লেখা...শুধু বইগুলোর টাইটেল পেজে আমার নাম ছাপা আছে।

সবাই অবাক হয়ে তাকালেন রঞ্জন দেবনাথের দিকে। যা শুনছেন ঠিক শুনছেন তো! কিন্তু রঞ্জন দেবনাথ নির্বাক নির্বিকার।

দু-একবার ঢোঁক গিলে রত্নাবলী আবার বলতে শুরু করলেন, ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমার লেখা ও প্রথম দিকে কারেকশান করে দিত। তারপর এক-একসময় গোটা লেখাটাই রিরাইট করে দিত। সেগুলো আমি আবার নিজের হাতে কপি করে ছাপতে দিতাম। প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা অনেকটা খেলা বা মজার মতো ছিল। কিন্তু যেই আমার বইয়ের বিক্রি বাড়তে লাগল তখন সেটা আর নিছক খেলা রইল না। রঞ্জনের দু-একটা বই ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো একদম বিক্রি হত না। ওর তখন ফ্যামিলি বারডেন অনেক খুব টাকার দরকার। তাই আমিই একদিন ওকে বললাম, তুমি লেখো—আর সেগুলো আমার নামে ছেপে বেরোক, তা হলে টাকা আসবে। যা পাব, তুমি অর্ধেক নেবে, আর বাকিটা আমি। অবশ্য যদি চাও সবটাই নিতে পারো। তোমাকে দিতে মন চায় না এমন কিছু তো আমার নেই...।

শব্দ করে কেঁদে উঠলেন রত্নাবলী। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আর তো লুকিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। রঞ্জনকে...রঞ্জনকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। এখনও ভালোবাসি। ওর মতো বন্ধু হয় না। আমার জন্যে ও কম স্যাক্রিফাইস করেনি। আমার যে-উপন্যাসটা রবীন্দ্র পুরস্কারের ফাইনাল রাউন্ডে গিয়েছিল সেটাও ওর লেখা। আমার যে-বই ইংরিজিতে বেরিয়েছে সেটারও আসল মালিক রঞ্জন। সত্যি, কত যশ আর খ্যাতি থেকে বেচারা বঞ্চিত হয়েছে! আর আমি? এগারো বছর ধরে অন্যের খ্যাতি নিজের নামে যোগ

করে করে সেটা আমার হকের দাবি বলে ভাবতে শুরু করেছি। সিংহাসনে একবার বসতে পারলে কে আর সহজে নেমে আসতে চায় বলুন! আমারও ঠিক সেই দশা হয়েছিল।

তারপর…তারপর..বছর দুয়েক ধরে রঞ্জন নানান অজুহাতে আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। নিজের নামে লিখতে শুরু করল আবার। আমার তখন কী দুরবস্থা একবার ভাবুন! সবাই লেখা চায়, কিন্তু আমার মাথায় যুতসই কোনও আইডিয়া আসে না। নিজের সঙ্গে সে যে কী কঠিন লড়াই! স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, রূপ-যৌবন-খ্যাতি সবই একে-একে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখন শুধু অপেক্ষা। এরকমই একটা মানসিক অবস্থায় মধ্যে এল এই কনফারেন্স। তারপর… দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন রত্নাবলী।

কিন্তু গোস্ট রাইটারের ব্যাপারটা তো প্রমাণ করা খুব শক্ত। পাঁচকড়ি দে কিংবা এডগার ওয়ালেসের ব্যাপারটা কেউ প্রমাণ করতে পারেননি। অশোকচন্দ্র মন্তব্য করেছেন রত্নাবলীকে লক্ষ করে।

কোনওরকমে কান্না চাপা দিয়ে রত্নাবলী ভাঙা স্বরে বললেন, আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু রঞ্জন একদিন আমাকে কতকগুলো অডিয়ো ক্যাসেট শুনতে দিয়েছিল…আর, কারেকশন করা রিরাইট করা আট-দশটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখিয়েছিল। অডিয়ো ক্যাসেটে আমাদের অনেক অন্তরঙ্গ কথা ধরা ছিল। ওগুলো দেখার পর, শোনার পর আর কোনও যুক্তি টেকে না—একেবারে অকাট্য প্রমাণ।

আবার চোখ মুছলেন রত্নাবলী ও আশ্চর্য! কীভাবে রত্ন থেকে আমি হঠাৎ মিসেস মুখার্জি হয়ে গেলাম রঞ্জনের কাছে! শেষটা এত কষ্টের হবে ভাবিনি। আপনারা..আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যাই, মিস্টার গুপ্ত…মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে..ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হবে। বড় ক্লান্ত লাগছে।

খুব ধীরে পা ফেলে রত্নাবলী মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন ঘর থেকে। রঘুপতি যাদব নড়েচড়ে উঠেছিল, কিন্তু এসিজি তাকে হাতের ইশারায় থামালেন। রত্নাবলীর ইঙ্গিত তিনি ধরতে

পেরেছেন। বিদায় যদি সত্যিই ওঁকে নিতে হয় তা হলে সম্রাজ্ঞীর মতো বিদায় নেওয়াই ভালো।

উঠে দাঁড়ালেন এসিজি। ভাস্কর রাহাকে লক্ষ করে বললেন, চলি ভাস্করবাবু, পরে কখনও আবার দেখা হবে। আর একটা কথা ও রঘুপতি যাদবের ফাইলে কিন্তু দেবারতি মানির ব্যাপারটা সুইসাইড বলেই লেখা হবে। আশা করি তাতে আপনাদের কোনও আপত্তি হবে না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

তারপর প্রশান্ত রায় এসে দাঁড়ালেন এসিজির কাছে। ইতস্তত করে বললেন, কিন্তু মিস্টার গুপ্ত, দেবারতি মানি ওই সিক্রেট ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল কেমন করে?

তেতো হাসলেন এসিজি। বললেন, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। রঞ্জন দেবনাথই খবরটা দিয়েছিলেন দেবারতিকে। কারণ তিনি জানতেন, দেবারতি ব্যাপারটা জানার পর পরিণতি কী হবে।

অশোকচন্দ্র এগিয়ে গেলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রঞ্জনের কাছে। ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, আর আপনার কোনও চিন্তা নেই। পথ পরিষ্কার। নাম-ডাক কিংবা টাকা পেতে কাল থেকে আপনার আর কোনও অসুবিধে হবে না।

পাশেই দাঁড়ানো অনামিকার দিকে তাকালেন এসিজি ও মা-মণি, তুমি আমার মেয়ের মতো। একটা কথা তোমাকে বলি। এই সর্বনাশা লোকটার খপ্পরে তুমি পোড়ো না। এই লোকটা রত্নাবলী মুখোপাধ্যায়কে শেষ করেছে, দেবারতি মানিকে শেষ করেছে–এরপর কার পালা কে জানে! আইনের খাতায় এদের শায়েস্তা করার কোনও ব্যবস্থা নেই। কারণ, কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। তাই তোমাকে সাবধান করলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

হাতের ফাইল নামিয়ে রেখে ভারি পায়ে রঞ্জন দেবনাথের সামনে এসে দাঁড়াল রঘুপতি। তারপর ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে বিরাশি সিক্কার এক চড় কষিয়ে দিল রঞ্জনের বাঁ-গালে।

রঞ্জনের মুখটা এক ঝটকায় ঘুরে গেল। ও চিৎকার করে গালাগালি দিল রঘুপতিকে।

রঘুপতি যাদব চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, রাইটার রঞ্জনকো গু কিঁউ আতা হ্যায়? এবং সঙ্গে-সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে। তারপর টান মেরে ওকে পেড়ে ফেলল মেঝেতে।

কী হচ্ছে, রঘুপতি! এসিজি চিৎকার করে উঠলেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! ইউ আর ব্রেকিং দ্য ল!

রঘুপতি তখন মেঝেতে পড়ে যাওয়া রঞ্জন দেবনাথকে যথেচ্ছ লাথি মারছিল। রঞ্জনের গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল বারবার।

একসময় মারধোর থামিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে রঘুপতি বলল, একটু-আধটু ব্রেক না করলে সে আবার কিসের কানুন, স্যার। আর তো চান্স পাব না, তাই এখনই এই কামিনাকে থোড়াসা সবক শিখিয়ে দিলাম।

অশোকচন্দ্র হাত ধরে টেনে নিলেন রঘুপতিকে। তারপর হাঁটা দিলেন দরজার দিকে। কনস্টেবল দুজনও ওঁদের অনুসরণ করল।

করিডর ধরে ওঁরা প্রায় লিফটের দরজার কাছে চলে এসেছেন, এমন সময় পিছন থেকে ডেকে উঠেছেন রূপেন মজুমদার। ওঁরা থামতেই রূপেন দ্রুত পা ফেলে কাছে চলে এসেছেন। ওঁর হাতে দুটো বই—সেই ডাকিনীর হাতছানি।

একটা করে বই রঘুপতি যাদব আর অশোকচন্দ্র গুপ্তকে দিয়ে রূপেন মজুমদার হেসে বললেন, পড়ে দেখবেন, একেবারে ওরিজিন্যাল। অন্য রাইটারদের মতো সাহেব বলিয়াছেন

এরকম কোনও ব্যাপার নেই।

বই হাতে নিয়ে লিফটে করে নামতে নামতে এসিজি ভাবলেন, মানুষ সত্যি কতরকম হয়! মানুষ তাকে সবসময়ই অবাক করে–রংবেরঙের পাখির মতো।

রঘুপতি যাদব হাতঘড়িতে চোখ রাখলঃ রাত দশটা বেজে গেছে।

মার্ডার ডট কম

মার্ডার ডট কম

০১.

মাউসে ডাবল ক্লিক করতেই মনিটরে রঙিন ছবিটা পালটে গেল। আর ঠিক তখনই পারফিউমের গন্ধ নাকে এল আমার। সুতরাং কিবোর্ডে আঙুল চালানো থামিয়ে মনিটরের দিক থেকে চোখ সরালাম।

বর্ষা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী দারুণ দেখাচ্ছে ওকে! গাঢ় নীলের ওপরে সাদা-ফুল চুড়িদার। গলায় সাদা ওড়না। কপালে টিপ, চোখে কাজল। নাকে সরষের দানার মতো নাকছাবি।

অফিসের কাজ ছাড়া আমার কাছে ও খুব একটা আসে না। আর যদিও বা হঠাৎ করে আসে, তো দু-পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না। আমিই বরং এই প্রোগ্রামটা কেমন যেন ট্রাবল দিচ্ছে, অমুক ফ্লপিটা কি তোমার কাছে আছে?, ম্যানেজারসাহেব ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে কোথায় গেলেন বলো তো!—এই সব ছলছুতোয় ওর সিটের কাছে যাই। সেখানে আশাবাদী দু-চারজন পুরুষের ভিড় সবসময়েই লেগে আছে। তাই আমার কেমন যেন লজ্জা করে। অথচ ওর কাছে না গিয়েও পারি না। ভেতর থেকে কে যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

বর্ষার টেবিলের কাছে গেলেই আমার অস্কার পুরস্কারের কথা মনে পড়ে। দ্য নমিনিজ আর... বলেই চার-পাঁচটি নাম। আর তারপরই .অ্যান্ড দ্য অ্যাওয়ার্ড গোজ টু...। এই অফিসের চার পাঁচজন সেই অস্কার নমিনির মতোই ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে তার মধ্যে আমিও আছি। অ্যাওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত কে পাবে জানি না।

রীতেনদা, একটা হেল্প করবেন?

এরকম মিষ্টি অনুরোধে সমরখন্দ-বোখারাও দিয়ে দেওয়া যায়। তাই বললাম, তোমাকে হেল্প করার জন্যে আমি আপাদমস্তক তৈরি। বলো, কী করতে পারি। ইট উইল বি মাই প্লেশার।

বর্ষা আমার পাশের একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর মুখে একটা ছেলেমানুষি কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে আবদারের গলায় বলল, আপনার মোবাইল ফোনটা একটু ইউজ করতে দেবেন?

আমি বুক পকেট থেকে নোকিয়া সিক্স-ওয়ান-ওয়ান-জিরোটা বের করে ওর হাতে দিলাম। বললাম, ইচ্ছে হলে সারাদিন রাখতেও পারো।

না, না–জাস্ট একটা ফোন করব। হাসল ও ও অফিসের ফোন থেকে কিছুতেই লাইন পাচ্ছি না।

বর্ষা আমার সামনে বসেই বোতাম টিপতে শুরু করল।

আমি কি সিট ছেড়ে উঠে যাব?

না, না, আপনি থাকতে পারেন। প্রাইভেট কিছু নয়...দিদির সঙ্গে একটু কথা বলব।

আমি কম্পিউটারে কাজ বন্ধ রেখে বর্ষাকে অনুভব করতে লাগলাম।

আমাদের অফিসটা এয়ার কন্ডিশন্ড, কিন্তু কাচের জানলা দিয়ে বাইরের গনগনে রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে শীত-গ্রীষ্ম এবং বর্ষা..দারুণ!

ফোন শেষ করে হ্যান্ডসেটটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বর্ষা বলল, অনেক চার্জ উঠল, না?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ, সাংঘাতিক। কাল থেকে আমাকে টোল-পড়া অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে নীচে গণেশ অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে ঘুরতে হবে।

বর্ষা হাসল। ওর গালে টোল পড়ল।

তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। আজকের দিনটা সাবধানে থেকো।

কেন!

আমাদের অফিসে নেকড়ে আর হায়েনা তো কিছু কম নেই!

বর্ষা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে, মনে হল আমাকে ও তার মধ্যে ধরবে কি ধরবে না ভাবছে।

এমন সময় প্রকাশ রায়চৌধুরী এগিয়ে এল আমাদের কাছে।

ফরসা, লম্বা-চওড়া, মাথায় কঁকড়া চুল, গলায় সোনার চেন, একটু ওভারস্মার্ট। ও একজন অস্কার নমিনি। তাই বর্ষাকে আমার কাছে পাঁচমিনিটের বেশি বসতে দেখে সাঙ্ঘাতিকরকম উতলা হয়ে পড়েছে।

আমার দিকে আড়চোখে একপলক দেখে বর্ষার দিকে মনোযোগ দিল প্রকাশ : হাই রেইন, আমার কম্পিতে কিছু ডেটা ঢোকানোর ব্যবস্থা করো। মাই মেশিন ইজ স্টার্ভিং।

বর্ষাকে প্রকাশ রেইন বলে। তাই আমি ওকে মনে-মনে বলি রেইনম্যান।

আমার হাতের মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল প্রকাশ ও মোবাইল ফোনটা নেওয়ার পর রীতেনদার স্ট্যাটাস কিন্তু হেভি বেড়ে গেছে। আগে রীতেনদাকে কেউ পাত্তা দিত না—এখন থোড়া-থোড়া দিচ্ছে।

প্রকাশ বর্ষাকে আর-একবার ডেটার তাগাদা দিয়ে চলে গেল।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার মুখ আর কান বেশ লাল হয়েছে।

বর্ষা নরম গলায় বলল, প্রকাশদার কথায় কিছু মাইন্ড করবেন না।

না, মাইন্ড করিনি। ব্যাপারটা খুব স্পষ্টঃ নেকড়ে হায়েনাকে কামড় বসিয়ে গেল।

খিলখিল করে হেসে উঠল বর্ষা। আমার বুকের ভেতরে পাগলা হাওয়া নেচে উঠল।

হঠাৎ দেখি আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজার মঙ্গল পুরকায়স্থ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আড়ালে ওঁকে আমরা মংপু বলে ডাকি।

মংপুও একজন অস্কার নমিনি। যদিও ওঁর বয়েস পঞ্চান্ন—একটি ছেলে, একটি মেয়ে, এবং একটি হস্তিনী স্ত্রী আছে।

আমি চাপা গলায় বর্ষাকে বললাম, আর-একটা গোদা নেকড়ে আসছে। তুমি সিটে ফিরে যাও। আমি আর কামড় খেতে চাই না। বরং বিকেলের দিকে দশমিনিট গল্প করতে যাব।

বর্ষা ও. কে. বলে চটপটে পায়ে নিজের সিটের দিকে রওনা দিল।

আর কী আশ্চর্য! মংপুও কম্পাসের অনুগত কাটার মতো গতিপথ পালটে বর্ষার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল।

গত চার-পাঁচ বছরে যে-কটা সফটওয়্যার কোম্পানি নাম করেছে তার মধ্যে আমাদের কোম্পানি সফট কর্পোরেশন বেশ এগিয়ে রয়েছে। এখানে প্রোগ্রামার হিসেবে মাইনে আমি খারাপ পাই না। কিন্তু ফ্যামিলি বার্ডেন থাকায় অর্ডার সাপ্লাইয়ের ছোটখাটো একটা ব্যবসাও চালাই। ব্যবসার খাতিরেই মাসদুয়েক হল মোবাইল ফোনটা নিয়েছি। আমার ছোটভাই ব্রতীন বি.এস-সি. পাশ করেছে। গত বছর। তারপর ব্যবসার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে বেশ খানিকটা হাঁফ ছাড়তে পারছি।

হঠাৎই বিপ-বিপ করে দুবার শব্দ হল।

চমকে উঠলাম। প্রথমে মনে হল আমার ফোনের ব্যাটারি হয়তো কাবু হয়ে পড়েছে। কারণ, ব্যাটারি লো হলেই বিপ শব্দ হয়। কিন্তু সে তো একটা শব্দ–দুবার তো নয়! তখনই খেয়াল হল, সেলফোনে কেউ কোনও মেসেজ পাঠালে দুবার বিপ-বিপ শব্দ হয়। দিনসাতেক আগে হ্যান্ডসেট রিপেয়ার করার একজন টেকনিশিয়ানের মেসেজ পেয়েছিলাম সঙ্গে তার মোবাইল নাম্বার।

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে দেখি তার এল সি ডি প্যানেলে একটা মেসেজ ফুটে উঠেছে। মেসেজটা ভারী অদ্ভুত?

সেক্সি ফ্রেন্ডশিপ উইথ সুইট লেডিজ! সিক্রেসি গ্যারান্টিড।
কল ৯৮৩০০ ০১২৩৪।

তার মানে! মিষ্টি মেয়েদের সঙ্গে অন্যায় বন্ধুত্ব! কেউ জানতে পারবে না!

মিনিটখানেকের জন্যে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার কখনও সেরকম ঘনিষ্ঠতা হয়নি। সেরকম কোনও সুযোগও আসেনি।

আমার পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই বাপি চলে গেছেন। একমাত্র বোন মিলি আর ওর পরের ভাই ব্রতীন তখন বেশ ছোট। মা ক্রনিক আলসারের রুগি। কী করে যে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়েছি সে আমিই জানি! আজ মায়ের বয়েস আরও বেড়েছে, আরও অসুস্থ হয়েছে। মিলির এখনও বিয়ে দেওয়া হয়নি। মা সবসময় সেই চিন্তা করে। আমি মায়ের কাছে আরও দুটো বছর সময় চেয়েছি। বলেছি, আমি আর ব্রতীন মিলে ব্যবসা দাঁড় করিয়ে মিলিকে ভালোভাবে পাত্রস্থ করব। কিন্তু মাঝে-মাঝে নিজেরই মনে হয়, শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারব তো! বাপি চলে গিয়ে আমাকে বড় অসহায় করে গেছেন।

নিজেকে নিয়ে আমি বেশ ভাবি। বয়েস তিরিশ পেরিয়ে গেল। একজন সুপুরুষ যুবকের জীবনে যেসব সুন্দর-সুন্দর ঘটনা ঘটে তার কিছুই আমার কপালে জুটল না। বন্ধুবান্ধবের মুখে কত রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনি। শুনে রাতে কত উলটোপালটা কল্পনা করি। বর্ষাকে কত আদর করি। মাধুরী দীক্ষিত কিংবা জুলিয়া রবার্টসও আমার ভালোবাসাবাসির ছায়া-যুদ্ধ থেকে। বাদ যায় না। আমার মধ্যে যে একটা প্রেমিক মন আছে সেটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না।

হয়তো সেইজন্যেই মোবাইল ফোনের মেসেজটা আমার মনে দাগ কাটল। ফোন-নম্বরটা মুখস্থ হয়ে গেল সহজেই। তারপর ভাবলাম, এ আবার সেই পার্টি লাইন বা টেলি-ফ্রেন্ড-এর মতো নয়তো! যত ভালোবাসা শুধু টেলিফোনে! সেও তো আর-একরকম ছায়া-যুদ্ধ!

না, ওসব টেলিফোন-ঠেলিফোন নয়। আসল ব্যাপারটা আমার একবার চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে।

তা হলে ওই নম্বরে পরে একটা ফোন করে দেখলে কেমন হয়!

আমার সফটওয়্যার ডেভেলাপমেন্টের কাজে বারবার ভুল হয়ে যেতে লাগল। যতই ছুটির সময় কাছে এগিয়ে আসতে লাগল ততই ভেতরে-ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ টেবিল ছেড়ে বর্ষার কাছে গেলাম।

ও একমনে কম্পিউটারে কাজ করছিল। অস্কার নমিনিরা কেউ ধারে কাছে নেই–শুধু আমি ছাড়া।

ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল ও। ডান হাতের সুন্দর আঙুলগুলো মাউস আঁকড়ে রয়েছে। মাউসটা আমার হাত হতে পারত।

বলুন, রীতেনদা–।

আমি চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্লাস্টিক আর কাচের পার্টিশন দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট কিউবি। যে-যার সিটে বসে কাজ করছে। শুধু এয়ারকুলারের ভোমরার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

কখন বেরোবে অফিস থেকে? আমি আলতো করে জিগ্যেস করলাম।

হাতের কাজটা কমপ্লিট হলেই বেরোব। একটু দিদির বাড়ি যেতে হবে।

বর্ষার বাড়ি শুনেছি এন্টালির দিকে। আর আমার সূর্য সেন স্ট্রিটে। তবুও অনেক সময় ওর সঙ্গে বাস স্টপ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়। তবে একা নয়–আরও দু-একজন নমিনি সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে। কোনও-কোনও দিন মঙ্গল পুরকায়স্থ বর্ষাকে লিফ্‌ট দেন। বর্ষার কাছেই শুনেছি, মাঝে-মাঝেই নাকি উনি বর্ষাকে লাঞ্চ কিংবা ডিনারের প্রস্তাব দিতে ছাড়েন না।

সাহস করে বলতে পারলাম না, ঠিক আছে, দুজনে একসঙ্গে বেরোব। তার বদলে মুখ ফসকে অস্কার পুরস্কারের ব্যাপারটা ওকে বলে ফেললাম। শুনে ও তো হেসেই অস্থির।

আমি ওর হাসি দেখছিলাম। আর এদিক-ওদিক থেকে চার-পাঁচ জোড়া চোখ আমাদের দেখছিল।

ওর হাসির ঝিলিক কমলে পর বললাম, দ্যাখো, স্পষ্ট কথা বলাই ভালো। আমি কিন্তু সাধুপুরুষ নই–আমিও একজন অস্কার নমিনি।

আবার খিলখিল হাসি। তারপরঃ আপনি দারুণ জোক করতে পারেন। অস্কার অ্যাওয়ার্ড..অস্কার নমিনি...মাই গুডনেস! হাসির চোটে ওর চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল। আঙুল বুলিয়ে সেই জল মুছে নিল বর্ষা।

বর্ষার কাছে এলে আমার কী যে হয়! মনের সব কথা উজাড় করে বলতে ইচ্ছে করে। মোবাইল ফোনে আসা মেসেজটাও ওকে বলতে ইচ্ছে করল। তাই ভয় পেয়ে নিজের সিটে ফিরে এলাম।

আসার পথে লক্ষ করলাম, প্রকাশ রায়চৌধুরী দূর থেকে আমাকে দেখছে।

.

সেদিন রাতে, আটটা নাগাদ, মেসেজটা আর-একবার এল।

আমি পাড়ার চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা সামনে নিয়ে বর্ষার কথা ভাবছিলাম। মন টন ভীষণ খারাপ। তখনই বিপ-বিপ শব্দটা হল।

হঠাৎই মাথার মধ্যে কী যে হল, উচ্ছৃঙ্খল হতে খুব সাধ জাগল। বর্ষার ওপর অনেকটা অভিমান নিয়েই চায়ের কাপ ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। কাছাকাছি একটা ফোন বুথে ঢুকে পড়ে বোতাম টিপলাম : ৯৮৩০০ ০১২৩৪।

একটু পরেই ও-প্রান্তে একজন মহিলার মিষ্টি গলা পেলাম।

হ্যালো।

আপনারা আমার মোবাইল ফোনে একটু আগে একটা...একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। সকালেও মেসেজটা একবার পেয়েছিলাম।

আপনার মোবাইল নাম্বারটা কাইন্ডলি বলবেন?

নাম্বার বললাম।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি মিস্টার রীতেন মিত্র?

হ্যাঁ। আমার গলাটা হঠাৎই কেমন শুকিয়ে গেল। ওরা আমার নাম জানল কেমন করে! তা হলে কি সবার মোবাইল নাম্বার আর নামের লিস্ট তৈরি করে তারপরই ওরা মেসেজ পাঠাতে শুরু করেছে।

আপনারা...মানে আমার নাম..ইয়ে...।

রিল্যাক্স, মিস্টার মিত্র। আপনি ফর নাথিং নার্ভাস হচ্ছেন। আমাদের বিজনেসের ক্যাপিটালই হল সিক্রেসি আর প্রাইভেসি। মহিলা আমাকে আশ্বাস দিলেন : আপনি কাল সন্ধে সাতটায় আমাদের অফিসে চলে আসুন। আমাদের এনরোলমেন্ট ফি দুশো টাকা। আর তারপর সার্ভিস অনুযায়ী চার্জ। ঠিক সাতটায় আসবেন কিন্তু!

এরপর তিনি পার্কসার্কাস অঞ্চলের একটি ঠিকানা বললেন। কীভাবে সেখানে পৌঁছতে হবে সেটা পাখি-পড়া করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। এখানে এলে আপনার ভালো লাগবে। তবে মনে রাখবেন, তিনতলার ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটে লেখা আছে মিস্টার পি. দত্তগুপ্ত, ক্লিয়ারিং এজেন্ট। ওখানে লোক থাকবে। তাকে দুশো টাকা দিয়ে দেবেন ক্যাশ। তারপর আমরা আপনাকে খুশি করার জন্যে যা-যা করা দরকার করব। গুডনাইট।

কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলাম আমি। মনে-মনে বেশ কৌতূহল হচ্ছিল। দুশো টাকা খুব একটা বেশি নয়। তারপর কত–তিনশো, পাঁচশো, হাজার? একবার, মাত্র একটিবার, ব্যাপারটা চেখে দেখতে ক্ষতি কী! মা, মিলি, ব্রতীন, বর্ষা–কেউ কিছু টেরই পাবে না।

সুতরাং পরদিন কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধে সাতটায় দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম।

.

০২.

পালিশ করা বিশাল কাঠের দরজা। তাতে ম্যাজিক আই লাগানো। দরজার ডানদিকের ফ্রেমে কলিংবেলের বোতাম।

নেমপ্লেটের লেখাটা আর-একবার পড়ে নিয়ে কলিংবেলের বোতাম টিপলাম।

দত্তগুপ্তদের ফ্ল্যাটবাড়িটা বেশ পুরোনো ধাঁচের। এক-একটা তলার হাইট প্রায় পনেরো-ষোলো ফুট হবে। বাড়ির বাইরের চেহারাটা জব চার্নক হলেও ভেতরটা ঋত্বিক রোশন। অভিজাত পয়সাওয়ালা মানুষজনই এইসব ফ্ল্যাটে থাকে।

বাড়িতে ঢুকেই প্রথম যে-ব্যাপারটা আমার নজর কেড়েছে সেটা নির্জনতা। সিঁড়ি আর অলিন্দ দেখে মনে হয় না কেউ এখানে থাকে।

শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলতেই পারফিউমের উগ্র গন্ধ আমাকে স্বাগত জানাল।

দারুণ সাজগোজ করা একজন মহিলা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে। ফরসা, গোলগাল চেহারা, কোঁকড়ানো চুল। বয়েসটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে, মেকাপের কথা

আর শুনছে না।

মহিলা বড় বড় শ্বাস ফেলছিলেন। ওঁর ভারী বুক ওঠা-নামা করছিল।

আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছিল অকারণেই। বেশ টের পাচ্ছিলাম, কপালের পাশ দিয়ে ঘামের রেখা গড়িয়ে নামছে।

রুমাল বের করে ঘাম মুছে নিয়ে আমি বললাম, আমার...আমার নাম রীতেন মিত্র। সাতটায় আমার আসার কথা ছিল।

ভদ্রমহিলা হাসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর মুখটা মিষ্টি হয়ে গেল।

আসুন, ভেতরে আসুন। ওঁর গলাও দারুণ মিষ্টি।

আমি ভেতরে ঢুকতেই মহিলা দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

সামনের ঘরটা রিসেপশান কিউবিলের ঢঙে সাজানো। বাঁদিকে ঝকঝকে কাউন্টার–তার ওপরে টেলিফোন আর কম্পিউটার। পাশেই রাখা নোটপ্যাড আর পেন।

ডান দিকের কোণে একটা সুদৃশ্য টুলে রাখা আছে একটা চিনেমাটির ফুলদানি–তাতে রংবেরঙের ফুলের তোড়া বসানো। তার পাশ ঘেঁষে লম্বা একটা সোফা। সোফার ঠিক ওপরে দেওয়ালে টাঙানো একটা রঙিন ছবি। ছবিতে কয়েকটি মেয়ে লোভনীয় ঢঙে দাঁড়িয়ে। ওদের শরীরের ওপরে লেবেল সাঁটার মতো করে একটা ইংরেজি ক্যাপশান লেখা? সে হ্যালো টু এভরিবডি। তার পাশেই একটা ক্যালেন্ডার আর একটা ফুটফুটে বাচ্চার ছবি ঝুলছে। অন্যায় খেলার ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও।

ফ্ল্যাটটা কেমন নিঝুম আর ফঁকা-ফঁকা। তাতে আমার একটু অবাক লাগছিল। কিন্তু ওরাই তো ফোনে বলেছে, সিক্রেসি আর প্রাইভেসি ওদের ক্যাপিটাল! তাই হয়তো এ-সময়টায় আর কাউকে আসতে বলেনি।

ভদ্রমহিলা কেমন যেন এলোমেলো ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন। নার্ভাসভাবে বারবার শাড়ি ঠিক করছিলেন। আমাকে সোফায় বসতে বলে কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে এদিক-ওদিক হাঁটকাতে লাগলেন।

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে ঢোঁক গিলে বললাম, আমার...দুশো টাকা দেওয়ার কথা ছিল। টাকাটা পকেট থেকে বের করে ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

কাঁপা হাতে টাকাটা নিয়ে রিসেপশান কাউন্টারের একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি একটু বসুন। আমি মিস্টার দত্তগুপ্তকে খবর দিচ্ছি।

একটা কাঠের দরজা ঠেলে মহিলা ফ্ল্যাটের ভেতরের দিকে চলে গেলেন। আমি দুরুদুরু বুকে অন্যায় অভিযানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিটখানেক পরেই ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন। ছোট্ট করে হেসে বললেন, আপনি বসুন, উনি এখুনি আসছেন। আমি আপনার জন্যে কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসছি।

কথাটা বলেই মহিলা ফ্ল্যাটের সদর দরজা খুলে ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। আমি অপেক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়ে টেনশান কাটাতে একটা সিগারেট ধরালাম।

প্রায় মিনিট পনেরো কেটে যাওয়ার পর আমার ধৈর্যে টান পড়ল। দত্তগুপ্তের হল কী! সিগারেট কখন শেষ হয়ে গেছে! ঘড়ির কাঁটা সাড়ে সাতটার ঘরে পৌঁছে গেছে। নাঃ, এবার একটু খোঁজ করা দরকার।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে তারপর ফ্ল্যাটের ভেতরে যাওয়ার দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কান পেতে কথাবার্তার শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম।, কোনও শব্দ নেই। এই ফ্ল্যাটটা বোধহয় শুধুই যোগাযোগের অফিস। সুইট লেডিজরা থাকে অন্য কোথাও হয়তো নিজের নিজের আস্তানায়।

দরজায় চাপ দিতেই পাল্লা খুলে গেল।

সামনেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পুরোনো আমলে বারান্দা ছিল, এখন ডাইনিং স্পেস। আলো নেভানো থাকায় আবছা আঁধার ছড়িয়ে রয়েছে। তার ডানদিকে দুটো ঘর। দুটো ঘরের দরজাই হাট করে খোলা। একটা অন্ধকার, অন্যটায় আলো জ্বলছে।

চুরুটের হালকা গন্ধ নাকে আসছিল। মিস্টার দত্তগুপ্ত কি চুরুট খাচ্ছেন?

হঠাৎই ফোন বাজতে শুরু করল।

ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি। তারপরই বুঝলাম, পকেটে আমার সেলফোন বাজছে।

ফোনটা পকেট থেকে বের করে অফ করে দিলাম। সুরেলা বাজনা থেমে যেতেই ফ্ল্যাটটা আগের চেয়ে দ্বিগুণ নিস্তব্ধ মনে হল।

যে-ঘরটায় আলো জ্বলছিল, পা টিপেটিপে সেই ঘরটার দিকে এগোলাম।

ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। এবং রাজধানী এক্সপ্রেস যেন দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে আমার হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মারল। বুকের ভেতরে ধুকপুকুনি থমকে গেল। কয়েক লহমার জন্যে। তারপরই তাড়া খাওয়া কাঠবেড়ালির মতো ছুটতে শুরু করল ধকধক...ধকধক...।

ঘরের ধবধবে বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে প্যান্ট-শার্ট পরা একজন মানুষ। তার হাত পা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না কারণ, মুখের ওপরে একটা বালিশ চাপা দেওয়া রয়েছে।

ইনিই কি মিস্টার পি. দত্তগুপ্ত? কে জানে!

কৌতূহল আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরের সর্বত্র বিলাসিতার সিলমোহর। আসবাবপত্র, বিছানা, লাইট, ফ্যান সবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তবে ঘরে পাগলের মতো অনুসন্ধান চালিয়ে কেউ সাজানো-গোছানো ঘরটাকে ছন্নছাড়া করে তুলেছে। বেশ কয়েকটা ড্রয়ার খোলা। আলমারির পাল্লা খোলা। জামাকাপড়, কাগজপত্র সব মেঝেতে ছড়ানো।

ঘরের এক কোণে বিদেশি রঙিন টিভিতে বিবিসি-র খবর চলছে। কিন্তু ভলিয়ুম কমানো থাকায় কোনও শব্দ হচ্ছে না। আর হলেও বিছানায় বিচিত্র ঢঙে শুয়ে থাকা ভদ্রলোকের কানে সে আওয়াজ নিশ্চয়ই ঢুকত না।

বিছানার খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই বালিশের গায়ে পোড়া গর্তটা আমার নজরে পড়ল। বালিশটা একটানে সরাতেই দত্তগুপ্তকে কিংবা বলা ভালো, দত্তগুপ্তের পাস্ট টেন্সকে–দেখা গেল। ওঁর ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুখটা আসলে কেমন ছিল সেটা বুঝতে হলে প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রয়োজন। ওঁর মাথার নীচের বালিশটা লাল। কখনও যে ওটা সাদা ছিল সেটা বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়।

হাতুড়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি দত্তগুপ্তের পালস দেখার চেষ্টা করলাম। অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। তবে ওঁর শরীরটা এখনও গরম আছে। মানে, যে-ই ওঁকে খুন করে থাকুক– ব্যাপারটা খুব বেশি আগে হয়নি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রিভলভারটা চোখে পড়ল না।

কে খুন করল দত্তগুপ্তকে? ওই মহিলা নয় তো! ওঁর আচরণ কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু মেয়েরা কি এরকম নৃশংসভাবে রিভলভার ব্যবহার করে?

আমি যখন এই ফ্ল্যাটে আসি তখন দত্তগুপ্ত নিশ্চয়ই ওপারে চলে গেছেন। কারণ, যতই মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আওয়াজ বন্ধ করার চেষ্টা হোক না কেন একটা ভোতা শব্দ নিশ্চয়ই

আমার কানে আসত। এমনও তো হতে পারে, দত্তগুপ্তকে খুন-টুন করে ভদ্রমহিলা যখন ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাওয়ার মতলব আঁটছিলেন ঠিক তখনই আমি এসে হাজির হয়েছি।

হতে পারে অনেক কিছুই। এখন ওই ভদ্রমহিলার খোঁজ করা দরকার। উনি যদি খুনি নাও হন, উনি নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানবেন। কোল্ড ড্রিঙ্কস আনার নাম করে উনি গেলেন কোথায়! চম্পট দেননি তো!

এই প্রথম কৌতূহলকে ছাপিয়ে ভয় আমার মনে জায়গা করে নিল। ঠান্ডা ঘাম তৈরি হল বুকে-পিঠে। তারপর ধীরে-ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল।

একটা নির্জন ফ্ল্যাটে আমি আর একটা ডেডবডি! এখন যদি কেউ আসে তা হলে কী ভাববে? যদি পুলিশ আসে!

প্রায় দৌড়ে রিসেপশানে চলে এলাম। আমাকে চমকে দিয়ে রিসেপশানের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

নিস্তব্ধ ফ্ল্যাটে টেলিফোনের আওয়াজ আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছিল। তাই রিসিভারটা তুলে কাউন্টারের ওপরে নামিয়ে রাখলাম। ফোনে একটা পুরুষকণ্ঠ হ্যালো হ্যালো বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল।

হঠাৎই আমার মনে হল, আমার নাম, মোবাইল নাম্বার সবই দত্তগুপ্তদের কাছে রয়েছে। এই খুনের তদন্ত করতে এসে পুলিশ যদি সেসব খুঁজে পায় তা হলে আমাকেই হয়তো মার্ডারার বলে সন্দেহ করবে। তা ছাড়া বাড়িতে অফিসে সবাই জেনে যাবে আমি এই ফ্ল্যাটে কেন এসেছিলাম। আমার মনের অবস্থাটা কেউ বুঝতে চাইবে না। শুধু অভিযোগের আঙুল তুলেই চেনা-জানা মানুষজন তাদের দায়িত্ব শেষ করবে।

চটপট চলে গেলাম রিসেপশান কাউন্টারের ওপারে। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে আমার নাম আর মোবাইল নাম্বার থাকাটা অসম্ভব নয়। মেশিনটা অন করাই ছিল। অভ্যস্ত হাতে

হার্ড ডিস্কের সব ফাইল মুছে ফেলার নির্দেশ দিলাম। কম্পিউটার জানতে চাইল আমি সত্যিই সব ফাইল মুছে ফেলতে চাইছি কি না। উত্তরে আমি ওয়াই টিপে এন্টার বোতামটা টিপে দিলাম।

এইভাবে পাগলের মতো একের পর এক ডিরেক্টরি মুছে ফেলতে লাগলাম।

কম্পিউটার যখন মুছে ফেলার কাজ করছিল সেই সময়ে আমি সবকটা ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র হাঁটকাতে লাগলাম।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই একটা ডায়েরিগোছের খাতা পেয়ে গেলাম। তাতে অনেক মেয়ের নাম লেখানামের পাশেই লেখা রয়েছে টেলিফোন নাম্বার। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল। প্রতিটি মেয়ের নামের পাশে ব্র্যাকেটে একটি করে নাম লেখা রয়েছে। যেমন, শ্রীজাতা সরকার (সিমি) : ২৪৩ ৭১১২।

লিস্টটায় দ্রুত নজর বোলাতে গিয়ে মারাত্মক একটা ধাক্কা খেলাম।

বর্ষা দাশগুপ্ত (কঙ্কণা) : ২৪৫ ০৮৬৩।

বর্ষার নাম এখানে কেন! ওর ফোন নাম্বার জানি না, তবে নাম-পদবি দুটোই হুবহু মিলে যাচ্ছে! ওর সঙ্গে দত্তগুপ্তের কি কোনও যোগাযোগ ছিল?

একটা কাগজের টুকরোয় ওর ফোন নাম্বারটা টুকে নিয়ে সেটা বুকপকেটে রাখলাম।

আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও যখন আমার নাম বা ফোন নাম্বার পেলাম না তখন খানিকটা স্বস্তি পেলাম। তা হলে দত্তগুপ্তের যা-কিছু রেকর্ড ছিল সবই ওই হার্ড ডিস্কে!

কম্পিউটারে ফাইল মোছামুছির কাজ শেষ হতেই পকেট থেকে রুমাল বের করলাম। ফ্ল্যাটে ঢোকার পর থেকে যেখানে-যেখানে আমার আঙুলের ছাপ পড়েছে বলে মনে হল সেই সব জায়গা পাগলের মতো মুছতে শুরু করলাম। উত্তেজনায় মাথা ঠিকমতো কাজ

করছিল না। কেউ যদি ফ্ল্যাটে এসে এখন আমাকে দেখতে পায় তা হলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করে খুব সাবধানে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। তারপর রুমাল দিয়ে হাতলটা ধরে পাল্লা টেনে দিতেই নাইটল্যাচ ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রাস্তায় বেরিয়েই বর্ষাকে একটা ফোন করতে হবে। তখনই বুঝব দত্তগুপ্তের বর্ষা আমার বর্ষা কি না।

কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটা ছোট্ট ভুল করে বসলাম। মাথা ঠান্ডা থাকলে এই ভুলটা হয়তো হত না।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যখন একতলায় নামছি তখন একজন মোটাসোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা। মাথায় টাক, চর্বি-থলথলে মুখ, কোলে ভুড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে হাঁফিয়ে পড়েছেন।

আমাকে দেখে অবাঙালি টানে জিগ্যেস করলেন, দোত্তোগুপ্তাবাবুর ফ্লেটটা কো-তোলায় হোবে বলতে পারেন? ফোনে দোতোলা বোলল না সেকিন্ড ফ্লোর বোলল...।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাংলা তিনতলায়, ইংরেজি সেকেন্ড ফ্লোর। তারপর ওঁর জলহস্তীর মতো চেহারা আর ঘাম-জবজবে মুখ দেখে কেমন যেন মায়া হল। বেচারা কষ্ট করে আরও কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙবে! তাই যোগ করলামঃ কিন্তু ওঁর ফ্ল্যাট তো এখন বন্ধ আছে।

বোন্ধ! ইয়ে কেইসন কোম্পনি? এতোটা পোথ দওড় করিয়ে...।

হঠাৎই বুঝলাম ওঁর সঙ্গে কথা বলে ভুল করেছি। কিন্তু এখন তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ যদি দত্তগুপ্তের খুনের তদন্ত করতে করতে এই ভদ্রলোকের খোঁজ পায় তা

হলে আমার খোঁজ শুরু করতে আর দেরি হবে না।

মাথা নীচু করে তরতরে পায়ে সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম। আমার কেমন যেন দম আটকে আসছিল। একটু বাতাসের জন্যে ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল।

.

০৩.

পার্কসার্কাস ময়দানের কাছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বড়-বড় শ্বাস নিলাম। ভেতরের অস্থির ওলটপালট ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে স্থির হয়ে এল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অলস চোখে গাড়ি, বাস, অটো, ট্রাম আর লোকজন দেখতে লাগলাম।

তারপর, মন যখন পুরোপুরি শান্ত হল, তখন পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। ফোনের সুইচ অন করে বুক পকেট থেকে বর্ষার ফোন নাম্বার লেখা চিরকুটটা বের করে নিলাম। ওর নাম্বারটা ডায়াল করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিলাম : দত্তগুপ্তের বর্ষা আর আমার অস্কার পুরস্কার বর্ষা যেন এক না হয়।

কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ও-প্রান্তে ফোন ধরে কেউ হ্যালো বলল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে পার্কসার্কাস অঞ্চলটা বনবন করে লাট খেয়ে আবার কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, মাতালের মতো টলতে লাগল। কারণ, দুটো বর্ষা এক হয়ে গেছে!

আমি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করলাম। কী বলব এখন ওকে?

ও-প্রান্তে বর্ষা হ্যালো হ্যালো বলেই চলেছিল। কয়েক সেকেন্ড এলোমেলো ভাবনার পর আমি খসখসে গলায় বললাম, রীতেনদা বলছি। তোমার সঙ্গে এক্ষুনি খুব জরুরি দরকার আছে।

রীতেনদা! বর্ষা অবাক হয়ে গেলঃ আপনি আমার নাম্বার পেলেন কী করে!

ওসব পরে বলব। এক্ষুনি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।

ন-না। বরং কাল অফিসে বলবেন।

বর্ষা, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দু-বছর ধরে তোমার সঙ্গে একই সেকশানে কাজ করছি–কোনওদিন তোমার ফোন নাম্বার জানতে চেয়েছি। কিন্তু এখন অ্যাবসলিউট ইমার্জেন্সি। আমাদের এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার–ফোনে এসব কথা বলা যাবে না।

কাল পর্যন্ত ওয়েট করা যায় না...তা হলে অফিসে...।

আমি ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম। একটু রূঢ় গলায় বললাম, পি. দত্তগুপ্ত নামে কোনও ক্লিয়ারিং এজেন্টকে চেনো? পার্কসার্কাসে তিনতলায় ফ্ল্যাট...।

ন-না তো, চিনতে পারছি না তো! কেন, চেনার কথা?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সিক্রেসি আর প্রাইভেসি ছিল দত্তগুপ্তের ক্যাপিটাল। সোজা আঙুলে দেখছি ঘি উঠবে না!

অতএব আঙুল বাঁকাতে হল।

চিনতে পারছ না! আরে যে-দত্তগুপ্ত তোমার নাম রেখেছে কঙ্কণা। ও-প্রান্তে চমকে উঠে শ্বাস টানল বর্ষা।

আমি আরও বললাম, একটা ভালো খবর আছে। দত্তগুপ্ত ঘণ্টাদেড়েক আগে ওঁর ফ্ল্যাটে মার্ডার হয়েছেন।

কী বলছেন, রীতেনদা! বর্ষা একেবারে আঁতকে উঠল।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এবার নিশ্চয়ই তোমার দেখা করতে কোনও অসুবিধে হবে না!

আরও আধঘণ্টা পর, সাড়ে আটটা নাগাদ, আমি বর্ষার মুখোমুখি বসে কথা বলতে শুরু করলাম।

মৌলালির মোড়ের কাছাকাছি একটা রেস্তরাঁয় আমরা চা আর ওমলেট নিয়ে মুখোমুখি বসেছি। বর্ষা শাড়ি পরে এসেছে। তাতে ওর ধার এতটুকুও কমেনি–অন্তত আমার কাছে। কোনও রেস্তরাঁয় এই প্রথম আমরা একান্তে বসেছি। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে প্রথম এভাবে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা দারুণ হত।

আমি নীচু গলায় বর্ষাকে সব খুলে বললাম। আমার অন্যায় বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভে লজ্জায় গলা জড়িয়ে গেল, চোখে জল আসতে চাইল। বললাম, নিঃসঙ্গতায় পাগলের মতো লাগছিল আমার, মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আমাকে যেন ও ক্ষমা করে।

ক্ষমা করবে কী, বর্ষা তখন ফ্যাকাসে মুখে পাথর হয়ে বসে আছে–চোখে শূন্য দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ পর ও কথা বলল, রীতেনদা, কী হবে এখন!

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কোনও পথ নেই। তবে পুলিশ হয়তো দু-চারদিনের মধ্যে তোমাকে ফোন করতে পারে।

তখন কী বলব?

প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। ভেতরে-ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম। কিন্তু বর্ষাকে জিগ্যেস করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। আর এও মনে হচ্ছিল, ওর উত্তরটা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেবে।

পুলিশের প্রশ্নটা যদি আমি তোমাকে জিগ্যেস করি?

বর্ষা মাথা নীচু করে বসে রইল।

দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে তোমার নাম আর ফোন নম্বর পাওয়া গেল কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বর্ষা। ওর মুখ নীচু থাকায় মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যখন ও মুখ তুলল তখন ওর চোখে জল।

আমার বুকের ভেতরে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল।

বর্ষা ধীরে-ধীরে ওর কথা বলে গেল। মাঝে-মাঝে নাক টানল, রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

দত্তগুপ্তের ব্যবসা মেয়ে নিয়ে। তবে ওঁর ব্যবসার অনেকগুলো স্তর আছে। তার একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে টেলিফোনে বন্ধুর মতো সুখ-দুঃখের গল্প করা। তারপরের স্তর টেলিফোনে নোংরা রগরগে গল্প। এর পরের ধাপে টেলিফোনে নয়—একেবারে মুখোমুখি গল্প এবং প্রেম। তবে কিছুতেই শরীর ছোঁয়া চলবে না। দত্তগুপ্তের মাল্লম্যানরা সেটা নজর রাখত।

এরপর আসছে বডিলাইন লেভেল। এর প্রথম লেভেলের এলাকা হল চুমু থেকে গভীর শৃঙ্গার পর্যন্ত। আর তার পরের ফাইনাল লেভেল হল ফ্রি-স্টাইল।

নানান ধরনের ক্লায়েন্টের জন্যে দত্তগুপ্তের নানানরকম ব্যবস্থা।

দত্তগুপ্তের কাছে বর্ষা প্রথম লেভেলের চাকরি করত। সপ্তাহে তিনদিন দু-ঘণ্টা করে ওকে নানা ধরনের ক্লায়েন্টের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করতে হত। এর জন্যে মাসে ও দেড় হাজার টাকা করে পেত। টেলিফোনে ওর ছদ্মনাম ছিল কঙ্কণা।

দত্তগুপ্ত ওকে বহুবারই বলেছেন প্রাথমিক স্তর থেকে ওপরের স্তরগুলোয় উঠতে। তাতে বর্ষা টাকাও পাবে অনেক বেশি। কিন্তু বর্ষা রাজি হয়নি। টাকার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে

এই কাজ ও করত বটে, তবে তার জন্যে রুচি বিসর্জন দেয়নি।

টেলি-গার্ল হওয়ার চাকরিটা ও পায় ওর এক বান্ধবীর মারফত। তখন ও আমাদের কোম্পানিতে চাকরি পায়নি। খুব অভাবের সময়ে এই চাকরিটা ওকে দারুণ সাহায্য করেছে। তা ছাড়া দত্তগুপ্ত ওর সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেননি, কখনও কোনও অন্যায় প্রস্তাবও দেননি। এখন চাকরিটা চলে যাওয়াতে ওর একটু অসুবিধেই হবে।

রীতেনদা, আপনি হয়তো আমাকে খারাপ ভাবছেন...কান্না চাপতে-চাপতে বর্ষা কোনওরকমে বলল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে যা-যা বললাম সব অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। আমি শুধু টেলিফোনেই গল্প করতাম–তার বেশি কিছু নয়। তবে অনেক সময় অনেক কিছু দেখতাম...সেসব কাউকে বলা যাবে না। মিস্টার দত্তগুপ্ত এই একটা ব্যাপারে বারবার করে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন। ওঁর অনেক বাজে ধরনের লোকজন জানাচেনা ছিল। কেউ বেয়াড়াপনা করলে তাকে টিট করার ব্যবস্থা ওই লোকগুলোই করত।

বর্ষা এখনও রুমাল ব্যবহার করে চলেছে। ওর চোখ ফুলে উঠেছে। আমি ওকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। আজ সকালেই আমরা কত দূরে ছিলাম, আর এখন কত কাছাকাছি চলে এসেছি!

বর্ষার কাছেই শুনলাম, দত্তগুপ্ত খুব ছোট মাপে ব্যাবসা শুরু করে মাত্র চারবছরেই সেটাকে বিশাল জায়গায় নিয়ে গেছেন। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ওঁর ক্লোজ কানেকশান ছিল। এসব ব্যবসায় এই টাইপের কানেকশান না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তাদেরই কেউ কি দত্তগুপ্তকে খুন করল!

বর্ষাকে আমি নানা প্রশ্ন করলাম। তার মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর ও দিতে পারল। তবে বারবার করে আমাকে বলল, এসব কথা যেন আমাদের দুজনের বাইরে আর কারও কাছে না যায়, রীতেনদা।

তুমি মিস্টার দত্তগুপ্তের কাছে কতদিন ধরে এই পার্টটাইম জবটা করছিলে?

অলমোস্ট দু-বছর।

তোমাকে স্যালারি পেমেন্ট করত কে?

মিস্টার দত্তগুপ্ত নিজে।

তুমি কোথায় বসে টেলিফোনে গল্প করতে?

পার্কসার্কাসের ওই ফ্ল্যাটে বসে কথা বলতাম। ওখানে একটা ঘরে পাঁচটা টেলিফোন রাখা আছে—আমরা পাঁচজন মেয়ে সেখানে বসে একসঙ্গে কাজ করতাম।

ওদের নাম জানো?

না। সবাই ছদ্মনাম ব্যবহার করত। ওরাও আমাকে কঙ্কণা নামে চিনত।

তোমাদের আসল নাম কে কে জানত?

মিস্টার দত্তগুপ্ত জানতেন। আর জানতেন ওঁর পি. এ. মিস রোজি।

মিস রোজিকে কেমন দেখতে?

বর্ষা মিস রোজির চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিল। সেটা আমার দেখা রিসেপশানের ওই মহিলার সঙ্গে মোটেই মিলল না।

তখন আমি রহস্যময়ী সেই মহিলার চেহারা যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে বর্ণনা করলাম। তারপর জানতে চাইলাম, এরকম চেহারার কাউকে তুমি ওখানে দেখেছ?

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বর্ষা বলল, ম-ম-না।

যে-পাঁচজন টেলিফোনে কথা বলত তাদের দেখতে কেমন?

না—ওদের চেহারার সঙ্গেও আপনার ওই ভদ্রমহিলার কোনও মিল নেই।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি বললাম, ওই মহিলাকে পেলে অনেক কিছু জানা যেত। কে জানে, হয়তো দত্তগুপ্তকে উনিই শেষ করে দিয়েছেন...।

বর্ষা এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

বর্ষা একটু ইতস্তত করে বলল, কাল আমার দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা ছিল... আমি আর ওখানে যাব না।

না, যেয়ো না। তবে মিস রোজিকে একটা ফোন করে বোলো যে, তোমার শরীর খারাপ। তখন উনি নিশ্চয়ই বলবেন, দত্তগুপ্ত মার্ডার হয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালালে তুমি হয়তো অনেক কিছু জানতে পারবে। সেগুলো আমাকে বোলো। দুজনে ডিসকাস করে যা হোক একটা রাস্তা খুঁজে বের করব।

আমরা চুপচাপ থাকি না! আমাদের ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার!

বর্ষার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললাম, তোমার হয়তো ঝামেলায় না জড়ালেও চলবে, কিন্তু আমি যে অলরেডি ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। ওই মোটা ভদ্রলোক সিঁড়িতে আমাকে দেখেছেন। ফ্ল্যাটের কোথাও-না-কোথাও হয়তো আমার আঙুলের ছাপ রয়ে গেছে। এমন কী নাম আর মোবাইল নাম্বারও হয়তো কোনও খাতা-টাতা বা ডায়েরিতে লেখা আছে। পুলিশ ইনভেস্টিগেশান শুরু করলে দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমার কথা জানতে পারবে। তখন আমাকে নির্ঘাত অ্যারেস্ট করবে। মা-ভাই-বোনের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। চাকরিটাও হয়তো খোয়াতে হবে। একটু থেমে কয়েকবার শ্বাস টানলাম আমি। ভেতরে-ভেতরে একটা গোঁয়ার্তুমি টের পাচ্ছিলাম। সেই সঙ্গে রাগও

হচ্ছিল। অন্যায় ইচ্ছে নিয়ে আমি দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু কোনও অন্যায় আমি করিনি। দত্তগুপ্তকে কেনা-কে মার্ডার করেছে, অথচ সেই দায়টা চেপে যাবে আমার ঘাড়ে! বেশ মজার ব্যাপার তো! ওই ভদ্রমহিলাকে সামনে পেলে একবার দেখে নিতাম।

না, বর্ষা—এত সহজে আমি ছেড়ে দেব না। জেদি ঘোড়ার মতো এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম আমি ও ওই মিস্টিরিয়াস লেডিকে আমি খুঁজে বের করবই! তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারোনাও থাকতে পারো। আই ডোন্ট মাইন্ড। আই ডোন্ট কেয়ার ইভন। দিস ইজ মাই গেম। শুধু-শুধু তোমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ট্রাবল দিলাম...।

ভালোবাসার অস্কার নমিনি হয়ে রাস্তার মাঝে চারপাশের লোকজনের চোখের সামনে আমি বর্ষার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে পড়তে পারি। কিন্তু আমাকে অন্যায়ভাবে খুনের দায়ে কেউ জড়াতে চাইলে হাঁটুগেড়ে বসার কোনও প্রশ্নই নেই। বর্ষা পাশে না থাকতে চায় না থাক। গ্রীষ্ম তো রইল!

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আমরা গ্রীষ্ম অনুভব করছিলাম। গুমোট চটচটে গরম। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

বর্ষা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আড়চোখে দেখল আমাকে। তারপর অপরাধী গলায় বলল, সরি, রীতেনদা। আপনি যা ভালো বোঝেন করুন। আমি পাশে আছি। দিস ইজ আওয়ার গেম।

ওর কথাটা শোনামাত্রই এত আনন্দ হল যে, সম্পর্ক অন্যরকম হলে আর পরিবেশ অন্যরকম হলে ওকে একেবারে জাপটে ধরে একটা ইয়ে খেতাম।

বর্ষা আমাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনুমতি দিল। আর আমার মোবাইল নাম্বারটাও টুকে নিল।

বাড়ি ফেরার পথে মায়ের ফোন পেলাম। আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে দুশ্চিন্তায় ফোন করেছে।

মায়ের কথায় মনে-মনে হাসি পেল।

আমার দুশ্চিন্তার কথা মা যদি জানত!

.

০৪.

পরদিন খবরের কাগজে তিন নম্বর পৃষ্ঠায় ছোট্ট করে খবরটা ছাপা হল।

দত্তগুপ্তের পুরো নাম পিনাকী দত্তগুপ্ত। বয়েস বাহান্ন। ওঁর বেআইনি ব্যবসা মাপে বেশ বড়। পুলিশের ধারণা বখরার ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হওয়ায় অপরাধজগতের কেউ ওঁকে খুন করেছে। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে গুলি করার কারণ খুনি গুলির আওয়াজ চাপা দিতে চেষ্টা করেছে। এখনও সন্দেহভাজন কাউকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার কথা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি। কিন্তু কী করে ওই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পাওয়া যায়? দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটবাড়ির কাছে গিয়ে আমি কি তা হলে নজর রাখব? যদি ওই মহিলাকে হঠাৎ করে দেখতে পেয়ে যাই! নাকি বর্ষা যেমন বলছে, ঝামেলায় না জড়িয়ে চুপচাপ থাকব?

সারাটা দিন এইসব পাগল করা চিন্তা নিয়ে কাটতে লাগল। মা বেশ কয়েকবার জিগ্যেস করল, কী হয়েছে। আমি প্রতিবারই পাশ কাটানো জবাব দিলাম। টের পাচ্ছিলাম, মিলি আর ব্রতীন বেশ দূরত্ব বজায় রেখে অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছে। কারণ, হাজার সমস্যাঁতেও ওরা কখনও আমাকে এরকম বিপর্যস্ত দেখেনি।

সিগারেটের পর সিগারেট পুড়তে লাগল। আচমকা এরকম বিপদে জড়িয়ে পড়ে নিজেকে বেশ অসহায় লাগছিল। তবে এও মনে হচ্ছিল, এরকম ঝামেলায় না জড়ালে বর্ষাকে এতটা কাছাকাছি পেতাম না। এই কাছাকাছির আলাদা কোনও মানে আছে কি না একমাত্র ভবিষ্যই এর উত্তর দিতে পারে।

অফিসে গিয়ে যান্ত্রিকভাবে কাজে বসে পড়লাম। বর্ষা ওর সিটে বসে কাজ করতে করতে বারবারই আমার দিকে দেখছিল। টিফিনের সময় ও আমার কাছে এল। চাপা গলায় বলল, কাগজে নিউজটা দেখেছেন, রীতেনদা?

দেখেছি। বোধহয় আজ সন্ধেবেলা খাস খবর-এ দেখাবে।

আজ মিস্টার দত্তগুপ্তের ওখানে ফোন করতে আমার ভয় করছে।

ভয়ের কী আছে! তুমি তো জাস্ট একটা ফোন করছ। সেরকম হলে ঝপ করে লাইন কেটে দেবে। আর ফোনটা করবে কোনও এস.টি.ডি. বুথ থেকে।

বর্ষা আমার কথা শুনল বটে, তবে তেমন নিশ্চিন্ত হল বলে মনে হল না।

ওকে বললাম, সেরকম জরুরি কোনও খবর থাকলে আমাকে মোবাইলে ফোন করে জানাতে।

এমন সময় মংপু চলে এলেন আমাদের কাছে।

বর্ষা, আই ওয়ান্ট য়ু। কাম টু মাই রুম। চেন্নাইয়ের প্রজেক্টটা নিয়ে একটু ডিসকাশন আছে।

বর্ষা আমার দিকে একটা অসহায় চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে মংপুর সঙ্গে ওঁর কাচের কিউবিল এর দিকে চলে গেল।

পুরকায়স্থর বর্ষা, আই ওয়ান্ট য়ু কথাটা অনেকক্ষণ ধরে বেসুরোভাবে আমার কানে বাজতে লাগল। কী চমৎকার! বর্ষা, তোমাকে চাই।

বর্ষার সঙ্গে এর বেশি আর কথা বলার সুযোগ পাইনি। বেশ আনমনাভাবে অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। তারপর বর্ষার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধেটা আমার টিভি দেখে কাটছিল।

সামনে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, আর চোখ টিভির রঙিন পরদায়। কখন ফোন করবে বর্ষা? কখন?

হঠাৎই কেউ যেন চাবুকের বাড়ি মারল আমার পিঠে। একী দেখছি আমি! টিভির পরদায় সেই মুখ! সেই মহিলা! দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে আমাকে বুদু বানিয়ে কেটে পড়েছিল।

একটা ট্যালকম পাউডারের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। ড্রিম ট্যালকম পাউডার লাগালে আপনার কোনওরকম অসুখ-বিসুখ করবে না, রূপকথার গল্পের মতো আপনি সারাজীবন সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবেন। দাম অত্যন্ত কম, এবং একটা কিনলে আর-একটা ফ্রি।

এরকম একটা স্বপ্নের পাউডারের বিজ্ঞাপনে সেই রহস্যময় মহিলা অভিনয় করছেন! ভদ্রমহিলার পোশাক-আশাক ও মেকাপ অন্যরকম হলেও ওঁকে চিনে নিতে আমার একটুও অসুবিধে হল না।

কিন্তু কী করে এঁকে ধরা যায়!

কিছুক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম ওই পাউডার কোম্পানির অফিসে যাব। সেখান থেকেই শুরু করব আমার খোঁজ।

ভদ্রমহিলার হদিস পাওয়ার পর কোথায় আমার টেনশান কমবে, তা নয়, উলটে টেনশান যেন বেড়ে গেল। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চললাম, আর বর্ষার ফোনের জন্যে

অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বর্ষার ফোন এল।

মোবাইল ফোনে জিঙ্গল বেল-এর সুর বেজে উঠতেই ফোন তুলে নিলাম আমি।

হ্যালো।

রীতেনদা, বর্ষা বলছি।

বলো, কী খবর?

মিস রোজিকে ফোন করেছিলাম। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে পুলিশ ফ্ল্যাটটা সিল করে দিয়েছে। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখছে। ফলে ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। মিস রোজি ওঁর রেসিডেন্সের ফোন নাম্বার দিয়েছেন। বলেছেন মাঝে-মাঝে ওঁকে ফোন করে খবর নিতে।

গুড। এদিকে আমার কাছে তো দারুণ খবর আছে।

কী খবর?

সেই মিস্টিরিয়াস লেডিকে পেয়ে গেছি। বর্ষাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

এবার কী করবেন? উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল ও।

কাল ওই পাউডারের কোম্পানি দিয়ে শুরু করব। তারপর কপাল যদি গোপালপুরে নিয়ে যায়, তাও যাব। তাই এখন দু-চারদিন অফিস যাওয়াটা আমার আনসার্টেইন। আমি ফোন করে মংপুকে বলে দেব। তুমি হায়েনা আর নেকড়ের পালের মধ্যে সাবধানে থেকো।

এসব ঠাট্টা এখন ভাল্লাগছে না, রীতেনদা। তারপর একটু থেমে? আমি কাল আপনার সঙ্গে যাব।

একটু ভেবে আমি বললাম, না—এখন নয়। সময় হলে আমি বলব। তুমি বরং টাইম পেলে ড্রিম ট্যাঙ্ক-এর অ্যাডটা দেখো। আর দরকার মনে করলেই আমাকে মোবাইলে ফোন কোরো, ও. কে.?

হু একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্ষা নিমরাজি হল।

ফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। একটা ঝাটের কাজে পা বাড়ানোর আগে মনটাকে শান্ত করা দরকার।

.

ড্রিম ট্যালক তৈরি করে ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড। কয়েকটা বড়সড়ো স্টেশনারি দোকানে ঘোরাঘুরি করে, পাউডারের কৌটোর গায়ে লেখা কোম্পানির ঠিকানা জোগাড় করে, বি.সি.এল.-এর অফিসে পৌঁছতে খুব একটা কষ্ট হল না।

আজ সকাল থেকেই কিছুটা মেঘলা আকাশ, তাই গরমের দাপট কম। তবু বর্ষা এলে ভালো লাগত। দু-বর্ষার কথাই বলছি।

একে-ওকে জিগ্যেস করে যখন ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড-এ পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় দুটো।

চিৎপুরের এক ঘিঞ্জি রাস্তায় একটা বাড়ির দোতলায় ওদের অফিস। তবে অফিস-বাড়িটার যা চেহারা তাতে মনে হতেই পারে ওরা ট্যালকম পাউডার নয়, টুথ পাউডার তৈরি করে। নোনা ধরা জীর্ণ বাড়ির একতলায় নানারকম কারখানা ছাপাখানা, খাঁটিয়া তৈরির কারখানা, কোথাও বই বাঁধাই হচ্ছে, টিনের কৌটো তৈরি করছে কেউ। দু-তিনটে রেডিয়োর গান কানে আসছে। আর গোটা একতলাটা বিড়ি আর বাথরুমের গন্ধে ম-ম করছে।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেড়ে উঠলাম। সিঁড়ির যা ছিরি তাতে মনে হচ্ছিল তেনজিং নোরগে বোধহয় এই সিঁড়িতেই ট্রেকিং-এ হাতেখড়ি দিয়েছিলেন।

বি.সি.এল.-এর অফিসের বাইরে প্লাস্টিকের ছোট সাইনবোর্ড। তার পাশের কাচের দরজায় কোম্পানির তিনরকম প্রোডাক্টের রঙিন স্টিকার।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কাচক্যাচ শব্দ হল। সামনের টেবিলে বসা পাকা-চুল ভদ্রলোক একটা লেজার থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তার চোয়াল নড়ছিল। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের ট্রাইব সিরিয়ালে বোধহয় এ-মুখ আমি দেখেছি। এ-মুখ দেখে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ডারউইনসাহেব ঠিকই বলেছিলেন : বানর থেকে মানুষ। যার গাছে থাকার কথা সে একটা চেয়ারে বসে আছে। অবশ্য চেয়ার আর গাছ–দুটোই বেসিক্যালি কাঠ।

কী চাই? পাউডার, সাবান, না ক্রিম? কাক যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত, তা হলে বোধহয় এরকমটাই শোনাত।

ঘরের মাপ বড়জোর ছফুট বাই আট ফুট। মাথায় কাঠের সিলিং। আর আসবাব বলতে একটা পোস্টাল ফ্যান, দুটো টেবিল, দুটো চেয়ার, আর একটা টুল। টেবিল-চেয়ারের যা রং-চটা দুর্দশা তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এদের ফাঁক ফোকরে ছারপোকার দল ওনারশিপ ফ্ল্যাট কিনে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। তবে অফিসের যা চেহারা তাতে মনে হয় না লোকজন এখানে খুব একটা আসে, আর ছারপোকাগুলো রেগুলার ব্লাড সাপ্লাই পায়।

অফিসে আর কেউ নেই। সুতরাং যা বলার এই বৃদ্ধ মানুষটিকে বলা যাক।

আপনারা সিসিসিএন চ্যানেলে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন...।

ওই অ্যাডভেটাইজে অ্যাকশন হয়েছে তা হলে! একগাল হাসলেন বৃদ্ধ। হাসি তো নয়, যেন দাঁতের বিজ্ঞাপন–যদিও এদিক-ওদিক কয়েকটা পিস মিসিং।

না, মানে…আমার একটা কসমেটিক্স কোম্পানি আছে…।

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল, ঘোলাটে চোখে সন্দেহ দেখা দিল। আমার দিকে তীব্র নজর মেলে চুপচাপ কিছু একটা চিবোনোর কাজ করে চললেন।

অনেকক্ষণ পর জিগ্যেস করলেন, কী তৈরি করা হয়? আমরা অনেক প্রোডাক্ট সাব-কন্ট্রাক্ট এ তৈরি করি। লেবেল আমাদের থাকে।

ভদ্রলোক আমাকে এখনও বসতে বলেননি। তাই মনে-মনে বেশ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু দরকারটা আমার—তাই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিলাম। এখন ওঁর লোভ চকচকে চোখ দেখে মনে হল লোভটাকে একটু উসকে দিই।

আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা ঘামাচির পাউডার তৈরি করছি…।

ঘামাচির পাউডার!

আজ্ঞে হ্যাঁ। জাপানের সুঘামাচি কর্পোরেশনের সঙ্গে আমরা টেকনিক্যাল কোলাবোরেশান করেছি।

তা হলে তো ফরেন গুডস! খুশিতে বিকশিত হলেন বৃদ্ধ। ওঁর দাঁতে সূর্যমুখী দেখা গেল। বললেন, দারুণ! দারুণ! ওই অ্যাডভেটাইজে এই টাইপের অ্যাকশন পাব ভাবিনি।

আমার টোটাল প্রোডাকশন আপনাদের হাতে আমি তুলে দেব। কথা দিলাম। তবে তার আগে একটা ছোট্ট খবর চাই। আপনাদের ওই দারুণ অ্যাডটা কোন এজেন্সিকে দিয়ে করিয়েছেন? আমি ওদের দিয়ে কয়েকটা অ্যাড করাতে চাই। তাতে আপনাদের নামও দেব।

আরে, বসুন, বসুন। হাতের ইশারায় আমাকে বসতে বলে বৃদ্ধ একটা পুরোনো ডায়েরির পাতা হাঁটকাতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি এবং চোয়াল নাড়ার পর এজেন্সির নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিলেন। গলার স্বর যথাসম্ভব মিষ্টি করার চেষ্টা করে অনেক বড়-বড় লাভের লোভ দেখালেন আমাকে। ওঁর কথার চেয়ে গলায় স্বর আমাকে বেশি আগ্রহী করে তুলছিল। কারণ, কাক যখন কোকিলের গলায় কথা বলার চেষ্টা করে তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় সেটা জানার কৌতূহল আমার বহুদিনের।

কাজ শেষ করে পুরোনো বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখি রাগি সূর্যকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেঘ কখন যেন পিঠটান দিয়েছে। গনগনে রোদে ভাজা-ভাজা রাস্তায় যখন হাঁটতে শুরু করলাম তখনও কসমেটিক্স কোম্পানির বাড়িটার বিড়ি আর বাথরুমের গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েছে।

রাস্তার ধারের একটা দোকানে বসে টিফিন করলাম। একটা ঠান্ডা কোক গলায় ঢালোম। খানিকটা জিরিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম অভিযানে।

এখন যেতে হবে ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে, স্পেকট্রাম অ্যাড-এর অফিসে।

বাসস্টপে একা-একা দাঁড়িয়ে যখন দরদর করে ঘামছি তখন আর-একবার মনে হল বর্ষা এলে ভালো হত। এবারও দু-বর্ষার কথাই বলছি।

.

স্পেকট্রাম অ্যাড-এর অফিসটা বি.সি.এল.-এর ঠিক উলটো। ইন্ডিয়ান মিরার স্ট্রিটে ওদের ছোট্ট অফিস। কাচ আর প্লাস্টিক দিয়ে দারুণ মড স্টাইলে সাজানো। রিসেপশান কাউন্টারে বসে আছে ফরসা স্লিম একটি অল্পবয়েসি মেয়ে। পরনে হলুদ চুড়িদার। ওর কপালে চুলের ঝালর নেমে এসেছে। তার নীচেই টানা-টানা চোখ। মুখে একটা এসো এসো ভাব।

এসি থাকায় ভীষণ আরাম লাগছিল। আমেজে চোখ বুজে আসতে চাইছিল। কিন্তু এখন চোখ বুজলে চলবে না। চোখ খোলা রাখতে হবে। নইলে হয়তো একেবারে বুজতে হবে– দত্তগুপ্তের মতো।

রিসেপশানের মেয়েটিকে আমার ছদ্ম-পরিচয় জানিয়ে বললাম যে, আমি একটা টিভি অ্যাড দিতে চাই। আর তাতে মডেল হিসেবে ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড-এর ড্রিম ট্যালকাম পাউডারের অ্যাডের মেয়েটিকে চাই।

রিসেপশানের মেয়েটি বোধহয় চাকা-লাগানো চেয়ারে বসেছিল। কারণ, আমার কথা শোনামাত্রই কাউন্টারের একপাশে বসানো কম্পিউটারের কাছে প্রায় ভেসে চলে গেল। ওর সুন্দর আঙুল ব্যস্তভাবে নড়ে উঠল কিবোর্ডে। তারপরই আমার দিকে মুখ তুলে বলল, আপনি ভেতরের ঘরে যান। সেখানে মিস্টার করের সঙ্গে কথা বলুন। ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড-এর নাম বলবেন। কম্পিউটারে দেখলাম, ওদের অ্যাডটা মিস্টার কর ডিল করেছিলেন।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে রওনা হতে যাব, ঠিক তখনই আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

পকেট থেকে ফোনটা বের করে কথা বললাম। ব্যবসার ফোন। ওরা জানে না, ব্যবসা এখন আমার মাথায় উঠেছে।

ফোনে কথা বলা শেষ করে ভেতরের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা ছোট কিন্তু চমৎকার। প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি কোনও আসবাবপত্র নেই। ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট তিনজন কর্মী–একজন মহিলা, দুজন পুরুষ তিনটে টেবিলে বসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন। আমি ওঁদের একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে না তাকিয়েই হাতের ইশারায় সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করে চললেন।

চেয়ারটা আধুনিক—মোল্ডেড প্লাস্টিক আর লোহার কায়দাকানুন দিয়ে তৈরি। সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের চেয়ারে বসলে এমন আরাম হয় যে, নিতম্ব নিত্যানন্দ হয়ে বারবার ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু এখন অবস্থা স্বাভাবিক নয়। তাই পেছনে পিন ফুটতে লাগল? কোথায় দত্তগুপ্তের তৃপ্তি নিকেতনের মানসী? কোথায়? কোথায়?

ভদ্রলোক কাজের ঝোঁক সামান্য কমিয়ে কয়েকটা কাগজের গোছা একপাশে সরিয়ে রেখে এই প্রথম আমার দিকে তাকালেন : বলুন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু…।

আমি মিস্টার করের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মুখে সুন্দর পেশাদারি হাসি ফুটিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমিই সঞ্জিত কর। বলুন, কী হেল্প করতে পারি।

ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড-এর ড্রিম ট্যাঙ্ক-এর অ্যাডটা আপনারা করেছেন। রিসেপশানের ম্যাডাম এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন…।

বলুন, কী বলবেন—। চোখের চশমাটা সামান্য অ্যাডজাস্ট করে কর টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকালেন। ভাবটা এমন যেন আমি ওঁর কাজের সময় অকারণে নষ্ট করছি।

একটু নার্ভাস হয়ে গেলাম আমি। কিছুটা সময় নিয়ে ইতস্তত করে বললাম, আমার একটা ছোট কোম্পানি আছে, মিস্টার কর। তার একটা টিভি অ্যাড দিতে চাই। আর তাতে মডেল হিসেবে একজনকে আমার পছন্দ—তাকে চাই।

সঞ্জিত কর আমার চাহিদা আঁচ করে বললেন, তার মানে ভারত কসমেটিক্স-এর ড্রিম ট্যাঙ্ক-এর মডেলকে চাই। ও. কে., নো প্রবলেম…।

আমার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আমার তদন্ত তা হলে ঠিক পথেই এগোচ্ছে!

কর গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে-ভঁজতে বাঁ-দিকে ঘাড় ঘোরালেন। ওঁর টেবিলের পাশেই একটা সুন্দর কাঠের র‍্যাক ছিল। র‍্যাকে সার বেঁধে অনেকগুলো ভিডিয়ো ক্যাসেট সাজানো। তাদের লেবেলগুলো খুঁটিয়ে দেখে কর একটা ক্যাসেট টেনে নিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আসুন, প্রোজেকশান রুমে একবার ক্যাসেটটা চালিয়ে দেখে নিই।

কর আমাকে একটা অ্যান্টিরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভিসিআর, টিভি, প্রোজেক্টার সব তৈরি। আমাকে বসতে বলে ক্যাসেটটা রেডি করে ভিসিআর-এর প্লে বোতাম টিপে দিলেন মিস্টার কর। টিভির পরদায় নানান বিজ্ঞাপনের মেলা শুরু হয়ে গেল।

একটু পরেই দেখতে পেলাম ওঁকে।

সেই বিজ্ঞাপন, সেই মুখ, সেই হাসি।

আমি একটু উত্তেজিতভাবেই করকে বললাম, এই ভদ্রমহিলা–এই মডেল! ওঁর নাম কী?

শর্মিলা বোস–গড়পাড়ে থাকেন–আমরা শর্মিলাদি বলি। আমার দিকে খানিকটা অবাক চোখে তাকিয়ে শান্ত গলায় কথাগুলো বললেন কর।

ওঁর ডিটেইল্ড অ্যাড্রেসটা আমাকে দিতে পারেন?

কেন বলুন তো? করের কপালে ভাঁজ পড়েছে।

না, মানে, আমার ওই অ্যাডটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতাম। আমি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

কর হাসলেনঃ যা ডিসকাস করার আমাদের সঙ্গে করতে পারেন। মডেলদের সঙ্গে ক্লায়েন্টদের জেনারালি কথা বলতে দেওয়া হয় না–তাতে কাজের প্রবলেম হয়।

ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যেতে পারে? জাস্ট একবার? আমি মরিয়া।

মিস্টার কর ভালো করে আমাকে জরিপ করলেন। বোধহয় ভাবতে চাইলেন কেসটা কী ও প্যার কিয়া তো ডরনা কেয়া, নাকি প্রেম-প্রতিজ্ঞা?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার বলুন তো?

আমি দাগা খাওয়া প্রেমিক সাজার ভান করে মনমরা গলায় বললাম, কিছু মাইন্ড করবেন না। ওঁর সঙ্গে...ওঁর সঙ্গে একসময় আমার...ইয়ে, মানে...একটা অ্যাফেয়ার... মানে, পরিচয় ছিল। একবার দেখা হলে খুব ভালো হত।

কর আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ভালো করে দেখলেন। তারপর ঠোঁটের কোণে হেসে ভিসিআর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে ভিসিআর, টিভি, সব অফ করে দিলেন।

আমি ওঁর উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম।

আপনমনেই হাসলেন কর। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। বিড়বিড় করে নিজেকেই বললেন, বাব্বাঃ, এই বয়েসেও শর্মিলাদিকে ইয়াং বয়ফ্রেন্ড সামাল দিতে হচ্ছে!

তারপর আমাকে ইশারা করে অ্যান্টিরুমের বাইরে আসতে বললেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, শর্মিলাদি আমাদের অফিসে প্রায়ই আসেন নতুন কাজের খোঁজ নিতে। আজও হয়তো আসবেন। সময় হয়ে গেছে।

আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ শুরু হয়ে গেল।

আপনার ওই অ্যাড-ফ্যাডের ব্যাপারটা তা হলে বোগাস! শুধু-শুধু আমার টাইম নষ্ট করলেন। করের মন্তব্যে হতাশা আর বিরক্তি ছিল।

তাই নিজের মান বাঁচাতে বললাম, না, না! সত্যিই একটা অ্যাড আমি তৈরি করতে চাই। ইচ্ছে হলে অ্যাডভান্স নিতে পারেন। তবে বড় অ্যাড নয় দশ সেকেন্ডের কুইকি।

ঠিক আছে। বলে আমাকে রিসেপশানের কাছে নিয়ে এলেন করঃ আপনি এখানে ওয়েট করুন–শর্মিলাদি হয়তো এসে যাবেন।

রিসেপশানের সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর শর্মিলা বোসের কথা ভাবতে লাগলাম।

কী কুক্ষণে যে কৌতূহলের তাড়নায় দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। এখন এই ঘোলাজলের ঘূর্ণি থেকে কী করে উদ্ধার পাব কে জানে! তবে লাভের মধ্যে এই হয়েছে যে, আমি আর বর্ষা দুজনেই একই বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। এর ফলে আমরা কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু বর্ষা সত্যিই আমাকে সব কথা খুলে বলেছে তো! এরকম বিপদে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। তখন যাকে-তাকে সন্দেহ হয়। আমার অবস্থাটাও বোধহয় তাই। নইলে বর্ষাকে সন্দেহ করব কেন?

একটা সিগারেট ধরাতে যেতেই রিসেপশানের মেয়েটি এক্সকিউজ মি, স্যার বলে আমার দিকে তাকাল। তারপর ইশারা করল একটা স্টিকারের দিকে থ্যাংক য়ু ফর নট স্মোকিং।

সিগারেট আবার পকেটের প্যাকেটে ঢুকে গেল। সিগারেট ছাড়া সময় কাটানো মুশকিল। চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসতে চাইছে।

অফিসের দরজা ঠেলে যখনই কেউ ঢুকছে তখনই আমি চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে তাকাচ্ছি। নাঃ, শর্মিলা বোস নয়।

সত্যিই, কী অদ্ভুত ব্যাপার! শর্মিলা বোসের বদলে অনেক তরুণী এবং অনেক সুন্দরী মেয়েরা স্পেকট্রাম অ্যাড-এর অফিসে ঢুকলেও ওরা আমাকে একচুলও টানতে পারছে না। আমার কাছে। ওরা স্রেফ নন-ম্যাগনেটিক মেটিরিয়াল। এখন, এই মুহূর্তে, শর্মিলা বোসই আমার একমাত্র মহান চুম্বক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে উঠে পড়তে হল। সাড়ে তিন ঘণ্টা মতো অপেক্ষা করেও শর্মিলা বোসের দেখা পেলাম না। তখন সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঢুকে পড়লাম অফিসের ভেতরে।

সঞ্জিত করের কাছে গিয়ে কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে দাঁড়ালাম।

তিনি ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, কী আর করবেন...দরকার মনে হলে কাল একবার আসুন...।

আচ্ছা, ওঁর অ্যাড্রেসটা আমাকে দেওয়া যায় না? কিংবা ফোন নাম্বার?

উঁহু-ট্রেড সিক্রেট।

ওঁর সঙ্গে দেখা করাটা ভীষণ জরুরি...।

সঞ্জিত কর ভুরু কুঁচকে সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বললেন, ইচ্ছে হলে আপনি কাল আর-একবার আসতে পারেন, চান্স নিতে পারেন। দ্য চয়েস ইজ ইওরস। নাউ, ক্যান উই ফিনিশ দিস ডায়ালগ?

অপমানে গা চড়চড় করছিল, কিন্তু উপায় নেই। আমার ঘাড়ের ওপর দত্তগুপ্তের ডেডবডি ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলছে।

সুতরাং স্পেকট্রাম অ্যাড-এর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় রিসেপশানের মেয়েটিকে বলে এলাম যে, আমি আবার কাল আসব।

হতাশ মন নিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওনা হলাম, তখনও জানি না আর-এক বিপদ সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

.

০৫.

দরজার কড়া নাড়তেই মিলি দরজা খুলে দিল।

মিলি খুব ফরসা। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোয় ওকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ সরু হয়ে এল।

মিলি ফিসফিস করে বলল, দাদা, থানা থেকে পুলিশ এসেছে। তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

পুলিশ!

আমার মুখের রক্ত বোধহয় কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল, কারণ মিলির মুখে ভয়ের ছাপ পড়ল। ও অস্পষ্ট গলায় বলল, প্রায় একঘণ্টার ওপর ওরা বসে আছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে, ঘাড়ে, গলায় ঝুলিয়ে নিলাম। ওঁদের প্রশ্নগুলো মনে মনে কল্পনা করে উত্তরগুলো ঝালিয়ে নিতে লাগলাম।

কী ব্যাপার, দাদা! পুলিশ তোর খোঁজ করছে কেন? মা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কাঁদছে।

আমি আপনমনেই একবার মাথা নাড়লাম। তারপর মিলিকে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। কেমন যেন দম আটকে আসছিল। একগাদা শুকনো ছাতু মুখের মধ্যে কেউ যেন জোর করে গুঁজে দিয়েছে।

বাইরের ঘরটাতেই ওঁরা দুজনে বসেছিলেন। সামনের টেবিলে দুটো খালি চায়ের কাপ আর প্লেট। তার পাশে একটা হলদে রঙের ফ্ল্যাট ফাইল।

ওঁদের একজন গাঁট্টাগোট্টা। পরনে ইউনিফর্ম। আপাদমস্তক পুলিশ-পুলিশ ভাব। আর-একজন সিঁড়িঙ্গে চেহারার। গায়ে সাদা পোশাক। গালে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। মাথায় টাক। ঠোঁটের কোণে একটা মজার হাসি সবসময় লেগে রয়েছে।

আমি ঘরে ঢুকেই ওঁদের আলতো নমস্কার জানিয়ে বললাম, আমার নাম রীতেন মিত্র।

হুঁ বসুন। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ভদ্রলোক বললেন, আপনার জন্যেই এতক্ষণ ওয়েট করছি।

আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

মিলি আমার পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে চলে গেল। ও চলে যাওয়ার সময় দরজার পরদাটা কেঁপে গেল। তখনই পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মা-কে দেখতে পেলাম।

আমি ইন্সপেক্টর সেন—মুচিপাড়া থানায় আছি। প্রথমজন বললেন। তারপর সঙ্গীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, আর ইনি কড়েয়া থানার অফিসার দ্বিজেন বিশ্বাস...।

আমি সৌজন্য দেখালাম। তারপর প্রথম প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ইন্সপেক্টর সেন টেবিলে রাখা ফাইলটা হাতে তুলে নিলেন। সেটা ওলটাতে-ওলটাতে একটা পৃষ্ঠায় গিয়ে থামলেন।

ফাইলের দিকে চোখ রেখেই প্রথম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তিনিঃ আপনার মোবাইল নাম্বার ৯৮৩০০-৪৩২৮১?

হ্যাঁ–।

আপনি গণেশ অ্যাভিনিউর সন্ট কর্পোরেশন-এ প্রোগ্রামারের চাকরি করেন?

হ্যাঁ। ওরা বাড়ির কাজ বেশ গুছিয়ে শেষ করে তারপর পরীক্ষা দিতে সরি, নিতে–এসেছে দেখছি। কিন্তু আমার মোবাইল নাম্বার ওরা কী করে পেল? অফিসের হদিস, বাড়ির ঠিকানা? তা হলে কি কম্পিউটার ছাড়াও অন্য কোথাও আমার মোবাইল নাম্বার আর নাম-টামের হার্ড কপি ছিল?

আমার বুকের ভেতরে এমন জোরে গুমগুম শব্দ শুরু হল যে, আমার ভয় হচ্ছিল পুলিশ অফিসাররা সেই শব্দ শুনতে পাবেন।

পিনাকী দত্তগুপ্তকে আপনি চিনতেন?

না। এই প্রথম নাম শুনছি।

পার্কসার্কাসে ওঁর ফ্ল্যাটে আপনি কখনও যাননি?

অসংখ্য মিথ্যে বলার জন্যে মনে-মনে তৈরি হয়ে উত্তর দিলাম, যার নাম কখনও শুনিনি তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কী করে!

দ্বিজেন বিশ্বাস গলাখাঁকারি দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, সত্যিই আপনি মিস্টার দত্তগুপ্তকে চেনেন না? ওঁর ফ্ল্যাটে কখনও যাননি? কোশ্চেনটা খুব ইমপর্ট্যান্ট–উত্তরটাও।

কেন, ওঁকে আমার চেনার কথা? একটু খোঁচা মেরেই প্রশ্নটা করলাম।

বিশ্বাস হাসলেন, বললেন, চেনার তো কথা—নইলে মিস্টার দত্তগুপ্তের ফোন থেকে আপনার মোবাইল ফোনে মেসেজ আসবে কেন!

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। ঠিক কতটা জানে ওরা?

ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার সময় চাই। তাই প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলুন তো? পিনাকী দত্তগুপ্তকে নিয়ে এত কোশ্চেন করছেন কেন?

এবারে সেন উত্তর দিলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, পিনাকী দত্তগুপ্ত ওঁর ফ্ল্যাটে মার্ডার হয়েছেন। কেসটা আমরা ইনভেস্টিগেট করছি। দত্তগুপ্ত একটা টেলিফোন-মধুচক্র চালাতেন। তবে আমাদের কাছে খবর আছে ব্যাপারটা এত ইনোসেন্ট ছিল না। ওঁর রোরিং বিজনেস ছিল। ক্লায়েন্টের লিস্ট ছিল কয়েক মাইল লম্বা...।

আর সেই লিস্টেই আমরা আপনার নাম পেয়েছি। হেসে বললেন দ্বিজেন বিশ্বাস।

ওঁদের ভদ্রলোকের মতো সাফাই দেওয়া দরকার। তাই একটা লম্বা শ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে দত্তগুপ্তের কোম্পানির মেসেজ পাঠানোর কথা বললাম। তারপর এও বললাম যে, আমি ওঁদের ওখানে কখনও ফোনও করিনি, যাইওনি।

বিশ্বাস করুন। আমার মাথার ওপরে অনেক ফ্যামিলি বার্ডেন ইনকামও তেমন নয়। এসব বিলাসিতা আমাদের মতো লোকের কাছে স্বপ্ন। অনেস্টলি বলছি। গলায় বেশ খানিকটা আবেগ জড়িয়ে কথা শেষ করলাম।

অফিসার দুজন কয়েক লহমা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় বুঝতে চাইলেন আমার অনেস্টিতে শতকরা জলের পরিমাণ কত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইন্সপেক্টর সেন বললেন, ও.কে., মিস্টার মিত্র। আজ আমরা উঠি। আপনি আমাদের না জানিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবেন না। উই হোপ য়ু আর

টেলিং দ্য ট্রুথ।

ওঁরা চলে যেতেই মা পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। আমাকে প্রায় জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলল, রতু, রতু…আমার বড় ভয় করছে রে…।

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, কোনও ভয় নেই, মা, কোনও ভয় নেই। আমি এমন কিছু করিনি যাতে পুলিশ আমার কিছু করতে পারে।

আমার দু-হাতের বাঁধনে মায়ের ক্ষীণজীবী রোগা শরীরটা ভেজা পাখির ছানার মতো থরথর করে কাঁপছিল।

মায়ের আশঙ্কা অনুভব করে আমার চোখে জল এসে গেল।

.

পরদিন আবার গেলাম স্পেকট্রাম অ্যাড-এর অফিসে।

গতকালের হলুদ চুড়িদার মেয়েটি আজ গোলাপি চুড়িদার পরে আছে। কপালে সেই চুলের ঝালর, তার নীচে টানা-টানা চোখ।

আমাকে দেখামাত্রই সৌজন্যের হাসি হাসল। সোফায় দিকে চোখের ইশারা করল।

সোফায় বসে আমি মেয়েটিকে শর্মিলা বোসের কথা জিগ্যেস করলাম। উত্তরে মেয়েটি বলল যে, শর্মিলা বোস এখনও আসেননি–তবে ওঁর আসার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি। আমি চাইলে অপেক্ষা করতে পারি।

চাইলে মানে! শর্মিলা বোসকে আমার চাই-ই চাই! গতকালের পুলিশি হানার পর আমি রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছি। মা, ব্রতীন, মিলি যদি একবার জানতে পারে যে, দত্তগুপ্তের

ফ্ল্যাটে আমি কীসের লোভে গিয়েছিলাম, তা হলে আমাকে হয়তো সুইসাইড করতে হবে।

কী একটা কাজে সঞ্জিত কর অফিসের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রিসেপশানের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে আবার ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন, আচমকাই আমাকে দেখতে পেলেন।

আরে, আপনি এসে গেছেন! চওড়া করে হাসলেন সঞ্জিত কর।

আমি কাচুমাচু মুখ করে মাথা নাড়লাম—যার অর্থ হল, না এসে উপায় কী!

একটু ওয়েট করুন। শর্মিল্যাদি আজ হয়তো আসবেন।

সঞ্জিত করের কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে থেকে কাচের দরজা ঠেলে একজন ভদ্রমহিলা ভেতরে এসে ঢুকলেন। ফরসা গোলগাল চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, চোখে সানগ্লাস। ম্যাচ করা শাড়িব্লাউজ দিব্যি মানিয়েছে।

ওঁকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না।

মিস্টার করকে দেখে খুশির হাসি হেসে ভদ্রমহিলা বললেন, হাই সঞ্জিত, কোনও ভালো খবর আছে?

সঞ্জিত কর বড় করে হাসলেন। তারপর আমার দিকে ইশারা করে বললেন, দারুণ গুড নিউজ আছে। ইওর ওল্ড ফ্রেন্ড ইজ ব্যাক। আপনি কথা বলুন। আজ আপনার সঙ্গে আমার কোনও কাজ নেই। নেক্সট মানডে বিকেলের দিকে একবার আসবেন।

কথাগুলো বলেই সঞ্জিত কর ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা ওঁকে কোনও জবাব দিতে পারেননি। শুধু ঘাড় কাত করে হ্যাঁ বুঝিয়েছেন। কারণ রিসেপশানের সোফায় আমাকে দেখেই ওঁর মুখ সাদা হয়ে গেছে। চোখ পাগলের মতো হয়ে গেছে ভয়ে।

অবশেষে আমি ওঁর দেখা পেলাম। এইবার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। দত্তগুপ্তকে কে খুন করেছে আমি জানতে চাই।

শর্মিলা বোসের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে আমি একটি কথাও বলিনি। একবার শুধু বলেছি, আমার নাম রীতেন মিত্র। সূর্য সেন স্ট্রিটে থাকি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। আর সেটা খুব নিরিবিলি জায়গায় হলে ভালো হয়।

কিছুক্ষণ দোনোমনা করার পর শর্মিলা বোস ছোট্ট করে জিগ্যেস করলেন, আমার বাড়িতে বসে কথা বললে কোনও প্রবলেম আছে?

না। বরং সেটাই ভালো হবে।

কী করে আমার খোঁজ পেলেন?

সংক্ষেপে সব বললাম।

তারপরই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছ থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা ছুটলাম গড়পাড়ের দিকে।

ট্যাক্সিতে শর্মিলা একবার কথা বলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে আমি ওঁকে থামিয়ে দিয়েছি। আমার মনে তখন শয়ে-শয়ে পাগলা ঘোড়া ছুটছে। বহু প্রশ্ন একসঙ্গে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ঠোঁটের কাছে। আমি বর্ষার কথা ভেবে মনটাকে শান্ত করছিলাম। অফিসে এখন ও কার সঙ্গে গল্প করছে কে জানে! মংপু কিংবা রেইনম্যান নিশ্চয়ই ওর কাছাকাছি আছে।

গড়পাড়ের একটা পুরোনো বাড়ির একতলায় থাকেন শর্মিলা। দেড়খানা ঘরকে জোড়াতালি দিয়ে ফ্ল্যাটের মতো করে নিয়েছেন। মাসছয়েক হল বিয়ে করেছেন, তবে সিঁথিতে রঙের ছোঁয়া নেই। কারণ, যে-ধরনের কাজ তিনি করেন তাতে অসুবিধে হয়।

একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন শর্মিলা। নিজে একটা খাটো টুলের ওপরে বসলেন।

ছোট ঘর। অভাব আর চাহিদা দিয়ে সাজানো। বুঝতে পারছিলাম, ওঁর লড়াইটা বেশ কষ্টের। ওঁকে কষ্ট দিতে আমার খুব কষ্ট হবে।

আমার মুখে বোধহয় তেষ্টা আর ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। কারণ, পাশের ঘরে গিয়ে আমার জন্যে এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশের শরবত তৈরি করে নিয়ে এলেন।

কাচের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অনুভব করে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই শর্মিলা বললেন, সরি, ফ্রিজ নেই।

আমি এক ঢোঁকে গ্লাসটা খালি করে ওঁকে ফেরত দিলাম। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়েই প্রশ্ন করলাম, দত্তগুপ্তকে কে মার্ডার করেছে?

শর্মিলার হাত কেঁপে গেল। গ্লাসটা মেঝেতে একপাশে রাখতে গিয়ে ঠক করে শব্দ হল। তারপর কয়েকসেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, আমি জানি না।

ম্যাডাম, এখন ছেলেমানুষির সময় নয়। পুলিশ যে-কোনও সময় এসে আপনার বাড়ির কড়া নাড়বে। আমার বাড়িতে ইতিমধ্যেই হানা দিয়েছে।

দেখুন, এখন পাঁচটা বাজে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার হাজব্যান্ড এসে পড়বে। ও খুব বদরাগি লোক। হয়তো কী-নাকী ভেবে উলটোপালটা কিছু একটা করে বসবে।

আমি কোনও কথা না বলে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। বললাম, আপনি কি চান আমি এই মুহূর্তে কড়েয়া থানায় ফোন করে আপনার নাম-অ্যাড্রেস বলে দিই! তাতে আমি হয়তো মরব, তবে আপনিও বাঁচবেন না।

শর্মিলা মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। অভিনয় কি না কে জানে! তবে কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে ভেজা চোখে তাকালেন আমার দিকে ও আমার অবস্থা ঠিক আপনার মতো। মিস্টার দত্তগুপ্ত সাড়ে ছটা নাগাদ আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। আমি পৌনে সাতটা নাগাদ গিয়ে দেখি উনি বিছানায় মরে পড়ে আছেন। বিশ্বাস করুন, অনেস্ট টু গড।

আপনাকে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়েছিল কে?

শর্মিলা কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। ইতস্তত করে বললেন, রোগা ফরসা মতন একটি মেয়ে। আমাকে দরজা খুলে দিয়ে সে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল...।

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, বোধহয় কোল্ড ড্রিংস আনতে গিয়েছিল। আবার সেই মেয়েটিকে খোঁজ করে যদি জিগ্যেস করি তা হলে সে-ও নিশ্চয়ই একই গল্প শোনাবে। অন্য আর একটি মেয়ে ওকে দরজা খুলে দিয়েছিল...তারপর ওর জন্যে কোল্ড ড্রিংস আনতে গিয়েছিল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম ও মিসেস বোস, ব্যাপারটা অনেকটা মুরগি আগে, না ডিম আগে র মতো হয়ে গেল না! আমি লাস্টবারের মতো আপনাকে বলছি, দিস ইজ নট আ জোক। আমি আপনাকে হেল্প করতেই চাই। ডোন্ট মেক মি চেঞ্জ মাই মাইন্ড। মোবাইল ফোনটা উঁচিয়ে ধরে ওঁকে আবার পুলিশের ভয় দেখালাম।

শর্মিলা মাথা ঝুঁকিয়ে দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। ওঁর পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। ফরসা পিঠে গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজটা যেন কেটে বসেছে।

আমি ওঁকে সামলে নেওয়ার সময় দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে শর্মিলা যা জানালেন তাতে ব্যাপারটা খুব একটা এগোল না।

শর্মিলা সত্যি-সত্যি পৌনে সাতটা নাগাদ দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে শর্মিলা দরজা বন্ধ করে দেন। কারণ, দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে ওঁর যাতায়াত বহুদিন ধরেই–ফলে কোনও ভয়-টয় ওঁর মনে

কাজ করেনি। রিসেপশানে কাউকে না দেখে ওঁর প্রথম খটকা লাগে। তারপর ভেতরে গিয়ে দেখেন দত্তগুপ্ত বিছানায় মরে পড়ে আছেন। ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। তখন ভীষণ ভয় পেয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোতে যাবেন ঠিক তখনই কলিংবেল বেজে ওঠে। শর্মিলা তখন ভয়ে পাগলের মতো হয়ে যান। দিশেহারা অবস্থায় কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে দরজা খোলেন।

তারপর তো আপনি সবই জানেন...। ধরা গলায় বললেন শর্মিলা, আপনাকে চিনি না, জানি না ঠিক কীভাবে কথা বলব বুঝতে পারছিলাম না।...আপনি সেদিন মিস্টার দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে কেন গিয়েছিলেন?

ভেতরের দ্বিধা কাটিয়ে সত্যি কথাই বললাম ওঁকে। তারপর জানতে চাইলাম, আপনি কেন গিয়েছিলেন?

পাশের ঘর থেকে ফোন বেজে ওঠার শব্দ শোনা গেল। শর্মিলা তড়িঘড়ি উঠে ফোন ধরতে চলে গেলেন।

একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, এমন প্রফেশনে আছি যে, ফোন না থাকলে চলে না। তবে খুব দরকার ছাড়া ফোন করি না। সবসময় ভয় হয়–এই বোধহয় দেড়শো ফ্রি কল পেরিয়ে গেল।

আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন? ঠান্ডা গলায় আবার প্রশ্ন করলাম।

শর্মিলা দুবার ঢোঁক গিললেন, তারপর বললেন, মিস্টার দত্তগুপ্তের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ছিল।

কীসের বোঝাপড়া?

শর্মিলা উদাস চোখে আমার দিকে তাকালেন। ঘরের জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির রং-চটা দেওয়াল দেখা যাচ্ছিল। দেওয়ালে বিকেলের রোদ ঠিকরে পড়ে শর্মিলার ঠিকানায় খানিকটা আলো পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সেই আলোয় শর্মিলার ফরসা গোলগাল মুখ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। আর ওর কোকড়ানো চুলে অসংখ্য হাইলাইটের কুচি চিকচিক করছিল।

রীতেনবাবু, আমার জীবনটা ছোটবেলা থেকেই নানান ঝড়ঝাপটায় কেটেছে। সেসব কাহিনি আপনাকে শুনিয়ে আর লাভ নেই। পিনাকী দত্তগুপ্তের ওখানে আমি প্রায় শুরু থেকেই ছিলাম। ওঁর ব্যবসা মেয়েদের নিয়ে–তবে তার নানারকম লেভেল আছে...।

আমি ছোট্ট করে বললাম, জানি।

কী করে জানলেন! শর্মিলা অবাক হয়ে গেলেন? জানেন, লাস্ট লেভেলে কী ধরনের কাজ করতে হয়?

জানি। এই তিন-দিনে আমি প্রচুর খবর জোগাড় করেছি, ম্যাডাম। পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করতে এলে আমাকে তো আগে বাঁচতে হবে! সে যাকগে–আপনি যা বলছিলেন বলুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শর্মিলা তেতো গলায় বলতে শুরু করলেন, আমি ওঁর কাছে সব লেভেলেরই কাজ করেছি : টেলিফোনে খোশগল্প করা থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত। পরের দিকে শুধু লাস্ট লেভেলের কাজই করতাম। প্রথম প্রথম অভাবের জন্যে... শেষ দিকে হয়তো স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল...কে জানে! শর্মিলা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, এই করতে করতে সময় গড়িয়ে গেল, বয়েস গড়িয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, যখন জীবনটা একেবারে হোপলেস জায়গায় চলে গেছে বলে ধরে নিয়েছি, যখন সব ফুল ঝরে গেছে, তখনই আনএক্সপেক্টেড একটা ঘটনা ঘটল...।

কী?

মরা গাছে ফুল ফুটল। আই ফেল ইন লাভ। জনির প্রেমে পড়ে গেলাম। বিষণ্ন হাসলেন শর্মিলা : কখনও ভাবিনি এরকম বয়েস-পেরোনো বয়েসে আমি প্রেমে পড়ে যাব–তাও আবার আমার চেয়ে কমবয়েসি কোনও পুরুষের সঙ্গে…।

শর্মিলার মুখে ঠিকরে পড়া আলোটা ক্রমেই কনে-দেখা-আলো হয়ে যাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক অদ্ভুত ঘোরের ভেতর থেকে শর্মিলা কথা বলে চললেন।

জনির সঙ্গে কাছাকাছি আসার পর আমার সবকিছু বদলে যেতে চাইল। ওর সঙ্গে আমার মেলামেশায় কোনও ফাঁক ছিল না। কিন্তু কোথায় ও ফুর্তি-টুর্তি করে কেটে পড়বে, তা না, আমাকে বিয়ে করার বায়না ধরল। আমার মনটাও কেমন যেন হয়ে গেল…রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু বিয়ের পর আমি কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলতেই দত্তগুপ্ত খেপে গেলেন। জনি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সিকিওরিটি অফিসারের চাকরি করে। আর টুকটাক মডেলিং করে আমিও দু-পয়সা আয় করি। ফলে সংসার চালাতে কোনও প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। সেইজন্যেই ওসব কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দত্তগুপ্ত পরিষ্কার আমাকে বললেন, একটা কেন, দশটা বিয়ে করো– তবে লাইন ছাড়তে পারবে না। আমার বিজনেসের ক্ষতি হবে।

দত্তগুপ্ত এমনিতে ভালো লোক ছিলেন কিন্তু বিজনেসের এক ইঞ্চি ক্ষতি হলেই রাগে পাগল হয়ে যেতেন। আমাকে তো ঘরে ডেকে নিয়ে যা-তা বললেন। যখন দেখলেন আমি সেই এক গোঁ ধরে আছি, তখন বিচ্ছিরিভাবে হেসে একটা বড় খাম বের করলেন। খামের ভেতরে ছইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি মাপের অনেকগুলো কালার ফটোগ্রাফ ছিল। নানান ধরনের কাস্টমারের সঙ্গে আমার ছবি–সবই বেডরুমের…একটাতেও গায়ে সুতো নেই।

আমি তাতে ভয় পাইনি। কারণ, জনি আমার এই লাইফের কথা জানত। সব জেনেই ও আমাকে বিয়ে করেছে। তাই জোর গলায় দত্তগুপ্তের হুমকির প্রতিবাদ করি। একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে দুঃখের হাসি হাসলেন শর্মিলা। ছোট করে মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। তারপর বললেন, দত্তগুপ্তকে চিনতে আমি ভুল করেছিলাম। উনি আমার কথায় দমে না গিয়ে হেসে বললেন, শর্মিলা, তুমি বড় ছেলেমানুষ। প্রেম-টেমের ব্যাপারগুলো আমি বুঝি। এই ছবিগুলো আমি তোমার হাজব্যান্ডের কাছে পাঠাব না। ছাপিয়ে বই করে পর্নোগ্রাফির মার্কেটে বিক্রি করব। এত কম দামে বেচব যাতে কয়েকমাসে লক্ষ-লক্ষ কপি উবে যায়। তাতে ছবির সঙ্গে-সঙ্গে তোমার নাম-ঠিকানাও ছাপা থাকবে। কনট্যাক্ট ফোন নাম্বার, আর পার-নাইট রেটও ছাপা থাকবে। তোমার সোসাল লাইফ বলে কিছু থাকবে না। শুধু থাকবে অ্যান্টিসোসাল লাইফ।

এরপর দত্তগুপ্ত প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে ওঁর ফ্ল্যাট থেকে ফিরে এসেছিলাম। তার পরে বহুবার ওঁকে রিকোয়েস্ট করেছি কিন্তু ওঁকে নড়াতে পারিনি। তখন বাধ্য হয়ে আমি নানাভাইয়ের কাছে যাই...।

কে নানাভাই? আমি জিগ্যেস করলাম।

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে একবার দেখলেন শর্মিলা। তারপর ঢোঁক গিলে বললেন, মিস্টার দত্তগুপ্তের এলাকাটা ওঁর দখলে। দত্তগুপ্ত মাসে-মাসে নানাভাইকে দশহাজার টাকা করে দিতেন।

নানাভাইয়ের কাছে আপনি কবে গিয়েছিলেন?

লাস্ট মান্থে।

তারপর?

নানাভাইকে আমি চিনতাম। দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটেই একবার আলাপ হয়েছিল। আমার কথা শুনে নানা বললেন, কোনও চিন্তা নেই। সব প্রবলেম সল্ভ হয়ে যাবে। তারপর...।

নানাভাইকে আপনি কোনও টাকা দিয়েছিলেন?

না, না! কোনও টাকা দিইনি।

নানাভাই কীভাবে প্রবলেম সলভ করবেন বলেছিলেন?

না বলেননি।

তা হলে কি নানাভাই সবচেয়ে সোজা-সরল পথে প্রবলেমটা সল্ভ করে দিয়েছেন! দত্তগুপ্তের মুখের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে তারপর...।

হঠাৎই শর্মিলা বললেন, নানাভাই মহিলাদের খুব রেসপেক্ট করেন। আমার অবস্থায় কথা শুনে ছোট্ট করে শুধু বলেছিলেন, ম্যাডাম, আপনার কথা যদি সাচ্চা হয় তা হলে ওই বাস্টার্ডটার আমি কাম তামাম করে দেব। আর যদি খোঁজ নিয়ে দেখি আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন, তা হলে আমার ছেলেরা আপনাকে পাবলিক প্লেসে বেইজ্জত করে ছাড়বে। তখন...তখন আমি কেঁদে নানাভাইয়ের পা জড়িয়ে ধরি...।

কিন্তু আপনি এটা খেয়াল করেছেন, দত্তগুপ্তকে মার্ডার করলে নানাভাইয়ের মান্থলি ইনকাম দশহাজার টাকা করে কমে যাবে।

হ্যাঁ জানি। সেইজন্যেই তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না..দত্তগুপ্তকে কে মার্ডার করল... আপনি আমাকে ফর নাথিং সন্দেহ করছেন।

আমার মনের ভেতরে একটা ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছিল। এ কোন জটে জড়িয়ে পড়লাম আমি! বর্ষার কথাটা মনে পড়ল? আমরা চুপচাপ থাকি না! আমাদের ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার!

আমি কি তা হলে ভুল করছি?

আপনি এখন কী করতে চান? শর্মিলার আচমকা প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম।

সত্যিই তো! এখন কী করব আমি? কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, পুলিশ বরং পুলিশের কাজ করুক। আমি আর বর্ষা চুপচাপ থাকি। যদি পুলিশ তদন্ত করতে করতে আমাকে কিংবা বর্ষাকে অ্যারেস্ট করে হ্যারাস করে, তখন না হয় কিছু একটা করা যাবে। দরকার হলে নানাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বিপদের কথা বলব।

নানাভাইয়ের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতে পারেন?

কেন, কী করবেন? শর্মিলা যেন ভয় পেয়ে গেলেন।

ফোন নাম্বার নিয়ে লোকে কী করে–ফোন করে। আমিও তাই করব। নানাভাইয়ের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন। আমার শেষ কথাটায় একটু কড়া সুর ছিল।

শর্মিলা আমার চোখে কী যেন দেখলেন। তারপর তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে একটা ডায়েরির পাতা উলটে নানাভাইয়ের ফোন নাম্বারটা আমাকে বললেন। আমি মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে নাম্বারটা টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ঢুকিয়ে নিলাম।

শর্মিলা তখন আমার মোবাইল নাম্বারটা চাইলেন। দিলাম। এবং ওঁর ফোন নাম্বারটাও মোবাইল ফোনে স্টোর করে নিলাম।

মিস্টার দত্তগুপ্ত মার্ডার হওয়ার পর আপনি নানাভাইয়ের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি?

না– শর্মিলা ইতস্তত করে জবাব দিলেন, পুলিশের অ্যাকটিভিটিটা একটু থিতিয়ে আসুক..তারপর হয়তো কনট্যাক্ট করব। শর্মিলা আবার হাতঘড়ি দেখলেন। কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার উঠুন, প্লিজ। জনি এখুনি এসে পড়বে। তারপর...।

মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, ম্যাডাম, চলি। থ্যাঙ্ক য়ু ফর ইয়োর কোঅপারেশন।

শর্মিলা বোস ভদ্রতার হাসি হাসলেন, বললেন, আপনার খোঁজখবরে নতুন কোনও ডেভেলাপমেন্ট হলে আমাকে জানাবেন। দরকার হলেই বলবেন আমি সবসময় হেল্প করতে রাজি আছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন দশাসই চেহারার লোক হুট করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। তাকে দেখে শর্মিলার মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওঁর ফরসা মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। একবার আমার দিকে, একবার আগন্তুকের দিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে লাগলেন। যেন এক্ষুনি কোনও বিপদ হতে পারে।

ঘরে যে ঢুকেছে তার হাবভাবে একটু মালিক-মালিক ছাপ রয়েছে। গায়ের রং রোদে পোড়া তামাটে। চৌকো মুখে অকালে ভাঁজ পড়েছে। কপালে কিছু বেশি। ছোট-ছোট চোখে ঘোলাটে ভাব। চোখের নীচে অ্যালকোহলের ব্যাগ। আর ঠোঁটে কালচে ছোপ। নাকটা পেশাদার বক্সারদের মতো চ্যাপটা। মাথার কালো কুচকুচে চুল তেল মেখে পেতে আঁচড়ানো।

বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। পরনে ঘিয়ে রঙের হাওয়াই শার্ট আর নস্যি রঙের ফুলপ্যান্ট। জামাটা ঢোলা হলেও পেশি আর স্বাস্থ্য এখানে-সেখানে জানান দিচ্ছে।

আমার হাজব্যান্ড—জনি। মুখে চেষ্টা করে হাসি ফুটিয়ে শর্মিলা বললেন।

মুখটা চিনতে পারলাম। কারণ, দেওয়ালে টাঙানো একটা রঙিন ফটোগ্রাফে জনি ওর এক রোগাপটকা বন্ধুর সঙ্গে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি হেসে হাত বাড়ালাম জনির দিকে। জনি হাসল। ওর মুখের রুক্ষ সন্দিহান ছাপটা কেটে গেল। আমার সঙ্গে হাত মেলাল।

ওকে উইশ করে আমার পরিচয় দিলাম। তারপর আর কিছু বলার আগেই শর্মিলা বলে উঠলেন, মিস্টার মিত্র একটা অ্যাড ফিল্মে আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান। আজ বিকেলেই স্পেকট্রাম অ্যাড-এর অফিসে ওঁর সঙ্গে কনট্যাক্ট হয়েছে।

ইশারা থেকে বুঝে নেওয়া বুদ্ধিমান লোকের কাজ। তাই একগাল হেসে বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই ওয়েট করছিলাম। ম্যাডাম বলছিলেন যে, আপনি এখুনি এসে পড়বেন...।

জনি একটা মোড়া টেনে নিয়ে আমাদের কাছাকাছি বসে পড়ল। অনুরোধের সুরে বলল, অ্যাডের কাজ-টাজের খোঁজ পেলে ওকে দেবেন। ওর মধ্যে পার্টস আছে কিন্তু ভালো চান্স পায়নি। তবে যারাই ওকে দিয়ে কাজ করিয়েছে দে গট হুন্ড। হোয়াট ডু য়ু সে, হানি? জনি হো-হো করে হেসে উঠল।

হাসতে-হাসতে হঠাৎই ওর খেয়াল হল আমি দাঁড়িয়ে আছি। তাই বলল, আপনি বসুন — শর্মিলার দিকে ফিরে : ওঁকে চা-টা দিয়েছ?

শর্মিলা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে–আর বসব না। আজ চলি–পরে আবার দেখা হবে।

শর্মিলা আমাকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

হঠাৎই একটা কথা মনে পড়ায় ওঁকে জিগ্যেস করলাম, ম্যাডাম, দত্তগুপ্ত কি চুরুট খেতেন?

আচমকা এই ধরনের প্রশ্নে শর্মিলা কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে মিস্টার দত্তগুপ্তকে যেন চুরুট খেতে দেখেছি।

আমার কপালে ভাঁজ পড়ল। কী যে করি এখন! এভাবেই কি আমাকে আঁধারকানা হয়ে ঘুরে-ঘুরে মরতে হবে! বর্ষা যদি ফোন করে তা হলে ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখি।

শর্মিলাদের ঘর থেকে আবছাভাবে ইংরেজি গানের কলি ভেসে আসছিল। জনি গান গাইছে। তারপরই নাম ধরে স্ত্রীকে ডাকল জনি। একবার। দুবার।

শর্মিলা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। তারপর ব্যস্তভাবে বললেন, যাই–পরে আপনাকে ফোন করব। আপনিও দরকার হলে ফোন করতে পারেন। দুপুরে করবেন–জনি তখন থাকবে না।

আবার রাস্তার আমার সঙ্গী হল। তবে সূর্যের পালা এখন শেষ। একটু পরেই চাঁদের পালা শুরু হবে।

.

০৬.

বাড়ি ফেরার পর আমার ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে মা আঁতকে উঠল। কয়েক লাইন বকুনি দিয়ে তারপর গজগজ করতে করতে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল এনে দিল। প্রায় শাসনের সুরে বলল, এবার একটু বিশ্রাম কর। বাড়ি থেকে আর বেরোস না।

মা কথাগুলো না বললেও পারত। কারণ, আমার শরীর আর বইছিল না। নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলাম। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে ঝড় তুলতে লাগল। তারই মধ্যে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল মোবাইল ফোনের সুরেলা আওয়াজে।

ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ঘর অন্ধকার। মোবাইল ফোনটা টেবিলে রাখা ছিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেদিকে এগোতে এগোতেই ফোনের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। ইস,

বোধহয় বর্ষার ফোন ছিল।

আলো জ্বেলে মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে মিসড কল-এর লিস্টে ফোন নাম্বারটা দেখলাম। না, বর্ষার নাম্বার নয়। আমার চেনা অন্য কোনও নাম্বারও নয়।

এরপর সিগারেট, চা, আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সময় কাটতে লাগল। একসময় আর পেরে না উঠে টেপ রেকর্ডারে গান চালিয়ে দিলাম। ধীরে-ধীরে দত্তগুপ্ত, শর্মিলা, জনি, নানাভাই, সবাই আবছা হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু বর্ষার ফোন এল না।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আর থাকতে না পেরে বর্ষাকে ফোন করলাম। বোধহয় ওর মা ধরলেন। ধরেই প্রশ্ন করলেন, কে বলছেন?

আমি নাম বললাম।

বর্ষা এখন নেই। একটু কাজে বেরিয়েছে। আপনি কাল সকাল আটটা নাগাদ ফোন করবেন– পেয়ে যাবেন।

ফোন শেষ হওয়ার পর বেশ ধন্দে পড়ে গেলাম। এত রাতে কোন কাজে বেরিয়েছে বর্ষা! দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়ে কোনও বিপদে পড়ল না তো! নাকি মিস রোজির বাড়িতে গেছে!

পরদিন অফিসে গিয়ে আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।

অন্যান্য অস্কার নমিনিকে উপেক্ষা করে বর্ষা সরাসরি চলে এল আমার কাছে। ফ্যাকাসে মুখে বলল, রীতেনদা, কাল আপনি ফোন করেছিলেন? আমি তখন কড়েয়া থানায় গিয়েছিলাম।

শুনে আমার ফ্যাকাসে হওয়ার পালা।

থানায়! তার মানে!

ও নীচু গলায় সব বলল।

কড়েয়া থানা থেকে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। পাড়ার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে ও থানায় দেখা করতে গিয়েছিল। বর্ষা জানত, সন্ধের পর কোনও মহিলাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে থানায় ডেকে পাঠানো যায় না। কিন্তু কৌতূহল ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে পুলিশকে ও যা বলার বলেছে। এও বলেছে, খুনের ব্যাপারে ও কিছু জানে না। পুলিশের ধারণা, দত্তগুপ্তকে কেউ বদলা নেওয়ার জন্যে খুন করেছে। কোনও মাফিয়া ডনও খুনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে।

আচ্ছা, বর্ষা, মিস্টার দত্তগুপ্ত কি চুরুট খেতেন?

আমার আচমকা প্রশ্নে ও থতোমতো খেয়ে গেল, বলল, না তো! উনি ক্লাসিক খেতেন। মিস রোজিকে একদিন আমার সামনেই প্যাকেট বের করে অফার করেছিলেন আমি দেখেছি।

আমার মনের ভেতরে ঝড় উঠল। হে নিয়তি, এ তোমার কেমন খেলা!

বর্ষা চাপা গলায় জিগ্যেস করল, আপনার ছুটোছুটির কী রেজাল্ট হল?

ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা। হেসে বললাম, এখন নয়। এক্ষুনি পুরকায়স্থ তোমাকে তলব করে বসবে। চলো, আজ বাইরে লাঞ্চ করব। তখন সব বলব…।

বর্ষা ঘাড় কাত করল। ওর শ্যাম্পু করা চুল বিজ্ঞাপনের মতো দেখাল।

আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছিলাম, হঠাৎই দেখি প্রকাশ রায়চৌধুরী হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বর্ষাকে বললাম, বর্ষা, এবার একটু প্রকাশের কাছে যাও—বৃষ্টি দাও। নইলে ওর চোখ মুখের যা হিংস্র অবস্থা দেখছি তাতে সামনে যাকে পাবে তাকেই কামড়ে দেবে।

এত সমস্যার মধ্যেও বর্ষা হাসল। হেসে সত্যি-সত্যিই চলে গেল প্রকাশের টেবিলের কাছে।

আমি মাথা নীচু করে কাজে মন দিলাম। প্রেমে গদগদ হায়েনাকে কেমন দেখায় সেটা আমি আর দেখতে চাই না।

***

রশিদ আমাকে পথ দেখিয়ে নানাভাইয়ের আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর লম্বা-লম্বা চুল, ভাঙা গাল, লিকলিকে ঢ্যাঙা চেহারা দেখলে কে বলবে ও নানাভাইয়ের হিটম্যান—দু-চারটে খুন ওর কাছে কোনও ব্যাপার নয়!

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে ছাতা নেই। তাই দুজনেই অল্পবিস্তর ভিজতে ভিজতে কাদা-জল মাড়িয়ে একটা বস্তির সরু গলি ধরে এগোচ্ছিলাম। কলকাতার কোনও গলিতেই ভদ্রলোকের মতো আলো নেই। এখানেও তাই। কলকাতা চিরকালের জন্যে উন্নয়নশীল রয়ে গেল! সত্যি-সত্যি যদি কোনওদিন কলকাতার উন্নতি ঘটে যায়, তা হলে এখানে উন্নয়নশীল কাজকর্ম যেসব জনগণঅন্তপ্রাণ মহাজন করে থাকেন তাঁরা নিতান্ত বেকার হয়ে পড়বেন।

নানাভাইয়ের অট্টালিকার সামনে পৌঁছে বুকের ভেতরটা ভয়ে মুচড়ে উঠল। বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার এই পদ্ধতিটাই যে কেন আমার সবচেয়ে পছন্দ হল কে জানে! ভয় তাড়াতে বর্ষার কথা ভাবতে শুরু করলাম।

পরশুদিন বর্ষার সঙ্গে বিস্তর আলোচনার পর মনে হল, নানাভাইয়ের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে। আমাকে পুলিশ হাজতে পুরে থার্ড ডিগ্রি দেওয়ার আগে আসল

খুনিকে ধরা চাই। আর সেটা নিশ্চয়ই রীতেন মিত্রের কর্ম নয়! অতএব নানাভাই।

গতকাল শর্মিলাকে ফোন করেছিলাম। আমার নাম বলামাত্রই তিনি যে-ধরনের হাসি হাসলেন তাতে যে-কোনও লোকের মনে হতে পারে স্পেকট্রাম অ্যাড-এর সঞ্জিত করের ধারণাটাই ঠিক। আবার দত্তগুপ্ত বেঁচে থাকলে বলতেন, শর্মিলা বোস ফার্স্ট লেভেলের কাজ করছে।

কেমন আছেন, ম্যাডাম?

ভালোই। আপনি?

আপাতত ঠিক আছি—তবে আপনার হেল্প না পেলে আমার ফিউচার টেনস হতে পারে। আর তাই নিয়েই ভীষণ টেনশানে আছি।

বলুন, কী হেল্প করতে হবে।

নানাভাইকে একটু কনট্যাক্ট করতে চাই। আপনি ফোন নাম্বার দিয়েছেন ঠিকই তবে ডায়রেক্টলি ফোন করাটা বোধহয় ঠিক হবে না।

নানাভাইকে ফোন করে আপনি কী বলবেন?

আবার সেই একই প্রশ্ন! শর্মিলা কি চান না আমি নানাভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি? কিন্তু শর্মিলা তো এও জানেন, আমাকে হেল্প না করে ওঁর উপায় নেই। আমি পুলিশের ঝামেলায় জড়ালে উনিও রেহাই পাবেন না। তাতে হয়তো জনির সঙ্গে ওঁর প্রেমের বিয়েটা চটকে যাবে।

একটু হেসে বললাম, আমি মহিলা হলে কোনও প্রবলেম ছিল না। কারণ, আপনিই তো বলেছেন নানাভাই মহিলাদের খুব রেসপেক্ট করেন। কিন্তু পুরুষদের কী করেন? পিনাকী দত্তগুপ্তের মতো কাম তামাম করে দেন?

শর্মিলা কিশোরীর মতো হেসে উঠলেনঃ দত্তগুপ্তের সঙ্গে আপনার কোনও তুলনা চলে না। একটু থেমে আদুরে গলায় বললেন, আপনি দারুণ অ্যাট্রাকটিভ।

আমার হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা আর-একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। আমাকে এইরকম ভালো-ভালো কথা বলার জন্যে শর্মিলা পরে হয়তো সেল ট্যাক্সসমেত বিল পাঠাবেন।

ম্যাডাম, প্লিজ। আমার অবস্থাটা একবার বুঝুন। নানাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

শর্মিলা তখন আমাকে রশিদের কথা বলেন। ওর ফোন নাম্বার দেন। তারপর ও রশিদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি ওকে ফোন করে আপনার কথা বলে দিচ্ছি। আপনি আধঘণ্টা পরে ওকে ফোন করুন। তবে খুব কেয়ারফুলি কথাবার্তা বলবেন। ও নানাভাইয়ের একনম্বর হিটম্যান।

যখন টেলিফোন ছাড়তে যাচ্ছি তখন শর্মিলা আবার জানতে চাইলেন, নানাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আমি কী করব।

মনে-মনে ভীষণ বিরক্ত হলেও মিষ্টি গলায় উত্তর দিলাম, নানাভাই কেমন আছেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেমন আছে, সে-কথা জিগ্যেস করব। তারপর জানতে চাইব, দত্তগুপ্তকে মার্ডারের গুপ্তকথা। একটু হেসে যোগ করলামঃ পরে আপনাকে সব জানাব।

এবং রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

টিন ও টালির তৈরি খুপরি গোছের বেঁকাতেড়া ঘরগুলোর প্রায় গা ঘেঁষে জিরাফের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নানাভাইয়ের প্রাসাদ। বস্তির কারুকার্যের পাশে শ্রাবস্তীর কারুকার্য বড়ই বেমানান ঠেকছিল।

কোলাপসিবল গেটের সামনে জোরালো আলো জ্বলছিল। ভেতরে একটা ঘরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ছিল। লোকজনের চাপা কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছিল।

রশিদ পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল। চাপা গলায় কী সব কথা বলল। তারপর আমাকে হাত নেড়ে ইশারা করলঃ যাইয়ে, অন্দর যাইয়ে, ডঁয়ে তরফ কা বড়া কামরা। পহেলে আপনা নাম বনা—নানাভাই সমঝ জায়েঙ্গে।

রশিদের নির্দেশমতো ভেতরের দিকে পা বাড়ালাম। ভয়ে ঠকঠক করে পা কপার ব্যাপারটা যে নেহাতই কথার কথা নয় সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিলাম। বেশ কষ্ট করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ডানদিকের একটা বড় ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরজায় গ্রিলের পাল্লা হাট করে খোলা। তারপর কাঠের পাল্লা। হয়তো বাড়তি নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা। যারা মানুষের কাছে ভয় ফিরি করে বেড়ায় তারাও তা হলে ভয় পায়!

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই শৌখিন আতর আর মদের গন্ধ আমার নাকে ঝাপটা মারল। একেবারে পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে কাঁচে ঢাকা বড়সড়ো এক্সিকিউটিভ টেবিল। তার ওপিঠে গদিমোড়া ঘূর্ণি চেয়ার। তাতে শরীর এলিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে যিনি আয়েসি ঢঙে বসে আছেন তিনিই বোধহয় নানাভাই।

মাথায় শতকরা নব্বই ভাগ মরুভূমি। মাথার পেছনদিকটায় আর কানের পাশে ছিটেফোঁটা মরূদ্যান। গায়ের রং কালো। বছর পঞ্চাশের থলথলে মুখ। ঠোঁটের ওপরে কাঁচাপাকা গোঁফ আর কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। দাড়ির নীচেও চিবুকের ভাঁজ চোখে পড়ছে।

নানাভাইয়ের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। গলায় পাহাড়ি কাঁকড়াবিছের লেজের মতো মোটা সোনার চেন। ডান হাতের ডুমো ডুমো আঙুলে চারটে পাথর বসানো ভারী সোনার আংটি। ডানহাতের কবজিতে সোনার রিস্ট ব্যান্ড।

নানাভাইয়ের সামনের টেবিলে দুটো মোবাইল ফোন পড়ে আছে। তার পাশে কাটগ্লাসের নকশা তোলা গ্লাসে নেশা টলটল। তার কাছাকাছি নেশার বোতল, সোডার বোতল, চিকেন পকোড়ার প্লেট, আর পাঁচশো পঞ্চান্ন সিগারেটের প্যাকেট।

টেবিলে আরও চোখে পড়ল একটা ডায়েরি, তিনটে পেন, আর ডানদিক ঘেঁষে একটা পারসোনাল কম্পিউটার।

ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে বসানো রয়েছে একটা এয়ারকুলার মেশিন। কিন্তু মেশিন বোধহয় খারাপ–তাই তিনটে সিলিং পাখা ঘুরছে।

নানাভাইয়ের টেবিলের এদিকটায় চারটে গদিমোড়া চেয়ার–গেস্টদের জন্যে। সেখানে মাঝারি চেহারার একজন বসে ছোলা বা বাদাম কিছু একটা চিবোচ্ছে। এ ছাড়া দরজার ডানদিকে লম্বা গদিওয়ালা বেঞ্চে দুজন লোক বসে রয়েছে। ওদের চেহারা আর হাবভাব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওরা নানাভাইয়ের ছেলে। ওদের মধ্যে একজনকে কেন জানি না, চেনা-চেনা মনে হল।

আমি ইতস্তত পায়ে এগিয়ে গেলাম নানাভাইয়ের টেবিলের কাছে। টের পেলাম নানার ছেলেদের একজন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই তার ডান হাত পকেটে ঢোকানো এবং সতর্ক নজরে আমার গতিবিধি লক্ষ করছে।

আ-আমার নাম রীতেন মিত্র…।

মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে নানাভাই হাসলেন। ওঁর ফোলা ফোলা গাল আরও ফুলে উঠল। বললেন, আসুন, আসুন বসুন। রশিদ আপনার ব্যাপারে আমাকে বলছিল।

ওঁর কথায় সামান্য টান টের পাওয়া গেল।

আমি বসলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। আতর আর মদের গন্ধ নাক অবশ করে দিচ্ছিল। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কী!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বললাম, নানাভাই, একটা প্রবলেমে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

প্রবলেমে না পড়লে আমার গরিবখানায় কেউ আসে না। হাসলেন নানা : বলুন, কী প্রবলেম?

আমি তখন পিনাকী দত্তগুপ্তের খুনের ব্যাপারটা বললাম। বললাম, পুলিশ আমাকে একবার ইন্টারোগেট করেছে–আবার করতে পারে। ওরা বোধহয় মার্ডারটার ব্যাপারে আমাকেই সন্দেহ করছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হয়তো আমাকেই অ্যারেস্ট করবে। তবে বর্ষা কিংবা শর্মিলা বোসের কথা বললাম না।

কড়েয়া থানার কে আপনাকে হ্যারাস করছে? মুখার্জিবাবু? দাসবাবু?

আমি তখন ভয় পেয়ে বললাম যে, না, এখনও ঠিক হ্যারাস করেনি। তবে আচমকা হয়তো অ্যারেস্ট করতে পারে। আমি একজন সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রামার কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। এসব ব্যাপার লোক-জানাজানি হলে আমি লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।

ইচ্ছে করেই নানাকে ইন্সপেক্টর বিশ্বাসের নাম বললাম না।

নানা গ্লাসে চুমুক দিলেন, চেয়ারের হাতলে বারকয়েক টোকা মারলেন। কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

আমি আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করলাম, নানাভাই, দত্তগুপ্তকে কি আপনি...মানে, আপনার কোনও লোক কি ইয়ে...মানে, মার্ডার করেছে?

নানাভাইয়ের চিন্তার ঘোর কেটে গেল। আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। দেখাদেখি ওঁর তিন শাগরেদও হাসতে শুরু করল।

আমি ফ্যালফেলে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো বসে রইলাম। মনের মধ্যে অপমানবোধ খোঁচা মারছিল।

কিছুক্ষণ পর হাসির দমক কমলে, নানাভাই বললেন, আপ বড়া ভোলা সাদাসিধা আদমি হ্যায়, মিত্তিরবাবু। আমার এরিয়ায় বা ক্লায়েন্টদের কানেকশানে অন্য এরিয়ায় মাসে আমাকে দু-পাঁচ দশটা বডি ফেলতে হয়। কবে কোন বডি ফেলেছি তার ডিটেইল্‌স কি মুখে-মুখে বলা যায়! কী নাম বললেন যেন?

আমি পিনাকী দত্তগুপ্তের নাম-ঠিকানা আবার বললাম।

হিকপিক–।

এই বিচিত্র শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে চেনা-চেনা মনে হওয়া ছেলেটি ইয়েস বস বলে নানার টেবিলের কাছে এগিয়ে এল।

বুঝলাম, হিকপিক ওর নাম। আচার্য সুনীতিকুমার বেঁচে থাকলে এই নামের উৎপত্তি এবং ব্যুৎপত্তি নিয়ে হয়তো একটা নিষ্পত্তি করে ফেলতেন।

হিকপিক, জেরা দেখ তো, ইয়ে ডায়েরিমে ইয়া কম্পুটারমে উও পিনাকী দগুপ্তকা বডিকা হিসাব হ্যায় কি নহি…।

হিকপিক নানার টেবিল থেকে ডায়েরিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। তারপর একমনে পাতা ওলটাতে লাগল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নানাভাই আমার পাশে বসা ছোলা-কিংবা-বাদাম-চিবোনো লোকটার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

হিকপিকের ডায়েরি দেখা শেষ হল। আপনমনেই এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে ও বলল, ডায়েরিমে তো নহি মিলা, বস। অব দেখতে হ্যায় কম্পুটারমে…।

হিকপিকের লিকপিকে রুক্ষ চেহারা দেখে ওকে ভিখিরি ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অথচ এই লোকটা লেখাপড়া জানে, কম্পিউটার অপারেট করতে পারে! আমি ওকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম।

কম্পিউটারে মিনিটখানেক বোতাম টেপাটিপির পর হিকপিক বলল, হমারা ক্লায়েন্ট থা, বস। মাহিনামে দশহাজার…।

ওর সুইচ অফ করে দিল কে? নানাভাই বিড়বিড় করে বললেন।

আমি ব্যাপারস্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শর্মিলা আমাকে বলেছেন, পিনাকী দত্তগুপ্তের ব্যাপারটা নানা জানেন। হয়তো নানাই ওঁর কাম তামাম করে দিয়েছেন। অথচ দত্তগুপ্ত মার্ডার হলে নানার আয় মাসে-মাসে দশহাজার টাকা করে কমে যাবে। সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নানাভাইয়ের কাছে শর্মিলার নাম বলাটা কি ঠিক হবে? নাকি…।

ঠিক আছে, মিত্তিরবাবু। এই মার্ডারের ব্যাপারটা আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখছি। তবে আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি ভদ্দরলোক–তার ওপর আবার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আমি কড়েয়া থানায় মেসেজ পাঠিয়ে দেব আপনাকে কেউ ট্রাবল দেবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম…।

আমি নানার কথার প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিলাম যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই নিতান্তই একজন ছাপোষা প্রোগ্রামার। কিন্তু নানাভাই একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন।

আমি আরও দুটো কম্পুটার কিনছি। এই তিনটে মেশিন এসি রুমে বসিয়ে দেব। আপনি এখন কত করে স্যালারি পান?

আমি বিরাট একটা ধাক্কা খেলাম। নানাভাই কোনদিকে এগোতে চাইছেন? কিন্তু পরিস্থিতি সুবিধের নয়। তাই মিনমিন করে জবাব দিলাম, সাড়ে দশহাজার মতো।

ব্যস! তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন নানাভাই ও এতে কোনও ভদ্দরলোকের মাস চলে! আপনি আমার কম্পুটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যান। মান্থলি বিশহাজার পাবেন–উইথ পার্ক। কিঁউ?

অপমানে আমার মুখে কোনও কথা জোগাচ্ছিল না। ঠোঁটজোড়া যে থরথর করে কাঁপছে সেটা ভালো করেই টের পেলাম। কেন যে মরতে আমি এখানে এলাম! শরীরটা শক্ত করে আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম। বর্ষার কথা ভেবে নিজেকে শান্ত করতে চাইলাম।

নানাভাই মুচকি মুচকি হাসছিলেন। আড়চোখে সে হাসি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আর ভেতরে-ভেতরে জ্বলছিলাম।

হিকপিক কম্পিউটারের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল আমার কাছে। মা যেমন করে অভিমানী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সেভাবে আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, নানাভাইয়ের আপনাকে পছন্দ হয়েছে। তাই এরকম দারুণ অফার দিয়েছেন। রাজি হো যা, লালটু, রাজি হো যা–।

আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। দু-গাল থেকে আগুনের হলকা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। হে ভগবান! যদি তুমি সত্যিই থেকে থাকে, তা হলে আমাকে অপমান সহ্য করার শক্তি দাও। আর যদি না থেকে থাকে, তা হলে তো মিটেই গেল!

কা মিত্তিরবাবু, কুছ বোলিয়ে…। নানাভাইয়ের গলা পেলাম।

আরও কিছুক্ষণ সময় নেওয়ার পর মুখ তুললাম। আমার মুখ দেখে নানাভাইয়ের মুখটা একটু বদলে গেল। হিকপিক একটু সরে দাঁড়াল আমার কাছ থেকে।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম, আমার নতুন চাকরির দরকার নেই, নানাভাই। পুরোনোটাতেই বেশ চলে যাচ্ছে।

আপনার তো গুসসা হয়ে গেল দেখছি।

আমি হিকপিকের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, আপনি যদি রাগ না করেন তা হলে কয়েকটা কথা বলি, নানাভাই...।

হাঁ, হাঁ বলুন, বলুন। হাত নেড়ে আমাকে উৎসাহ দিলেন নানা।

এই যে আপনার শাগরেদ হিকপিক ইশারায় হিকপিককে দেখালাম আমি ও ওর যা চেহারা তাতে ঝোড়ো বাতাসে রাস্তায় বেরোতে পারবে না–হাওয়ায় উড়ে যাবে। ওর বডি এত সরু যে, মেঝেতে কোনও ছায়া পড়বে না। ওর নাম হিকপিকের বদলে লিকপিক হলে মানানসই হত। তা সত্ত্বেও ওর কী সাহস দেখুন–। হাসলাম আমি ও তার কারণ ওর পেছনে আপনি আছেন– আমার পেছনে কেউ নেই। ওর পকেটে হয়তো আমর্স আছে– আমার নেই। খোদা মেহেরবান তো চুহা পহেলবান।

আমার কথায় হো-হো করে হেসে উঠলেন নানাভাই। গ্লাসের ওষুধটুকু এক ঝটকায় গলায় ঢেলে দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে মজা পাওয়া গলায় বললেন, মিত্তিরবাবু মরদ আছেন দেখছি। তো আমি যদি ওই শালা হিকপিকের পেছনে না থাকি, ওর পকেটে যদি কোনও আর্মস না থাকে, তা হলে আপনি কী করবেন?

আমি উঠে দাঁড়ালামঃ দেখিয়ে দেব যে, আমি লালটু নই। ওরকম তিন-চারটে হিকপিককে পালিশ করার হিম্মত রাখি।

হিকপিক আমার দিকে তেড়ে আসতে যাচ্ছিল, আমি হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করলাম, বললাম, এখনও থামো, নইলে দেরি হয়ে যাবে। তারপর নানাভাইয়ের দিকে ফিরে : আজ চলি, নানাভাই। আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আমি নানার তিনজন শাগরেদের ম্যাপই মাথায় টুকে নিয়েছিলাম। এই মুখগুলো কখন কোথায় কাজে লাগে কে জানে!

নানার টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

হিকপিক আমার পাশে-পাশে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। চাপা গলায় হিসহিস করে বলে উঠল, তেরা হিসাব ম্যায় ফিট কর দুঙ্গা।

আমার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে গেল। রাগে পাগল হয়ে আমি এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালাম। খপ করে হিকপিকের চোয়াল চেপে ধরলাম ও অভি ওয়ক্ত হ্যায়, লালটু, সুধর যা।

কথাটা বলেই ওকে পেছনদিকে আলতো করে ঠেলে দিলাম। হিকপিক চার্লি চ্যাপলিনের মতো টাল খেতে-খেতে পেছিয়ে গেল।

নানা কিংবা তার অন্য শাগরেদরা একটি কথাও বলল না, জায়গা থেকেও নড়ল না। বরং মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বাইরে এসে রশিদকে পেলাম। ওকে ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে শুরু করলাম।

.

০৭.

রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে চেষ্টা করছিলাম।

নানাভাইয়ের টেবিলে আমি সিগারেটের প্যাকেট দেখেছি, চুরুট নয়। কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা? পুলিশ মার্ডার ওয়েপনটা পেয়েছে কি না আমি জানি না–জানার কোনও উপায়ও

নেই। যদি পেয়ে থাকে, তা হলে সেটা কি দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেল, না কি অন্য কোথাও থেকে।

আমি শুরু থেকে অঙ্কটা ভাবছিলাম।

দত্তগুপ্ত হয়তো খারাপ কাজ করত, কিন্তু তাই বলে কি খুনি পার পেয়ে যাবে। তা ছাড়া আসল খুনির হদিস না পেলে হয়তো আমাকেই তার বদলে জেলে গিয়ে প্রক্সি দিতে হবে। বাপি আমাকে বেশিদিন কাছে পাননি, কিন্তু তারই মধ্যে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন। আমি যে এখন কী করি!

পিনাকী দত্তগুপ্ত, শর্মিলা বোস, ঘটনার দিন রাতে সিঁড়ি বেয়ে-ওঠা মোটা মতন সেই অবাঙালি ভদ্রলোক, নানাভাই, বর্ষা, এবং আমি। এই খুনের ব্যাপারে কারও গুরুত্বই কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমি কি মিথ্যে-মিথ্যে ভয় পাচ্ছি? এমন কি হতে পারে যে, সম্পূর্ণ অচেনা কেউ সম্পূর্ণ অজানা কোনও কারণে পিনাকী দত্তগুপ্তকে খুন করেছে! হতেও তো পারে।

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দীর্ঘশ্বাসকে বললাম, তোরা যত খুশি বুক ঠেলে লাইন দিয়ে পরপর বেরিয়ে আয়, কিন্তু আমার প্রবলেমটা সল্ভ করে দে।

বিছানায় উঠে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

সেই মুহূর্তেই মনে হল, কোথায় যেন একটা গরমিলের খোঁজ পেয়েছি আমি। কার একটা কথায় যেন আমার খটকা লেগেছিল। কে যেন বলল কথাটা! কে যেন...।

বহু চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। কিন্তু আমার মন বলছিল, ওই কথাটা মনে পড়লেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব আমি।

রাতে বাড়ি ফিরতেই মিলি বলেছে আমার অফিস থেকে বর্ষা দাশগুপ্ত নামে একজন ফোন করেছিলেন। আমার মোবাইলে নাকি বহুবার চেষ্টা করেও লাইন পাননি।

অনেকসময় দেখেছি আকাশ মেঘলা থাকলে অথবা বৃষ্টি হলে মোবাইল ফোনের স্যাটেলাইট ঠিকমতো কাজ করে না। ফোনের ডিসপ্লেতে টাওয়ারের সিগনালটা কমজোরি হয়ে নেমে যায়। কাল হয়তো সেইজন্যেই বর্ষা লাইন পায়নি।

আজকের রাতটা খুব ঠান্ডা মাথায় আমাকে চিন্তা করতে হবে। অজস্র ভাঙা কাচ ছড়ানো পথে খুব সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে হবে। তারপর গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে।

তাই বর্ষাকে আর ফোন করিনি। অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে শুধু ভেবে চলেছি। অথচ তারই মধ্যে বর্ষার কথা মনে পড়ছিল।

এইভাবেই নানান কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকাডাকিতে।

উঠেই দেখি ঘড়ির কাঁটা নয়ের ঘর পেরিয়ে গেছে।

মা বলল, কী রে, আজ অফিসে বেরোবি না?

না, শরীরটা ভালো নেই।

শরীরের আর দোষ কী! দিন-রাত্তির টো-টো করলে কখনও শরীর ভালো থাকে!

কাল বৃষ্টিতে ভিজে আমার একটু ঠান্ডামতন লেগে গিয়েছে। একটা নাক রাত থেকে বন্ধ হয়ে আছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে।

মায়ের কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বিছানা ছেড়ে নামলাম। কলতলায় গিয়ে চোখেমুখে জল দিতে চোখ জ্বলতে লাগল।

ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে আসতেই মিলি খবরের কাগজ আর চা দিয়ে গেল। খবরের কাগজে দত্তগুপ্তকে নিয়ে এ কদিন আর কোনও খবর ছাপা হয়নি–আজও কোনও খবর নেই।

চায়ের পর সিগারেট ধরিয়ে আরও আধঘণ্টা সময় কাটালাম। বিছানার ওপরে খবরের কাগজটা ভোলা ছিল। সেখানে একটা বড় মাপের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ছিল। সিগারেটের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে ওরা দাবি করছে যে, ওদের সিগারেটের তামাকটা খুব হালকাও নয়, খুব কড়াও নয়– ঠিক যেমনটি আপনি চান।

কাল থেকে মনে-না-পড়া কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেল।

বর্ষাকে অফিসে ফোন করলাম।

ফোন ধরেই ও একলক্ষ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

ওর প্রশ্নের জোয়ারে ডুবে যেতে-যেতে আমি বললাম, শরীরটা ভালো নেই। আমি আজ অফিসে যাব না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। টেলিফোনে নয় সামনাসামনি কথা হওয়া দরকার। আজ সন্ধেবেলা ফ্রি আছ?

অফ কোর্স! সবকিছু জানার জন্যে ছটফট করছি।

সাড়ে ছটার সময়ে জগৎ সিনেমা হলের সামনে আসতে পারবে? আমি পাঁচ মিনিট আগে থেকেই তোমার জন্যে ওখানে ওয়েট করব। দেখা হলে সব বলব...।

ও.কে., রীতেনদা।

সি য়ু অ্যাট সিক্স থার্টি...।

ফোন শেষ করে ভাবতে বসলাম, বর্ষাকে কীভাবে সব বলব। সবকিছু কি ওকে বিশ্বাস করে বলা যায়? ওরও তো দত্তগুপ্তের সঙ্গে কোনও সমস্যা তৈরি হয়ে থাকতে পারে শর্মিলার মতন! তা হলে কতটুকু ওকে নিরাপদে বলা যায়?

এইসব উথালপাথাল ভাবনায় দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে শর্মিলার ফোন এল।

কৌতূহল বড় বিচিত্র জিনিস–বিশেষ করে মেয়েদের।

মিস্টার মিত্র, শর্মিলা বোস বলছি।

হ্যাঁ–বলুন।

কাল নানাভাইয়ের ওখানে কী হল?

রশিদ আপনাকে বলেনি?

কয়েক সেকেন্ড ও-প্রান্ত চুপচাপ। তারপর ঘনিষ্ঠ অভিমানী গলায়ঃ বলতে না চান বলবেন না–এরকমভাবে ইনসাল্ট করার কী আছে!

শর্মিলা কি আমাকে নিয়ে অন্যরকম কিছু ভাবতে শুরু করেছেন। জনির সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে মাত্র মাসছয়েক। এর মধ্যেই শেকল আলগা হয়ে পড়তে চাইছে! নাকি এটা ওঁর স্বভাব?

পরের দিকে শুধু লাস্ট লেভেলের কাজই করতাম। প্রথম-প্রথম অভাবের জন্যে...শেষ দিকে হয়তো স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল..কে জানে! শর্মিলার কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমার।

আমি বললাম, না, না, সেরকম কিছু নয়। ফোনে তো এত কথা বলা যায় না! সামনাসামনি দেখা হলে বলব।

এখনই আমার এখানে চলে আসুন না। বাড়িতে কেউ নেই–একা-একা ভীষণ বোর হচ্ছি। আপনার কথা শুনতে-শুনতে সময় কেটে যাবে…।

শর্মিলার স্বভাব দেখছি পিনাকী দত্তগুপ্তকে অমর করে রাখবে।

না, ম্যাডাম–এখন একটা কাজে ফেঁসে গেছি। পরে সময়মতো গিয়ে আপনাকে বলে আসব।

ঠিক আছে আমার বাড়িতে আসতে হবে না। আমরা অন্য কোথাও মিট করতে পারি…।

এক্ষুনি তো সেটা করা যাবে না। পরে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলে ঠিক করে নেব। ও হ্যাঁ, রশিদ আপনার কথামতো হেল্প করেছে। আর সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখুন, নানাভাইয়ের ওখানে গিয়ে খুব একটা কাজ হয়নি।

তার মানে!

তার মানে হল, এখনও আমি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে আছি।

ফোন অফ করে দিলাম।

গতকালের মেঘলাভাবটা আকাশে থেকেই গিয়েছিল। বিকেল পাঁচটা থেকে বৃষ্টি শুরু হল।

.

প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি আর বর্ষা শর্মিলা বোসের দরজায় কড়া নাড়লাম। বৃষ্টি তখনও থামেনি।

বর্ষার সঙ্গে সময়মতোই আমি দেখা করেছি। আমার সর্দির ভাবটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে কাশি। তাই ছাতা নিয়েই বেরিয়েছি।

ও সময়মতো হাজির হতেই ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ছাতা থাকলেও ওর চুড়িদার বেশ খানিকটা ভিজে গেছে। পোশাকের পায়ের কাছে কাদার ছিটে। তবে মুখটা টলটল করছে।

ওকে দেখামাত্রই বুকের ভেতরে উলটোপালটা ব্যাপার শুরু হল।

রাজাবাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা কথা বলছিলাম। প্রথমে খানিকটা অফিসের কথা হল। তারপর দত্তগুপ্ত, নানাভাই–এসব শুরু হল।

পথ চলতে-চলতে কথা বলা খুবই শক্ত ব্যাপার। তার ওপর রাস্তায় জল-কাদা, যানজট, আর মানুষের ভিড়। সায়েন্স কলেজ পেরিয়ে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় আমরা বসলাম।

আমার কাছ থেকে নানাভাইয়ের ব্যাপারটা সংক্ষেপে শোনার পর বর্ষা বেশ হতাশ হল। খানিকটা ভয়ও পেয়ে গেল ও। পুলিশ যদি আবার হ্যারাস করে! ওকে বললাম যে, নানা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন যে, পুলিশ আমাকে আর বিরক্ত করবে না। তবে ওর কথা নানাকে বলিনি। যদি নিতান্ত দরকার হয়, তা হলে বলতে হবে।

বর্ষা বলল, না, না বলার দরকার নেই। ওর মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ওকে বললাম, বর্ষা, তোমাকে এখন একজনের বাড়িতে নিয়ে যাব–যাবে?

চমকে উঠল বর্ষাঃ কার বাড়িতে!

শর্মিলা বোসের বাড়িতে। কাছেই গড়পাড়ে উনি থাকেন।

হঠাৎ ওঁর বাড়িতে কেন?

একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা লেগেছে। সেই ব্যাপারে একটু কথা বলতে যাব। তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হয়। তা ছাড়া তুমি তো ওঁকে কখনও দ্যাখোনি। ওঁর সঙ্গে আলাপও হয়ে যাবে।

আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে।

তোমার কোনও ভয় নেই–আমি তো সঙ্গে আছি!

মাঝারি বৃষ্টির মধ্যেই আমরা রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই প্যান্টের পকেটে আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

বোতাম টিপে কথা বললাম।

আমার এল.আই.সি.-র এজেন্ট। উনি জানতে চাইছেন, গতবছরে আমি যে বলেছিলাম এ-বছর একটা জীবন সুরক্ষা পলিসি করাব, সেটা করাব কি না।

চমৎকার প্রশ্ন, এবং চমৎকার সময়ে! জীবন সুরক্ষা যদি আমার দরকার না হয়, তা হলে আর কার দরকার হবে।

ওঁকে বললাম, নিশ্চয়ই করাব। উনি যেন নেক্সট উইকে আমার অফিসে আসেন।

মিনিটদশেকের মধ্যেই আমরা শর্মিলা বোসের দরজায় পৌঁছে গেলাম।

দরজা খুলে আমাকে দেখেই তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেনঃ এ কী! আপনি! তারপর চাপা গলায় বললেন, জনি বাড়িতে আছে।

আমি হাসলাম। তারপর একটু পাশে সরে দাঁড়াতেই শর্মিলা আমার পেছনে দাঁড়ানো বর্ষাকে দেখতে পেলেন। দরজার কাছটায় আলো তেমন জোরালো নয়। কিন্তু ওদের দুজনের মুখ আমি স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

না, ওরা একে অপরকে আগে কখনও দেখেনি।

আমি ভেজা ছাতাটা দরজায় পাশে রাখলাম। তারপর শর্মিলাকে একরকম পাশ কাটিয়েই ভেতরে ঢুকে গেলাম।

বর্ষাও দরজায় পাশে ছাতা রেখে বাধ্য মেয়ের মতো আমাকে অনুসরণ করল।

সামনের ঘরের দরজা খোলা ছিল। একটা মোড়া আর একটা এলোমেলোভাবে ভাঁজ করা খবরের কাগজ চোখে পড়ছিল।

ঘরে ঢোকার আগে আমি শর্মিলা আর বর্ষাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বললাম, ম্যাডাম, আপনার ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই। বর্ষা আমার অফিস কোলিগ। তা ছাড়া দত্তগুপ্তের কাছে ও পার্ট টাইম কাজ করত...ফার্স্ট লেভেলের। দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাট থেকে পুলিশ ওর ফোন নাম্বার পেয়েছে। হেসে বললাম, আমাদের তিনজনের একই প্রবলেম। সেই প্রবলেম সলভ করার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

দেখে মনে হল, শর্মিলা খানিকটা যেন ধাতস্থ হলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, জনি পাশের ঘরে টিভি দেখছে।

জনির ইংরেজি গানের কলি আমার কানে আসছিল। বোধহয় এম টি ভি এনজয় চালিয়ে টিভির গানটাই মুখস্থ করছে।

ঘরটাকে চট করে একটু গুছিয়ে নিয়ে শর্মিলা আমাদের বসতে বললেন। সামান্য দূরে নিজেও বসলেন। ওঁর পরনে ম্যাক্সি। চুলের গোছা কপালে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে। হালকা পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে।

কাল নানাভাইয়ের ওখানে কী হল, মিস্টার মিত্র?

আমি হাত তুলে ওঁকে ইশারা করলামঃ পরে বলছি। আগে আপনি বলুন, দত্তগুপ্ত কি চুরুট খেতেন?

শর্মিলার ভুরু কুঁচকে গেল।

কাছেই কোথাও টিনের চালের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে রিমঝিম শব্দ হচ্ছিল। বৃষ্টির কেমন একটা গন্ধও নাকে আসছিল।

মাঝে-মাঝে মিস্টার দত্তগুপ্তকে যেন চুরুট খেতে দেখেছি। থেমে-থেমে বললেন শর্মিলা।

আগেও এই কথাই আমাকে তিনি বলেছিলেন।

বর্ষা সঙ্গে-সঙ্গে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলাম। বর্ষা কী বলেছে আমার স্পষ্ট মনে আছে। দত্তগুপ্ত ক্লাসিক সিগারেট খেতেন।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, ম্যাডাম, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলছেন কেন? দত্তগুপ্ত চুরুট খেতেন না—ক্লাসিক সিগারেট খেতেন। দত্তগুপ্ত যখন মার্ডার হন তখন আমি ওঁর ফ্ল্যাটে চুরুটের গন্ধ পেয়েছিলাম। নানাভাইও চুরুট খান না।...তা হলে কে চুরুট খায়? নিশ্চয়ই আপনি নন?

আমার ঠাট্টায় শর্মিলা হাসবেন কি না ভাবছিলেন। ঠিক তখনই একটা গর্জন শোনা গেল।

আমি চুরুট খাই। সো হোয়াট—সো ব্লাডি হোয়াট?

টের পাইনি কখন দরজায় জনি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে সরু ধরনের একটা জ্বলন্ত চুরুট। পরনে গাঢ় ছাইরঙের বারমুডা আর সাদা পোলো নেক টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকের ওপরে লেখা : দিস সিটি রান্স অন লাভ।

জনি চোখ ছোট করে আমাকে দেখছিল। দৃষ্টিটা এমন যেন যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও কিছু করে বসতে পারে।

শর্মিলা ভয়ের চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বর্ষার মুখেও কখন যেন আশঙ্কার ছাপ পড়েছে।

আমি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। চুরুটের গন্ধটা শুঁকে দেখার জন্যে জনির দিকে এক পা এগোলাম।

ঠিক তখনই দেওয়ালে টাঙানো ফটোতে আমি হিকপিককে দেখতে পেলাম। জনির পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। এইজন্যেই হিকপিককে আমার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল।

জনির চুরুটের গন্ধ নাকে আসতেই সব অঙ্ক মিলে গেল।

সো ইট ওয়াজ য়ু। জনির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, মার্ডার ওয়েপনটা তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

উত্তরে জনি নোংরা খিস্তি করে উঠল। চুরুটটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার তলপেটে লাথি চালাল।

বর্ষা ভয়ের চিৎকার করে উঠল। শর্মিলা জনি! বলে ডেকে উঠলেন।

আমি পলকে শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়েছি বটে, তবে লাথিটা পুরোপুরি এড়াতে পারলাম না। ওটা আমার কোমরে এসে লাগল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম।

সামলে নিয়ে উঠে বসার আগেই জনি এগিয়ে এল আমার কাছে, কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বের করে বলল, নোবডি মেসেস অ্যারাউন্ড উইথ মাই ওয়াইফ। দত্তগুপ্ত আমার ওয়াইফকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। ওর হিসেব আমি চুকিয়ে দিয়েছি। এখন তুই আমার ওয়াইফকে লাফড়ায় জড়াতে চাইছিস!

জনি আমাকে দেওয়ালে ঠেসে ধরল। ওর ডানহাত আড়াআড়িভাবে চেপে বসল আমার গলায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, চোখের নজর ঝাপসা হয়ে এল। সেই ঝাপসা নজরেই আমি জনি আর হিকপিকের রঙিন ফটোটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমার ভেতরে একটা পাগল করা রাগ টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। কিন্তু জনি হিকপিক নয়। ওঁকে সামলাতে আমার মতো অন্তত দুজন লোক দরকার। এখন আর-একজন পাব কোথায়!

বর্ষা আর শর্মিলা জনির হাত ধরে টি-শার্ট ধরে যেমন-তেমনভাবে টানাটানি করছিল। ওকে ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। আর একইসঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল।

জনির কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ও আমার মুখের কাছে মুখ এনে তোড়ে গালাগাল দিচ্ছিল। ওর থুতুর কণা বৃষ্টির মতো আমার মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ঠিক তখনই আমার খড়কুটো-আঁকড়ে ধরতে-চাওয়া হাত মোবাইল ফোনটা খুঁজে পেল।

এক মুহূর্তও দেরি না করে আমি মোবাইল ফোনটা হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিলাম জনির বাঁকানের ওপরে।

গরম তেলে গোটা লঙ্কা ফেললে যেমন ফেটে যায় সেরকম একটা শব্দ হল। ফোনের খাটো অ্যানটেনাটা জনির কানের গর্তে ঢুকে গেল কি না কে জানে! তবে জনি হুড়মুড় করে খসে পড়ে গেল মেঝেতে। নিথড় হয়ে পড়ে রইল। ওর বাঁ কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল।

আমি মোবাইল ফোনটা আবার উঁচিয়ে ধরেছি দেখে শর্মিলা বুকফাটা চিৎকার করে ছুটে এসে আমাকে একেবারে জাপটে ধরলেন। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মোবাইল ফোনটা আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি শর্মিলাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে মেঝেতে বসে পড়লাম। ঘোলাটে চোখে বর্ষার দিকে তাকিয়ে হাঁফাতে লাগলাম। বর্ষা তখন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এর মধ্যেই আশপাশের দু-চারজন বাসিন্দা ঘরের দরজায় এসে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। আমি ইশারায় ওদের চলে যেতে বললাম। তাতে ওরা ইতস্তত করছে দেখে ধমকের গলায় বললাম, এসব ফ্যামিলি ম্যাটার। আপনারা চলে যান, প্লিজ।

এবার কাজ হল।

আমি গলায় হাত বোলাতে-বোলাতে উঠে দাঁড়ালাম। বর্ষা ছুটে এসে আমাকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম। অনেক ভুলে যাওয়া কবিতার লাইন পলকে মনে পড়ে গেল।

শর্মিলা তখন জনির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিলেন।

আমি বর্ষাকে বললাম, দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

ও দরজা ভেজিয়ে দিতেই শর্মিলাকে বললাম, ম্যাডাম, জনিকে এখন একটু ঘুমোতে দিন। সেই ফাঁকে আপনাকে দুটো কথা বলে নিই...।

শর্মিলা আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। আমার ডান হাতে ধরা অ্যানটেনা ভাঙা মোবাইল ফোনটার দিকে চোখ পড়তেই ওঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জনির কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেলেন।

জনি আগে নানাভাইয়ের দলে ছিল? ঠান্ডা গলায় জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ। ও-ই মিস্টার দত্তগুপ্তের কাছে মাসে-মাসে টাকা আনতে যেত। সেই থেকেই আমার সঙ্গে পরিচয়...তারপর ফ্রেন্ডশিপ...।

জনির রিভলবারটা এখন কোথায়?

ওটা জনির নয়– কাঁদতে কাঁদতে শর্মিলা বললেন, মিস্টার দত্তগুপ্তকে শায়েস্তা করার জন্যে রিভলভারটা ও হিকপিকের কাছ থেকে জোগাড় করেছিল। সেদিন ও আমার সঙ্গে পিনাকী দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল নেহাতই ওঁকে ভয় দেখাতে। শুরুতে কথাবার্তা বেশ ঠান্ডা মাথাতেই হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই মিস্টার দত্তগুপ্ত আমার নামে একটা নোংরা কথা বলায় জনি রাগে ফেটে পড়ে। ওঁকে লেফট অ্যান্ড রাইট মারধর করে বিছানায় কাত করে দেয়। তারপর আমি কিছু করে ওঠার আগেই আচমকা ওর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে গুলি করে দেয়।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকি। ওকে একরকম ধাক্কা দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিই। তারপর তাড়াহুড়ো করে দত্তগুপ্তের ঘর সার্চ করে আমার ফটোর খামটা খুঁজে বের করি। দত্তগুপ্তের লাইটার নিয়ে বাথরুমে চলে যাই–সেখানে খামটা পুড়িয়ে কমোডে ফেলে দিয়ে ফ্লাশ করে দিই। লাইটারটা শাড়ির আঁচলে মুছে দত্তগুপ্তের ঘরে সবে রেখেছি, তক্ষুনি ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি আপনি... কান্নার দমকে শর্মিলার গলা কেঁপে গেল, আপনাকে আমি চিনি না, ফ্ল্যাটে কেন এসেছেন তাও জানি না। কী বলব ভাবছি তখন আপনিই নিজে থেকে সব ইনফরমেশান জানিয়ে আমাকে হেল্প করলেন।

পিনাকী দত্তগুপ্ত খুব নোংরা লোক ছিল। বহু মেয়ের লাইফ ও শেষ করে দিয়েছে। অতগুলো লাইফের পাশে ওর একটা লাইফের কী দাম আছে, বলুন! জনি আমার জন্যে নানাভাইয়ের দল ছেড়ে দিয়েছিল। দল ছাড়তে চাইলে নানাভাই কাউকে আটকান না। শুধু কন্ডিশান হচ্ছে, সে যেন নানাভাইয়ের ডার্ক অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। তা হলে নানাভাই বা তার গ্যাঙের কেউ তার নামও কোনওদিন উচ্চারণ করবে না। কিন্তু কন্ডিশান ব্রেক করলেই সেই লোকটির গল্প শেষ। শর্মিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন? এবার তা হলে জনির গল্প শেষ...আমার গল্পও শেষ। বিশ্বাস করুন রীতেনবাবু, জনিকে আমি ভালোবাসি–ও-ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

আমার মুখে বোধহয় একটু অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে আমার পায়ের কাছে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন শর্মিলা। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বললেন, আপনার সঙ্গে যে ইনটিমেট কথাবার্তা বলেছি সেটা স্রেফ নিজেরা বাঁচার জন্যে। আমাদের এই নতুন সংসারকে বাঁচাতে আমি আরও পাঁচ-সাতজনের সঙ্গে শুতে রাজি আছি। কিন্তু আমি জনিকে ছেড়ে থাকতে পারব না...বিশ্বাস করুন...।

শর্মিলার পরের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গিয়ে আর বোঝা গেল না।

আমি একটু ইতস্তত করে ওঁকে ধরে তুললাম। অবাক চোখে দেখলাম ওঁর মুখের দিকে। ভালোবাসা, তোমার মধ্যে এমনকী আছে যে, বারবার তুমি জিতে যাও!

বর্ষার মুখের দিকে তাকালাম আমি। তারপর শর্মিলাকে বললাম, ম্যাডাম, পুলিশকে আমরা কিছু জানাব না–আপনাকে কথা দিলাম। পুলিশ যদি আমাকে হাজার প্রশ্ন করে তা হলেও ওদের আমি আপনার কথা বলব না। বলব না যে, আপনাকে আমি খুঁজে পেয়েছি।

শর্মিলা কাঁদতে কাঁদতে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন।

জনি ততক্ষণে সামান্য নড়তে শুরু করেছে।

আমি জনির দিকে ইশারা করে বললাম, ওকে একটু অ্যাটেন্ড করুন। পরে সব বুঝিয়ে বলবেন। আমরা এখন যাই...।

শর্মিল কৃতজ্ঞ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি আর বর্ষা ওঁর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

বর্ষাকে বাড়ি পৌঁছে দেব বলে একটা ট্রামে উঠলাম। একেবারে ফাঁকা ট্রাম। সামনের দিকের জোড়া সিটে পাশাপাশি বসলাম দুজনে।

বর্ষা আলতো সুরে জিগ্যেস করল, গলায় এখনও ব্যথা আছে?

আমি বললাম, না। যদিও গলাটা বেশ ব্যথা করছিল।

বর্ষা আড়ালে আমার হাত চেপে ধরল।

ট্রাম এন্টালি পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা একটিও কথা বলিনি। শুধু বর্ষার হাতটা আমার হাতের মধ্যে ধরা ছিল।

ওকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে আসার সময় জিগ্যেস করলাম, বর্ষা, আমি কি এখনও স্রেফ একজন অস্কার নমিনি?

বর্ষা উত্তরে শুধু হাসল। কিন্তু হাসিটা এমন যে আমার ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করল।

রইল না আর কেউ

রইল না আর কেউ

০১.

বৃষ্টির দু-চারটে ফোঁটা গায়ে পড়তেই শান্তনু চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু সামনের দুটো বাইক যেরকম আওয়াজ করে ছুটছিল তাতে শান্তনুর কথা কেউ শুনতে পেল বলে মনে হল না।

শান্তনু জোরে-জোরে কয়েকবার হর্ন দিল প্যাঁ–প্যাঁ–প্যাঁপ।

ওর বাইকের পিছনে বসা টুনটুনি চেঁচিয়ে বলল, হারা! জিকো! বাইক থামা–বৃষ্টি পড়ছে।

সামনের দুটো বাইক চালাচ্ছিল হারা আর জিকো। শান্তনুর হর্ন আর টুনটুনির মিহি গলা–দুটোই ওরা শুনতে পেল। তাই বাইকের গতি কমিয়ে পিছন ফিরে তাকাল দুজনে। দেখল টুনটুনি ছটফটে হাত নেড়ে বাইক থামাতে ইশারা করছে।

একটা বিরক্তির ভাব করে হারা বাইক নিয়ে গেল রাস্তার পাশে দাঁড় করাল। জিকোও বাইক সাইড করে হারার বাইকের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর শান্তনু নিজের ক্যারিজমা সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল ওদের পাশে।

তিনটে মোটরবাইকের পিছনে বসে থাকা তিনজন টনি, মউলি আর টুনটুনি–নেমে দাঁড়াল রাস্তায়। ওদের পিঠে ঝোলানো রুকস্যাক ভারে ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে।

আর তারপরই বৃষ্টি নিয়ে ওদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হল। এই বৃষ্টিতে বাইক চালিয়ে এগোনো ঠিক হবে, নাকি ওরা রাস্তার ধারে গাছের নীচে অপেক্ষা করবে–তারপর বৃষ্টি থামলে আবার বাইক নিয়ে রওনা হবে।

হারা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বৃষ্টির ধরনটা কীরকম সেটা বোঝার জন্য হাত পাতল। মউলি সঙ্গে-সঙ্গে একটা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন ওর হাতের চেটোয় দিয়ে ঠাট্টা করে বলল, এর বেশি পারব না–মাপ করো। তারপর বিরক্তভাবে বলল, :, কী না আমার বৃষ্টি তা আবার মাপতে বসেছে! সাধে কি বলে হারাধন!

হারা খেপে গিয়ে কয়েনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। তারপর বলল, মউলি, লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি–আমার নাম হারা, হারাধন নয়। শান্তনু আর টুনটুনি ওরকম হইচই করল বলে বাইক থামিয়েছি। নইলে এ আর কী বৃষ্টি! ব্যাঙের ইয়ে। শুধু আকাশটা কালো বলে...।

শান্তনু আকাশের দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে আকাশটা বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল।

আকাশে চাপ-চাপ ঘন কালো মেঘ। সেগুলো খুব ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে জোড়া লেগে যাচ্ছে। যেখানটায় জোড়া এখনও লাগেনি সেই সামান্য ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল ঘোলাটে আকাশ দেখা যাচ্ছে।

বৃষ্টি যে পড়ছে তার ফোঁটাগুলো মাপে বেশ বড় হলেও সংখ্যায় কম। তাই রাস্তায় ফোঁটাগুলোর দাগ চিতল হরিণের গায়ের মতো দেখাচ্ছে। এই বৃষ্টিতে বাইক চালানো যায় না এমন নয়। কিন্তু শান্তনু একটু সাবধানী–তাছাড়া বাইক চালায়ও একটু ধীরেসুস্থে। এ নিয়ে হারা আর জিকো মাঝেমধ্যেই ওকে ঠাট্টা করে।

ওরা ছজন তিনটে বাইক নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে–কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা গোছের অ্যাডভেঞ্চার। দরকারি জিনিসপত্র সব তিনটে রুকস্যাকে আর তিনটে বাইকের ডিকিতে ঠেসে নিয়ে ওরা ছজন মাঝে-মাঝেই এরকম বেরিয়ে পড়ে কখনও গরমের ছুটিতে, কখনও বা পুজোর ছুটিতে।

ওরা ছজন পাড়ায় তৈরি করেছে অভিযাত্রী ক্লাব। তার নামটা ভারী অদ্ভুত ও দেখব এবার জগৎটাকে। ওদের ক্লাবে আরও চার-পাঁচজন উৎসাহী ছেলেমেয়ে নাম লিখিয়েছে। সপ্তাহে একদিন করে ক্লাবে আসেন অভিজ্ঞ কোনও অভিযাত্রী। তিনি অভিযানের নানান বিষয় শেখান। আর রোজকার মাস্টারমশাই শিবেন্দ্র বিশ্বাস–শিবুদা। তিনি নাঘুন্টি, অন্নপূর্ণা, এরকম বেশ কয়েকটা অভিযানে গিয়েছিলেন। এখন শিবুদার বয়েস হয়েছে। কিন্তু পাড়ার এই ছেলেমেয়েগুলোকে অভিযানমুখী করে তোলার ব্যাপারে তার আগ্রহ কিছু কম নয়। এমনকী ক্লাবের নামটাও শিবুদারই দেওয়া।

শান্তনু আকাশ পরীক্ষা শেষ করে মুখ নামাল, গম্ভীর স্বরে বলল, হারা, মালি–কেস সুবিধের নয়। এ-বৃষ্টি বাড়বে।

শান্তনুর মতো টনিও আকাশ পরীক্ষা করছিল। ওর রোগা বেঁটেখাটো চেহারা, চোখে চশমা। কথাবার্তায় গম্ভীর ইনটেলেকচুয়াল ভাব। ও যে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী হবে সেটা গোটা কলকাতার সবাই জানে। কারণ, ওই সর্বত্র এটা প্রচার করে বেড়ায়।

ও নানান কায়দায় ঝুঁকে পড়ে, লম্বা হয়ে, একচোখ বুজে আকাশটা পরীক্ষা করছিল।

হারা ওকে আওয়াজ দিল, কী সায়েন্টিস্ট, কী বুঝছ?

টনি আকাশের দিক থেকে চোখ নামাল। ওর শৌখিন চশমার কাঁচে জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামছে।

ও সামান্য পা টেনে-টেনে হারাদের কাছে এগিয়ে এল। পিঠের রুকস্যাকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠিকঠাক করে নিল। হাইট কম হওয়ায় ওকে অনেকটা পিঠে-ব্যাগ স্কুলছাত্রের মতো লাগছিল।

কান খোল কর সুন লো, ভাইসব। মজার সুরে বলল টনি, প্রচণ্ড বৃষ্টি নামবে। ক্যাস অ্যান্ড ডগস। অ্যাট লিস্ট আমার তাই মনে হচ্ছে।

রিস্টওয়াচের দিকে চোখ রাখল হারা। সওয়া তিনটে।

একটা সাদা রঙের টাটা সুমো ঝড়ের বেগে ছুটে গেল রাস্তা দিয়ে। জলে ভেজা রাস্তায় চড়বড়-চড়বড় শব্দ হল।

ওরা ছজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগল।

কী করা যায় এখন?

তর্কের ঝড় চলল তিন মিনিট কি চার মিনিট। তারও হয়তো বেশি চলত যদি না বৃষ্টির তেজ আচমকা বেড়ে উঠত।

গাছের ঘন পাতা ভেদ কর জলের ফোঁটা এখন নীচে পড়ছে। ওরা ভিজতে শুরু করেছে।

শান্তনু হাতের তালু দিয়ে বৃষ্টির জল আড়াল করে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। নিজের কেঁকড়ানো চুলের বাহার নিয়ে ওর বেশ ম্যানিয়া আছে। তা নিয়ে টুনটুনি মাঝে-মাঝেই ওকে হেনস্থা করে। বলে, তুই চুলে কেয়োকার্পিন মাখ–তারপর বিনুনি করেনে।

শান্তনু মাথা নেড়ে বলল, না ভাই, আর পারা যাচ্ছে না–শেলটার খোঁজো কুইক।

জিকো বলল, এখানে কোথায় শেলটার পাবি? দুপাশে গাছপালা আর জঙ্গল...।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, মেঘ ডাকল গুড়ুম-গুড়ুম। বৃষ্টির তোড় আরও বেড়ে গেল।

টনি হারার হাত ধরে টান মারল : অনেক হয়েছে, বস্–এবার চলো–মাথা গোঁজার একটা আস্তানা খুঁজি…।

হারা আর শান্তনু বাইকে উঠে পড়ল। ওদের পিছনে উঠে বসল টনি আর টুনটুনি। বাইকে স্টার্ট দিল ওরা।

তাই দেখে জিকো বলে উঠল, শিট।

ওর মুখ বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছিল। হাত বুলিয়ে জল মুছে নিয়ে ও বাইকে চড়ে বসল। মউলিকে ডাকল, কাম অন, মউলি, আমরা এখন শেলটারে বেড়াতে যাচ্ছি।

মউলি আর দেরি করল না। প্রায় লাফিয়ে বাইকের পিছনে উঠে বসল। নিয়ম করে জিম এ যায় বলে ওর মধ্যে একটা অ্যাথলিট ভাব আছে।

তিনটে বাইক আবার চলতে শুরু করল–তবে রাস্তা ধরে নয়, গাছপালার আড়াল ভেদ করে।

হারা, জিকো, মউলিরা প্রথম-প্রথম ছোট-ছোট দূরত্বে অভিযান চালিয়েছে। যেমন, ভোরবেলা বেরিয়ে রাতে ফিরে আসা। তারপর ধীরে-ধীরে ওদের অভিজ্ঞতাও বেড়েছে, সেইসঙ্গে দূরত্বও বেড়েছে। ওরা পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ খুঁটিয়ে দেখে বইপত্র পড়ে এক-একটা নাম-না-শোনা জায়গা খুঁজে বের করে আর তারপর প্রবল উৎসাহে সেদিকে বাইক ছুটিয়ে দেয়। বাড়ির লোকেরা শুরুতে বিস্তর ঝামেলা করেছিল, কিন্তু ওদের জেদ আর উৎসাহের কাছে শেষ পর্যন্ত তারা হার মেনেছে। এবারে ওদের গন্তব্য ছিল পৎৰসায়র। কিন্তু পথে এই বিপত্তি।

ওদের সামনে বড়-বড় গাছ, ছোট-বড় ঝোঁপ আর এবড়োখেবড়ো পথ। এই তিনের মোকাবিলা করে ওদের বাইক চলছিল। আকাশ আঁধার–তাই হেডলাইট জ্বালতে হয়েছে। শান্তনু, জিকো আর হারা চোয়াল শক্ত করে বাইক চালাচ্ছে। বাইকগুলো থেকে-থেকেই লাফিয়ে উঠছে, আবার নীচে পড়ছে। টুনটুনি, মউলি আর টনি হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে। টনি তো বেশ ভয় পাচ্ছিল, ঝাঁকুনিতে বাইক থেকে না পড়ে যায়। বারবার হারাকে বলছিল, কেয়ারফুল, হারা…।

কিন্তু হারা কোনও জবাব দিচ্ছিল না।

ওরা কষ্ট করে এগোচ্ছিল বটে কিন্তু কোনও শেলটার চোখে পড়ছিল না। আকাশে বিদ্যুৎ, মেঘের ডাক আর বৃষ্টির তুমুল রাজ চলছিল। ওরা যেরকম ভিজে গিয়েছিল তাতে বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করে আর কোনও লাভ ছিল না।

হঠাৎই হারা দেখতে পেল বাড়িটা। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, শেলটার! শেলটার!

হারার বাইক সবার আগে ছিল। তাই বাড়িটা ও প্রথম দেখতে পেয়েছে।

গাঢ় কালো আকাশ আর গাছগাছালির পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃষ্টি-ঝাপসা একটা জীর্ণ মলিন দোতলা বাড়ি। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, সিমেন্ট-বালির কুৎসিত ঢিবি একটা। কিন্তু কুৎসিত ঢিবির অন্য একটা আকর্ষণ ছিল–যেটা হারাদের সবচেয়ে অবাক করেছে।

কালচে ছায়াময় বাড়িটায় আলো জ্বলছে। বৃষ্টি ভেদ করেও সে-আলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

হারার পরেই বাকি পাঁচজন বাড়িটা দেখতে পেল।

গাছপালা আর আগাছা শেষ হয়ে গেছে হঠাৎই। তারপর বিঘেখানেক ফাঁকা জায়গা। সেখানে স্রেফ ঘাস ছাড়া আর কোনও গাছের চিহ্নমাত্র নেই। মনে হতে পারে, কেউ যেন যন্ত্র নিয়ে ঘাসের চাষ করেছে। তবে এ কোনও শৌখিন ঘাস নয়—অতি সাধারণ ঘাস—মাঠে ঘাটে যে-ঘাস দেখা যায়।

বাড়িটা সেই ফাঁকা জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ঝাপসা বিমূর্ত ছবির মতো।

আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বিদ্যুতের সাদা উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠল। ফ্ল্যাশবা জ্বেলে বাড়িটার যেন ফটো তুলল কেউ।

টনি শান্তনুকে ডেকে বলল, শান, ব্যাপক লাক আমাদের—ওই যে শেলটার!

শান্তনু চেঁচিয়ে গানের সুরে বলে উঠল, আমরা করব জয়...।

বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মোটরবাইকের গর্জন সঙ্গত করছিল আগে থেকেই। এবার তার সঙ্গে জুড়ে গেল ওদের ছজনের হুল্লোড়। শেলটার খুঁজে পাওয়ার আনন্দে ওরা মেতে উঠল পলকে। ফাঁকা জমিতে ওদের বাইক গতি বাড়িয়ে দিল।

একটু পরেই ওরা এসে পড়ল বাড়ির দরজায়। চারপাশের ঘাসজমি জলে জলাকার। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক।

বাইকগুলো বাড়ির কাছ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে সবাই নেমে পড়ল বাইক থেকে। মুখ-চোখের জল মুছতে মুছতে এগিয়ে গেল বাড়ির দরজার কাছে।

মউলি প্রথম খেয়াল করল ব্যাপারটা।

বাড়ির সদর দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। আর সেখানে যত রাজ্যের ধুলো আর মাকড়সার জাল। বাড়ির ভেতর থেকে ছিটকে আসা আলোয় মাকড়সার জালের সুতোগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাড়িটায় বোধহয় কেউ থাকে না। ওই দেখ, স্পাইডার্স ওয়েব–। মউলি দরজার জোড়ের কাছটায় আঙুল দেখিয়ে বলল।

হারা কখন যেন একটা টর্চ বের করে নিয়েছিল। মউলির কথায় ও টনি আর শানকে ঠেলে সরিয়ে দরজার কাছে এল। টর্চের আলো ফেলল দরজার ওপরে।

ঠিকই বলেছে মউলি। বাড়িটায় কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে।

কী অদ্ভুত ব্যাপার!

বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠল আবার। কড়কড় করে বাজ পড়ল কোথাও। টুনটুনি ভয়ে আঁতকে উঠে শানের জামা চেপে ধরল।

হারা দরজার আশেপাশে তাকিয়ে কলিংবেলের বোতাম খুঁজল–পেল না। তখন দরজার কড়া নাড়ল জোরে। চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, কেউ আছেন?

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

এইবার হারার পাশে এসে দাঁড়াল জিকো। দরজার কড়া ধরে এমনভাবে নাড়া দিল যে, মনে হল এই বুঝি কড়াটা উপড়ে চলে আসবে ওর হাতে।

কড়ার প্রচণ্ড খটাখট শব্দের পর ওরা কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

টুনটুনি জিকোর পাশ থেকে চাপা গলায় বলল, মনে হল বাড়িতে কেউ নেই...।

সঙ্গে-সঙ্গে জিকো ধুত্তেরি বলে শক্ত হাতের এক ধাক্কায় দরজার পাল্লা দুটো ঠাস করে খুলে দিল। তারপর ওরা ছজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

মেঝেতে জমে থাকা ধুলোর ওপরে ওদের এলোমেলো ভেজা পায়ের ছাপ পড়তে লাগল। ওদের কৌতূহলী চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে লাগল।

নাঃ, কেউ নেই।

টনি কেমন যেন ভিতু গলায় বলে উঠল, এ তো আজব বাড়ি দেখছি!

ঠিক তখনই চোখ ঝলসানো সাদা আলো কালো আকাশ চিরে দিল। তারপরই কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল।

.

০২.

আশ্রয় তো পাওয়া গেল। কিন্তু এ কেমন আশ্রয়! ফাঁকা মাঠের মাঝে একটা জীর্ণ বাড়ি। বাড়িতে কেউ নেই অথচ দরজা-জানলা খোলা...কয়েকটা ঘরে, বারান্দায় আলো জ্বলছে!

ওরা ছজন এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। চোখের ভাষায় অনেক প্রশ্ন। কিন্তু ওদের পা এগিয়ে যাচ্ছিল।

সদর দরজার পর একটা অলিন্দ। অলিন্দের শেষ প্রান্তে হলদেটে বা জ্বলছে। ওরা ভেজা গায়ের জল ঝাড়তে ঝাড়তে একটা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। একপলক দেখেই বোঝা যায়, ঘরটা এককালে বসবার ঘর ছিল। তবে এখন তার ধূলিমলিন হতমান অবস্থা। একটা সঁতসেঁতে গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশে।

ঘরের দুটো জানলাই হাট করে খোলা। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। বৃষ্টি আর বাতাসের তোড়ে একটা জানলার পাল্লা খটাখট শব্দে পাগলের মতো বাড়ি খাচ্ছে

দেওয়ালে।

ব্যাপক বাড়ি মাইরি! মন্তব্য করল জিকো ও আলো-ফালো জ্বেলে বাড়ির লোকজন সব হাওয়া!

মউলি বলল, ধুলোর যা ক্যারেকটার দেখছি তাতে এ-বাড়ির লোকেরা অন্তত ছমাস আগে হাওয়া হয়েছে। এই শান, জানলা দুটো বন্ধ করে দে-জলের ছাট আসছে।

শান সঙ্গে সঙ্গে এগোল একটা খোলা জানলার দিকে। আর হারা অন্য জানলাটায় হাত লাগাল।

শান নীচু গলায় হারাকে বলল, বাড়িটা বোধহয় হন্টেড।

হারা ভূত-টুতে বিশ্বাস করে না। তাই তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করে বলল, ধুস!

ঘরে পুরোনো আমলের সব চেয়ার, টেবিল, আর একটা বেঢপ আলমারি। আলমারির দরজার ওপরের দিকের খানিকটা অংশ কাচের। সেই মলিন কাচের ভেতর দিয়ে ঠাসা কাগজপত্র আর বইয়ের গাদা চোখে পড়ছে। এ ছাড়া টেবিলেও বই আর কাগজপত্রের ডাঁই।

এসবের ওপরে চোখ বুলিয়ে টনি বলল, যারা থাকত তারা হেভি পড়ত। বোধহয় সায়েন্টিস্ট ফায়েন্টিস্ট হবে...।

হ্যাঁ, তোমারই মতন– হেসে বলল হারা।

জিকো চেঁচিয়ে উঠল, ও. কে., গাইড। এসব বাজে কথা পরে হবে–আগে কাজের কথা শোনো।

বাকি পাঁচজন নিজেদের গুঞ্জন থামিয়ে জিকোর দিকে তাকাল।

জিকো বলল, বাইরে বৃষ্টির যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আজকের রাতটা আমাদের এখানেই থাকতে হবে–এই শেলটারে।

টুনটুনি একটু ভিতু গলায় বলল, এখানে রাতে থাকতে হবে? এই ভূতুড়ে বাড়িতে? এখন তো সবে চারটে বাজে। বৃষ্টি থেমে গেলে..মানে, আকাশ ক্লিয়ার হয়ে গেলে…।

এক ধমকে ওকে থামিয়ে দিল জিকো।

তুই একটা ক্যাবলা, টুনি। ধর পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটায় বৃষ্টি ধরে গেল। তারপর বাইক নিয়ে বেরিয়ে আমরা কোথায় যাব? একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। তখন সেই আবার শেলটার খুঁজতে হবে। আমাদের রুটম্যাপ কী বলছে, শান?

ওরা অ্যাডভেঞ্চারে বেরোলে রুট-ম্যাপ স্টাডি করার দায়িত্ব শান্তনুর। ও কবিতা লেখে, দু-একটা কবিতা ছোট কাগজে ছাপাও হয়েছে। তারপর থেকে ও কবি কবি ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু কবি হলে কী হবে, রুট-ম্যাপ স্টাডির ব্যাপারে ও নাম্বার ওয়ান।

ও চটপট বলে উঠল, আমি অলরেডি ক্যালকুলেশান করেছি। জিকো ঠিকই বলছে, টুনি। আজ আমাদের এখানেই থেকে যেতে হবে। ভয় পাচ্ছিস কেন? জাস্ট একটা তো রাত!

শানের কথায় টুনি বোধহয় কিছুটা ভরসা পেল। ও কাঁচুমাচু হয়ে ওপর-নীচে মাথা নাড়ল।

জিকো বলল, আর কোনও কথা নয়। আমাদের ফার্স্ট কাজ হল বাইকের ডিকি থেকে মালপত্রগুলো নিয়ে আসা। হারা, শান–চল–চটপট কাজ সেরে নিই। এর মধ্যেই আমার আবার খিদে পাচ্ছে।

হারা আর শান জিকোর সঙ্গে দরজার দিকে এগোল। যেতে-যেতে হারা বলল, জিকো, তোর দেখছি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খিদে পায়–এটা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি...।

জিকো হারার চুল ধরে টেনে দিল : তুমিও কম কীসের, বস্–?

শান টুনিদের দিকে ফিরে বলল, তোরা এবার রুকস্যাকগুলো পিঠ থেকে নামা। এই ঘরেই সব গুছিয়ে রাখ–আমরা এক্ষুনি আসছি।

ওরা বেরিয়ে যেতেই টুনটুনি, মউলি আর টনি ঘরের এক কোণে গিয়ে ভেজা রুকস্যাক মেঝেতে নামাল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে রুকস্যাক খুলে জিনিসপত্র বের করে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

হারা, শান আর জিকো একটু পরেই ফিরে এল। হাতে মালপত্র, গা থেকে জল ঝরছে। বৃষ্টির তেজ এখনও কমেনি।

ওরা জিনিসগুলো টনিদের সামনে নামিয়ে রাখল। জিকো বলল, তোরা এগুলো গুছিয়ে রাখ, আমরা ততক্ষণে বাড়িটা একবার ইন্সপেক্ট করে আসি। দেখে আসি বাড়ির ভূতুড়ে মালিক কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কি না। অচেনা লোকের বাড়িতে এভাবে আমরা হুট করে ঢুকে পড়লাম...পারমিশান না নিয়ে...।

শান বলল, থাক, থাক, ঢের হয়েছে–এবার চল, অ্যাডভেঞ্চারে বেরোই...।

ওরা তিনজন বাড়িটা ঘুরে দেখতে বেরোল।

পিছন থেকে মউলি আওয়াজ দিল, দেখিস, অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে আবার হারিয়ে যান না!

শান হেসে বলল, আমি হারিয়ে গেলে টুনি আমাকে খুঁজে বের করবে।

এ-কথায় হেসে উঠল সবাই। শান মউলিদের হাত নেড়ে টা-টা করে অলিন্দে বেড়িয়ে পড়ল।

ভেজা পোশাক ছাড়তে মউলি আর টুনটুনি শুকনো জামাকাপড় নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। টনিও নিজের পাজামা আর টি-শার্ট বের করে ভেজা পোশাক পালটাতে লাগল।

গোয়েন্দা পুলিশের মতো বাড়িটায় তন্নতন্ন করে চিরুনি তল্লাশি চালাল শান্তনুরা।

নাঃ, বাড়িতে সত্যিই কেউ নেই। তবে একসময় যে কেউ থাকত তার বেশ কিছু চিহ্ন পাওয়া গেল। ধুলোমাখা জামাকাপড়, চটি, চুতো, রান্নার বাসনপত্র, আরও কিছু টুকিটাকি ছড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির এখানে-সেখানে।

বাড়িটায় মোট পাঁচটা ঘর—একতলায় তিনটে, আর দোতলায় দুটো। এ ছাড়া একতলায় রান্নাঘর আর বাথরুম, দোতলায় শুধু একচিলতে বাথরুম। দোতলায় ঘর দুটোর সামনে বেশ খানিকটা খোলা ছাদ। ছাদে ছোট-ছোট টবে অনেক গাছ।

প্রথমে একতলাটা ঘুরে দেখল ওরা।

দ্বিতীয় ঘরটা প্রথম ঘরটার মতো। কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। ঘরটা মাপে ছোট কিন্তু অগোছালো। ঘরে এলোমেলোভাবে ছড়ানো জিনিসপত্র দেখে বোঝা যায় ঘরটা কাজ-চালানো গোছের ল্যাবরেটরি। ঘরের আসবাব বলতে একটা প্রকাণ্ড মাপের কাঠের টেবিল। তার ওপরে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা টেস্টটিউব, কাচের বোতল, বকযন্ত্র, স্ট্যান্ড, হিটার, আরও সব টুকিটাকি। একটা র‍্যাকে বেশ কয়েকটা কেমিক্যালের বোতল আর ছোট-ছোট মাটির টব। টবে কয়েকটা গাছ। গাছগুলো শুকিয়ে গেছে।

শান, জিকো আর হারা অনেকক্ষণ ধরে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর শান বলল, টনি ঠিকই গেস করেছে। লোকটা সায়েন্টিস্ট ছিল।

কীসের সায়েন্টিস্ট? গাছপালার? হারা জিগ্যেস করল।

জিকো হারার মাথায় একটা চাটি মেরে বলল, গাছপালার সায়েন্টিস্ট কী রে! বল বোটানিস্ট।

ওই হল– হারা মন্তব্য করল।

ল্যাবরেটরিটা অযত্ন আর অবহেলার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ঘরে ছোট-ছোট দুটো জানলা। জানলা দিয়ে মেঘলা আলো এসে পড়েছে। ঘরের সিলিং-এ, র‍্যাকে, সর্বত্র ঝুল আর মাকড়সার জাল।

এরপর ওরা গেল দোতলায়।

সেখানেও ওই সর্বনাশা হাল।

বাড়িটা শুধু যে পুরোনো তা নয়। তৈরিও হয়েছে যেমন-তেমন করে, বদখত ভাবে। দেখে মনে হয়, রাজমিস্ত্রিদের মারাত্মক তাড়াহুড়ো ছিল। তাছাড়া প্ল্যানেরও কোনও মাথামুণ্ডু নেই। জানলাগুলো বেঢপ ছাঁদের। সিঁড়ির ধাপগুলো এক-একটা এক-এক মাপের। ওঠা-নামা করতে কষ্ট হয়।

বাড়ির আনাচে-কানাচে বাদুড় আরশোলা আর চামচিকে বাসা বেঁধেছে। সেইসঙ্গে ঝুল-কালি তো আছেই। দেওয়ালের বেশিরভাগ জায়গায় প্লাস্টার নেই। সিঁড়ির রেলিং কোথাও আছে কোথাও নেই।

বাড়িটায় দোতলায় ছাদে অসংখ্য মাটির টব। জলে-বাতাসে টবগুলোয় শ্যাওলা ধরে গেছে। কোনও-কোনও গাছ অযত্নে মরে গেছে। তবে বেশিরভাগই এখনও তাজা সবুজ।

টবের একটা গাছও ওরা চিনতে পারল না। তবে এটুকু খেয়াল করল যে, গাছগুলো অদ্ভুত ধরনের। উচ্চতায় বেঁটে-খাটো–অনেকটা বনসাইয়ের মতো। আর পাতাগুলো কারও

সরু-সরু, আবার কারও-বা চওড়া।

বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে পাতাগুলো নড়ছিল। হঠাৎ করে মনে হচ্ছিল, পাতাগুলো বুঝি সাধারণ উদ্ভিদ নয়, প্রাণীর মতো জীবন্ত।

শান্তনু বলল, টুনি হলে দু-চারটে গাছ চিনতে পারত। ওর তো বাগান করার ম্যানিয়া আছে।

জিকো মন্তব্য করল, কিছু মাইন্ড করসি না, শান, বড়লোকের মেয়েদের ওরকম অনেক ম্যানিয়া থাকে।

শান কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইল।

এর কারণটা হারা জানে। শান আর টুনির বন্ধুত্বটা বড্ড বেশি ক্লোজ। তা ছাড়া জিকো টুনিকে যে দারুণ পছন্দ করে এমন নয়।

প্রসঙ্গ পালটাতে হারা বলল, শোন, টুনি আর মউলিকে দোতলায় একটা ঘর ছেড়ে দে—।

শান বলল, তা হলে পাশের ঘরটায় আমি আর টনি থাকব।

হারা ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ও. কে.। আমি আর জিকো তা হলে একতলার পেছনের ঘটায় আস্তানা গাড়ছি..।

জিকো ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকাল : ও. কে. উইথ মি।

তদন্ত আর তল্লাশি সেরে ওরা তিনজন নীচে নেমে এল। ততক্ষণে প্রথম ঘরটাকে টনি, মউলি আর টুনি সাফসুতরো করে দিব্যি গুছিয়ে ফেলেছে। মউলির কানে ওয়াকম্যানের হেডফোন, কোমরে ছোট্ট বিদেশি ওয়াকম্যান। ও গানের তালে-তালে শরীর দুলিয়ে নাচছে আর সুর মিলিয়ে গাইছে? কল হো না হো…।

ঘরে ঢুকেই হারা চেঁচিয়ে বলল, শোনো সবাই। গুড নিউজ। বাড়িটার মালিক আমরা। বাড়িতে আর কেউ নেই।

শান টনিকে বলল, তুই ঠিক ধরেছিস। এ-বাড়ির মালিক সায়েন্টিস্ট ছিল। একতলায় লাস্টের

ঘরটা ওর ল্যাবরেটরি ছিল। মনে হচ্ছে, লোকটা গাছপালা নিয়ে রিসার্চ করত।

টনি গম্ভীরভাবে বলল, হু। ল্যাবটা আমাকে একবার দেখতে হবে।

টুনটুনি মজা করে মন্তব্য করল, সে আর বলতে! মিনি সায়েন্টিস্ট বলে কথা!

টনি একবার টুনির দিকে তাকাল শুধু–কোনও কথা বলল না।

হারা, শান আর জিকো রুকস্যাক খুলে যার-যার শুকনো পোশাক বের করে নিল। বাকিদের দাঁড়া, ড্রেস চেঞ্জ করে আসছি বলে চলে গেল।

একটু পরে ওরা ফিরে এল।

জিকো জোরে জোরে হাততালি দিয়ে বলল, লি এভরিবডি। ব্যাক টু বিজনেস। নাচা গানা পরে হবে। অ্যাই, মউলি!

মউলি তখনও নাচ-গানে মশগুল ছিল। তাই ওকে আলতো করে ঠেলা মারল জিকো? আগে শোন, পরে নাচবি–।

মউলি থামল। কান থেকে হেড-ফোন খুলে নিয়ে হাত দিয়ে মাথার ভিজে চুল ঝাড়ল। ওর বয়কাট চুল বৃষ্টিতে ভিজে খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে।

বল, কী বলবি– জিকোর দিকে তাকিয়ে বলল ও।

জিকো বলল, আমরা ঠিকই গেস করেছি। দেয়ারস্ নোবডি ইন দ্য হাউস। তবে ইনভেস্টিগেট করে মনে হল, মাত্র একজনই থাকত এ-বাড়িতে...হোয়াট ডু ইউ সে, হারা?

হারা ঠোঁট কামড়াল। এক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, আমার তো সেটাই মনে হল। জামা, প্যান্ট, জুতো–যা-যা পেয়েছি সেগুলোর সাইজ চেক করে দেখি সব এক মাপের। একটাই লোক থাকত এখানে...।

হ্যাঁ জিকো সায় দিল : গ্রোন-আপ ম্যান। তবে সে সবকিছু ফেলে রেখে পালাল কেন সেটাই বুঝতে পারছি না...।

শান গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, হয়তো কোনও কিছু দেখে...ইয়ে...মানে, ভয়ে পালিয়েছে...।

মউলি জিগ্যেস করল, গোস্ট-টোস্ট কিছু? অর সামথিং লাইক দ্যাট...।

টুনটুনি আমতা-আমতা করে বলল, পালিয়েছে, নাকি মারা গেছে?

চোখের চশমাটা একটু টাইট করে বসিয়ে টনি বলল, মারা গেলে বডিটা গেল কোথায়? ওটা তো আর হেঁটে বা দৌড়ে পালাতে পারে না!

জিকো হাত নেড়ে বলল, সে যাই হোক, যে এখানে থাকত সে এখান থেকে চলে গেছে... পর রিজৎস আনোন...।

টনি মেঝেতে বসেছিল। হঠাৎই হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে জিকোর কাছে এল।

ছোটবেলায় সাইকেল-ভ্যানের ধাক্কায় টনি চোট পেয়েছিল। তারপর থেকে ও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। ওর পা-টা পুরোপুরি সারেনি।

টনি বলল, জিকো, ডিডাকটিভ লজিক দিয়ে আরও একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে। লোকটা চলে গেছে রাতের বেলায় কারণ, কয়েকটা ঘরে আলো জ্বেলে রেখে গেছে। সে ভেবেছিল তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তাই দরজা খোলা রেখে গিয়েছিল কিন্তু আর ফেরেনি...।

কিংবা ফিরতে পারেনি। টনির কথার পিঠে মন্তব্যটা জুড়ে দিল শান।

ফিরতে পারেনি কেন? হারা প্রশ্ন করল।

সেটাই তো মিস্ট্রি– ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল জিকো, হয়তো বাইরের জঙ্গল থেকে কোনও অ্যানিম্যাল এসে তাকে অ্যাটাক করেছে..।

এই জঙ্গলে আবার কী অ্যানিম্যাল থাকবে? মউলি প্রশ্ন তুলল ও এখানে নিশ্চয়ই বাঘ টাগ নেই...।

বাঘ না থাকুক, হায়েনা থাকতে পারে। একটু ভেবে জিকো আবার বলল, কিংবা ধরো নেকড়ে। এনিওয়ে, পসিলি কোনও অ্যানিম্যাল লোকটাকে অ্যাটাক করে মেরে ফেলেছে। তারপর...।

শান্তনু জিকোকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওসব ছাড়। মোদ্দা কথা, লোকটা উধাও হয়ে ভালোই হয়েছে। বাড়িটায় আমরা শেলটার পেয়েছি। ও থাকলে হয়তো আমাদের গ্রুপটাকে ঢুকতেই দিত না। শুধু চেক করে দেখ বাড়িটা হন্টেড কিনা।

শানের মুখের সামনে বুড়ো আঙুল নেড়ে ঠাট্টা করে মউলি বলল, এখন আর কোনও চয়েস নেই, শান। এটা আমাদের ওনলি শেলটার।

শান মউলির দিকে কটমটিয়ে তাকাল।

জিকো থুতনিতে হাত বুলিয়ে বলল, একটা কথা মনে হচ্ছে। এ-বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই পিকিউলিয়ার টাইপের। এইরকম ফাঁকা একটা জায়গায় বাড়ি করেছে। সেখানে ব্যাপক খরচ করে পোল বসিয়ে ইলেকট্রিক কানেকশান নিয়েছে। ডিপ টিউবওয়েল আর পাম্প বসিয়েছে...কারণ, আমি দেখেছি, ছাদে জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে–বাথরুমে কল দিয়ে ফাইন জল পড়ছে...।

এ থেকে কী প্রমাণ হয়? জিকোর কথার মাঝে টনি প্রশ্ন তুলল।

প্রমাণ হয় এটাই যে, এত ট্রাবল আর পয়সা খরচ করে যখন কেউ একটা থাকার জায়গা তৈরি করে তখন তার একটা মেগা পারপাস থাকবে। সো, সেই মানুষটা নিজের ইচ্ছেয় ভ্যানিশ হবে না।

সে তো নেকড়ের ইচ্ছেয় ভ্যানিশ হয়েছে। মউলি ফুট কাটল।

এই মন্তব্যে হারা, টুনি আর শান হেসে উঠল।

জিকো খেপে গিয়ে হাত নেড়ে বলল, হাসি নয়, ব্যাপারটা সিরিয়াস। গেস করার চেষ্টা করো হোয়াট ইজ দ্যাট মেগা পারপাস...।

টনি হাত নেড়ে জিকোকে বাধা দিল ও ফরগেট অ্যাবাউট পারপাস। লোকটা সায়েন্টিস্ট ছিল। হয়তো খানিকটা পাগল ছিল, কিংবা হয়তো এখানে একটা টুরিস্ট স্পট ডেভেলাপ করতে এসেছিল...সো হোয়াট? টু হেল উইথ হিজ ব্লাডি পারপাস। আমরা এখানে থাকছি–তো হইচই করে থাকব, হুল্লোড় করে কাটাব। মোট কথা, এখন এই বাড়িটা আমাদের–ও. কে.?

অফ কোর্স! বলে মউলি এগিয়ে এসে টনির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

জিকো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে। রাতে আমরা কে কোন ঘরে থাকব শুনে নাও। তারপর কিছু একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করো..আমার পেটে আগুন জ্বলছে।

ওরা আলোচনা শুরু করল। মউলি আর টুনি প্যাকেট খুলে প্রত্যেকের হাতে একটা করে কেক ধরিয়ে দিল। টনি তিন বোতল জল বের করে সবার সামনে রাখল। শান্তনু গান ধরল ও শ্রাবণ তুমি বাজনা বাজাও পাগলাঝোরা হয়ে...।

বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল, শব্দের তেজ আগের চেয়ে কমে এসেছে।

.

০৩.

দোতলায় টনি আর শানের ঘরের দরজায় পাগলের মতো ধাক্কা দিচ্ছিল হারা। আর একইসঙ্গে ওদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছিল ও শান! টনি! শিগগির ওঠ! শান! এই শান! টনি।

হারার ধাক্কায় পুরোনো দরজাটা এমনভাবে থরথর করে কাঁপছিল যেন এক্ষুনি ভেঙে পড়বে।

হারার মুখ-চোখ ভয়ে পালটে গেছে। মনে হচ্ছে, ওকে কোনও প্রেতাত্মা তাড়া করেছে, আর ও প্রাণের ভয়ে আতঙ্কে ছুটে এসেছে টনিদের দরজায়।

আরও কয়েকটা জবর ধাক্কার পর দরজা খুলে দিল টনি। চোখে চশমা নেই। মাথার চুল এলোমেলো। কপালে বিরক্তির ভাঁজ।

চোখ ডলতে ডলতে টনি জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? এই মাঝরাতে চিল্লিয়ে কঁচা ঘুম চটকালি কেন?

হারা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জিকো নেই।

নেই মানে?

নেই মানে নেই–ওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

দরজার ধাক্কায় ঘুম না ভাঙলেও ওদের কথাবার্তার সঙ্গে শান্তনুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও এসে দাঁড়াল টনির পিছনে। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে পাজামা।

করিডরের বাবের আলোয় হারাকে বেশ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। ও এমনিতে মোটেই ভিতু নয় কিন্তু এখন যে-কোনও কারণে হোক ভয় পেয়েছে।

শান জিগ্যেস করল, কটা বাজে?

সাড়ে চারটে মতন– হারা বলল, এখন কী হবে?

টনি ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। একটু পরেই চশমা চোখে দিয়ে ফিরে এল। তারপর শান্তনু আর টনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ওদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

মউলিদের ডাকব! টনি শান্তনুর কাছে জানতে চাইল।

শান্তনু হাত নেড়ে বলল, একদম না। ওরা এসব শুনলে ভয়ে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবে।

অবশ্য মউলি শক্ত ধাতের মেয়ে। ও হয়তো সিনক্রিয়েট করবে না। কিন্তু টুনটুনিকে ভরসা নেই। ভাবল টনি।

শান হারার হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করল, কেসটা এজ্যাকুলি কী হয়েছে খুলে বল দেখি।

হারা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে শুরু করল।

রাত তখন কটা হবে কে জানে! হঠাৎই একটা শব্দে হারার ঘুম ভেঙে যায়। বৃষ্টি ধরে গিয়েছিল বলে হারা আর জিকো একটা জানলা খুলে শুয়েছিল। হারার মনে হয়, জানলা দিয়েই শব্দটা আসছে। তাই ও বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারে।

আকাশে চাঁদ ছিল না। তার ওপর আকাশ ছিল ঘোলাটে, আর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই বাইরে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি হারা। শুধু দূরের জঙ্গলটাকে ঘোর কালো ছায়ার মতো দেখিয়েছে। তবে শব্দটা আলতোভাবে হলেও শোনা যাচ্ছিল।

কীরকম টাইপের শব্দ? টনি জিগ্যেস করল।

কীরকম শব্দ? হারাকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। কিছুক্ষণ ভেবে ও আমতা-আমতা করে বলল, ভেজা মাটিতে চাবুক মারার মতন–তারপর পা ঘষে ঘষে যাওয়ার মতো আওয়াজ…।

হারার উত্তর শুনে এই বিপদেও হেসে ফেলল শান আর টনি।

শান বলল, ভেজা মাটিতে চাবুক মারার শব্দ মানে…।

না, মানে, ভেজা ঘাসের ওপরে সরু কিছু বারবার আছড়ে পড়লে যেমন শোনায়..ওইরকম টাইপের…।

টনি বলল, চল, নীচে চল।

ওরা বেখাপ্পা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

শান বলল, তারপর কী হল বল…।

হারা হাত নেড়ে বলতে শুরু করল? .তারপর তো আমি শুয়ে পড়েছি। ঘুমে চোখ টেনে গেছে। আর কিছু টের পাইনি। অনেক পরে...কতক্ষণ অবশ্য জানি না...ঠান্ডায় ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই টের পেলাম বেশ শীত শীত করছে। কোথা থেকে যেন ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে।

উঠে দেখি জিকো পাশে নেই... আর ঘরের দরজা খোলা। ব্যস, চোখের পলকে ঘুম উধাও। তখনই লক্ষ করলাম, দরজা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে।

লাফিয়ে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেখি সদর দরজাটাও ভোলা। ছুটে গেলাম সেদিকে। ভাবলাম, জিকো বোধহয় কোনও কারণে বাইরে বেরিয়েছে। কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর চালিয়ে ওকে কোথাও দেখতে পেলাম না। তা ছাড়া ওই অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখার উপায় আছে! তো তখন আমি ওর নাম ধরে দু-চারবার ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই। তারপরই আগের সেই পিকিউলিয়ার শব্দটা শুনতে পেলাম। ভাবলাম, সাপ-টাপ হতে পারে। তাই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তোদের ডাকতে গেছি...।

হারার কথা শুনতে-শুনতে ওরা নীচে নেমে এসেছিল। তারপর বারান্দার আলো জ্বেলে সোজা চলে গিয়েছিল সদর দরজার কাছে।

শান দরজাটা হাট করে খুলে দিল। বৃষ্টিভেজা বাতাস ছুটে এল ওদের দিকে।

বাইরেটা ঘোর অন্ধকার। এ সময়ে আকাশে যে সামান্য আলোর আভা থাকার কথা সেটা শুষে নিয়েছে জমাট কালো মেঘ। বাতাসে চঞ্চল দুরের গাছপালার শব্দ হালকাভাবে ভেসে আসছে। আর তাকে ছাপিয়ে ব্যাঙের ডাক।

শান বেশ কয়েকবার জিকো! জিকো। বলে ডাকল।

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

ও তখন বলল, হারা, কুইক ছুট্টে একটা টর্চ নিয়ে আয়।

হারা ছুটল।

শান দরজার চৌকাঠ ছেড়ে নীচে নামতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে টনি ওর পাজামা টেনে ধরল : না, বাইরে যাবি না!

শান ফিরে তাকাল টনির দিকে। আগামী দিনের বিজ্ঞানীর চোখে ভয়।

টনি বলল, দিনের আলো ফুটুক তারপর যা খোঁজ করবার করবি। এখন বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

শান দরজার বাইরে ভেজা ঘাস-জমির দিকে তাকাল। কল্পনায় যেন দেখতে পেল, সেই জল থইথই জমিতে অসংখ্য বিষধর সাপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

হারা টর্চ নিয়ে এল। শান টর্চটা নিয়ে তার আলো ছুঁড়ে দিল বাইরের অন্ধকারে।

বৃষ্টির জলে ভিজে নেয়ে একসা ঘাসের দল যেন ঘুম ভেঙে তাকাল ওদের দিকে। জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির জল জমে পুঁচকে পুকুর। আর চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের কোরাস।

নেই। জিকো কোথাও নেই।

দরজা বন্ধ করে হারার ঘরে ফিরে এল ওরা তিনজন। ওদের মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায়। অ্যাডভেঞ্চার করার খুশি-খুশি মেজাজটার বিশ্রীভাবে তাল কেটে গেছে।

মেঝেতে ধপ করে বসে পড়ল টনি। হাতের কাছে রাখা প্লাস্টিকের বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে বলল, হারা, দিস ইজ টু মাচ। জিকোর মতো একটা হাট্টাকাট্টা ইয়াং ছেলে কখনও স্রেফ হাওয়ায় ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে?

ওর পাশে বসে পড়ে শান বলল, আকাশে আলো ফুটলেই আগে চেক করতে হবে ওর বাইকটা আছে কি না।

হারা বসল শানের পাশে। অবাক হয়ে জানতে চাইল, মাঝরাত্তিরে ও বাইক নিয়ে কোথায় যাবে?

সত্যিই তো! অজানা-অচেনা জায়গায় মাঝরাত্তিরে বাইক নিয়ে দোকানপাটের খোঁজে বেরোনোটা শুধু যে অবাস্তব তা-ই নয় হাস্যকরও।

ওরা মনের ভেতরে হাতড়াতে লাগল পাগলের মতো। জিকোর মুখটা ওদের চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

লম্বা-লম্বা চুল। দারুণ চেহারা। ডানপিটে। আর হিন্দি ছবির পোকা ছিল জিকো। গানের তালে-তালে শরীর ঝাঁকিয়ে নাচতে পারত। কোনও একটা ব্যান্ডের সঙ্গে ড্রিল বাজাত। ওর হিরো হওয়ার শখ ছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই শানের হঠাৎ মনে হল, জিকো সম্পর্কে সবকিছুই ও কেমন যেন পাস্ট টেন্স-এ ভাবছে ছিল, পারত, বাজাত।

শানের বুকের ভেতরটা হঠাৎই কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কান্না পেয়ে গেল ওর। মনে পড়ল, গত সপ্তাহে ও যখন নতুন লেখা একটা কবিতা বন্ধুদের পড়ে শোনাচ্ছিল তখন জিকো আচমকা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোকে একটা কথা দিতে হবে, শান।

কী কথা?

তুই আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখবি।

উঁহু সম্ভব নয়। গম্ভীরভাবে বলেছিল শান্তনু।

কেন?

কেন জানো না? হেসে প্রশ্ন করেছিল, কাউকে নিয়ে কবি কবিতা লেখে সে মারা যাওয়ার পর। তুমি তো এখনও বিন্দাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

আর সবাই হেসে উঠেছিল এ-কথায়।

একটু পরে জিকো শানের বুকে একটা ঠোকা দিয়ে বলেছিল, তা হলে মরে গেলে লিখবি তো? কথা দে।

আগে মরো, ইয়ার–তারপর দ্যাখো কী ফাটাফাটি কবিতা লিখি...।

সবাই হেসে উঠেছিল আবার।

সেই কথাগুলো শান্তনুর মনে পড়ছিল। জিকো যেন ওর কানের পাশে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলছে, কী রে শান, এবার কবিতা লেখ। তুই তো কথা দিয়েছিলি, বস্।

শান্তনু হঠাৎই কেঁদে ফেলল। চোখে হাত চাপা দিল ও।

হারা আর টনি কাছে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। অন্তরের আবেগে ফুঁপিয়ে উঠল শান্তনু। ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

ভাঙা গলায় ও বলল, জিকো আর নেই...।

টনি আর হারা ধমক দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল। বলল, আলো ফুটলেই জিকোর আসল খোঁজ শুরু হবে।

.

সকাল হল বটে, তবু সেটাকে রাতের চেয়েও অন্ধকার মনে হল শান্তনুর। ও যখন নিজের কবিতাকে নিজের তৈরি সুরে গানের মতো গাইত তখন জিকো তাল ঠুকত। কখনও ওর আঙুল চলত কোনও বাড়ির জানলার পাল্লায়, কখনও টিফিন ক্যারিয়ারের ওপর বাজাত, আবার কখনও বা স্রেফ কিছু খুচরো পয়সা মুঠো করে তাল ঠুকত।

সেই বাজনা বাজানো হিরো হতে চাওয়া ডাকাবুকো ছেলেটাকে এখন খুঁজতে বেরোতে হবে।

বৃষ্টি আর নেই, যদিও আকাশ ঘোলাটে। সেই ঘোলাটে পরদার পিছনে স্তিমিত সূর্যকে মরা চাঁদের মতো নিস্তেজ দেখাচ্ছে। প্রকৃতির সব জায়গাতেই বৃষ্টির ভেজা সিলমোহরের ছাপ।

ওরা পাঁচজন আর সময় নষ্ট করেনি। জিকোর খোঁজে উতলা হয়ে উঠেছে। টুনি দরজার চৌকাঠ ছেড়ে মাঠে নামেনি। তবে বাকি চরাজন বেরিয়ে পড়েছে বাইরে।

প্রথমেই ওরা গেল বাইকগুলোর কাছে।

বাইক তিনটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে ওরা হয়তো অনেক কিছু দেখেছে, কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারছে না।

বর্ষার জলছবি চোখ টানার মতো। যেদিকে চোখ যায় ঘন সবুজ। হালকা বাতাস বইছে। বাতাসে ভেসে আসছে বুলবুলির শিস। এ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ সুন্দর।

জলময় ঘাস-জমিতে ছপাৎ-ছপাৎ করে পা ফেলে ওরা জিকোর উধাও হওয়ার রহস্যটা বুঝতে চাইল।

শান বলল, বাইক যখন নেয়নি তখন ও বেশি দূর যেতে পারেনি...।

কিন্তু ও মাঝরাতে হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে বেরোল কেন? হারা জিগ্যেস করল।

তারপর আপনমনেই কিছুক্ষণ কী ভেবে বলে উঠল, ও আমার মতো ওই শব্দ শুনে জেগে ওঠেনি তো?

টনি লম্বা-লম্বা ঘাসের ডগা সরিয়ে মাটির কাছে কী দেখছিল। হারার কথায় মুখ তুলে তাকাল : আমিও সেটাই ভাবছিলাম। ওই চাবুকের মতো শব্দে ওর হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারপর কিউরিয়োসিটিতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে।

তারপর? শান্তনু জানতে চাইল।

টনি আর কোনও উত্তর দিতে পারল না। কেমন বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল, কী একটা ও বলতে চায় কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছে।

মউলি কোমরে দু-হাত রেখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর সবুজ সালোয়ার অনেকটা করে গোটানো। বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচ রঙের নেলপালিশ। হঠাৎ করে মনে হয় নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

ও ভুরু উঁচিয়ে বলল, তারপর কী হল সেই স্টোরিটাই তো আমরা বুঝতে চাইছি।

টনি একটু আমতা-আমতা করে বলল, সেই লোকটার কথা মনে পড়ছে—এই বাড়িটার যে মালিক আঙুল তুলে বেঢপ বাড়িটায় দিকে দেখাল টনি? সেই লোকটাও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। আলো জ্বেলে দরজা হাট করে খুলে রেখে সে চলে গিয়েছিল। ঠিক এই মোমেন্টে আমরা পাঁচজন ভ্যানিশ হয়ে গেলে যে সিচুয়েশান হবে।

ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বোধহয় টনির কথাটা নাড়া দিয়ে গেল সবাইকে।

শান বলল, জিকো হায়েনা আর নেকড়ের কথা বলছিল...।

ওরা তাকাল দুরের গাছপালার দিকে। কাল রাতে ওই ঘন সবুজের আড়াল থেকে হঠাৎই কি বেরিয়ে এসেছিল কোনও হায়েনা কিংবা নেকড়ে? তারপর নিরস্ত্র জিকোকে

আক্রমণ করেছে?

কিন্তু জিকো তো লড়াই না করে হার মানার পাত্র নয়!

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে টুনটুনি চিৎকার করে জানতে চাইল, কী রে, কিছু পেলি?

ওরা চারজনেই টুনির দিকে তাকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

শান হঠাৎই হারার দিকে তাকিয়ে বলল, হয়েনা বা নেকড়ে না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে...।

অন্য কিছু মানে?

একটু ইতস্তত করে শান জবাব দিল, ভূত-টুত..মানে, নিশির ডাকে এরকম...।

মউলি খিলখিল করে হেসে একেবারে যেন গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাসির দমক সামলে বলল, বোগাস!

শান আহত গলায় বলল, হেসে উড়িয়ে দিলেই হল! জিকোর ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও তা হলে বোগাস! তুই ওকে আমাদের সামনে হাজির কর দেখি!

ঠিক তখনই টনি ঘাসের আড়াল থেকে কী একটা খুঁজে বের করে হাতে তুলে নিল।

জিনিসটা আকাশের ঘোলাটে আলোতেও চকচক করে উঠল।

শান আর মউলি প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, জিকোর আংটি!

আংটিটা ওদের সকলের চেনা। হোয়াইট মেটালের তৈরি ডিজাইন করা একটা চওড়া রিং। জিকোর ডানহাতের বুড়ো আঙুলে ওটা ছিল।

আংটিটা দেখেই ওরা চারজন কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওদের মনে হল, জিকোকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আংটিটা ঘিরে ভিড় করল ওরা। ওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎই শ্বাস টানল মউলি। আংটির গায়ে কীসের দাগ? রক্ত মনে হচ্ছে।

এই দেখ, আংটির গায়ে ব্লাড-স্টেইন লেগে আছে! মউলি বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজন ঝুঁকে পড়ল আংটিটার ওপরে। ওটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখল রক্তের ছিটে লেগে আছে আংটির বাইরে-ভেতরে দু-দিকেই। আংটিটা জিকোর হাত থেকে খুললই বা কে, আর ওটার ভেতর দিকে রক্তের দাগ লাগলই বা কেমন করে?

শান আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কাঁপা গলায় বলে উঠল, জিকো আর নেই...। তারপর মাথা নীচু করে চোখ ঢাকল হাতে।

হারা বলল, জিকোর কথাই তা হলে সত্যি হল...।

টনি চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, চল, আর একটু খুঁজে দেখি। হারা, তুই জিকোর হান্টিং নাইফটা নিয়ে আয়।

শান আর মউলির দিকে একপলক তাকিয়ে হারা ছুটল বাড়ির দিকে। ভেজা ঘাস-জমিতে ছপছপ শব্দ হল।

বাইরে কোথাও অ্যাডভেঞ্চারে বেরোলে জিকো সবসময় ওর শখের একটা হান্টিং নাইফ সঙ্গে নিত। এবারেও সেটা নিতে ভোলেনি।

ঘর থেকে ছুরিটা নিয়ে আসার সময়ে হারার মনে হল, রাতে বেরোনোর সময় জিকো যদি ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে বেরোত তা হলে বোধহয়...।

সদর দরজায় হারাকে দাঁড় করিয়ে টুনটুনি প্রশ্নে-প্রশ্নে ওকে জ্বালিয়ে মারছিল। জিকোর আংটির কথা শুনে ও কেঁদে ফেলল।

হারা ওর পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল। বলল, আমরা এখনও সার্চ করে যাব। হয়তো দেখব জিকো স্লাইটলি উন্ডেড হয়ে জঙ্গলে পড়ে আছে। লেট আস হোপ...।

হারা দৌড়ে চলে এল মউলিদের কাছে।

ওরা আবার শুরু করল ওদের খোঁজ।

খুঁজতে খুঁজতে ঘাস আর আগাছার এলাকা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। হারার হাতে বাগিয়ে ধরা হান্টিং নাইফ। ওর দুপাশে টনি আর শান্তনু। পিছনে মউলি।

কিন্তু বহু খোঁজ করেও ওরা কিছু পেল না। হতাশ হয়ে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। ওদের পিছন থেকে ভেসে আসছিল নাম-না-জানা পাখির ডাক।

শান হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছছিল বারবার।

মউলি বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল। ওর মুখ থমথমে। ভয়ের চোখে বারবার এপাশ-ওপাশ দেখছিল।

হারার কপালে ভাঁজ। ওর চোখ হায়েনা কিংবা নেকড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

টনি চোখা নজরে ঘাসের দিকে তাকিয়ে অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছিল। ওর মন বলছিল জিকোর আরও কোনও চিহ্ন কোথাও না-কোথাও অবশ্যই পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

লম্বা-লম্বা ঘাসের ফাঁকে জিকোর ছিন্নভিন্ন গেঞ্জি আর পাজামা পাওয়া গেল। ছেঁড়া পোশাকগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। রক্তে, জলে, কাদায় মাখামাখি।

পোশাকগুলো শুধু যে শতছিন্ন তাই নয়–সেগুলোর গায়ে রক্তের ছাপ। আর সেই পোশাক থেকে আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে।

ওরা চারজন ভীষণ ভয় পেল। শান পোশাকগুলো বুকে জড়িয়ে ডুকরে উঠল।

মউলি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ভেজা জমিতে।

হারা বিভ্রান্তের মতো স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

আর টনি শানকে জাপটে ধরে ওর গায়ে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। ওর চোখের কোণে জল।

কিছুক্ষণ পর নিজেদের সামলে নিয়ে ওরা বাড়ির দিকে ফিরে চলল। কিন্তু সংশয়ের খোঁচা থেকেই গেল। জিকোর যে সত্যি-সত্যি কী হয়েছে সেটা যেন ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না। ওরা সেই রহস্য নিয়েই আলোচনা করছিল। বুঝতে চাইছিল রহস্যের সমাধানটা। কিন্তু মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল।

.

০৪.

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হারা একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। ও মাঝে-মাঝে লুকিয়ে সিগারেট খায়। তবে এখন সিগারেট ধরিয়েছে জিকোর ব্যাপারটা সামলে নিয়ে সহজ হওয়ার জন্য।

ওকে সিগারেট ধরাতে দেখেই টুনি নাক কুঁচকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে বসল।

শান বলল, হারা, তুই যে কেন জোর করে এই নেশাটা ডেভেলাপ করছিস কে জানে! সাধ করে ক্যানসারকে কেউ ইনভাইট করে না।

হারা সিগারেটে টান দিয়েই কয়েকবার কেশে উঠল। কাশি থামলে পর বলল, না রে, আমি নেশা ডেভেলাপ করব না। একটু প্র্যাকটিস করেই ছেড়ে দেব। জিকোর কিন্তু কাশি হত না...।

আবার ঘুরে ফিরে সেই জিকো!

আজ সকাল থেকে কতবার যে জিকোর নাম এসে পড়ল কথায় কথায়।

টনি বোধহয় বাথরুমে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই শানকে জিগ্যেস করল, কী রে, কী ঠিক করলি? আমরা কি রওনা হচ্ছি, না থাকছি?

শান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইশারায় ওকে কাছে ডাকল ও আয়, বোস। সেটাই এখন ডিসকাস করব।

টনি এসে বসে পড়ল ওদের মাঝে।

শান একটু ভারী গলায় বলল, শোনেনা সবাই। যদি আমরা এখন রওনা দিই তা হলে রাত নটার মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যাব। আর যদি জিকোর ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু ইনভেস্টিগেট করে দেখতে চাই তা হলে আজ নয়, কাল সকালে স্টার্ট দিতে পারব।

টুনটুনি বলল, এখানে কোনও টাওয়ার নেই। মোবাইলে কলকাতার কানেকশান পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা পুলিশে...।

টনি ওর কথার ওপরে কথা বলে উঠল, হা, সেইজন্যেই আমরা পুলিশে কোনও খবর দিতে পারছি না। আর এখানে লোকাল থানা কোথায় কে জানে!

একটু থেমে টনি আবার বলল, জিকো যে... আর নেই...সেটা নিয়ে আমার কয়েকটা খটকা আছে–

মউলি বলল, আমারও। ও. কে., তুই আগে বল–।

টুনটুনি একটা কৌটো থেকে জোয়ান নিয়ে সবাইকে বিলি করছিল। ও বিড়বিড় করে বলল, যদি থেকে যেতে হয় তা হলে আজকের রাতটা কেয়ারফুল থাকতে হবে...।

মউলি অপছন্দের চোখে ওর দিকে একবার তাকাল শুধু।

টনি বলল, জিকোকে সাধারণ কোনও পশু মারেনি। কারণ, ওর ড্রেসের সঙ্গে ফ্লেশ বা বোনের কোনও টুকরো নেই। মাংস কিংবা হাড়ের টুকরো না থাকায় মনে হচ্ছে মুরগির পালক ছাড়ানোর মতো পশুটা যেন আগে থাবা দিয়ে জিকোর পাজামা আর গেঞ্জি ছাড়িয়েছে, তারপর রেলিশ করে ওকে সাবাড় করে দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে..।

টনির কথা শুনে হারা ঘেন্নায় শিউরে উঠল। জানলার কাছে গিয়ে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর মাথার কদমছাঁট চুলে হাত বুলিয়ে জানলার পাশে হেলান দিয়ে উনি আর মউলির দিকে তাকিয়ে রইল।

মউলি টনির দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস। তার মানে অ্যানিম্যালটা নিশ্চয়ই আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তা ছাড়া ওয়ান মোর পয়েন্ট ও জিকোর আংটি পাওয়া গেল এক জায়গায়, আর ড্রেসগুলো পাওয়া গেল অন্তত বিশ-তিরিশ ফুট দূরে। এর মানে কী? আংটিটা জিকোর আঙুল থেকে খুলে পড়ল কেমন করে?

শান একপাশে চুপচাপ বসে জোয়ান চিবোচ্ছিল আর চোয়ালে আঙুল চালাচ্ছিল। ও শান্ত গলায় বলল, মউলি, তোর আর টনির কথার সঙ্গে আমি আরও কয়েকটা মিস্ট্রি অ্যাড করছি। আংটিটা যেই জিকোর আঙুল থেকে খুলে নিক না কেন এটা শিয়োর যে, জিকো তখন উন্ডেড– কারণ, আংটির গায়ে রক্তের ছিটে।...এরপর আসা যাক জামা

কাপড়ে। ড্রেসগুলো রক্তে এমন মাখামাখি যে, স্পষ্ট বোঝা যায়, জিকো তখন সাংঘাতিক উন্ডেড–হয়তো বেঁচে ছিল না এমনও হতে পারে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মনোযোগী মুখগুলোকে দেখল শান। তারপর? এখন মিস্ট্রি হল, ঘাসে বা মাঠে কোথাও একফোঁটা রক্ত নেই কেন?

সবাই চুপ করে রইল।

একটু পরে হারা বলল, মে বি বৃষ্টির জলে সব ধুয়ে গেছে।

ধুয়ে যাবেটা কোথায়? গম্ভীর ভাবে জানতে চাইল টনি, আমি পা দিয়ে খুঁচিয়ে ঘাসের গোড়াগুলো ভালো করে দেখেছি। আংটির জায়গাতে কোনও রক্তের দাগ ছিল না, কিংবা জামাকাপড়ের আশেপাশেও কোনও দাগ-টাগ পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারটা দারুণ মিস্টিরিয়াস।

তা হলে কি আকাশপথে কোনও প্রাণী এসে জিকোকে অ্যাটাক করেছে? ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে খতম করে তারপর রক্ত চুষে খেয়েছে? একেবারে ইংলিশ হরার মুভির মতো?

কথাগুলো বলেছে মউলি। হারা সঙ্গে-সঙ্গে ওকে হাত তুলে থামতে ইশারা করেছে। বলেছে, প্লিজ, মউলি–আমার ভালো লাগছে না। গা গুলিয়ে উঠছে।

মউলি সিরিয়াস গলায় বলল, আমি এসব বলছি এইজন্যে যে, এগুলো অ্যাবসোলিউটলি অ্যাবসার্ড। আর সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছে, মে বি জিকো ইজ স্টিল অ্যালাইভ। হয়তো উন্ডেড…কিন্তু বেঁচে আছে।

বাকি চারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মউলি বুঝতে পারল, ওরা ওর কথা বিশ্বাস করতে চাইছে, অথচ ওদের চোখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছে।

টনি হাত তুলে ইশারা করে সকলের মনোযোগ চাইল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, অনেক তো আলোচনা হল...এবার লাখ টাকার প্রশ্নটা করি। তোমরা কেউই এই প্রশ্নটা করোনি। অথচ এটাই সবচেয়ে ভাইটাল কোশ্চেন... একটু থামল টনি। চশমার কাচের আড়াল থেকে উৎসুকভাবে দেখল সবাইকে। তারপর নিজেই মুখ খুলল, বলতে পারো, জিকো চিৎকার করেনি কেন? কোনও জন্তু-জানোয়ার অ্যাটাক করলে সেটাই তো ছিল স্বাভাবিক।

ওরা সবাই চুপ।

সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটা এতক্ষণ কারও মনে আসেনি, সত্যিই তো, জিকো চিৎকার করেনি কেন? তা ছাড়া ধস্তাধস্তির কোনও শব্দও কেউ শুনতে পায়নি।

মউলি হঠাৎই বিষণ্ণ থমথমে ভাবটা কাটিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল ঃ টনির কোশ্চেনটা আমার থিয়োরিকেই সাপোর্ট করছে। মানে, পুরো ব্যাপারটাই অ্যাবসোলিউটলি অ্যাবসার্ড। সো, লেট আস তোপ জিকো এখনও বেঁচে আছে। সুতরাং শান, উই আর স্টেয়িং টুডে-ও.কে.?

শান মাথা নেড়ে বলল, আমার তো সেটাই ইচ্ছে...।

টনি বলল, আমারও।

হারা ঠোঁট উলটে বলল, আমার কোনও আপত্তি নেই।

টুনটুনি করুণ চোখে চার বন্ধুর দিকে তাকাল। তারপর মিনমিন করে বলল, আমি একা আর কোথায় যাব।

শান বলল, ও. কে, তা হলে আজ আমরা থাকছি। কাল কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। এই থাকার ব্যাপারে কয়েকটা পয়েন্ট সবাইকে বলে দিই। আমাদের হান্ড্রেড পারসেন্ট কেয়ারফুল থাকতে হবে। রাতে আমরা কেউই বাইরে বেরোব না কিছুতেই না। আর আমি, টনি আর

হারা জানলা দিয়ে বাইরেটা ওয়াচ করব। দরকার হলে রাত জাগব। কী, টনি ঠিক আছে? হারা, ও.কে.?

টনি আর হারা মাথা নেড়ে সায় দিল।

শান বলল, তা ছাড়া দিনের বেলাতেও বাইরে না বেরোনোই ভালো। অ্যাজ সাচ বাইরে বেরোনোর তো কোনও দরকার নেই। স্টিল যদি কেউ বেরোয় তা হলে সবাইকে জানিয়ে বেরোবে।

এরপর ওদের জমায়েতটা ভেঙে গেল।

টুনি আর মউলি দোতলায় উঠে এল। ঘরে না ঢুকে ওরা ছাদে এসে দাঁড়াল। শান্তনুও কখন যেন এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

এখন দুপুর হলেও চারপাশটা শীতের শেষ বিকেলের মতো ঠান্ডা ধূসর। আকাশে ঘোলাটে মেঘ। মেঘ আর-একটু গাঢ় হলেই আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। গ্রাম যদি দূরে কোথাও থেকে থাকে তা হলে সবুজ তাকে আড়াল করে দিয়েছে।

প্রশান্ত ভেজা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে শান ভাবছিল প্রকৃতি সত্যিই রহস্যময়। কোথা থেকে আচমকা বৃষ্টি ঢেলে দিয়ে ওদের ছজনকে এক জটিল রহস্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তার মধ্যে একজন এখন আবার নেই।

ওরা যাচ্ছিল পত্রসায়রের দিকে। অথচ এখন পড়ে রইল পৎৰসায়র–চলে এল অচেনা এক গ্রামে। এমন এক অদ্ভুত গ্রাম যেখানে একটি মাত্র বাড়ি। সেটাও আবার সিমেন্ট-বালি দিয়ে তৈরি।

বাড়িটা এত পুরোনো আর ভাঙাচোরা যে, আলো-টালো না থাকলে দিব্যি ভূতুড়ে বাড়ি বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। বাড়িটার মালিকও বেশ অদ্ভুত। আলো জ্বেলে দরজা খুলে রেখে সে উধাও জিকোর মতো। কিন্তু সেটা হয়তো বিজ্ঞানীর খেয়াল। জিকোর মধ্যে তো সেরকম খামখেয়ালি ব্যাপার ছিল না!

শান এসব ভাবছিল আর জিকোর জন্য দুঃখ পাচ্ছিল। এরকম একটা জায়গায় কত কবিতার লাইন মনে আসার কথা, অথচ একটাও মনে আসছে না। তার বদলে একটা চাপা কষ্ট বুকের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

টুনি ঝুঁকে পড়ে টবের গাছগুলো দেখছিল। ও গাছের ভক্ত হলেও এই গাছগুলো ঠিক চিনে উঠতে পারছিল না। কোনও গাছই এক-দেড় ফুটের চেয়ে লম্বা নয়। তার মধ্যে কয়েকটা আবার লতানে গাছ। কোনও গাছের পাতা ছোট মাপের, কোনওটার-বা আবার বড়। এক-একটা গাছে ফুটে আছে ছোট-ছোট রঙিন ফুল।

টুনি উবু হয়ে বসে অবাক চোখে দেখছিল। কারণ, একসঙ্গে এতগুলো অচেনা গাছ ও কখনও দেখেনি। গাছের শখ মেটানোর টানে ও বেশ কয়েকটা বই কিনেছে–তাতে ছবিও আছে অনেক। কিন্তু সেই ছবিগুলোর একটাও এই গাছগুলোর সঙ্গে মিলছিল না।

ছাদের যেদিকটায় টবগুলো রাখা আছে সেদিকটা শ্যাওলা ঢাকা। টবগুলোও কালচে-সবুজ শ্যাওলায় মলিন। কিছু কিছু টব ফাটা, ভাঙাচোরা। ভাঙা টবের কয়েকটা গাছ হেলে গেছে। আবার কয়েকটা গাছ লতিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

মউলি বলল, কী রে, কয়েকটা গাছ নিয়ে যাবি নাকি?

টুনি ওর দিকে তাকিয়ে মলিন হাসল ও নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। গাছগুলো বেশ রেয়ার–আগে কখনও দেখিনি।

শান ওদের কাছে এল। একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই গাছটা নিয়ে চল– ব্যাপক দেখতে।

শানের দেখানো গাছটার দিকে তাকাল টুনটুনি আর মউলি। ওদের কাছ থেকে তিনটে টবের পিছনে রয়েছে গাছটা। মাঝারি মাপের সবুজ পাতা। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে ফুটে রয়েছে লম্বা লম্বা সবুজ ফুল। ফুলের চারপাশে ছোট-ছোট হলুদ রোঁয়া। আর প্রতিটি ফুলের নীচের সুতোর মতো সরু কয়েকটা করে শুঁড় ঝুলছে।

গাছটা টুনির মনে ধরল। ও দুটো টবের ফাঁকে শ্যাওলা ধরা মেঝেতে বাঁহাতের ভর দিল। তারপর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল একটা সবুজ ফুলের দিকে।

সবুজ ফুল ওরা আগে কখনও দেখেনি। ফুলগুলো যেন সবুজ পাতার সঙ্গে মিশে গেছে। টুনি হাত বাড়িয়ে একটা ফুল ছিঁড়তে গিয়েছিল। কিন্তু ফুলের নীচে গাছটার গায়ে ওর আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

সুতোর মতো সরু চারটে শুঁড় চোখের পলকে টুনির আঙুল জড়িয়ে ধরল। পাকের পর পাক দিয়ে জড়িয়ে গেল লাটাইয়ের সুতোর মতো।

টুনি আঃ! শব্দ কর এক হ্যাঁচকা টানে হাতটাকে ফেরত নিয়ে এল। শুঁড়গুলো ছিঁড়ে এল গাছের কাণ্ড থেকে।

শান আর মউলি চমকে উঠল। মউলি টুনিকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে এল টবগুলোর কাছ থেকে।

শুঁড়গুলো তখনও টুনির ডানহাতের আঙুলে জড়িয়ে রয়েছে। আর সবুজ কেঁচোর মতো অল্প-অল্প নড়ছে।

টুনির গা ঘিনঘিন করে উঠল। ও হাতটা ঝাড়া দিতে লাগল বারবার। ওর গলা চিরে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

শান চট করে চলে এল ওর কাছে। ওর পাশটিতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। তারপর পোকামাকড় ঝেড়ে ফেলার ঢঙে টুনির আঙুল থেকে ছেঁড়া শুঁড়গুলো ছিটকে ফেলে দিল।

মেঝেতে পড়েও শুঁড়গুলো নড়তে লাগল। ওরা তিনজন তাড়াতাড়ি কয়েক হাত পিছিয়ে গেল।

যন্ত্রণায় আকুলিবিকুলি করা মিনি লাউডগা সাপের মতো সবুজ শুঁড়গুলো মোচড়াতে লাগল, পাক খেতে লাগল। যেন প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে।

একটু পরেই শুঁড়গুলো স্থির হয়ে গেল।

টুনি ভয়ের গলায় বলে উঠল, এ কীরকম গাছ রে বাবা! হরিবল!

মউলি ওর আঙুলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, তোর আঙুলে কিছু হয়নি তো!

না, সেরকম কিছু হয়নি–শুধু আঙুলগুলো একটু চুলকোচ্ছে। এই বলে ওড়না দিয়ে আঙুলগুলো ভালো করে ঘষে ঘষে মুছতে লাগল টুনি।

শান এদিক-ওদিক খুঁজে একটা শুকনো কাঠি জোগাড় করল। তারপর সেই কাঠিটা এগিয়ে ধরল সবুজ ফুলগুলোর সামনে। ফুলের গোড়ায় খোঁচা দিল।

কিন্তু কিছুই হল না।

এবারে শুঁড়ের গায়ে কাঠি ছোঁয়াল শান। কিন্তু শুঁড়গুলো মোটেই কাঠিটাকে জড়িয়ে ধরল
।

শান অবাক হয়ে বলল, স্ট্রেঞ্জ! টুনির আঙুলের বেলায় টেন্ট্যাক্লগুলো চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ এই কাঠিটার বেলায় কেমন কোল্ড...।

মউলি গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ। অন্য গাছগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখবি নাকি?

কী দরকার? টুনি বলল।

শান কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ছাদের এককোণে। ছাদের পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকাল নীচের দিকে।

ঘাসের কার্পেট ছন্নছাড়াভাবে ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। কোথাও ভয়ের কোনও নাম-গন্ধ নেই। এমনকী লম্বা-লম্বা ঘাস আর আগাছার মধ্যে অন্য কোনও অদ্ভুত গাছও চোখে পড়ছে না।

ছাদের ছোট্ট টবে যে-ভয়ংকর গাছ ওরা এইমাত্র আবিষ্কার করল, সেরকম কোনও শিকারি গাছ যদি লুকিয়ে থাকে ওই ঘাসজমিতে। কিংবা জঙ্গলের ভেতরে! হয়তো ওরা শিকারি পশুর মতো চলে বেড়ায়। শিকার দেখলেই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শান্তনু শিউরে উঠল। ওর কবি-মন কল্পনায় কল্পনায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ও ফিরে তাকাল টুনি আর মউলির দিকে। মেজাজটা হালকা করার জন্য টুনিকে জিগ্যেস করল, কী রে, একটু আগে বলছিলি যে, ওই গাছের চারা নিয়ে যাবি নাকি কলকাতায়?

রক্ষে করো! প্রায় আঁতকে উঠে বলল টুনি, ওই রাক্ষুসে গাছ লাগালে আমার বাকি গাছ সব সাবাড় হয়ে যাবে।

এরপর ওরা দোতলার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সকলের মন ভালো করার চেষ্টায় শান্তনু কয়েকটা কবিতা শোনাল। মউলি ওর স্কুলের ফেস্ট-এর গল্প শোনাল। আর টুনি শোনাল আমেরিকার গল্প। ওর কাকা সদ্য ফিরেছেন ও-দেশ থেকে। ওঁর কাছ থেকে শোনা গল্পগুলো দারুণ থ্রিলিং আর ইন্টারেস্টিং। কারণ, টুনির কাকা জিয়োলজিস্ট-ও-দেশে গিয়ে কয়েকটা অভিযান চালিয়েছেন।

কিন্তু ওদের গল্প মোটেই জমছিল না। জিকো বারবার এসে হাজির হচ্ছিল ওদের মাঝখানে। ওদের ডেকে বলছিল, কী রে, আমাকে খুঁজে বের করবি না?

ওদের গল্পের তাল কেটে যাচ্ছিল।

একটু পরেই ওদের সব গল্প কোনও ম্যাজিকে ফুরিয়ে গেল। ওর মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইল।

.

০৫.

টনি আর হারা একতলার ঘরে বসে জিকোর কথা আলোচনা করছিল। ফুটবল, ক্রিকেট, পড়াশোনা আর বেড়ানো নিয়ে যত সব পুরোনো স্মৃতিকথা। যেসব কথা বহুদিন মনে পড়েনি সেসব কথাও আজ স্পষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছে। যেন কেউ স্মৃতিকথার বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলেছে একটানে।

কথা বলতে-বলতে জানলার কাছে গেল টনি। বাইরে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হারার দিকে ফিরে বলল, কাল রাতের ওই পিকিউলিয়ার সাউন্ডটা আর-একবার ডেসক্রাইব করতো।

হারা শব্দটার চরিত্র সাধ্যমতো বর্ণনা করার চেষ্টা করল।

টনিও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল। বারবার জানতে চাইল, শব্দ ছাড়া আর কোনও অদ্ভুত ব্যাপার ও টের পেয়েছে কি না। উত্তরে হারা মাথা নেড়ে না বলল বটে, কিন্তু ওর মধ্যে একটা দোনামনা ভাব ছিল।

সেটা লক্ষ করে টনি আবার ওকে চাপ দিল। বলল, ভালো করে ভেবে বল। এর ওপর আমাদের বাঁচা-মরা ডিপেন্ড করছে।

হারা তখন আমতা-আমতা করে বলল, বলছি কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। আমি..মানে…ঠিক শিয়ের না…কিন্তু…

ওসব ইয়ে ছেড়ে বলে ফেল…।

শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে পারফিউমের মতো একটা গন্ধ পেয়েছিলাম খুব হালকা মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা পেয়ে বেশ অবাক লেগেছিল।

কেন?

কারণ, মউলি বা টুনি ওই পারফিউম লাগায় না। ওদেরটা অন্যরকম…।

তারপর?

তারপর আর কী! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল–শুয়ে পড়েছি।

এরপর টনি ভাবতে বসল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভেবেও কোনও কুল পেল না।

ঘরের একপাশে বেঢপ মাপের টেবিল। টেবিলে কাগজের গাদা। তার পাশে একটা কলমদানিতে তিনটে বলপয়েন্ট পেন।

টেবিলের ঠিক পাশেই বিশাল আলমারিটা। বই আর কাগজপত্রে ঠাসা। আলমারির পাল্লার কাচগুলো ময়লা পড়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে। দুটো পাল্লায় পুরোনো আমলের দুটো পিতলের কড়া লাগানো।

বাড়িওয়ালার জিনিসপত্রের সঙ্গে ওদের মালপত্র রেখে বসবার ঘরটা এখন একেবারে গোডাউনের চেহারা নিয়েছে।

আলমারি আর টেবিলের কাগজপত্র-বইয়ের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল টনি। আচমকা ও বলে উঠল, অ্যাই হারা, চল তো, ওই পেপার্সগুলো ঘেঁটে দেখি–যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়...।

টনির প্রস্তাবে হারা তেমন উৎসাহ পেল না। এখন আবার ওই কাগজপত্রের ধুলো আর ময়লা ঘাঁটতে হবে!

কিন্তু টনিকে থামায় কে! আগামী দিনের বিজ্ঞানী বলে কথা! ও চট করে চলে গেল টেবিলের কাছে। একপাশে পড়ে থাকা হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ল। মাইনাস পাওয়ারের চশমাটা চোখ থেকে খুলে হারার দিকে ফিরে ওকে ইশারায় ডাকল টনি? কীরে, আয়।

হারা অনিচ্ছায় পা ফেলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল টনির কাছে।

টনি ততক্ষণে চশমাটা টেবিলের একপাশে রেখে কাগজপত্রের একটা গোছা সামনে টেনে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে।

কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে টনি আর হারার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। কারণ, বেশিরভাগ পৃষ্ঠাতেই দুর্বোধ্য সব জটিল অঙ্ক কষা। আর কোনও-কোনও পৃষ্ঠায় নানান রাসায়নিক যৌগের নাম আর তাদের নিয়ে সমীকরণ।

টনি আর হারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল আর একে-একে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটে যেতে লাগল।

হঠাৎই একটা পৃষ্ঠায় পৌঁছে টনি দেখল আর অঙ্ক বা রাসায়নিক সমীকরণ নয়, বরং ইংরেজিতে কত কী লেখা রয়েছে। তার মধ্যে প্লান্ট গ্রুপিং হেডিংটা টনির চোখ টানল। তার নীচে এক দুই-তিন-চার করে নম্বর দিয়ে কতকগুলি শব্দ লেখাঃ

1. Serracenia
2. Nepenthes
3. Darlingtonia
4. Drosera
5. Pinguicula
6. Utricularia
7. Diomea
8. X (?)

আট নম্বরে লেখা X এবং তার পাশে জিজ্ঞাসার চিহ্নটা দেখে টনির ভুরু কুঁচকে গেল।

আরও কয়েক পৃষ্ঠা ঘেঁটে দেখার পর টনির মনে হল ভদ্রলোক গাছপালা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। দোতলার ছাদে যে অতগুলো টব আর তাতে অতরকম গাছ–এখন মনে হচ্ছে ওটা স্রেফ শখের বাগান নয়, একতলার ল্যাবরেটরির একটা অংশ।

আরও কাগজপত্র ঘেঁটে টনি বেশ কিছু গাছের ছবি দেখতে পেল, তার সঙ্গে কয়েকটা ফুলের ছবি। সব ছবিই হাতে আঁকা। আর ছবির নানা অংশের দিকে তীরচিহ্ন দিয়ে নানান মন্তব্য লেখা।

বেশ কয়েক বান্ডিল কাগজ হাতড়ে দেখার পর আলমারি থেকে কয়েকটা বই নামিয়ে নিল টনি। ও আর হারা হাত দিয়ে চাপড় মেরে বইগুলোর ধুলো ঝাড়ল। তারপর একে-একে বইগুলো দেখতে লাগল।

বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় বইয়ের মালিকের নাম লেখা : সোমেশ চ্যাটার্জি। হাতের লেখা দেখে বোঝা গেল, হাতে লেখা কাগজপত্রগুলো ওঁরই। সুতরাং আন্দাজ করা যায় তিনিই এ-বাড়ির মালিক।

বইগুলো সবই গাছপালা নিয়ে। কারণ, বইগুলোর নাম সেরকমই। যেমন, একটার নাম প্লান্ট লোকোমোশান, আর-একটা বইয়ের নাম কার্নিভোরাস প্লান্ট, এ ছাড়া প্লান্ট রিপ্রোডাটিভ সিস্টেম আর ডাইজেস্টিভ এনজাইমস ইন প্লান্টস নামেও দুটো বই রয়েছে।

হারা বলল, টনি, বোঝা যাচ্ছে, এই সোমেশ চ্যাটার্জি ভদ্রলোক ছিলেন বোটানিস্ট। গাছপালা নিয়ে ছিল ওঁর যত কারবার। ওঁর ল্যাবরেটরিটা দেখেও সেরকম ইমপ্রেশান হয়।

টনি হারার কথায় ছোট্ট করে হু বলল। ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ওর মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে।

ও হঠাৎ হারার দিকে তাকাল, বলল, কার্নিভোরাস প্লান্টস মানে জানিস?

হারা মাথা নাড়ল? না জানি না।

মাংসাশী গাছ।

তো?

না, ভাবছি এর সঙ্গে জিকোর ভ্যানিশ হওয়ার কোনও কানেকশান আছে কি না।

তুই কি বলতে চাস গাছ জিকোকে খেয়ে ফেলেছে? তা হলে ওকে খেয়ে গাছটা গেল কোথায়? জঙ্গলে পালিয়ে গেছে? নাকি ওই ঘাসগুলোই তোর মাংসাশী গাছ? হাত নেড়ে পাত্তা না দেওয়ার একটা ভঙ্গি করল হারা।

হারার কথায় যুক্তি ছিল। তাই দমে গেল টনি। কিন্তু সন্দেহের একটা কাটা ওর মনের ভেতরে খচখচ করতে লাগল।

ও সোমেশবাবুর কাগজপত্রগুলো আবার ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখল। পরে সময় করে ও সোমেশবাবুর বাকি জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখবে। যদি নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায়। কারণ, পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে আর কাউকে কিছু বলাটা ঠিক হবে না। তাই টনি হারাকে বলল, শোন, আমার এই আইডিয়ার কথা কাউকে এখন বলার দরকার নেই। বললে ওরা সবাই মিলে আমাকে চাটবে। আমি আরও একটু ইনভেস্টিগেট করে দেখি, তারপর...।

হারা ভালোমানুষের মতো ঘাড় নাড়ল। তারপর জানলার কাছে এসে নিরীহ ঘাসগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

ওরা কি কখনও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে?

অন্য সময় হলে এ প্রশ্নের উত্তরে হারা হেসে উঠত। কিন্তু এখন হাসতে পারল না। টনির কথাগুলো ওর মনটাকে দুলিয়ে দিতে চাইছে।

.

ঘুম ভাঙতেই সুন্দর গন্ধটা মউলির নাকে ঢুকে পড়ল।

মউলি পারফিউম চর্চা করে বটে, কিন্তু এর আগে এত মিষ্টি মন-টানা গন্ধ কখনও ওর নাকে আসেনি। বড়-বড় শ্বাস টেনে গন্ধটাকে বুকের ভেতরে মিশিয়ে নিতে চাইল ও। মনে হল, এই গন্ধটা ওর প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছে।

ঘর গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। শুধু একটা খোলা জানলা দিয়ে ছায়াঅন্ধকার আকাশ দেখা যাচ্ছে। সারাদিনে আজ তেমন বৃষ্টি হয়নি। শুধু সন্ধের পর আধঘণ্টা মতন ঝিরঝিরিয়ে জল পড়েছে আকাশ থেকে।

ভালো করে কান পাতল মউলি। কোনও শব্দ কি শোনা যাচ্ছে?

নাঃ কোনও শব্দ কানে আসছে না। শুধু টুনটুনির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অথচ আগের দিন রাতে হারা কেমন যেন চাবুক মারার মতো শব্দ শুনেছে। যত্তসব আজগুবি ব্যাপার!

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল মউলি। কিছুতেই আর ঘুম আসতে চাইছে না। মাথার ছোট ছোট চুলে বারকয়েক হাত চালিয়ে ও চলে এল দরজার কাছে।

এর মধ্যে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছিল। তাই ঘুমন্ত টুনটুনির দিকে তাকিয়ে ওর ছোট্ট শরীরের আবছা হাইলাইট দেখা গেল। ও জেগে থাকলে মউলিকে কিছুতেই ঘরের বাইরে বেরোতে দিত না। মেয়েটা যা ভিতু! দড়িকে সবসময় সাপ বলে ভুল করে।

দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল মউলি। গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়েছে। কেমন যেন নেশার মতো টানছে। মউলির মনে হল গন্ধটা যেন ছাদের দিক থেকে আসছে। ছাদে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ থাকলেও তার পাশের জানলাটা খোলা। হয়তো সেখান দিয়েই ঢুকে পড়েছে এই পাগল করা গন্ধটা।

ছাদের দিকে এগিয়ে গেল মউলি। দরজাটা সহজ ভঙ্গিতে খুলে ফেলল। না, ওর এতটুকুও ভয় করল না। নিজের সাহস নিয়ে বেশ একটু অহংকার আছে মউলির। ও সাইকেল চালাতে পারে, নিয়ম করে জিমে যায়, সাঁতার কাটে। সুযোগ পেলে পাহাড়ে ওঠার তালিম নেওয়ার সাধ আছে। সব সময়েই ওর মনে হয়, ছেলেদের চেয়ে ও কম কীসে!

দরজাটা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস মউলির প্রাণ জুড়িয়ে দিল। তার সঙ্গে অপরূপ গন্ধটা আরও তেজি হয়ে ওকে প্রায় নেশা ধরিয়ে দিল।

আকাশের ঘষা চাপা আলো হালকাভাবে ছাদে ছড়িয়ে পড়েছে। টবের গাছগুলোকে গাঢ় ছায়া বলে মনে হচ্ছে। সেই আঁধারে তারার মতো কয়েক টুকরো আলো ঝিকমিক করছে।

মউলি নিজের চোখকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। গাছের পাতায় রাত্রিবেলা জোনাকির মতো আলো জ্বলছে! নাকি সত্যি-সত্যিই ওগুলো জোনাকি পোকা? কিন্তু জোনাকির আলো হলে সেগুলো নড়েচড়ে বেড়াত। এই আলোর ফুলকিগুলো স্থির।

দুপুরের সেই অদ্ভুত গাছটার কথা মনে পড়ল মউলির। যে-গাছটার শুঁড় টুনটুনির আঙুল জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু সে-গাছটা তো আছে ওই দক্ষিণ দিকের কোণে! এখন আলো জ্বলছে উত্তর দিকের একটা গাছে।

আশ্চর্য! গাছগুলো কী বিচিত্র! টনির কাছে মউলি শুনেছে, এই বাড়ির মালিক সোমেশ চ্যাটার্জি গাছপালা নিয়ে গবেষণা করতেন, তার মধ্যে নাকি কার্নিভোরাস প্লান্টও রয়েছে। টবের ওই ছোট ছোট গাছগুলো কোন জাতের কে জানে!

ফুরফুরে বাতাস মউলির মুখে-চোখে আরাম বুলিয়ে দিল। মউলি আকাশের দিখে মুখ তুলে লম্বা শ্বাস টানল। আর ঠিক তখনই নীচ থেকে সপাৎ-সপাৎ শব্দ ভেসে এল।

তাড়াতাড়ি ছাদের পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল মউলি। তাকাল নীচের ঘাস-জমির দিকে। আর তাকিয়েই ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

নীচের জমিতে কোথাও কোথাও যেন দেওয়ালি শুরু হয়েছে। নানান জায়গায় দেখা যাচ্ছে আলোর ফুলকি। সেগুলো স্থিরভাবে জ্বলে রয়েছে একই জায়গায়।

চাবুক মারার মতো শব্দটা মউলিকে অতটা টানেনি। ওকে টানছিল গন্ধটা, আর ওই অদ্ভুত আলো। নীচের জমি থেকেই গন্ধটা আসছে বলে ওর মনে হল। নাঃ, নীচে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখা দরকার।

মউলি ছাদ থেকে চলে এল বারান্দায়। পা টিপে টিপে নীচে নামতে শুরু করল। ও জানে, হারা, টনি আর শান একতলার ঘরে জেগে বসে আছে। জানলা দিয়ে অতন্দ্র চোখে

তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মউলিকে দেখতে পেলে কিছুতেই ওরা বাইরে যেতে দেবে না। আর নিজেরাও এত সাবধানী, কিংবা ভিতু, যে বাইরে পা ফেলবে না।

একতলায় নেমে এসে হালকা পা ফেলে বারান্দা পেরোল মউলি। তারপর আস্তে করে খুলে ফেলল সদর দরজা।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আলোর বিন্দুগুলো দেখতে পেল না মউলি। ঘাসের শিষের আড়ালে ওগুলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। একতলার ঘরের জানলা থেকে শান কিংবা টুনিরা ওই আলো দেখতে পেয়েছে কিনা কে জানে! তবে আলো দেখতে না পেলেও গন্ধটা পাওয়ার কথা অবশ্যই।

কিন্তু মউলি জানত না যে, তখন হারা, টনি বা শান কেউই জেগে নেই। ওরা পালা করে বাইরের মাঠের দিকে চোখ রাখছিল। এখন ছিল শানের পালা। কিন্তু শান নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুতরাং মউলি যখন সদর দরজা খুলে ঘাস জমিতে পা দিল তখন কোনও সাক্ষী ছিল না।

মউলিকে গন্ধটা টানছিল অনেকটা নিশির ডাকের মতো। সেই ডাকে ও ভুলে গেল জিকোর কথা। তাছাড়া সাহসের অহঙ্কার ওকে বাড়ির ভেতরে ধরে রাখতে পারল না।

বাইরে হাওয়া বইছিল। মউলির নাইটি অবাধ্য হয়ে উড়ছিল। সেটা সামলাতে-সামলাতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল ও। কোথায় ওই আলোর ফুলকিগুলো?

বেশিক্ষণ ওকে খুঁজতে হল না। হঠাৎই ও ভীষণভাবে চমকে উঠল। ওর সারা শরীর পলকে অবশ হয়ে গেল।

কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপরে। কী অমানুষিক তার শক্তি!

মউলির শরীরটা লাট খেয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপরে। যন্ত্রণায় ও শিউরে উঠল। ধারালো নখে কেউ যেন চিরে ফালাফালা করে ফেলছে ওর দেহ। ওঃ!

মউলি চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু চিৎকার করার জন্য হাঁ করতেই একটা নরম থাবা যেন এঁটে বসল ওর মুখের ওপরে।

অন্ধকারের মধ্যে ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল কেউ। ওকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। একইসঙ্গে ওর রক্তাক্ত পোশাকগুলো কলার খোসার মতো ছাড়িয়ে নিতে চাইছিল।

মৃত্যুর মুহূর্তে মউলির ভীষণ ইচ্ছে করছিল এই শিকারিকে একবার দ্যাখে।

কিন্তু শিকারির বোধহয় দেখা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাই অন্ধকার যেন সত্যি-সত্যিই মউলিকে গ্রাস করল।

.

০৬.

হিস্টিরিয়ার রুগির মতো চিৎকার করছিল টুনটুনি। সে-চিৎকার কিছুতেই থামছিল না।

হারা, শান আর টনি সাধ্যমতো ওকে থামাতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। চোখ বড় বড় করে হাত-পা ছুঁড়ে পাগলের মতো চিৎকার করছিল ও, এ-বাড়িতে আমি আর একটা সেকেন্ডও থাকব না। আমাকে তোরা এক্ষুনি কলকাতায় নিয়ে চল।

সকালে টুনটুনিই প্রথম দ্যাখে যে, মউলি নেই। তারপর জিকোর মতো ওর খোঁজ শুরু হয়– টয়লেটে, ছাদে, একতলায়, সিঁড়ির নীচে কিন্তু কোথাও ওকে পাওয়া যায়নি।

তখন হারা, টনি আর শান্তনু বাইরে বেরিয়ে মউলিকে খোঁজার কথা বলে। কিন্তু টুনি বাড়িতে একা থাকতে চায়নি। তাই শান আর বেরোয়নি বাড়ি থেকে। হারা আর টনি কাজে

নেমে পড়েছে।

কোথা থেকে একটা লাঠি জোগাড় করেছিল টনি। আর হারা নিয়েছিল জিকোর হান্টিং নাইফ। এই দুটো অস্ত্র হাতে নিয়ে ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়েছিল ঘাস-জমিতে।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওরা মউলিকে পায়নি। তবে জিকোর মতোই মউলির চিহ্ন পেয়েছে।

পাওয়া গেছে ওর রক্তাক্ত পোশাক, আংটি আর একটা রিস্ট ব্যান্ড। এদিক-সেদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছিল।

সেগুলো হাতে নিয়ে হারা আর টনি বাড়িতে ঢুকতেই টুনির চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। শান, হারা, টনি, কেউই আর চোখের জল রুখতে পারেনি। মউলি এত হাসিখুশি, উচ্ছল ছিল যে, ওর চলে যাওয়াটা সবাইকেই ধাক্কা দিয়েছে। তাছাড়া পাহারা দিতে বসে ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারটা টনি, হারা আর শানকে অপরাধী করে রেখেছিল।

শান চোখের জল মুছে বলল, এইভাবে কি আমরা একে একে সবাই উধাও হয়ে যাব?

হারা চোয়াল শক্ত করে বলল, কিছুতেই না। ওদের আমরা খুঁজে বের করব। ফিরিয়ে আনব।

টনি সজল চোখে মাথা নাড়ল, বলল, না রে, ওদের বোধহয় আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে একটু চেষ্টা করলে মিস্ট্রিটা হয়তো সল্ভ করা যাবে। তাতে সুবিধে এই, ইন ফিউচার আর কেউ এভাবে...।

শান বলল, তুই মিস্ট্রি সলভ কর। আমি এ-বাড়িতে আর থাকতে চাই না। বাড়িটা অপয়া আমি আর টুনি বেরিয়ে পড়ছি। যদি আমরা কাল চলে যেতাম তা হলে এখন মউলি আমাদের সঙ্গে থাকত।

টনি ওর জায়গা ছেড়ে উঠে এল শানের কাছে। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, চমৎকার। বন্ধুর উপযুক্ত কথাই বটে! ও. কে., একটা প্রশ্নের জবাব দে দেখি। মউলির বাড়িতে গিয়ে তুই কোন মুখে আঙ্কল আর আন্টির সামনে দাঁড়াবি? যখন ওঁরা জিগ্যেস করবেন, মউলি কোথায়, তখন কী উত্তর দিবি? জিকোর বাড়িতে গিয়েও বা তুই কী উত্তর দিবি? এবার ব্যঙ্গের খোঁচায় ধারালো হল টনির গলা, বলবি যে ওরা জঙ্গলে উধাও হয়ে গেছে, তাই আমরা ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ডরপোক কঁহাকা!

এখানে আরও একটা রাত থেকে লাইফ রিস্ক কে নেবে? শান ঝঝিয়ে উঠল, তুই নিবি?

নেব। ঠান্ডা গলায় বলল টনি, কারণ, জিকো আর মলির যদি আমাদের ওপর কোনও দাবি থেকে থাকে তো সেটা হল, টু ফাইন্ড আউট হু ডিড ইট। নিজের বিবেককে জিগ্যেস করে দেখ, শান–এটা ওদের পাওনা। আজ জিকোর বদলে যদি তোর কিছু একটা হত, তা হলে কি আমরা চটজলদি পালিয়ে যেতাম? বুকে হাত রেখে বল তো, সেটা তোর ভালো লাগত?

কথা বলতে বলতে টনির চোখে জল এসে গিয়েছিল। মউলি আর জিকোর মুখটা ভেসে উঠছিল বারবার।

শান থমথমে আবেগে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। হঠাৎই ও টনিকে জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, বলল, তুই ঠিক বলেছিস। কাপুরুষ হলে আমাদের চলবে না।

হারা এগিয়ে এসে ওদের পিঠে হাত রেখে বলল, তাছাড়া আমরা এখনও তো হান্ড্রেড পারসেন্ট শিয়োর নই যে, জিকো আর মউলি মারা গেছে।

টুনির চোখেও জল এসে গিয়েছিল। দোটানায় ওর মনটা দুলছিল। আজ যদি মউলির জায়গায় ওর কিছু একটা হত, আর বাকি বন্ধুরা পালিয়ে যেত, তা হলে টুনির কি সেটা ভালো লাগত? মোটেই না।

শান, টনি আর হারা টুনটুনির কাছে এসে মেঝেতে বসে পড়ল।

টনি হাত নেড়ে ওকে বোঝাতে চাইল, শোন, টুনি, এটা বোঝা গেছে যে, বাড়িটা পুরোপুরি সেফ। বাড়ির ভেতরে থাকলে কোনও ভয় নেই, রাইট?

টুনি মাথা নেড়ে সায় দিল, আলতো স্বরে বলল, রাইট।

সুতরাং, তুই কোনও অবস্থাতেই এ-বাড়ির বাইরে বেরোবি না। তা হলে তোর আর কোনও বিপদের ভয় নেই।

টনির এই যুক্তিটা শানের ভালো লাগল।

টনি আবার বলতে শুরু করল, আমার নেক্সট পয়েন্ট হল, দিনের আলোয় গোটা জায়গাটাই সেফ। মানে, বাইরে বেরোলে ওইরকম মিস্টিরিয়াস অ্যাটাকের কোনও ভয় নেই। কী রে, হারা, ঠিক বলছি? শান, তোর কী মনে হয়?

ওরা তিনজনেই বুঝল, টনির লজিকে কোনও ফাঁক নেই।

হারা বলল, ঠিক বলেছিস।

শান সায় দিয়ে মাথা নাড়ল, কারেক্ট।

তা হলে আমরা এমন কোনও হান্টিং অ্যানিম্যালের খোঁজ করব, যে শুধু অন্ধকারে অ্যাটিভ–!

সব হান্টিং অ্যানিম্যালই তো অন্ধকারে অ্যাকটিভ. টুনটুনি বাদ সাধল টনির নতুন যুক্তিতে।

টনি হেসে বলল, তুই যাদের কথা বলতে চাইছিস তারা দিনের বেলাতেও অ্যাটিভ। তা ছাড়া বাঘ, নেকড়ে বা হায়েনা রোজ একটা করে মানুষ মারে না। আরও একটা ব্যাপার আছে : এ-বাড়ি থেকে রাতে মানুষ বেরোতে পারে এই পসিবিলিটির কথা ভেবে এইসব জন্তু জানোয়ার কখনও জঙ্গল ছেড়ে ঘাস জমিতে এসে ওয়েট করবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টনি, হাতে হাত ঘসে বলল, আসলে আমি বলতে চাইছিলাম এমন একটা হান্টিং অ্যানিম্যালের কথা যে দিনের বেলায় পুরোপুরি ইনঅ্যাকটিভ বুঝেছিস?

এবার ওরা টনির কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারল।

সত্যিই তো, এর আগে তো ওরা যুক্তি সাজিয়ে ব্যাপারটাকে এমন করে ভাবেনি!

শান জিগ্যেস করল, এখন আমরা কী করব?

টনি বলল, একটা টেস্ট আপাতত ভেবেছি। দিনের বেলা এই টেস্টটা করা যাবে না– তাই রাতে করত হবে।

কী টেস্ট? হারা প্রশ্ন করল।

তুই আর শান একটা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়। আশপাশের কোনও গ্রাম-টাম খুঁজে একটা মুরগি বা হাঁস কিনে নিয়ে আয়। রাতে ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে দেখব কী হয়…।

একথা শুনে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর শান ধীরে-ধীরে বলল, ও.কে.দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আর হারা বেরোচ্ছি। মনে হয়, হাঁস বা মুরগি পেয়ে যাব। না পেলে খরগোশ, পায়রা, বেড়ালছানা, যা তোক একটা কিছু নিয়ে আসব, তাই তো?

ইয়েস, টনি বলল, আর আমাকে সোমেশ চ্যাটার্জির বাকি পেপার্সগুলো স্টাডি করতে হবে– সেই সঙ্গে ল্যাবটাও–যদি কোনও ক্লু-টু পাওয়া যায়…।

টুনটুনি একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল, ওপরের ঘরটায় একা-একা থাকতে আমার বাজে লাগে। মউলির মেমোরি খুব হন্ট করছে...।

শান ওকে বলল জিনিসপত্র নিয়ে নীচে ওদের ঘরে চলে আসতে। আজ রাতে আর ঘুমোনোর ব্যাপার নেই কারণ, রাতে অনেক কাজ।

শানের কথায় টুনি খানিকটা ভরসা পেল। ও শানকে সঙ্গে করে দোতলার রওনা হল। যেতে যেতে অনুযোগের সুরে ও বলছিল, মোবাইল ফোনে কোনও কানেকশান পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে কেন যে কোনও টাওয়ার নেই কে জানে!

.

আকাশ আজও মেঘলা। গোটা আকাশে কেউ যেন ছাই রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। সেই ধূসর পটভূমিতে পায়চারি করছে আরও গাঢ় রঙের বাদল মেঘ।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল টনি। ভাবছিল, আজকের রাত আবার নতুন কোনও ঘটনা নিয়ে আসবে। ওরা চারজন যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। যে-বাসিন্দারা একে-একে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

টুনির ঘটনা শোনার পর গতকালই ছাদের টবগুলোকে পরীক্ষা করেছে টনি। সেখানে ও সাতটা গাছ পেয়েছে যাদের মধ্যে লজ্জাবতী লতার ক্যারেকটার আছে। মানে, গাছের পাতা কিংবা ফুলে হাত দিলেই গাছটা নড়াচড়া করে রেসপন্ড করে। আজ রাতে গাছগুলোর ক্যারেকটার খুঁটিয়ে দেখবে টনি। বলা যায় না, হয়তো নতুন কোনও সূত্রের হদিস পাওয়া যেতে পারে।

টনির সামনে টেবিলে ছড়ানো সোমেশ চ্যাটার্জির কাগজপত্র। এগুলো নিয়ে ও পাগলের মতো পড়াশোনা করছে–যেন সামনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। একটা উত্তর ওকে খুঁজে বের করতেই হবে–আজ রাতের মধ্যেই।

যতই পড়ছে ততই যেন ব্যাপারগুলো মাথায় ঢুকছে টনির। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা বলে বেশ কিছুটা অসুবিধে থেকেই যাচ্ছে।

হঠাৎই আলমারির একেবারে নীচের তাক থেকে একটা বড় বাঁধানো খাতা খুঁজে পেল টনি। খাতার বাঁধাইটা জীর্ণ হয়ে খুলে গেছে বলে খাতাটা লাল-সাদা সুতলি দিয়ে যোগচিহ্নের মতো করে বাঁধা। খাতার ধারগুলো পোকায় খেয়ে দিয়েছে।

ধুলো ঝেড়ে বাঁধন খুলতেই টনি বুঝতে পারল, খাতাটা আসলে একটা পাণ্ডুলিপি। মাংসাশী গাছ নামে বাংলায় একটা বই লিখতে শুরু করেছিলেন সোমেশবাবু।

লেখাটা খুব গোছানো নয়। খাপছাড়াভাবে নানান অংশ লিখে তারিখ দেওয়া। শেষ তারিখটা এক বছরেরও বেশ পুরোনো। সোমেশবাবু হয়তো ভেবেছিলেন, পরে মাঝের অংশগুলো লিখে পাণ্ডুলিপিটা সম্পূর্ণ করবেন, কিন্তু তার আর সময় পাননি।

টনি খাতাটা পড়তে শুরু করল। ওর চঞ্চল চোখ লাইনের পর লাইন ডিঙিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দরকারি জায়গায় চোখ পড়লেই ও থামছিল, ভালো করে পড়ে নিচ্ছিল সেই জায়গাগুলো।

...মাংসাশী গাছ পোকামাকড় বা ছোট-ছোট প্রাণী ধরে খায়, তবে অন্যান্য প্রাণীর মতো এরা শিকারকে সত্যি-সত্যি চিবিয়ে গিলে খায় না। বেশিরভাগ মাংসাশী গাছের ক্ষেত্রে একরকম রস নিঃসৃত হয়, যাকে পাঁচক রসের মতো ভাবা যেতে পারে। এই রস শিকারকে পচিয়ে-গলিয়ে দেয়। তারপর সেই গলিত পদার্থ গাছ শুষে নেয় নিজের শরীরে। কিছু কিছু মাংসাশী গাছে রস নিঃসরণের ব্যবস্থা নেই। ওরা শিকার ধরার পর তাকে পচানোর জন্য জীবাণুর ওপরে নির্ভর করে। অর্থাৎ শিকারকে মেরে ফেলার পর ওরা প্রাকৃতিক পচনের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর সেই গলিত পদার্থ শরীরে শুষে নেয়।

….অন্যান্য সবুজ গাছপালার মতো মাংসাশী গাছও নিজের খাদ্য নিজের শরীরে তৈরি করে। কিন্তু এ ছাড়াও শিকার ধরে কেন তারা বাড়তি খাদ্য সংগ্রহ করে সে-বিষয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্ট নয়। তবে অনেক সময় দেখা গেছে, কিছু কিছু প্রজাতির মাংসাশী গাছ এমন মাটিতে জন্মায় যেখানে নাইট্রোজেন ও গাছের অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলের ঘাটতি আছে। তারা শিকার ধরে খাদ্য সংগ্রহ করে এই অভাব মেটায়।

এরপর কয়েকটা পৃষ্ঠায় টনি দেখল, নানান প্রজাতির মাংসাশী গাছের কথা লেখা আছে। এই নামগুলো ও আগে একবার দেখেছিল। তবে এখানে X চিহ্ন দিয়ে কোনও গণের কথা বলা নেই।

গণের নামের পর বিভিন্ন প্রজাতির গাছের উদাহরণ দেওয়া আছে। যেমন, কলস উদ্ভিদ, সূর্যশিশির, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ, ব্লাডারওয়ার্ট ইত্যাদি।

পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এক জায়গায় ওর নজরে পড়ল শিকার ধরার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক।

..পোকামাকড়দের কাছে টেনে এনে ফাঁদে ফেলার নানারকম পদ্ধতি আছে। যেমন, সারাসেনিয়া, নিপেনথেস বা ডার্লিংটোনিয়া গণের বিভিন্ন রকম কলস উদ্ভিদের ফাঁদ পাতার ঢং বিভিন্ন হলেও ওদের মূল নীতি একটাই ও মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়িয়ে ওরা পোকামাকড়কে পাতার কাছে টেনে নিয়ে আসে। কলসির ভেতরে পোকা একবার পড়ে গেলে সে তেলা দেওয়াল বেয়ে উঠে আর বাইরে বেরোতে পারে না। তা ছাড়া ওই দেওয়ালে নিম্নমুখী সূক্ষ্ম রোঁয়া থাকে। এর ফলে ফাঁদে পড়া পোকার বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

সূর্যশিশিরের চামচের মতো বাঁকানো পাতায় থাকে অনেক শুঁড়। প্রতিটি শুঁড়ের ডগায় থাকে একফোঁটা করে আঠালো লালা। সূর্যের আলোয় এই লালা শিশিরবিন্দুর মতো চকচক করে। কোনও পোকা সূর্যশিশিরের পাতায় বসলেই ওই আঠায় জড়িয়ে পড়ে। আর সে বেরোতে পারে না।

বাটারওয়র্টের পাতার আকৃতি ডিমের মতো। রং হলদেটে সবুজ। এই পাতায় লালা মাখানো থাকে। কোনও পোকামাকড় একবার এই পাতায় বসলেই শেষ। সে ওই লালার আঠায় আটকে যায়, আর পাতাগুলো ভেতরদিকে গুটিয়ে গিয়ে তাকে বন্দি করে ফ্যালে। তখন আরও লালা বেরিয়ে আসে। তার একটু পরেই বেরিয়ে আসে পাঁচক রস।

মাংসাশী গাছ সাধারণত গন্ধ আর রং দিয়ে পোকামাকড়কে টানে। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনও আকর্ষণ পদ্ধতি আছে কিনা তা নিয়ে আজও গবেষণা চলছে।

সবচেয়ে বড় মাপের মাংসাশী গাছ পাওয়া যায় নিপেনথেস গণে। এই গাছগুলো দশ/পনেরো মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এরা পোকামাকড় ছাড়াও বড় মাপের শিকার ধরতে পারে। যেমন, ব্যাং। আবার কখনও কখনও পাখি বা ইঁদুর ধরেছে বলেও শোনা গেছে।

অনেক গাছের ফাঁদ কাজ করে চোখের পলকে। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যারা শিকার ধরে তারা হল ইউট্রিকুলারিয়া গণের মাংসাশী গাছ। এরা জন্মায় জলের তলায়। এক সেকেন্ডের তিরিশ ভাগের একভাগ সময়ে তারা শিকারকে ভেতরে টেনে নেয়।

প্রায় ছশোর বেশি মাংসাশী গাছের প্রজাতি এবং উপ-প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গেছে। আরও খোঁজ চলছে। তবে গত দু-দশক ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে যে-যুগান্তকারী গবেষণা চলছে তা হল জিন মিশ্রণের সাহায্যে নতুন-নতুন ধরনের মাংসাশী গাছ তৈরি করে তাদের যুদ্ধের কাজে লাগানো। গোপনে শত্রুবিনাশ করার জন্য এ-ধরনের গাছ খুবই জরুরি। আমার ধারণা, সাধারণ গাছের সঙ্গে মাংসাশী গাছের জিন মিশ্রণ ঘটিয়ে অলৌকিক ফল পাওয়া সম্ভব। যদি সেরকম কোনও গাছ কখনও তৈরি করা সম্ভব হয়, তা হলে সে হবে যুদ্ধের অপরাজেয়। শত্রু বুঝতেই পারবে না আঘাত কোনদিক থেকে আসবে, কখন আসবে।

খাতার শেষদিকের পৃষ্ঠাগুলো পড়তে-পড়তে টনি বেশ অবাক হয়ে গেল। ওর মনে পড়ল, গবেষণার কাগজপত্রগুলো ঘাঁটতে গিয়ে ও জিন, ক্লোনিং এই শব্দগুলো পেয়েছিল।

তা হলে কি সোমেশ চ্যাটার্জি নতুন ধরনের কোনও মাংসাশী গাছ তৈরির চেষ্টা করছিলেন? সেই অজানা গ্রুপের নাম দিয়েছিলেন X? চেষ্টা করতে করতে তিনি সত্যি-সত্যি সেরকম গাছ তৈরি করে ফেলেননি তো?

দোতলার ছাদের টবগুলোর কথা মনে পড়ল টনির। সেখানে এই নতুন গাছের নমুনা নেই। তো! কিন্তু নতুন গাছ যে, সেটাই বা টনি বুঝবে কেমন করে?

নানান চিন্তায় জড়িয়ে পড়ছিল টনি। সোমেশ চ্যাটার্জির পাণ্ডুলিপিটায় ও বারবার চোখ বোলাল। তারপর সব কাগজপত্র সরিয়ে রেখে চোখ বুজে চেয়ারে বসে রইল।

ও মনে-মনে জিকো আর মউলির কথা ভাবতে লাগল।

প্রথম প্রশ্ন, ওরা রাতের আঁধারে বাইরে কেন বেরোল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাইরে বেরোনোর পর কে কীভাবে ওদের আক্রমণ করল।

কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল টনি। একঘেয়েমি কাটাতে ও চলে এসেছিল দোতলার ছাদে। ওর পিছন পিছন টুনিও চলে এসেছিল দোতলায়। কারণ, হারা আর শান হাঁস মুরগির খোঁজে বেশ কিছুক্ষণ আগে বাইক নিয়ে বেরিয়েছে ফলে বাড়িতে এখন টনি ছাড়া ওর সঙ্গী আর কেউ নেই।

টুনির বারবারই মনে হচ্ছে, ওকে যেন কে পা টিপে টিপে অনুসরণ করছে। তাই ও সবসময় একটা আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে। টনি এ নিয়ে বেশ কয়েকবার ওকে ঠাট্টাও করেছে।

টনি উবু হয়ে বসে ছাদের টবগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আবার। ওর ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখের নজর তীক্ষ্ণ। জটিল কোনও প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে প্রাণপণে।

টুনটুনি বারবারই ওকে জিগ্যেস করছিল, কীরে, কিছু পেলি?

উত্তরে টনি মাথা নাড়ছিল। আর মনে-মনে ভাবছিল, ওই ছোট-ছোট গাছগুলোর মধ্যে আসল উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে কি না।

একটু পরেই বাইকের শব্দ ওদের কানে এল।

টুনটুনি দৌড়ে গেল ছাদের পাঁচিলের কাছে। দেখল, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘাম-জমির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে হারাদের মোটরবাইক। হারা চালাচ্ছে, আর শান পিছনে বসে আছে। ওর হাতে একটা মুরগি।

টনি উঠে এসেছিল পাঁচিলের কাছে। শানের হাতে মুরগিটা দেখতে পেল ও। সঙ্গে সঙ্গে ও আজ রাতের চরম পরীক্ষাটার কথা ভাবতে শুরু করল।

.

০৭.

ঘড়ির কাঁটা রাত দশটার ঘরে পৌঁছতেই ওরা চারজন তৈরি হয়ে নিল।

সন্ধের পর থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখন বৃষ্টির তেজ না বাড়লেও বজ্রপাতের তেজ বেড়েছে। আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠছে সাদা তরোয়াল।

টনি, হারা, শান আর টুনি সাবধানী পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে চলল সদর দরজার দিকে। ওদের সঙ্গে রয়েছে বেচারি নিরীহ মুরগিটা। কঁক কঁক শব্দ করছে।

মুরগিটার পায়ে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা। দড়ির অন্য প্রান্তটা হারার হাতে। আর টনির হাতে টর্চ।

টনি সবাইকে হাত নেড়ে বোঝাচ্ছিল, ও ঠিক কী করতে চায়।

রাত আর-একটু বাড়লে আমরা মুরগিটাকে বাইরের ঘাসের মধ্যে ছেড়ে দেব। তারপর ওয়াচ রাখব, কেউ ওটাকে অ্যাটাক করে কি না। যেই অ্যাটাক করবে সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বাইরে লাইটটা জ্বেলে দেব। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম টর্চ মারব মুরগিটার গায়ে…তা হলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

বাড়ির সদর দরজার বাইরে একটা ল্যাম্প হোলডার লাগানো ছিল, কিন্তু তাতে কোনও বাল্ব ছিল না। আজ বিকেলে দোতলার ঘর থেকে একটা বাল্ব খুলে নিয়েছে টনি। তারপর হারার কোলে উঠে অনেক কসরত করে সেই বাল্বটা লাগিয়ে দিয়েছে সদর দরজার বাইরের হোলডারটায়। সুইচ অন-অফ করে দেখে নিয়েছে বাল্বটা ঠিকমতো জ্বলছে নিভছে কিনা। বাল্বটা জ্বলে উঠলে বাইরের ঘাস জমির অনেকটা জায়গায় আলো ছড়িয়ে পড়ছে যদিও সেই আলোর তেজ তেমন বেশি নয়।

ওরা সদর দরজার কাছে অলিন্দের মেঝেতে বসে পড়ল। সামনে টনি আর শান, পিছনে হারা আর টুনটুনি। মুরগিটা ওদের কাছ ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ওটার পায়ে বাঁধা দড়ির খোলা মাথাটা হারা বেঁধে দিয়েছে সদর দরজার একটা কড়ায়।

বাড়ির সব আলো ওরা আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল। এখন টনির কথায় টুনটুনি উঠে গিয়ে অলিন্দের আলোটাও নিভিয়ে দিল।

ওদের চোখের সামনে হঠাৎ করে অন্ধকার নেমে এল। অন্ধকার হতেই মুরগিটা চুপ করে গেল।

টনি টর্চটা কয়েকবার জ্বেলে টেস্ট করে নিল।

তারপর শুরু হল অপেক্ষা।

টুনটুনি হারার জামা খামচে ধরে বসেছিল।

হারা ওকে বলল, এত ভয় পাওয়ার কী আছে বল তো!

টুনি বলল, ভয়ে নয়–এমনি।

হারা কোনও জবাব দিল না।

শান টনিকে জিগ্যেস করল, আমরা কতক্ষণ ওয়েট করব রে?

টনি বলল, সেটাই তো বোঝা মুশকিল। দেখা যাক সিচুয়েশান কী হয়...।

একটু পরেই অন্ধকারে ওদের চোখ সয়ে এল। বাইরের ঘাসের শিষ আবছা দেখা যাচ্ছিল। তার ওপরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ পাচ্ছিল ওরা।

চারপাশ নিস্তব্ধ হওয়ায় ওদের কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। টুনটুনি তো একবার বলেই ফেলল, হুট করে বাঘ কিংবা নেকড়ে এসে পড়লে কী হবে?

টনি শান্ত গলায় বলল, টর্চের আলো ফেললেই ওরা ভয় পেয়ে থেমে যাবে। তখন চট করে দরজা বন্ধ করে দিলেই হবে।

শান টুনটুনিকে সাহস দিতে হালকা গলায় গান ধরল।

টনি আর হারা তাকিয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। কাল রাতের মতো আজ কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। রাত যত গভীরই হোক, সজাগ থাকতে হবে।

সময় কাটানোর জন্য টনি হারাদের সোমেশ চ্যাটার্জির গবেষণার কথা বলছিল। বলছিল অদ্ভুত সব মাংসাশী গাছের কথা।

একসময় টনি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর ওরা চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

একঘেয়েভাবে অপেক্ষা করতে করতে ঘড়ি দেখতেও ভুলে গেল ওরা। বারবার চোখ টেনে আসতে চাইল, কিন্তু জিকো আর মউলির কথা ভেবে ওরা ঘুম তাড়াল। কয়েকবার উঠে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এল।

রাত তখন কত কে জানে! টনি চোখ পুরোপুরি আর খুলে রাখতে পারছিল না। হঠাৎই ওর নাকে একটা গন্ধ এল। মনে হল, নাম-না-জানা কোনও মিষ্টি পারফিউম যেন কেউ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে।

টনি নড়েচড়ে বসল। শান আর হারাকে ঠেলা মারল। ফিসফিসে গলায় ডাকল, অ্যাই, শান! হারা!

শানের একটু তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল। টনির ধাক্কায় ও চটপট সোজা হয়ে বসল।

হারা জেগেই ছিল। বলল, একটা গন্ধ পাচ্ছিস?

পাচ্ছি। ফিসফিস করে বলল শান।

হারা বলল, অ্যাই, টুনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

শান বলল, ওকে আর ডাকিস না ঝামেলা বাড়বে।

গন্ধটা বাড়ছিল। সেই গন্ধে ওদের মেজাজটা দারুণ চনমনিয়ে উঠল। কিন্তু এতক্ষণ এই গন্ধটা ছিল কোথায়? তা হলে কি ওই ঘাসের আড়ালে নতুন কোনও ফুল ফুটেছে এই মাঝরাতে?

শান একটা ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা বাড়াতে গেল সামনে।

ধাক্কা মেরে ওকে পিছনে ঠেলে দিল টনিঃ কী করছিস পাগলের মতো! ফিসফিসে গলায় ও ধমকে উঠল।

হারা শানের হাত চেপে ধরল।

ওটা-ওটা কীসের গন্ধ? শান শিশুর মতো গলায় প্রশ্ন করল।

ওটা বিপদের গন্ধ। জবাব দিল টনি।

ঠিক তখনই ওর নজরে পড়ল, ঘাসের শিষের ফাঁকফোকর দিয়ে দু-একটা রঙিন আলোর বিন্দু যেন দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিতে বাতাসে ঘাসের শিষগুলো নড়ছে বলে থেকে-থেকেই আলোর ফুটকিগুলো আড়াল হয়ে যাচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে যেন জ্বলছে আর নিভছে।

আলোর ফুটকিগুলো ঠিক যেন কলকাতার রাস্তায় গেঁথে দেওয়া ডিভাইডারের আলোর মতো। মিটমিট করছে।

টনি উঠে দাঁড়াল। বলল, তোরা চুপচাপ এখানে থাক, আমি দোতলার ছাদ থেকে কেসটা একবার ভালো করে দেখে আসি। ভুলেও জায়গা ছেড়ে নড়বি না। মনে রাখবি, জিকো আর মউলি কিন্তু ফেরেনি। আমি যাব আর আসব।

টনি টর্চ হাতে করে রওনা হল দোতলার সিঁড়ির দিকে।

ওর সামান্য গা-ছমছম করছিল, কিন্তু ও জানে, বাড়ির ভেতরের চেয়ে বাইরের ভয় অনেক বেশি।

দোতলার ছাদে এসে অবাক হয়ে গেল টনি। এখানেও সেই আলো!

ছাদের যেদিকটায় থরেথরে টব সাজানো সেদিকটায় জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই কয়েকটা আলোর বিন্দু তারার মতো মিটমিট করছে।

এ-দৃশ্য টনি আগে কখনও দেখেনি। তাই ও অবাক হয়ে রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাবছিল, কোন গাছটা এই দেওয়ালি উৎসব শুরু করেছে।

ঘোরলাগা গন্ধটা টনির নাকে এখনও আসছিল। গন্ধটা যেন ওকে আয়, আয় বলে টানছিল।

বোধহয় সেই টানেই ও ছাদের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। কারণ, গন্ধের বেশিরভাগটাই সেদিক থেকে ঢেউয়ের মতো ভেসে আসছিল।

ছাদের পাঁচিলের ওপর দিকে ঝুঁকে পড়ল টনি। আর তখনই ও অসংখ্য আলোয় বিন্দু দেখতে পেল।

টনির ভেতরে একটা প্রবল কৌতূহল আর টান কাজ করতে শুরু করল। কী রয়েছে ওই ঘাস জমির মধ্যে?

অদ্ভুত এক তাড়াহুড়ো নিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলল টনি। তারপর সাবধানে পা ফেলে সিঁড়ি নামতে লাগল। এই দু-তিনদিনে বাড়ির বেখাপ্পা সিঁড়িগুলো ওর তেমন মুখস্থ হয়ে ওঠেনি।

একতলায় সদর দরজার কাছে যখন এল তখন ও সামান্য হাঁপাচ্ছে। দেখল টুনটুনি এর মধ্যে জেগে উঠেছে। ওকে দেখতে পেয়েই জিগ্যেস করল ওপর থেকে কী দেখলি?

ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে ছোট ছোট আলো জ্বলছে...অনেক আলো...ওইরকম...। আঙুল তুলে বাইরের অন্ধকারে জ্বলে ওঠা কয়েকটা আলোর বিন্দুর দিকে দেখাল টনি।

হারা চাপা গলায় বলল, এদিকে কী ঝামেলা বল তো! শান বারবার বাইরে যেতে চাইছে...আমি কোনওরকমে ঠেকিয়ে রেখেছি...।

শান অনুযোগের সুরে বলল, কেন, বাইরে গিয়ে ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করলে ক্ষতি কী?

টনি শান্ত গলায় বলল, তা হলে তুই হয়তো আর ফিরে আসবি না—জিকো আর মউলির মতো...।

শান সঙ্গে-সঙ্গে দমে গেল। ওর চেতনা বোধহয় ফিরে এল।

টনি ভাবল, এবারে মুরগিটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে দেখা যাক কী হয়।

আর ঠিক তখনই বাইরে ঘাসের জটলা থেকে একটা চাপা সপসপ শব্দ ভেসে এল। হারার ভাষায় যে-শব্দ ভেজা মাটিতে চাবুক মারার মতন।

টনি আর দেরি করল না। হারাকে বলল, শিগগির মুরগিটাকে তুলে এনে ছুঁড়ে দে বাইরে!

টনি আন্দাজে ভর করে টর্চের আলো ফেলল মুরগিটার গায়ে। হারা চোখের নিমেষে মুরগিটার কাছে পৌঁছে গেল। এক ঝটকায় ওটাকে তুলে নিল। তারপর সদর দরজার কাছে এসে ওটাকে বাইরে ছুঁড়তে যাবে, অমনি টনি চেঁচিয়ে উঠল, বেশি দূরে ছুড়বি না। পাঁচ-ছহাতের মধ্যে...।

হারা মুরগিটাকে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারের মধ্যে।

ডানা ঝাপটে কঁক কঁক করে ডেকে উঠল মুরগিটা। শূন্যে টাল খেয়ে ঘাসের মাঝে গিয়ে পড়ল।

আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চূড়ান্ত ঝটাপটি—যেন হিংস্র মোরগ-লড়াই চলছে।

অদৃশ্য কোনও শত্রুর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করছিল মুরগিটা। অন্তত শব্দ শুনে তাই মনে হচ্ছিল।

টনি চেঁচিয়ে বলল, শান, শিগগিরই বাইরের লাইটটা জ্বেলে দে—।

শান একলাফে সুইচের কাছে গিয়ে বাইরের লাইট জ্বালার আগেই টনির টর্চের আলো গিয়ে পড়েছে মুরগিটার ওপরে।

সবুজ সাপের মতো ওগুলো কী কিলবিল করছে মুরগিটার গায়ে।

কেঁচোর মতো সরু অসংখ্য লাউডগা সাপ যেন ঘেঁকে ধরেছে অসহায় মুরগিটাকে। মুরগিটা কর্কশ গলায় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

টুনটুনি ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল।

দু-তিন সেকেন্ড পরেই জ্বলে উঠল বাইরের আলোটা। সঙ্গে-সঙ্গে কিলবিলে সাপগুলো মুরগিটাকে ছেড়ে লাটাইয়ের সুতো গোটানোর মতো সড়সড় করে ঢুকে গেল মাটির ভেতরে।

দড়ি টেনে মুরগিটাকে কাছে নিয়ে আয়– চেঁচিয়ে বলল টনি।

হারা সঙ্গে-সঙ্গে দড়ি ধরে টান মারল। ঘাসের শিষ নুইয়ে দিয়ে মুরগিটার কাহিল শরীর ওদের দিকে খানিকটা এগিয়ে এল। ফলে চলে এল আলোয় কাছাকাছি।

পারফিউমের গন্ধটা এখন আরও তীব্রভাবে নাকে আসছিল।

টনি আর হারা সামনে ঝুঁকে পড়ে মুরগিটাকে ভালো করে দেখল।

বেচারি এখনও বেঁচে আছে। থরথর করে কাঁপছে ওর দেহ। ওর সাদা আর হালকা বাদামি পালকে রক্ত লেগে আছে।

সরু-সরু সাপের মতো ওগুলো কী? টুনি কাঁপা গলায় জানতে চাইল। আঙুল তুলে দেখাল বাইরের ঘাসের দিকে।

টনি বলল, মনে হচ্ছে গাছ, মাংসাশী গাছ। ওরা...ওরা...ওদের গায়ে ছোট-ছোট রোঁয়া ছিল...।

গাছগুলো মাটির ভেতরে ঢুকে গেল কেন? হারা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

জানি না...। টনি নিজেও এই ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়েছিল। ও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল মুরগিটার দিকে।

শান ভয় পাওয়া টুনিকে ভরসা দিচ্ছিল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। টনির উত্তর শুনে বলে উঠল, আর এক্সপেরিমেন্ট করে কাজ নেই। চল, দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যাই। কাল সকাল হলেই...।

টনি আনমনাভাবে বলল, একমিনিট, শান, একমিনিট। একটা আইডিয়া এসেছে। এটাই লাস্ট এক্সপেরিমেন্ট প্লিজ।

কী এক্সপেরিমেন্ট? হারা জিগ্যেস করল।

শান বিরক্তির একটা শব্দ করল মুখে।

টনি বলল, কী এক্সপেরিমেন্ট এখনই দেখতে পাবি। শান, লাইটের সুইচটা তোকে আর-একবার অফ করতে হবে।

অন্ধকারেই ঠোঁট ওলটাল শান। তারপর হাত বাড়িয়ে বাইরের আলোয় সুইচটা অফ করে দিল।

টনি দরজার প্রায় চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। শান বাইরের আলোটা নেভানোর সঙ্গে-সঙ্গে ও টর্চটা নিভিয়ে দিল।

আবার অন্ধকার নেমে এল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল সপসপ শব্দ। সেই সঙ্গে পারফিউমের মন কেড়ে নেওয়া গন্ধটা নেশা ধরিয়ে দিতে চাইল।

আর তখনই শোনা গেল মুরগিটার কঁক কঁক চাপা ডাক। সঙ্গে দুর্বলভাবে ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

টনি টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল মুরগিটার দিকে। চেঁচিয়ে শানকে বলল, শিগগির আলো জ্বেলে দে!

বাইরের আলোটা জ্বলে উঠতেই স্পষ্টভাবে সব দেখা গেল।

হিলহিলে সরু সাপগুলো আবার মুরগিটাকে সাপটে ধরেছে। কিন্তু আলো জ্বলে ওঠামাত্রই ওরা নিস্তেজ হয়ে গেল যেন। সড়সড় করে আবার ফিরে গেল মাটির ভেতরে।

হারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, এসব কী অ্যাবসার্ড ব্যাপার দেখছি!

শান আর টুনি চলে যাচ্ছিল ভেতরে। টনি ওদের ডেকে থামাল। তারপর তিনজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা আরও একবার চালাল-তবে অন্তত মিনিট দশেক পর।

এবারে আলো জ্বলতেই শুধু মুরগির রক্তমাখা পালক চোখে পড়ল–এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পালক ছাড়ানো মুরগিটার আর কোনও চিহ্ন নেই।

মউলি আর জিকোর কথা মনে পড়ল ওদের। রক্তমাখা জামাকাপড়, আংটি আর রিস্টব্যান্ড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

ওদের গায়ে কাঁটা দিল।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টিভেজা ঘাস-জমির দিকে তাকিয়ে ওদের এই প্রথম বিশ্বাস হল, জিকো আর মউলি আর কখনও ফিরবে না।

ওদের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে ওরা চলে এল বাড়ির ভেতরে।

টনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বলল, সাপের মতো ওই শুঁড়গুলো মানে, গাছগুলো, নকটার্নাল।

নকটার্নাল মানে? জানতে চাইল হারা।

নিশাচর। বলল, টনি, ওই গাছগুলো নকটার্নাল কার্নিভোরাস প্লান্ট। নিশাচর মাংসাশী গাছ।

একটু চুপ করে থেকে সকলের মনের ভাবনাটা মুখে উচ্চারণ করল টনি, জিকো আর মউলিকে হায়েনা, নেকড়ে কিংবা বাঘ নয়–এই ভয়ংকর গাছগুলোই শেষ করেছে…।

.

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল হারার।

খোলা জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে। বৃষ্টি নেই, তবে আকাশ বিষণ্ণ।

পাশে তাকিয়ে দেখল শান আর টনি নেই। বোধহয় গোছগাছের জন্য আগেই উঠে পড়েছে। কারণ, আজ ওদের চলে যাওয়ার দিন।

হঠাৎই হারার কান্না পেয়ে গেল। বুকের ভেতরটা ভার হয়ে গেল। মউলি আর জিকো আগেই চলে গেছে। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

টুনটুনি চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখ ভার। চোখ ভেজা।

হারা চুপচাপ ওকে দেখল। ও হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। সবকিছু বুঝতে শিখেছে।

কাল রাতে টনির ওই ভয়ংকর পরীক্ষার আগে পর্যন্ত ওদের মনে একটা আবছা বিশ্বাস ছিল, জিকো আর মউলি ফিরে আসবে। তাই দুঃখের অন্ধকারের মধ্যেও একবিন্দু আশার আলো ছিল।

এখন আলো নিভে গেছে।

টুনির হাত থেকে চায়ের কাপ নিল হারা। চুমুক দিল।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল টনি আর শান। শানের হাতে একটা ছোট হাতব্যাগ।

টনি বলল, হারা, আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়েনে। দেরি করলে বৃষ্টিতে ফেঁসে যেতে পারি। আমি আর শান চটপট সব গুছিয়ে নিচ্ছি–তুই আয়।

টনির কথায় প্রাণের ছোঁয়া ছিল না। ওর কথাগুলো অনেকটা যন্ত্রস্বরের মতো শোনাল।

হারা বলল, যা, যাচ্ছি– ।

বাইরের ঘরে এসে ছড়ানো জিনিসপত্রে আবার হাত লাগাল শান আর টনি। টুনটুনিও এসে ওদের সাহায্য করতে লাগল।

টনির হঠাৎ মনে হল, সোমেশ চ্যাটার্জির কাগজপত্রগুলো ও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাতে পুলিশি তদন্তের হয়তো সুবিধে হবে। এখানে কাগজপত্রগুলো ফেলে রেখে গেলে হারিয়ে যাওয়ার কিংবা নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে।

ও শানকে সেকথা বলতেই শান জোর গলায় সায় দিল : অফ কোর্স! এখানে ফেলে রেখে যাওয়ার রিস্ক নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

সুতরাং টনি ওর কাজ শুরু করল।

পাশের ঘর থেকে সোমেশ চ্যাটার্জির বিছানার একটা চাদর নিয়ে এল টনি। সেটার ধুলো ঝেড়ে পেতে নিল মেঝেতে। তারপর গবেষণার কাগজপত্রের তাড়া একে-একে সাজিয়ে রাখতে লাগল চাদরের ওপরে।

এদিকে হারা এসে টুনি আর শানের সঙ্গে গোছানোর কাজে হাত লাগিয়েছে। ওরা ওদের মনে কাজ করছিল, আর টনি টনির মনে।

পাণ্ডুলিপিটাও তুলে নিল টনি। রাখল কাগজপত্রের সঙ্গে। তারপর আর কোনও দরকারি কাগজ আছে কি না সেটা ভালো করে দেখার জন্য টেবিলটাকে ও টেনে সরাল। হাট করে খুলে দিল আলমারির দরজা। দেখল, একেবারে নীচের তাকে বেশ কিছু কাগজের তাড়া রয়েছে।

নাকে হাত চাপা দিয়ে ধুলোমাখা কাগজপত্রগুলো ঘাঁটতে লাগল টনি। তার মধ্যে থেকে বেছে কয়েকটা কাগজের গোছা তুলে নিল।

ঠিক তখনই ওর চোখে পড়ল ডায়েরিটা।

গাঢ় বাদামি রেক্সিনে মোড়া বড় মাপের ডায়েরি। তার মলাটের কোনাগুলো ধাতুর পাতে বাঁধানো।

ডায়েরিটা সোমেশ চ্যাটার্জির—প্রথম পাতায় নাম লেখা আছে।

ওটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা ওলটাল টনি। দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল। ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ডায়েরিটা পড়তে-পড়তেই ও আন্দাজে হাত বাড়াল চেয়ারের দিকে। চেয়ারটা খুঁজে পেয়ে তাতে বসে পড়ল। তারপর একমনে পাতার পর পাতা উলটে চলল।

টনির বিমূঢ় অবস্থাটা প্রথম খেয়াল করল হারা। ও টনির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, কী রে, কী হল তোর? হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেলি কেন?

টনি তাকাল হারাদের দিকে। ওর চোখে বিভ্রান্ত ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি।

হাতের কাজ ফেলে টুনি, হারা আর শান প্রায় ছুটে চলে এল টনির কাছে। তাকাল ওর হাতে ধরা ডায়েরিটার দিকে।

কী ব্যাপার বল তো? শান জিগ্যেস করল।

টনি আলতো গলায় বলল, এই ডায়েরিটার সোমেশ চ্যাটার্জি সব লিখে গেছেন। আমাদের এখনই এ-বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এই বাড়িটা একটা ফাঁদ। যদি আমরা এখানে আরও কদিন থেকে যাই, তা হলে আমরাও একে-একে জিকো আর মউলির মতো হারিয়ে যাব। সোমেশ চ্যাটার্জিও বোধহয় এইভাবে হারিয়ে গেছেন। কার্নিভোরাস প্লান্ট এক্স সবাইকে খতম করে দিয়েছে।

হারা ঝুঁকে পড়ল ডায়েরিটার ওপরে ও এসব কী বলছিস!

ঠিক বলছি। ডায়েরিটা পড়–সব কোশ্চেনের আনসার পেয়ে যাবি...।

ওরা তিনজন ঝুঁকে পড়ল টনির ঘাড়ের ওপরে। টনির বেছে দেওয়া জায়গাগুলো পড়তে লাগলঃ

অবশেষে আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হতে চলেছে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে। কার্নিভোরাস প্লান্টের একটা নতুন গণ বোধহয় আবিষ্কার করতে পেরেছি আমি–জেনাস এক্স। এই নতুন লতানে গাছটা মাপে বেশি বড় নয়, তবে এর শুঁড়গুলো সরু হলেও বেশ শক্ত। সহজে ছেঁড়া যায় না।

এই লতানে গাছটা মানুষের কী উপকারে লাগবে জানি না। তবে সব আবিষ্কার তো মানুষের উপকারের কথা ভেবে হয় না। আবিষ্কার হয়ে যায় সায়েন্টিস্টদের কৌতূহলের টানে। যেমন, মাংসাশী গাছ নিয়ে গবেষণা আমাকে চিরকাল টেনেছে। তাই এক্সকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি চালিয়ে যাব।

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম।

প্লান্ট এক্সটা বোধহয় সাবালক হয়ে উঠেছে। কারণ, আগে আমিই ওকে নিয়ম করে পোকামাকড় ধরে দিতাম। সেটা দেওয়ামাত্রই ও শুঁড় দিয়ে পোকাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরত। তারপর সেটার প্রাণরস শুষে নিত। ওর শুঁড়ের মধ্যে ছোট-ছোট সাকার আছে–যেগুলো দিয়ে চোষা যায়। তা ছাড়া ওর শরীর থেকে যে-ডাইজেস্টিভ জুস বেরোয় সেটার অ্যাসিডিটি বেশি–পিএইচ ভ্যালু সাতের চেয়ে অনেক কম–প্রায় চারের কাছাকাছি। ফলে খুব তাড়াতাড়ি শিকারকে হজম করে ফেলতে পারে প্লান্ট এক্স।

কিন্তু আজ একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার দেখলাম।

একটা ছোট্ট প্রজাপতি উড়তে উড়তে গাছটার কাছে এসেছিল। লতানে গাছটার দুটো শুঁড় আচমকা উড়ন্ত প্রজাপতিটাকে বিদ্যুতের মতো ছোবল মারল। তারপর চোখের পলকে সাপটে ধরল ওটাকে। এবং সাকারগুলো তাদের কাজ শুরু করে দিল।

ঘটনাটা আমাকে অবাক করেছে। না, ওর শিকার ধরা নয়। বরং সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হল, এক্স বুঝল কেমন করে যে, প্রজাপতিটা উড়তে-উড়তে ওর নাগালের মধ্যে এসেছে!

যা ভেবেছিলাম তাই।

এক্স-এর মধ্যে ইনফ্রারেড ওয়েভ সেন্সর আছে–টিভির রিমোট সেন্সিং এর মতো। কোনও পোকামাকড় বা প্রজাপতি এক্স-এর কাছাকাছি এলে তাদের শরীরের তাপ-তরঙ্গ

এক্স টের পায়। ওর শুঁড়ের গায়ে যে সূক্ষ্ম রোঁয়া আছে সেগুলো সেই অবলোহিত তরঙ্গ অনুভব করতে পারে। তারপর শুঁড়গুলো শিকার ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শিকার ধরার এই মারমুখী ধরন দেখে এক্সকে মাংসাশী গাছ না বলে যোদ্ধা গাছ বা ওয়ারিয়র প্লান্ট বললেই বোধহয় বেশি মানায়। মাংসাশী গাছের ইতিহাসে এরকম হিংস্র গাছের কোনও নজির নেই।

আজ এক্স একটা চড়ুই পাখি ধরেছে।

পদ্ধতি সেই একই প্রজাপতিটার মতন। আচমকা ছোবল। জড়িয়ে ধরা। খতম।

ওর শুঁড়গুলো আগের চেয়ে মোটা হয়েছে। লম্বাও। এখন শুঁড়গুলোর ডায়ামিটার আড়াই মিলিমিটার। আর লেংথ তিন ফুট মতন।

একটু পরেই চড়ুই পাখিটার শুধু পালকগুলো পড়ে রইল। বাকিটা এক্স খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আমি ওকে এখনও স্টিমুল্যান্ট আর এক্সাইটার ইনজেক্ট করে যাচ্ছি। কেমিক্যালের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ইত্যাদির জোগান দিয়ে যাচ্ছি। আমি চাই, এক্স রাতেও ওর অ্যাকটিভিটি বজায় রাখুক। কারণ, রাতে অ্যাকটিভ না হলে এক্স শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে পারবে না। আর যদি সত্যি-সত্যিই ও সেরকমভাবে অ্যাকটিভ হয় তা হলে ওকে রোখা মুশকিল হয়ে পড়বে।

এক্স রাতে অ্যাটিভ হতে পেরেছে।

কাল রাতে ও একটা ইঁদুর ধরেছে।

আমি পাশের ঘরটাতেই ছিলাম। অন্য টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত থাকলেও মন পড়েছিল ছাদের দিকে।

হঠাৎই একটা চি-চি গোছের চাপা শব্দ পেয়েই টর্চ নিয়ে ছুটে গেছি ছাদে। আলো ফেলেই দেখি এক্স একটা নেংটি ইঁদুরকে জড়িয়ে ধরেছে।

আলো পড়তেই এক্স-এর শুঁড়গুলো কেমন যেন থমকে গেল। তারপর বেশ ধীরে ওর কাজ শুরু করল।

কিন্তু আমি টর্চের আলো নিভিয়ে দিতেই এক্স-এর কাজের গতি আবার বেড়ে গেল।

আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোয় এক্স-কে আমি পর্যবেক্ষণ করে চললাম।

শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, আলো পড়লেই এক্স কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। আর অন্ধকার হলেই ও চঞ্চল, চনমনে হয়ে উঠছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ইঁদুরটা শেষ হয়ে গেল।

তা হলে কি এক্স-এর মধ্যে নকটার্নাল ক্যারেকটার ডেভেলাপ করছে? বুঝতে পারছি, আমার ইনজেকশান চালিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবে না।

..আজ মন খুব খারাপ।

কারণ, এক্স বোধহয় মারা যাবে—আর ঠেকানো যাবে না।

ওর পাতা, শুঁড়, সব শুকিয়ে বাদামি হয়ে গেছে। শত চেষ্টা করেও আমি কিছু করতে পারছি না। আমার এতদিনের পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াল।

এক্স আর নেই। আমি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছি। ওকে নিয়ে লেখা আমার রিসার্চ পেপারটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছিল, এখন সেটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। ভেবেছিলাম, এই আবিষ্কারের কথা সারা দুনিয়াকে বেশ ঘটা করে জানাব। তারপর আমাকে নিয়ে কত

হইচই হবে সারা পৃথিবী জুড়ে। সমস্ত আশায় এখন ঠান্ডা জল পড়ে গেল। ওই টবটার দিকে তাকিয়ে আমার কান্না পাচ্ছে।

অবাক কাণ্ড! এক্স আবার শিকার ধরেছে কিন্তু কীভাবে জানি না। কারণ, আজ সকালে দেখি এক্স-এর টবের মাটির ওপরে সবুজ রঙের পাখির পালক পড়ে আছে। পালকের রং দেখে মনে হল পাখিটা বসন্তবৌরী। কিন্তু পাখিটাকে মারল কে? আর তার দেহটাই বা কোথায় গেল?

যদি বেড়াল পাখিটা মেরে থাকে তা হলে পালকগুলোকে এত গুছিয়ে রেখে যেতে পারত না।

তা হলে কে?

এক্স-এর পাশের কোনও টব থেকে কোনও মাংসাশী গাছ এই অপকীর্তি করেনি তো? জানি না, এক্স-এর মধ্যে কোনও ছোঁয়াচে জীবাণু আছে কি না।

ভাবলাম, রাতে একটা পরীক্ষা করে দেখব।

রাত দশটা নাগাদ একটা ব্যাং নিয়ে ছাদে এলাম। এসে বেশ একটু অবাক হলাম। এক্স-এর টবের দিকটায় অন্ধকারে কয়েকটা আলোর ফুটকি দেখতে পেলাম। রঙিন আলোর বিন্দুগুলো স্থির হয়ে স্কুলে আছে। সেইসঙ্গে একটা গন্ধও আমার নাকে এল। গন্ধটা মিষ্টি পারফিউমের গন্ধের মতন। কেমন যেন নেশা ধরিয়ে টানছে।

আমি টবটার কাছে গেলাম। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম। হ্যাঁ, এক্স-এর টবেই জ্বলছে আলোগুলো। আর গন্ধটাও মনে হল একটু জোরালো। কিন্তু এক্স তো এখন নেই। শুধু ভেজা মাটি পড়ে আছে।

আমি আর দেরি না করে ব্যাংটাকে টবের মাটিতে ছেড়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে, বলতে গেলে চোখের পলকে, এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

আমি চাঁদের আলোয় সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, তবে আবছাভাবে। তা সত্ত্বেও ঘটনাটা দেখতে কোনও অসুবিধে হল না। আমি পাথর হয়ে গেলাম।

এ কী দেখছি আমি!

ব্যাংটাকে টবের মাটির ওপরে ছাড়ামাত্রই কয়েকটা শুঁড় মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এল। চাবুকের মতো শিস তুলে জড়িয়ে গেল ব্যাংটার শরীরে। ব্যাংটাকে দেখতে হল অনেকটা সুতো জড়ানো লাটাইয়ের মতো। তারপর পাঁচ-দশ সেকেন্ডের মধ্যেই সব শেষ। ব্যাং উধাও হয়ে গেল। শুঁড়গুলো সড়সড় করে ফিরে গেল গর্তে।

ঘটনাটা আমাকে হতবাক করে দিলেও আনন্দ পেলাম এই কথা ভেবে যে, আমার পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত তা হলে পণ্ডশ্রম হয়নি।

..গত কয়েকদিন আমার চিন্তা-ভাবনা কেমন যেন জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এ কোন মারাত্মক গবেষণায় জড়িয়ে গেলাম আমি।

এ কটা দিন আমি রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। বিবেকের তাড়নায় শুধু ছটফট করেছি। আমি কি আমার গবেষণা এখানেই থামিয়ে দেব, না কি আরও এগিয়ে নিয়ে যাব?

শেষপর্যন্ত আমার কৌতূহল জিতেছে। অথবা বলা ভালো, বিজ্ঞান জিতেছে।

এক্স-কে নিয়ে আমি আরও কয়েকবার পরীক্ষা চালালাম। ব্যাং, ইঁদুর, টুনটুনি পাখি এসব ছেড়ে দিয়ে দেখলাম।

দেখলাম, ফলাফল সেই একই। তবে শিকার ধরার সময় আলো ফেললে ও সঙ্গে-সঙ্গে থমকে যাচ্ছে। আলো কোনও-না-কোনওভাবে ওর কোশকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

অর্থাৎ, আমি একটা ভয়ংকর নিশাচর শিকারি গাছ তৈরি করে ফেলেছি। কারণ, দিনের বেলা এক্স নিষ্কর্মা হয়ে থাকে, আর রাতে সজাগ হয়ে ওত পেতে থাকে।

রঙিন আলোগুলো ওর রাতের অ্যাট্রাক্টর-সূর্যশিশিরের শিশিরবিন্দুর মতো। আর মিষ্টি ওর গন্ধটাও আর-একটা অ্যাট্রাক্টর। রাতে এক্স আলো আর গন্ধ দিয়ে শিকারকে কাছে টানে। আর দিনের বেলা মাটির নীচে ও স্রেফ ঘুমিয়ে থাকে—মানে, ইনঅ্যাকটিভ হয়ে থাকে।

ছোট্ট এইটুকু টবে এক্স-এর বাহাদুরি রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয়। যদি এক্স বড় জমি পেত তা হলে নিশ্চয়ই আরও শক্তিশালী, আরও ভয়ংকর হয়ে উঠত।

আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল মাথাচাড়া দিল। বাইরের ঘাস-জমিতে এই টবটা মাটি খুঁড়ে বসিয়ে দিলে কেমন হয়!

কয়েকটা দিন টানাপোড়েনে কাটার পর মনস্থির করলাম।

আজ সকালে আমি বাড়ির দরজা থেকে অন্তত দশমিটার দূরে এক্স-এর টবটা মাটির তিনহাত নীচে পুঁতে দিয়েছি।

এবার শুধু অপেক্ষা।

বড় জমি পেয়ে এক্স-এর তেজ অনেক বেড়ে গেছে। আস্পর্ধাও।

আজ থেকে আমি ওকে কন্ট্রোল করার রিসার্চ শুরু করেছি। এমন একটা কেমিক্যাল আমাকে আবিষ্কার করতে হবে যা ছড়িয়ে দিলে এক্স-এর অ্যাকটিভিটি স্লো হয়ে যাবে। ও রাতের বেলাতেও নিস্তেজ কিংবা অকেজো হয়ে পড়বে।

রাতে আমি বাড়ি থেকে আর বেরোই না। তবে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি এক্স বাড়ির চারদিকে আলো জ্বেলে গন্ধ ছড়িয়ে বসে আছে। কখনও কখনও ওর বাদুড় কিংবা

পাচা ধরার শব্দ শুনেছি। তবে এক্স-এর টেনট্যাকলগুলো এত দ্রুত কাজ করে যে, বেশিরভাগ সময়েই কোনও শব্দ শোনা যায় না—অথবা, খুব চাপা শব্দ হয়।

অনেক সময় মাটিতে চাবুক আছড়ানোর মতো সপসপ শব্দ শুনেছি। আন্দাজে আমার মনে হয়েছে, খিদের টানে এক্স-এর শুঁড়গুলো অস্থির হয়ে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে।

এক্স-এর বড় বাড় বেড়েছে। যে করে হোক ওকে কন্ট্রোল করতে হবে।

ওর অ্যান্টিডোট আমাকে বের করতেই হবে।

আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এক্স-এর একটা অ্যান্টিডোট বোধহয় আমি বের করে ফেলেছি। সামনের শনিবার রাতে বাইরে বেরিয়ে অ্যান্টিডোটটা পরীক্ষা করব। তবে খুব সাবধানে আমাকে পরীক্ষা চালাতে হবে। কারণ, এক্স-কে বিশ্বাস নেই।

এটাই ডায়েরির শেষ লেখা। লেখাটার তারিখ প্রায় তিনমাসের পুরোনো।

ডায়েরিটা শব্দ করে বন্ধ করল টনি। শানদের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

শান বলল, এরপর কী হয়েছে সেটা মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে।

টনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, অ্যান্টিডোটটা কাজ করেনি। অথবা সোমেশ চ্যাটার্জি ভুল করে প্লান্ট এক্স-এর ফাঁদে পা দিয়েছেন। তারপর...।

তারপর আর ফিরতে পারেননি। হারা যেন টনির কথাটা শেষ করল।

টুনি বলল, চল, তাড়াতাড়ি রেডি হয়েনে...দেরি হয়ে যাচ্ছে।

টনি উঠে দাঁড়াল। ডায়েরিটা মেঝেতে রাখা কাগজের থাকের ওপরে রাখল। তারপর চাদরের চারটে খুঁট জড়ো করে গিঁট বাঁধতে লাগল।

টুনি, শান আর হারা গোছগাছের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যেকরে হোক, একঘণ্টার মধ্যেই ওরা এ-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। তারপর খবর দেবে পুলিশে, খবরের কাগজে আর নানান টিভি চ্যানেলে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাই জেনে যাক এই নিষিদ্ধ এলাকার কথা।

সত্যি, ওদের সামনে এখন অনেক কাজ।

রুদ্ধশ্বাস

রুদ্ধশ্বাস

০১.

হেডলাইটের আলো বাচ্চা মেয়েটার মুখের ওপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফরসা ফুটফুটে অথচ ভয় পাওয়া মুখ। গাড়ির ঝাঁজালো হ্যালোজেন আলোয় একেবারে যেন ঝলসে যাচ্ছে।

চোয়াল শক্ত করে প্রাণপণে ব্রেক কষল শমিত। কালো পিচের ওপরে ঘষটে গেল গাড়ির চাকা। রবার পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। শমিতের পাশে বসা পাপিয়া এই-ই-ই বলে চেঁচিয়ে উঠে ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। ওর শরীরটা সামনের উইন্ডশিল্ডের দিকে ছিটকে যেতে চাইছিল, কিন্তু সিট বেল্ট ঠিকমতো বাঁধা থাকায় সেটা এড়ানো গেল।

পিছনের সিটে বাপ্পার বসে থাকার কথা কিন্তু ও বসে ছিল না। ও দাঁড়িয়ে বাবা আর মা-কে সাতকাহন করে শোনাচ্ছিল, ও কটা লুচি খেয়েছে, কটা ফিশ বাটার ফ্রাই, কটুকরো মাটন আর কটা রসগোল্লা। ওর ফর্দ শোনানোর মাঝখানে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় ওর থুতনিটা সামনের সিটের একপাশে ঠুকে গেল।

বারাসাতে বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিল শমিত, পাপিয়া আর বাপ্পা। শমিত গাড়ি চালাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য অ্যাকসিলারেটরে পায়ের চাপ একটু বাড়িয়েই

দিয়েছিল। ফ্ল্যাটে ওদের পোষা কুকুর চ্যাম্প একা রয়েছে। যদিও ওর ঘণ্টা চার-পাঁচ একা থাকার দিব্যি অভ্যেস আছে, তা হলেও দুশ্চিন্তা একটা থাকেই।

এমনিতে ভি.আই.পি. রোডে গাড়ি-টারি একটু জোরেই যায়। তার ওপর রাত এখন প্রায় সাড়ে দশটা। সুতরাং রাস্তা সুনসান। শমিত বেশ মেজাজেই গাড়ি চালাচ্ছিল।

পাপিয়া একবার সাবধান করে বলে উঠেছিল, এত জোরে চালানোর কী হয়েছে। বাড়ি ফিরতে না হয় একটু দেরিই হল...।

শমিত পাপিয়ার কথার জবাব না দিয়ে ছেলেকে লক্ষ করে হেসে মন্তব্য করেছে, বাপ্পা, তোর মা ভয় পেয়ে গেছে। যো ডর গয়া।

সমঝো মর গয়া। বাবার অর্ধেক কথাটা শেষ করল বাপ্পা।

শমিত মাঝে-মাঝেই ঠাট্টা করে এই কথাটা বলে। তাই শুনে-শুনে বাপ্পার কথাটা মুখস্থ হয়ে গেছে।

সুতরাং রাত সাড়ে দশটার ভি.আই.পি. রোডের ওপরে শমিতের মারুতি আটশো বলতে গেলে বেপরোয়াভাবে উড়ছিল।

দমদম পার্ক পেরোনোর পরেই ঘটনাটা ঘটেছে। রাস্তার বাঁদিকের গাছপালার আড়াল থেকে বলতে গেলে আচমকাই ছুটে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা। শমিত পোড়খাওয়া ড্রাইভার না হলে মেয়েটাকে নির্ঘাত ধাক্কা মেরে বসত।

কিন্তু মেয়েটা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। স্টিয়ারিং-এ বসে ওর একটা পা শুধু দেখতে পাচ্ছিল শমিত। তা হলে কি ওর গায়ে ধাক্কা লেগেছে? গাড়ির ব্রেক কষার তীব্র শব্দে সংঘর্ষের কোনও শব্দ শমিতের কানে আসেনি। আর গাড়িতে বসে ঠিক বোঝাও যায়নি ধাক্কা লেগেছে কি না।

সিট বেল্ট খুলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল শমিত। বাপ্পাও সর্দারি করে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু পাপিয়া ওকে ধমকে উঠল। বাপ্পা বিরক্ত হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ও ক্লাস এইটে পড়ে। এমন কিছু কচি খোকা নয় যে, বাবাকে একটু সাহায্য করতে পারবে না! কিন্তু মা সেটা বুঝলে তো!

মেয়েটা চিত হয়ে পড়ে ছিল রাস্তায়। গাড়ির হেডলাইটের আলো ওকে ভাসিয়ে দিয়েছে। বয়েস কত হবে? বড়জোর নয় কি দশ। পুতুল-পুতুল মিষ্টি মুখটাকে ঘিরে রেখেছে একরাশ কোঁকড়া চুল। দু-চোখ বোজা হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মেয়েটির পরনে লম্বা ফ্রক–তাতে হালকা রঙের কাপড়ে চড়া রঙের সস্তা প্রিন্ট। দুকানে রুপোর মাকড়ি, গলায় সরু ইমিটেশন চেন।

ওকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোথাও সেরকম চোট পেয়েছে কি না।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে এপাশ-ওপাশ দেখল শমিত। রাস্তা ফাঁকা। কেউ নেই। শুধু কখনও কখনও ছুটন্ত গাড়ির জ্বলজ্বলে দুটো চোখ হুউস করে উড়ে যাচ্ছে।

ঝুঁকে পড়ে মেয়েটাকে শমিত তুলে নিল। ছিপছিপে হালকা শরীর–তেমন একটা ওজন নেই। শমিতের দু-হাতের ওপরে দেহটা ছোট্ট কোলবালিশের মতো নিথর হয়ে পড়ে আছে।

চটপট গাড়ির কাছে ফিরে এল ও। ওর মাথার মধ্যে ডাক্তার-হাসপাতাল-নার্সিংহোম–এইসব শব্দগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল।

বাপ্পা তীক্ষ্ণ চোখে সবকিছু দেখছিল। বাবাকে গাড়ির দিকে আসতে দেখেই ও গাড়ির দরজা খুলে ধরল। সুইচ টিপে গাড়ির ভেতরের আলোটা জ্বেলে দিল।

বাপ্পা আর শমিত যখন মেয়েটাকে পিছনের সিটে কসরত করে শুইয়ে দিচ্ছে তখন পাপিয়া কাঁপা গলায় জিগ্যেস করল, মেয়েটার সঙ্গে আর কেউ নেই! এত রাতে

ভি.আই.পি. রোডে ও একা…।

শমিত সংক্ষেপে বলল, দেখছি তো আর কেউ নেই…।

ড্রাইভিং সিটে বসে সিট বেল্ট বাঁধল শমিত। তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। বাপ্পা গাড়ির ভেতরের আলোটা নিভিয়ে দিল। কেমন একটা ভয় ওদের আঁকড়ে ধরতে চাইছিল।

গাড়ি খানিকটা এগিয়ে যেতেই পাপিয়ার চোখে পড়ল, রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে গাছগাছালির গায়ে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে রয়েছে–তার পিছনের লাল লাইট দুটো জ্বলছে।

বাবা, ওর সিরিয়াসলি লাগেনি তো? বাপ্পা আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করল।

শমিত ঠান্ডা গলায় বলল, দেখে তো মনে হচ্ছে লাগেনি। চলো, ওকে ডক্টর চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাই…উনি ভালো করে দেখে কনফার্ম করবেন।

পাপিয়া প্রায় আঁতকে উঠে বলল, পাগলের মতো কী বলছ তুমি! ডক্টর চৌধুরীর কাছে নিয়ে গেলেই উনি ব্যাপারটা পুলিশে ইনফর্ম করতে বলবেন। তারপর টানাহ্যাঁচড়া, পুলিশ-কেস…ওঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না…।

পাপিয়া, তুমি ভুলে যাচ্ছ, ডক্টর চৌধুরী আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। তুমি যা ভাবছ ওসব কিচ্ছু হবে না।

বাই চান্স যদি হয় তখন কে বাঁচাবে? ভাগ্যিস, ভি.আই.পি.-র পুলিশ প্যাট্রল আমাদের দেখতে পায়নি!

হঠাৎই শমিতের মনে হল, পাপিয়ার কথা নিতান্ত আজগুবি নয়। ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশের ঝাট হলেও হতে পারে। তাই ও পাপিয়াকে হাত নেড়ে শান্ত করার চেষ্টা করে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগে তো ওকে বাড়িতে নিয়ে যাই..।

শমিতের গাড়ির সিট কভারের সঙ্গে জলের বোতল রাখার ব্যাগ আছে। সেখানে সবসময় একটা প্লাস্টিকের বোতলে জল রাখা থাকে। বাপ্পা চুপ করে মা-বাবার কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু একইসঙ্গে ওর হাত কাজ করছিল।

জলের বোতলটা ব্যাগ থেকে বের করে নিয়ে ও ছিপি খুলল। কিছুটা জল হাতে ঢেলে নিয়ে ছিটিয়ে দিল মেয়েটির চোখে-মুখে। তারপর ভিজে হাতটা আলতো করে বুলিয়ে দিল মেয়েটির কপালে।

বোতলটা আবার জায়গামতো রেখে দিয়ে একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল বাপ্পা। কিন্তু না—গাড়ির ঝাঁকুনির জন্য মেয়েটার শরীর যেটুকু নড়াচড়া করছে তার বাইরে বাড়তি কোনওরকম আলোড়ন দেখা গেল না।

ওকে নিয়ে তখনও আলোচনা করছিল শমিত আর পাপিয়া।

কার মেয়ে? কোথায় থাকে? বাড়ির লোকজনকে ঠিকমতো খবর দেওয়া যাবে কি না! ওর জ্ঞান ফিরলেই হয়তো ওর বাড়ির ঠিকানা কি ফোননম্বর জানা যাবে। তখন...।

এইসব নানান কথার মাঝে ওরা পৌঁছে গেল বাড়িতে।

অরবিন্দ সরণি থেকে রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে খানিকটা ঢুকেই গোলাপি রঙের একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। শমিতরা এ-বাড়িরই তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়ির নীচতলাটা গ্যারেজ। শমিতের গাড়ি সেখানে থাকে।

শমিত হর্ন দিতেই বড় লোহার দরজা খুলল দারোয়ান ভজনচাঁদ।

পাপিয়া চাপা গলায় বলল, গাড়িটা গ্যারেজে ঢোকানোর দরকার নেই। গাড়ি এখানে রেখে আগে ফ্ল্যাটে চলো। আমি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে এতটা সিঁড়ি ভাঙতে পারব না।

শমিত ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, কেন? গ্যারেজে গাড়ি রেখে তারপরেও তো ওই কাজগুলো করা যায়।

মেয়েটাকে এই অবস্থায় দেখলে ভজন সন্দেহ করতে পারে...।

এখন গাড়ি থেকে নামলেও তো দেখতে পাবে সন্দেহও করতে পারে যে, আমরা একটা বাচ্চা মেয়েকে কিডন্যাপ করে এনেছি।

শমিতের ঠাট্টায় পাপিয়া মুখ বেঁকাল: আমার বুদ্ধি কখনও তুমি নেবে না।

তখন বাপ্পা বলল, বাবা, মা যা বলছে তাই করো। আমরা এখানেই নেমে যাই। তুমি পরে নীচে এসে গাড়ি গ্যারেজ করে দিয়ো–

অগত্যা শমিত রাজি হল।

ওরা সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। শমিত মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ওর মাথাটা শুইয়ে দিল নিজের ডানকাঁধের ওপরে। তারপর সদর দরজা দিয়ে ঢুকে গ্যারেজের পাশের পথ ধরে হাঁটা দিল ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার দিকে।

ভজনচাঁদ লোহার গেটের একটা পাল্লার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কখন শমিতের মারুতি গ্যারেজে ঢুকবে। তার বদলে ওদের হেঁটে যেতে দেখে সে বেশ একটু অবাক হল। ভাবল, শমিতবাবু বোধহয় গাড়ি নিয়ে আবার বেরোবে।

তাই ও ডেকে উঠল পিছন থেকে, স্যার, আপনি কি আবার বেরোবেন?

শমিত মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, না। আমি ওপর থেকে এসে গাড়ি তুলে দিচ্ছি।

পাপিয়া তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিল, সেইসঙ্গে বাপ্পাকেও হাত ধরে টানছিল। কিন্তু বাপ্পা ঠিক বুঝতে পারছিল না ভজনচাঁদকে ভয় পাওয়ার কী আছে।

ভজনচাঁদ কৌতূহল চাপতে পারল না। পিছন থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, এ-লড়কিকে কোথা থেকে নিয়ে এলেন, স্যার? ওর কি বোখার হয়েছে?

পাপিয়ার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

শমিত কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই পাপিয়ার দিকে তাকাল।

আর বাপ্পা পিছন ফিরে ভজনচাঁদকে দেখছিল।

মাঝবয়েসি বোকা-বোকা মুখ। মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখে বসন্তের দাগ। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর পায়ে খাকি হাফ প্যান্ট। এমনিতে লোকটা বড়ই সাদাসিধে সরলমতি। শখ কিংবা নেশা বলতে দুটি জিনিস খইনি আর সিনেমা।

পাপিয়া ভজনচাঁদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে অকারণেই হাসল। তারপর বলল, আমার বোনের ছোট মেয়ে, ভজন। তুমি ঠিকই ধরেছ, ওর জ্বর হয়েছে। ওর বাবা-মা কদিনের জন্যে দিল্লি গেছে– তাই ও এখন আমাদের কাছে দু-চারদিন থাকবে।

ভজনচাঁদকে এরকম সাতকাহন কৈফিয়ত দেওয়ার কোনও মানে হয় না। কিন্তু বানানো গল্পটা বলতে পেরে পাপিয়ার ভালো লাগল। কারণ, এই মেয়েটি সম্পর্কে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করবে। তাদের মুখ বন্ধ করতে এই গল্প তৈরি করাটা খুব জরুরি। এই গল্পটা বারবার বলতে-বলতে এর ফাঁকফোকরগুলো ঠিকঠাক করে নেওয়া যাবে–অনেকটা নাটকের রিহার্সালের মতো। তখন এই বানানো গল্পটাই সত্যি ঘটনার মতো শোনাবে।

ওরা সিঁড়ি উঠে চলে এল তিনতলার।

পাপিয়া ব্যাগ থেকে চাবির গোছা বের করল। কোলাপসিবল গেটের তালা খুলল। তারপর পালিশ করা কাঠের দরজার নাইটল্যাচে চাবি ঢোকাল।

বাপ্পা মেয়েটার মুখ দেখার চেষ্টা করছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ডাক্তার আঙ্কেলকে খবর দিলেই বাবা ভালো করত। কিন্তু মায়ের যতসব উলটোপালটা ভয়!

ফ্ল্যাটের দরজায় শব্দ হতেই ভেতর থেকে চ্যাম্পের চাপা ডাক শোনা গেল কয়েকবার। আর ওরা ফ্ল্যাটে ঢুকতেই ডোবারম্যান কুকুরটা কোথা থেকে বেরিয়ে এসে শমিত আর বাপ্পার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল। বাপ্পা চ্যাম্প, চ্যাম্প বলে কয়েকবার ডাকল, ওর ঘাড়ে আলতো চাপড় মেরে হাত বুলিয়ে দিল।

বসবার ঘরের রট আয়রন সোফায় মেয়েটাকে খুব সাবধানে শুইয়ে দিল শমিত। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে পাপিয়াকে বলল, ভালো করে দ্যাখো ওর কোথাও চোট লেগেছে কিনা। আর চোখে-মুখে একটু জলের ছিটে দাও...হয়তো সেন্স ফিরে আসবে। আমি গাড়িটা গ্যারেজে তুলে আসছি।

বাপ্পা বলে উঠল, গাড়িতেই আমি জল দিয়েছিলাম...।

আর-একবার দিয়ে দ্যাখ– বলে শমিত ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পিছন থেকে পাপিয়া ডেকে বলল, ভজনচাঁদের সঙ্গে এ-নিয়ে আর কোনও কথা বলবে না।

মিনিট দশেক পরেই ফ্ল্যাটে ফিরে এল শমিত।

এসে দ্যাখে মা আর ছেলে ফ্যাকাসে মুখে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দুজনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

শমিত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

শমিতের কথার জবাব দিল না কেউ। শুধু পাপিয়া আঙুল তুলে মেয়েটার ফ্রকের দিকে দেখাল।

শমিত তাকাল সেদিকে, কিন্তু তেমন কিছু ঠাহর করতে পারল না।

তখন পাপিয়া কাঁপা গলায় বলল, রক্ত—ওর ফ্রকে রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে।

এইবার বুঝতে পারল শমিত। মেয়েটার কাছে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল ও।

সত্যিই তো! ফ্রকের ওপরে যে চড়া রঙের সস্তা প্রিন্ট ও দেখেছিল তার মধ্যে নীল আর সবুজ রংটায় কোনও গোলমাল নেই। তবে লালের ছোপগুলো মোটেই রং নয়—রক্ত। কোনওভাবে ওর ফ্রকে ছিটকে গিয়ে ছোট-বড় ফোঁটা মিলিয়ে একটা এলোমেলো নকশা তৈরি করেছে।

রক্তের দাগগুলো আলতো করে পরখ করল শমিত। এগুলো কি মানুষের রক্ত, না কি অন্য কোনও পশুপাখির রক্ত? না কি মেয়েটা অ্যাক্সিডেন্টে চোট পেয়ে আহত হয়েছে? হয়তো ওর পায়ে টায়ে কোথাও কেটে গেছে।

সে কথাই পাপিয়াকে বলল ও।

তুমি ওকে একটু বাপ্পার বেডরুমে নিয়ে যাও। ভালো করে চেক করে দ্যাখো উন্ডেড হয়েছে কি না। আর ওর ড্রেসটা ছাড়িয়ে ওকে বাপ্পার একটা ড্রেস পরিয়ে দাও। কিছুক্ষণ চিন্তা করল শমিত। তারপর বিড়বিড় করে বলল, মনে হচ্ছে আমাদের কপালে পুলিশের হেনস্থা লেখা আছে।

পুলিশ! আঁতকে উঠে বলল পাপিয়া।

শমিত ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

আর ঠিক তখনই মেয়েটার মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল। ওর ঠোঁট ফাঁক হল।

বাপ্পা চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, দ্যাখো…দ্যাখো…!

মেয়েটা ততক্ষণে চোখ মেলে তাকিয়েছে।

ও চোখ মেলে তাকাতেই ওর মিষ্টি মুখটা আরও মিষ্টি হয়ে গেল। তখন বোঝা গেল, চোখেরও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।

মেয়েটিকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই বাপ্পার মুখে হাসি ফুটে উঠল। একই সঙ্গে একটা স্বস্তির শ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুকের ভেতর থেকে। যাক, আর ভয় নেই।

সামান্য হাসি পাপিয়াকেও ছুঁয়ে গেল। ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়ল। আর থানা-পুলিশ নার্সিংহোমের ঝামেলা নেই। মেয়েটার মুখ থেকে ঠিকানা-ফোননম্বর জানামাত্রই ওর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাবে।

ও শমিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। শমিত ওর হাসি ফিরিয়ে দিল।

ঠিক তখনই মেয়েটা উঠে বসল। ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আমার নাম মিষ্টু। তোমরা কে?

নতুন অতিথিকে প্রথম থেকেই বেশ ভালোরকম জরিপ করছিল চ্যাম্প। এখন, মিষ্টু উঠে বসামাত্রই, চ্যাম্প এগিয়ে এল ওর কাছে। চাপা গলায় কয়েকবার ডেকে উঠল।

.

০২.

সকালে পাপিয়ার ঘুম ভাঙতেই একটা গানের সুর কানে এল। খুব মিষ্টি গলায় কেউ গাইছেঃ

ভোরের আলো।
ভোরের বাতাস

ভোরের পাখির গান,
নয়ন মেলে
দেখ না মাগো
জুড়াবে তোর প্রাণ…

প্রথমটা পাপিয়া ভাবল, বাপ্পা বোধহয় ভোরবেলা উঠেই ফুল ভলিয়ুমে এফ.এম. চ্যানেল শুনছে। ওর মনে পড়ল, বাপ্পা ও-ঘরে শুয়েছে—ওর বাবার সঙ্গে। ও-ঘরে ট্রানজিস্টর রেডিয়ো চললে এ-ঘরে শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবুও…

তখনই পাপিয়া চোখ খুলল।

চোখ খুলেই যে-ছবিটা দেখল তাতে ওর মনটা কেমন হয়ে গেল। ওর মনে হল, এরকম সুন্দর ভোর ওর জীবনে আগে কখনও আসেনি।

রাস্তার ধারের একটা জানলার পাশে বসে বাইরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে আছে মিষ্টু। আর অদ্ভুত তৈরি গলায় সুর করে গান গাইছে—যে-গান পাপিয়া এফ.এম. চ্যানেলের গান বলে ভুল করেছিল।

বিছানায় উঠে বসল পাপিয়া। মিষ্টুকে দেখতে লাগল। মিষ্টু মুখ ফিরিয়ে পাপিয়াকে একপলক দেখল, কিন্তু গান থামাল না। একচিলতে হাসল শুধু।

মেয়েটার গায়ে বাপ্পার নীল আর খয়েরি প্রিন্টের হাফশার্ট, পায়ে বাপ্পার হাফপ্যান্ট হাফপ্যান্টের রং হালকা বিস্কুট, আর তাতে একগাদা পকেট।

পাপিয়াদের ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে নীচের রাস্তা দেখা যায়। রাস্তার ওপারে একটা বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ, আর তার পিছনেই টিনের চাল দেওয়া একটা মোটর গ্যারেজ। গ্যারেজের পাশে অনেকটা লম্বা জায়গা জুড়ে টিনের কৌটো তৈরির একটা কারখানা। তার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটা কাঠগোলাপ গাছ।

বর্ষা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই, কিন্তু দুটো গাছ ঋতুর কথা না ভেবে এখনও ফুল ফুটিয়ে চলেছে। গাছ দুটোর মাঝখান দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নজর চলে যায়। দেখা যায় বিশাল আকাশ। আকাশের নীচে খুচরো বাড়ির জঙ্গলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা চিমনি। ওটা দিয়ে কখনও ধোঁয়া বেরোতে দেখেনি পাপিয়া।

মিষ্টু গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে এসবই দেখছিল বোধহয়, আর গান গাইছিল।

কাল সারারাত পাপিয়ার ভালো ঘুম হয়নি। নানান চিন্তা ওকে কুরেকুরে খেয়েছে। তারপর, শেষরাতের দিকে, নেহাত ক্লান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাপিয়ার দুশ্চিন্তার কারণ মিষ্টু। কাল রাতে ওর জ্ঞান ফিরে আসার পর ওরা সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল। ভেবেছিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে।

মিষ্টুর জ্ঞান ফেরার পরই পাপিয়া ওর পাশটিতে বসে পড়েছে। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

মিষ্টু, এই হল তোমার শমিত আঙ্কল, এ হল বাপ্পা-তোমার দাদা, আমি হলাম পাপিয়া আন্টি। আর এই যে সুন্দর ডোবারম্যান কুকুরটা দেখছ–ওর নাম চ্যাম্প।

মিষ্টু হাসিমুখে পরিচয়ের পালা সারছিল। একে-একে ও হাত বাড়িয়ে দিল শমিতের দিকে, বাপ্পার দিকে, পাপিয়ার দিকে। আর সবশেষে চ্যাম্পের ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আমার ডোবারম্যান ভালো লাগে। আমি ডোবারম্যান আগেও দেখেছি।

শমিত অধৈর্য হয়ে পড়ছিল, কিন্তু কোনও কথা বলল না। কারণ, ও জানে, পাপিয়ার বাস্তব বুদ্ধি অনেক বেশি। অনেক সময় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা জেদ ধরে বসে–তখন ওদের কাছ থেকে কোনও কথা বের করা যায় না। মিষ্টুর বেলায় কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না পাপিয়া। ওর সঙ্গে সহজ-স্বাভাবিক ব্যবহার করে সব কথা জানতে হবে।

তোমার ভালো নাম কী? পাপিয়া মিষ্টুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল।

ভালো নাম জানি না। আমার নাম মিষ্টু।

একটু অবাক হলেও পাপিয়া হাল ছাড়ল না।

তোমার বাড়ি কোথায়?

জানি না। পা দোলাতে-দোলাতে নির্বিকার মুখে বলল মিষ্টু।

সে কী! বাড়ি কোথায় জানো না? শমিত জানতে চাইল এবার।

না, আঙ্কল, জানি না। শমিতের দিকে সরল চোখে তাকিয়ে বলল মেয়েটা।

তোমাদের বাড়ির ফোন নাম্বার মনে আছে? পাপিয়া ওর মাথায় হাত বুলিয়ে নরম করে জানতে চাইল।

না, মনে নেই।

বাবার নাম, মায়ের নাম?

এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে না বোঝাল মিষ্টু।

তোমার জামায় রক্ত লাগল কীভাবে? প্রশ্নটা করে শমিত আবার হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে। মিষ্টুর কাছে।

রক্ত? কোথায়? মাথা নীচু করে গায়ের ফ্রকের দিকে তাকাল মিষ্টু। লাল ছোপগুলোয় বারতিনেক আঙুল ছুঁইয়ে মুখ বেঁকাল ও এ ম্যা! আমার ফ্রকটা শিগগির পালটে দাও। ওটা কাচতে হবে।

পাপিয়া ফ্যালফেলে চোখে শমিতের মুখের দিকে তাকাল।

বাপ্পা জিগ্যেস করল, কোন স্কুলে পড়ো তুমি?

মিষ্টু পালটা জানতে চাইল, তুমি কোন স্কুলে পড়ো?

ক্যালকাটা বয়েজ..। আর, তোমার স্কুল?

মিষ্টু ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে মনে করার খুব চেষ্টা করল। তারপর মাথা নাড়ল : নাঃ, মনে পড়ছে না। ভুলে গেছি।

শমিত আর পাপিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বাপ্পাও হতাশ হয়ে মা-বাবার দিকে দেখল।

মিষ্টু পাপিয়াকে বলল, আমার এই নোংরা ড্রেসটা চেঞ্জ করে দাও, আন্টি।

পাপিয়া কেমন অসহায়ভাবে শমিতের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

শমিত বিড়বিড় করে বলল, ওর কোনও কথা মনে নেই। মনে হয় কোনও শক-টক পেয়ে পুরোনো সব কথা পুরোপুরি ভুলে গেছে।

শকটা পেল কী করে? তোমার গাড়িতে চোট পেয়েছে বলে তো মনে হয় না।

পাপিয়ার কথার জবাবে ঠোঁট ওলটাল শমিত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, আমার গাড়িতে চোট পায়নি। অন্য কোনও প্রবলেম হবে। যাও, ওকে বাপ্পার ঘরে নিয়ে যাও। যদি সেরকম কোনও চোট না থাকে তা হলে ডাক্তারের ব্যাপারটা কাল ভাবা যাবে।

না, মিষ্টুর শরীরে কোনওরকম আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায়নি পাপিয়া। ওকে বাপ্পার ড্রেসটা পরিয়ে দেওয়ার পর ওর ফ্রকটা হালকা গরম জলে ভিজিয়ে দিয়েছে। রক্তের

দাগগুলো তুলে ফেলা দরকার। কাল সকালে পাপিয়া নিজে জামাটা কেচে ফেলবে। ঠিকে কাজের লোককে এটা কাচতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

রাতে মিষ্টু পাপিয়ার সঙ্গে শুয়েছে। তার আগে পাপিয়া ওকে এগ চাউমিন তৈরি করে খাইয়েছে। খাওয়া দেখে মনে হয়েছে, ওর খুব খিদে পেয়েছিল।

কথায় কথায় পাপিয়া ওকে অনেক কিছু জিগ্যেস করেছে, কিন্তু মিষ্টু সেরকম কোনও উত্তর দিতে পারেনি। ওর স্মৃতির শ্লেটটা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে কেউ যেন তাড়াহুড়ো করে মুছে দিয়েছে। ফলে দু-একটা খাপছাড়া স্মৃতির টুকরো ছাড়া মিষ্টুর কাছে বাকি সব আঁধার হয়ে গেছে।

প্রথমে শমিত ভেবেছিল মিষ্টুকে ডাক্তার দেখাতে হবে শরীরের ডাক্তার। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, শরীরের নয়—মনের ডাক্তার দেখাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিষ্টুর স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

অ্যামনেশিয়া বা স্মৃতিবিলোপের ঘটনা এর আগে শমিত বইয়ে পড়েছে, সিনেমায় দেখেছে। কখনও কখনও খবরের কাগজেও এরকম দু-একটা খবর চোখে পড়েছে। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি, কোনও অ্যামনেশিয়ার রুগি ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে।

মিষ্টুকে নিয়ে পাপিয়াও কম ভাবেনি।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে কত না আকাশ-পাতাল ভেবেছে!

যদি মিষ্টুর খবরটা থানায় জানানো হয়, তা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই ওকে লিলুয়ার উদ্ধার আশ্রম কিংবা ওরকম কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। তারপর কবে মিষ্টুর বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়া যাবে কে জানে! ততদিন ওসব আশ্রমে কী কষ্টই না পাবে মেয়েটা! তার চেয়ে এখানে থাকলে ক্ষতি কী! বাপ্পার ছোটবোনের মতো থাকবে, হাসবে, খেলবে—এমনকী ওকে স্কুলেও ভরতি করে দেবে পাপিয়া। কেউ ওর সম্পর্কে কোনও কথা জিগ্যেস করলে

ভজনচাঁদের গল্পটাই বলবে– মিষ্টু ওর বোনের ছোট মেয়ে। এমনিতে পাপিয়ার কোনও বোন নেই। না-ই বা থাকল। মিষ্টুর জন্য এরকম মিথ্যে বলা যায়। কাল রাতে শমিতের সঙ্গে এ নিয়ে ওর কথা হয়ে গেছে।

সকালের আলো বাড়ছিল। রাস্তার ওপারের কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথায় রোদ পড়েছে। কয়েকটা পাখি গাছের ডালে, পাতার আড়ালে, চঞ্চলভাবে ঘোরাফেরা করছে। মিষ্টু বোধহয় সেদিকেই তাকিয়ে ছিল, কারণ, গান শেষ করেই ও পাপিয়ার দিকে ফিরে বলল, ওই দ্যাখো, আন্টি, পাখিরা গাছে খেলা করছে...।

পাপিয়া বিছানা থেকে নেমে ওর কাছে এগিয়ে গেল। ওর মুখটা দু-হাতের পাতায় ধরে মাথায় চুমো খেল। তারপর জিগ্যেস করল, তুই এত সুন্দর গান শিখলি কোথায়?

মিষ্টু হেসে বলল, সে জানি না–আমার গান ভালো লাগে।

তুই কখন উঠেছিস রে? আমি তো একটুও টের পাইনি!

আমি তো সবসময় ভোরবেলা উঠি।

ফুটফুটে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে পাপিয়া ভাবছিল, ওর সামনে এখন অনেক কাজ।

সকাল নটা বাজলেই শমিত অফিসে বেরোবে। আর দশটা বাজলেই পাপিয়া বাপ্পাকে নিয়ে স্কুলে যাবে। শমিত অফিসে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। ফলে পাপিয়াকে বেশিরভাগ সময় বাসেই যাতায়াত করতে হয়। অবশ্য কখনও কখনও শমিতের সময় থাকলে বাপ্পাকে স্কুলে দিয়ে আসে, কিংবা নিয়ে আসে। বাপ্পার স্কুলের কার পুলের কোনও গাড়ি এদিকটায় এখনও আসে না বলেই যত ঝঞ্ঝাট।

পাপিয়া ঠিক করল, বাপ্পাকে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় মিষ্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে। ফেরার পথে মানিকতলা বা হাতিবাগান থেকে মিষ্টুর জন্য কয়েকটা জামা-টামা কিনে নেবে।

তারপর দুপুরবেলাটা গল্প করবে মিষ্টুর সঙ্গে। যদি আচমকা কোনও দরকারি সূত্র বেরিয়ে আসে।

সন্ধেবেলা শমিত অফিস থেকে ফিরলে ওরা ঠিক করবে কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে মিষ্টুকে দেখাতে নিয়ে যাবে কি না। শমিত বলেছে, অফিস থেকে ও ভালো কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের খোঁজখবর জোগাড় করে নিয়ে আসবে। অফিসে বেরোনোর সময় কথাটা ওকে আর-একবার মনে করিয়ে দিতে হবে।

মনে করিয়ে দিতেই শমিত বলল, ভুলে যাব মানে! এখন মিষ্টুর ব্যাপারটাই আমার একমাত্র চিন্তা।

অফিসে ওর কথা কাউকে আবার গল্প কোরো না যেন। শমিতকে সাবধান করে দিল পাপিয়া।

শমিত হাত নেড়ে বলে উঠল, আরে না, না–পাগল!

বাপ্পাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে একইভাবে সাবধান করে দিল পাপিয়া। বাপ্পা বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা যে গোপন রাখাই ভালো সেটা ও ভালো করেই বুঝতে পেরেছে।

পাপিয়া শুধু বলল, আমাদের পাড়াপড়শি কেউ জিগ্যেস করলে ভজনচাঁদকে যে-গল্পটা বলেছি, সেটাই বলবি। বলবি মিষ্টু তোর মাসির মেয়ে। মাসি নৈহাটিতে থাকে।

শমিতকেও পাপিয়া বারবার করে সাবধান করল, তিনজনের বলা গল্প যেন একরকম হয়– নইলে লোকে সন্দেহ করবে।

পাপিয়ার পরিচালনায় সবকিছু ঠিকমতোই চলল।

বাপ্পাকে স্কুলে দিয়ে ফেরার সময় মিষ্টুর জন্য তিনরকম পোশাক কিনল পাপিয়া। ফ্রক, চুড়িদার, নাইটি। আর কয়েকটা প্যান্টি। তারপর বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে ওর

সঙ্গে গল্প করতে বসল। কথায় কথায় জানতে চেষ্টা করল অনেক কিছু। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। এমন কোনও কথা মিষ্টু বলতে পারল না যা থেকে ওর বাড়ির লোকদের কোনও হদিস পাওয়া যেতে পারে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ অফিস থেকে ফিরল শমিত।

প্রথমে মিষ্টুর খবর নিল পাপিয়ার কাছে। তারপর বলল, একজন সাইকিয়াট্রিস্টের খোঁজ পাওয়া গেছে। ডক্টর চিত্রলেখা দাশগুপ্ত। তিনি পার্ক সার্কাসে বসেন–সোম, বুধ, শুক্র। আজ মঙ্গলবার। সুতরাং আগামীকাল মিষ্টুকে নিয়ে ডক্টর দাশগুপ্তের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

সন্ধেবেলা হোমওয়ার্ক করতে বসে বাপ্পা মিষ্টুকে পাশে নিয়ে বসল। মাকে ডেকে বলল, কয়েকটা ইংরেজি আর বাংলা গল্পের বই দিতে মিষ্টু ওগুলো পড়বে।

পাপিয়া লক্ষ করল, কয়েকটা বই বেশ সুন্দর পড়তে পারছে মেয়েটা। আবার অন্য কয়েকটা বই পড়তে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে বিশেষ করে ইংরেজিগুলো।

ব্যাপারস্যাপার দেখে পাপিয়ার মনে হল, মিষ্টু বোধহয় ক্লাস ফোর বা ফাইভে পড়ে। ও ঠিক করল, ফোর-ফাইভের কয়েকটা বই জোগাড় করে মিষ্টুকে রোজ পড়াবে। হয়তো এইরকম একটা স্বাভাবিক জীবন শুরু করলেই মেয়েটার স্মৃতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

বাপ্পার মিষ্টুকে খুব পছন্দ হয়েছিল। পাপিয়াকে বারবার বলছিল, মা, বোনটাকে কী সুন্দর দেখতে। ওইটুকু মেয়ে কী ফ্যান্টাস্টিক গান গায়...।

পাপিয়া আর শমিত বুঝতে পারছিল, মিষ্টুকে পাওয়ার পর মোটামুটি একটা দিন নিশ্চিন্তে গড়িয়ে যাওয়ায় ওদের টেনশন অনেক কমে এসেছে। ভয় আর উৎকণ্ঠা সরে গিয়ে মিষ্টুর জন্য একটা সরল মায়া সেখানে জায়গা করে নিচ্ছিল।

কিন্তু তখনও ওরা বুঝতে পারেনি আগামী কয়েক ঘণ্টায় ওদের জীবনটা বদলে যাবে।

টেলিফোনটা এল রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ।

মিষ্টু আর বাপ্পা তখন যে-যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফোনটা ধরেছিল পাপিয়া। শমিত তখন ড্রইং-ডাইনিং-এ বসে টিভি দেখছিল।

হ্যালো।

মিস্টার শমিত রায়চৌধুরী আছেন?

একমিনিট ধরুন—দিচ্ছি। বলে পাপিয়া গলা তুলে শমিতকে ডাকল : তোমার ফোন...।

টেলিফোনটা শমিতদের বড় বেডরুমে। কর্ডলেস ফোন না থাকায় মাঝে-মাঝে ফোন ধরতে বেশ অসুবিধেই হয়। বাপ্পাও বাবার কাছে মাসকয়েক ধরে কর্ডলেসের বায়না করছে, কিন্তু এখনও বায়নার কোনও সুরাহা হয়নি।

শমিত এসে পাপিয়ার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে হ্যালো বলল।

পাপিয়া ঘরের টুকিটাকি গোছগাছ করছিল—তাতেই মন দিল আবার।

শমিত রায়চৌধুরী বলছেন? ও-প্রান্ত থেকে মিহি গলায় প্রশ্ন ভেসে এল।

হ্যাঁ, বলছি।

গতকাল রাতে আপনি ভি.আই.পি. রোডে একটা মেয়েকে পিক আপ করেছেন?

পিক আপ...মানে...ইয়ে...মেয়েটা আমাদের গাড়ির সামনে হঠাৎ এসে পড়েছিল..তারপর...।

ব্যাপারটা যে মিষ্টুকে নিয়ে সেটা বুঝতে পারামাত্রই পাপিয়া হাতের কাজ ছেড়ে শমিতের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর কথা শুনতে লাগল মন দিয়ে।

আমরা সবই দেখেছি। ঠান্ডা গলায় শমিতকে থামিয়ে দিল লোকটি।

শমিতের বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল। লোকটা কী করে সব দেখল? এ কি পুলিশের লোক, নাকি অন্য কেউ? শমিতকে ফোন করেছে কেন? লোকটা কি ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে?

লোকটি তখন কথা বলছিল ও মেয়েটাকে যে আপনারা পেয়েছেন সেটা পুলিশে না জানিয়ে ভালোই করেছেন। ইন ফ্যাক্ট জানানোর কোনও দরকার নেই–ভুলেও আর জানাবেন না।

না, না, জানানোর কোনও প্রশ্নই নেই। তাড়াহুড়ো করে সায় দিয়ে বলল শমিত।

দ্যাটস গুড। তারিফের সুরে বলল লোকটা।

মেয়েটা পুরোনো কথা সব ভুলে গেছে–টোটালি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। উত্তেজিতভাবে বলল শমিত, আমরা ওর বাড়ির লোকের খোঁজ করব। দরকার হলে নিউজ পেপারে অ্যাড দেব। যতদিন কোনও খোঁজ না পাই ও আমাদের কাছেই থাকবে।

টেলিফোনের ও-প্রান্তে হাসল লোকটা অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা হাসি। তারপর থেমে-থেমে বলল, ওসবের কোনও দরকার নেই। বাড়ির লোকের খোঁজ করবেন না, কাগজে অ্যাড দেবেন না…আর মেয়েটাকেও আপনাদের কাছে রাখবেন না।

শমিত হতভম্ব হয়ে বলে উঠল, এ আবার কী ধরনের কথা! তা হলে কী করব ওকে নিয়ে? রাস্তায় আবার বের করে দেব? তা কখনও হয় না কি!

না, না, তা কেন করবেন। আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি! আবার একটু হাসল লোকটা : আপনারা মেয়েটাকে মেরে ফেলুন–তা হলেই সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। ওকে মেরে ফেলাটা খুব জরুরি...কারণ, মেয়েটা অনেক কথা জানে। সেসব কথা মনে পড়ে গেলেই আমাদের বিপদ হবে–বহত ভারি মুসিবত। সো কিল দ্য গার্ল!

যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে কেঁপে উঠল শমিত। টেলিফোনের রিসিভারটা ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

পাপিয়া ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। শমিতকে আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো জিগ্যেস করতে লাগল, কী হল? কী হল?

শমিত মোমের মূর্তির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু বুকের ভেতরে একটা কেউটে সাপের নড়াচড়া ও টের পাচ্ছিল।

.

০৩.

রোজ বিকেলে বাপ্পা চ্যাম্পকে নিয়ে বেরোয়।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি একটা মাঝারি মাপের পার্ক আছে। এই পার্কটায় পাড়ার দুর্গাপুজো হয়। এ ছাড়া সারাবছর পাড়ার ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা ভলিবল নিয়ে মেতে থাকে।

পার্কের রেলিং জং ধরা–বহুদিন তাতে রং পড়েনি। মেন গেটের স্তম্ভে ফাটল ধরেছে। গোটাপাঁচেক ল্যাম্পপোস্টের মধ্যে একটা কি দুটোয় বাতি জ্বলে। পার্কের একপাশে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা হাফডজন বকুল, কৃষ্ণচূড়া আর দেবদারু গাছ আছে। তার কাছাকাছি দুটো দোলনা আর একটা টেকিকল। তাতে ছোট-ছোট বাচ্চারা খেলা করে।

পার্কের মেন গেট দিয়ে ঢুকে দোলনার দিকটায় চলে আসে বাপ্পা। এদিকটায় ঘাস-ছাওয়া জমি আছে অনেকটাই। তার প্রান্ত ঘেঁষে তিনটে সিমেন্টের বেঞ্চি। বাচ্চারা যখন ছুটোছুটি করে খেলা করে তখন তাদের গার্জেনরা এই বেঞ্চিগুলোতেই বসে থাকেন।

পার্কের বাকি অংশটায় শুধু ধুলো আর কাকড় ঘাসের ছিটেফোঁটাও থাকে না। এখন বর্ষায় ছবিটা সামান্য বদলেছে। বড়দের ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি সেখানেই চলে। বড় মাঠের দু-প্রান্তে লোহার পাইপ দিয়ে দুটো গোলপোস্ট তৈরি করা আছে।

আজ চ্যাম্পকে নিয়ে বেরোনোর সময় মিষ্টুকেও সঙ্গে নিতে চাইল বাপ্পা। কিন্তু পাপিয়া যে বারণ করতে পারে সেটা ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

আসলে পাপিয়া কাল রাতের টেলিফোনের কথাগুলো ভুলতে পারছিল না। শমিতের মুখ থেকে কথাগুলো শোনার সময় পাপিয়া ভয়ে শিউরে উঠেছে। এত নৃশংস হতে পারে কেউ! মিষ্টুর মতো ফুটফুটে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চায়! তাও আবার ওদের দিয়েই!

মিষ্টুকে ভালো করে দেখল পাপিয়া।

পরনে গোলাপি-সাদা চুড়িদার, মাথার লম্বা চুলে দুটো বিনুনি—তাতে রঙিন ব্যান্ড আঁটা। কপালে কালো টিপ। গলায় পাউডারের আবছা ছাপ।

এ-মেয়েকে দেখলেই গাল টিপে আদর করতে ইচ্ছে করে।

পাপিয়া ফোনের কথাগুলো বাপ্পাকে বলতে পারছিল না। ও ভয় পাচ্ছিল, মিষ্টু রাস্তায় বেরোলেই যদি কোনও বিপদ হয়! কী অনেক কথা জানে মিষ্টু, যার জন্য ওকে খুন করতে বলছে।

কিন্তু বাপ্পা কিছুতেই ওর জেদ ছাড়বে না। ও বারবার জিগ্যেস করছে, কেন তুমি বারণ করছ তোমাকে বলতেই হবে। নইলে বাবা অফিস থেকে ফিরলে আমি তোমার নামে

কমপ্লেন। করব।

বাপ্পার সঙ্গে-সঙ্গে মিষ্টুও বায়না করছিল। সুতরাং কোনও উপায় না দেখে পাপিয়া নিমরাজি হলো। তবে সাবধানের মার নেই—একথা ভেবে ও বাপ্পাকে বলল, চল, আজ আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

বাপ্পা একটু অবাক হলেও কিছু বলল না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা দিব্যি ফুর্তিতে হাঁটা দিল পার্কের দিকে। চ্যাম্প দুলকি চালে বাপ্পার পাশে-পাশে চলতে লাগল।

চ্যাম্পের দিকে তাকিয়ে মিষ্টু বাপ্পাকে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, বাপ্পাদাদা, ডোবারম্যানদের লেজ কাটা থাকে কেন?

বাপ্পা বিজ্ঞের মতো ভঙ্গি করে জবাব দিল, ডোবারম্যানের লেজ ঠিক টিকির মতো দেখতে। তাতে কুকুরের শো নষ্ট হয় বলে ডোবারম্যানের লেজ কাটা একেবারে মাস্ট। একদম ছোটবেলায় ওটা কেটে ফেলতে হয়। চ্যাম্পের লেজ আমাদের ডক্টর আঙ্কল কেটে দিয়েছে।

কথা বলতে বলতে ওরা চলে এল পার্কে।

দোলনাগুলোর কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল পাপিয়া।

সকালে দু-একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর রোদ উঠলেও পার্কের মাটি ভিজে সঁতসেঁতে। কিন্তু সেসব হৃক্ষেপ না করেই বাচ্চারা কলকলিয়ে ছুটোছুটি করছিল। মিষ্টু আর বাপ্পা একটা রবারের বল ছোঁড়াছুড়ি করে খেলতে লাগল। আর চ্যাম্প সেই বল ধাওয়া করে ওদের হুল্লোড়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। দু-একটা দিশি কুকুর চ্যাম্পকে লক্ষ করে ঘেউঘেউ করছিল, কিন্তু চ্যাম্প ওদের মোটেও পাত্তা দিচ্ছিল না।

তিনটে বেঞ্চিতে বেশ কয়েকজন পুরুষ-মহিলা বসে ছিলেন। এ ছাড়া দু-চারজন বয়স্ক মানুষ গল্প করতে করতে পায়চারি করছিলেন। আর কয়েকটা বেওয়ারিশ দিশি কুকুর এপাশ-ওপাশ ঘোরাঘুরি করছিল।

আকাশে বর্ষার কালো মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছিল। সূর্যের আলো সেখানে সোনালি জরির পাড় বসিয়ে দিয়েছে। আর পার্কের মাঠে, গাছের পাতায়, ঝকঝকে রোদ্দুর। একঘেয়ে বৃষ্টির ফাঁকে এই সুন্দর বিকেলটা সবাই উপভোগ করছিল।

খেলাধুলো ছুটোছুটিতে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। চ্যাম্পকে অনেকেই লক্ষ করছিল, ওকে নিয়ে মজা করছিল। ওর পিছনে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মিষ্টু। বাপ্পা ওর কাছে ছুটে যাওয়ার আগেই শার্ট-প্যান্ট পরা রোগা মতন একজন লোক মিষ্টুকে ধরে তুলল, ওর জামা কাপড় হাত দিয়ে ঝেড়ে দিল। তারপর সামান্য হেসে পকেট থেকে জাম্বো সাইজের একটা ক্যাডবেরি চকোলেট বের করে মিষ্টুর হাতে দিল।

পাপিয়া দূর থেকে মিষ্টুর পড়ে যাওয়াটা লক্ষ করেছিল। ও বেঞ্চি ছেড়ে উঠে হাঁটা দিল মিষ্টুর দিকে।

বাপ্পা আর চ্যাম্প মিষ্টুর কাছে পৌঁছোতেই লোকটি বাপ্পাকে হেসে বলল, ভয় নেই, সেরকম কিছু লাগেনি। তারপর মিষ্টুর থুতনি ধরে আদর করে বলল, ক্যাডবেরিটা তুমি পুরোটা একা-একা খেয়ো না দাদাকে দু-এক কামড় দিয়ো। টা-টা...।

লোকটি অলস পায়ে পায়চারি করতে করতে চলে গেল।

মিষ্টু আর দেরি করল না। চকচকে চোখে ক্যাডবেরি চকোলেটটার মোড়ক ছিঁড়তে লাগল। বাপ্পার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, বলল, বাপ্পাদাদা, আমি কিন্তু বেশি খাব–তোমাকে দুটো ব্লক দেব। আর আঙ্কল-আন্টির জন্যে..।

আচমকা মিষ্টুর হাত ফসকে ক্যাডবেরিটা পড়ে গেল মাটিতে।

কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ও। আর তখনই একটা ছুটন্ত বাচ্চা ওকে আলতো ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। ফলে চকোলেটটা আর সামলাতে পারেনি।

মিষ্টু ঝুঁকে পড়ে চকোলেটটা তুলে নিতে গেল। ততক্ষণে পাপিয়া ওর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পাপিয়া চেঁচিয়ে বলে উঠল, মিষ্টু, ওটা তুলবে না—খাবার জিনিস পড়ে গেলে কক্ষনও তুলতে নেই।

কিন্তু পাপিয়ার বারণ করার কোনও দরকার ছিল না। কারণ, চকোলেটটা পড়ে যাওয়ামাত্রই ঘুরঘুর করা দুটো দিশি কুকুর ওটার ওপরে বলতে গেলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুটোর মধ্যে যেটা গায়েগতরে বেশ মোটাসোটা সেটাই জিতে গেল। চকোলেটটা মুখে নিয়ে রাংতার মোড়কসমেত আয়েশ করে চিবোতে লাগল।

আসল ঘটনাটা ঘটল তার পরেই।

মিনিটখানেকের মধ্যেই কুকুরটা হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পা দাপিয়ে লেজ নেড়ে সরু গলায় ককিয়ে উঠল দুবার। তারপরই সব চুপচাপ।

কুকুরটার চোয়াল ঝুলে পড়ল। জিভ বেরিয়ে এল বাইরে। তার সঙ্গে খানিকটা সাদা ফেনা। ছিন্নভিন্ন রাংতার মোড়কটা ওর মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপরে।

ভয়ে পাপিয়ার মুখ দিয়ে একটা চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল। বাপ্পা আর মিষ্টু অবাক হয়ে মরা কুকুরটাকে দেখতে লাগল। ছোট-বড় তিনটে নেড়িকুকুর কান্নার কুঁইকুঁই শব্দ তুলে মৃতদেহটা শুঁকতে লাগল বারবার। আর চ্যাম্প চাপা গর্জন করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মরা কুকুরটাকে ঘিরে ছোটখাটো জটলা তৈরি হয়ে গেল। পাপিয়া আর দেরি না করে বাপ্পা আর মিষ্টুর হাত চেপে ধরে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। চ্যাম্পও ওদের সঙ্গে পা মিলিয়ে রওনা হল।

পাপিয়া টের পেল ওর শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

মায়ের সঙ্গে যেতে-যেতে বাপ্পা এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেই রোগা মতন লোকটাকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না।

মিষ্টু পাপিয়াকে বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, আন্টি, কুকুরটা হঠাৎ মরে গেল কেন? চকোলেট খেয়ে কি ওর অসুখ করেছে?

পাপিয়া অবোধ মেয়েটার দিকে তাকাল। ওর কান্না পেয়ে গেল। আর-একটু হলে কী হত, সেকথা ভেবে ও শিউরে উঠল। যারা টেলিফোন করেছিল, তারা তা হলে হাত গুটিয়ে বসে নেই! তারা পাপিয়াদের ওপরে নজর রাখছে, সুযোগ পেলে মিষ্টুকে খতম করার চেষ্টাও করছে! কিন্তু কেন?

আন্টি, বলো না, চকোলেট খেয়ে কুকুরটার কি অসুখ করেছিল?

মিষ্টুর প্রশ্নে বিব্রত হল পাপিয়া। কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

বাপ্পা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হ্যাঁ, অসুখ করেছিল।

যদি চ্যাম্প ওটা খেত তা হলে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হত বলো, বাপ্পাদাদা!

পাপিয়া আর থাকতে পারল না। মিষ্টুকে একহাতে জাপটে ধরে কেঁদে ফেলল ও। কান্না ভাঙা গলায় বলল, তুই ওটা খেলে কী সর্বনাশটা হতো সেটা একবার ভেবে দেখেছিস! এখনও বুঝিসনি চকোলেটটায় বিষ ছিল!

মিষ্টু অবাক চোখে পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। পাপিয়া হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

বাপ্পা জিগ্যেস করল, পুলিশে খবর দেবে, মা?

পাপিয়া মাথা নাড়ল? না, এখন না। আগে তোর বাবা অফিস থেকে ফিরুক, তারপর আলোচনা করে ঠিক করা যাবে।

মিষ্টু, বাপ্পা আর চ্যাম্পকে নিয়ে খুব সাবধানে রাস্তা পার হল পাপিয়া। সন্ধের আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ি, বাস, মিনিবাস হেডলাইট জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে। চারপাশের ব্যস্ততা আর হর্নের শব্দ পাপিয়াকে যেন পাগল করে দিচ্ছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও ফ্ল্যাটের নিরাপদ ঘেরাটোপে পৌঁছোতে চাইছিল।

ফ্ল্যাটে ফিরে হাঁফ ছাড়ল পাপিয়া। শমিত কখন বাড়ি ফিরবে এই চিন্তায় বারবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল। আজ আবার মিন্ধুকে নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়ার কথা। পার্কের ঘটনাটা শোনার পর শমিত কী বলবে কে জানে!

.

ডক্টর চিত্রলেখা দাশগুপ্তের চেম্বারে ঢুকতেই ফিনাইল কিংবা স্পিরিটের মতো একটা গন্ধ পাপিয়ার নাকে এল। অথচ ও ভালো করেই জানে, মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের চেম্বারে এরকম ওষুধপত্রের গন্ধ পাওয়ার কথা নয়। হয়তো এটা মনেরই কোনও কারসাজি।

ডক্টর দাশগুপ্তের চেম্বারটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হয়নি। পার্ক সার্কাসের গোলচক্করের একপাশে বেশ বড় একটা মিষ্টির দোকান। তার ঠিক পাশেই একটা পুরোনো বাড়ির দোতলায় ডক্টর দাশগুপ্ত বসেন সন্ধে সাতটা থেকে দশটা।

ফুটপাথে ঘেঁষাঘেষি করে বসা ফলের দোকানদারদের পাশ কাটিয়ে বাড়িটার ছোট্ট সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি এবড়োখেবড়ো, ভাঙাচোরা। দেওয়ালে ড্যাম্পের কালচে ছোপ। সিঁড়ির আলো বলতে একটা বালব।

ওপরে ওঠার সময় বেশ কয়েকজন ওদের পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল।

চেম্বারে যদি পেশেন্টের খুব ভিড় থাকে তা হলে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে। এত লোককে নামতে দেখে পাপিয়াকে বিড়বিড় করে বলল শমিত।

উত্তরে পাপিয়া শুধু মাথা নাড়ল।

বাড়ির বাইরের চেহারার তুলনায় চেম্বারটা দারুণ ঝকঝকে। চেম্বার দেখলেই ডাক্তারের ওপরে ভক্তি বেড়ে যায়। শমিত আর পাপিয়া কেমন যেন স্বস্তি পেল। বাপ্পা আর মিষ্টুর দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা ওদের খোশগল্পে মশগুল।

পেশেন্টের ভিড় বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল বলে আধঘণ্টা মতন অপেক্ষা করার পরই ডাক পেল শমিত।

কাচের সুইংডোর ঠেলে ডক্টর দাশগুপ্তের ঘরে ঢুকল ওরা।

ভদ্রমহিলা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। গায়ে হালকা সবুজ জমিতে বাদামি পাড়-বসানো তাঁতের শাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। ফরসা লম্বাটে মুখ। বয়েস বোধহয় পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে, কিন্তু মুখের মেকআপ তাকে প্রাণপণে পিছনদিকে টানছে। চোখের চাউনি আর চোয়ালের রেখা বলছে, ডক্টর দাশগুপ্তের অভিজ্ঞতা কিছু কম নেই।

ওঁর চেয়ার থেকে একটু দূরে ছোটমাপের চেয়ার-টেবিল নিয়ে একজন সেক্রেটারিগোছের মেয়ে বসে আছে। বয়েস কুড়ি কি বাইশ। ছিপছিপে, ফরসা, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। একটা নোটবই আর পেন নিয়ে লেখালিখির জন্য তৈরি।

ডক্টর দাশগুপ্তের রিভলভিং চেয়ারটার পিছনে ঘষা কাচের প্যানেল। তার ওপরে নানান সুন্দর সুন্দর পোস্টার লাগানো। তার ঠিক মাঝখানে একটা পোস্টারে বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে?

শরীর ভালো রাখবেন অবশ্যই,
কিন্তু মনের কথাটা ভুলে যাবেন না।
মন ভালো রাখা খুব জরুরি।

ছিমছামভাবে সাজানো ঘরে চারটে ছোট-ছোট চেয়ার আর একটা কাউচ। কাউচে কোনও রুগি আধশোওয়া হয়ে শুতে পারে। কে জানে, একটু পরেই মিষ্টুকে হয়তো ওখানে শুতে হবে। তারপর ডক্টর দাশগুপ্তের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ডক্টর দাশগুপ্ত বললেন যে, প্রথমে তিনি শমিত আর পাপিয়ার সঙ্গে আলাদা কথা বলবেন। তখন পাপিয়া বাপ্পা আর মিষ্টুকে বাইরের ঘরে পেশেন্টদের মাঝে বসিয়ে দিয়ে গেল। বাপ্পাকে চাপা গলায় বলল, কারও সঙ্গে কথা বলবি না...কেউ কিছু দিলে খাবি না। আর কোনওরকম প্রবলেম দেখলেই চেঁচাবি–চেঁচিয়ে আমাদের ডাকবি। আমাদের বড়জোর পাঁচ-দশ মিনিট লাগবে।

সত্যি-সত্যি দশ মিনিটের কমেই ব্যাপারটা মিটে গেল।

ওদের কাছ থেকে সব শুনলেন ডক্টর দাশগুপ্ত। পাপিয়া ওঁকে মিষ্টুর গল্পটা একটু ঘুরিয়ে বলেছে। বলেছে, মিষ্টু ওরই মেয়ে...আচমকা এরকম হয়ে গেছে। তাই ও মনোবিদের শরণাপন্ন হয়েছে।

এরপর মিষ্টুর সঙ্গে চিত্রলেখা দাশগুপ্ত কথা বললেন।

যেসব প্রশ্ন তিনি করলেন, তার সবগুলোই গত দু-দিনে পাপিয়া আর শমিত করে ফেলেছে।

প্রায় আধঘণ্টা মিষ্টুকে স্টাডি করার পর ডক্টর দাশগুপ্ত বললেন, দেখুন, আপনাদের মেয়ের কেসটা পিয়োরলি অ্যামনেশিয়ার কেস। তবে ওর টাইপটা হচ্ছে সাইকোজিনিক অ্যামনেজিয়া। যেহেতু ও মাথায় কোনও চোট পায়নি বলছেন সেহেতু বলতে পারেন

ব্যাপারটা ততটা মারাত্মক নয়। সেরকম হলে ওর মগজ স্মৃতি ধরে রাখতে পারত না। কিংবা কোনও ঘটনা স্মৃতি হিসেবে ওর স্মৃতিকোষে ঢুকতেই পারত না। মানে, ওর ব্রেইনে রিটেনশন ফেইলিয়োর হত...কিংবা কোনও ইনফরমেশন ওর ব্রেইনে রেজিস্টারই করত না। যে-স্মৃতি ওর হারিয়ে গেছে সেটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেত।

একটু দম নিয়ে বড় করে শ্বাস ফেললেন চিত্রলেখা দাশগুপ্ত। টেবিল থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিয়ে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, সাইকোজিনিক অ্যামনেশিয়ায় খুব ভয়ের কিছু নেই। ওর মেমোরি সব ঠিকঠাক আছে– মানে পুরোনো কোনও স্মৃতি ওর হারায়নি– শুধু ওর রিকল মেকানিজমটা ফেইল করছে। আরও এক্সপ্লেইন করে বলতে গেলে, দরকার মতো পুরোনো কথা ওর মনে পড়ছে না। অথচ ওর সাবকনশাস লেভেলে...মানে, অবচেতন স্তরে...সব স্মৃতিই পারফেক্ট রয়েছে। একমাস পর ওকে নিয়ে আসুন...একটু হিপনোটাইজ করে দেখব পুরোনো কথা কিছু বের করা যায় কিনা। এখন শুধু একটা স্টিমুল্যান্ট লিখে দিলাম...একটা ফাইল খাওয়ান...।

শমিত অনেকক্ষণ ধরেই উশখুশ করছিল, একটু ফাঁক পেতেই জিগ্যেস করে বসল, আচ্ছা, ডক্টর দাশগুপ্ত, মিষ্টুর এরকম হল কী করে?

চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন ডক্টর দাশগুপ্ত। চেয়ারে আয়েশ করে হেলান দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, ও বোধহয় সাংঘাতিক একটা শক পেয়েছে–মেন্টাল শক– যেটাকে ট্রমা বলে। হতে পারে, আবার সেরকম একটা শক পেলে সাডেনলি ওর স্মৃতি ফিরে আসবে। তবে সেটা পিয়োরলি চান্সের ব্যাপার। টেবিলের দিকে ঝুঁকে এলেন ডক্টর দাশগুপ্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওয়েল, লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট।

শমিতরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ফুটপাথের দোকানগুলো তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেছে। দুটো দিশি কুকুর জিভ বের করে বৃষ্টিতে বসে ভিজছে।

পাপিয়া ছাতা খুলল, তার নীচে মিষ্টুকে ডেকে নিল। শমিত আর ছাতা খুলল না। ও আর বাপ্পা একছুটে পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে।

বাপ্পা শমিতের পাশে বসল। আর পিছনের সিটে মিষ্টুকে নিয়ে পাপিয়া। গাড়ি স্টার্ট দিল শমিত। ওয়াইপার চালু করে হেডলাইট জ্বেলে দিল। গাড়ি ছুটল সি.আই.টি. রোড ধরে।

জলে ভেজা রাস্তায় গাড়িঘোড়া কম। বাস, মিনিবাসের কাচ তোলা–যাচ্ছেও বেশ ধীরে ধীরে। বাসস্টপের শেড আর গাড়িবারান্দার নীচে পথচারীর জটলা। ল্যাম্পপোস্টের সোডিয়াম-বাতির অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে ভেজা রাস্তায়।

তিন-সাড়ে তিন কিলোমিটার পেরোনোর পরই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

মিষ্টু তখন শমিতকে জিগ্যেস করেছে, আঙ্কল, আমার কী হয়েছে? আমি কি পুরোনো কথা সব ভুলে গেছি? হিপনোটাইজ মানে কী?

বাপ্পা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হিপনোটাইজ মানে সম্মোহন। অনেকটা ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার মতন...।

পাপিয়া মন্তব্য করল, হিপনোটাইজ করলে লোকে ঘুমিয়ে কথা বলে। ডাক্তারের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন ধর...।

পাপিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর কোথা থেকে ছুটে এসে শমিতের মারুতির পিছনে ধাক্কা মারল।

সংঘর্ষের শব্দ হল। ব্যাকলাইটের কভার ভেঙে মারুতির পিছনটা তুবড়ে গেল। শমিতের গাড়িটা ধাক্কার চোটে আচমকা এগিয়ে গেল সামনে।

মিষ্টু আর বাপ্পা চিৎকার করে উঠল। পাপিয়া ভয়ের চোখে মারুতির পিছনের কাচ দিয়ে অ্যাম্বাসাডরটাকে দেখল। শমিত রিয়ারভিউ মিরারে একপলক তাকিয়েই গাড়ি থামিয়ে

নামতে যাচ্ছিল। ভেবেছিল, অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভারকে দেখে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই গাড়িটা ছুটে এসে শমিতের মারুতিকে আবার ধাক্কা মারল। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকসিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিল শমিত। কারণ, বুঝতে পারল, এটা মোটেই অ্যাক্সিডেন্ট নয়। অ্যাম্বাসাডরটা ইচ্ছে করেই ধাক্কা মেরেছে ওর গাড়ির পিছনে। বিশেষ করে বিকেলে পার্কের বিষাক্ত চকোলেটের ঘটনাটার পর এটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক।

অফিস থেকে ফিরে পাপিয়ার কাছে সবই শুনেছে শমিত। শুনে পাপিয়ার কথাটাই মনে হয়েছে ওর : যারা ফোন করে মিষ্টুকে খুন করতে বলেছিল, তারা হাত গুটিয়ে বসে নেই! বাপ্পা কয়েকবার পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু পাপিয়া আর শমিত ওর পরামর্শে কান দেয়নি। কারণ, পুলিশে গেলেই আরও পাঁচকথা উঠবে। ওদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু হবে। তার চেয়ে মিষ্টুকে আগলে-আগলে রাখাই ভালো। শমিত তখন বলেছিল, আজ সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর পর মিষ্টুকে আর বাড়ির বাইরে বের করার দরকার নেই। যদি কোনওরকমে ওর পুরোনো সবকথা মনে পড়ে যায় তা হলে তখন নতুন করে ভাবা যাবে।

কিন্তু এই বিপদটা শমিত আশা করেনি। ও বুঝতে পারল, ওর হিসেবে ভুল ছিল।

মারুতি গাড়িটা শমিতের খুব প্রিয়। নিজের হাতে গাড়ির যত্ন নেয় ও। সব-সময় ঝাড়পোঁছ করে গাড়ি টিপটপ রাখে। এ-নিয়ে পাপিয়া প্রায়ই ওকে ঠাট্টা করে, কিন্তু শমিত সে-ঠাট্টা গায়ে মাখে না।

শমিত বুঝল, মারুতির পিছনদিকটা ভালোই তুবড়ে গেছে। তাতে প্রথমটায় ওর মনখারাপ হল, কিন্তু তারপরই রাগ হল।

আর ঠিক তখনই অ্যাম্বাসাডরটা খ্যাপা বুনো শুয়োরের গোঁ নিয়ে তেড়ে এল, প্রচণ্ড শব্দে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা মারল আবার। মারুতির পিছনের কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল।

পাপিয়া মিষ্টুকে জাপটে ধরে চিৎকার করে উঠল। মিষ্টুও ভয়ে আঁকড়ে ধরল ওকে। আচমকা ধাক্কায় বাপ্পার মাথার পিছনটা ঠুকে গেল হাইব্যাক সিটে। ও চেঁচিয়ে বলল, বাবা, কেয়ারফুল!

বৃষ্টির তেজ এখন অনেকটা বেড়ে গেছে। রাস্তায় ঠিকরে পড়ে লাফিয়ে উঠছে জলের কণা। ওয়াইপার প্রাণপণে কাজ চালাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামনে ভালো করে নজর চলে না। রিয়ারভিউ মিরারে শমিত অ্যাম্বাসাডরটার হেডলাইটের আলো দেখতে পাচ্ছিল। বৃষ্টির ফোঁটার আড়ালে গাড়িটাকে গোঁ-গোঁ করে ছুটে আসা একটা অপার্থিব জন্তু বলে মনে হচ্ছিল।

শমিতের রাগটা পালটে গেল অন্ধ রাগে।

ওরা তো কারও কোনও ক্ষতি করেনি। বরং স্মৃতি-হারানো একটা মেয়েকে আপন করে নিয়েছে। কোনও অন্যায় না করেই এরকম নিগ্রহ সইতে হচ্ছে ওদের! বিচার বলে সত্যি কি কিছু নেই?

অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে ওটা মেঝেতে মিশিয়ে দিল শমিত। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিল মারুতি। আয়নায় দেখল অ্যাম্বাসাডরটাও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

সিঙ্গল লেন রাস্তায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল শমিতের গাড়ি। অ্যাম্বাসাডরটাও প্রায় ছায়ার মতো আঁকাবাঁকা পথ ধরেই মারুতিটার পিছন পিছন ছুটে চলল।

হঠাৎ একটা পেট্রল পাম্প দেখতে পেল শমিত। তক্ষুনি ওর মাথায় খুন চেপে গেল।

পনেরো বছর বয়েস থেকেই ও গাড়ি চালায়। সেটা ছিল ওর বাবার অ্যাম্বাসাডর। তারপর যতই দিন গেছে ততই ধারালো আর নিখুঁত হয়েছে ওর গাড়ি চালানোর হাত। ওর হাতে পড়লে গাড়ি কথা বলে। এখন গাড়িকে দিয়ে কথা বলাতে ইচ্ছে করল ওর।

আচমকা মারুতিটাকে পেট্রল পাম্পে ঢুকিয়ে দিল শমিত। স্টিয়ারিং কাটিয়ে তেল নেবার মেশিন দুটোকে দুরন্ত গতিতে একটা পাক মেরে দিল।

পাম্পে গোটা চার-পাঁচেক গাড়ি গ্যারেজ করা ছিল। দুজন কর্মী কাচের প্যানেল দেওয়া অফিসঘরের মধ্যে বসে ছিল। কাচের ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ে একটা অদ্ভুত লেন্স তৈরি করেছিল। ফলে লোক দুটোকে ঝাপসা বিকৃত দেখাচ্ছিল।

মারুতিটাকে মারাত্মক স্পিডে ঢুকতে দেখেই অফিসঘর থেকে একজন লোক ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। হাত দিয়ে বৃষ্টি আড়াল করে ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

শমিতের মারুতি একটা পাক মেরেই সাপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেছে সামনের রাস্তায়। সেই গতিপথ অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভার হুবহু আঁচ করতে পারেনি। ফলে ঝড়ের বেগে পাম্পের ভেতরে ছুটে এসে স্টিয়ারিং কাটাতে গিয়েই বেচারি ধাক্কা মেরেছে তেল নেবার মেশিন দুটোকে। তারপর গাড়িটা মুখ উঁচিয়ে শূন্যে লাফিয়ে ছিটকে গেছে অফিসঘর লক্ষ্য করে। তবে কাচ ভাঙার শব্দের পর বাকি শব্দ আর শোনা যায়নি।

কারণ, প্রবল এক বিস্ফোরণ গোটা এলাকা কাঁপিয়ে দিল। হলদে-লাল আগুনের বিশাল একটা বল লাফিয়ে উঠল শূন্যে। পেট্রল পাম্পটা নিমেষে নেই হয়ে গেল।

শমিতের গাড়ি তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

রিয়ারভিউ মিরারে আগুনের ছায়াটা দেখতে পেল শমিত। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কপালের পাশে একটা শিরা দপদপ করছিল।

পাপিয়া মিষ্টুকে আঁকড়ে ধরে রীতিমতো কাঁদছিল। কান্না-ভাঙা গলায় বারবার বলতে লাগল, আস্তে চালাও, আস্তে চালাও...।

শমিত চোয়াল শক্ত করে চুপ করে রইল। ভাগ্যিস, আশেপাশে কোনও পুলিশ ছিল না। যদি থাকত তা হলে...।

বাপ্পা জানলার কাচ নামিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই গলা বাড়িয়ে আগুনের তাণ্ডবলীলা দেখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু শমিত এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল যে, ছবিটা খুব তাড়াতাড়ি ছোট হয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ি ফিরে গাড়ি গ্যারেজ করার সময় গাড়িটার শোচনীয় অবস্থা দেখতে পেল ভজনচাঁদ।

কেমন করে অ্যাক্সিডেন্ট হল, স্যার? কৌতূহলী ভজনচাঁদ জানতে চাইল।

শমিত বিড়বিড় করে একটা দায়সারা উত্তর দিল।

বাপ্পা আর মিষ্টুকে নিয়ে পাপিয়া ওপরে রওনা হতেই ভজনচাঁদ শমিতকে বলল, পুলিশে রিপোর্ট করেছেন, স্যার?

করেছি।

বহত আচ্ছা কিয়া। বদমাস গাড়ির পাইলটকে এবার ভারী কমপেনশন দিতে হবে।

শমিতের এতই ক্লান্ত লাগছিল যে, ও ভজনচাঁদের কমপেনশন-কে আর শুধরে কমপেনসেশান করল না। গাড়ি গ্যারেজ করে ভজনচাঁদকে দশটাকা বকশিশ দিল।

ভজনচাঁদ ভক্তিভরে সেলাম ঠুকতেই শমিত রওনা হল সিঁড়ির দিকে।

শমিত অথবা ফ্ল্যাটের অন্যান্য মালিক ভজনচাঁদকে সময়ে-অসময়ে বকশিশ দেয়, বিনিময়ে সেলামও পায়। কিন্তু আজ শমিতের নিজেকে কেমন অপরাধী লাগছিল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মিষ্টু আর বাপ্পা যে-যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শমিত আর পাপিয়ার ঘুম আসছিল না কিছুতেই।

শমিত একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে গা ঢেলে দিল। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, এবার ব্যাপারটা পুলিশে জানানো দরকার...।

পাপিয়া গম্ভীর থমথমে মুখে একটা ডিভানের ওপরে বসে ছিল, শমিতের কথার উত্তরে বলল, পুলিশে গিয়ে তুমি কী বলবে?

প্রথম থেকে যা-যা হয়েছে তা-ই বলব– বাচ্চা ছেলের মতো বলল শমিত।

বলবে যে, একটু আগে তুমি কয়েকটা লোককে খুন করেছ? ধারালো গলায় জিগ্যেস করল পাপিয়া।

তার মানে?

তার মানে, ওই অ্যাম্বাসাডরের ভেতরে যারা ছিল তারা কেউ আর বেঁচে আছে মনে করেছ! সব শুনলে পুলিশ তো তোমাকেই আগে অ্যারেস্ট করবে।

এখন তো আর না বলে উপায় নেই। ক্লান্ত গলায় শমিত বলল, কাল-পরশুর মধ্যে পুলিশ আমাদের বাড়িতে আসবেই। এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট...পুলিশ খোঁজ করবেই। খোঁজ করতে করতে যদি ওরা...। কথা শেষ না করেই থেমে গেল শমিত।

যদি ওরা কী? জিগ্যেস করল পাপিয়া।

শমিত সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে সেটাই বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

পাপিয়া আর শমিত এ-ওর দিকে তাকাল।

তারপর শমিতই উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

হ্যালো...।

শমিত রায়চৌধুরী বলছেন?

মিহি গলাটা ভালো করেই চিনতে পারল শমিত। ওর হাত-পা হঠাৎই ঠান্ডা হয়ে যেতে শুরু করল। ও কোনওরকমে বলল, হ্যাঁ বলছি।

অ্যাম্বাসাডর গাড়িটার দুজন লোক ছিল–বিনোদ আর সুধীর। সুধীর ড্রাইভ করছিল– ও মারা গেছে। একটু থামল নোকটা। তারপরঃ আর বিনোদ নার্সিংহোমে–মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে।

শমিত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমার কোনও দোষ নেই ওরা আমার গাড়িতে আগে ধাক্কা মেরেছে–একবার নয়, তিন-তিনবার। আমি ভয় পেয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছি...আমাকে ফলো করতে গিয়ে অ্যাম্বাসাডরটা পেট্রল পাম্পে ঢুকে মেশিনে ধাক্কা মারে...তাতে...।

আমি খোঁজ নিয়েছি..সবই আমি জানি..কিন্তু সবকিছুর গোড়ায় তো ওই মেয়েটা মিষ্টু। ওকে আপনি মেরে ফেলুন...তা হলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। আর আমরা যদি ট্রাই করি তাহলে বহত খুন-খারাবা হতে পারে।

ওইটুকু একটা ফুলের মতো মেয়েকে আপনি মারতে চাইছেন কেন? অনুনয়ের সুরে জিগ্যেস করল শমিত, ওকে আপনারা ছেড়ে দিন...।

উত্তরে নোংরাভাবে হাসল লোকটা। তারপর বলল, যদি আপনারা মিষ্টুকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা খুব কস্টলি হবে। অনেক দুঃখ অনেক পরেশানি হবে আপনাদের...।

আমরা ওকে...ওকে...ওকে...।

তোতলামি ছাড়ুন! লোকটা ধমক দিয়ে বলল, কালকের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলুন... নইলে আপনাদের যে কী হাল হবে, রাম জানে। রাম রাম। বলে ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।

পাপিয়া সব শোনার পর ভয় পেয়ে বলল, এখন কী হবে?

শমিত সিগারেটের শেষটুকু একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বলল, আমি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি–পুলিশে আমাদের খবর দিতেই হবে। আর কোনও পথ নেই।

কেন, পথ নেই কেন?

শমিত থেমে থেমে বলল, আমার গাড়ির পিছনের নাম্বার প্লেটটা দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় অ্যাম্বাসাডরের ধাক্কায় ওটা রাস্তাতেই খুলে পড়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে খোঁজ করতে করতে যদি পুলিশ আমাদের গাড়ির নাম্বার প্লেটটা খুঁজে পায় তা হলে ওরা দু-চারদিনের মধ্যেই এই ফ্ল্যাটে এসে হাজির হবে। কথা বলতে বলতে হতাশায় মুখে হাত চাপা দিল শমিত। বড়-বড় শ্বাস টেনে বলল, এই টেনশন আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আমিও আর পারছি না। পাপিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, কিন্তু মিষ্টুর কোনও ক্ষতি করতে পারব না। ওকে যে আমি ভালোবেসে ফেলেছি! কেঁদে ফেলল পাপিয়া : ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তুমি দ্যাখো, ওর গায়ে যেন কোনও আঁচ না লাগে। তুমি যা ভালো বোঝো করো–আমি আর পারছি না, আর পারছি না।

শমিত পাপিয়ার কাছে এসে ওর হাত ধরল, মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, কেঁদো না। আমাকে একটু ভাবতে দাও...।

.

০৪.

শুক্রবার সাতসকালে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল শমিত। ও মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে কাজ করে। তাই সেই ধরনের খবরগুলোয় খুঁটিয়ে চোখ বোলাচ্ছিল।

পাপিয়া চ্যাম্পকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছিল। আর রাস্তার দিকের ছোট্ট ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে মিষ্টু গান শোনাচ্ছিল বাপ্পাকে।

পাপিয়ার কান পড়ে ছিল মিষ্টুর গানের দিকে। ও শমিতকে বলল, শুনছ, তোমার মেয়ে গাইছে...।

শমিত কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে দেখল পাপিয়ার দিকে। অবাক হয়ে বলল, মেয়ে!

পাপিয়া হেসে ইশারা করে মিষ্টুকে দেখাল।

ভোরের আলোয় মেয়েটাকে দেখে শমিত কেমন যেন হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল মেয়ে-র গান।

শুন লো শুন লো বালিকা,
রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি,
শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুমমুঞ্জরি, ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায়...

ওইটুকু পুঁচকে মেয়ে, অথচ কী অসামান্য সুরের দখল! অবহেলায় সুরকে খেলাচ্ছে!

শমিতের চোখ আবেশে বুজে আসছিল।

আশ্চর্য! পুরোনো সবকথা ভুলে গেলেও গানটাতো ও ভোলেনি! এরকম কি হয়?

পাপিয়া শমিতের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল–খবরের কাগজের হেড-লাইনগুলো আনমনাভাবে পড়তে চেষ্টা করছিল। হঠাৎই ও চমকে উঠল।

কাগজের দুইয়ের পাতায় মিষ্টুর ছবি ছাপা হয়েছে।

ও এক ঠেলা মারল শমিতকে। বলল, শিগগির দ্যাখো! মিষ্টুর ছবি দিয়েছে কাগজে। ছবিটায় আঙুল ছোঁয়াল পাপিয়া। নীচু গলায় জিগ্যেস করল, এটা মিষ্টু না?

শমিতের আবেশ-টাবেশ তখন ছুটে গেছে। কারণ, ও ততক্ষণে ছবির নীচের চার-ছলাইন লেখাটাও পড়ে ফেলেছে:

আমাদের দশ বছরের মেয়ে মিষ্টু, ভালো নাম সঙ্গীতা, গত সোমবার বাগুইআটি বাসস্টপ থেকে নিখোঁজ। একটা শক পেয়ে পুরোনো সব কথা ও ভুলে গেছে। কোনও সহৃদয় বন্ধু দয়া করে ওর সন্ধান দিলে আমরা সাধ্যমতো পুরস্কার দেব, প্রাণে বাঁচব।
তন্ময় ও মালিনী হাজরা ফোন ৯৮৩১১০৪২৩২

বারবার মির ফটোগ্রাফটা দেখল শমিত।

নাঃ, ভুল হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে ওর বুকটা স্বস্তিতে হালকা হল, কিন্তু তারপরই ভারী হয়ে উঠল আবার। মিষ্টুর বাবা-মায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। ওঁরা এবার নিয়ে যাবেন ওঁদের আদরের মেয়েকে।

শমিতের বুকের ভেতরে একটা পাথর গড়াতে লাগল। ওর সেঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। এই চারদিনে ছোট্ট মেয়েটা ওদের সঙ্গে এত জড়িয়ে গেছে যে, এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে গেলে বুকের ভেতরে রক্তক্ষরণ হবেই।

পাপিয়ার মুখের দিকে তাকাল শমিত। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে মিষ্টুর ফটোটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। শমিত বুঝতে পারল পাপিয়ার বুকের ভেতরে ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

মিষ্টুর মা-বাবার কষ্টটা একবার ভেবে দ্যাখো...। আলতো করে বলল শমিত।

পাপিয়া চুপ করে রইল। ভাবল, আজকের সকালটা না হলেই ভালো হত।

শমিত বলল, কাগজটার কিছু একটা ব্যবস্থা করো...মিষ্টু বা বাপ্পা যেন ছবিটা না দ্যাখে। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

চা খাওয়া ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল শমিত। চোখ বন্ধ করে ডান হাতটা ভাঁজ করে রাখল চোখের ওপরে। ওর চা ঠান্ডা হতে লাগল।

পাপিয়া মিষ্টুর দিকে অপলকে তাকিয়ে খবরের কাগজটা ভাঁজ করতে লাগল।

মিষ্টুর গান শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন বাপ্পা ওকে অনভ্যস্ত গলায় দু-চারলাইন হিন্দি গান শোনাচ্ছিল। এরপরই হয়তো দুজনে অন্তাক্ষরী খেলা শুরু করে দেবে। তারপর অনেক বকাঝকা করলে বাপ্পা একটু বই নিয়ে বসবে।

শমিত গতকালের কথা ভাবছিল। গতকালটা খুব ঝামেলার মধ্যে কেটেছে শমিতের।

ওর দিনের প্রথম কাজ ছিল গাড়িটাকে গ্যারেজে পাঠানো। কিন্তু তার আগেই বেশ কয়েকজন প্রতিবেশীর সমবেদনা ওকে শুনতে হয়েছে।

কলকাতার মতো বিচ্ছিরি ট্র্যাফিক ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোনও শহরে নেই।

দেখুন গিয়ে, ড্রাইভারটা হয়তো নেশা-টেশা করে গাড়ি চালাচ্ছিল।

গ্যারেজে তো আপনার প্রায় পাঁচ-সাত হাজার টাকা লেগে যাবে।

ওই গাড়িটার কাছ থেকে কত টাকা আদায় করতে পারলেন?

গাড়ি সারানোর খরচা আপনার অফিস দেবে না? আপনার তো মশাই সাহেব-কোম্পানি!

শমিত মামুলি উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে।

গ্যারেজে গাড়িটাকে জমা করে দিয়ে এসে পুলিশের ব্যাপারটা নিয়ে পড়ল শমিত। অফিসে বেরোনোর সময় পাপিয়াকে ও বলল, আমাদের অফিসের প্রজেক্ট ম্যানেজার চন্দ্রদেও আগরওয়ালের পুলিশে কিছু জানা-চেনা আছে। আজ ওর সঙ্গে কথা বলে ওর চেনা কোনও অফিসারের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে সেই পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে যাব। তাঁকে সব বলে দেখি কী সাজেশান দেন…।

কী হয় আমাকে ফোন করে জানিয়ো…নইলে খুব টেনশন হবে। পাপিয়া বলল।

শমিত মাথা নেড়ে বলল, করব। শোনো, আজ ফিরতে আমার একটু দেরি হতে পারে। তুমি ওদের নিয়ে খুব সাবধানে থাকবে। বাপ্পাকে স্কুলে দিয়ে আসা বা নিয়ে আসার সময় অ্যালার্ট থাকবে। আনোন কোনও লোককে ফ্ল্যাটের দরজা খুলবে না। বিকেলে পার্কে বেরোলে চ্যাম্পকে তো সঙ্গে নেবেই, তা ছাড়া লোকজনের মাঝে থাকবে..ফাঁকা জায়গায় একা-একা তোমরা ঘুরবে না। আর কোনও প্রবলেম হলেই আমাকে মোবাইলে ফোন করে দেবে।

শমিত অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর পাপিয়া বাপ্পাকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে, অচেনা কোনও লোকের কাছে যাবি না, কথা বলবি না…আর কিছু দিলেও নিবি না।

চকোলেটের ঘটনাটা বাপ্পার মাথায় আছে। সুতরাং হেসে মাকে আশ্বস্ত করল ও, বলল, ডোন্ট উয়ারি, মা, আমি কেয়ারফুল থাকব।

এরপর পাপিয়া যখনই রাস্তায় বেরিয়েছে তখনই বাজপাখির চোখে চারদিকে নজর রেখেছে। আর বাপ্পাও কম যায় না! সবসময় মাকে আর মিষ্টুকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে

চলাফেরার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বিকেলে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার সময়েও ওরা যথেষ্ট সাবধান ছিল।

রাতে প্রায় পৌনে আটটার সময় শমিত অফিস থেকে ফিরেছে।

পাপিয়া সারাটা দিন ওর বাড়ি ফেরার প্রহর গুনেছে, বারদুয়েক ফোনও করেছে শমিতকে। এখন ও বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসামাত্রই পাপিয়া ওকে চেপে ধরেছে : অফিসের কনট্যাক্টে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু হল?

শমিত বলল, কথা হয়েছে, তবে ফোনে। সেই অফিসার বলেছেন, মিষ্টুর ব্যাপারটা আর অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা সেপারেটলি ট্রিট করতে। ভদ্রলোক আগরওয়ালের খুবই ক্লোজ। উনি বলেছেন, লালবাজারের মিসিং পারসন্স স্কোয়াডে একবার কথা বলবেন। আর একটা ইমপরট্যান্ট অ্যাডভাইস দিয়েছেন : পুলিশ যদি কখনও মিষ্টুর ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করে তাহলে যেন সত্যি কথাই বলা হয়।

এরপর ওরা চারজন লুডো খেলতে বসেছে ড্রইং-ডাইনিং-এ। আর চ্যাম্প মেঝেতে শুয়ে একমনে টিভি দেখছিল। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট কিংবা ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলে পশুপাখির ছবি দেখালেই চ্যাম্প একমনে সেগুলো দ্যাখে। তখন টিভি অফ করলেই ও চিৎকার শুরু করে দেয়। চ্যাম্পের এই অদ্ভুত নেশাটা বাপ্পার আবিষ্কার।

লুডো খেলতে খেলতে যখন ওরা মশগুল, পাকা ঘুঁটি-কাঁচা ঘুঁটির দান নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-চেঁচামেচি করছে, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠল।

শমিত উঠে গিয়ে ফোন ধরল। তার আগে আড়চোখে তাকাল দেওয়াল-ঘড়ির দিকে : সাড়ে নটা পেরিয়ে মিনিটদশেক হয়েছে।

হ্যালো।

শমিত রায়চৌধুরী? সেই মিহি গলা, তবে গলায় বিরক্ত ওপরওয়ালার সুর।

হ্যাঁ, বলছি...।

মিষ্টু এখনও বেঁচে আছে কেন?

এ-প্রশ্নের কী জবাব দেবে শমিত ঠিক বুঝতে পারল না। ও আমতা-আমতা করতে লাগল।

এখনও কেন বেঁচে আছে মেয়েটা? রুক্ষ অধৈর্য সুরে বুলেটের মতো ছুটে এল প্রশ্নটা।

শমিত আমতা-আমতা করে বলল, আমরা ওকে...ওকে..মারতে পারব না..আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়...প্লিজ... আপনি একটু বুঝতে চেষ্টা করুন...।

শমিত টেলিফোনে কাঁপা গলায় এইসব বলছিল আর তিনজন লুডো-খেলোয়াড় হাঁ করে ওর কথাগুলো গিলছিল।

বড় বেডরুমের দরজার কাছেই টেলিফোন। ফলে শমিতকে ওরা যেমন দেখতে পাচ্ছিল তেমন শুনতে পাচ্ছিল ওর কথা। শুনতে-শুনতে পাপিয়ার চোখ-মুখ কেমন যেন বদলে যাচ্ছিল।

ওসব বাজে বকওয়াস ছেড়ে কান খুলে শুনুন। এই সপ্তাহের মধ্যে কাজটা ফিনিশ করে দিন...দরকার হয় পাঁচ-দশ হাজার টাকাও দেব আপনাকে...গাড়িটা ভালো করে রিপেয়ার করিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি এই উইকের মধ্যে কাজটা ফিনিশ করতে না পারেন, তাহলে মেয়েটাকে রাস্তায় একা বের করে দিন, আমরা কাজ ফিনিশ করে দেব। আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েও আমরা কাজটা করতে পারি, কিন্তু তাতে মিষ্টুর সঙ্গে-সঙ্গে আরও দু-চার পিস জান বেহুদা খরচা হয়ে যাবে। সেটা তো ভালো হবে না...।

ঠিক আছে, ঠিক আছে...আমি দেখছি কী করা যায়...প্লিজ, আমাদের একটু ভাববার সময় দিন...প্লিজ...।

কিন্তু ততক্ষণে ও-প্রান্তের লোকটা ফোন রেখে দিয়েছে।

শমিত ঘামতে শুরু করেছিল। পাপিয়া, বাপ্পা আর মিষ্টু ওকে জরিপ করছিল। শমিতের ভয় হচ্ছিল, ওরা বোধহয় ওর বুকের ধড়াস ধড়াস আওয়াজগুলো শুনতে পাবে। ওর বারবার মনে হচ্ছিল, এই শহরে সাধারণ মানুষ কত অসহায়।

শমিত রিসিভার নামিয়ে রাখল।

কী হয়েছে, বাবা! কে ফোন করেছে? বাপ্পা জিগ্যেস করল।

আঙ্কল, তুমি এত ঘামছ কেন? মিষ্টু জানতে চাইল।

পাপিয়া ওদের প্রশ্নগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, চল তো, তোরা এখন খেতে চল। চট করে হাত-মুখ ধুয়ে নে...। উঠে দাঁড়িয়ে ওদের তাড়া লাগাল পাপিয়া।

শমিত বেডরুমের দরজা থেকে ধীরে-ধীরে পা ফেলে ড্রইং-ডাইনিং-এ এল।

ওরা কাকে মেরে ফেলতে বলছে, আঙ্কল?

মিষ্টু প্রশ্নটা করতেই পাপিয়া ডুকরে কেঁদে উঠল। ওকে জড়িয়ে ধরে কান্না চাপতে-চাপতে বলল, ওটা পাগলের ফোন..ওসব কথা তোরা শুনিস না...।

ব্যাপারটা তখনকার মতো মিটে গেলেও বাপ্পা আর মিষ্টুর মনে খটকা লেগেই রইল।

রাতে বাপ্পা আর মিষ্টু ঘুমিয়ে পড়লে শমিত আর পাপিয়া ড্রইং-ডাইনিং-এ টিভি দেখতে বসেছে। কিন্তু টিভির ছবি কিংবা কথা ওদের মাথায় ঢুকছিল না। ঘরের আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে ছিল ওরা দুজনে। টিভির পরদার আলো ওদের থমথমে মুখে হাইলাইট তৈরি করেছে। শমিত একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। আর পাপিয়া বারবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল যেন তিনি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ বলে দেন।

মিষ্টুকে কী করে খুন করবে ওরা! কী করে রাস্তায় বের করে দেবে মেয়েটাকে! মানুষ কখনও এমন কাজ পারে না। এমন কাজ করতে হলে অমানুষ হতে হয়–টেলিফোন করা ওই লোকটার মতো। যার বাইরের চেহারাটা মানুষের মতো–ভেতরটা নয়।

এক অদ্ভুত দোটানায় দুলতে-দুলতে কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থেকেছে পাপিয়া আর শমিত। ভেবেছে, এখন ওদের কী করা উচিত। ভাবতে-ভাবতে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু পথের হদিশ মেলেনি। সারাটা রাত প্রায় জেগে কাটিয়ে হঠাৎই শমিত দ্যাখে আকাশ কখন যেন ফরসা হয়ে গেছে।

তারপর আজ সকালের খবরের কাগজ ওদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। পুলিশের ভয় আর নেই। টেলিফোনে হুমকির ভয়ও আর থাকবে না। ভগবান নিশ্চয়ই পাপিয়ার আকুল প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাপিয়া বা শমিত খুশি হতে পারছে না কেন!

পাপিয়া খবরের কাগজটা ভাঁজ করে শোবার ঘরের আলমারির মাথায় তুলে রাখতে যাচ্ছিল, শমিত হঠাৎই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, ওকে ডাকলঃ কাগজটা দাও।

কেন?

মিষ্টুর বাড়িতে ফোন করব। এভাবে আমি আর পারছি না...এখন এটাই একমাত্র পথ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শমিত, বড় বেডরুমটার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল।

পাপিয়া শমিতকে দেখল। ওর চোখে প্রতিজ্ঞা, চোয়াল শক্ত। সত্যিই ও আর পারছে না। এই কদিনেই চোখের কোল কেমন বসে গেছে।

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে শমিতের কাছে এল পাপিয়া। শমিতের দিকে না তাকিয়ে কাগজটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। ধরা গলায় অস্পষ্টভাবে বলল, যা ভালো বোঝো করো...।

শমিত কোনও কথা বলল না। রোবটের মতো আবেগহীনভাবে চলে গেল টেলিফোনের কাছে। খবরের কাগজ দেখে মোবাইল নম্বরটা ডায়াল করল।

পাপিয়া পাথরের মূর্তি হয়ে শমিতকে দেখতে লাগল। ওর সবরকম বোধ কেমন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।

হ্যালো, মিস্টার তন্ময় হাজরা বলছেন?

হ্যাঁ বলছি। ওপাশ থেকে উত্তর ভেসে এল।

লাইনটা একটু ডিসটার্ব করছিল। তাই শমিত একটু গলা তুলেই বলল, আপনাদের দেওয়া অ্যাডটা দেখে ফোন করছি। আমার নাম শমিত রায়চৌধুরী। আপনাদের মেয়ে মিষ্টু আমাদের কাছে আছে...।

সত্যি? সত্যি বলছেন? ভদ্রলোক আকুল গলায় জিগ্যেস করলেন।

হ্যাঁ, সত্যি... কথা বলতে গিয়ে মনের আবেগ চাপতে পারছিল না শমিত। তাই সংক্ষেপে কথা শেষ করার জন্য বলল, আজ সন্ধেবেলা সাতটা নাগাদ আপনারা আমাদের বাড়িতে আসুন...এলে ডিটেইলসে সব জানতে পারবেন...।

তারপর শমিত ওঁদের ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিল। কীভাবে এই ফ্ল্যাটে আসতে হবে তাও বলে দিল।

তন্ময় হাজরা শমিতকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, মেয়েকে হারিয়ে ওঁর স্ত্রী মালিনীর প্রায় পাগলের মতো অবস্থা। এরকম অবস্থায় আরও এক-দু-সপ্তাহ কেটে গেলে ওঁর কী হত বলা যায় না। আজ সন্ধে সাতটার সময় তিনি অবশ্যই স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন।

ফোনটা করা হয়ে গেলে শমিত কিছুক্ষণ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাপিয়াকে দেখল, দেখল মিষ্টু আর বাপ্পাকেও। শমিতকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, মনে-মনে ও কিছু একটা ভাবছে।

মিনিটখানেক পরেই ও বাপ্পা আর মিষ্টুকে কাছে ডাকল। ওরা আসতেই শমিত হেসে বলল, শোন, তোদের একটা দারুণ খবর দেব। আজ আমি অফিস ছুটি নিচ্ছি। আর, বাপ্পা, তুই আজ স্কুলে যাবি না…।

কেন, বাবা?

আজ সারাটা দিন আমরা হইহই করে ছুটি কাটাব। ট্যাক্সি নিয়ে গোটা কলকাতা ঘুরব। তাজ বেঙ্গলে লাঞ্চ খাব। দুপুরের শো-তে একটা সিনেমা দেখব…তারপর ময়দানে হাওয়া খাব, ভিক্টোরিয়ায় বেড়াব, তোদের জন্যে নতুন ড্রেস কিনব, মিষ্টুর জন্যে খেলনা কিনব..যা খুশি তাই করব। বলো, দারুণ জমবে না?

শেষ প্রশ্নটা শমিত করেছে পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে।

পাপিয়া মানুষটার ভেতরের কষ্ট বুঝতে পারছিল। ওর মন ঝলসে যাওয়ার গন্ধ পাচ্ছিল নাকে। শমিতের বাইরেটা হাসিখুশিতে টগবগে, কিন্তু ওর চোখের কোণে জলের ফোঁটা চিকচিক করছিল।

পাপিয়া কষ্ট করে হাসল, উজ্জ্বল হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বলল, সত্যি, দারুণ হবে। আজকের দিনটা মিষ্টুর বহুদিন মনে থাকবে।

তারপরই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল ওদের ফ্ল্যাটে। শমিত অফিসে ফোন করে বলে দিল, আজ ও ছুটি নিচ্ছে। পাপিয়া দশভুজা হয়ে রোজকার কাজ সারতে লাগল। তারপর কোনওরকমে ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা চারজন বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চ্যাম্পকে ওরা জমা রেখে গেল পাশের ফ্ল্যাটের নিরঞ্জনবাবুর কাছে। খুব বেশি সময়ের জন্য বাইরে বেরোলে শমিত আর পাপিয়া চ্যাম্পকে নিরঞ্জনবাবুর জিম্মায় দিয়ে যায়।

সত্যি, আজ ওদের চারজনের যেন স্বাধীনতা দিবস।

শুধু ট্যাক্সিতে ওঠার সময় পাপিয়া চাপা গলায় শমিতকে মনে করিয়ে দিল, সাড়ে ছটার মধ্যে কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে। ওঁরা সাতটার সময় আসবেন…।

শমিত ছোট্ট করে হুঁ বলল।

.

০৫.

ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল ঠিক সাতটায়।

বেলের আওয়াজে পাপিয়া চমকে উঠল।

শমিত তাকাল মিষ্টুর দিকে।

মেয়েটা এখনও কিছু জানে না। অনেকবার বলতে চেয়েও শমিত কিংবা পাপিয়া ওকে কিছু বলতে পারেনি। শুধু কয়েকবার ওকে সঙ্গীতা বলে ডেকে দেখেছে, কিন্তু মিষ্টু সে-ডাকে সাড়া তো দেয়ইনি, উলটে অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে, কে সঙ্গীতা? কাকে সঙ্গীতা বলে ডাকছ?

সারাদিন উদ্দামভাবে বেড়ানোর পর ওরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সওয়া ছটা নাগাদ ফিরেছে। কিন্তু বাপ্পা আর মিন্তুর উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ওরা নতুন কিনে আনা ড্রেস আর খেলনা নিয়ে ড্রইং-ডাইনিং-এ বসে পড়েছে। প্রতিটি জিনিস ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চকচকে চোখে দেখছে, তারিফ করছে।

শমিত পাশের ফ্ল্যাট থেকে চ্যাম্পকে নিয়ে আসামাত্রই ও কুঁইকুঁই করে বাপ্পাকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল, বারবার নাক ছোঁয়াল বাপ্পার গায়ে।

শমিত একটা চেয়ারে বসে একের পর এক সিগারেট খাচ্ছিল আর মিণ্টুকে দেখছিল। পাপিয়া নানান কাজে এ-ঘর সে-ঘর করছিল বটে, কিন্তু শমিত লক্ষ করল ওর সারা মুখে বর্ষার মেঘ।

বিকেল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। একটু আগে সেটা কয়েক ডিগ্রি বেড়েছে। কোথায় যেন ছড়ছড় করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে।

কলিংবেল বাজতেই শমিত উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা।

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করে বললেন, আমরা শমিতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাদের…আই মিন..সাতটায় সময় আসার কথা ছিল..মানে…।

আপনার নাম? শমিত বুঝতে পারছিল প্রশ্নটা অবান্তর, কিন্তু ও এতটুকুও সন্দেহের ফাঁক রাখতে চাইল না। কারণ, টেলিফোনের ভয়-দেখানো কথাগুলো ওর কানে ভাসছিল।

আ-আমি তন্ময় হাজরা। থতিয়ে বললেন ভদ্রলোক। পাশে দাঁড়ানো মহিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আমার ওয়াইফ..মালিনী। আমরা…আই মিন…মিণ্টুর…মানে, ইয়ে…সঙ্গীতার খোঁজে এসেছি…।

কোথায়? আমার মেয়ে মিষ্টু কোথায়? কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন মালিনী।

শমিত ওঁদের ভেতরে আসতে বলল।

তন্ময় হাজরার গায়ের রং ময়লা। চেহারা বেঁটেখাটো। মাথায় টাক। চোখে সাধারণ চশমা। পরনের জামা-প্যান্টও মামুলি। বয়েস বড়জোর চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ—শমিতের কাছাকাছি। কথাবার্তায় কেমন একটা মিনমিনে সঙ্কুচিত ভাব।

কিন্তু মালিনীকে দেখে একটু অবাক হলো শমিত।

ফরসা ছিপছিপে ধারাল রূপসি। পরনে দামি সিল্কের শাড়ি। বয়েস খুব বাড়িয়ে বললে সাতাশ কি আঠাশ। নাক-মুখ-চোখ এত সুন্দর যে, মালিনী সহজেই টিভি সিরিয়ালের নায়িকা হতে পারেন। তন্ময়ের স্ত্রী হিসেবে ওঁকে কেন যেন বেশ বেমানান লাগছিল।

তন্ময়ের হাতে বড় একটা মিষ্টির প্যাকেট ছিল। সেটা শমিতের হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। মালিনীর হাতে এক বিশাল মাপের পলিথিনের ঝোলা—তাতে বেশ কয়েকটা রঙিন বাক্স চোখে পড়ছে। ওঁর চোখ চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল—মিষ্টুকেই খুঁজছিল বোধহয়। কিন্তু একটু আগেই মিষ্টু উঠে টয়লেটে গেছে। তাই মালিনী আকুলভাবে শমিতের দিকে তাকালেন, তারপর তাকালেন স্বামীর দিকে।

চ্যাম্প তন্ময় আর মালিনীকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছিল, বারবার নাক ঠেকাচ্ছিল ওঁদের পোশাকে।

শমিত ওঁদের সোফায় বসতে বলল। তারপর অন্দরের দিকে তাকিয়ে একটু উঁচু গলায় হাঁক পাড়ল, পাপিয়া, তন্ময়বাবুরা এসেছেন...।

বাপ্পা হাঁ করে মিষ্টুর মা-বাবাকে দেখছিল। আজ সারাদিন ধরে বেড়ানোর সময় পাপিয়া ওকে সবকথা বলেছে। বলেছে, আজ মিষ্টুর মা-বাবা মিষ্টুকে নিতে আসবেন।

বাপ্পার ভীষণ মনখারাপ লাগছিল। মিষ্টু চলে যাবে ওদের বাড়ি ছেড়ে!

এমন সময় মিষ্টু আর পাপিয়া একসঙ্গে ড্রইং-ডাইনিং-এ এল। ওদের নজর সরাসরি গিয়ে পড়ল অতিথি দুজনের দিকে। শমিত লক্ষ করল মিষ্টুর চোখে কৌতূহল।

মালিনী হঠাৎ সোফা ছেড়ে ছিটকে উঠে পড়লেন। মিষ্টু– বলে এক তীব্র হাহাকার তুলে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলেন মিষ্টুকে। চুমোয়-চুমোয় ওকে অস্থির করে তুললেন।

মিষ্টু...আমার মিষ্টু সোনা! তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে, মা-মণি? তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমি তো মরেই যাচ্ছিলাম! মা-মণি আমার...। মালিনীর গলা কান্নায় জড়িয়ে গেল।

তন্ময়ও সোফা ছেড়ে উঠে চলে গেলেন মিষ্টুর কাছে। ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

শমিত লক্ষ করল তন্ময়ের চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

পাপিয়া আকুল বাবা-মাকে দেখছিল আর চোখ মুছছিল। হারানো-সন্তানকে ফিরে পাওয়া মানে শরীর আর প্রাণের মিলন। এ-দৃশ্য এত আনন্দের যে, আবেগকে ধরে রাখা যায় না।

এরপর যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল শমিতদের ফ্ল্যাটে।

মালিনী ওঁর পলিথিনের ঝোলা থেকে রঙিন বাক্সগুলো বের করলেন। বাক্সগুলো খুলতেই বেরোল রং-বেরঙের খেলনা। সেগুলো দিয়ে ফিরে-পাওয়া মেয়েকে একেবারে মুড়ে দিলেন। বাবা মায়ের আদরে-আদরে মিষ্টু একেবারে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটা সবসময়েই মালিনীকে অপরিচিতের চোখে দেখতে লাগল।

সারাদিন বাইরে ঘুরবে বলে কাজের লোককে শমিতরা ছুটি দিয়েছিল। তাই তন্ময়দের জন্য মিষ্টি কিনতে শমিত নিজেই বেরোল। তন্ময়দের কোনও আপত্তি শুনল না।

মালিনী আর তন্ময় বাপ্পার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটা খেলনা ওকে দিয়ে মালিনী বললেন, এই অটোমেটিক রিভলভারটা তুমি নাও মিষ্টু খুশি হবে।

ওদের কথাবার্তায় মাঝেই ফিরে এল শমিত। ওর হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে তন্ময় আর মালিনীর আপ্যায়ন সারল পাপিয়া।

তারপর সবাই মিলে গোল হয়ে বসে দুনিয়ার গল্প শুরু হয়ে গেল।

শমিত বলল, কীভাবে মিষ্টুকে ওরা রাস্তায় পেয়েছে। তবে ভয়-দেখানো ফোনের কথাও বলল না, আর অ্যাম্বাসাডরের অ্যাক্সিডেন্টের কথাটাও বলল না। শুধু বলল, মিষ্টুর স্মৃতি হারিয়ে যাওয়ার কথা। ওকে নিয়ে গিয়ে যে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হয়েছে সে কথা জানাল। আর সবশেষে বলল, নানান সাত-পাঁচ ভেবে ওরা মিষ্টুকে পেয়ে পুলিশে কোনও খবর দেয়নি। তখন পাপিয়া পুলিশে খবর না দেওয়ার কারণগুলোও বলল।

তন্ময় হঠাৎই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। নীচু গলায় বললেন, আমরাও ওকে ডাক্তার... আই মিন...সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাচ্ছিলাম। কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট তো সেরকম কিছু হল না। ডক্টর বলেছেন, চেষ্টা করতে করতে কোনদিন হঠাৎই ওর মেমোরি ফিরে আসবে...আই মিন... সব কথা মনে পড়ে যাবে।

তন্ময়ের কথা শুনতে-শুনতে আঁতকে উঠল পাপিয়া। মিষ্টুর যদি সবকথা মনে পড়ে যায় তা হলেই তো সর্বনাশ! টেলিফোনে ওই লোকটা বলেছিল, মিষ্টু অনেক কথা জানে। সেসব কথা মনে পড়ে গেলে ওদের যাচ্ছেতাই বিপদ হবে।

তন্ময় ও মালিনীর সঙ্গে চায়ের পালা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল শমিত। টেলিফোনের কথাগুলো ওর মনেও একইসঙ্গে খোঁচা মারছিল। তন্ময় আর মালিনীকে কি টেলিফোনের ব্যাপারটা জানানো উচিত? কিন্তু সেটা বলতে গেলেই তো আরও অনেক কথা

বলতে হবে। তারপর যে-জিনিসটা ওরা সবচেয়ে বেশি এড়াতে চাইছে, সেটাই ঘুরেফিরে এসে পড়বে : পুলিশ।

শমিত পাপিয়ার দিকে তাকাল। চোখে-চোখে কথা হল ওদের। পাপিয়া ছোট্ট করে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল–যার মানে, না, বোলো না।

শমিত তখন তন্ময়দের জিগ্যেস করল, কিন্তু হঠাৎ করে ওর মেমোরি লস হলো কী করে? ও কি কোনও শক-টক পেয়েছিল?

তন্ময় হাজরাও চায়ের পর সিগারেট ধরিয়েছিলেন। শমিতের কথার উত্তরে মালিনী কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তন্ময় সিগারেটসমেত হাত শূন্যে তুলে ইশারায় ওঁকে বাধা দিলেন। তারপর আড়চোখে তাকালেন মিষ্টুর দিকে।

মিষ্টু তখন বাপ্পার সঙ্গে ক্রিকেট খেলা শুরু করে দিয়েছে।

মালিনীর আদরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই মিষ্টু চলে গেছে বাপ্পার কাছে। বাপ্পা কোথা থেকে একটা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে এসেছিল, সেটা দেখেই মিষ্টু একটা বল নিয়ে ওর সঙ্গে মেতে উঠেছে। বাবা-মায়ের সম্পর্কে ওর কোনওরকম আগ্রহ আছে বলে মনে হল না।

ওর দিকে ইশারা করে তন্ময় বললেন, দেখেছেন, আমাদের নিয়ে মিষ্টুর কোনওরকম মাথাব্যথা নেই! এটা আমাদের কাছে কত পেইনফুল ভাবুন তো! ভাবুন তো, আপনার ছেলে আপনাকে…আই মিন…চিনতে পারছে না! কেমন লাগবে সেটা! ওঃ! মাথা নীচু করলেন তন্ময় ও আসলে কী জানেন? ওর এই মেমোরি লসের জন্য আমরাই ইনডিরেক্টলি দায়ী।

কেন, আপনারা দায়ী কেন? পাপিয়া প্রশ্ন করল।

মালিনী আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তন্ময় ওঁকে বাধা দিয়ে বললেন, মালিনী, প্লিজ, আমাকে বলতে দাও। আমার যদি কোথাও গ্যাপ পড়ে যায়…আই মিন ভুল-টুল হয়, তখন তুমি আমাকে শুধরে দিয়ো।

সিগারেটে বারদুয়েক টান দিলেন তন্ময়। চ্যাম্পকে একবার দেখলেন। তারপর খানিকটা আনমনাভাবে বললেন, সবই আমাদের কপাল, মিস্টার রায়চৌধুরী! আমাদের বাড়ি তালতলা অঞ্চলে…আই মিন…এস.এন.ব্যানার্জি রোডে। মাসখানেক আগে আমরা মিষ্টুকে বউবাজারে ওর এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাই। পরদিন ওর ফিরে আসার কথা। শ্রেয়া… আই মিন ওর বন্ধু…বলেছিল, আঙ্কল, সঙ্গীতা আমাদের বাড়িতে দু-তিনদিন থাকুক, তারপর বাপি ওকে বাড়ি দিয়ে আসবে। আমরা..আই মিন আমি আর মালিনী…রাজি হইনি। মিষ্টু আমাদের এমনই একটা জ্যান্ত খেলার পুতুল যে, ওকে ছেড়ে আমরা একটুও থাকতে পারি না। যাই হোক, পরদিন বিকেলে মিষ্টুকে দিয়ে আসার জন্যে শ্রেয়ার বাপি… আই মিন সুদেববাবুকে..আমি বারবার করে রিকোয়েস্ট করলাম। তিনি রাজি হলেন। আমরা চলে এলাম…।

কিন্তু পরদিন বিকেলে মিষ্টু এল না। তখন আমি ওদের বাড়িতে ফোন করলাম। ফোন বেজেই চলল–কেউ ধরল না। তখন আমার আর মালিনীর খুব দুশ্চিন্তা হল। বুঝতেই পারছেন, কোয়াইট ন্যাচারাল। মালিনী তো কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ওকে অনেক কষ্টে শান্ত করে সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি শ্রেয়াদের বাড়ি রওনা হলাম। পথে ভাবতে-ভাবতে গেলাম যে, শ্রেয়ার বাপিকে…আই মিন সুদেববাবুকে…আচ্ছা করে দু-চারকথা শুনিয়ে দেব। বলব যে, মশাই, এই আপনার কাণ্ডজ্ঞান! এদিকে চিন্তায়-চিন্তায় আমরা মরছি!

ওদের বাড়ি পৌঁছে দেখি ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। বাড়ি একেবারে খাঁ-খাঁ…আই মিন বাড়িতে কেউ নেই। শ্রেয়াদের ছোট একতলা বাড়ি–নিজেদের বাড়ি, কোনও ভাড়াটে নেই। তাই সদরের ভেজানো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল।

গোটা বাড়ি অন্ধকার। আমার তো বেশ ভয়-ভয় করছিল। শ্রেয়া আর মিষ্টুর নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পেলাম না। তবুও সাহসে ভর করে শুধুমাত্র মিষ্টুর জন্যে আমি সবকটা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু ওর কোনও হদিস না পেয়ে আমার কান্না পেয়ে গেল। অন্ধকার ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কপাল চাপড়াতে লাগলাম। কী করে বাড়ি ফিরে আমি মালিনীকে মুখ দেখাব!

বেশ কিছুক্ষণ পর...আই মিন প্রায় আধঘণ্টামতন হবে...নিজেকে ধীরে-ধীরে সামলে নিলাম। আর ঠিক তখনই একটা চাপাকান্নার শব্দ আমার কানে এল। একটা ছোট ছেলে বা মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কে? মিষ্টু না! আমি ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম : মিষ্টু! মিষ্টু! আর সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া পেলাম। কান্না থামিয়ে কে যেন বলে উঠল, এই যে, আমি.. এখানে...। একলাফে উঠে দাঁড়ালাম আমি। অন্ধকার ঘরে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলাম। একটু পরেই ওকে পেলাম। খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। আমি ওকে জাপটে ধরলাম। টের পেলাম, ও বাচ্চা খরগোশের মতো ভয়ে কাঁপছে।

ওকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। তারপর সোজা রওনা হলাম বাড়ির দিকে। শ্রেয়াদের ব্যাপার নিয়ে একটিবারের জন্যেও ভাবলাম না। হয়তো আমার পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু...।

তন্ময় হাজরা থামলেন। হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল—এটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন।

শমিত আর পাপিয়া একমনে তন্ময়ের কথা শুনছিল। শমিত আনমনাভাবে সিগারেটে টান দিচ্ছিল আর ভাবছিল, শ্রেয়াদের হঠাৎ উধাও হওয়ার ব্যাপারটা তন্ময় পুলিশে জানাননি। শমিতরাও তা হলে মিষ্টুর ব্যাপারটা থানায় না জানিয়ে খুব একটা অন্যায় করেনি!

মালিনী বললেন, ও আমাকে ফোন করে সব বলেছিল..তখন আমিও পুলিশে খবর দিতে বারণ করেছি। কারণ, থানা-পুলিশ হলেই আবার সতেরো ঝামেলা...।

কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে মিষ্টু আবার হারিয়ে গেল কেমন করে? তন্ময়কে জিগ্যেস করল শমিত। ফিলটার পোড়া গন্ধ পেতেই ও সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে।

তন্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে আর-এক অদ্ভুত গল্প। লাস্ট সোমবার ওকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আমি আর মালিনী বাগুইআটি থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। বাগুইআটির বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসের জন্যে। আমাদের চারপাশে লোকজনের বেশ ভিড় ছিল। খিদে পেয়েছে বলাতে মিষ্টুকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট কিনে দিয়েছিলাম। ও প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট খাচ্ছিল আর বাসস্টপে ঘুরে বেড়ানো কয়েকটা নেড়ি কুকুরকে মাঝে-মাঝে বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছিল। হঠাৎই দেখি মিষ্টু আমাদের সঙ্গে নেই। আমরা আশপাশের লোকজনকে জিগ্যেস করাতে তারা বলল, মেয়েটা তো দুটো কুকুরের উৎপাতে তাড়া খেয়ে ওদিকটায় চলে গেল! ও আপনাদের সঙ্গে ছিল?

তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেছে। তারই মধ্যে আমরা দুজনে কাকভেজা হয়ে মিষ্টুকে খুঁজতে লাগলাম। এ-রাস্তা সে-রাস্তা আর অলিগলি করে আমরা হন্যে হয়ে পড়লাম। কোথাও মেয়েটাকে পেলাম না। হতাশায় মাথা নাড়লেন তন্ময়। তারপর শমিত আর পাপিয়ার দিকে পালা করে তাকিয়ে বললেন, আমাদের অবস্থাটা একবার বুঝুন! মালিনীর পাগলের মতো কান্নাকাটি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম...ও আবার না উলটোপালটা কিছু করে বসে...আই মিন সুইসাইড টাইপের কিছু।

একটু থামলেন তন্ময়। চোয়ালে বার-দুয়েক হাত বুলিয়ে বললেন, এবার তো থানা-পুলিশ করতেই হল। তারপর পুলিশের ভরসায় থাকতে না পেরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। সত্যি, ঈশ্বরের লীলার কোনও জবাব নেই। শেষ পর্যন্ত তিনিই মেলালেন। ওপরদিকে মুখ তুলে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন তন্ময়।

মালিনীও চোখের জল মুছে প্রণাম জানালেন ভগবানকে। তবে ওঁর বেলায় এই ভক্তিটা শমিতের কাছে কেমন যেন বেমানান ঠেকল। সেটা বোধহয় ওঁর সাজপোশাকের জন্য।

হঠাৎই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তন্ময় হাজরা বলে উঠলেন, মিস্টার রায়চৌধুরী, আর রাত করব না—নটা বেজে গেছে, এবার আমরা উঠব। আপনারা আমাদের যা উপকার করলেন...জীবনে কখনও ভুলব না। আপনারা..আই মিন...আমাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন।

মালিনী দু-হাতে পাপিয়ার হাত চেপে ধরলেন : আপনাদের কী পুরস্কার দেব জানি না...।

পাপিয়া ঘন-ঘন চোখ মুছছিল। মাথা নেড়ে বলল, পুরস্কারের কী আছে! এ তো যে-কোনও মানুষের কর্তব্য।

মিষ্টু বোধহয় ওই এরিয়াতেই পথ হারিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। আপনারা ওকে খুঁজে না পেলে কী হত ভাবুন তো! এবার একটু মিষ্টুকে ডাকুন...।

তন্ময় আর মালিনী একইসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

মিষ্টু আর বাপ্পা খেলতে-খেলতে কখন যেন বড় বেডরুমটায় ঢুকে পড়েছিল। পাপিয়া গলা তুলে মিস্তুকে ডাকল।

ডাক শুনে মিষ্টু আর বাপ্পা ড্রইং-ডাইনিং-এ এল। আর তারপরই শুরু হল সাংঘাতিক কাণ্ড।

মিষ্টু জেদ ধরে বসলঃ কিছুতেই ও তন্ময় আর মালিনীর সঙ্গে যাবে না—ও আঙ্কল আর আন্টির কাছেই থাকবে।

পাপিয়া আর শমিত মিলে ওকে অনেক করে বোঝাল। বলল যে, ওঁরা ওর বাবা-মা। মিষ্টু ওঁদের সঙ্গে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলে সবাই খুশি হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ওর মুখে সেই এক বুলি : আমি আঙ্কল আর আন্টি আর বাপ্পাদাদাকে ছেড়ে অন্যলোকের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়ো না...তা হলে আমি মরে যাব..প্লিজ..।

তন্ময় আর মালিনীও অনেক চেষ্টা করলেন। মিষ্টুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর-টাদর করে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু কিছু করা গেল না। মালিনীর প্রবল কান্নাকাটিতেও মিষ্টুর মন নরম হল না।

শেষে বাপ্পাও ওকে বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল, তুই তোর বাবা-মায়ের সঙ্গে এখন যা কাল আবার আমাদের বাড়িতে আসিস..আমরা একসঙ্গে পার্কে গিয়ে খেলব।

উত্তরে মিষ্টু বলল যে, সেরকম হলে তন্ময় আর মালিনী রোজ এ-বাড়িতে মিষ্টুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন, কিন্তু মিষ্টু কিছুতেই বাপ্পাদের ছেড়ে যাবে না।

সব মিলিয়ে তখন রীতিমতো একটা হইচই চলছে। চ্যাম্প ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বারবার এর-ওর দিকে তাকাচ্ছে আর ঘেউঘেউ করছে। মিষ্টু পাগলের মতো মাথা নেড়ে না-না বলছে, কাঁদছে। আর বাকি পাঁচজন ওকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

এইসব কারণেই টেলিফোনটা যে বাজছে সেটা প্রথমটায় কেউ খেয়াল করেনি।

ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করল বাপ্পা। ও শমিতকে ডেকে বলল, বাবা, টেলিফোন।

শমিত তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধরতে ছুটল।

আজ ও অফিসে যায়নি। তাই অফিস থেকেই কোনও কলিগ হয়তো ফোন করে থাকতে পারে। সামনের মাসে একটা বড়সড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের সতেরোজন এক্সিকিউটিভকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে খুব জোর কথাবার্তা চলছে। হয়তো সেই ব্যাপারেই মদনলাল জানা কিংবা শংকর ভাসওয়ানি ফোন করে থাকতে পারে। যদি...।

হ্যালো।

হ্যালো, রায়চৌধুরীসাহেব, মুন্নাকা সমাচার কেয়া? সেই মিহি গলা। তবে তাতে বেশ খানিকটা ধারালো ব্যঙ্গ মিশে রয়েছে।

কে মুন্না? কে বলছেন আপনি? ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও প্রশ্নগুলো করল শমিত।

আহারে আমার ন্যাকাগঙ্গারাম! মেয়েলি ঢঙে বলল লোকটা। তারপর রীতিমতো শাসানি দিয়ে বলল, মিষ্টুর ব্যাপারটা কী হল? আর মাত্র দু-দিন টাইম আছে। তারপর একদম ঘড়ি বন্ধ...পাক্কা বন্ধ..বুঝতে পারলেন কিছু, নাকি...।

বুঝেছি...বুঝেছি।..আ-আমি..আমরা কিছু একটা করব। এখন ঘরে সব গেস্টরা রয়েছে..প্লিজ..।

বাই সানডে করতেই হবে। ওটাই ডেডলাইন...নইলে ডেড.. মুখে গুলি ছোঁড়ার শব্দ করল লোকটা। তারপর ফোন রেখে দিল।

শমিতের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও অদ্ভুত এক স্লো মোশনে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। তারপর পাপিয়াদের দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল।

ওরা সবাই হাঁ করে শমিতের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় টেলিফোনের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে।

শমিত তক্ষুণি কোনও কথা বলতে পারল না।

পাপিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তন্ময়দের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা কিছু মাইন্ড করবেন না। মানে...একজনের কাছ থেকে ও টাকা লোন নিয়েছিল...ভীষণ বাজে লোক। তো সেই লোকটা যখন-তখন ফোন করে হুমকি দেয়...যা-তা বলে। অথচ ও ঠিক মাসে-মাসে অল্প-অল্প করে পোন শোধ করে যাচ্ছে...।

পাপিয়াকে মনে-মনে নোবেল প্রাইজ দিয়ে দিল শমিত। কী দারুণভাবে ব্যাপারটা সামলে দিল!

তন্ময় আর মালিনী অপ্রস্তুত হয়ে হাসলেন। মালিনী সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ, যা বলেছেন! উলটোপালটা পাবলিকের থেকে লোন নিলে এই মুশকিল...।

কিন্তু মিষ্টুর ব্যাপারে তন্ময় আর মালিনী হাল ছেড়ে দিলেন। শত চেষ্টা করেও মেয়েটাকে একটুও টলানো গেল না। তন্ময় একবার ওর হাত ধরে টানার চেষ্টা করতেই মিষ্টু খেপে গিয়ে এমন চিৎকার করে উঠল যে, তন্ময় আঁতকে উঠে ওর হাত ছেড়ে দিলেন।

সুতরাং, শেষ পর্যন্ত মিষ্টুর সমস্যাটা থেকেই গেল। শমিত আর পাপিয়া কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না নিয়তি ওদের সঙ্গে এ কোন নিষ্ঠুর খেলা খেলছে!

তন্ময়রা চলে যাওয়ার সময় পাপিয়াদের বলে গেলেন যে, ওঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। মিষ্টু একটু ধাতস্থ হয়ে এলেই ওঁরা এসে ওকে নিয়ে যাবেন।

পাপিয়া আর শমিত বেশ চিন্তিতভাবে ওঁদের বিদায় দিল। ওঁরা চলে যেতেই শমিত দরজা বন্ধ করে পাপিয়ার দিকে তাকাল, বলল, এবার কী করবে? ওই লোকগুলো ফোন করেছিল...।

পাপিয়া শমিতের দিকে একপলক তাকিয়েই ছুটে চলে গেল মিষ্টুর কাছে। হাঁটুগেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল ওকে। ওর জামায় মুখ গুঁজে বলে উঠল, তুই কে সত্যি করে বল! এ কোন মায়ায় তুই আমাদের জড়ালি!

বাপ্পা অবাক হয়ে মাকে দেখতে লাগল। মিষ্টু থেকে যাওয়াতে ও কম খুশি হয়নি। কিন্তু মা কাঁদছে কেন? আনন্দে?

সেটা বোঝা গেল বাবার কথা শুনে।

শমিত সোফায় এসে বসল আবার। মিষ্টুকে ডেকে বলল, মিষ্টু, তুই চলে গেলে ফ্ল্যাটটা ফাঁকা হয়ে যেত, বুঝলি! এবার নে, মিষ্টি করে একটা গান শুনিয়ে দে তো...তা নইলে তোর আন্টির কান্না থামবে না।

পাপিয়া মিষ্টুর গালে চুমু খেয়ে শমিতের দিকে তাকাল। শমিত দেখল, পাপিয়ার চোখে জল অথচ হাসছে। না, শমিত আর টেলিফোনের লোকটাকে ভয় পাবে না। ওই ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক কিছু করা যায়।

শমিত এখন মিষ্টুর জন্য মানুষ খুন করতে পারে।

.

০৬.

গণ্ডগোলটা বাধল শমিত অফিস থেকে ফেরার পথে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জোরালো বৃষ্টি গোটা কলকাতাকে নাজেহাল করে দিয়েছে। তার ওপরে বীভৎস ট্রাফিক জ্যাম।

সুতরাং বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা থেকেই শমিত বাড়িতে ফোন করল দুবার। বাপ্পা, মিষ্টু আর পাপিয়ার সঙ্গে কথা বলল। শমিতের দেরি দেখে ওরা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিল। পাপিয়ার মনটা তো কু-ডাক ডেকে উঠেছে বেশ কয়েকবার।

ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছিল শমিত। সঙ্গের ব্রিফকেসটা পাশে রেখে ও সিটে গা এলিয়ে দিয়েছিল। কতক্ষণে বাড়ি ফিরবে সে-কথাই ভাবছিল। শেয়ালদার পর রাস্তা ফাঁকা পেতেই ও ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জোরে চালাতে বলল।

সুকিয়া স্ট্রিট থেকে রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে গাড়িটা ঢুকতেই রাস্তাঘাট বেশ নির্জন ঠেকল। রাত সাড়ে আটটা সবে পেরিয়েছে...এর মধ্যেই সব কেমন ঘুমপাড়ানি মাসি পিসির কাছে

বশ মেনেছে। রাস্তার আলোগুলো ক্লান্তভাবে জ্বলছে। দোকানপাট বেশিরভাগই ঝপ বন্ধ করে ফেলেছে।

ঘটনাটা ঘটল মানিকতলা মেন রোড পেরোনোর পরই।

শমিত বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল, একটা মোটরবাইক হেডলাইট জ্বেলে ওর ট্যাক্সির পিছন পিছন আসছে। এখন সেই বাইকটা কোনওরকম হর্ন-টন না দিয়ে সাপের মতো স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পিছলে গিয়ে শমিতের ট্যাক্সির সামনে এসে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ট্যাক্সির ড্রাইভারও ব্রেক কষল। কুৎসিত শব্দ করে ট্যাক্সিটা থামল। তবে রাস্তা ভিজে থাকায় ব্রেক কষার পরেও বেশ কয়েক হাত এগিয়ে গেল ট্যাক্সিটা।

ততক্ষণে সামনের মোটরবাইক থেকে দুজন লোক নেমে পড়েছে। হাত দুলিয়ে ওরা এগিয়ে আসতে লাগল শমিতের ট্যাক্সিটার দিকে।

শুক্রবার রাতের পর থেকে শমিত প্রতিমুহূর্তেই বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। রাস্তায় বেরোলেই ও সতর্ক নজর রাখছিল চারপাশে। সকালে অফিসে বেরোনোর সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ও একটি মুহূর্তের জন্যও নজরদারিতে ঢিলে দেয়নি। আর সেইজন্যই ও মোটরবাইকটাকে অনেক আগে থেকেই লক্ষ করেছে।

শুক্রবার রাতে ফোন করে লোকটা কী যেন বলেছিল?

বাই সানডে করতেই হবে। ওটাই ডেডলাইন...নইলে ডেড...।

গতকাল সেই ডেডলাইন পেরিয়ে গেছে। শমিত আর পাপিয়া অসহায়ভাবে শুধু দিনটা গড়িয়ে যেতে দেখেছে। মিষ্টুকে মেরে ফেলার বদলে চোখের জল ফেলেছে আর আদর করেছে।

তাই আজ সকালে রাস্তায় বেরোনোর পর থেকেই শমিতের বুকের ভেতরে মেঘ ডাকছিল। কখন বাজ পড়বে কে জানে!

এখন বোধহয় সেই সময় এসে গেছে।

লোক দুটোকে ওরকমভাবে এগিয়ে আসতে দেখেই ওর ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, সামনে বিপদ! জলদি পালাও!

শমিত বুঝতে পারল, ট্যাক্সির ভেতরে বসে থাকলে নড়াচড়ার জায়গা পাওয়া যাবে না, আর পালানোর স্বাধীনতাটাও বোধহয় থাকবে না। তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের হাতে ঝটপট একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে ও একঝটকায় দরজা খুলে নেমে পড়ল রাস্তায়। ব্রিফকেসের হাতলটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। আর তারপরই দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুট।

শমিতের আচমকা দৌড়ের জন্য লোক দুটো মোটেই তৈরি ছিল না। কিন্তু তৈরি হতে ওদের খুব একটা সময় লাগল না। ওদের একজন ছুটতে ছুটতেই কোমরে হাত দিয়ে কী-একটা বের করে নিল। অন্ধকারে জিনিসটাকে ঠিকমতো চেনা না গেলেও তার লম্বাটে ভাব আর চকচকে চেহারা ভালো করেই বুঝিয়ে দিল জিনিসটা কী।

শমিত রাস্তা পার হয়ে দিগভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগল। কোনও একটা দোকানঘর কি বাড়ির দরজা খোলা পেলেই ও সটান ঢুকে পড়বে। তারপর দেখবে লোক দুটো কেমন করে ওকে কজা করে!

কিন্তু শমিতের কপাল খারাপ। কোনও বাড়ি বা দোকানের দরজা ও খোলা পেল না।

রাস্তার ভাঙা ফুটপাথে কয়েকটা বড়-বড় গাছ। সেগুলোর অন্ধকার পাতা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। তারই একটা গাছের নীচে একটা চায়ের স্টল। তার মাথায় পলিথিনের চাদর। চা তৈরির উনুনের পাশে হ্যারিকেন জ্বলছে। রোগা টিংটিঙে দোকানি ছাড়া ভাঙা বেঞ্চিতে বসে আছে ছায়া-ছায়া একজন খদ্দের।

পাগলের মতো ছুটে যাওয়ার সময় শমিত খেয়াল করেনি। পলিথিন টাঙানোর একটা দড়ি ওর বুকের কাছটায় আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দড়িটা ছিঁড়ে গেল বটে, কিন্তু শমিত লাট খেয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল চায়ের দোকানটার ওপরে। ওর ব্রিফকেস ছিটকে গেল হাত থেকে।

এতক্ষণ শমিত চিৎকার করেনি। কিন্তু এইবার চিৎকার করল। যন্ত্রণার আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

দড়ি ছিঁড়ে পলিথিনের শিটটা ঝুলে পড়ল দোকানের ওপরে। তার একটা কোনা বোধহয় উনুনে ঠেকে গিয়েছিল, কারণ প্লাস্টিক-পোড়া গন্ধ শমিতের নাকে এল।

ও টাল খেয়ে পড়েছিল বেঞ্চির লোকটার ঘাড়ে, সেখান থেকে পাক খেয়ে উনুনের মুখের কাছে। একপাশে রাখা কয়লার টুকরোগুলো ওর শরীরের নানা জায়গায় খোঁচা মারছিল, আর অসহ্য তাপে ওর মুখ ঝলসে যেতে চাইল।

ওই অবস্থাতেই শমিত দেখল, চায়ের দোকানদার ও তার একমাত্র খদ্দের পড়িমড়ি করে ছুটে পালাচ্ছে। কারণ, ওরা হিংস্রভাবে ধেয়ে আসা দুটো লোককে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে সামনের লোকটির হাতে বাগিয়ে ধরা চকচকে ভোজালিটাও।

একমুহূর্তের মধ্যে শমিত বুঝে গেল ওকে বাঁচাতে কেউ আর আসবে না। কারণ, এই শহরের বেশিরভাগ মানুষ শান্তিপ্রিয় অশান্তিতে জড়াতে কেউ চায় না।

অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে তোক দুটো ঝুঁকে পড়ল শমিতের ওপরে। শমিত চিত হয়ে শুয়ে অসহায়ভাবে ওদের ভয়ংকর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওর মুখ দিয়ে অর্থহীন চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছিল।

সামনের লোকটা হাসতে-হাসতে ভোজালি তুলল। তার শাকরেদ মন্তব্য করল, একটু-আধটু পালিশ দিয়ে ছেড়ে দে। দু-চার পোঁচড়া–ব্যস। জানে খতম করলে বস খেপে যাবে–

সেরকম হুকুম নেই।

ভোজালি হাতে লোকটা দাঁত বের করে হাসল, শমিতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, ব্যাটা কেমন কুত্তার মতো কুঁইকুঁই করছে দেখ। এখানে হাজার চিল্লালেও কুত্তাভি আসবে না।

সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল, অথচ শমিত যেন দেখছিল স্লো-মোশনে।

ভোজালিটা নেমে আসছে। শমিত তা হলে কুত্তারও অধম–চ্যাম্পেরও অধম।

মিষ্টুর মুখটা মনে পড়ছে বাপ্পার মুখ, পাপিয়ার মুখও। আর কি ওদের সঙ্গে দেখা হবে? কিন্তু শমিত যে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। মিষ্টুকে ও আদর করতে চায় প্রাণভরে।

যো ডর গয়া, সমঝো কে মর গয়া।

মানুষ মরার আগে কখনও মরে না।

শমিতের বাঁ-হাত একগাদা কয়লার টুকরো খুঁজে পেল।

উনুনের তাপে মুখ জ্বলছে।

ওর ডানহাত একটা কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় অন্ধের মতো খামচাচ্ছিল, হঠাৎই উনুন খোঁচানোর বাঁকানো শিকটা পেয়ে গেল।

ভোজালির প্রথম কোপটা নেমে এল ওর বাঁ-হাত লক্ষ্য করে। কিন্তু শমিত ততক্ষণে বাঁ হাতে মুঠো করা কয়লার টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে লোকটার মুখে। একইসঙ্গে কবজি আর কনুইয়ের মাঝামাঝি ভোজালিটা কেটে বসল।

জন্তুর মতো দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল শমিত। ওই অবস্থাতেই উঠে বসার চেষ্টা করল। এবং ডানহাতে ধরা লোহার শিকটা অলৌকিক এক শক্তিতে ঢুকিয়ে দিল ভোজালিওয়ালার পেটে।

ক্ষমা সবসময় পরম ধর্ম নয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনও প্রয়োজন। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

সামনের লোকটা ভোজালি আবার তুলেছিল শূন্যে, কিন্তু শমিতের কয়লার গুঁড়ো আর শিক ওর সব অঙ্ক গোলমাল করে দিল। ওর হাত থেকে ভোজালি খসে পড়ল। ও চোখ কচলাতে কচলাতে মাথা নীচু করে অবাক হয়ে তাকাল পেটের দিকে। সেখান থেকে শিকের খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে দেখেও ব্যাপারটা ও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। শিকটা এত সহজে ঢুকে গেল পেটে!

ওর সঙ্গের লোকটা ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গীর হাত ধরে টান মারল। শমিত কাত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোজালিটার ওপরে। অবশ হয়ে আসা রক্তাক্ত বাঁ-হাত আর ডানহাত একসঙ্গে জড়ো করে অতিকষ্টে ভোজালির বাঁট খামচে ধরল। পাগলের মতো চিৎকার করে ভোজালি উঁচিয়ে ধরল। ওকে অবাক করে দিয়ে গালাগালির স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে। বোঝা গেল, দাঁত নখের লড়াইয়ে ওর ভেতরের আদিম মানুষটা বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ও অন্ধরাগে ভোজালিটা শুন্যে এপাশ-ওপাশ চালাতে লাগল, আর একই সঙ্গে আহত জন্তুর মতো গর্জন করতে লাগল।

পলিথিন-শিটটায় কখন যেন আগুন ধরে গেছে। কটু গন্ধে ভরে যাচ্ছে চারদিক। শমিতের মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছিল। হাত-পা কাঁপছিল থরথর করে। বাঁ-হাতে অসহ্য যন্ত্রণা।

সেই অবস্থাতেই ও দেখল, লোক দুটো পালিয়ে যাচ্ছে। একজন খোঁড়াচ্ছে, আর-একজন তাকে জাপটে ধরে হাঁটছে।

ওরা মোটরবাইকে উঠে রওনা হয়ে গেল। আহত লোকটা পিছনে বসে সামনের সঙ্গীর গায়ে এমনভাবে এলিয়ে পড়ে আছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

শমিতের ক্লান্ত হাত থেকে ভোজালিটা খসে পড়ল।

দু-চারজন করে লোকের ভিড় জমতে শুরু করল। শমিতকে ধরে তুলল সবাই। কেউ একজন ওর হাতের কাটা জায়গাটা একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। শমিতের ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব্রিফকেসটা খুঁজতে লাগল।

দু-তিনজন লোক তখন জল ঢেলে পলিথিনের আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। কয়েকজন ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! করে হাঁক পেড়ে ছুটন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করাতে চাইছে। দু-চারজন শমিতকে ঘিরে নানান প্রশ্ন করছে।

এরই মধ্যে কে যেন বলে উঠল, দাদাকে মানিকতলা থানায় নিয়ে চল।

আর-একজন বলল, তার আগে দত্ত মেডিকেল থেকে হাতটা ব্যান্ডেজ করিয়ে নে।

শমিত কিছু একটা বলতে চাইছিল, কিন্তু ওর ঠোঁট কাঁপছিল..মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছিল না।

তিন-চারজন লোক ওকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। শমিত লক্ষ করল, একজনের হাতে ওর ব্রিফকেসটা রয়েছে, আর-একজনের হাতে রক্তমাখা ভোজালিটা। তবে ভোজালির বাঁটটা লোকটি খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়েছে।

শমিতের হাতে ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করা হল। কী একটা ইনজেকশনও যেন দিয়ে দিল দোকান থেকে। তারপর ট্যাক্সি চলল মানিকতলা থানার দিকে।

শমিত মিনমিন করে বলল, আমি বাড়িতে একটা ফোন করব...।

আর তখনই ওর মোবাইল ফোনটার কথা খেয়াল হল।

ফোনটা সবসময় ওর বাঁ-পকেটে থাকে। দু-পকেট ছুঁয়ে দেখল শমিত। না, ফোনটা নেই। হয়তো কোথাও ছিটকে পড়ে গেছে।

মানিকতলা থানা খুব কাছেই–পৌঁছোতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।

একজন পুলিশ অফিসার ওদের কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে জেনারেল ডায়েরি লিখলেন। শমিতদের অনেক প্রশ্নও করলেন।

মোটরবাইকের নম্বরটা কেউ দেখেছেন কি?

না।

লোকগুলো কীরকম দেখতে?

শমিত যথাসাধ্য বর্ণনা দিল।

আপনাকে হঠাৎ অ্যাটাক করতে গেল কেন?

কী জানি! হয়তো ছিনতাইয়ের মতলব ছিল। আমার সেলফোনটা তো পাচ্ছি না…।

অফিসার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহু প্রশ্ন করা সত্ত্বেও শমিত মিষ্টুর ব্যাপারে একটি কথাও বলল না।

অফিসার ভোজালিটা জমা নিলেন। একজন সাদা-পোশাক পুলিশকে বললেন অকুস্থলটা দেখে আসতে। শমিতের সঙ্গীদের কাউকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

থানা থেকে বাড়িতে ফোন করার সুযোগ পেল শমিত।

পাপিয়া ফোন ধরতেই ও বলল, পাপিয়া, একটুও চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক আছি। আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছোচ্ছি...।

পাপিয়া ধরা গলায় বলল, আমরা এদিকে ভেবে-ভেবে মরছি। মোবাইলে ফোন করলে শুধু রিং হয়ে যাচ্ছে। তুমি শিগগির চলে এসো...মিষ্টু আর বাপ্পা মনখারাপ করে বসে আছে...।

শমিত ফোনটা ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না। ও-প্রান্ত থেকে মিষ্টু হঠাৎ আঙ্কল বলে শমিতকে ডেকে উঠেছে।

মেয়েটার গলা শুনতে পাওয়া মাত্রই শমিতের বুকের ভেতরটা কেমন হু-হু করে উঠল। আর একই সঙ্গে বাঁ-হাতের যন্ত্রণাটা কোন এক ম্যাজিকে মিলিয়ে গেল।

মিষ্টুসোনা, আমি এক্ষুণি বাড়ি যাচ্ছি...তুমি মনখারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি...।

আঙ্কল, তোমার কিছু হয়নি তো?

না, মা-মণি, কিচ্ছু হয়নি। বাপ্পাদাদা কী করছে?

ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর শমিতের টেনশনটা কমে এল। রিসিভার নামিয়ে রেখে ও অফিসারের সঙ্গে ফর্মালিটি মিটিয়ে নিল চটপট। কয়েকটা জায়গায় সই করে দিল। গোটা-গোটা হরফে নাম-ঠিকানা-ফোননম্বর লিখে দিল।

শমিতের সঙ্গী লোকজনও দরকারমতো সইসাবুদ করে দিল। তারপর ওরা দল বেঁধে থানা থেকে বেরিয়ে এল।

ওরাই শমিতকে ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিল। গার্জেনি ঢঙে সাবধান করে দিল বারবার। ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও সতর্ক করে দিল।

বাড়ি ফেরার পথে শমিত ভাবছিল, এই শহরের মানুষ শান্তিপ্রিয় বটে, তবে তারা অসময়ে বড় আপনজন, তাদের আদর-যত্নের কোনও জবাব নেই। ওদের কথা শমিতের বহুদিন মনে থাকবে।

.

মঙ্গলবার সকালবেলা শমিত তৈরি হয়ে অফিসে বেরোতে যাবে, ঠিক তখনই ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

পাপিয়া ম্যাজিক আই-তে চোখ রেখেই ঘুরে তাকাল, শমিতকে ডাকল ইশারায়। শমিত কাছে এলে চাপা গলায় বলল, দুজন লোক..চিনি না…।

শমিতও একচোখ দিয়ে দেখল। ভারী চেহারার দুজন লোক। একজনের হাতে সিগারেট।

দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে দেখে ফ্ল্যাটের কলিংবেল পরপর আরও দুবার বেজে উঠল।

শমিত পাপিয়াকে পিছিয়ে যেতে বলল। তারপর কাঠের পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মারল। তালাবন্ধ কোলাপসিবল গেটটা শমিতকে ভরসা জোগাচ্ছিল। গেটের লোহার গরাদের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের একজন কথা বললেন।

শমিত রায়চৌধুরী?

হ্যাঁ– সায় দিয়ে মাথা নাড়ল শমিত।

আপনার মারুতি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? গত বুধবার?

হ-হ্যাঁ… ইতস্তত করে শমিত বলল। ওর গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল।

আমরা লালবাজার থেকে আসছি। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসার। পকেট থেকে ফটোওয়ালা একটা আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখালেন ভদ্রলোক : আপনার সঙ্গে

জরুরি কথা আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে...।

শমিত আমতা-আমতা করে বলল, আ-আমি এখন তো অফিসে বেরোচ্ছি। মানে...।

ভদ্রলোক হাসলেনঃ পুলিশ তো আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবে না...খুলুন।

শেষ শব্দটায় আদেশের সুর ছিল। শমিত আর দেরি না করে দরজা হাট করে খুলে দিল। কোলাপসি গেটও খুলে দিল।

ভদ্রলোক দুজন এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ফ্ল্যাটের চারপাশটা জরিপ করতে লাগলেন। তারপর দুটো সোফায় দুজনে বসে পড়লেন। চ্যাম্প কোথা থেকে এসে হাজির হল। ওঁদের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল আর গন্ধ শুঁকতে লাগল। দুজনের মধ্যে যার বয়েস একটু বেশি তিনি চ্যাম্পের মাথায়-ঘাড়ে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, আমি কুকুর পুষি। আমার গায়ে কুকুরের গন্ধ পাচ্ছে বলে ও চেঁচামেচি করছে না।

পাপিয়া মিষ্টু আর বাপ্পাকে ভেতরে নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বারকয়েক আশঙ্কার নজরে শমিতকে দেখল।

পরিচয়ের পালা শেষ হল।

প্রথমজন যিনি এতক্ষণ কথাবার্তা চালিয়েছেন–প্রফুল্ল পান। বয়েস পঞ্চাশের ওপাশে। রং ময়লা। মাথায় কদমছাঁট কাঁচা-পাকা চুল। বাঁ-গালে একটা আঁচিল। মুখে অনেক ভাঁজ। চোয়ালে সাদা দাড়ির খোঁচা উঁকি মারছে।

ভদ্রলোকের বোধহয় নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে। কারণ, ওঁর নীল-রঙা হাফ শার্টের বেশ কয়েক জায়গায় নস্যির দাগ।

দ্বিতীয়জনের নাম যোগেশ দাশগুপ্ত। বয়েস পঁয়তাল্লিশের এদিক-ওদিক। মাথায় টাক তাকে ঘিরে চুলের ঝালর। ঠোঁটের ওপরে মোটা গোঁফ। চোখে গোল-গোল কাচের চশমা–

অনেকটা পাচার চোখের মতন। শরীরের কাঠামো বেশ শক্তপোক্ত। মাথায় প্রফুল্ল পানের চেয়ে খাটো। আর মুখে সবসময় কেমন একটা হাসি-হাসি ভাব।

যোগেশের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। ওটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে তিনি ভুরু উঁচিয়ে আলতো করে জিগ্যেস করলেন, হাতে ব্যান্ডেজ কীসের?

শমিত থতমতো খেয়ে বলল, কাল একটু চোট পেয়েছি…।

উত্তর শুনে প্রফুল্ল পান হাসলেন, বললেন, অত তাড়াহুড়ো করে বানিয়ে বলার দরকার নেই। ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে বলুন। কারণ, আমরা আপনার গল্পটার প্রতিটি ভাঁজ চেক করে দেখব গাদাগাদা প্রশ্ন করব। তখন আপনার গল্পটা লালবাতি জ্বেলে বসে থাকবে। যাই হোক, টেক ইয়োর টাইম…।

যোগেশ পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই বের করে তার দু-চারটে পাতা উলটে দেখে তারপর প্রশ্ন করলেন, ডব্লিউ বি জিরো টু সিটু ওয়ান টু নাইন…এই নম্বরের মারুতি গাড়িটা আপনার?

হ্যাঁ–।

অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা আমাদের খুলে বলুন…।

শমিত পালা করে দুজন অফিসারের দিকে তাকাচ্ছিল আর নখ খুঁটছিল। তারপর হোঁচট খেয়ে কথা বলতে শুরু করল, অ্যাক্সিডেন্ট…মানে…সেদিন…।

হাত তুলে ওকে ভরসা দিলেন প্রফুল্ল পান, বললেন, আপনি মিছিমিছি নার্ভাস হচ্ছেন। রুদ্রদা..মানে, রুদ্রপ্রতাপ সেনের সঙ্গে তো এ-ব্যাপারে আপনার আগেই কথা হয়েছে…।

শমিত যেন অকুল সমুদ্রে লাইফবোট খুঁজে পেল। তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ–হ্যাঁ।

রুদ্রপ্রতাপ সেন লালবাজারের সিনিয়র ইন্সপেক্টর–চন্দ্রদেও আগরওয়ালের বন্ধু। ওঁর সঙ্গেই ফোনে কথা বলেছিল শমিত।

ও আর থাকতে পারল না। সরাসরি প্রফুল্ল পানের হাত চেপে ধরল। অনুনয় করে বলল, আমাদের আপনারা বাঁচান! এভাবে আমরা আর পারছি না!

ভরসা খুঁজতে চেয়ে শমিতের চোখে জল এসে গেল।

প্রফুল্ল ওর হাতে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, একটুও আপসেট হবেন না, মিস্টার রায়চৌধুরী, আমরা কিন্তু আপনাকে হেল্প করতেই এসেছি। রুদ্রদা আপনার সম্পর্কে আমাদের বলেছেন। আপনি নির্ভয়ে আমাদের সব খুলে বলুন। আমরা আপনার বন্ধু...।

শমিত কাঁপা হাতে পকেট থেকে সিগারেট বের করে যোগেশকে অফার করল। যোগেশ মাথা নেড়ে না বলায় নিজে একটা ধরাল। সিগারেটে বড়মাপের একটা টান দিয়ে ধাতস্থ হয়ে পাপিয়াকে চেঁচিয়ে ডাকল।

পাপিয়া ড্রইং-ডাইনিং-এ এলে শমিত ওকে বসতে বলল। অফিসার দুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, ওঁরা আমাদের বন্ধু। আমাদের বিপদে হেল্প করতে চান...।

শমিত আর পাপিয়া পালা করে গোটা গল্পটা ওঁদের শোনাল।

প্রফল্ল পান আর যোগেশ দাশগুপ্ত চুপটি করে শুনলেন, দু-একবার হুঁ-হাঁ ছাড়া একটি কথাও বললেন না। তবে যোগেশ একটা বলপয়েন্ট পেন দিয়ে তার নোটবইতে যথেচ্ছ নোট নিচ্ছিলেন।

ওদের বলা শেষ হলে শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফুল্ল, পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে শব্দ করে নস্যি নিলেন। শমিত লক্ষ করল, পাপিয়া ঘেন্নায় একটু শিউরে উঠল।

ব্যাপারটা প্রফুল্লর নজর এড়ায়নি। তিনি হেসে বললেন, সরি ম্যাডাম, আমার নেশাটা বড় বাজে। তা ছাড়া ডিউটির সময়ে নেশা করা ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের দুজনের নেশার অভ্যেসটা ডিপার্টমেন্ট জানে। যোগেশ স্মোকার আর আমি স্নাফার...।

স্নাফার? অবাক হয়ে বলল শমিত।

হ্যাঁ, স্নাফ মানে নস্যি, আর স্নাফার মানে আমি। অবশ্য স্নিফারও বলতে পারেন নস্যি সিফ করি তাই! শব্দ করে হাসলেন প্রফুল্ল পান।

যোগেশ বললেন, আপনাকে একবার আমাদের দপ্তরে আসতে হবে। তখন আপনার ডিটেইলড স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে নেব। এবারে কাজের কথা শুনুন...আপনার কাছে আমরা যে জন্যে এসেছি...।

এই পর্যন্ত বলে প্রফুল্ল পানের দিকে তাকালেন যোগেশ। ভাবটা এমন যেন অনুমতি চাইছেন। প্রফুল্ল ছোট্ট করে মাথা হেলিয়ে ইশারা করলেন, যার অর্থ বলো। তখন যোগেশ শমিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, যে-অ্যাম্বাসাডরটার সঙ্গে আপনার গাড়ির ক্র্যাশ হয় তাতে দুজন হার্ড বয়েলড ক্রিমিনাল ছিল সুধীর পাণ্ডে আর বিনোদ শর্মা। ওদের নামে প্রায় গোটাদশেক করে কেস ঝুলছে –তাতে মার্ডার, কিডন্যাপিং থেকে শুরু করে সবই আছে। সুধীর মারা গেছে, কিন্তু বিনোদ শর্মা বেঁচে আছে–এখনও। তবে ওর অবস্থা ভালো নয়... এখনও আমরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠতে পারিনি। লোকাল থানা ব্যাপারটা আমাদের রিপোর্ট করেছিল। পরে আমরা খতিয়ে দেখি যে, সুধীর আর বিনোদের বেশ কয়েকটা কেস আমাদের কাছে আছে। তখন ব্যাপারটা আমরা টেক আপ করি।

যাই হোক, আমাদের ধারণা সুধীর আর বিনোদের গ্যাং-ই আপনাদের ফোন করে থ্রেট করছিল...কী বলেন, প্রফুল্লদা? প্রফুল্ল পানের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন যোগেশ।

হতে পারে, তবে ওই গ্যাং-এ আরও লোক আছে। নইলে সুধীর আর বিনোদ বসে যাওয়ার পরও ভয় দেখানো ফোন আসবে কেন! আর একটা বাচ্চা মেয়ের পেছনে এত বড় একটা গ্যাং লেগে পড়েছে... চিন্তার সুরে বললেন প্রফুল্ল পান, তারও তো একটা বড়সড় মোটিভ থাকতে হবে...।

পাপিয়া সায় দিয়ে বলল, আমরাও তো সেকথাই ভাবছি।

যোগেশ বললেন, মিষ্টুকে একবার ডাকুন তো।

পাপিয়া উঠে দাঁড়াল, বলল, ডাকছি। আর আপনাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি...।

ও চলে যাওয়ার পর যোগেশ আর প্রফুল্ল শমিতের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

যোগেশ তন্ময় হাজরার মোবাইল নম্বর জানতে চাইলেন।

শমিত নম্বরটা বলল। তারপর বলল যে, মিষ্টুর মা-বাবা রোজই আসছেন, ওঁদের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মেয়েটার এখানে ভীষণ মায়া পড়ে গেছে–পুরোনো কথা কিছুই ওর মনে নেই তাই ও জেদ করছে, যেতে চাইছে না। এতে শমিতদের ভীষণ অস্বস্তি আর লজ্জার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

প্রফুল্ল জিগ্যেস করলেন, মিষ্টুর বাবা-মা বিপদের কথা শুনে কী বলছেন?

শমিত বলল যে, ওঁদের অ্যাক্সিডেন্ট কিংবা টেলিফোনে হুমকির কথা কিছুই জানানো হয়নি।

কেন, জানাননি কেন?

শুধু-শুধু কমপ্লিকেশন বাড়াতে চাইনি, তাই।

যোগেশ আর প্রফুল্ল কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন, মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর যোগেশ বললেন, আজ দুপুর থেকে আপনাদের টেলিফোন লাইনটা আমরা ট্যাপ করব। যদি থ্রেট করে আবার ফোন আসে আমাদের ধারণা আসবেই তা হলে আমরা কলটা ট্রেস করে সেই বেসিসে খোঁজখবর করতে পারব। কিন্তু সবচেয়ে আগে মেয়েটার সেফটির একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সুধীর আর বিনোদের গ্যাং খুব ডেঞ্জারাস। ওদের দল পারে না এমন কোনও কাজ নেই। হতে পারে মেয়েটাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল, তারপর মেয়েটা কোনও এক ফাঁকে ওদের আস্তানা থেকে সটকে পড়েছে...।

কিন্তু মিষ্টুর বাবা-মা তো সেরকম কিছু বলেননি!

হু, কেস বেশ পিকিউলিয়ার। গালে হাত বোলাতে বোলাতে প্রফুল্ল বললেন, কিন্তু মেয়েটার সেফটির ব্যবস্থা করাটা খুব জরুরি। ও বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেলেও হয়তো এই গ্যাং ওর জানের পিছনে পড়ে থাকবে। আচ্ছা, মিষ্টুর বাবা-মা কি আপনাদের বাড়িতে আজ আসবেন?

শমিত সায় দিয়ে মাথা নাড়লঃ হ্যাঁ, আসার কথা।

ওঁরা এলে একটু আমাদের জানাবেন। ওঁদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা দরকার। এই নিন, আমাদের কনট্যাক্ট নাম্বার নিন– প্রফুল্ল একটা কাগজে দুটো মোবাইল নম্বর লিখে শমিতকে দিলেন। তারপর বললেন, আসলে মিষ্টুর মেমোরি ফিরে আসাটা খুব ভাইটাল...।

হঠাৎই প্রফুল্ল পান লক্ষ করলেন একটা ফুটফুটে মেয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ওঁদের দেখছে। আর তার থেকে হাত পাঁচ-ছয় পিছনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে–উঁকি মেরে কৌতূহলী চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

প্রফুল্ল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ওকে কাছে ডাকলেন, এদিকে এসো। তোমার নাম কী?

আমার নাম মিষ্টু। বলে দিব্যি প্রফুল্লর কাছে চলে এল মিষ্টু, সরল চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

নাম বললেন প্রফুল্ল। তারপর হাত বাড়িয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি কখন এলে? আমরা তো খেয়ালই করিনি!

তোমরা তো আমাকে নিয়ে গল্প করছিলে…।

এরপর কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বললেন প্রফুল্ল আর যোগেশ। মিষ্টু বেশ সহজভাবেই ওঁদের সঙ্গে কথা বলল। তারপর বাপ্পাকে ডেকেও ওঁরা আলাপ করলেন। হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠলেন দুই বালক-বালিকার সঙ্গে। তখন শমিতের মনেই হচ্ছিল না ওঁরা পুলিশের লোক।

চা-পর্ব সেরে আরও আধঘণ্টা পর প্রফুল্ল আর যোগেশ উঠে দাঁড়ালেন।

দরজায় ওঁদের এগিয়ে দেওয়ার সময় শমিত বলল, মিষ্টুকে যে-করে-হোক বাঁচান আপনারা। ওর কিছু একটা হয়ে গেলে আমরা সইতে পারব না।

ডোন্ট উয়ারি, মিস্টার রায়চৌধুরী, আমরা যা করার করছি। প্রফুল্ল বললেন।

শমিত কৃতজ্ঞতায় ওঁর হাত চেপে ধরল আবার।

.

০৭.

সন্ধে পার করে তন্ময় আর মালিনী শমিতদের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন। ওঁদের সঙ্গে নতুন একজন অতিথিও এসেছেন। বছর তিরিশ-বত্রিশের এক যুবক। স্মার্ট টানটান

চেহারা। গায়ে রিংকলড কটনের রংচঙে শার্ট, পায়ে ফেডেড জিনস। ডানহাতে অদ্ভুত নকশার একটা চকচকে বালা, বাঁ-হাতে বেঢপ মাপের স্পোর্টস-ওয়াচ।

তন্ময় শমিতদের সঙ্গে নতুন অতিথির পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিকেলেই তিনি ফোন করে জানিয়েছিলেন যে, ছোট ভাইকে নিয়ে আসবেন। সে নর্থ বেঙ্গলে থাকে। মিষ্টুকে পাওয়া গেছে শুনে কলকাতায় এসেছে।

আমার ছোটভাই..মৃন্ময়...।

মৃন্ময় সৌজন্য দেখিয়ে শমিতদের নমস্কার জানালেন। শমিত লক্ষ করল, পাপিয়া বেশ জরিপ নজরে মৃন্ময় হাজরাকে দেখছে।

তন্ময় শমিতের হাতের ব্যান্ডেজ দেখে কী ব্যাপার জানতে চাইলেন। শমিত ছোট্ট করে বলল, সামান্য কেটে গেছে সিরিয়াস কিছু না।

তন্ময় বোধহয় সিগারেট বেশি খেতে ভালোবাসেন। কারণ, কয়েক সেকেন্ড উশখুশ করেই তিনি সিগারেট বের করলেন। শমিতকে একটা অফার করলেন। শমিত গাঁইগুই করছিল, কিন্তু তন্ময় ওর কোনও আপত্তি শুনলেন না। একরকম জোর করেই সিগারেটটা শমিতের হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজে একটা নিলেন।

লাইটার বের করে শমিতের সিগারেটটা ধরিয়ে দেওয়ার সময় তন্ময় হেসে বললেন, কীভাবে আপনার ঋণ শোধ দেব জানি না, মিস্টার রায়চৌধুরী...আপনারা আমার আর মালিনীর জীবনদাতা।

না, না, এভাবে বলে লজ্জা দেবেন না... শমিত বিনয় করে বলল।

মালিনী তখন মিষ্টুকে আদর-আহ্লাদ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মিষ্টুকে বেশ সহজভাবেই ওঁর সঙ্গে মিশতে পারছে বলে মনে হল। শুক্রবারের পর থেকে তন্ময়রা রোজ এই ফ্ল্যাটে

এসেছেন। মিষ্টুকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন। ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছেন। এঁদের মনে হয়েছে, এর ফলে মেয়েটা ধীরে-ধীরে সহজ হয়ে আসবে, ওঁদের সঙ্গে বাড়ি যেতে রাজি হবে।

কিন্তু আসলে তা হয়নি। খেলাধুলো কিংবা গল্পের সময় মিষ্টুকে দিব্যি সহজ-স্বাভাবিক মনে হলেও শমিতদের ছেড়ে যাওয়ার কথা উঠলেই মেয়েটা জেদ ধরে বেঁকে বসছে। পাপিয়া বা শমিত অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়েও ওকে রাজি করাতে পারেনি।

তন্ময় কিংবা মালিনী রোজ তিন-চারবার করে মিষ্টুকে ফোন করেন। তখন ও বেশ সুন্দর করে কথা বলে। জিগ্যেস করে, তোমরা কখন আসবে? কিন্তু শমিতদের ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়ার কথা বললেই ওর কী যে হয়!

সেইজন্যই তন্ময়রা আজ মৃন্ময়কে নিয়ে এসেছেন। মৃন্ময় নর্থ বেঙ্গলে চাকরি করেন। মিষ্টুর সমস্যা মেটানোর জন্যই তন্ময় ওঁকে ফোন করে কলকাতায় ডেকে এনেছেন। কারণ, মিষ্টু যখন ছোট ছিল মৃন্ময়ের খুব ন্যাওটা ছিল। সবসময় মেয়েটা কাকুর পিছন পিছন ছুটে বেড়াত। ওর যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন মৃন্ময় চাকরি নিয়ে নর্থ বেঙ্গলে চলে যান। এখন ওঁকে দেখে মিষ্টুর মন যদি কিছুটা বদলায়! যদি পুরোনো কথা কিছু মনে পড়ে!

মৃন্ময় মিষ্টুকে ডেকে নিয়ে ওর সঙ্গে হুটোপাটি করতে শুরু করলেন। ছোটবেলায় যেমন করতেন সেরকমভাবে ওকে দু-হাতে শুন্যে তুলে ধরে দোল খাওয়ালেন কয়েকবার। তারপর ওকে নামিয়ে দিয়ে লুকোচুরি খেলার প্রস্তাব দিলেন। নিজে বাচ্চা ছেলের মতো ছুটোছুটি করে ঘরে, বারান্দায়, আলমারির পিছনে লুকিয়ে বারবার মিষ্টুকে টুকি দিতে লাগলেন।

বাকি সবাই বেশ কৌতূহল নিয়ে মৃন্ময়ের চেষ্টা দেখছিল। বাপ্পাও বেশ অবাক হয়ে নতুন এই বুড়ো খোকাটির কাণ্ডকারখানা দেখছিল। দেখে ওর ভীষণ হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু বাবা আর মায়ের ভয়ে অতিকষ্টে ও হাসি চেপে রেখেছিল।

চেষ্টা করতে করতে মৃন্ময় গলদঘর্ম হয়ে গেলেন, কিন্তু মিষ্টুর মধ্যে নতুন কোনও আগ্রহের লক্ষণ দেখা গেল না। ও কেমন যেন নিষ্প্রাণভাবে মৃন্ময়ের ডাকে সাড়া দিচ্ছিল। মৃন্ময় অনেক করে বলা সত্ত্বেও মিষ্টু একটিবারও মৃন্ময়কে কাকু বলে ডাকতে চাইল না।

হতাশায় মৃন্ময়ের চোখে জল এসে গেল। তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়লেন দাদার পাশে। মাথা নীচু করে জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন। ভাঙা গলায় বললেন, এরকম ভাবতে পারিনি। খুব কষ্ট হচ্ছে।

তন্ময় ছোটভাইয়ের পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মনখারাপ করিস না। আসলে যাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছিস সে চিনতে না পারলে কষ্ট তো হবেই! অ্যামনেশিয়া বড় ডেঞ্জারাস জিনিস।

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

পাপিয়া ফোনটা ধরতে এগোচ্ছিল, কিন্তু শমিত ওকে ইশারায় বারণ করল। কারণ, ও জানে ফোনটা কার।

বড় বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে একপলক পাপিয়ার দিকে তাকাল শমিত। তারপর রিসিভার তুলে কথা বলল।

হ্যালো।

হাত কেমন আছে? আপনজনের সুরে মিহি গলায় কেউ প্রশ্নটা করল।

প্রশ্নটা শুনেই শমিতের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কিন্তু ও সময় নিয়ে রাগটাকে ঠান্ডা করল।

ফোনটা কারা করেছে বুঝতে পেরেও শমিত ভয় পেল না মোটেই। কারণ, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এখন ওর পাশে আছে।

হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল, প্রফুল্ল পান বলেছিলেন, তন্ময় হাজরা এলে ওঁদের খবর দিতে। নানান ডামাডোলে শমিত ব্যাপারটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

কেমন আছে হাত? প্রশ্নের সুরটা এবার আগের চেয়ে রুক্ষ হয়েছে।

ভালো—

আসরাফ বেঁচে গেছে। মানে, বেঁচে যাবে।

কে আসরাফ?

ওই যে, যার পেটে লোহার শিক ঢুকিয়ে দিলেন, মনে নেই! চাপা হাসি হাসল লোকটা। তারপর একইরকম মোলায়েম গলায় বলল, সেরে উঠেই ও আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আপনার পেছনে ফুলস্টপ বসিয়ে দেবে। বুঝলেন কি? একদম খাল্লাস! একটা আনচাক্কা বাচ্চা মেয়ের জন্যে এত তকলিফ কেন করছেন?

শমিতের গলার স্বর কয়েক পরদা চড়ে গেল। ও কেটে-কেটে বলল, শুনুন, মিষ্টুকে আমরা ওর বাবা-মায়ের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। ওর কোনও ক্ষতি আমরা করতে পারব না। বরং কেউ যদি ওর ক্ষতি করতে চায় তা হলে বাধা দেব। আমি পুলিশে সব জানিয়েছি...।

ও-প্রান্ত কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপরঃ পুলিশে সব জানিয়ে দিয়েছেন! আপনি কি পাগল? এখন আপনার ফ্যামিলিকে কে সেভ করবে? আপনি সেকেন্ড-মিনিট গুনতে থাকুন...তিনদিনের মধ্যে আমরা কাজ খতম করে দিচ্ছি। আর শুনুন, মিস্টার বুরবাক, মিষ্টুর বাবা-মাকেও আমরা ছাড়ছি না। পথের মাঝে যে এসে দাঁড়াবে তাকেই..ফুস... মুখ দিয়ে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ নকল করল লোকটা। তারপরই লাইন কেটে দিল।

শমিত রিসিভার নামিয়ে রেখে চটপট প্রফুল্ল পানের দেওয়া নম্বরটা ডায়াল করতে শুরু করল।

ওদিকে তন্ময় আর মালিনীর মুখ তখন শুকিয়ে গেছে।

টেলিফোনে শমিতের বলা কথাবার্তা যে টুকু ওঁরা শুনেছেন তাতে ভালোই বুঝতে পেরেছেন। মিষ্টুকে নিয়ে বড় রকমের গণ্ডগোল কিছু একটা বেধেছে। ওঁরা ফ্যাকাসে মুখে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। পাপিয়া ওঁদের লক্ষ করতে লাগল।

শমিত ফোন ছেড়ে তন্ময় আর মালিনীর কাছে আসতেই তন্ময় নাছোড়বান্দার মতো শমিতকে চেপে ধরলেন।

কী ব্যাপার, মিস্টার রায়চৌধুরী? মিষ্টুকে নিয়ে কী প্রবলেম হয়েছে? আপনাকে খুলে বলতেই হবে…প্লিজ…।

মালিনীও অনুনয়-বিনয় করে জোর করতে লাগলেন। অগত্যা শমিত পাপিয়ার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলতে শুরু করল। মিষ্টু আর বাপ্পা তখন নিজেদের খেলায় মত্ত। আর চ্যাম্পও ওদের কাছে ঘুরঘুর করছে।

শমিত ধীরে-ধীরে কথা বলছিল। মিষ্টুকে ওরা পেয়েছে সোমবার, আর মঙ্গলবার রাত থেকেই টেলিফোনে হুমকি শুরু হয়েছে। লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে ওরা মোটেই ঠাট্টা করছে না।

এরপর শমিত ওর হাতের ব্যান্ডেজটার আসল কারণ জানাল তন্ময়কে। বলল, কীভাবে ওকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল।

শমিতের কথা শুনতে-শুনতে তন্ময়দের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কেমন একটা হতভম্ব ভাব ফুটে উঠল তন্ময়ের মুখে। বেশ খানিকক্ষণ তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন শমিতের মুখের দিকে।

মালিনী আর মৃন্ময়ের অবস্থাও অনেকটা একইরকম। হতাশায় মাথা নেড়ে শমিত বলল, কীভাবে যে আমরা দিন কাটাচ্ছি সে আমরাই জানি।

পাপিয়া বলল, মিষ্টুকে আমরা এত ভালোবেসে ফেলেছি যে, ওকে বাঁচানোর জন্যে যে কোনও স্টেপ নিতে রাজি আছি।

তন্ময় বললেন, না, মিস্টার রায়চৌধুরী, মিষ্টুকে আর আপনাদের এখানে রাখাটা ঠিক হবে ...আই মিন, রিস্কি হয়ে যাবে। আজ ওকে আমরা নিয়ে যাব।

মৃন্ময় মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, না, না–এখানে রাখার আর কোনও প্রশ্নই নেই। ওর কিছু একটা হয়ে গেলে দাদা-বউদিকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে। এরকম ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

পাপিয়া মিনমিন করে বলল, আপনারা যা ভালো মনে করেন। মিষ্টুর ওপরে টান যতই থাক, ওর সেফটিটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি।

টেনশন কাটাতে শমিত একটা সিগারেট ধরাল। তন্ময়কে অফার করল, কিন্তু তিনি নিলেন না–ছোট্ট করে থ্যাংকস বললেন।

মালিনী তন্ময়কে বললেন, চলো, তা হলে আর রাত করব না। বলা যায় না, পথে আবার প্রবলেম হতে পারে...। মিষ্টু! মিষ্টুকে ডেকে উঠলেন মালিনী।

মিষ্টু খেলতে খেলতে মালিনীর দিকে ঘুরে তাকাল। মালিনী ওকে ইশারায় কাছে ডাকলেন, চলো, বাড়ি যাব। এরপর রাত হয়ে যাবে। মিষ্টু অমনি বিগড়ে গেল। বায়নার সুরে বলল, না, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে যাব না...। মালিনী মৃন্ময়কে বললেন, ছোড়দা, তুমি একটু দ্যাখো।

মৃন্ময় লম্বা-লম্বা পা ফেলে মিষ্টুর কাছে পৌঁছে গেলেন। ওকে আদর করে বললেন, লক্ষ্মী মা-মণি, বায়না করে না, চলো, তোমাকে ক্যাডবেরি কিনে দেব...।

মিষ্টু মাথা ঝাঁকাতে লাগল বারবার।

তখন শমিত পাপিয়াকে বলল মিষ্টুকে বোঝানোর জন্য। পাপিয়া উঠে মিষ্টুর কাছে গেল। কিন্তু বোঝাবে কী! ওরই মন চাইছে না এ-ফ্ল্যাট ছেড়ে মেয়েটা চলে যাক।

শমিত সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, তন্ময়কে বলল, ব্যাপারটা আমরা লালবাজারে জানিয়েছি—ওদের সি.আই.ডি. ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা একটু পরেই হয়তো এসে পড়বেন। আপনাদের সঙ্গে ওঁরা কথা বলতে চান...।

তন্ময় হাসলেন, বললেন, সেটাই তো ন্যাচারাল! আমার মেয়েকে যে এভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে সেটা তো আর জানতাম না! যাই হোক, আমরা তো এখন চলে যাচ্ছি... আপনি ওঁদের..আই মিন, সি.আই.ডি. অফিসারদের বলবেন আমাদের সঙ্গে ফোনে কনট্যাক্ট করে নিতে।

এদিকে মৃন্ময় মিষ্টুকে কোলে তুলে নিয়েছেন। মিষ্টু জেদ করে হাত-পা ছুড়ছিল, চাঁচাচ্ছিল, আর মৃন্ময় ওকে আদর করে ক্যাডবেরির লোভ দেখিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছিলেন। মালিনী আর পাপিয়া ওদের কাছে দাঁড়িয়ে কাকু-ভাইঝির লড়াই দেখছিল।

মিষ্টুকে ভোলানোর জন্য পাপিয়া ওকে বলল, অ্যাই, একটা গান শুনিয়ে দে তো।

আর গান! মেয়েটা তখন আপত্তি জানাতেই ব্যস্ত।

কী হল, একটা গান শোনাবি না তো? আর-একবার চেষ্টা করল পাপিয়া। তারপর মালিনীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আপনার মেয়ে কার কাছে গান শেখে? দারুণ গায় কিন্তু!

মালিনী অবাক বিব্রত চোখে পাপিয়ার দিকে তাকালেন : গান? মিষ্টু? কই, না তো! ও তো কখনও গান শেখেনি!

এবার পাপিয়ার চোখ কপালে তোলার পালা। মেয়ে গান শেখে মা জানে না। কারণ, গান না শিখলে তো অমন গলা হতে পারে না!

তন্ময় ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন। তিনি বউকে একরকম ঝাজিয়ে উঠলেন : তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! সত্যেনবাবু যে মিষ্টুকে গান শেখাতে আসেন সেকথা ভুলে গেলে! তুমি ভীষণ ফরগেটফুল। আই মিন...।

ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে! বিব্রত ভাবটা সামলে নিয়ে মালিনী একগাল হেসে ফেললেন, আমারও দেখি মিষ্টুর মতো অ্যামনেশিয়া হয়ে যাচ্ছে..।

কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

পাপিয়া সবাইকে অবাক করে দিয়ে হিংস্র থাবা বসিয়ে দিল মালিনীর গলার কাছটায়। শাড়ি আর ব্লাউজ খামচে ধরে অলৌকিক এক শক্তিতে মালিনীকে পাগলের মতো আঁকাতে লাগল। মনে হল যেন পাপিয়ার ওপরে কোনও অপদেবতা ভর করেছে।

শিগগিরই বল, তুই কে? তুই মিষ্টুর মা না! শয়তান ডাইনি! বল তুই কে? মিষ্টু তোর মেয়ে না! বল!

পাপিয়ার ওইরকম রুদ্রাণী রূপ দেখে সবাই কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। চ্যাম্প উত্তেজিত হয়ে ঘেউঘেউ শুরু করে দিল।

মালিনীর রোগা ছিপছিপে শরীরটা পাপিয়ার প্রবল ঝাঁকুনিতে পেন্ডুলামের মতো এপাশ ওপাশ দুলছিল।

মিষ্টু ব্যাপারটা খেয়াল করামাত্রই ওর জেদ পাঁচগুণ বেড়ে গেল। ও ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল। মৃন্ময় ওকে থামাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মিষ্টু আচমকা মৃন্ময়ের হাতে কামড় বসিয়ে দিল।

মৃন্ময় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। মিষ্টুকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মেঝেতে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মিষ্টু আরও একবার দাঁত বসিয়ে দিল মৃন্ময়ের উরুতে।

রাগে অন্ধ হয়ে মৃন্ময় মিষ্টুর বাঁ গালে খোলা হাতে সপাটে এক চড় কষিয়ে দিলেন।

মেয়েটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কংক্রিটের মেঝেতে ওর মাথা ঠুকে যাওয়ার বিশ্রী শব্দ হল।

বাপ্পা ছুটে গেল মিষ্টুর কাছে। ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ল। মিষ্টু! মিষ্টু! বলে ডাকতে লাগল।

দৃশ্যটা দেখে পাপিয়া সত্যি-সত্যি বোধহয় পাগল হয়ে গেল। ও চোখে আগুন জ্বেলে মালিনীকে এক ধাক্কা দিল। মালিনী ছিটকে গিয়ে পড়লেন মৃন্ময়ের গায়ে। টাল সামলাতে না পেরে ওঁরা দুজনেই কাত হয়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

এসব ঘটনা খুব দ্রুত ঘটছিল। শমিতের মাথার ভেতরে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। যুক্তি-বুদ্ধি সব জট পাকিয়ে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছিল।

তন্ময় কিন্তু সব বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন যে, ওঁরা পাপিয়ার কাছে ধরা পড়ে গেছেন। তাই ম্যাজিশিয়ানের মতো এক ভেলকিতে কোথা থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করে পাপিয়াকে লক্ষ করে গুলি করলেন।

গুলি কোথায় গিয়ে লাগল বুঝে ওঠার আগেই দুটো ঘটনা ঘটল। চ্যাম্প চোখের পলকে লাফিয়ে পড়ল তন্ময়ের ওপরে।

আর শমিত একটা হিংস্র চিৎকার করে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা তন্ময়ের গালে চেপে ধরে রগড়ে দিল।

যন্ত্রণায় উঃ! শব্দ করে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তন্ময় ছিটকে পড়লেন টিভির ওপরে। ঝনঝন শব্দ করে টিভিটা ভেঙে পড়ল মেঝেতে। চ্যাম্পের ধারালো দাঁত তখন ওঁর হাত কামড়ে ধরে আঁকাচ্ছে।

গুলি পাপিয়ার কোথাও একটা লেগেছিল। কারণ, ওর হালকা রঙের শাড়িতে রক্তের ছোপ দেখা গেল। ওর ভারী শরীরটা আচমকা খসে পড়ল মেঝের ওপরে। তারপর যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

মৃন্ময় মেঝেতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। ওঁর হাত ধরে মালিনীও।

বাপ্পা ভয়ে ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল আর চ্যাম্পকে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য ছু-ছু শব্দ করছিল। তার মধ্যে বারকয়েক ও ঝুলবারান্দার দিকে ছুটে গিয়ে অন্ধকার রাত লক্ষ করে বাঁচাও! বাঁচাও বলে চিৎকার করল। কেউ ওর আর্তচিৎকার শুনতে পেল কি না কে জানে! হতাশায় বাপ্পা কাঁদতে শুরু করল।

মিষ্টু হঠাৎই উঠে বসল। ঘুম-ভেঙে-ওঠা চোখে ঘরের দৃশ্য অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ওর কপালের একপাশটা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। যন্ত্রণার শব্দ করে কাটা জায়গাটায় হাত দিল ও। হাতটা চোখের সামনে নিয়ে আসামাত্রই ও পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

কারণ, রক্ত দেখার সঙ্গে-সঙ্গে তন্ময় হাজরাকেও ও দেখতে পেয়েছে। এবং চিনতে পেরেছে।

মৃন্ময় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মিষ্টুর দিকে তেড়ে যাচ্ছিলেন। সেটা শমিত আর সইতে পারল না। ও একলাফে রট আয়রনের একটা সোফা তুলে নিল। ওর বাঁ-হাতের ব্যান্ডেজ রক্তে

ভিজে গেল। হাতটা অসহ্য যন্ত্রণায় কনকন করে উঠল। সোফাটা খসে পড়তে চাইল হাত থেকে।

কিন্তু মেয়ের বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে বাবারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। অন্তত শমিত তাই করল।

মেয়ে বলেই তো ডেকেছিল পাপিয়া, তাই না! সেই পাপিয়া এখন গুলি খেয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। কাতরাচ্ছে। আর শমিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখবে! কখনও তাই হয়?

মিষ্টুর জন্য ও না মানুষ খুন করতে পারে। সেখানে মৃন্ময় তো একটা তুচ্ছ অমানুষ! মাত্র দুটো পা ফেলে মৃন্ময়ের কাছে পৌঁছে গেল শমিত।

মৃন্ময় ততক্ষণে মিষ্টুর একটা হাত চেপে ধরেছেন। এইবার এক হ্যাঁচকায় ওকে টেনে তুলবেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

রোবটের মতো আবেগহীনভাবে শমিত রট আয়রন সোফাটা সপাটে মৃন্ময়ের মাথায় আছড়ে দিল। চোখ কপালে তুলে মৃন্ময় চিৎ হয়ে পড়লেন মেঝেতে। ওঁর গল্প শেষ হয়ে গেল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

কাতর চিৎকার করে বাঁ-হাতের ব্যান্ডেজ চেপে ধরল শমিত। যন্ত্রণায় ওর বাঁ-হাতটা খসে পড়তে চাইছিল। চোখ বুজে মুখ কুঁচকে ও উবু হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

ওঃ ভগবান! এই দুঃস্বপ্ন কি শেষ হবে না?

মালিনী ঘরের এককোণে ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইবার হিস্টিরিয়ার রুগির মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করে দিলেন। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর দৃশ্যগুলো তিনি আর সইতে পারছিলেন না।

এদিকে চ্যাম্পের আক্রমণ এড়িয়ে তন্ময় উঠে বসার চেষ্টা করছিলেন। ওঁর গালে জড়ুলের মতো পোড়া দাগ। একনাগাড়ে নোংরা গালিগালাজ ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন তন্ময়। এই ফ্ল্যাট থেকে তিনি এখন কোনওরকমে পালাতে চাইছেন। কিন্তু পিস্তলটা কোথায় গেল! এইখানেই কোথায় যেন খসে পড়েছিল মেশিনটা!

তন্ময় পাগলের মতো পিস্তলটা খুঁজতে লাগলেন। ওটা খুঁজে পেলেই তিনি শয়তান কুকুরটার দফারফা করবেন। কোথায়…কোথায়…?

মিষ্টু তন্ময়ের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে ও বুলেটের মতো ছুটে গেল তন্ময়ের দিকে, আর একইসঙ্গে কান্না ভাঙা গলায় পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে লাগল, তুমি খুনি! খুনি! আমার মাম আর বাবুকে খুন করেছ। মাম আর বাবুকে তুমি মেরে ফেলেছ! তুমি খুনি!..।

তন্ময়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্র চিতার মতো খেপে উঠল মিষ্টু। আঁচড়ে কামড়ে ওঁকে অস্থির করে তুলল। এদিকে চ্যাম্প চাপা গর্জন করার সঙ্গে-সঙ্গে ওর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

খুনি! তুমি খুনি! তুমি খুনি…!

মিষ্টুর পাগল করা চিৎকারের মাঝখানেই ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

.

০৮.

গত কদিন ধরে একফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাতায়-পাতায় সূর্য খেলা করছিল। মাথার ওপরে আকাশ ছবির মতো নীল। মেঘের দল বোধহয় ছুটি নিয়েছে। হতেও পারে। কারণ, আজ রবিবার।

সবমিলিয়ে মনে হচ্ছিল, পুজোর সাজের ছোঁয়া লেগেছে।

প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে পাপিয়ার মনেই হচ্ছিল না মিষ্টুকে পাওয়ার পর থেকে সাত-আটটা দিন ওদের কী ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেটেছে। ভগবান বোধহয় মাঝে-মাঝে এরকম পরীক্ষা নেন। কিন্তু তারপরে যা পাওয়া যায় সুখ, শান্তি, আনন্দ–তার কোনও তুলনা নেই।

মিষ্টু গান গাইছিলঃ

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম
আজব কারখানা।
কেউ বুঝল কেউ বুঝল না।
দেহের মাঝে বাড়ি আছে,
সেই বাড়িতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কেটেছে,
চুরি করে একজনা।...

সেই গান শুনছিল ওরা সবাই।

সবাই বলতে পাপিয়া, শমিত, বাপ্পা–আর দুজন অতিথি ও প্রফুল্ল পান এবং যোগেশ দাশগুপ্ত।

ওঁরা যে আজ সকালবেলা আসবেন সেটা ফোন করে জানিয়েছিলেন প্রফুল্ল। হেসে বলেছিলেন, ম্যাডাম, পুলিশ কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসে না। তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন করছি তখন পুলিশ হিসেবে আসছি না–আসছি বন্ধু হিসেবে...চা খেতে। কী, আপত্তি নেই তো?

পাপিয়া উত্তরে বলেছে, আপত্তি করব আমি! আপনারা আমাকে একটা মিষ্টি মেয়ে দিয়েছেন–এ কথা কি কখনও ভুলতে পারব।

সেই ভয়ংকর ঘটনার পর আঠেরো দিন কেটে গেছে, কিন্তু পাপিয়ার এখনও মনে হয় ব্যাপারটা এই একটু আগেই শেষ হল।

সেদিন কলিংবেল বেজে ওঠার পর বাপ্পা ছুটে গিয়ে দরজা খুলেছিল। খুলেই দ্যাখে কোলাপসিবল গেটের বাইরে পড়শিদের ভিড়, গুঞ্জন, কৌতূহলী মুখের মিছিল।

দরজার পাশেই একটা শো-কেসের ওপরে কোলাপসিবল গেটের চাবিটা রাখা থাকে। কাঁপা হাতে সেটা নিয়ে পড়শিদের কারও হাতে দিয়েছিল বাপ্পা।

ব্যস, তারপরই ওরা জলস্রোতের মতো ঢুকে পড়েছিল ফ্ল্যাটের ভেতরে। আর জনাছয়েক লোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে একটা দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড তৈরি করে দিয়েছিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হাসপাতাল আর পুলিশে ফোন করা হয়ে গেল। তন্ময়, মৃন্ময় আর মালিনী কড়া পাহারায় ঘেরাও হয়ে গেলেন। পাপিয়া আর শমিতের যত্ন-আত্তি শুরু হয়ে গেল একইসঙ্গে।

এর মিনিট কুড়ি পরেই প্রফুল্ল পান আর যোগেশ দাশগুপ্ত এসে পৌঁছেছিলেন। চমকে দেওয়া পুলিশি তৎপরতায় ওঁরা পরিস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছিলেন।

পাপিয়া এসবের কিছুই জানে না কারণ, ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তন্ময়ের গুলি লেগেছিল ওর পেটের কাছে। আর চার-পাঁচ ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলেই ব্যাপারটা বিপজ্জনক হতে পারত।

তারপর আঠেরোটা দিন যে কীভাবে কেটেছে! পাপিয়া পরে শমিতের কাছে শুনেছে। কারণ, সাতদিন ও নার্সিংহোমে ছিল মাইনর অপারেশন করে ওর গুলিটা বের করতে

হয়েছে।

ও মোটামুটি সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর শুরু হয়েছে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ।

সেই ধকলটা কেটে গেলে পর শমিত আর পাপিয়া প্রফুল্ল আর যোগেশের কাছে মিষ্টুর আসল গল্পটা জানতে চেয়েছে। ওঁরা বলেছিলেন, একদিন এসে গল্পটা শোনাবেন।

মিষ্টু একটি দিনের জন্যও শমিতদের ফ্ল্যাট ছেড়ে যায়নি। যখনই দরকার হয়েছে, পুলিশ ফ্ল্যাটে এসে ওর সঙ্গে কথা বলে গেছে। প্রফুল্ল আর যোগেশই সে-ব্যবস্থা করেছিলেন।

শমিত আর পাপিয়া ধীরে-ধীরে জানতে পেরেছে ওইটুকু মেয়ের ওপর দিয়ে কী সাংঘাতিক ঝড় বয়ে গেছে।

এখন সেই ঝড়কপালি মেয়েটা মনভোলানো গান গাইছে।

মিষ্টুর গান শেষ হয়ে গেলে প্রফুল্ল আর যোগেশ ওকে দারুণ তারিফ করলেন। যোগেশ হেসে বললেন, গানের ক্লু দিয়েই শেষ পর্যন্ত খুনি ধরা পড়ল, কী বলেন।

উত্তরে শমিত আর পাপিয়া সায় দিয়ে হাসল। তখন দু-টিপ নস্যি নাকে গুঁজে দিয়ে প্রফুল্ল পান মিষ্টুর গল্পটা ওদের শোনালেন।

মিষ্টুর বাবা-মায়ের নাম সত্যি-সত্যিই তন্ময় আর মালিনী হাজরা। তবে ওঁদের বাড়ি মোটেই তালতলায় নয়–তেঘরিয়ায়। এবং ওঁরা আর বেঁচে নেই। মিষ্টুর চোখের সামনেই ওঁদের নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখামাত্রই মিষ্টু কেমন যেন হয়ে যায়–সেই শকই বোধহয় ওর অ্যামনেশিয়ার কারণ।

পুরো ঘটনাটা শুরু হয় সুপারলোটোর একটা টিকিট নিয়ে।

লটারির টিকিট কাটা তন্ময়ের বহু পুরোনো অভ্যেস ছিল। মানুষটি ভাগ্যে খুব বিশ্বাস করত। হঠাৎই, জীবনে এই প্রথমবার, সুপারলোটোর জ্যাকপট জুটে যায় তন্ময়ের কপালে। তার টাকার অঙ্কটাও অবিশ্বাস্য রকমের : সাতানব্বই লক্ষ টাকা। তন্ময় আর মালিনীর হার্ট নিশ্চয়ই শক্তপোক্ত ছিল, কারণ, এই মারাত্মক আনন্দের খবরটা শুনেও ওঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েননি।

কিন্তু গণ্ডগোল শুরু হল তন্ময়ের ভাই মৃন্ময়কে নিয়ে। মৃন্ময় অল্প বয়েস থেকেই আজেবাজে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়েছিলেন। তাই সবসময়েই খরচের টাকায় টান পড়ত। সময়ে-অসময়ে দাদাকে ফোন করে হোক বা এসে হোক তিনি টাকা ধার চাইতেন—এবং সেই ধার আর কোনওদিনই ফেরত দিতেন না। এইসব কারণেই তন্ময় ছোটভাইকে কখনও নিজের কাছে রাখেননি।

সুপারলোটোর পুরস্কার পাওয়ার খবরটা পাঁচকান হয়ে মৃন্ময়ের কানে পৌঁছোয়। তখন তিনি ফোন করে দাদাকে ভয় দেখান—ওই টাকার অর্ধেক দাবি করেন।

স্বাভাবিক কারণেই তন্ময় রাজি হননি। এই নিয়েই দুই ভাইয়ের মন কষাকষি শুরু।

মৃন্ময়ের ক্রমাগত হুমকিতে তন্ময় ভয় পেয়ে যান। টিকিটটা তিনি বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে ফেলেন। মৃন্ময় ইতিমধ্যে কুখ্যাত একটা মাফিয়া গ্যাং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন। মৃন্ময় তাদের বলেন, যেভাবে হোক টিকিটটা ওঁর চাই।

একদিন রাতে সেই গ্যাং নিয়ে মৃন্ময় তন্ময়দের বাড়িতে চড়াও হন। তারপর নানানভাবে তন্ময় আর মালিনীকে টরচার করেন। কিন্তু কিছুতেই টিকিটটার হদিশ না পেয়ে মিষ্টুর চোখের সামনে দাদা আর বউদিকে কুপিয়ে খতম করেন। সেই সময় রক্ত ছিটকে লেগেছিল মিষ্টুর ফ্রকে। আর প্রচণ্ড শক পেয়ে মিষ্টু স্মৃতি খুইয়ে বসে।

মিষ্টু কিন্তু জানত টিকিটটা ওর মাম আর বাবু কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তন্ময়দের খুন করার আগে কথায় কথায় মৃন্ময় সেটা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু মিষ্টু স্মৃতি হারিয়ে ফেলায় মৃন্ময় ফ্যাসাদে পড়ে যান। ওকে চাপ দিয়ে টিকিটের হদিশটা আর বের করতে পারেননি। ফলে তক্ষুণি কোনও উপায় ভেবে না পেয়ে মিষ্টুকে কিডন্যাপ করে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যান।

পথে একরকম অলৌকিকভাবেই মিষ্টু শমিতদের আওতায় চলে আসে।

দমদম পার্ক পেরিয়ে ভি.আই.পি. রোডের ধারে মৃন্ময়রা গাড়ি থামিয়েছিলেন। কারণ, ওঁর দুজন সঙ্গীর তখন টয়লেটে যাওয়ার দরকার হয়েছিল। সেই সুযোগে হতবুদ্ধি মিষ্টু ফাঁক পেয়েই বেপরোয়া ছুট লাগায়–শমিতদের গাড়ির সামনে এসে পড়ে। তারপর...।

..তারপর তো গোটা গল্পই আপনি জানেন। শমিতের দিকে তাকিয়ে গল্প শেষ করলেন। প্রফুল্ল পান।

টেলিফোন করে আমাদের ভয় দেখাত কে? পাপিয়া জানতে চাইল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে যোগেশ দাশগুপ্ত বললেন, সুধীর আর বিনোদের গ্যাং-এর হরিরাম নামের একটা লোক। কাশীপুর থানায় ওর নামে তিনটে মার্ডার চার্জ রয়েছে। তন্ময় আর মালিনী যে-দিন মার্ডার হন সেদিন হরিরাম মৃন্ময়ের সঙ্গে ছিল।

প্রফুল্ল পান রুমাল দিয়ে নাক মুছে নিয়ে বললেন, মিষ্টুকে নিয়ে মৃন্ময়ের বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। এক তো মিষ্টুই শুধু সুপারলোটোর টিকিটটার হদিশ জানত। এ ছাড়া মিষ্টুই ছিল তন্ময় আর মালিনীর খুনের একমাত্র সাক্ষী। তাই মৃন্ময় একবার চাইছিলেন মিষ্টুকে বাঁচিয়ে রাখতে, আর একবার চাইছিলেন ওকে মেরে ফেলতে। এই দোটানায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মৃন্ময় শেষের পথটাই বেছে নিয়েছিলেন– তিনি ভেবেছিলেন, লটারির টিকিটটা পাওয়ার আর কোনও

আশা নেই। তাই ছলে বলে কৌশলে মিষ্টুকে আপনাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাইছিলেন।

তারপর...ঘটনাচক্রে সব প্ল্যানই তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। তখন মৃন্ময় দাদার নাম করে মিষ্টুর ছবি দিয়ে নিউজপেপারে বিজ্ঞাপন দেন। তারপর তন্ময় সেজে আপনাদের ফ্ল্যাটে আসেন।

সবিতা ঘোষ নামের একটা নাটকের মেয়েকে মালিনী সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসেন...।

শেষদিন ওঁদের সঙ্গে মৃন্ময় সেজে কে এসেছিল? পাপিয়া জিগ্যেস করল।

যোগেশ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আনোয়ার–সুধীর আর বিনোদের এক চ্যালা। ছেলেটা পড়াশোনা জানে, কথাবার্তায় ভদ্র...ওদের দলের বেশ কয়েকটা ডাকাতির বুদ্ধি জুগিয়েছে।

বদমাইশ লোকগুলোর সাজা হবে তো?

হবে না মানে! আমাদের চার্জশিটে কোনও ফাঁক থাকবে না। যোগেশ ভুরু উঁচিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, আমি আর প্রফুল্লদা সহজে হার মানার পাত্র নই...।

প্রফুল্ল হাতে হাত ঘষে হাসলেন : কেস মিটে গেলে সুপারলোটোর টিকিটটা আপনারা হাতে পাবেন। তখন প্রাইজ মানিটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন।

ওটা তো আমাদের টাকা নয়, মিষ্টুর টাকা! শমিত বলল।

এখন আপনারা ছাড়া ওর আর কে আছে?

পাপিয়া মিষ্টুকে কাছে টেনে নিল। ওর গালে, মাথায় আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, সত্যি, এই মেয়েটা আমাদের গুণ করেছে।

গুণ কী, আন্টি? গুণ অঙ্ক? অবাক চোখে পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে মিষ্টু জানতে চাইল।

না রে, গুণ অঙ্ক নয়। এই গুণ মানে জাদু, বুঝলি! এখন থেকে তুই সত্যি-সত্যি আমাদের মেয়ে। তোকে আর কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে না। মিষ্টুর চুলে মুখ গুঁজে দিল পাপিয়া।

শমিত, বাপ্পা আর চ্যাম্প অপলকে পাপিয়া আর মিষ্টুকে দেখছিল।

আর ঠিক তখনই জোরালো এক বাতাসে কৃষ্ণচূড়া গাছটার রোদ-চকচকে পাতাগুলো ঝলমলিয়ে নেচে উঠল।

সর্বনাশের কাছাকাছি

সর্বনাশের কাছাকাছি

ধর্ষণ করে খুন

স্টাফ রিপোর্টারঃ শনিবার রাতে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের চিংড়িঘাটা এলাকায় ঝরনা সামন্ত (২২) নামে এক তরুণীকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। রবিবার ভোরে তরুণীটির মৃতদেহ খালপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহে ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

রবিবারের ভোরবেলাটার গায়ে কেমন যেন ছুটির মেজাজ মাখানো ছিল। সমতল পিচের রাস্তায় মসৃণ বেগে রোলার স্কেস চালিয়ে যেতে-যেতে দ্বৈপায়নের ঠিক সেরকমটাই মনে হচ্ছিল।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। পাখিরা গাছের ঠিকানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘুমজড়ানো চোখে ডানা মেলে দিয়েছে খাবারের সন্ধানে। ওদের মিষ্টি ডাকের টুকরো দ্বৈপায়নের দারুণ লাগছিল। দু-পাশের বড়-বড় গাছের পাতায় এখনও কুয়াশা জড়ানো। শৌখিন সব বাড়ির লাগোয়া বাগান থেকে গোলাপ-গাঁদার হালকা গন্ধ দ্বৈপায়ন ঘ্রাণে টের পাচ্ছিল।

সল্ট লেক এলাকাটা এমনিতেই নির্জন। তার ওপর রবিবারের এই সাতসকালে এলাকাটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছিল। নিস্তব্ধ পরিবেশে দ্বৈপায়নের রোলার

স্কেটল্‌স-এর চাকার ঘর্ঘর শব্দ কানে বাজছিল। আর রিবক-এর ট্র্যাক সুট ভেদ করে ঠান্ডা যেন ঢুকে পড়ছিল বুকের ভেতরে।

একটু দূরেই কাঠগোলাপ গাছটাকে দেখতে পেল দ্বৈপায়ন। গাছে বড়-বড় সাদা ফুল ফুটে আছে। কিছু ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

গাছের নীচে রিকশা-স্ট্যান্ড। সেখানে মাত্র একটি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে। রিকশাওয়ালা চাদর মুড়ি দিয়ে প্রায় কবন্ধ সেজে ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করছে।

একটা লাল রঙের হুন্ডাই গাড়ি হুস করে দ্বৈপায়নকে পেরিয়ে চলে গেল। ঠিক তখনই দূর থেকে কেউ ডেকে উঠল : দিপুদা, এবার ফিরে এসো।

রোলার স্কেটস-এ চলতে-চলতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল দ্বৈপায়ন। অনেকটা দূরে হলদে রঙের ট্র্যাক সুট পরে অচ্যুত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্বৈপায়নকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

দ্বৈপায়ন ওকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল। তারপর ওর চলার গতি বাড়িয়ে দিল। সুইমিং পুল স্টপেজের কাছটায় ইউ বাঁক নিয়ে ও অচ্যুতকে লক্ষ করে ফিরে চলল। অচ্যুতের ডাকনাম মিমো, তবে দ্বৈপায়ন ওকে আদর করে গুটে বলে ডাকে। বছর ন-দশের সরল সাদাসিধে ছেলে। নারায়ণ দাস বাঙ্গুর স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে। দ্বৈপায়নদের ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাটেই ওরা থাকে।

গুটে ডাকাবুকো স্বাস্থ্যবান ছেলে। পড়ায় যত মন তার চেয়ে ঢের বেশি মনোযোগ খেলাধুলো আর টিভি সিরিয়ালে। যেমন, যেখানে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন শক্তিমান সিরিয়ালটা ওর দেখা চাই-ই চাই। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে ওর নিত্য চেঁচামেচি লেগে আছে।

রোজ ভোরবেলায় দ্বৈপায়ন পায়ে রোলার স্কেস লাগিয়ে প্র্যাকটিস করতে বেরোয়। মাসখানেক আগে হঠাৎ একদিন গুটে বায়না ধরে বসল ওকেও রোলার স্কেট করা শিখিয়ে দিতে হবে। তারপর থেকে দ্বৈপায়ন রবিবার আর ছুটির দিনে ভোরবেলা ওকে সঙ্গে নিয়ে

বেরোয়। না নিয়ে গেলেই বাচ্চা ছেলেটা কান্নাকাটি করে দ্বৈপায়নকে আঁচড়ে কামড়ে একেবারে অস্থির করে তোলে।

গুটের কাছে পৌঁছে থামল দ্বৈপায়ন। রাস্তার পাশে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। তারপর ফিতে খুলে পা থেকে রোলার স্কেস দুটোকে আলাদা করে ফেলল। গুটেকে কাছে ডাকল, আয়, এদিকে আয়–।

গুটে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্বৈপায়ন কাছে ডাকতেই ও মায়ের শেখানো মতো রাস্তার ডান দিক আর বাঁ দিকে একবার করে তাকাল–তারপর এক ছুটে দ্বৈপায়নের কাছে চলে এল। অধীর আগ্রহ নিয়ে ওর রোলার স্কেটস-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

ট্র্যাক সুটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা চাবি বের করল দ্বৈপায়ন। একটা রোলার স্কেটের চেসিসের দুটো নাট খুলে চেসিসের দুটো টুকরোকে মুখোমুখি ঠেলে ছোট করে গুটের পায়ের মাপে নিয়ে এল। নাট দুটো আবার টাইট করে দিল চাবি দিয়ে। চারটে চাকার নাট ঠিকমতো টাইট আছে কিনা একবার পরখ করে নিল। তারপর গুটের কেস জুতো পরা ডানপায়ে রোলার স্কেটটা ফিতে দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিল। অন্য স্কেটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এরপর প্র্যাকটিসের পালা।

গুটের হাত ধরে দ্বৈপায়ন ওর পাশে-পাশে হেঁটে চলল। আর গুটে ডান পায়ে ভর দিয়ে চাকা গড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে লাগল।

দিপুদা, আমার শিখতে কদিন লাগবে?

দ্বৈপায়ন সামান্য চিন্তা করার ভান করে তারপর বলল, এই ধর মাসদুয়েক।

তারপর বাপিকে বলব রোলার এস্কেট কিনে দিতে।

এস্কেট নয়–স্কেটস। হাসল দ্বৈপায়ন।

ওই হল। গুটে বলল, তোমার মতো জোনেক্স কোম্পানির কিনব।

কিনিস। এখন শেখায় মন দে। বডিটা একদম স্ট্রেট রাখ–ডানদিক বাঁদিকে হেলাবি না।

শিখতে-শিখতে সময় গড়াতে লাগল। রাস্তায় লোকজন আর গাড়ির সংখ্যা বাড়তে লাগল। একসময় দ্বৈপায়ন গুটেকে দাঁড় করিয়ে ওর পা থেকে রোলার স্কেটটা খুলে নিল। তারপর চেসিসটা নিজের পায়ের মাপে ঠিক করে নিয়ে দুটো স্কেটই পায়ে লাগিয়ে নিল।

এইবার গুটের হাত ধরে স্কেট করে চলতে শুরু করল দ্বৈপায়ন। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গুটে ছুটে চলল। ওর দিকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলল, হাঁপিয়ে গেলে বলবি, স্পিড কমিয়ে দেব।

গুটে ছুটতে-ছুটতেই ঘাড় নাড়ল।

ঠিক তখনই নীলরঙের একটা মারুতি গাড়ি দ্বৈপায়নের ডান পাশে চলে এল, ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল।

দ্বৈপায়ন দেখল, গাড়িতে মাঝবয়েসি দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন? একজন স্টিয়ারিং এ, আর অন্যজন তার পাশে।

জানলার পাশে বসা ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, ভাই, সি.ই.-১৬৫টা কোথায় পড়বে বলতে পারেন?

সি.ই.-১৬৫ দ্বৈপায়নদের বাড়ির ঠিকানা। বাড়িটা পাঁচতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি, তাতে মোট দশটা ফ্ল্যাট আছে। এঁরা কাদের গেস্ট কে জানে!

দ্বৈপায়ন হাত নেড়ে ওঁদের বুঝিয়ে দিল, কীভাবে সামনের গোলচক্কর ঘুরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশ দিয়ে সি.ই.-১৬৫-তে পৌঁছতে হবে।

দ্বৈপায়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে মারুতিটা স্পিড নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গুটে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। গাড়িটা চলে যেতেই দ্বৈপায়নকে জিগ্যেস করল, দিপুদা, ওরা কাদের ফ্ল্যাট খুঁজছে? আমাদের?

না, না। এই সকালে কাদের ফ্ল্যাটে যাবে কে জানে! গুটের কদমছাঁট মাথায় আদর করে এক চাঁটি মারল দ্বৈপায়ন ও নে, চল–। দেরি হয়ে গেলে বউদি আবার বকাবকি করবে।

গুটে হেসে বলল, মোটেই না। মা তোমাকে একটুও বকবে না। মা তোমাকে ভালোবাসে।

গুটের শেষ কথাটা দ্বৈপায়নকে যেন একটা ধাক্কা দিল।

বাড়ির কাছে এসে দ্বৈপায়ন দেখল, নীল মারুতিটা ওদের সদর দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। গুটে শক্তিমান সিরিয়াল নিয়ে আপনমনে বকবক করে যাচ্ছিল। গাড়িটা দেখামাত্রই ও চুপ করে গেল। তারপর দ্বৈপায়নের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, গাড়িটা কী সুন্দর দ্যাখো! আমি বাপিকে বলেছি একটা নীল রঙের মারুতি কিনতে।

দ্বৈপায়ন ছোট্ট করে হু বলে পা থেকে রোলার স্কে খুলতে লাগল।

তিনতলায় গুটেদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে ও দেখল দরজা সামান্য খোলা। ফাঁক দিয়ে বসবার ঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে সোফায় মারুতি গাড়ির একজন ভদ্রলোক বসে আছেন।

দ্বৈপায়ন বউদি বলে ডেকে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তখনই ড্রইং স্পেসের সম্পূর্ণ ছবিটা ওর নজরে ধরা পড়ল।

নব্বই ডিগ্রি কোণে সাজানো দুটো সোফায় মারুতি গাড়ির দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তাদের একজনের হাতে সিগারেট। ওদের সামনে আর-একটা সোফায় গুটের বাবা শান্তনু বসে আছে। তার ঠিক পিছনে গুটের মা সীমন্তিনী দাঁড়িয়ে।

দ্বৈপায়নের ডাকে সীমন্তিনী দরজার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। তখনই দ্বৈপায়ন খেয়াল করল সীমাবউদির মুখটা কেমন ফ্যাকাসে। মুখের সৌন্দর্যে আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা আঁচড় কেটেছে।

গুটে মাকে দেখামাত্রই বলে উঠল, আজ অনেকটা শিখে গেছি। দু-মাস পর আমি রোলার এস্কেট কিনব। তাই না, দিপুদা?

দ্বৈপায়ন সীমার দিকে তাকিয়ে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল। গুটের কথায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল, হ্যাঁ, কিনিস। এখন ভেতরে যা হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসে যা

সীমাও ছেলেকে ভেতরে যেতে বলল। ওদের দিন-রাতের কাজের মেয়ে বাসন্তী একটু দূরে রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রং ময়লা। গায়ে রঙিন ফুল-ফুল ছাপা ফ্রক।

গুটে জুতো খুলে ওর কাছে চলে গেল।

দ্বৈপায়ন চলে আসতে যাবে, সীমন্তিনী ওকে ডাকল, দিপু, তুমি একটু থেকে যাও। তারপর সোফায় বসা অপরিচিত দুই ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করে ও চাপা গলায় বলল, ওঁরা পুলিশের লোক…সল্ট লেক থানা আর লালবাজার থেকে এসেছেন।

দ্বৈপায়নের ভুরু কুঁচকে গেল। ও সীমার আকুল মুখের দিকে দেখল। তারপর রোলার স্কেট-জোড়া দরজার একপাশে নামিয়ে রেখে ঢুকে পড়ল বসবার ঘরের এলাকায়।

সীমন্তিনী দ্বৈপায়নকে দেখিয়ে অপরিচিত দুই ভদ্রলাককে লক্ষ করে ইতস্তত করে বলল, ইনি দ্বৈপায়ন বসু–আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড–সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।

দ্বৈপায়ন একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল।

যে-ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছিলেন তিনি কাঠ-কাঠ গলায় বললেন, আমার নাম অমল রায় সল্ট লেক থানা, সাউথ। আর ইনি– সঙ্গীর দিকে ইশারা করে ও বিজয় মিত্র–

হোমিসাইড স্কোয়াড, লালবাজার। আমরা একটা ব্যাপারে শান্তনুবাবুকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি।

দ্বৈপায়ন সাদা-পোশাকের দুই অফিসারকে বেশ খুঁটিয়ে দেখল।

অমল রায়ের গায়ের রং কালো, চোয়াড়ে চেহারা, মাথায় সামনের দিক থেকে টাক পড়তে শুরু করেছে, চোখ ছোট-ছোট। সব মিলিয়ে কেমন একটা রুক্ষ ভাব।

ওঁর সঙ্গী বিজয় মিত্রের ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বছর পঞ্চাশের মোটাসোটা ফরসা চেহারা, গোলগাল মুখে সবসময়েই এক টুকরো হাসি লেগে আছে, চোখে চশমা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, যথেষ্ট ভুড়ি আছে–দেখে মনে হয় ভোজনবিলাসী।

বাসন্তী ট্রে-তে করে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল সবার জন্য। সীমন্তিনী অতিথিদের অনুরোধ করল, নিন, চা খান।

দ্বৈপায়নও চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল। তারপর শান্তনুর দিকে তাকাল।

শান্তনুর বয়েস সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ হবে–দ্বৈপায়নের চেয়ে বছর আট-নয়ের বড়। স্টেট ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে। তা ছাড়া মানুষটাও ভালো। সিগারেট আর তাস ছাড়া অন্য কোনও নেশা নেই। এই ফ্ল্যাটে এসেছে সাত-আট মাস। দ্বৈপায়নরা এই ফ্ল্যাট-বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা। তাই এই এলাকার যে-কোনও ব্যাপারে দ্বৈপায়নই ওদের গাইড।

কিন্তু পুলিশ হঠাৎ এখানে এসেছে কী ব্যাপারে?

সিগারেট শেষ করে অমল রায় টুকরোটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর শান্তনুকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা এ-ফ্ল্যাটে এসেছেন কতদিন?

মনে-মনে হিসেব কষে নিয়ে শান্তনু বলল, প্রায় সাড়ে সাত মাস।

আপনাদের ফোন কি নতুন এসেছে?

হ্যাঁ–সবে মাসখানেক পেরিয়েছে। শান্তনু সমর্থনের আশায় সীমার দিকে তাকাল।

সীমা ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে বলল, এখনও প্রথম বিল আসেনি।

আপনারা ফোন নাম্বার কাউকে দিয়েছেন?

হ্যাঁ। নতুন ফোন এলে সেটাই তো স্বাভাবিক।

শান্তনুর কথায় যে-খোঁচা ছিল সেটা অমল রায় গায়ে মাখলেন না। বিজয় মিত্র টেবিলে রাখা খবরের কাগজের হেডলাইনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিলেন। মনে-মনে কিছু ভাবছিলেন কি না বোঝা গেল না।

শান্তনুর দিকে না তাকিয়েই বিজয় মিত্র বললেন, একটা চিরকুটে আপনার নাম আর ফোন নাম্বার লিখে কাউকে দিয়েছিলেন?

শান্তনু কেমন যেন দিশেহারা হয়ে ভাবতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে বলল, হয়তো দিয়েছি–স্পেসিফিক কিছু মনে পড়ছে না।

বিজয় মিত্র স্বাভাবিক গলায় সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বললেন, রায়, চিরকুটটা ওঁকে দেখান।

অমল রায় ব্যাজার মুখ করে তার ছাইরঙা জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন। নিস্পৃহ মুখে খাম খুলে একটা চিরকুট বের করে এগিয়ে দিলেন শান্তনুর দিকে।

চিরকুট হাতে নেওয়ামাত্রই সবকিছু মনে পড়ে গেল শান্তনুর। ও মুখ ফিরিয়ে তাকাল দেওয়ালে ঝোলানো বড়-বড় তারিখ ছাপা একটা ক্যালেন্ডারের দিকে। ছবিহীন ক্যালেন্ডার, বারো মাসের জন্য বারোটা পৃষ্ঠা।

দ্বৈপায়ন গলা উঁচু করে চিরকুটের লেখাটা দেখতে চেষ্টা করল। শান্তনুর হাতের লেখা খুব সুন্দর। সেই সুন্দর হরফেই লেখা রয়েছে শান্তনু সেনগুপ্ত / ৩৩৭-৪৫৩৬।

ও শান্তনুকে উদ্দেশ করে চাপা গলায় বলল, শান্তনুদা, এটা তো আপনারই হাতের লেখা। কাকে লিখে দিয়েছিলেন মনে পড়ছে না?

শান্তনু মাথা নাড়লঃ হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে। চিরকুটটা ওই ক্যালেন্ডরটার পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ওখান থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়েছিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে সীমন্তিনীরও সবকিছু মনে পড়ে গেল। দ্বৈপায়ন লক্ষ করল, সীমার ফরসা মুখে হালকা গোলাপি ছোপ।

নাম আর ফোন নাম্বারটা কাকে লিখে দিয়েছিলেন? অমল রায় জিগ্যেস করলেন। তারপর চিরকুটটা শান্তনুর হাত থেকে নিয়ে উঠে গেলেন ক্যালেন্ডারটার কাছে। ছেঁড়া পাতাটা খুঁজে বের করে ওটা খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে পরখ করে দেখলেন।

শান্তনু বলল, দিন পনেরো আগে আমার এক বন্ধু এ-বাড়িতে এসেছিল। এই চিরকুটটা আমি ওকে দিয়েছিলাম।

বন্ধুর নাম কী? বিজয় মিত্র নরম গলায় জানতে চাইলেন।

পলাশ–পলাশ সান্যাল।

অমল রায় বসবার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। সিগারেট ঠোঁটে নিয়েই জড়ানো স্বরে জিগ্যেস করলেন, কীরকম বন্ধু?

কীরকম বন্ধু মানে? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল শান্তনু।

আহা, রাগ করছেন কেন, মিস্টার সেনগুপ্ত! বিজয় মিত্র পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেনঃ আমরা অ্যাকচুয়ালি আপনার বন্ধু সম্পর্কে একটু ইন্টারেস্টেড। তাই জানতে চাইছি। শুধু-শুধু এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন?

অমল রায় ফিরে এসে সোফায় বসলেন এবং একইসঙ্গে মন্তব্য করলেন, এক্সাইটেড হয়েও তো কোনও লাভ নেই। আমরা আমাদের কাজ করবই। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে? হ্যাঁ, মিস্টার সেনগুপ্ত, এবার বলুন–পলাশ সান্যাল সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

শান্তনু একটা সিগারেট ধরাল। ওর মাথার ভেতরটা কেমন করছিল। পলাশ সম্পর্কে ও কতটুকু জানে?

ভালো করে ভাবতে গিয়ে দেখল, প্রায় কিছুই না। পলাশ মেট্রোপলিটন স্কুলে ওর সঙ্গে পড়ত। ক্লাসে পলাশের সঙ্গে ওর তেমন একটা বন্ধুত্ব ছিল না। তারপর, স্কুল শেষ হতেই, ছাড়াছাড়ি। বিশ-বাইশটা বছর কোথা দিয়ে যেন গড়িয়ে গেছে। পলাশকে শান্তনু একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎই সেদিন–মাসদেড়েক আগে সন্ধেবেলা উলটোডাঙা-ভি.আই.পি. রোডের মোড়ে পলাশের সঙ্গে আচমকা দেখা। শান্তনু পলাশকে একটুও চিনতে পারেনি। পলাশই ওকে নাম ধরে ডেকেছিল।

তারপর ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে স্কুলের গল্প, বন্ধুদের গল্প, স্যারদের গল্প। শেষ পর্যন্ত অচেনা মানুষটাকে শান্তনু পলাশ বলে মেনে নিয়েছিল।

কথায় কথায় শান্তনু ওকে নিজের বিয়ের কথা, নতুন ফ্ল্যাট কেনার কথা বলেছিল। বলেছিল, একদিন সময় করে মিসেসকে নিয়ে চলে আয়।

উত্তরে হেসে পলাশ বলেছিল, একাই আসব কারণ, আমার পিকিউলিয়ার জীবনটা এখনও একলা চলো রে।

শান্তনু ভাবেনি পলাশ সত্যি-সত্যিই ওর ফ্ল্যাটে আসবে।

কিন্তু পলাশ এসেছিল। প্রায় দু-ঘন্টা ছিল। হাসি-ঠাট্টা-গল্পে সীমা আর মিমোকে একদম মাতিয়ে দিয়েছিল। ও চলে যাওয়ার পর সীমা বলেছিল, তোমার বন্ধু খুব মজার। ওঃ, কতদিন পর প্রাণ খুলে হাসতে পারলাম।

পলাশকে ওরা সবাই আবার আসার জন্য বারবার করে বলেছিল। পলাশও কথা দিয়েছিল সুযোগ পেলেই আসবে। সীমা বলেছিল ফোন করে আসতে। কারণ, আগে থেকে জানা থাকলে ও পলাশকে রাতের খাওয়া খাইয়ে তবে ছাড়বে। পলাশ হেসে বলেছিল, সাহেবরা যাকে বলে ডিনার? বলেই হো-হো করে গলা ফাটানো হাসি। তারপর ও কথা দিয়েছে, আবার আসবে।

সেদিন দু-ঘণ্টা আড্ডার পর স্কুলের পলাশ সান্যালকে যেন ধীরে-ধীরে খুঁজে পাচ্ছিল শান্তনু। স্কুলের সেই রোগা ময়লা চেহারার লাজুক ছেলেটাকে ও যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

তারপরই এখনকার পলাশের চেহারাটা ভেসে উঠল শান্তনুর চোখের সামনে। ভারী শরীর, মাথায় টাক, চোখে চশমা, কঁচাপাকা গোঁফ। ঘন-ঘন সিগারেট খায়। কারণে-অকারণে দরাজ গলায় হেসে ওঠে। সব মিলিয়ে বেশ দিলখোলা বলে মনে হয়। তবে শান্তনু স্পষ্ট লক্ষ করেছিল, চশমার কাচের আড়ালে পলাশের চোখের মণি বেশ সতর্ক আর চঞ্চল—সবসময়েই কী যেন খুঁজছে।

পলাশের সঙ্গে এত গল্প করেছে ওরা, কিন্তু ওর সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি—কোথায় থাকে, কোথায় চাকরি করে, বাড়িতে আর কে-কে আছে।

সীমন্তিনী দু-একবার সেসব প্রসঙ্গ তুলেছিল বটে, কিন্তু পলাশের অন্য সব কথাবার্তায় সেগুলো চাপা পড়ে গেছে।

নাকি পলাশ ইচ্ছে করে সেসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে?

কিন্তু কেন?

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সীমন্তিনীর দিকে একবার তাকাল শান্তনু। তারপর নীচু গলায় বলল, ও... আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত...হঠাৎ রাস্তায় দেখা...প্রায় বিশ বছর পর। একদিন মাত্র এখানে এসেছিল...তেমন একটা কিছু...ইয়ে...মানে, জানা হয়নি।

অমল রায় ও বিজয় মিত্র এরপর নোট প্যাড বের করে শান্তনু আর সীমন্তিনীকে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর দরকার মতো প্যাডে নোট নিতে লাগলেন।

দ্বৈপায়ন হতবাক হয়ে গোটা ব্যাপারটার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

ওঁদের জিজ্ঞাসাবাদের ধকল শেষ হলে সীমা প্রশ্ন করল, পলাশদার কি কোনও অ্যাসিডেন্ট হয়েছে?

অ্যাসিডেন্ট! বিজয় মিত্র হেসে ফেললেন : আপনি যা ভাবছেন তা নয়, ম্যাডাম। সেরকম হলে আমরা ফোন করেই কাজ সেরে নিতাম, সাতসকালে কষ্ট করে এসে আপনাদের বিরক্ত করতাম না। মিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেনঃ ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। একইসঙ্গে বিপজ্জনক..আপনাদের পক্ষে...।

দ্বৈপায়ন উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। ও আর থাকতে না পেরে বলল, প্লিজ, ব্যাপারটা আমাদের খুলে বলুন।

বিজয় মিত্র অমল রায়ের দিকে তাকালেন, একটু সময় নিয়ে বললেন, রায়, আপনাকে তো সব বলেছি, আপনিই ব্যাপারটা ওঁদের খোলসা করে বলুন।

অমল রায় টেবিলে বারকয়েক টোকা মেরে মাথা নাড়লেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, মিস্টার সেনগুপ্ত, আপনারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা

খবর খেয়াল করেছেন কি না জানি না। গত ছমাসে কলকাতায় তিন-তিনটে রেপ অ্যান্ড মার্ডারের ঘটনা ঘটেছে। প্রথমটা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, দ্বিতীয়টা কসবায়, আর শেষ ঘটনাটা মাত্র চারদিন আগের মানে, গত শনিবার রাতে ইস্টার্ন বাইপাসের চিংড়িঘাটা এলাকায় হয়েছে।

তিনটে ঘটনার মধ্যে এমন কিছু কিছু মিল আমরা খুঁজে পেয়েছি যাতে মনে হয় কাজটা একই লোকের। যেমন, তিনটে ঘটনাই ঘটেছে সন্ধের পর, রাতে। অবশ্য এটা নেহাতই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এসব অপকর্ম অন্ধকারেই হবে। তবে দ্বিতীয় মিলটা বেশ অদ্ভুত। রেপ করে মার্ডার করার পর মার্ডারার মেয়েগুলোর পোশাক-আশাক আবার বেশ সময় নিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে। এছাড়া তিনজনেরই গলায় আর গালে কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আর প্রত্যেককে খুন করা হয়েছে গলা টিপে।

তিনজন ভিকটিমের গড় বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। তিনজনেরই বেশ অ্যাট্রাকটিভ চেহারা ছিল। ফোরেনসিক রিপোর্টে তিনটে কেসের মধ্যে আরও অনেক সিমিলারিটি পাওয়া গেছে। তাই আমরা এই ডিসিশানে এসে পৌঁছেছি যে, তিনটে রেপ অ্যান্ড মার্ডার একই লোকের কাজ। এ-ব্যাপারে এখনও আমরা কাউকে ট্র্যাক ডাউন করতে পারিনি বলে লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াড বেশ অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে।

অমল রায় একটু থামলেন। সিগারেটে কয়েকবার গভীর টান দিলেন। অনুসন্ধানী নজরে শান্তনু, সীমন্তিনী আর দ্বৈপায়নকে জরিপ করলেন। যেন ওদের প্রতিটি অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি মানে বুঝে নিতে চাইলেন। তারপর সামান্য কেশে নিয়ে কথায় খেই ধরে বলতে শুরু করলেন?

চিংড়িঘাটার কেসটা আপনাদের একটু বলি। যে-মেয়েটি মারা গেছে ঝরনা সামন্ত—ও কাছাকাছি একটা ঝুপড়িতে থাকত। গায়ের রং কালো হলেও চেহারা নজর কাড়ার মতো। সন্ধের পর ও যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে খালধারে বোধহয় শুকনো ডালপালা জোগাড় করতে গিয়েছিল কারণ, ওর সঙ্গে একটা বস্তা ছিল। আপনারা

ওদিকটায় কখনও গেছেন কিনা জানি না, তবে জায়গাটা ভীষণ নির্জনতা ছাড়া ওখানে একটা খাল আছে, খালের ধারে অনেক আগাছা আর গাছের ভিড় জঙ্গলের মতন। সেদিন খালের বাঁদিকটায় কাছাকাছি একটা বিশাল জমির আগাছা সাফ করার জন্যে কিছু লেবার সেই আগাছায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে দাবানলের মতো দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল সেখানে। স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা সেই আগুন দেখতে ভিড় করেছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঝরনা সেখানে ছিল। তখন সময় প্রায় সাড়ে ছটা হবে। শীতের সময়...বুঝতেই পারছেন, সাড়ে ছটা মানে বেশ অন্ধকার। তার ওপর আগুন নিভতে আরও কিছুটা সময় লেগেছিল।

সিগারেট শেষ হয়ে আসায় অমল রায় জ্বলন্ত টুকরোটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আগুন নিভে যাওয়ার পর জায়গাটা আবার নির্জন অন্ধকার হয়ে যায়। তখন ঝরনা বোধহয় খালধারের দিকে চলে যায়। ব্যস, তারপর সব শেষ।

শান্তনু, সীমন্তিনী আর দ্বৈপায়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অমল রায়ের কথা শুনছিল। তিনি থামতেই দ্বৈপায়ন জিগ্যেস করল, কিন্তু শান্তনুদা এর মধ্যে এল কোত্থেকে?

সামান্য হাসলেন অমল রায়, তারপর বললেন, ডেডবডির শাড়ির ভাঁজে আমরা এই চিরকুটটা পেয়েছি। এটার কথা আমরা মিডিয়াকে ফ্ল্যাশ করিনি। এই সিরিয়াল কিলার ও রেপিস্টকে ধরার এটাই একমাত্র পজিটিভ ক্লু। এই সূত্র ধরেই কেসগুলো আমরা সম্ভ করতে চাই।

বিজয় মিত্র এবার মুখ খুললেন, আমাদের বিশ্বাস আপনার স্কুলের বন্ধু পলাশ সান্যালই হল আসল কালপ্রিট। আর তাকে ধরতে হলে আপনাদের সাহায্য আমাদের কাছে ভীষণ জরুরি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিত্র, তারপর ও ব্যস, এই হল পুরো গল্প।

সীমন্তিনীর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। অর দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরে গুড়গুড় করে যেন ঢাক বাজতে শুরু করল। পলাশ সান্যালকে ও কখনও দ্যাখেনি। কিন্তু একজন রেপিস্ট ও মার্ডারার শান্তনুদার স্কুলের বন্ধু এটা ভাবতেই ওর কেমন লাগছিল।

সীমা বিজয় মিত্রের কাছাকাছি এগিয়ে এল, অসহায়ভাবে জিগ্যেস করল, আমরা তা হলে এখন কী করব?

শান্তনু একমনে সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছিল, ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে ছিল সামনের খোলা জানলার দিকে। বোধহয় পলাশের নতুন অবিশ্বাস্য চেহারাটার কথা ভাবতে চাইছে।

টেবিলে রাখা খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করতে করতে বিজয় মিত্র বললেন, মিস্টার সেনগুপ্ত, আমরা আপনাদের ওপর খুব ডিপেন্ড করছি। আপনি ফোন নাম্বারটা পলাশ সান্যালকে লিখে দিয়েছেন দিন পনেরো আগে, আর সেটা আমরা পেয়েছি মাত্র চারদিন আগে মার্ডার স্পটে। চিরকুটটা দশদিনেরও বেশি সময় ধরে কেন পলাশবাবুর পকেটে ছিল বলতে পারব না। তবে এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, পলাশবাবুর কাছ থেকে ওটা চলে গেছে আসল মার্ডারারের কাছে, আর পলাশবাবু নির্দোষ। উঁহু মাথা নাড়লেন ঘন-ঘনঃ হি ইজ আওয়ার গাই। যেহেতু আমাদের কাছে আর কোনও ক্লু নেই তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও পথও নেই।

সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে শান্তনু এবার নড়েচড়ে বসল : কীসের অপেক্ষা?

পলাশ সান্যাল কবে আবার আপনাদের ফোন করে, বা আপনাদের বাড়িতে আসে– তার অপেক্ষা।

আপনার কী মনে হয় ও ফোন করবে বা আসবে?

আমার মন বলছে সে আসবে... চোখ তুলে সীমন্তিনীর দিকে একপলক তাকালেন বিজয় মিত্রঃ কারণ আপনার স্ত্রী সুন্দরী। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সেনগুপ্ত–

রেপিস্টদের সাইকোলজি যা একটু-আধটু ঘেঁটে দেখেছি তাতে বুঝেছি ওদের মধ্যে মাঝে-মাঝে লোভ মাথাচাড়া দেয় সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গ পাওয়ার লোভ। কেউ-কেউ আবার হঠাৎ-হঠাৎ ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। পলাশ সান্যাল কী টাইপের জানি না, তবে সে যদি যোগাযোগ করে তা হলে আমি মোটেই অবাক হব না।

চিরকুটটা তো ওর কাছে আর নেই। ফোন নাম্বারটা ওর কি মনে থাকবে? আমতা আমতা করে শান্তনু প্রশ্ন করল। ওর মুখের রং কিছুতেই ফিরে আসছে না।

থাকতেও পারে। হয়তো আগেই অন্য কোথাও টুকে রেখেছে।

যদি পলাশদা আবার ফোন করে বা হঠাৎ চলে আসে তা হলে কী করব? সীমন্তিনী ভয়ের গলায় জিগ্যেস করল।

দুটো ফোন নাম্বার আপনাদের দিচ্ছি। পলাশ সান্যাল এলে তাকে যে-কোনও ছলছুতোয় আটকে রাখবেন। আর এক ফাঁকে এই দুটো নাম্বারের একটায় আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। আমাকে না পেলে ফোনে আপনাদের নাম বলে মেসেজটা দিয়ে দেবেন–বলবেন ইমারজেন্সি– তা হলেই ওরা আমাকে মোবাইল নাম্বারে কনট্যাক্ট করে নেবে।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তাতে ফোন নম্বরগুলো লিখলেন বিজয় মিত্র। তারপর কার্ডটা শান্তনুর হাতে দিলেন।

কার্ডটা নিতে গিয়ে শান্তনুর হাতটা সামান্য কেঁপে গেল। পলাশকে ও একজন ভয়ঙ্কর রেপিস্ট ও নৃশংস খুনি হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করল।

বিজয় মিত্র ও অমল রায় উঠে দাঁড়ালেন।

সকলেরই মুখ থমথমে–যেন এইমাত্র কোনও শোকসভা শেষ হল।

দরজার কাছে পৌঁছে সীমন্তিনীর ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকালেন বিজয় মিত্র। স্মিত হেসে বললেন, ভয় পাবেন না, মিসেস সেনগুপ্ত–আমরা তো আছি। তবে পলাশ সান্যালকে ধরাটা খুব ভাইটাল নইলে আরও বহু মেয়ের সর্বনাশ হবে। কারণ, লোকটার কোনও বাছবিচার নেই। ওর প্রথম ভিকটিমের বয়েস ছিল মাত্র ষোলো ফুটফুটে এক কিশোরী...।

সীমন্তিনীর কানে হঠাৎই এক অলৌকিক সাইরেন বেজে উঠল। ওর মাথাটা কেমন চক্কর দিল। তারই মধ্যে আবছাভাবে বিজয় মিত্রের শেষ কথাটা শুনতে পেল ও।

আপনাদের ওপরে আমরা খুব ডিপেন্ড করছি কিন্তু।

.

আরও কুড়িদিন কেটে যাওয়ার পর, শান্তনু আর সীমন্তিনী যখন ভাবতে শুরু করেছে। পলাশ আর কখনও যোগাযোগ করবে না, ঠিক সেই সময়ে পলাশের ফোনটা এল।

রোজ সকাল নটার মধ্যে শান্তনু অফিসে বেরিয়ে যায়। তখন একঘণ্টা সময় হাতে পায় সীমন্তিনী। তারপর, দশটা বাজলেই, ও গুটেকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। রান্নার ঝামেলা সকালেই প্রায় মিটে যায়। যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু সীমা সেরে নেয় এগারোটার পর।

বসবার ঘরে বসে সীমা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে কুছ কুছ হোতা হ্যায় ছবির গান শুনছিল। বাসন্তী বাথরুমে কাপড় কাচছে কলের জল পড়ার আওয়াজ, কাপড় কাঁচার শব্দ, সবই শোনা যাচ্ছে এ-ঘর থেকে।

এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

টেপ রেকর্ডারের গানের কলি কানে আসছিল সীমার।

তুম পাস আয়ে
ইয়ু মুসকুরায়ে
তুমনে না জানে কেয়া
সপনে দিখায়ে...

ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। ও যার কথা ভাবছে নিশ্চয়ই সে এসেছে।

দরজা খুলতেই সীমা দেখল ওর অনুমান সত্যি। দ্বৈপায়ন দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওর মাথার আঁকড়া চুল এলোমেলো। ফরসা সজীব মুখে সরল হাসি। পরনে কউল জাতীয় কাপড়ের চেক-চেক টি-শার্ট আর নীল রঙের জিন্স। পায়ে রোলার স্কেস লাগানো। ওর শরীর চাবুকের মতো টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন যে-কোনও লড়াইয়ের জন্য তৈরি।

এসো, ভেতরে এসো—। দ্বৈপায়নকে ভেতরে ডাকল সীমন্তিনী। ওর বুকের ভেতরে উলটোপালটা কীসব হচ্ছিল যেন।

দ্বৈপায়ন চাকা গড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই সীমা দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর টেপটা অফ করে দিয়ে মজা করে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার, পায়ে চাকা লাগানো কেন?

দ্বৈপায়ন টেপের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুনগুন করল, কুছ কুছ হোতা হ্যায়। তারপর সীমার প্রশ্নের জবাবে বলল, বহুদিন চেষ্টার পর স্কেসে একটা নতুন কায়দা রপ্ত করেছি—সেটা তোমাকে দেখাতে এলাম।

কী কায়দা?

আমি নাম দিয়েছি ল্যাটো বনবন। এই দ্যাখো।

কথা শেষ হতে-না-হতেই দ্বৈপায়ন চাকা গড়িয়ে ডাইনিং স্পেস, করিডর আর বসবার ঘরে ঘুরতে লাগল। এইভাবে পথ চলে গতি বেশ খানিকটা বাড়তেই ও সীমার কাছাকাছি এসে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। দ্বৈপায়নের শরীরটা অনেকটা ব্যালে নাচিয়ের মতো বনবন করে ঘুরতে শুরু করল।

বেশ কয়েক পাক ঘোরার পর দ্বৈপায়ন কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সীমা কোনও কিছু না ভেবেই ওকে ধরে ফেলল।

দ্বৈপায়ন পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল, আর খুব কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছিল সীমন্তিনীর নিটোল মুখ। ওর হাত দ্বৈপায়নের বাহু আঁকড়ে ধরেছে। টানা-টানা চোখে স্পর্শকাতর আকুতি।

দ্বৈপায়ন নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, থ্যাংক য়ু, বউদি। দেখছি ল্যাটো বনবন টা এখনও আমার ভালো করে রপ্ত হয়নি।

সীমার ফরসা মুখে লালচে আভা। এক অদ্ভুত চোখে ও দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছিল। আগুনের হলকা টের পাচ্ছিল কানে–যেন রাবণের চিতা জ্বলছে।

সীমা নীচু গলায় বলল, তোমার জন্যে একটু মিষ্টি আনাই।

দ্বৈপায়ন বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সীমা বাসন্তী! বাসন্তী! বলে ডেকে উঠল। তারপর দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, মিষ্টিটা হচ্ছে তোমার ওই ল্যাটো বনবন এর প্রাইজ।

কাপড় কাচা ছেড়ে বাসন্তী হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। সীমন্তিনীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল মিষ্টি নিয়ে আসতে।

মিষ্টির দোকান অনেক দূরে। দ্বৈপায়ন জানে, বাসন্তীর মিষ্টি নিয়ে ফিরতে অন্তত কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগবে। ওর কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল।

বাসন্তী চলে যেতেই সীমা দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে দাঁড়াল দ্বৈপায়নের মুখোমুখি। সরাসরি তাকিয়ে রইল ওর চোখে।

দ্বৈপায়ন অস্বস্তি পাচ্ছিল। সীমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল বারবার।

সীমা জিগ্যেস করল, দিপু, তোমার কাছে আমার কোনও দাম নেই?

আছে। ঘাড় নেড়ে বলল দ্বৈপায়ন।

তা হলে আমাকে নাম ধরে ডাকো।

দ্বৈপায়ন মাথা নীচু করে রইল।

ডাকো। নইলে আমার দিব্যি।

ইতস্তত করে দ্বৈপায়ন নীচু গলায় বলল, সীমা।

ওরকম না। পুরো নাম। সীমা জেদের সুরে বলল।

সীমন্তিনী। আলতো করে বলল দ্বৈপায়ন।

দ্বৈপায়নের গালে আঙুল ছোঁয়াল সীমা। ওর দিকে মুখ তুলে বলল, দিপু, তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

দ্বৈপায়নের চোখ জ্বালা করছিল, বুকের ভেতরে ষাঁড়ের লড়াই চলছিল, গলাটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল। ও কোনওরকমে অস্পষ্ট স্বরে বলল, হ্যাঁ, ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি, শান্তনুদাকে ভালোবাসি, গুটেকেও ভালোবাসি।

হাত সরিয়ে নিল সীমা। অভিমানের গলায় বলল, সবাইকে ভালোবাসার কথা বলছি না। আমি শুধু আমাকে ভালোবাসার কথা বলছি।

সেটা হয় না। নরম গলায় বলল দ্বৈপায়ন, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি–তবে সেটা একটু অন্যরকম ভালোবাসা। আমার কোনও লাভার নেই। কেউ-কেউ ইন্টারেস্ট দেখালেও আমার মনে ধরেনি। কিন্তু তোমাকে আমার ভীষণ পছন্দ। শান্তনুদার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। হয়তো তোমারটাও।

সীমন্তিনী কেঁদে ফেলল, নির্লজ্জভাবে জাপটে ধরল দ্বৈপায়নকে। ওর বুকের আড়াল থেকে গোঙানির মতো দিপু! দিপু! করে ডেকে উঠছিল বারবার।

সীমার ভারে দ্বৈপায়নের রোলার স্কেসের চাকা সামান্য গড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা পা আড়াআড়িভাবে সামান্য ঘুরিয়ে দ্বৈপায়ন সেটা রুখে দিল। তারপর একটু সময় দিয়ে সীমাকে সোজা করে দাঁড় করাল। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, সীমা, ভালোবাসা অনেক বড় ঠিকই, তবে বিশ্বাস বোধহয় তার চেয়েও বড়।

সীমা সামনের একটা সোফায় মাথা নীচু করে বসে পড়ল, বিড়বিড় করে বলল, তুমি যে কী করেছ আমাকে! আমি কিছুতেই নরমাল হতে পারছি না। সবসময় তোমার কথা মনে পড়ে, তোমাকে চোখের সামনে দেখতে পাই। কান্না চাপার চেষ্টা করল সীমা, তারপর ভেজা চোখ তুলে দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে বলল, দিপু, তুমি এত ভালো কেন? আমার কষ্ট তুমি বুঝতে পারো না?

দ্বৈপায়ন সীমায় কাছে সরে এসে বলল, বুঝতে পারি। পারি বলেই আমার কষ্টটাও তোমাকে বোঝাতে চাই।

কলিং বেল বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল সীমা। দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল দ্বৈপায়ন।

বাসন্তী মিষ্টি নিয়ে ফিরে এসেছে।

মিষ্টির বাক্সটা বাসন্তীর হাত থেকে নিয়ে দ্বৈপায়ন বাক্স খুলল। তারপর প্রাইজ খেয়ে নিলাম বলে একটা সন্দেশ টপ করে মুখে পুরে দিল।

বাক্সটা সীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়ানো গলায় ও বলল, এই নাও, বাকি প্রাইজগুলো গুটের জন্যে।

বাসন্তী দ্বৈপায়নের কাণ্ড দেখে মিটিমিটি হাসছিল। সীমা একটা সন্দেশ বাসন্তীকে দিয়ে বলল, এটা খেয়ে নে।

সন্দেশটা নিয়ে সীমাকে বলে বাসন্তী বাথরুমের দিকে চলে গেল।

আর ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

সীমা উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

হ্যালো।

পলাশ সান্যাল বলছি। ও-প্রান্ত থেকে পলাশের হাসিখুশি স্বর শোনা গেল।

চোখের পলকে সীমার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। এতদিন ধরে ও আর শান্তনু প্রতিটি মুহূর্তে পলাশের ফোনের জন্য অপেক্ষা করেছে। শান্তনু রোজ অফিসে গিয়ে সকাল-বিকেল বাড়িতে ফোন করেছে। জানতে চেয়েছে, পলাশের ফোন এসেছে কি না। ওই দুই অফিসারের কাছে পলাশের ব্যাপারে সবকিছু শোনার পর শান্তনু এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, ও কিছুদিন অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সীমা সেটা হতে দেয়নি। বহু তর্ক বিতর্কের পর ও শান্তনুকে অফিস যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে পেরেছিল। ও বলেছিল, দ্বৈপায়ন যখন আছে তখন শান্তনুর অফিস কামাই করার দরকার নেই।

দ্বৈপায়নের বাবার ইলেকট্রনিক্সের বিশাল ব্যাবসা। ধর্মতলায় ওদের অফিস। দ্বৈপায়ন বি.এসসি পাশ করার পর বাবার সঙ্গে খানিকটা সময় ব্যাবসা দেখাশোনা করে, আর বাকি সময়টা নিজের মতো করে কাটায়। গত পনেরো বছর ধরে ও রোলার স্কেস পাগল। আর বছরচারেক হল কাছাকাছি এক বন্ধুর বাড়ির গ্যারেজে একটা জিমনাশিয়াম খুলেছে। সেখানে ইজি-ক্রাঞ্চ, ফ্লেক্সিবার, স্লিম ডিস্ক, টামি ট্রিমার, সুপার হাইট ইত্যাদি নানান ব্যায়ামের যন্ত্র রয়েছে। দ্বৈপায়ন সারাটা দিনই প্রায় রোলার স্কেট আর জিম নিয়ে মেতে থাকে। নেহাত বাবাকে শান্ত রাখতে ও ব্যবসার পিছনে কিছুটা সময় দেয়। এ ছাড়া ওর চলাফেরার সঙ্গী হল একটা মোটরবাইক। হয় মোটরবাইক নয় রোলার স্কেস চড়ে দ্বৈপায়ন সবসময় ঘুরে বেড়ায়। শান্তনু ওকে ঠাট্টা করে বলে, তোমার তো সবসময় হয় দু-চাকা নয় আট চাকা। ভগবান ভদ্রলোকের উচিত ছিল একেবারে গোড়া থেকেই পায়ে চাকা লাগিয়ে তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানো।

বাজপাখির তাড়া খাওয়া চড়ুইয়ের মতো উদভ্রান্ত চোখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল সীমা। ওই তো উৎকণ্ঠা-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিপু। শান্তনু এই মুহূর্তে পাশে নেই তো কী হয়েছে! দিপু তো আছে!

কিন্তু পলাশের কথা আবার শুরু হতেই সীমন্তিনীর সব ভরসা যেন উবে গেল।

কী ব্যাপার, চুপ করে গেলে যে! চিনতে পারছ না নাকি! আমি পলাশ-তোমার বোকা বোকা হাজব্যান্ড শান্তনুর ক্লাসফ্রেন্ড।

সীমা সংবিৎ ফিরে পেল। দ্বৈপায়নের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। চিনতে পারব না কেন! উঃ, কতদিন পর আপনি ফোন করলেন। কিন্তু…কিন্তু ও তো এখন নেই… অফিসে গেছে…।

আজ কাজের দিন, অফিসে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। ভরাট গলায় হাসল পলাশ ও সেইজন্যেই তো ওর সুন্দরী বউকে একা পেয়ে ফোন করছি। কেমন আছ তুমি, সীমন্তিনী?

শান্তনুকে দেখাশোনা করে বিয়ের আগে সীমায় কোনও প্রেমিক ছিল না। তবুও ওর মনে হল, পলাশের প্রশ্নের ধরনটা যেন প্রাক্তন প্রেমিকের মতো।

ও অস্বস্তি-ভরা সুরে কোনওরকমে জবাব দিল, ভালো আছি। আপনি?

টেলিফোনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পলাশ ও আমি ভালো নেই। আমার মাথায় একটা পিকিউলিয়ার ব্যথা হয়…সেটা কদিন ধরে খুব উৎপাত করছে।

দ্বৈপায়ন সীমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। টেলিফোনের রিসিভারের কাছে কান পেতে ও-প্রান্তের কথা শুনতে চেষ্টা করল।

সীমা তখন টেলিফোন নম্বর লেখা চিরকুটটার কথা ভাবছিল। ওটা তো পলাশ হারিয়ে ফেলেছে! তা হলে এখন ফোন করল কেমন করে? নম্বরটা কি ও মুখস্থ করে নিয়েছিল? নাকি অন্য কোথাও টুকে রেখেছিল?

এইসব ভাবতে-ভাবতেই সীমন্তিনীর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কথাটা।

আমাদের ফোন নাম্বারটা আপনার মনে ছিল?

কেন? একথা বলছ কেন? পলাশ অবাক হয়ে জানতে চাইল।

চিরকুটটা তো আপনি হারিয়ে ফেলেছেন–। কথাটা মুখ দিয়ে বেরোনোমাত্রই সীমায় বুকের ভেতরে আচমকা যেন বাজ পড়ল।

ও-প্রান্তে পলাশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আরও অবাক হয়ে সন্দেহের গলায় জিগ্যেস করল, ওটা হারিয়ে গেছে তুমি জানলে কেমন করে?

শীতের মধ্যেও সীমায় কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠল। ওর বুকের ভেতরে বরফের মতো ঠান্ডা জটিল জলস্রোত ঘুরপাক খেতে লাগল। ও অসহায়ভাবে দ্বৈপায়নের দিকে

তাকাল। দ্বৈপায়ন

ওকে তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়ার জন্য ইশারা করল।

সীমা কোনওরকমে বলল, ক্যালেন্ডারের পাতা ছেঁড়া ওইটুকুন এটা চিরকুট…আমি… আমি জানতাম ওটা হারিয়ে যাবে। তাই…ইয়ে..আন্দাজে বললাম। কেন, সত্যি-সত্যি হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর পলাশ জবাব দিল, হু…তুমি ঠিকই ধরেছ। ওটা হারিয়ে ফেলেছি। তবে কোথায় যে হারালাম…কে জানে!

দ্বৈপায়ন সীমার বাহুতে হাত রাখল। টের পেল সীমা ভয়ে কাঁপছে। ও সীমাকে ছুঁয়ে থেকে ভরসা দিতে চাইল। ওর কানের খুব কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, ওঁকে বাড়িতে আসতে বলো। মনে নেই সেদিন অমল রায় কী বলে গেলেন! কুইক…।

সীমা কোনওরকমে হেসে বলল, প্রথমদিন আলাপ করেই বুঝেছিলাম আপনি খুব ভুললামনের মানুষ। সেই যে চলে গেলেন আর কোনও পাত্তাই নেই! কবে আসছেন বলুন। আপনাকে খাওয়ানোটা তো এখনও বাকি থেকে গেল সাহেবরা যাকে বলে ডিনার।

ও-প্রান্তে হেসে উঠল পলাশ। সীমার মনে হল, ও যেন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

পলাশ বলল, তোমাদের ওখানে যাব তো নিশ্চয়ই…তবে আজ নয়। কোনও চিন্তা নেই তোমার–ফোন করে যাব।

সীমা হঠাৎই ছোট মেয়ের মতো বায়নার সুরে বলল, না, না, ওরকম বললে হবে না। আজকেই কথা দিতে হবে কবে আসছেন।

সীমা দিনক্ষণটা জানতে চাইছিল। সেটা জানতে পারলে পুলিশের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করতে সুবিধে হবে। উৎকণ্ঠার মধ্যেও দ্বৈপায়নের আশ্বাস ওর ভালো লাগছিল।

পলাশ হেসে বলল, তোমাকে কথা দিচ্ছি যাব, তবে কবে কখন যাব এক্ষুনি হুট করে বলতে পারছি না। মাথার ব্যথাটা বড্ড ট্রাবল দিচ্ছে। যাকগে, শান্তনুকে বোলো আমি ফোন করেছিলাম। হঠাৎই ফোন রেখে দিল পলাশ।

বিমূঢ় ভয়ার্ত চোখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল সীমন্তিনী।

দ্বৈপায়ন তখন পলাশ সান্যালের চেহারাটা সামনে দেখতে পাচ্ছিল। পুলিশ অফিসারদের কাছে পলাশের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল শান্তনু। তখন থেকেই ওর একটা ছবি তৈরি হয়েছে দ্বৈপায়নের মনে। সেই টাকমাথা ভারী চেহারার লোকটাকে ওর ভয়ঙ্কর এক শত্রু বলে মনে হচ্ছিল।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দ্বৈপায়নের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সীমা জিগ্যেস করল, কী করব এখন?

খুব সিম্পল। শান্তনুদাকে অফিসে ফোন করে খবরটা জানাও। তারপর লালবাজারে ফোন করে বিজয় মিত্রকে জানাও। দরকার হলে ওঁরা তোমাদের ফোন ট্যাপ করবেন। বুঝতেই পারছ, পলাশ সান্যাল ইজ আ ভেরি ডেঞ্জারাস ম্যান।

সীমা তাড়াতাড়ি ফোন নম্বরগুলো খুঁজে বের করল। দ্বৈপায়ন ওর হয়ে ডায়াল করে দিল। শান্তনু খবরটা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সীমা ওকে ভরসা দিল। বলল, দ্বৈপায়ন আছে, ভয়ের কিছু নেই। ও এখন স্কুল থেকে মিমোকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে।

লালবাজারে ফোন করে বিজয় মিত্রকে পাওয়া গেল। তিনি শান্তস্বরে জানালেন, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওঁরা পুলিশের আর্টিস্ট দিয়ে পলাশ সান্যালের একটা ছবি আঁকিয়ে রাখছেন। সেটা শান্তনুদের দিয়ে চেক করিয়ে ফাইনাল করবেন। তারপর সেরকম পরিস্থিতি

দেখা দিলে টিভিতে ছবিটা প্রচার করে পলাশ সান্যালের খোঁজ করবেন। শুধুমাত্র সন্দেহ বা অনুমানের ওপরে নির্ভর করে এক্ষুনি টিভি ব্রডকাস্টে যাওয়া ঠিক হবে না।

আর টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যাপারে বিজয় মিত্র বললেন, পলাশ সান্যাল তো রেগুলার আপনাকে ফোন করছে না। রেগুলার আপনাদের ফোন করা শুরু করলেই আমাদের জানাবেন– তখন লাইন ট্যাপিং-এর ব্যবস্থা করব। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজয় মিত্র ও ট্যাপ করেও তেমন একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। দেখব হয়তো পাবলিক ফোন কি এস.টি.ডি. বুথ থেকে ফোন করছে। ও.কে., মিসেস সেনগুপ্ত, রাখছি।

ফোন রেখেই হাতঘড়ির দিকে তাকাল সীমা। তাকিয়েই আঁতকে উঠল। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। ছুটির সময় ওর যেতে দেরি হলে মিমো ভীষণ ঝামেলা করে।

বাসন্তীকে বলে দ্বৈপায়নের সঙ্গেই ও ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এল। ছোট্ট করে দ্বৈপায়নকে জিগ্যেস করল, তুমি সঙ্গে যাবে নাকি?

দ্বৈপায়ন রোলার স্কেটসটা পা থেকে খুলতে খুলতে বলল, যেতে ইচ্ছে করছে, তবে উপায় নেই। সাড়ে দশটায় ড্যাডির সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। না গেলে ড্যাডি খুব খেপে যাবে। সন্ধের পর বরং আসব।

সীমা সিঁড়ি নামতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে দ্বৈপায়ন বলল, আর-একবার নাম ধরে ডাকব?

সীমা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও চকিতে চোখ বুলিয়ে সিঁড়ির ওপর। নীচটা দেখল। কেউ নেই। তখন ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

দ্বৈপায়ন জিগ্যেস করল, পুরো নাম?

সীমা হেসে ঘাড় কাত করল।

সীমন্তিনী–। আলতো করে ডাকল দিপু। তারপরই ওদের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল ঠকঠক করে।

দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে কিশোরী হয়ে হাসল সীমা। তারপর যেন হাওয়ায় ভেসে সিঁড়ি নামতে শুরু করল। দ্বৈপায়নের আলতো ডাকটা ওকে রেশমের শাড়ির মতো সর্বক্ষণ জড়িয়ে রইল। মিমোর স্কুলে পৌঁছনো পর্যন্ত সেই ডাকটা ও শুনতে পাচ্ছিল।

.

একদিন সন্ধ্যায় শান্তনুদের ফ্ল্যাটে পলাশ সান্যাল এসে হাজির হল আগাম কোনও খবর দিয়েই।

পলাশ শেষ যেদিন ফোন করেছিল তারপর সাত-সাতটা দিন সহজ-সরলভাবে কেটে গেছে। শান্তনুরা আবার ভাবতে শুরু করেছিল পলাশ আর কোনওদিনই ওদের বাড়িতে আসবে না। সীমন্তিনী এও ভাবতে শুরু করেছিল, পলাশ হয়তো সত্যি-সত্যিই অপরাধী নয়–পুলিশ মিছিমিছি ওকে সন্দেহ করছে।

ঠিক এরকমই একটা নিশ্চিন্ত অবস্থার মাঝে পলাশ এসে হাজির হল। এবং প্রমাণ করে দিল, বিজয় মিত্র বা অমল রায়ের ধারণায় কোনও ভুল ছিল না।

সীমন্তিনী সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। অথচ তার আগে ও, শান্তনু আর দ্বৈপায়ন মিলে কত পরিকল্পনাই না করেছে।

পলাশ এলে কীভাবে ওরা বিজয় মিত্রকে খবর দেবে। শান্তনু যদি বাড়ি না থাকে তা হলে সীমা কী করে ওকে বোঝাবে যে, পলাশ ওদের ফ্ল্যাটে আছে। পলাশ এলে দ্বৈপায়নকেও খবরটা জানানো দরকার–ওকে কীভাবে জানানো হবে। মিমোকে একমাসের জন্য ছোটমাসির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কি না। এইরকম নানান জল্পনা কল্পনায় শান্তনুদের দিন কেটেছে। কিন্তু কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরই ওদের সব ভাবনা থিতিয়ে গেছে। পলাশ

সান্যালকে মনে হয়েছে। অন্য কোনও গ্রহের মানুষ। আর অমল রায় ও বিজয় মিত্র যেন শান্তনুদের নয়, অন্য কারও ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।

পলাশ যেদিন এল সেদিনটা ছিল শনিবার। অন্য আর-পাঁচটা দিনের মতোই দিনটা শুরু হয়েছিল।

গুটের সেদিন স্কুল ছুটি ছিল। কিন্তু সোমবারে ক্লাস টেস্ট আছে বলে ওকে দ্বৈপায়নের সঙ্গে ভোরবেলা সীমা বেরোতে দেয়নি। তা ছাড়া আগের দিন বাংলা আর অঙ্ক পরীক্ষা ভালো হয়নি বলে সীমার মেজাজটাও খারাপ ছিল।

দ্বৈপায়ন জিমে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় একবার হাতঘড়ি দেখল। সওয়া দশটা বাজে। সীমাদের ফ্ল্যাট থেকে গুটের হুল্লোড়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কী ভেবে দ্বৈপায়ন সীমাদের ফ্ল্যাটে নক করল।

একটু পরেই সীমার গলা শোনা গেল : কে?

মজা করার জন্য দ্বৈপায়ন গলার স্বর সামান্য বদলে নিয়ে বলল, আমি...পলাশ...।

সঙ্গে-সঙ্গেই ও খেয়াল করল, দরজার ওপাশে ম্যাজিক আই-এ চোখ রেখেছে সীমা। তারপরই দরজা খুলে এরকম সাঙ্ঘাতিক ঠাট্টা করার কোনও মানে হয়! এসো– বলে দ্বৈপায়নকে ঘরে ডেকেছে।

ঘুরে ঢুকেই দ্বৈপায়ন গুটেকে দেখতে পেল।

একটা টেবিলক্লথ পিঠের দিকে ঝুলিয়ে গলায় বেঁধে নিয়েছে। কোমরে একটা বেলট। বুকের কাছে ঝুলছে শক্তিমান-এর একটা পোস্টার। হাতে লম্বা একটা স্কেল।

এই অদ্ভুত সাজসজ্জাসমেত বাচ্চাটা চেয়ার থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে সোফায়, সোফা থেকে মেঝেতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। আর একইসঙ্গে আমি শক্তিমান! আমি

শক্তিমান! বলে চেঁচাচ্ছে।

মিমো, তোমাকে তখন থেকে কিন্তু বলছি এবার থামো। ওসব জঞ্জাল রেখে পড়তে বোসো।

দ্বৈপায়ন বুঝল সীমা ছেলের ওপর বেশ রেগে গেছে। ওকে ঠান্ডা করার জন্য দ্বৈপায়ন হেসে বলল, খেলছে একটু খেলুক না–।

তার মানে! ভ্রূকুটি করে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল সীমা : তুমি জানো, আগের দুটো টেস্টে বেঙ্গলি আর ম্যাথুস-এ ও কী করেছে!

দ্বৈপায়ন দু-হাত নেড়ে হেসে বলল, কী আর করবে! বড়জোর একটু কম নম্বর পেয়েছে, এই তো!

সে হলে তো হতই! অঙ্ক পরীক্ষায় দিয়েছিল A-র মালিক আয় বারোশো টাকা, B-র মাসিক আয় তেইশশো টাকা..এইসব দিয়ে একটা সোজা অঙ্ক দিয়েছিল। তো তোমার গুটে সে-অঙ্ক ছেড়ে দিয়েছে। জিগ্যেস করলাম, এই সোজা অঙ্কটা করলি না কেন। তাতে ও কী জবাব দিল জানো? বলল, ইংরেজি অঙ্ক আমি শিখেছি নাকি! ওই যে, ক-খ-গ-র বদলে A-B-C দিয়েছে!

দ্বৈপায়ন তো গুটের কীর্তি শুনে হেসেই অস্থির।

সীমা গুটেকে আবার ধমকে উঠল, মিমো, ওসব রেখে শিগগির পড়তে বোস কিন্তু! নইলে আমি কিন্তু…।

আঃ, বউদি কী হচ্ছে! সীমাকে থামাল দ্বৈপায়ন। তারপর গুটেকে কাছে ডাকল ও অ্যাই, এদিকে আয়–।

গুটে শক্তিমান! বলে এক তীব্র হাঁক ছেড়ে লাফ দিয়ে দ্বৈপায়নের কাছে এসে হাজির হল। ওকে দেখে মনেই হল না, মায়ের কথাগুলো ওর বিন্দুমাত্রও কানে ঢুকেছে। সীমা রেগে গিয়ে ওর কান মুলে দিল।

গুটে অসন্তুষ্ট হয়ে সীমার দিকে তাকাল, গজগজ করে বলল, সবসময় খালি আমাকে মারবে।

ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। দ্বৈপায়নের সামনে কান মুলে দেওয়ায় ব্যাপারটা ওর যথেষ্ট প্রেস্টিজে লেগেছে।

সীমা রাগি চোখে ছেলের দিকে একবার তাকাল। তারপর দ্বৈপায়নকে বলল, এবারে ওর বাংলা পরীক্ষার কীর্তি শোনো।

এ কথা বলামাত্রই গুটে সীমাকে একেবারে জাপটে ধরল। ওই অবস্থায় প্রায় লাফাতে লাফাতে বলল, না, না–দিপুদাকে কিছুতেই বলবে না। কিছুতেই না। আমি রোজ মন দিয়ে পড়ব।

কিন্তু সীমাও তখন বেশ রেগে গেছে। ও গুটেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, শোনো, বাংলায় ও কী করেছে। কোয়েশ্চেন দিয়েছিল, তোমার যে সবচেয়ে প্রিয় তার সম্পর্কে দশ লাইন লেখো। তাতে ও কী লিখে এসেছে জানো! লিখেছে : আমার সবচেয়ে প্রিয় গরু…, তারপর গরু রচনা থেকে দশ লাইন মুখস্থ লিখে দিয়েছে–ওটা তৈরি ছিল, তাই।

দ্বৈপায়ন হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল। আর গুটে দিপুদাকে বললে কেন? দিপুদাকে বললে কেন? বলতে-বলতে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মায়ের কাছে গিয়ে ছোট্ট হাতে বারকয়েক কিল মারার চেষ্টা করল। তারপর একছুটে চলে গেল শোওয়ার ঘরের দিকে।

দ্বৈপায়ন ওকে অনেকবার ডাকল, কিন্তু ও শুনল না।

গুটের কাণ্ড শুনে দ্বৈপায়ন অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর সীমাকে বলল, বউদি, গুটেকে মারধোর কোরো না, বুঝিয়ে বলো, ঠিক বুঝবে।

আর বুঝেছে! শক্তিমানের ছবিটা ওর প্রাণ। দিন-রাত ওটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ওপর তোমার রোলার স্কেটস তো আছেই।

গুটেকে দ্বৈপায়ন খুব ভালোবাসে। প্রথম পরিচয়ের পর বাচ্চা ছেলেটা ওকে কাকু বলে ডাকত। দ্বৈপায়ন তখন ওকে বারণ করেছিল। বলেছিল দিপুদা বলে ডাকতে। কাকু ডাকটা ওর কেমন যেন কানে লাগত। দ্বৈপায়নের বউদি ডাকটাও কি সীমন্তিনীর কানে লাগে?

দ্বৈপায়ন ওদের তিনজনের কথাই ভাবছিল। মাত্র ছমাসের মধ্যেই কী অদ্ভুতভাবে ও ওদের আপনজন হয়ে উঠেছে। তেমনি ওরাও। ওদের গায়ে কোনও আঁচড় পড়লে দ্বৈপায়ন সেই জ্বালা টের পায়। ওদের সংসারে মেঘ ঘনিয়ে এলে দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরে বৃষ্টি হয়। এ কোন অলৌকিক সম্পর্ক কে জানে!

ঠিক আছে, রোলার স্কেটস কদিন না হয় বন্ধ রাখব। সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল ও ও দেখি, গুটেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পড়তে বসাই। বাচ্চাদের সবসময় এরকম মারধোর করলে হয়!

দ্বৈপায়ন ভেতরের দিকে রওনা হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। সীমা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরল। পলাশের ভয় এ কদিনে থিতিয়ে এলেও রিসিভার তোলার সময় সীমার হাত কেঁপে গেল।

হ্যালো।

মিসেস সেনগুপ্ত বলছেন? ও-প্রান্ত থেকে ভারী গলায় কেউ বলল।

হ্যাঁ..আপনি?

বিজয় মিত্র, লালবাজার।

সীমার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ও আগ্রহ নিয়ে জিগ্যেস করল, বলুন, কোনও খবর আছে?

সীমা ভাবছিল, পলাশ সান্যাল হয়তো এর মধ্যেই পুলিশে ধরা পড়ে গেছে।

ও-প্রান্তে বিজয় মিত্র হাসলেনঃ এদিকে নতুন কোনও খবর নেই। তাই আপনার কাছে খবর চাইছি।

সীমা কেমন স্তিমিত হয়ে গেলঃ নাঃ, এর মধ্যে আর ফোন করেনি।

দ্বৈপায়ন গুটেকে নিয়ে কখন যেন বসবার ঘরে চলে এসেছে। বাচ্চাটা শক্তিমানের ধড়াচূড়া সব ছেড়ে এলেও কার্ডবোর্ডে সাঁটা ছবিটা এখনও গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

মিসেস সেনগুপ্ত, পলাশ সান্যালের স্কেচটা কাল সন্ধেবেলা আপনাদের দেখাতে নিয়ে যাব। আর্টিস্টও সঙ্গে যাবে। আপনারা থাকবেন কিন্তু।

থাকব। ছোট্ট করে বলল সীমা।

আমার দেওয়া ফোন নাম্বার দুটো মনে আছে তো?

সীমা জানাল, হ্যাঁ, আছে।

কোনওরকম ইমারজেন্সি হলেই আমাকে রিং করবেন। বিজয় মিত্র ফোন রেখে দিলেন।

সীমা রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল। ওর চিন্তা পলাশ সান্যালকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করল।

দ্বৈপায়ন জিগ্যেস করল, কে ফোন করেছিল, বউদি?

সীমা অন্যমনস্কভাবে বলল, সেই পুলিশ অফিসার—বিজয় মিত্র।

কী ব্যাপার বলো তো? কী ভাবছ?

সীমা অসহায়ভাবে বলল, পলাশ সান্যাল যদি কখনও হঠাৎ করে চলে আসে তখন তুমি যদি কাছে না থাকে, তা হলে তোমাকে জানাব কেমন করে? তোমার দাদা যা ছাপোষা মানুষ! ওরকম ডেঞ্জারাস একজন মার্ডারারের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

কে মার্ডারার, মা? গুটে কৌতূহলে জানতে চাইল।

সীমা ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, চুপ কর। সব ব্যাপারে ফোড়ন কাটা চাই!

আহা, ওকে বকছ কেন! বলে দ্বৈপায়ন গুটের মাথার ছোট-ছোট চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, এসব বড়দের ব্যাপার, তুই বুঝবি না। তারপর সীমার দিকে ফিরে ও বউদি, তোমাকে তো আগেও বলেছি, আমাকে ঘরে নয় অফিসে একটা ফোন করে দেবে। আর আমি তো মাঝেমধ্যে ফোন করে তোমাদের খবর নিই। এত ভয় পেলে কখনও চলে! তুমি বরং বিজয়বাবুর দেওয়া ফোন নাম্বার দুটো আমাকে দাও—আমি লিখে নিই।

সীমা তাড়াতাড়ি ফোন নম্বর দুটো খুঁজে বের করে একটা চিরকুটে টুকে দ্বৈপায়নকে দিল।

ওটা পকেটে রেখে দ্বৈপায়ন বলল, শান্তনুদার সঙ্গে স্কুলের আর কোনও বন্ধুর কোনও কনট্যাক্ট নেই?

সীমা বলল, সুজিত আর পার্থ নামে দুজনের সঙ্গে আছে। ওদের অনেকদিন আগেই ও জিগ্যেস করেছিল। পলাশ সান্যাল নামটাই ওরা মনে করতে পারছে না।

দ্বৈপায়ন ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তুমি ভয় পেয়ো না। কেউ দরজায় নক করলে বা বেল টিপলে আগে ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে নেবে। তবে পলাশ সান্যাল এলে তাকে যেন আবার দরজা থেকে বিদেয় করে দিয়ো না। লোকটা

অ্যারেস্ট হওয়া দরকার। নয়তো আরও অনেকের সর্বনাশ করবে। তোমাকে একটিই রিকোয়েস্ট, কিছুতেই যেন নার্ভ ফেল কোরো না।

চলে যাওয়ার আগে দ্বৈপায়ন গুটের মাথায় একটা চাটি মেরে গেল। আর সীমাকে বলে গেল, তোমার ভয় কীসের, বউদি! আমি তো আছি।

এর ঠিক আট ঘণ্টা পরে, সন্ধে সাতটা নাগাদ, পলাশ সান্যাল যখন এল তখন দ্বৈপায়নের শেষ কথাগুলো সীমন্তিনীর সবচেয়ে আগে মনে পড়ল।

.

ম্যাজিক আই দিয়ে আগন্তুকের পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। শুধু শক্ত চোয়াল, গলা, আর কাঁধের খানিকটা অংশ চোখে পড়ছে। তামাটে গলায় দুটো কালো ভাঁজ, দু-চারটে কাঁচা পাকা দাড়ির খোঁচা, সাদা-নীল স্ট্রাইপ দেওয়া কলার, আর হালকা সবুজ সোয়েটার।

দরজা খুলে দেওয়ার মুহূর্তেও সীমন্তিনী ভাবতে পারেনি অতিথি পলাশ সান্যাল হতে পারে। সেই কারণেই দরজা খুলে ভিনগ্রহের মানুষটাকে দেখে ও চমকে উঠল। ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল পলকে।

পলাশ অবাক হলেও হেসে বলল, কী ব্যাপার! তুমি যে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলে!

ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ইন্দ্রিয়ের কবলে পড়ে সীমা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিল। ও অসহায়ভাবে দেখল, পলাশ সান্যাল হাসিমুখে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে এল, তারপর দরজা ঠেলে বন্ধ করে দিল। ক্লিক করে নাইটল্যাচ বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ হল।

শান্তনু বসবার ঘরের সোফায় গা এলিয়ে রঙিন টিভির দিকে চোখ মেলে বসেছিল। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

পলাশকে দেখামাত্রই সিগারেটটা হাত থেকে পড়ে যেতে চাইছিল। ও কোনওরকমে দুর্ঘটনাটা সামলে নিল। একইসঙ্গে সীমন্তিনীর মুখের চেহারা ওকে ভয় পাইয়ে দিল। ও সহজ গলায় পলাশকে অভ্যর্থনা জানাতে চেষ্টা করল? কী ব্যাপার! সেই যে হুট করে একদিন এলি...তারপর তো একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলি। রোজই আমি বাড়ি ফিরে ওকে জিগ্যেস করি পলাশ ফোন করেছিল কি না–।

ওর কাছাকাছি একটা সোফায় পলাশকে বসতে ইশারা করল শান্তনু।

পলাশ ছোট্ট একটা শব্দ করে এগিয়ে এল সোফার কাছে। ওর চঞ্চল চোখ চারপাশটা চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছিল। সীমা আর শান্তনুকেও একপলক দেখে নিল ও।

সীমা ওর চোখে সন্দেহের দৃষ্টি খুঁজতে চাইল। গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, বসুন। চা খাবেন তো?

পলাশ অবাক হয়ে সীমার দিকে তাকাল : শুধু চা! আমি তো ভাবছিলাম, সাহেবরা যাকে বলে ডিনার একেবারে তা-ই খেয়ে যাব। কথার শেষে ও হো-হো করে হেসে উঠল।

সে তো খাবেনই। হেসে বলল সীমা, ডিনার না খাইয়ে আপনাকে আজ ছাড়ছি না। পলাশকে যে-করে-হোক আটকে রাখতেই হবে।

পলাশ বসতেই শান্তনু ওকে সিগারেট অফার করল। সম্পূর্ণ নতুন চোখে ওর স্কুলের বন্ধুকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। খুঁজে পেতে চাইল একজন ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীকে।

টেবিলে রাখা লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল পলাশ। তারপর লাইটার রেখে সিগারেট ধরা ঠোঁটে জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, কেমন আছিস বল।

শান্তনুর বুকের ভেতরে এলোপাতাড়ি ঢাক বাজাচ্ছিল কেউ। বরাবর অঙ্কে ওর মাথা ভালো। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওর সব অঙ্ক কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। পলাশের

চওড়া কাঁধ আর হাতের পেশির দিকে তাকিয়ে ও স্পষ্ট বুঝল, সমান-সমান লড়াইয়ে পলাশকে কাবু করা ওর কর্ম নয়। দ্বৈপায়ন কাছে থাকলেও বা কিছু একটা ভাবা যেত। ও ডাকাবুকো ছেলে, শক্তি সামথ্যও কম নয়। কিন্তু একা-একা…।

শান্তনু সময় পেলেই গল্প-উপন্যাস পড়ে, কেব্ল টিভি-তে সিনেমাও দ্যাখে। সেখানে অবিশ্বাস্য কত কিছু ঘটে যায়। মিমোর শক্তিমান হলেও এতক্ষণে বহু কিছু করে ফেলত। হয়তো পলাশকে শূন্যে তুলে ঘুরপাক খাইয়ে ছুঁড়ে দিত মহাকাশে। ডাই হার্ড ছবির ব্রুস উইলিস কেমন একা লড়াই করে হারিয়ে দিল এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী দলকে। ফার্স্ট ব্লাড ছবিতে সিলভেস্টার স্ট্যালোনও কি কম কিছু করেছিল। কিংবা, আরনল্ড সোয়াজেনেগার, স্টিভেন সিগাল, জাঁ ক্লদ ভ্যান ড্যাম–ওরাও তো কত লড়াই করে সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক সব ভিলেনদের সঙ্গে! সানি দেওল, সঞ্জয় দত, মিঠুন চক্রবর্তী…একের পর এক নাম মনে পড়ছিল। লোকে বলে বুদ্ধির জোর বেশি। কিন্তু শুধু বুদ্ধির জোরে কি কিছু করা যায়! গায়ের জোরও দরকার।

তখনই সীমার দিকে চোখ পড়ল ওর। আর মনে হল, নাঃ, মনের জোর থাকাটাও এখন বেশ জরুরি।

সীমা চোখে-চোখে কী একটা ইশারা করতে চাইল শান্তনুকে। তারপর চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

সীমা কি বিজয় মিত্রকে ফোন করার জন্য ইশারা করল? কথাটা ভাবতে গিয়েই শান্তনুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ফোন নম্বর দুটো ও মুখস্থ করে রেখেছিল। কিন্তু এখন কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। কেমন যেন সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ফোন করতে গেলেই পলাশ নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। ও যদি বাথরুমে যায় সেই ফাঁকে ফোনটা করে ফেলা যায়। কিন্তু হঠাৎ ও বাথরুমেই বা যাবে কেন? আচ্ছা, ওকে জিগ্যেস করলে কেমন হয়!

তুই কি বাথরুমে যাবি? এলোপাতাড়ি ভাবতে-ভাবতে এই হাস্যকর প্রশ্নটা শান্তনুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

পলাশ চোখ ছোট করে শান্তনুর দিকে তাকালঃ তার মানে! জিগ্যেস করলাম, কেমন আছিস। তার উত্তর হল, তুই কি বাথরুমে যাবি? একটু থামল পলাশ। তারপর ও কী ব্যাপার বল তো? তুই কি অন্য কিছু ভাবছিস?

বেসামাল পরিস্থিতিটা সামলে নেওয়ার জন্য শান্তনু হাতের সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিল। একবার টিভির দিকে দেখল, একবার পলাশের দিকে। সীমন্তিনী চা নিয়ে এসে পড়লে বাঁচা যেত। ও কী যে করছে এতক্ষণ!

জোর করে হাসার চেষ্টা করল শান্তনু। কয়েকবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, আজকাল আমার এইরকম হয়েছে। আনমনাভাবে উলটোপালটা সব কথা বলে ফেলছি। যাকগে, তোর কী খবর বল। চাকরি-বাকরি কেমন চলছে?

চাকরি! তোকে তো কখনও বলিনি যে, আমি চাকরি করি।হেসে বলল পলাশ। তারপর বেশ সিরিয়াস ঢঙে মন্তব্য করল, আমি কারও চাকর নই। আমি স্বাধীন।

শান্তনু উত্তরে কী বলবে ভাবছিল, ঠিক তখনই সীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। পলাশের সামনে টেবিলে কাপ-প্লেট সাজিয়ে দিতে দিতে শান্তনুকে লক্ষ করে বলল, তোমার চা করিনি। তোমাকে একটু বাজারে যেতে হবে। তারপর ফিরে এসে চা খাবে। পলাশের দিকে তাকিয়ে সীমা বলল, পলাশদা, আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না। আপনি গেস্ট আপনার জন্যে স্পেশাল কিছু রাঁধতে না পারলে আমার মন মানবে না। দশমিনিটেই ও ঘুরে চলে আসবে–আপনি ততক্ষণ টিভি দেখুন।

শান্তনু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ও সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই সীমা ওকে ভেতরে ডাকল।

সীমার বুকের ভেতরে যাচ্ছেতাই ব্যাপার চলছিল। ও কোনওরকমে শান্তনুকে রান্নাঘরের কাছে ডেকে নিয়ে এল। বাজারের থলে আর টাকা ওর হাতে দিতে দিতে চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, বাইরে বেরিয়েই দিপুকে একটা খবর দেবে। তারপর বিজয় মিত্রের দেওয়া নাম্বারে ফোন করে সব বলবে। বলবে, ভীষণ বিপদ।

শান্তনু যখন বলল, ফোন নম্বর দুটো ওর মনে নেই, তখন সীমা বলল যে, নম্বর দুটো দিপু জানে।

শান্তনু ঘোর লাগা মানুষের মতো আলগা পায়ে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে হাঁটা দিল। সীমা আর মিমোকে একটা ভয়ঙ্কর খুনির সঙ্গে রেখে যেতে ওর বুক দুরদুর করছিল।

বাসন্তী রান্নাঘরে একমনে মশলা বাটছিল। আর মিমো শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বই খাতা ছড়িয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল। সীমা শান্তনুকে রওনা করে দিয়েই শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল মিমো নেই। বই-খাতা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রেখে কোন ফাঁকে উঠে পড়েছে।

সীমা তাড়াতাড়ি পা ফেলে বাথরুমের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল মিমো সেখানে নেই। তা হলে নিশ্চয়ই ও বসবার ঘরে পলাশের কাছে গেছে! সীমার বুকের ভেতরে ঢেঁকির পাড় পড়ল যেন। ও মিমো! মিমো! করে ডাকতে-ডাকতে প্রায় ছুটে এল বসবার ঘরে।

বাড়িতে যে কোনও অতিথি এসেছে সেটা মিমো পড়তে-পড়তেই টের পেয়েছিল। তাই পড়ার ব্যাপারটা মোটামুটি শেষ হতেই ও চুপিসারে চলে এসেছে বসবার ঘরে।

টিভিতে তখন খবর পড়া হচ্ছিল। চা-সিগারেট খেতে-খেতে পলাশ একমনে টিভি দেখছিল। গলায় শক্তিমানের ছবি ঝোলানো বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়েই পলাশ আদর করে ওকে কাছে ডেকেছে : কী খবর, অচ্যুতবাবু, কেমন আছ?

শান্তনু তখন পলাশকে আসছি বলে ফ্ল্যাটের ল্যাচে হাত রেখেছে। সুতরাং মিমো যখন কথা বলল তখন শান্তনু আর সীমা দুজনেই পলাশের কাছ থেকে মাত্র হাত পাঁচ-ছয় দূরে

দাঁড়িয়ে। ওরা তিনজনে যেন একটা বিষমবাহু ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু তৈরি করেছে।

ওদের তিনজনকেই স্তম্ভিত করে দিয়ে মিমো পলাশকে জিগ্যেস করল, পলাশকাকু তুমি মা-মার্ডারার? সেদিন মা দিপুদাকে বলছিল...।

মিমোর কথায় জগৎ-সংসার পলকে স্থবির হয়ে গেল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, কোনও চেতনা নেই। শুধু তিনটে রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ পরস্পরকে বিমূঢ় চোখে দেখছে।

শান্তনুর কণ্ঠা ওঠা-নামা করছিল বারবার। যেন সাঁতার না-জানা কোনও ডুবন্ত মানুষ অসহায়ভাবে খাবি খাচ্ছে। ওর রোগা চেহারার যেটুকু বা বুদ্ধিদীপ্ত ভাব ছিল এখন সেটা সম্পূর্ণ উবে গেছে। ও বড়-বড় চোখে পলাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর চোখের কোণ দিয়ে টের পাচ্ছিল সীমন্তিনীর দুর্দশা। এই মুহূর্তে কে বলবে ও সুন্দরী! কপালে ভাঁজ, চোখে-মুখে ভয়, বুক পাথর। যেন কোনও আগ্নেয়গিরির প্রলয় শুরু হওয়ার জন্য একরাশ আতঙ্ক ও উষ্কণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

পলাশের স্নায়ুতন্ত্রীর প্রশংসা করতেই হয়। ও সিগারেট নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে রেখে দিল। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর মিমোর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে শান্তনুকে লক্ষ করে ঠান্ডা গলায় বলল, তোরা তা হলে সবই জেনে গেছিস!

শান্তনু শুকনো ঢোঁক গিলে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর কেমন একটা জড়ানো স্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ...পুলিশ সব জানে...।

পলাশ ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর আপনমনেই বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, আমি যে এখানে সাতটার সময়ে আসব তা তো তোরা জানতিস না! তা হলে পুলিশ এখনও খবর পায়নি যে, আমি এখানে আছি...।

সীমা অনেক চেষ্টা করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপনার বাঁচার আর কোনও পথ নেই, পলাশদা...। পুলিশের লোকজন সাদা-পোশাকে আমাদের ফ্ল্যাটের ওপরে নজর রাখছিল।

তারা আপনাকে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লালবাজারে খবর চলে গেছে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সীমা : আপনার আর কোনও আশা নেই...।

মিথ্যে কথাগুলো সত্যির মতো শোনাল তো! গলার স্বর খুব বেশি কেঁপে যায়নি তো! ভাবল সীমা।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ...। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল পলাশ। ওর মোটা-মোটা গাঁটওয়ালা আঙুলগুলো মিমোর মাথায়, গালে, গলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সীমার বুকের ভেতরে উথালপাথাল চলছিল, একটা ভয়ংকর কান্না গলা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। পলাশ মিমোকে ছুঁয়ে আছে দেখেই ওর ভীষণ ভয় করছিল। অমল রায়, বিজয় মিত্র, ওঁদের সন্দেহের প্রতিটি কণা তা হলে সত্যি!

মিমো, আমার কাছে আয়– ছেলেকে ডাকল সীমন্তিনী। আর একইসঙ্গে পা বাড়াল ছেলের দিকে, পলাশের দিকে।

সরল, নিষ্পাপ, দুরন্ত ছেলেটা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা ভোঁতা হয়ে গেছে পলকে। ওর মুখে কোনও কথা সরছে না। শুধু অবাক হয়ে বাবার ছোটবেলার বন্ধুকে দেখছে।

মায়ের ডাকে মিমো সাড় ফিরে পেল যেন। ও কচি গলায় ডেকে উঠল, মা!

ওর ডাকে খানিকটা কান্না মিশে গেল।

পলাশের চঞ্চল চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ও মনে-মনে কিছু একটা হিসেব কষছে।

সীমন্তিনী ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ও এক ঝটকায় মিমোকে ঠেলে দিল একটা সোফায় দিকে। মিমো সোফায় ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সীমন্তিনী একটা চাপা চিৎকার করে উঠতেই পলাশ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। কখন যেন ও ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়েছিল। এখন সেটা বাইরে বেরিয়ে আসতেই ছোট মাপের একটা ধারালো চাকু ঝলসে উঠল ওর হাতে।

অদ্ভুত তৎপরতায় পলাশের ভারী শরীর পৌঁছে গেল মিমোর কাছে। সামান্য ঝুঁকে পড়ে এক হ্যাঁচকায় বাচ্চাটাকে টেনে তুলল। ছোট বাঁকানো ফলার ছুরিটা ওর কানের পিছনে চেপে ধরে শান্তনুকে লক্ষ করে চাপা হিংস্র গলায় বলল, দরজায় ছিটকিনি-খিল সব এঁটে দে! এক্ষুনি!

শান্তনু আতঙ্কের চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কাঁপা হাতে কোনওরকমে ও পলাশের হুকুম তামিল করল।

এখানে আমার কাছে এসে বোস। শান্তনুকে আবার আদেশ করল পলাশ।

নিশি-পাওয়া মানুষের মতো শান্তনু পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল পলাশের কাছে। একটা সোফার বসে পড়ল।

মিমো কাঁদছিল। কিন্তু শান্তনু যেন অচেনা কোনও মানুষের মতো ছেলেকে দেখছিল। ওর মনে হচ্ছিল, এগুলো ওর জীবনের ঘটনা নয়। ও ভ্যান ড্যাম অথবা ব্রুস উইলিসের কোনও অ্যাকশন ছবি দেখছে। ওসব সিনেমায় যা হয়, বাস্তবে তা হতে পারে বলে শান্তনুর মন কখনও বিশ্বাস করেনি।

মিমোকে কাঁদতে দেখে সীমন্তিনী নিজেকে আর শক্ত করে ধরে রাখতে পারেনি। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। জল ভরা চোখেই ও দেখছিল, মিমোর বুকে শক্তিমানের ছবিটা নিছকই ছবি হয়ে ঝুলছে।

মিমোকে ছেড়ে দিন, পলাশদা! কান্না-ভাঙা কাতর গলায় পলাশের কাছে যেন ভিক্ষে চাইল সীমা। ওর মন দ্বৈপায়নকে ডাকতে লাগল আকুল হয়ে।

পলাশ দাঁত বের করে হাসল। ওর দাঁতের জোড়গুলোয় কালচে ছোপ চোখে পড়ল। হাত নেড়ে ইশারা করে সীমাকে কাছে ডাকল পলাশ, তুমিও লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখানটায় চলে এসো। শান্তনুর কাছে চুপটি করে বসে পড়ো।

সীমা প্রায় ছুটে এসে বসে পড়ল শান্তনুর পাশে। এমন সময় টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

শান্তনু নিশ্চল হয়ে বসেছিল। ওর বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। ও পলাশের নজর এড়িয়ে সীমাকে ছোট্ট করে ঠেলা দিল। অর্থাৎ, জলদি টেলিফোনটা ধরো।

কিন্তু টেলিফোন ওঁদের কাউকেই ধরতে হল না। কারণ, মিমোকে সঙ্গে নিয়ে পলাশ টেলিফোনের কাছে গেল। রিসিভার তুলে নিয়ে হ্যালো বলল।

মিস্টার সেনগুপ্ত আছেন? ও-প্রান্তে কেউ একজন জিগ্যেস করল।

পলাশ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল, রং নাম্বার।

তারপর মন্তব্য করল, টেলিফোন যন্ত্রটাই বড় বিরক্তিকর। এবং টেলিফোনের তারটা দেওয়ালের জাংশান বক্স থেকে একটানে ছিঁড়ে দিল।

সীমন্তিনীর মনে আশার যে-সরু সুতোটা দোলাচলে দুলছিল সেটাও যেন কেউ একটানে ছিঁড়ে নিল।

বাসন্তী যে কখন ড্রইং স্পেসের সামনে করিডরে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা কেউই টের পায়নি। টেলিফোনের তারটা ছিঁড়ে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পলাশ ওকে দেখতে পেল। ওর দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে হিংস্রভাবে পলাশ বলল, ভেতরে গিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ কর। চেঁচামেচি করলে প্রথমে মিমোর গলা কাটব, তারপর তোর। হাত তুলে বাঁকানো ফলার ছুরিটা দেখাল পলাশ।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বাসন্তী প্রায় ছুটে চলে গেল ভেতরের দিকে। মিমো চোখে হাত ঘষে কাঁদছিল। পলাশ ওর কাছে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর বলছি!

মিমো চমকে উঠে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

পলাশ নিজের কপালের দু-পাশটা বাঁ-হাতে জোরে টিপে ধরল। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। তারপর ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠল, আ-আঃ!

একইসঙ্গে বাঁ-হাতে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল মিমোর গালেঃ চুপ কর বলছি! চিৎকার করে পাগল করে দেবে দেখছি।

ওইটুকু বাচ্চার গালে কেউ যে অমনভাবে চড় কষাতে পারে এটা শান্তনু বা সীমন্তিনী কল্পনাও করতে পারেনি। ওরা দুজনেই ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। মিমো আরও জোরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু এরপরই পলাশ যা করল তাতে ওইটুকু বাচ্চাও চুপ করে যেতে বাধ্য হল।

মিমোর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল পলাশ। ছুরি ধরা ডান হাতটা ওর গলার নলির কাছে নাচাতে নাচাতে চিবিয়ে চিবিয়ে হাসল, তারপর বলল, একটানে নলিটা দু-ফাঁক করে তোর কান্না থামিয়ে দেব, অ্যাঁ! পাগলের মতো হেসে উঠল পলাশ ও তখন তোর সব কান্না গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে মুখ দিয়ে আর বেরোবে না। দেখবি? কী রে, দেখবি, আঁ?

শান্তনু আর সীমন্তিনী ভয়ঙ্কর একটা খুন-পাগল মানুষকে দেখতে পেল যেন। সীমন্তিনী আর সইতে পারল না। সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে ছুটে গেল ছেলের কাছে। আর ঠিক তখনই পলাশ মিমোকে এক ধাক্কায় মায়ের দিকে ঠেলে দিল, বলল, ছেলেকে যে-করে-হোক চুপ করাও।

মিমো চুপ করে গিয়েছিল তার আগেই। ওর মুখ ভয়ে নীল। সীমা ছেলেকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। কোণঠাসা ইঁদুর যেভাবে হন্যে হয়ে পালাবার পথ

খুঁজে বেড়ায় সেইভাবে বাঁচার একটা পথ খুঁজে বেড়াতে লাগল সীমা। মিমোকে টেনে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

পলাশ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বড়-বড় শ্বাস ফেলছে।

হঠাৎই মিমোর গলায় ঝোলানো শক্তিমানের ছবিটার দিকে নজর গেল সীমার। ছবিটা যে ওর ছেলের প্রাণ সে-কথা দ্বৈপায়ন ভালো করেই জানে। যদি...।

সীমা আর সময় নষ্ট করল না।

আবার তুমি এই ছবিটা গলায় ঝুলিয়েছ! শান্তনু আর পলাশকে রীতিমতো অবাক করে দিয়ে বেচারি মিমোকে ধমক দিল সীমা। শক্তিমানের ছবিটা ধরে এক টান মারল ও।

সুতো ছিঁড়ে ছবিটা চলে এল সীমার হাতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও সেটা ছুঁড়ে দিল খোলা জানলা লক্ষ করে। গজগজ করে মন্তব্য করল, হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও তুমি ওইসব আজেবাজে ছবি গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে! লেখাপড়া ছেড়ে যত্তসব বাজে কাজ!

সীমার আচমকা এই আচরণে পলাশ ও শান্তনু দুজনেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। পলাশ চোখ ছোট করে তাকাল সীমার দিকে। যেন সীমার আচরণের সারমর্মটুকু ও নিখুঁতভাবে মেপে নিতে চায়। কিন্তু রহস্যের কোনও উত্তর খুঁজে পেল না পলাশ। ও টের পেল না যে, সীমা তখন আকুলভাবে প্রার্থনা করছে, দ্বৈপায়ন যেন যে-কোনওভাবে রাস্তায় অবহেলায় পড়ে থাকা শক্তিমানের ছবিটা দেখতে পায়। ঠাকুর, দিপু যেন ছবিটা দেখতে পায়!

পলাশ জানলার কাছে গিয়ে দেওয়ালের আড়াল থেকে খুব সাবধানে উঁকি মারল নীচের রাস্তায়। সত্যিই কি সাদা-পোশাকের গোয়েন্দারা ওত পেতে আছে অন্ধকারে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে! এই ফ্ল্যাটে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? সীমার কথা কতটুকু সত্যি?

জানলা থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নজর চালিয়েও কাউকে দেখতে পেল না পলাশ।

তখন ও ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগিয়ে এল সীমা আর মিমোর কাছে। অদ্ভুতভাবে হেসে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

সীমাসুন্দরী, পুলিশকে ঠিক কতটুকু বলেছ? কী কী জানতে চেয়েছে পুলিশ? কবে এসেছিল ওরা?

সাপ যদি কথা বলতে পারত তা হলে বোধহয় এই সুরেই কথা বলত।

একটা ভয়ঙ্কর মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখছিল সীমন্তিনী। এই লোকটার হাতে ধর্ষিত হয়ে খুন হওয়ার সময় মেয়েগুলোর জঘন্য আতঙ্ক ও স্পষ্ট টের পেল। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। মিমো উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে দিল মায়ের কোলে।

শান্তনু এবার সীমার জন্য ভয় পেল। স্থবির অবস্থা কাটিয়ে ও মুখ খুলল, তোকে... তোকে দেওয়া...টেলিফোন নাম্বার লেখা চিরকুটটা নিয়ে..পুলিশ আমাদের কাছে এসেছিল...।

পলাশ আনমনা হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, তা হলে বাইপাসের ওই মেয়েটার কাছে কোথাও চিরকুটটা আমি হারিয়েছি...। শান্তনুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে ও জিগ্যেস করল, তারপর?

একে-একে সব বলে গেল ওরা। কখনও শান্তনু, কখনও সীমন্তিনী। ইতস্তত করে, হোঁচট খেয়ে ওরা অমল রায় আর বিজয় মিত্রের সব কথা বলে গেল। সীমা ইচ্ছে করেই দ্বৈপায়নের কথা বলেনি। সীমার কথার ধরন দেখেই শান্তনু ইশারাটা বুঝে নিয়েছিল। তাই ও-ও দ্বৈপায়নের কথা এড়িয়ে গেল।

কিন্তু তাতে পুরোপুরি পাশ কাটানো গেল না। ওদের কথা শেষ হতেই পলাশ সীমাকে লক্ষ করে প্রশ্ন করল, দিপুদা কে? তোমার ছেলে বলছিল...।

আমার পিসতুতো দিদির ছেলে। বালিগঞ্জে থাকে। নির্বিকারভাবে উত্তর দিল সীমা।

পলাশ এবার আপনমনে হেসে উঠল। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। টিভি তে কোনও একটা বিজ্ঞাপনের চড়া মিউজিক বাজছিল। বিরক্ত হয়ে সেদিকে তাকাল পলাশ। বাঁ-হাতে কপাল টিপে ধরল। তারপর ছুরিটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান হাতে টেবিল থেকে একটা কাপ তুলে নিল। সবাইকে চমকে দিয়ে চাপা গলায় খিস্তি করে টিভি-র পরদা টিপ করে কাপটা গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল।

বিচিত্র শব্দ করে টিভি-র পরদা চুরমার হয়ে গেল। আগুনের ফুলকি দেখা গেল। ধোঁয়া বেরোল টিভি-র ভেতর থেকে। কাপটা নিরীহ বেড়ালছানার মতো অটুট অবস্থায় টিভির খোলের ভেতরে বসে রইল।

পলাশ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, এটা লা পলাশ কাপের বিজ্ঞাপন। তারপর রেডিয়োর বিজ্ঞাপনের মতো সুর করে উচ্চারণ করল, টুং-টুং।

ওদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল পলাশ। হাতে হাত ঘষে শান্তনুকে বলল, এবার আমার কথা বলি, শোন। তুই তো জানিস, স্কুলে আমি ভীষণ কম কম নম্বর পেতাম। মাস্টারগুলো এত বজ্জাত ছিল যে, কিছুতেই আমাকে নম্বর দিতে চাইত না। স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি একদিন রাতে ঢিল ছুঁড়ে নগেনবাবুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।

শান্তনুর নগেনবাবুকে মনে পড়ল। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা। ওদের অঙ্কের স্যার ছিলেন। খুব কড়া ধাতের নীতিবাগীশ শিক্ষক ছিলেন। কোনও ছাত্রকেই অন্যায্য নম্বর দিতেন না।

পলাশ চায়ের টেবিলটাকে ঘিরে অলসভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলতে লাগল, আসলে ব্যাপারটা কী জানিস, কেউ কখনও আমাকে ভালো চোখে দ্যাখেনি। যেমন ধর, তোরা। ছোটবেলা থেকেই আমার কপাল পোড়া। বাবা দিনরাত্তির আমাকে হুকুম করত। আর সেসব কাজ করতে গিয়ে পান থেকে চুন খসলেই আমাকে ধরে বেধড়ক ঠ্যাঙাত। মা চেঁচাত বটে, কিন্তু বাবা মাকে একেবারেই পাত্তা দিত না। সবসময় আমাকে চাকর-বাকরের মতো ট্রিট করত। বলত, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। তোকে কেউ কোনওদিনই পাত্তা দেবে না...।

সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে হাসল পলাশ, গুনগুন করে আবৃত্তি করলঃ

ছন্নছাড়া ছিন্ন-ছেঁড়া গাছ পাথরের জীবন–
এই জীবনের পোশাকী নাম মরণ, শুধু মরণ।

তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে তেতো হাসি হেসে হতাশার একটা শব্দ করল : হাঃ! সেই কোন ছোটবেলা থেকে নিজের লাশটা কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ আমাকে আমল দেয় না...অথচ আমি আমল পেতে চাই।

জানিস, শান্তনু, কলেজেও সেই একই কেস হল। কো-এড কলেজে ভরতি হয়েছিলাম। ভেতরে-ভেতরে মেয়েদের জন্যে দারুণ একটা লোভ ছিল। আজেবাজে স্বপ্ন দেখতাম, রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে যা-তা ভাবতাম, যা খুশি করতাম। কিন্তু দিনের আলোয় সাহস করে মেয়েবন্ধুদের কিছু বলতে পারতাম না। বহুদিন ধরে মনে-মনে রিহার্সাল দেওয়ার পর রুমকি আর লোপামুদ্রাকে মনের গোপন ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। ওরা অবাক হয়ে হি-হি করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, পলাশ, তুই না মাইরি একটা ভোদাই-কিতকিত! তোর বোধহয় মাথা ফাথার ঠিক নেই। হি-হি হি-হি...। চকিতে ঝুঁকে পড়ে টেবিলে জোরালো একটা চাপড় কষাল পলাশ ও ব্যস, সব গল্প শেষ। লোপামুদ্রা আর রুমকি অনেকের সঙ্গেই ইয়ে করত, অথচ শুধু আমার বেলায় বাদ!

ধীরে-ধীরে আমি নিজেকে বদলাতে শুরু করলাম। বুঝলাম, অধিকার চাইলেই পাওয়া যায় না ছিনিয়ে নিতে হয়। তাই ভেতরে-ভেতরে তৈরি হতে লাগলাম। কিন্তু একইসঙ্গে আমার একটা অসুখ দেখা দিল। মাঝে-মাঝেই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। একটা অদ্ভুত দপদপানি। সেই সময়ে আমি কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ি, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। লাস্ট এক বছরে অসুখটা ডেঞ্জারাস চেহারা নিল। তারপর…এই মাস ছসাত আগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একটা মেয়েকে শাস্তি দিলাম…আমাকে পাত্তা না দেওয়ার শাস্তি। মেয়েটা খুব ছোট ছিল… কথা বলতে-বলতে সীমন্তিনীর কাছে এগিয়ে এল পলাশ। হঠাৎই ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, তোমার চেয়েও অনেক ছোট।

সীমা এক ঝটকায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

পলাশ বাঁকানো ছুরিটা সীমার চোয়ালের নীচে ঠেকাল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তবে মেয়েটার জিনিসপত্তর ছিল তোমার মতোই। ডান হাতে সীমার মুখটা একরকম জোর করেই নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল পলাশ ও তুমি যেন আবার ভুল করে আমাকে পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। শান্তনুর দিকে তাকিয়ে ও শান্তনু, তোর ওয়াইফকে সাবধান করে দে। বেচারি এখনও আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

সীমন্তিনীর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় অনুনয় করল শান্তনু।

পলাশ বলে চলল, ব্রিগেডের পর কসবা, তারপর বাইপাস, তারপর…।

সীমন্তিনীর চিবুকে আলতো করে টোকা মারল পলাশঃ তারপর কি সল্টলেক?

সীমার চিবুকে অসংখ্য মাকড়সা হেঁটে বেড়াতে লাগল। ও আবার দিপুর জন্য আকুল প্রার্থনা করল।

পলাশ দু-হাত ঝাঁকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে ও কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল টুং-টাং...।

পলাশ পলকে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

আর সীমন্তিনী এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল।

ওর এইরকম আচমকা উঠে দাঁড়ানোয় মিমো ধাক্কা খেয়ে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। শব্দ করে সামান্য কেঁদে উঠে মাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে চাইল।

ততক্ষণে কলিংবেল আবার বেজে উঠেছে : টুং-টাং।

কে এসেছে? পুলিশ? সন্ত্রস্তভাবে জানতে চাইল পলাশ। ওর গলার স্বর কেমন যেন ফাসফেঁসে চেরা-চেরা শোনাল।

শান্তনু জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল সীমন্তিনীর দিকে। সীমা তখন মরিয়া হয়ে ভাবছে, কে আসতে পারে এই অসময়ে? কে এই দেবদূত? পুলিশ? নাকি অন্য কেউ?

হয়তো বিজয় মিত্র অথবা অমল রায় ফোনে যোগাযোগ করতে চেয়ে পারেননি। তখন নিছকই সন্দেহের বশে চলে এসেছেন শান্তনুদের ফ্ল্যাটে। হয়তো...।

দরজা খোলার জন্য সামনে পা বাড়াল সীমা। সঙ্গে-সঙ্গে পলাশ ওকে চাপা গলায় ধমক দিল, দরজা খুলবে না!

সীমা বিরক্ত হয়ে তাকাল পলাশের দিকে। পলাশের মুখটা কোণঠাসা বাঘের মতো দেখাচ্ছে। এই শীতেও কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটেছে।

দরজা না খুললে সন্দেহ হবে। আপনার বিপদ আরও বাড়বে...। ঠান্ডা গলায় বলল সীমা। ও বেশ বুঝতে পারছিল পালটা ভয় না দেখালে পলাশের মতো পাগল খুনিকে

রোখা যাবে না। দরজায় যে-ই এসে থাকুক, তাকে পলাশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তা নইলে...।

আবার কলিং বেল বাজল।

সীমা সহজ পায়ে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগোতেই পলাশ একলাফে মিমোর কাছে চলে এল। জামার কলার ধরে এক হ্যাঁচকায় বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিল। ছুরিটা ডান হাতে নিয়ে ওর কানের পাশে চেপে ধরল। চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, যে-ই আসুক তাকে দরজা থেকে কাটিয়ে দাও। তা নইলে বাচ্চাটার গলা...।

সর্বনাশের কাছাকাছি

থাক! বারবার একই ভয় দেখিয়ে বীরত্ব দেখাতে হবে না! ঘেন্নার সুরে পলাশকে বাধা দিল সীমন্তিনী ও আগে দেখি দরজায় কে এসেছে। আমরা স্বাভাবিক ব্যবহার করলে কেউ সন্দেহ করবে না। আপনি যদি উলটোপালটা কিছু করেন তা হলে আমরা কেউই বাঁচব না।

পলাশ ঘাড় গোঁজ করে ভারী গলায় বলল, বি কেয়ারফুল! ভুলে যেয়ো না আমার হাতে কী আছে!

সীমা দরজা খুলে দিল।

এসো আমার দেবদূত! আমার প্রিয়তম দেবতা! আমার পুরুষোত্তম! তুমি এলে সূর্যোদয় হয়। তুমি বিদায় নিলে সূর্যাস্ত। দিনে তোমায় আলোর কিরণ দিয়ে আরাধনা করি, রাতে নিবেদন করি নক্ষত্রমালা। এসো হে প্রাণপুরুষ! এসো আমার অন্তরতম দীপাবলি!

দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন।

কিন্তু এ কোন দ্বৈপায়ন!

পেশাদারি সেল্‌সম্যানের মতো ওর সাজপোশাক। হাতে বড়-বড় কয়েকটা পলিথিনের প্যাকেট। মুখে পাউডার, গলায় টাই, গা থেকে ভুরভুর করে পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

সীমাকে দেখামাত্রই চোখ টিপল দ্বৈপায়ন। তারপর অচেনা সেজে সেল্‌সম্যানের মিষ্টি মোলায়েম ঢঙে বলল, মিস্টার শান্তনু সেনগুপ্ত আছেন? আমি ফ্যানট্যাসটিক কোম্পানি থেকে আসছি। আপনারা আজ একটু রাত করে আসতে বলেছিলেন। আপনারা যে-দুটো ইন্সট্রুমেন্ট চেয়েছিলেন সে-দুটো দেখানোর জন্যে নিয়ে এসেছি।

রোবটের মতো যান্ত্রিক ঢঙে গড়গড় করে কথা বলে যাচ্ছিল দ্বৈপায়ন। আর একইসঙ্গে দ্রুত নজর বুলিয়ে ঘরের পরিস্থিতি জরিপ করে নিচ্ছিল।

যা বোঝার ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। পলাশ সান্যালকে চিনে নিতে ওর কোনও কষ্ট হল না। লোকটা গুটেকে প্রায় খামচে নিজের কাছে ধরে রেখেছে। গুটের চোখ ভেজা। ভেজা চোখে অবাক হয়ে ওর দিপুদাকে দেখছে।

সীমা ইতস্তত করে বলল, আমাদের একজন গেস্ট রয়েছেন—তাই একটু অসুবিধে আছে। পরে কখনও যদি আসেন…।

আপনি নিশ্চয়ই মিসেস সেনগুপ্ত? একগাল হেসে ঘরে ঢুকে পড়ল দ্বৈপায়ন। এমন সহজ ভঙ্গিতে কনুই দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল যেন এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ। তারপর ও গেস্ট থাকায় আপনাদের সুবিধেই হবে, ম্যাডাম। আপনারা ওঁর ওপিনিয়ানটাও নিতে পারবেন। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না—মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট। এই দেখুন…।

পলিথিনের বড়-বড় প্যাকেট খুলে দুটো জিনিস বের করল দ্বৈপায়ন।

একটা জোনেক্স কোম্পানির রোলার স্কেস-এর বাক্স। আর একটা লম্বাটে আয়তাকার বাক্স যার ওপরে লাল রঙে বড়-বড় হরফে ইংরেজিতে লেখা ফ্লেক্সিবার।

প্রথম বাক্স খুলে একজোড়া রোলার স্কেটস বের করে নিল ও। আর দ্বিতীয় বাক্স খুলে টেনে বের করে নিল লম্বা লাঠির মতো একটা জিনিস। লাঠির দু-প্রান্তে মোটরবাইকের হাতলের মতো ফাইবারের তৈরি দুটো হাতল। আর হাতল দুটোকে জুড়ে রেখেছে কালো রঙের মোটাসোটা একটা লম্বা স্প্রিং।

দ্বৈপায়ন যখন ওর দোকান সাজাচ্ছিল পলাশ তখন মিমোকে নিয়ে পা টিপে টিপে সরে যাচ্ছিল কাচ ভাঙা টিভি-টার কাছে। দ্বৈপায়ন যাতে টিভিটা দেখতে না পায় সেজন্য ওটাকে আড়াল করে দাঁড়াল পলাশ। মনে-মনে ভাবল, হতচ্ছাড়া সেল্সম্যানটা কতক্ষণে এ-ফ্ল্যাট থেকে বিদেয় হবে।

পলাশের চেষ্টা দেখে দ্বৈপায়ন মনে-মনে হাসল। টিভি-র করুণ অবস্থাটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর নজরে পড়েছে। কিন্তু কোনওদিকে না দেখার ভান করে দ্বৈপায়ন উবু হয়ে বসে রোলার স্কেটস জোড়া নিজের পায়ের মাপে অ্যাডজাস্ট করতে শুরু করল। তারপর পা ছড়িয়ে বসে ও-দুটো দু-পায়ে শক্ত করে বেঁধে নিল। এসব কাজ করতে করতে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল দ্বৈপায়ন।

...জোনেক্স কোম্পানির রোলার স্কেটস একেবারে চ্যাম্পিয়ান। এই মডেলটার দাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা, তবে আমরা এখন একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি—দুশো টাকা। মানে, এখন নিলে সাড়ে পাঁচশো পড়বে। এটা মিস্টার সেনগুপ্তও পরতে পারবেন...। বলে শান্তনু আর পলাশের দিকে ধন্দের চোখে তাকাল ও। যেন বুঝতে চাইছে, কে মিস্টার সেনগুপ্ত।

সীমার বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল। পলাশের শক্ত মুঠোয় ধরা ছুরিটার কথা ও ভোলেনি। দিপু তো ছুরিটার কথা জানে না! কী হবে এখন?

এইসব উথালপাথাল ভাবনার মধ্যেও দ্বৈপায়নের কথাগুলো ওর কানে ঢুকল। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ইনি হলেন শান্তনু সেনগুপ্তআমার হাজব্যান্ড। আর ইনি আমাদের গেস্ট–পলাশ সান্যাল। আর ও অচ্যুতকে দেখাল সীমা ও আমাদের ছেলে-অচ্যুত। রোলার স্কেটসটা আমরা ওর জন্যেই চেয়েছি।

দিপুদাকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখে গুটের মনটা নেচে উঠেছিল। কিন্তু কেমন একটা চাপা ভয় ওকে পাথর করে রেখেছিল। বারবার হেঁচকি মতন উঠছিল। মনে হচ্ছিল, ভেতর থেকে কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে।

এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল বাচ্চাটা। দ্বৈপায়ন শুধু ওর দিকেই নজর রাখছিল। শান্তনু আর সীমন্তিনী হয়তো ওর অভিনয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, কিন্তু গুটে? গুটে যদি হঠাৎ দিপুদা! বলে চেঁচিয়ে ওঠে তা হলেই সর্বনাশ! সেইজন্য বেশ ভয়ে ভয়ে বাচ্চাটাকে দেখছিল দ্বৈপায়ন। ও যদি হঠাৎ–।

গুটে কিছু একটা বলার জন্য সবে হাঁ করতেই দ্বৈপায়ন বিচ্ছিরিভাবে ওকে ধমকে উঠল, একদম চুপ! তারপর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওকে চুপ করে থাকতে ইশারা করল।

গুটে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেল। ওর চোখে জল চলে এল আবার।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য দ্বৈপায়ন মোলায়েম হেসে নরম গলায় বলল, রাগ কোরো না, অচ্যুত। ডিমনস্ট্রেশান দেওয়ার সময় কেউ কথা বললে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। সবকিছু মুখস্থ-টুখস্থ করে আমরা তো তৈরি হয়ে আসি, কেউ ডিসটার্ব করলে সেগুলো কেমন গুলিয়ে যেতে চায়। দাদা, বউদি আপনারা কিছু মাইন্ড করবেন না... প্লিজ! আমার বলা হয়ে যাক, তারপর আপনারা যত খুশি প্রশ্ন করবেন।

ফ্লেক্সিবারটা হাতে নিয়ে দ্বৈপায়ন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘরের মেঝেতে স্কেটস করে ও এপাশ-ওপাশ সামান্য ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই শান্তনু আর

পলাশকে লক্ষ করে ও যান্ত্রিকভাবে ওর যন্ত্রের গুণগান করতে শুরু করল।

..দেখুন, আমাদের কোম্পানি কখনও লো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট বিক্রি করে না। এই যে স্কেস দেখছেন, এর চেসিসগুলো স্টিলের তৈরি, আর চাকাগুলো ইমপোর্টেড। স্কেস-এর চাকাই হল আসল। চাকা একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর রিপ্লেস করা যায় না। তখন নতুন স্কেস কিনতে হয়–একজোড়া। কারণ, সিঙ্গল স্কেট পাওয়া যায় না সবসময় পেয়ারে সাপ্লাই আসে।

কথা বলতে বলতে চাকা গড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দ্বৈপায়ন। এইবার ও ফ্লেক্সিবারটা তুলে ধরল।

এটার নাম ফ্লেক্সিবার। এটাও আপনারা দারুণ সিলেক্ট করেছেন। এটা মুম্বইয়ের স্ম্যাশ কোম্পানির প্রোডাক্ট। আমরা মাত্র বছরখানেক এজেন্সি নিয়ে দুর্দান্ত রেসপন্স পেয়েছি। দু-পাশের এই হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে বারটাকে বেঁকাতে হয়…। দ্বৈপায়ন দু-পাশের হাতল ধরে আড়াই ফুট মতন লম্বা বারটাকে বেশ সহজেই বেঁকিয়ে ধরল এইভাবে বেঁকালে বাইসেপ আর ট্রাইসেপ তৈরি হয়। বারটা ছেড়ে দিলেই স্প্রিং-এর অ্যাকশনে ওটা আবার লাঠির মতন সোজা হয়ে যায়। এর বাক্সের ভেতরে ফ্লেক্সিবারের নানারকম ব্যায়ামের চার্ট আছে। ওটা একবার দেখে নিলেই আর কোনও প্রবলেম হবে না। আর হলে আমাদের কোম্পানি তো আছেই। নিন, হাতে নিয়ে একবার টেস্ট করে দেখুন।

ফ্লেক্সিবারের গুণপনার ব্যাখ্যা করতে করতে দ্বৈপায়ন পলাশের কাছে এসে পড়েছিল। পলাশ বেশ বিরক্ত হয়ে বেহায়া সেলসম্যানটাকে দেখছিল। মিমোকে জাপটে ধরে ভাঙা টিভি টার প্রায় গায়েই দাঁড়িয়ে ছিল ও। ভাবছিল, কতক্ষণে আপদ বিদেয় হবে।

কিন্তু দ্বৈপায়ন যে হঠাৎ ওকে আক্রমণ করবে সেটা পলাশ বুঝতে পারেনি।

ফ্লেক্সিবারটা ইউ অক্ষরের মতো কোনো অবস্থায় স্কেটস করে পলাশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল দ্বৈপায়ন। আচমকা ও বারের একটা দিক ছেড়ে দিল।

স্প্রিং-এর টেনশানে ছিটকে সোজা হয়ে গেল বারটা। ওটার ভারী শক্ত হাতল দ্বৈপায়নের হিসেব মতো পলাশের ডান গালে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

বিশ্রী শব্দ হল একটা। পলাশের গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। সংঘর্ষের ধাক্কায় টিভি র দিকে হেলে পড়ল পলাশ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বাস্টার্ড বলে দ্বৈপায়ন ডান পায়ে এক তীব্র লাথি কষাল পলাশের দু-পায়ের ফাঁকে। রোলার স্কেটের ইস্পাতের চেসিস পলাশের শরীরে বোধহয় কেটে বসল। কারণ, পলাশ এইবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। ও লাট খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ওর চশমা ছিটকে পড়ল দূরে।

সীমন্তিনী গলা ফাটিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল—যে-চিৎকারটা ও এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে করতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি।

শান্তনু যেন এক অলৌকিক মন্ত্রের জোরে ঘোর কাটিয়ে উঠল। ও মিমো! মিমো! করে আর্ত স্বরে ডেকে উঠল।

পলাশ মিমোকে আঁকড়ে ধরেছিল। তাই ওর শরীরটা বেটাল হয়ে মেঝেতে পড়ে যেতে বাচ্চাটাও একইসঙ্গে কাত হয়ে পড়ল ওর গায়ে।

পলাশ সেই অবস্থাতেই বাচ্চাটার চুলের মুঠি চেপে ধরল। আর মিমো গোঙানির মতো একটা চাপা চিৎকার করে কামড় বসিয়ে দিল পলাশের পেটে।

যন্ত্রণায় ঝাঁকিয়ে উঠল পলাশ। মিমোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। মিমো ছাড়া পেয়েই কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল মায়ের দিকে। সীমন্তিনী ওকে পাগলের মতো জাপটে ধরল। কাঁদতে কাঁদতেই ওর কপালে-গালে-মাথায় চুমু খেতে লাগল। আর বারবার বলতে লাগল, বাবুসোনা, তোর লাগেনি তো! বাবুসোনা, তোর লাগেনি তো!

দ্বৈপায়নের কাজ তখনও শেষ হয়নি। ও ফ্লেক্সিবারটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করতে লাগল। ধোপারা যেভাবে মুগুর পিটিয়ে কাপড় কাঁচে, ও ফ্লেক্সিবার দিয়ে পলাশকে সেভাবে কাচতে লাগল।

এত হইচই চেঁচামেচিতে বাসন্তী আবার ড্রইং স্পেসে চলে এসেছিল। মিমোর হাতে রক্ত দেখে ও কেঁদে ফেলল। শান্তনু মিমোর কাছে এসে ওর হাতটা পরীক্ষা করে বুঝল, মিমোর কিছু হয়নি। পলাশের রক্ত ওর গায়ে লেগেছে।

ওরা চারজন এক জায়গায় জড়ো হয়ে দ্বৈপায়নের কীর্তি দেখছিল। ওর ইস্পাতের মতো দেহটা নমনীয় হয়ে যেভাবে খুশি বেঁকে যাচ্ছিল, আর পলাশকে আড়ং ধোলাই দিচ্ছিল। কখনও ওর হাত চলছিল, কখনওবা পা। রোলার স্কেটস-এর এইরকম অমানুষিক অপব্যবহার কেউ কোনওদিন কল্পনাও করেনি।

পলাশের সারা শরীরে রক্ত। পোশাক-আশাক নানা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ওর অসাড় দেহটা একতাল কাদার মতো টিভি-র কাছে পড়ে আছে। কান্না ও যন্ত্রণা মেশানো একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসছে ওর মুখ থেকে। শুধু তাতেই বোঝা যাচ্ছে ও এখনও খতম হয়নি।

দ্বৈপায়ন বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল। সীমা আর মিমোকে যে গায়ে আঁচড় কাটে দ্বৈপায়নের হাতে তার নিস্তার নেই।

রাস্তায় মোটর বাইক রেখে বাড়িতে ঢোকার সময় ও শক্তিমানের ছবিটা দেখতে পায়। ও অবাক হয়ে ওটা হাতে তুলে নিয়েছিল। এটা রাস্তায় ফেলে দিল কে? চোখ তুলে সীমাদের ফ্ল্যাটের জানলার দিকে তাকিয়েছিল দ্বৈপায়ন। সীমা কি মিমোর ওপর চটে গেছে? না কি অন্য কোনও বিপদ দেখা দিয়েছে সেখানে? যে-ছবিটা গুটের প্রাণ সেটা কেন অবহেলায় রাস্তায় পড়ে আছে?

শক্তিমানের ছবিটা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল দ্বৈপায়ন। তারপর ফোন করেছিল শান্তনুদের ফ্ল্যাটে। ফোনের ঘন্টি বেজেই চলল, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। অথচ দ্বৈপায়ন স্পষ্ট দেখেছে, ওদের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে।

দ্বৈপায়নের সন্দেহটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। ওর মাথার ভেতরে ব্যাগাটেলির গুলি দৌড়তে শুরু করল। কী করা উচিত এখন?

কয়েকমিনিট ধরে নানান চিন্তা করার পর দ্বৈপায়ন লালবাজারে বিজয় মিত্রের দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করেছে। বিজয় মিত্রের নামে ইমারজেন্সি মেসেজ দিয়ে দিয়েছে আর-একজন অফিসারের কাছে। তারপর আবার ভাবতে বসেছে। শান্তনুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে কি ও নক করবে? নাকি আগেভাগেই শোরগোল তুলে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ফেলবে? কিন্তু তারপর যদি দ্যাখে যে, সেরকম কিছুই হয়নি!

এইরকমের বহু উলটোপালটা চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত দ্বৈপায়ন যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে।

সীমন্তিনী আর শান্তনুর চিৎকারে দ্বৈপায়নের ঘোর কাটল। সীমা ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরলঃ ঢের হয়েছে, দিপু! আর না। এবার থামো। লোকটা বোধহয় মরেই গেছে।

দ্বৈপায়ন থামল। ফ্লেক্সিবারে লাঠির মতো ভর দিয়ে ও হাপরের মতো হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিয়ে বলল, লালবাজারে ফোন করে দিয়েছি। ওরা এখুনি হয়তো এসে পড়বে। এই লোকটাকে এখানে আটকে রেখে তোমরা আমাদের ফ্ল্যাটে চলো–

সীমার সঙ্গে-সঙ্গে মিমোও চলে এসেছিল দ্বৈপায়নের কাছে। দ্বৈপায়ন ওকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল। এক হাতে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, গুটে, তোর আর কোনও ভয় নেই...।

বাচ্চাটা দ্বৈপায়নের কোমরের কাছে মুখ গুঁজে রইল। একটু পরে আড়চোখে তাকাল নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা পলাশের দিকে। ইতস্তত করে বলল, এই...এই লোকটা মা-মার্ডারার?

দ্বৈপায়ন হেসে বলল, হ্যাঁ, মার্ডারার।

কাল সকালে আমাকে রোলার এস্কেট শেখাবে তো?

হ্যাঁ, শেখাব। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল দ্বৈপায়ন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাসন্তী চাপা চিৎকার করে উঠল। কারণ, পলাশের নড়াচড়া ও প্রথম লক্ষ করেছে।

শান্তনুও ব্যাপারটা দেখেছিল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

পলাশ মেঝেতে দেড় পাক গড়িয়ে চোখের পলকে চলে এল মিমোর কাছে। ওর পা ধরে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকা মারল। দ্বৈপায়নের আলতো বাঁধন ছিঁড়ে মিমো শব্দ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। চিতাবাঘ যেভাবে হরিণ ধরে, পলাশ সেইরকম হিংস্র ক্ষিপ্র ঢঙে মিমোকে এক টান মেরে নিয়ে এল নিজের কাছে। তারপর, মেঝেতে শোওয়া অবস্থাতেই, ও কোথা থেকে যেন বের করে নিল লুকোনো ছুরিটা। অমানুষের মতো নিষ্ঠুরভাবে ওটার বাঁকানো ফলা মিমোর গলায় চেপে ধরল। ফাঁসফেঁসে চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, সবাই দূরে সরে যা। কেউ চেঁচাবি না। তা হলে সত্যি-সত্যি এটার গলা কেটে দেব।

পলাশকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। মুখের নানা জায়গায় রক্তের ছোপ। জামাকাপড় বিধ্বস্ত। চশমা না থাকায় চোখ দুটো কেমন অচেনা লাগছে। আর মিমো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

নতুন করে ভয় আর আশঙ্কা নেমে এল ঘরের ভেতরে।

শান্তনু, সীমন্তিনী আর দ্বৈপায়ন পলাশের নির্দেশমতো কয়েক পা দুরে সরে গেল।

পলাশ কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল। মিমোকেও টান মেরে দাঁড় করাল। ছুরিটা ওর ডান চোয়ালের নীচে গলায় সামান্য চাপ দিয়ে বসানো। ছুরির ধারালো ডগার চাপে গলার নরম চামড়া কেটে গিয়ে রক্তের বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

পলাশ পাগলের মতো ভয়ঙ্কর উদভ্রান্ত চোখে ওদের চারজনকে একে-একে দেখে নিল। চশমা না থাকায় মুখগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছে, তবে এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বাসন্তীকে লক্ষ করে খিঁচিয়ে উঠল পলাশ, দরজায় খিল-ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দে। যে-কেউ হাজার ডাকলেও দরজা খুলবি না।

বাসন্তী ভয়ে ঝাঁকিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দরজার খিল আর ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দিল।

দ্বৈপায়নের দিকে আঙুল তুলে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে পলাশ জানতে চাইল, এই লোকটা কে? ঠিক-ঠিক জবাব দিবি। নইলে তোর ছেলের ছুটি করে দেব। স্কুলে ওর ক্লাসে একটা সিট খালি হয়ে যাবে।

শান্তনু হোঁচট খাওয়া গলায় বলল, ও দ্বৈপায়ন–আমাদের সামনের ফ্ল্যাটে থাকে।

মিমোর চুলের মুঠি ধরে পলাশ ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা শো-কেসের কাছে। নিষ্ঠুরভাবে মাথাটা ঠুকে দিল শো-কেসের গায়ে। তারপর শান্তনুর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, সত্যি করে বল, এই লোকটা কে! পলাশ তখনও হিংস্রভাবে বাচ্চাটার চুলের মুঠি ধরে রয়েছে। চোখে পাগলের মরিয়া দৃষ্টি।

সীমন্তিনী কেঁদে উঠে ভাঙা জড়ানো গলায় সব বলল পলাশকে। বারবার করে অনুরোধ করল, আপনি যা বলবেন তা-ই শুনব। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন প্লিজ।

ছেড়ে দেব! ও হল আমার ফিক্সড ডিপোজিট। মিমোর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল পলাশ। তারপর দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে বলল, হিরো, ওই ফ্লেক্সিবারটা

আমার দিকে ছুঁড়ে দে।

দ্বৈপায়ন চুপচাপ কথা শুনল। বারটা আলতো করে ছুঁড়ে দিল পলাশের পায়ের কাছে।

এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

আচমকা কলিং বেলের শব্দে ওরা সবাই চমকে উঠল।

কোনও শালাকে ফ্ল্যাটে ঢোকাবি না! চাপা গর্জন করল পলাশ, সীমাসুন্দরী, তুমি শিগগির যাও দরজা না খুলে চেঁচিয়ে যা-হোক বলে উটকো পাবলিককে ফোটাও। জলদি! কুইক!

দরজার কাছে যাওয়ার আগে ছেলের দিকে একবার তাকাল সীমা। চোখ-মুখের কী অবস্থা হয়েছে ওর! ভয়ে যেন ঠান্ডা পাথর হয়ে গেছে। কান্নার একটা ভাঙা টুকরো বেরিয়ে এল সীমার গলা চিরে। ও দরজার কাছে গিয়ে ডেকে উঠল, কে?

মিসেস সেনগুপ্ত, আপনাদের ফ্ল্যাটে কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি?

গলাটা চেনা-চেনা মনে হল সীমার। চারতলার মিস্টার সিনহা হতে পারেন।

ও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলল, না, না,–সেরকম কিছু না। আমাদের নিজেদের ব্যাপার।

ও, আচ্ছা। ঠিক আছে। যা হোক করে একটু মানিয়ে-টানিয়ে নিন।

দরজার ওপারে আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

পলাশ ছুরিটা বাঁ হাতে চালান করে দিয়ে ফ্লেক্সিবারটা ডান হাতের শক্ত মুঠোয় তুলে নিয়েছিল। ছুরিটা মিমোর বাঁ চোয়ালের নীচে চেপে ধরে ও দ্বৈপায়নকে এবার কাছে ডাকল–

ঠিক যেভাবে লোকে পোষা কুকুরকে ডাকে ও আ যা, মেরে হিরো, আ যা! আঃ, তু তু তু...।

রোলার স্কেটস পরা পায়ে মেঝেতে শব্দ করে কয়েক পা এগিয়ে এল দ্বৈপায়ন। ও পলাশের চোখে তাকিয়ে বুঝতে চাইছিল পাগল খুনিটা ঠিক কী করতে চায়।

এবার মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়! কুইক! কড়া গলায় হুকুম দিল পলাশ, নইলে এই ছোঁড়াটাকে খালাস করে দেব। নে, শুয়ে পড়, জলদি!

স্কেকট পরা পায়ে শুয়ে পড়তে একটু অসুবিধে হল বটে কিন্তু দ্বৈপায়ন মুখ বুজে পলাশের কথা মেনে নিল। অবশ্য না মেনে কোনও উপায়ও ছিল না।

উপুড় হয়ে শুয়ে ও ভাবতে লাগল প্রথম আঘাতটা ঠিক কীভাবে আসবে। আচ্ছা, ইন্সপেক্টর বিজয় মিত্র কি ওর দেওয়া ইমারজেন্সি মেসেজটা পেয়েছেন? ওঁরা খবর পেয়ে আসবেন তো?

শালা, শুয়োরের বাচ্চা! মুখ খিস্তি করে মেঝেতে থুতু ছেটাল পলাশ ও থুঃ! তারপরই ফ্লেক্সিবারটা প্রবল বেগে শূন্যে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল দ্বৈপায়নের মাথার পিছনদিকে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ফাইবারের হাতলের একটা অংশ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

দ্বৈপায়ন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কিন্তু পলাশের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। এক হাতে মিমোকে জাপটে রেখে অন্য হাতে ও দ্বৈপায়নের শুয়ে থাকা শরীরটাকে পেটাতে লাগল। আর অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল।

সীমন্তিনী চিৎকার করে মারতে বারণ করে ছুটে আসতে চাইছিল, কিন্তু পলাশ দাঁত খিঁচিয়ে মিনোর গলায় আলতো করে ছুরির আঁচড় টেনে দিল। রক্তের রেখা ফুটে উঠল ওর গলায়। আর বাচ্চাটা প্রাণভয়ে মা! মা! বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

শান্তনু আর সহ্য করতে পারছিল না। ও মনে-প্রাণে জ্ঞান হারাতে চাইছিল। শুকনো খসখসে গলায় ও পলাশকে আর্ত প্রার্থনা জানাল, মিমোকে ছেড়ে দে, ভাই। তুই যা চাস সব নিয়ে নে– ।

পলাশ দ্বৈপায়নকে পেটানো থামিয়ে শান্তনুর দিকে ঘুরে তাকাল। হেঁচকি তুলে খলখল করে হাসল ও দ্যাখ, শালা! ওই হিরো দ্বৈপায়নের দিকে আঙুল দেখাল পলাশ : আর আমি ভিলেন নিজের বুকে হাত ঠুকল এবার : দেখি, হিরোর প্রাণভোমরা বডি ছেড়ে বেরোয় কি না! ফ্লেক্সিবার বাগিয়ে ধরে আবার তৈরি হল পলাশ।

ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে উঠল আবার।

পলাশ চমকে ঘুরে তাকাল দরজায় দিকে। তারপর সীমাকে ইশারা করল। যার অর্থ হল, যে-ই এসে থাকুক তাকে যা-হোক কিছু বুঝিয়ে নিরস্ত করো।

সীমা দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, কে?

দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এল, আমি মানে, আমরা আপনাদের হেল্প করতে এসেছি।

চেনা গলা। ইন্সপেক্টর বিজয় মিত্র।

সীমার বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল। কী বলবে এখন ও? ঠোঁট কামড়ে বিহ্বল চোখে হতভাগা বাচ্চাটার দিকে একবার তাকাল সীমা।

পলাশ বিজয় মিত্রের কথাগুলো শুনতে পায়নি। কিন্তু সীমার চাউনিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। তাই অসভ্যের মতো খেঁকিয়ে উঠল, যে-ই হোক দরজা খুলবি না! এক হ্যাঁচকায় মিমোকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল। চঞ্চল চোখে ফ্ল্যাটের এপাশ-ওপাশ জরিপ করল।

সীমা বারকয়েক ঢোঁক গিলে কোনওরকমে বলল, আমরা ব্যস্ত আছি। দরজা খোলা যাবে না। পরে আসবেন।

মিসেস সেনগুপ্ত, কীসব আবোলতাবোল বকছেন! বিরক্ত গলায় বললেন বিজয় মিত্র, পলাশ সান্যাল কি ভেতরে আছে?

হ্যাঁ ।

আপনাদের ভয় দেখাচ্ছে? এবার চাপা গলায় কথা বললেন বিজয় মিত্র।

হ্যাঁ।

ওর কাছে রিভলবার আছে?

না –না।

ছুরি?

হ-হ্যাঁ।

আপনার বাচ্চাটা কি ভেতরে আছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার কেঁদে ফেলল সীমন্তিনী। আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার চাপে ওর বুকের ভেতরটা যেন জমাট বেঁধে ছিল। হঠাৎই সেটা গলতে শুরু করল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল সীমা। ওর কান্না কিছুতেই আর থামতে চাইছিল না।

হিংস্র বাঘের গলায় সীমাকে ডাকল পলাশ, অ্যাই! এদিকে চলে আয়!

শান্তনু সীমার কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইল। বলল, কোনও ভয় নেই। এপাশে চলে এসো।

ঠিক তখনই দরজায় রুক্ষ আঘাত পড়ল। বেপরোয়াভাবে দরজায় লাথি মারছে কেউ।

পলাশ মিমোকে টেনে নিয়ে দেওয়ালের এক কোণে চলে গেল। চিৎকার করে বলতে লাগল, ঘরে কেউ ঢুকলেই বাচ্চাটার গলা কেটে দেব! ওদের বারণ কর বলছি!

সীমার কান্না একফোঁটাও থামেনি।

শান্তনু কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

বাসন্তী ওদের কাছটিতে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

আর দ্বৈপায়নের অসাড় দেহটা সামান্য নড়েচড়ে উঠল।

আধমিনিটও লাগল না। দরজায় কাঠ ফেটে গেল। দুটো অজানা-অচেনা হাত সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে খিল-ছিটকিনি খুলে ফেলল। তারপরই ঘরে ঢুকে পড়ল চারজন মানুষ। দুজন সাদা-পোশাক, আর দুজন উর্দি-পরা কনস্টেবল। সাদা-পোশাকের একজনকে শান্তনু আর সীমন্তিনী চিনতে পারলঃ বিজয় মিত্র।

দরজায় বাইরে উৎসাহী জনতার ভিড় জমে গিয়েছিল। বিজয় মিত্র কনস্টেবল দুজনকে দরজায় মোতায়েন করে দিলেন। তারপর হাঁপ ছেড়ে একগাল হেসে বললেন, যাক, আর কোনও ভয় নেই। আমরা এসে পড়েছি। সীমন্তিনীর দিকে ফিরে : ম্যাডাম, আমাদের একটু চা খাওয়ান। গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে।

বিজয় মিত্রের আচরণে সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম একটা বিপজ্জনক মুহূর্তে ভদ্রলোক যেন পিকনিক করতে এসেছেন।

ভুড়ি সামলে হেলেদুলে হেঁটে বিজয় মিত্র একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। তারপর এই প্রথম যেন দ্বৈপায়ন আর পলাশকে দেখতে পেলেন। পলাশকে বললেন, কী ব্যাপার? আপনারা দুজন মারপিট করছিলেন নাকি? আর বাচ্চাটাকে ওভাবে ধরে আছেন কেন?

ওকে ছেড়ে দিন। সীমন্তিনীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ম্যাডাম, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, প্লিজ। আমার তাড়া আছে– এক্ষুনি চলে যাব। চা-টা একটু জলদি হলে ভালো হয়।

দ্বৈপায়নের গলা দিয়ে উঃ-আঃ শব্দ বেরোচ্ছিল। বিজয় মিত্র সঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, ব্যানার্জি, একে তুলে বাথরুমে নিয়ে যান। মাথায় জল-টল দিয়ে দেখুন কী ধরনের ইনজুরি হয়েছে। সেরকম বুঝলে হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

ব্যানার্জি কোনও কথা না বলে দ্বৈপায়নকে অনায়াসে চাগিয়ে দু-হাতে তুলে নিলেন। তারপর শান্তনুর দিকে চোখের ইশারা করে জানতে চাইলেন, বাথরুমটা কোনদিকে। শান্তনু দেখিয়ে দিতেই সেদিকে চলে গেলেন।

সীমন্তিনী বাসন্তীকে পাঠাল চা তৈরি করতে। কান্না থামিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ও বিজয় মিত্রকে দেখছিল। পলাশও অবাক সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছিল এই অদ্ভুত অফিসারের দিকে।

এবার শান্তনুর দিকে তাকালেন বিজয় মিত্রঃ মিস্টার সেনগুপ্ত, আসুন–এখানে এসে বসুন–আপনার সঙ্গে কথা আছে।

শান্তনু বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনল। বিজয় মিত্রের কাছাকাছি একটা সোফায় বসে আমতা-আমতা করে বলল, আমি…আমাদের…।

বুঝেছি, বুঝেছি। ব্যস্ত হতে হবে না–চুপ করে বসে একটু জিরোন, চা-টা খান–তারপর কথা হবে।

মিমো। ঘরের আর-এক প্রান্ত থেকে সীমা ছেলের নাম ধরে ডেকে উঠল।

তখনই যেন বিজয় মিত্র পলাশকে আবার খেয়াল করলেনঃ আরে, কী হল! আপনাকে বললাম না বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন। ওকে ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বসুন কথা আছে।

পলাশ হঠাৎই রাগে ফেটে পড়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, আমাকে আটকালে বাচ্চাটার গলা কেটে দেব! মিমোর চুলের মুঠি ধরে হিংস্রভাবে আঁকিয়ে ওর মাথাটা কাত করে ধরল পলাশ। তখনই ওর গলায় ভয়ঙ্করভাবে চেপে ধরা ছুরিটা স্পষ্ট দেখা গেল।

আমি এখান থেকে চলে যাব– হিসহিস করে বলল পলাশ, ওদের বলুন পথ ছেড়ে দিতে। কেউ যেন আমাকে না আটকায়।

বিজয় মিত্র হাসলেন, বললেন, পলাশবাবু, আপনাকে আটকাতে আমরা আসিনি। আপনার এগেইন্সেট কোনও অভিযোগ কিংবা প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করতেও চাই না। আপনি শুধু বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন। শেষ কথাটা বলার সময় বিজয় মিত্রের গলাটা কেমন ঠান্ডা শোনাল।

না! ছাড়ব না! দুপাশে মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করল পলাশ।

এই আপনার শেষ কথা?

হ্যাঁ।

তা হলে আপনি চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। হেসে বললেন বিজয় মিত্র। এবং মোটা শরীরটাকে একপাশে কাত করে পকেট থেকে একটা ছোট মাপের অটোমেটিক পিস্তল বের করলেন। চোখ দিয়ে মেপে দেখলেন, তার কাছ থেকে পলাশের দূরত্ব প্রায় বারো-তেরো ফুট।

পিস্তলটা দেখেই শান্তনুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। সীমন্তিনী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

পিস্তলটা নেড়েচেড়ে পলাশকে দেখালেন বিজয় মিত্র ও এটা লামা অটোমেটিক পিস্তল। সোয়া ছইঞ্চি ব্যারেল। ওজন ছশো গ্রাম মতন। আটটা গুলি করা যায়। দেখতে ছোট হলে

কী হবে, ভীষণ কাজের।

সীমা, লোকটাকে ভয় দেখাতে বারণ করো! চেঁচিয়ে বলল পলাশ, নইলে আমি কিন্তু মিমোকে খতম করে দেব।

পলাশবাবু, আপনি কখনও ষাঁড়ের লড়াই দেখেছেন? হাসিমুখেই জানতে চাইলেন বিজয় মিত্র, ওই যে, স্পেনে যেটা হয়। তাতে ম্যাটাডর যখন ছুটে আসা যাঁড়টাকে তরোয়াল দিয়ে শেষ করে তখন তার মধ্যে একটা অঙ্কের হিসেব থাকে। ম্যাটাডর চার্জিং বুলের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ায়। ষাঁড়টা মাথা নীচু করে ধুলো উড়িয়ে তার দিকে ধেয়ে আসে। যখন ষাঁড়টা ম্যাটাডরের গায়ের কাছে এসে যায় তখন সামনে, ষাঁড়ের দু-শিং-এর ফাঁকে, ঝুঁকে পড়ে ম্যাটাডর একটা বিশেষ জায়গায় তরোয়ালটাকে আমূল ঢুকিয়ে দেয়। জায়গাটা হল, কুঁজের সামনে, দুধের জোড়ের ঠিক মাঝে, একটা টোল খাওয়া ছোট্ট অঞ্চল। ম্যাটাডরের সোজা সরু তরোয়ালটা এখানে বিধিয়ে দিলে সেটা মাখন কেটে বসার মতো স্ট্রেট ভেতরে ঢুকে যায়। আর লাইটের সুইচ অফ করে দেওয়ার মতো ষাঁড়টার প্রাণবাতি তক্ষুনি নিভে যায়। ওটা জাস্ট খসে পড়ে ম্যাটাডরের পায়ের কাছে, একফোঁটা ছটফট করতে পারে না। কারণ, ওটার মেইন আর্টারিটা ড্যামেজ হয়ে যায়…।

পলাশ অধৈর্য হয়ে পড়লেও বিজয় মিত্রের কথাগুলো শুনছিল। ব্যাঙ যেমন সাপের কথা শোনে।

বাসন্তী সত্যি-সত্যি চার কাপ চা নিয়ে এল ট্রে-তে করে। কাপ-প্লেটগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় বিশ্রী ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছিল। কারণ, ওর হাত কাঁপছিল।

শান্তনু অসহায় বাচ্চাটার দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। মিমো যা-যা বায়না করবে এখন থেকে ও সবই কিনে দেবে। শুধু আজ কেউ ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে দিক।

বিজয় মিত্র হেসে একটা কাপ তুলে নিলেন বাঁ হাতে। তাতে শব্দ করে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির আঃ! শব্দ করলেন।

ব্যানার্জি ভেতর থেকে ড্রইং স্পেসে চলে এলেন। বিজয় মিত্রের কাছে এসে বললেন, ওঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে। শোওয়ার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছি। একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলে ভালো হয়।

গুড। একটু পরে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করছি। এখন নিন, চা খান।

ব্যানার্জি ইতস্তত করে দাঁড়িয়েই রইলেন। তিনি বিজয় মিত্রের হাতের পিস্তলটার দিকে দেখছিলেন, আর দেখছিলেন পলাশের দিকে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাপ টেবিলে রেখে বিজয় মিত্র আবার বলতে শুরু করলেন, পলাশবাবু, এখানে আপনি হলেন খ্যাপা ষাঁড়, আর আমি মোটাসোটা ভুড়িওয়ালা উদ্ভট চেহারার ম্যাটাডর। তবে সোর্ডের চেয়ে বন্দুক-পিস্তল এসব আমার বেশি পছন্দ। আমি এখন যে আপনাকে ঠিক দু-ভুরুর মাঝে গুলি করব তাতে আপনার মাথার ভেতরে করপাস ক্যালোসাম, থ্যালামাস আর হাইপোথ্যালামাস সব তালগোল পাকিয়ে ভুনি খিচুড়ি হয়ে যাবে। মানে, এককথায় বলতে গেলে, আপনার বাতি নিভে যাবে। অবশ্য আপনার মাথার পেছনের দেওয়ালটা ইয়ে-টিয়ে লেগে একটু নোংরা হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করার নেই। আমি যে-কোনও হার্ড ক্রিমিনালকে প্রথমে রিকোয়েস্ট করি..তারপর বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু করে দিই। হাসলেন বিজয় মিত্র।

এবং হাসতে-হাসতেই কথা থামিয়ে পলাশকে গুলি করলেন।

বন্ধ ফ্ল্যাটে সাইকেলের টায়ার ফাটার শব্দ হল।

সীমা আর বাসন্তী চিৎকার করে উঠল।

শান্তনু ছুটে গেল মিমোর দিকে।

ঘরে বারুদের পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল।

পলাশের মৃতদেহটা তখন দেওয়াল ঘষটে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ছে। ওর চোখে প্রাণহীন শূন্য দৃষ্টি। দেখেই বোঝা যায় বাতি নিভে গেছে।

বিজয় মিত্র পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব্যানার্জিকে বললেন, নিন, আমার কাজ শেষ। এবার আপনার কাজ শুরু।

চায়ের কাপে আর-একবার চুমুক দিয়ে বিজয় মিত্র বাসন্তীকে লক্ষ করে বললেন, চা-টা হেভি হয়েছে, মা-মণি। তবে চিনি একটু কম হয়েছে। একটু চিনি দিতে পারো?

শান্তনু, সীমা আর মিমো তখন একে অন্যকে জাপটে ধরে যা খুশি তাই করছিল।

হিমশীতল

হিমশীতল

০১.

কোথাও যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছে সেটা বোঝা গেল উকিলসাহেবকে দেখে। দু-আড়াই বছরের বাচ্চা ছেলের মতো থপথপ করে পা ফেলে ও এসে হাজির হল আমার কাছে। মুখ আকাশের দিকে তুলে বিচিত্র কঁদুনি গোছের আওয়াজ করে ডাক ছাড়ল কয়েকবার। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

আমরা আন্টার্কটিকায় এসে আস্তানা গাড়ার কয়েকদিন পর থেকেই এই অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটা আমাদের এলাকায় ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে। ওর গায়ে শক্ত আঁশের মতো পালক– সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। পিঠ আর ডানার রং কালো, তবে বুকের দিকটা ধবধবে সাদা। হঠাৎ করে মনে হতে পারে কালো কোট পরা কোনও উকিল বুঝি। সেইজন্যেই আমি ওর নাম রেখেছি উকিলসাহেব।

আন্টার্কটিকায় সতেরো রকম প্রজাতির পেঙ্গুইন পাওয়া গেলেও অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের দেখা মেলে বেশি। এই অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটাকে কোনও এক সময়ে একটা লেপার্ড সিল আক্রমণ করেছিল কিন্তু খতম করতে পারেনি। সেই আক্রমণের চিহ্ন হিসেবে ওর বুকের ওপর দিকটায় একটা ক্ষতচিহ্ন থেকে গেছে–জায়গাটায় ঠিকমতো পালক গজায়নি। সেই

দাগ দেখেই ওকে আমি চট করে চিনতে পারি। একটু আগেই ওকে একজন সঙ্গী নিয়ে এদিকটায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলাম। কিন্তু এখন ও একা।

উকিলসাহেবের উচ্চতা বড়জোর দু-ফুট, কিন্তু হাঁটাচলা বেশ গুরুগম্ভীর। এমনিতে ওর খাদ্য ক্রিল—আন্টার্কটিকায় খুদে চিংড়ি। তবে আমাদের ক্যাম্পের কাছে ঘোরাঘুরির সময় দেখেছি টিনের কৌটো-বন্দি মাছের দু-একটুকরো দিলে দিব্যি খেয়ে নেয়।

এখন ওকে দেখে মজা পাওয়ার বদলে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ, ওর সাদা পালকের ওপরে চুনির দানার মতো বেশ কয়েক বিন্দু রক্ত লেগে রয়েছে। এই প্রবল শীতে সাবজিরো উষ্ণতায় রক্তের ছিটে ওর গায়ে লাগার পরই জমাট বেঁধে গেছে।

কিন্তু উকিলসাহেবের গায়ে রক্ত এল কোথা থেকে?

পেঙ্গুইনরা নিজেদের মধ্যে বিকট ঝগড়া করে বটে, কিন্তু রক্তারক্তি? নাঃ, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হচ্ছে।

আমি উকিলসাহেবকে তু-তু করে আরও কাছে ডাকলাম। ও সে-ডাকে ভ্রুক্ষেপ না করে দাঁড়িয়েই রইল। তখন আমি খুব ধীরে-ধীরে ওর দিকে দু-পা এগিয়ে হাত বাড়ালাম—গ্লাভস পরা আঙুলের ডগায় কয়েকটা চুনির দানাকে স্পর্শ করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দানাগুলো খসে পড়ল বরফের ওপরে। আর উকিলসাহেব কী ভেবে কয়েক পা দূরে সরে গেল।

আমি বরফের ওপরে উবু হয়ে বসে পড়লাম। জমাট বাঁধা রক্তের ফোঁটাগুলো দু-আঙুলের ডগায় তুলে নিলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নজর চালালাম ক্যাম্পের দিকে।

মাত্র পঁচিশ-তিরিশ মিটার দূরেই আমাদের ক্যাম্প এক্স স্টেশন। ক্যাম্পের বাইরে দুজন লোক কী একটা যন্ত্র নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে। অনুমানে মনে হল চন্দ্রেশ্বর গুপ্তা আর রোহিত চিরিমার।

আমি চেঁচিয়ে ওদের ডাকলাম।

আন্টার্কটিকার বাতাস ভারী হওয়ার জন্যে শব্দ খুব স্পষ্টভাবে শোনা যায়। ওরা আমার ডাক শুনতে পেল। আমার দিকে একপলক তাকিয়ে হাতের যন্ত্রটা রেখে দিল বরফের ওপরে। তারপর পা বাড়াল।

কাছে আসতেই দেখলাম, ঠিকই ধরেছি–চন্দেৰশ্বর আর রোহিত। চন্দেৰশ্বর আমাদের রিসার্চ টিমের জিওলজিস্ট–মানে, ভূতত্ত্ববিদ। আর রোহিত হল আর্মির লোক বরফ বিশেষজ্ঞ।

এবারের অভিযানে রোহিত চিরিমারের ভূমিকা খুব জরুরি। কারণ, গত তিন বছর ধরে আন্টার্কটিকার পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটি-র কাছাকাছি যে বরফ ড্রিলিং-এর কাজ চলছে, এবারের অভিযানে সেটা শেষ হবে। প্রায় চারহাজার মিটার পুরু বরফের স্তর ভেদ করে আমরা পৌঁছে যাব–অথবা, বলা ভালো আমাদের যন্ত্র পৌঁছে যাবে–লেক এক্স-এর রহস্যময় জলে।

রোহিত আর চন্দেৰশ্বর আমার কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই আমি আঙুল তুলে অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটার দিকে দেখালাম।

উকিলসাহেবের বুকের দিকে তাকিয়েই ওরা বুঝতে পারল আমি কী বলতে চাইছি। রোহিত পাখিটার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল। চোখ সরু করে ওটার বুকের লাল দাগগুলো দেখতে লাগল।

আমি বললাম, রোহিত, এই যে আমার কাছে কয়েকটা স্যাম্পল আছে…।

আমার গ্লাভস পরা হাতের তালুতে রক্তের দানাগুলো বলতে গেলে চোখে পড়ে-কি-পড়ে না।

চন্দ্রেশ্বর আমার হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়ল ইটস ব্লাড, বস!

হ্যাঁ রক্ত। জমাট বেঁধে গেছে।

রোহিতও ঝুঁকে পড়ল ছোট্ট লাল বিন্দুগুলোর ওপরে ও কীসের রক্ত, দাদা?

চন্দ্রেশ্বর বলল, পেঙ্গুইনরা নিজেদের মধ্যে ইউসুয়ালি রক্তারক্তি কাণ্ড বাধায় না। তা ছাড়া, এই পেঙ্গুইনটা উন্ডেড বলেও মনে হচ্ছে না...।

আমরা যে-কথাটা উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছিলাম, রোহিত সে-কথাটা উচ্চারণ করে বসল, মানুষের রক্ত নাকি, দাদা?

তুমি ঠিক পয়েন্টে হিট করেছ, রোহিত। আমি শিওর হতে চাই যে, এটা মানুষের রক্ত নয়। আর, আরও শিওর হতে চাই যে, এটা আমাদের কারও রক্ত নয়...।

ও মাই গড! আমার কথা শেষ হতে না-হতেই চাপা গলায় বলে উঠেছে চন্দ্রেশ্বর গুপ্তা, কী বলছেন আপনি!

ঠিকই বলছি। এখুনি ক্যাম্পে চলো—খোঁজ করে দেখি সবাই বহাল তবিয়তে আছে কি না। এখানে আমরা তিনজন—বাকি রইল আর চারজন। দেখি ওরা কে কোথায় আছে...।

রক্তের দানাগুলো পলিথিনের একটা স্যাম্পল-ব্যাগে ঢুকিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রাখলাম। তারপর আমরা তিনজনে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের দিকে হেঁটে চললাম। আর উকিলসাহেবও থপথপ করে একটা বরফের ঢালের দিকে এগিয়ে চলল। ওদিকে কিলোমিটারখানেক এগোলেই ও ওর রুকারি-তে পৌঁছে যাবে।

পেঙ্গুইনদের আস্তানা বা বাসস্থানকে বলে রুকারি। প্রায় বছরদশেক ধরে আমেরিকা, ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলে পেঙ্গুইন নিয়ে বিশেষ ধরনের গবেষণা চালাচ্ছে। ওরাই যৌথ প্রচেষ্টায় বহু টাকা খরচ করে পোল অফ ইনঅ্যাকসেসিবিলিটিতে এই কৃত্রিম

পেঙ্গুইন রুকারি তৈরি করেছে। বরফ গলিয়ে গর্ত তৈরি করে তার মধ্যে পাথর ফেলে গড়ে তোলা হয়েছে একটা বিশাল হ্রদ। হ্রদের পাড়ে অনেকখানি পাথুরে জায়গা। আর হ্রদের জলে নুন মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে নোনা জল। সেই জলে চাষ করা হচ্ছে পেঙ্গুইনদের প্রধান খাদ্য ক্রিল—আন্টার্কটিকার বিশেষ প্রজাতির চিংড়ি।

ওই রুকারি থেকেই উকিলসাহেব কিংবা তার দু-চারজন জাতভাই আমাদের ক্যাম্পের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে আসে।

আমরা যে-অভিযানের দায়িত্ব নিয়ে এবারে আন্টার্কটিকায় এসেছি তাতে রক্তপাতের কোনও সিন নেই। তাই এই রক্তপাতের ঘটনাটা আমাকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে।

রোহিত কী ভেবে বলল, সুজাতা পেঙ্গুইন নিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করছে না তো?

আমি ওর দিকে তাকালাম। গগলস-এর গাঢ় রঙের কাঁচে আন্টার্কটিকার ধু-ধু বরফ-ঢাকা প্রান্তরের ছায়া। রোহিতের চোখ দেখা যাচ্ছে না। সারা শরীর হলুদ রঙের ভারী জ্যাকেটে ঢাকা। মাথায় হলুদ টুপি। লালচে ঠোঁটের ওপরে ঝাটার মতো গোঁফ। গোঁফটা আর্মির প্রতীক হলেও হতে পারে। তবে আন্টার্কটিকায় এসে প্রত্যেকেরই গোঁফ আমার খুব কাজে লেগেছে। সুকুমার রায় ঠিকই বলেছিলেন : গোঁফ দিয়ে যায় চেনা। কারণ, সারা শরীর শীতের পোশাকে ঢেকে চোখে জাম্বো গগল্স পরে পুরুষগুলো যখন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় তখন গোঁফ দেখেই আমি তাদের চিনে নিতে পারি।

রোহিতের কথার জবাবে আমি বললাম, তুমি তো ভালো করেই জানো রোহিত, এখানে আমাদের পেঙ্গুইন নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের কোনও প্রোগ্রাম নেই। থাকলে টিম লিডার হিসেবে সেটা আমি জানতাম।

রোহিত ঘাড় নাড়ল।

চন্দেৰশ্বর বলল, আমাদের কেউ তা হলে উন্ডেড হয়েছে।

হতে পারে। কিন্তু পেঙ্গুইনটার সামনে কীভাবে উন্ডেড হল সেটাই ভাবছি.. আমি বললাম, এখন আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় শেষের দিকে। এখন যদি কোনও ঝামেলা হয় তা হলে লেক এক্স-এর জল নিয়ে রিসার্চের প্ল্যান একেবারে ওলটপালট হয়ে যাবে।

আন্টার্কটিকায় চারপাশের সমুদ্রতট থেকে যে-অঞ্চলটি সবচেয়ে দূরে, তারই নাম পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটি। বৃত্তের কেন্দ্র যেমন পরিধি থেকে সবচেয়ে দূরের বিন্দু, অনেকটা সেইরকম। এই অঞ্চলের গভীরে বরফ আর পাথরের স্তরের মাঝে খুঁজে পাওয়া লেক এক্স সত্যিই এক রহস্যময় হ্রদ। হিসেব করে যা দেখেছি তাতে অনায়াসে বলা যায়, লেক এক্স রয়েছে সমুদ্রতলেরও কয়েকশো মিটার নীচে। এই হ্রদের জল কেউ কখনও চোখে দেখেনি, কেউ জানে না কোন রহস্যময় প্রাণিজগৎ বেঁচে রয়েছে সেই লুকোনো হ্রদে। হয়তো এই হ্রদের জল থেকেই পাওয়া যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নতুন ইতিহাস। নতুন কোনও জীবন্ত প্রমাণ খুঁজে পাব আমরা।

এই লেকটার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বেশ আকস্মিকভাবেই।

বছরচারেক আগে আন্টার্কটিকায় রাশিয়া ও ভারতের একটি যৌথ অভিযান হয়েছিল। অভিযানের লক্ষ ছিল কুমেরু মহাদেশের পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটি অঞ্চলে বরফের স্তরের গভীরতা মাপা, ওই অঞ্চলের অতীত আবহাওয়ার খোঁজখবর করা, এবং সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান করা।

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, কারণ আন্টার্কটিকায় বরফের স্তর অস্বাভাবিকরকম পুরু। পৃথিবীর মিষ্টিজলের শতকরা পঁচাত্তরভাগই এখানে জমে বরফ হয়ে আছে। আর বরফ রয়েছে পৃথিবীর মোট বরফের শতকরা নব্বই ভাগ। এখানকার বরফের গভীরতা কোথাও কোথাও প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের কাছাকাছি! তবে গড় গভীরতা আড়াই কিলোমিটার। আর আন্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রে বরফের আয়তন প্রায় ঊনতিরিশ মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার। এই বিশাল হিমবাহের ওজনে কুমেরু অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ প্রায় ছশো মিটার

নীচে নেমে গেছে। যদি কোনওভাবে এই বরফকে গলিয়ে ফেলা যায়, তা হলে সারা পৃথিবীর সমুদ্রতল ষাট মিটার উঁচু হয়ে যাবেফলে বেশিরভাগ বন্দরই জলে ডুবে যাবে।

আমাদের এই প্রকল্পের কাজ যখন শুরু হয় তখন পর্যন্ত বরফস্তরে ড্রিল করা হয়েছে মোটামুটিভাবে দু-কিলোমিটার পর্যন্ত। ব্রিটিশ ও মার্কিন গবেষক দল এই ড্রিলিং-এর কাজ চালিয়েছিল। কিন্তু বরফের নীচে লুকিয়ে থাকা কোনও হ্রদের সন্ধান তারা পেয়েছে বলে শোনা যায়নি।

দু-বছর আগে ভারত যে-অভিযান চালায় তাতেই প্রথম একটি লেকের অস্তিত্ব আঁচ করেছিল অভিযাত্রীরা। নানান জায়গায় বরফে ড্রিল করে তারপর সিজমিক শট-এর মাধ্যমে তারা ডেথ সাউন্ডিং-এর কাজ চালাচ্ছিল। আন্টার্কটিকার গভীর স্তর থেকে সেইসব বিস্ফোরণের শব্দের প্রতিফলন ধরা পড়ছিল সূক্ষ্ম যন্ত্রে। তা থেকেই বিজ্ঞানীরা বরফের নীচে লুকিয়ে থাকা বেডরক এর স্তরের খোঁজ পাচ্ছিল।

এইভাবে কাজ চালাতে চালাতে প্রায় তিনহাজার সাতশো মিটার গভীরতায় একটি জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষণায় এও বোঝা যায়, হ্রদটির আয়তন প্রায় দশহাজার বর্গ কিলোমিটার। তখন এই অজানা হ্রদের নাম দেওয়া হয় লেক এক্স।

এর পরের অভিযানের নাম ছিল অপারেশন লেক এক্স। আর উদ্দেশ্য ছিল বরফে ড্রিল করে লেক এক্স-এর জলে পৌঁছনো। বলতে বাধা নেই, আমাদের কাজটা ড্রিলিং-এর হলেও তার আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখার নির্দেশ আছে। তাই অন্যান্য দেশের অভিযাত্রীরা জানে আমরা সাধারণ ড্রিলিং করে গবেষণার খোরাক খুঁজছি।

পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটি অঞ্চলে রাশিয়ার গবেষক দল কাজ করছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে। আন্টার্কটিকায় অতীতকালের আবহাওয়ার খবর পাওয়ার জন্যে বরফের বিভিন্ন স্তরের ফাঁকে আটকে থাকা গ্যাসের বিশ্লেষণ খুব জরুরি। রাশিয়ানরা মূলত

সেই গবেষণাই করছিল, আর তার পাশাপাশি চলছিল খনিজের সন্ধান। আমাদের ধারণা, কোনও লেকের সন্ধান ওরাও আজ পর্যন্ত পায়নি।

আমরা যখন এই লেকের সন্ধান পেলাম তখন প্রথম প্রশ্ন হল, প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর ধরে যে-লেক স্টেরাইল অবস্থায় পড়ে আছে, তাকে হঠাৎ করে এখনকার আবহাওয়ার ছোঁয়াচ লাগতে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না। আবার বিপরীত প্রশ্নটাও বেশ জটিল ছিল? যদি কোনও প্রাগৈতিহাসিক জলচর প্রাণী ওই হ্রদে থেকে থাকে তা হলে তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না।

যাই হোক, বহু বাকবিতণ্ডার পর, সংসদে বহু উত্তপ্ত চাপান-উতোরের পর বিজ্ঞানের জয় হয়েছিল। সবাই একমত হয়ে বলেছিল যে, বিপদ যা আসে আসুক, বরফের গভীরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোটাই বড় কথা।

তারপর থেকে আমরা একটানা এই গর্ত খোঁড়ার কাজ করে যাচ্ছি। এবং সেই কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এবারের অভিযানে আমি দলনেতা। তবে রোহিত চিরিমার অপারেশন লেক এক্স-এর শুরু থেকে আছে–তার আগেও দুবার ও এই হিমশীতল অঞ্চলে ড্রিলিং অপারেশনের দায়িত্বে ছিল। ফলে অভিজ্ঞতা ওর বেশি। সেইজন্যেই ওর মতামতকে আমি বেশ গুরুত্ব দিই। আর সেটা রোহিত জানে।

ভারী বুট দিয়ে বরফ মাড়িয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ক্যাম্পের কাছে।

অ্যালুমিনিয়াম আর কাঠ দিয়ে তৈরি আমাদের মূল শিবির। এ ছাড়া দরকার মতো অস্থায়ী শিবিরের জন্যে ব্রিটিশ আন্টার্কটিক সার্ভে থেকে আমরা লাল রঙের পিরামিডের চেহারার কয়েকটা তবু কিনে এনেছি। এই তাঁবুগুলো ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার গতিবেগ পর্যন্ত তুষারঝড় সইতে পারে। শদেড়েক মিটার দূরে সেরকম একটা শিবির চোখে পড়ছে।

ওটা আমাদের দলের মাইক্রোবায়োলজিস্ট অদিতি প্রধানের গবেষণাগার। ড্রিলিং অপারেশনে যে-বরফ উঠে আসছে তার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণের সন্ধান করে চলেছে অদিতি।

ক্যাম্প থেকে হাতদশেক দুরেই ড্রিল-হাউস। সেখানে সবচেয়ে আধুনিক সবচেয়ে দামি কোর ড্রিল চলছে। ড্রিলিং-এর ধকধক আওয়াজ দুস্তর বরফে ঢাকা শ্বেত-শুভ্র শান্ত মহাদেশকে যেন শব্দের ঝড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে।

এখন ড্রিল-হাউসে ডিউটিতে আছে পবন শর্মা আমাদের দলের ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। একটানা ছঘণ্টা ওর ডিউটি সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো। তারপর আমার পালা–আবার ছঘণ্টা। সন্ধের পর ড্রিলের বিশ্রাম, যদিও আমাদের বিশ্রাম নেই। মাপজোখের কাজ, গভীর স্তর থেকে তুলে নিয়ে আসা আইস কোর-এর স্যাম্পল স্টেরিলাইজড কনটেনারে রেখে তার গভীরতা গায়ে লিখে রাখা, সেই বরফের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস, তার কার্বন-ফোরটিন ডেটিং–এসব চলতে থাকে। বিশবছর আগেও কার্বন-ফোরটিন ডেটিং-এর শতকরা নব্বই ভাগ সঠিক উত্তর পেতে প্রায় একহাজার কিলোগ্রাম স্যাম্পল লাগত। এখন লাগে এক কিলোগ্রামেরও কম। তা থেকেই বিশ্লেষণ করে জানা যায় ওই বরফের স্তর কত হাজার বা লক্ষ বছরের পুরোনো।

আমরা তিনজন ড্রিল-হাউসের কাছে পৌঁছলাম। কনকনে ঠান্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ড্রিল-হাউসের সারা গায়ে আন্টার্কটিকায় তুষারঝড়ের চিহ্ন। কোথাও ধাতুর পাত তুবড়ে গেছে, কোথাও আবার কাঠের দেওয়াল কমজোরি হয়ে খসে পড়ায় তার ওপরেই অন্য কাঠের তক্তা পেরেক ঠুকে এঁটে দেওয়া হয়েছে। মাসপাঁচেক আগে বাড়িটার মাথায় একটা অ্যালুমিনিয়াম রডের সঙ্গে একটা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বেঁধে উড়িয়ে দিয়েছিলাম–এখন সেটা বরফে ঢেকে শক্ত হয়ে গেছে...যেন একটা ভাস্কর্য।

ড্রিল-হাউসের দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ!

তখন চন্দেৰশ্বরকে বললাম, পবন ভেতরেই আছে কিন্তু দরজা বন্ধ কেন? তুমি বরং বাকিদের ডেকে জোগাড় করো।

চন্দেৰশ্বর হাঁটা দিল ক্যাম্পের দিকে।

রোহিত বলল, দাদা, আমি অদিতিকে ডেকে নিচ্ছি। বলেই অদিতির তাবুর দিকে এগোল।

আমার দলের প্রতিটি সদস্যের একটা জায়গায় খুব মিল–ওরা সকলেই কাজ করতে ভালোবাসে।

ড্রিল-হাউসের ভেতর ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট আর কোর ড্রিলের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বাড়িটার দেওয়ালগুলো কাঁপছিল থরথর করে।

কিন্তু পবন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল কেন!

ড্রিল-হাউসের দরজা বন্ধ করে তো আমরা কাজ করি না! আর এখান থেকে বেরোনোর অন্য কোনও দরজাও তো নেই!

এলোমেলো চিন্তা শুরু হয়ে যাচ্ছিল। অ্যাডেলি পেঙ্গুইনটার বুকের রক্তের ছিটের সঙ্গে কি এই বন্ধ দরজার কোনও সম্পর্ক আছে?

আরও কিছু ভেবে ওঠার আগেই ওরা সবাই আমার পাশটিতে এসে হাজির।

চন্দেৰশ্বর আর রোহিত বাকি তিনজনকে খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছে।

দলে আমরা মোট সাতজন। ছজন ড্রিল-হাউসের বাইরে–একজন ভেতরে।

আমি ওদের পেঙ্গুইনটার কথা বললাম। তারপর চেঁচিয়ে পবনের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। যদিও বুঝতে পারছিলাম, এভাবে ডেকে লাভ নেই। কারণ, ভেতরের ওই আওয়াজ ছাপিয়ে ওর পক্ষে কোনও কিছু শোনা বোধহয় সম্ভব নয়।

সুরেন্দ্র নায়েক এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত রাখল, বলল, এভাবে ডেকে লাভ নেই, চিফ ভেতরে কিছু শোনা যাবে না। লেটস ব্রেক ও দ্য ব্লাডি ডোর।

সুরেন্দ্র আমাদের দলের কেমিস্ট—লো টেম্পারেচার কেমিস্ট্রি ওর গবেষণার বিষয়। ভারী চেহারা, গালে চাপদাড়ি, গোঁফও মানানসই। শুরু থেকেই লক্ষ করেছি, চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে গায়ের জোরে কাজ করতে ভালোবাসে।

সুরেন্দ্রর কথায় সায় দিল রোহিত চিরিমার আর অদিতি প্রধান। তবে আমাদের দলে আর একটি যে মেয়ে রয়েছে—মেরিন বায়োলজিস্ট সুজাতা—দেখলাম ওর মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে।

আমি হাতের ইশারা করতেই সুরেন্দ্র আর চন্দেৰশ্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপরে।

অদিতির হাতে একটা আইস অ্যাক্স চোখে পড়ল। বোধহয় সাধারণ ধাক্কায় কাজ না হলে ওটা দরজার ওপরে ব্যবহার করবে।

অবশ্য তার আর দরকার হল না। দুবারের চেষ্টাতেই ড্রিল-হাউসের দরজা ভেঙে গেল। আমরা ছজন বলতে গেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

এবং ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম।

কারণ, ড্রিল-হাউসে কেউ নেই।

ড্রিল-হাউসে ঢুকতেই কেমন একটা অদ্ভুত অনুভব মনে ছেয়ে গেল।

বিশাল উঁচু একটা কুৎসিত জটিল যন্ত্র। তাকে ঘিরে অন্যান্য ধাতুর কাঠামো। একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই সটান উঠে গেছে একেবারে ড্রিল-হাউসের চালের কাছে। ড্রিলের ফ্রেমটাকে নানাদিক থেকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে তুষারঝড়ে ড্রিল-হাউসের দেওয়াল পড়ে গেলেও ড্রিলটা অক্ষত থাকে।

ইঞ্জিন-জেনারেটরের শব্দ, ড্রিলের শব্দ আমাদের কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর শব্দ তরঙ্গগুলো যেন সত্যি-সত্যি গায়ে এসে ধাক্কা মারছিল।

সব মিলিয়ে মনের মধ্যে এমন একটা তোলপাড় হল যে, আমার রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা-র কথা মনে হল। মনে হল, যন্ত্রকে আমরা চালাচ্ছি, না যন্ত্র আমাদের চালাচ্ছে।

আমি চোখের গগল্স কপালে তুলে দিলাম, তারপর চন্দ্রেশ্বরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, জেনারেটরের ব্রেকার অফ করে দাও।

ড্রিল-হাউসের এক কোণে ভারী বেস প্লেটের ওপরে ইনস্টল করা রয়েছে ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট। তার পাশে গোটাদশেক লাল রঙের ফুয়েল ড্রাম। ড্রাম থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে ব্রেকার, সুইচ, অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার এইসব নিয়ে ছোট একটা প্যানেল। চন্দেৰশ্বর সেদিকে এগিয়ে গেল। অফ করে দিল জেনারেটরের ব্রেকার।

মুহূর্তে সমস্ত শব্দ থেমে গেল। জেনারেটরের শক্তি নিয়ে যে-চারটে টিউব লাইট জ্বলছিল সেগুলো নিভে গেল। তবে দেওয়ালের তক্তার ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু আলো উঁকি মারছিল ভেতরে। এ ছাড়া ভাঙা দরজা দিয়ে বেশ খানিকটা আলো ঢুকে পড়েছিল। তবুও কেমন একটা আবছা অন্ধকার যেন নেমে এল ড্রিল-হাউসে। একইসঙ্গে শীতটাও বোধহয় বেড়ে গেল।

এখন সময়টা জানুয়ারির শুরু। অতএব সূর্য সবসময়েই আকাশে। একুশে ডিসেম্বর সূর্যটা দিগন্ত থেকে নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়েছিল। ফলে দিনে বা রাতে

সূর্যের আলোয় এতটুকু হেরফের হয়নি। তার পরদিন থেকেই রাত বারোটায় ঠিক দক্ষিণ দিক বরাবর সূর্য একটু করে নেমে যায়। তারপর দিগন্ত বরাবর আকাশ পরিক্রমা করতে করতে দুপুর বারোটায় ঠিক উত্তরের আকাশে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছয়। অর্থাৎ, সূর্য সবসময়েই আকাশে–তবে উত্তর দক্ষিণ বরাবর কাত হয়ে ঘোরে।

ভাঙা দরজা দিয়ে ঢুকে-পড়া আলো ভরসা করে আমরা পবন শর্মাকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার মন বলছিল ওকে আর পাওয়া যাবে না। তবুও আমরা ওর নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডেকে উঠলাম।

কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না।

আধঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পবন শর্মার কোনও হদিশ পেলাম না আমরা। আমাদের দলের ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যেন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সুরেন্দ্র নায়েক আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কথা বলার সময় ওর নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। এখন উষ্ণতা মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস–আন্টার্কটিকার উষ্ণতম সময়। অথচ আমরা শীতে কঁপছি।

চিফ, ড্রিল-হাউসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করল কে? পবন শর্মা?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, আর কে হতে পারে। আমরা বাকি ছজন ড্রিল-হাউসের বাইরে ছিলাম...।

অদিতি মাথা নাড়ল সূর্যদা, পবন ড্রিল-হাউসের দরজা বন্ধ করবে কেন? এখানে তো কিছু চুরি যাওয়ার ভয় নেই!

সেটাই তো অবাক লাগছে, অদিতি– আমি গ্লাভস পরা হাত দুটো ঘষলাম : ড্রিল চালু রেখে পবন উধাও হল কোথা দিয়ে? আর কেনই বা হল? তা ছাড়া ওই অ্যাডেলি

পেঙ্গুইনটার গায়ে রক্তের ছিটেগুলো মিথ্যে নয়...।

রোহিত বলল, দাদা, পবন কি দরজা বন্ধ করে ড্রিলটাকে নিয়ে কোনও লটঘট করতে চাইছিল?

কী লটঘট করবে? আমি অবাক হয়ে রোহিতের দিকে তাকালাম।

উত্তরে সুজাতা বলল, যাতে আর ড্রিল না করা যায়...।

আমি চমকে সুজাতার দিকে ফিরে তাকালাম। আমাদের ড্রিলিং-এর কাজ বন্ধ হলে পবনের কী লাভ?

সেকথাই জিগ্যেস করলাম ওকে।

উত্তরে ও যা বলল তা বেশ রোমাঞ্চকর।

পবন শর্মার বিশ্বাস ছিল, ড্রিল করে আমরা যেই লেক এক্স-এর জলে পৌঁছব অমনই ঘটে যাবে এক বিপর্যয়। প্রাগৈতিহাসিক কোনও সরীসৃপ হয়তো ক্ষিপ্র গতিতে ড্রিলিং শ্যাফ্‌ট বেয়ে উঠে আসবে। তারপর এই বরফে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তরে আমাদের বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে।

পবন খুব ফুর্তিবাজ ছেলে ছিল। তবে ওর মধ্যে খ্যাতির লোভ ছিল। নিজের লাভ ক্ষতি নিয়ে বড় বেশি ভাবত।

এই তো, গত পরশু রাতে খাওয়ার সময় ও হঠাৎই আমাকে জিগ্যেস করেছিল, ডক্টর সেন, এবারের এক্সপিডিশন আর রিসার্চ নিয়ে আমরা যে-রিসার্চ পেপার লিখব তাতে সবার নাম থাকবে নিশ্চয়ই?

আমি বলেছিলাম, অবশ্যই থাকবে।

তখন ও খুশি-খুশি মুখে বলেছিল, চিফ, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে, বলুন। সারা পৃথিবী আমাদের নাম জেনে যাবে। পাঁচ লক্ষ বছর ধরে আইসোলেটেড একটা লেকের জল নিয়ে আমরাই প্রথম রিসার্চ করব। সেই জলের পোকামাকড়, ব্যাকটিরিয়া।

আমি ওকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, বড়সড়ো সাপ-টাপ, মানে, রেপটাইলও থাকতে পারে, পবন। অবশ্য আছে কি না সেটা বোঝা যাবে আর চার-পাঁচদিনের মধ্যেই। কারণ, ড্রিলিং-এর মিটার রিডিং দেখে যেসব ক্যালকুলেশন আমি আর রোহিত করেছি তাতে আমরা শিওর যে, আর চার-পাঁচদিন এইভাবে ড্রিল করে গেলে আমরা আইস শিট পেনিট্রেট করে লেক এক্স-এর জলে পৌঁছে যাব।

পবন আমার শেষ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। কেমন একটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল।

তারপর, বেশ কয়েক সেকেন্ড পর, বিড়বিড় করে বলল, সাপ-টাপ…রেপটাইল…যদি ওটা ড্রিলিং হোল দিয়ে ওপরে উঠে আসে!

আমি হেসে বলেছিলাম, এতটা কল্পনা করা ঠিক নয়, পবন। তবে রেপটাইল ইজ আ পসিবিলিটি।

পবন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠেছিল, ও মাই গড!

পরদিনই জেনেছিলাম, ওর এই ভয়ের কথাটা ও অনেককেই বলেছে। আরও বলেছে, ইমিডিয়েটলি ড্রিলিং বন্ধ করা উচিত।

কিন্তু আমি সে-কথায় গা করিনি। কারণ, এই কুমেরুতে এসে এই প্রবল ঠান্ডায়, বরফে ঢাকা নির্জন প্রান্তরে অনেকেরই মানসিক দোলাচল দেখা দেয়। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার দুটো ঘটনাও ঘটেছে গত তিরিশ বছরের নানান অভিযানে। পবনের কি সেরকম গোলমাল কিছু হল?

কিন্তু ড্রিলটা চালু অবস্থায় রেখে ও তো কোথাও যাবে না! ওর দায়িত্ববোধ আমাদের কারও চেয়ে কিছু কম ছিল না।

সুজাতাকে বললাম যে, পবন শর্মার ওই ভয়ের ব্যাপারটা আমিও জানি। তবে ও যে হঠাৎ করে কোনও ছেলেমানুষি কাজ করে বসবে না সে-বিশ্বাস আমার আছে।

রোহিতের গলায় বাইনোকুলার ঝুলছিল। সেটা চেয়ে নিয়ে আমি সিলিং ছোঁওয়া মইটার কাছে এগিয়ে গেলাম। বাকিদের বললাম, আমি ড্রিল-হাউসের চালে উঠে একবার চারপাশটা দেখে আসি যদি কোনও ট্রেস পাওয়া যায়।

মই বেয়ে একেবারে ড্রিল-হাউসের চালের কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে একটা চৌকোনা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটা হ্যাঁচ রয়েছে। জোরে চাপ দিতেই হ্যাঁচ খুলে গেল। কয়েকটা বরফের টুকরো খসে পড়ল আমার গায়ে-মাথায়। ঠান্ডা ঢুকে পড়ল চৌকো ফোকর দিয়ে। ওপরের উজ্জ্বল নীল আকাশও দেখা গেল–ঠিক যেন নীল-রঙা এক ডাকটিকিট।

এই হ্যাচটা মাঝে-মধ্যে ভোলা হয় বলে বরফ তেমন পুরু হয়ে জমেনি। শরীরটা হ্যাঁচের ফোকর দিয়ে গলিয়ে বাইরে খানিকটা নিয়ে আসতেই চোখে পড়ল চালের অন্যান্য জায়গায় বরফ বেশ পুরু।

একটা আয়রন গ্রেটিং-এর ওপরে সাবধানে দাঁড়িয়ে শরীরটা সোজা করলাম। ফলে আমার কোমর পর্যন্ত এখন চালের বাইরে। সেই অবস্থায় বাইনোকুলার চোখে দিয়ে নজর চালালাম চারপাশে।

যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। তারই মধ্যে বরফের ঢেউ ওঠা-নামা করেছে–অনেকটা মরুভূমির মতন।

আন্টার্কটিকার আবহাওয়া এত বিশুদ্ধ আর বাতাস এত পরিষ্কার যে, আমাদের মতো শহুরে মানুষের পক্ষে কোনও কিছুর দূরত্ব আঁচ করা একরকম অসম্ভব। তবুও আমার ধারণা, আমি প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। ঠান্ডা হাওয়ায় আমার শরীরের ভেতর পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছিল। আঙুলের ডগাগুলো প্রায় অসাড়। তা সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে নজর বোলালাম চারপাশে।

কেউ কোত্থাও নেই!

শুধু চোখে পড়ছে বাঁশের কঞ্চির ডগায় দাঁড়িয়ে থাকা কতকগুলো কমলা রঙের পতাকা, আর লাল রঙের খালি প্লাস্টিকের ড্রাম—তার অনেকটাই বরফে ঢেকে গেছে। আন্টার্কটিকার বরফের সমুদ্রের মধ্যে পথের হদিশ পাওয়া খুব মুশকিল বলে পথ বরাবর নিশানা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ওগুলো সেই নিশানা—আমাদের তিন নম্বর ক্যাম্পে যাওয়ার পথ।

এ ছাড়া কৃত্রিম পেঙ্গুইন রুকারিটাও চোখে পড়ল।

বৃত্তাকারে নজর ঘোরানো যখন শেষ করলাম তখন আমার আল্পকা গালদুটো জমে হিম হয়ে গেছে। আঙুলের ডগাগুলো টনটন করছে। চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে নামছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর নামতে পারেনি—গালের ওপরে জমে বরফ হয়ে গেছে।

আমি আর পারছিলাম না। হ্যাঁচ বন্ধ করে নেমে এলাম, তারপর মই বেয়ে সোজা নীচে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখি পাঁচজনের চোখে নীরব প্রশ্ন।

তার উত্তরে মাথা নাড়লাম আমি। তাতেই ওরা বোধহয় বুঝে গেল পবনকে আর কোনওদিনই পাওয়া যাবে না।

আমি একটুও দমে না গিয়ে বললাম, অন্তত আরও দু-ঘণ্টা আমরা পবনকে খুঁজব। তারপর ফাইনাল ডিসিশান নেব। আপাতত বেস ক্যাম্পকে কিছু জানাব না। তবে ড্রিলিং-এর কাজ পালা করে চালিয়ে যাব। লেক এক্স-এর জলে আমাদের পৌঁছতেই হবে। এটা

একটা চ্যালেঞ্জ। একটু থেমে চন্দেৰশ্বরকে লক্ষ করে বললাম, পবনকে খোঁজা শেষ হলে তুমি ড্রিলিং ডিউটি শুরু করবে, গুপ্তা। ও.কে, নাউ লেটস মুভ।

ড্রিল-হাউসের বাইরে বেরিয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম আশেপাশে। যেদিকে চোখ যায় বরফ, শুধুই বরফ।

অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো এই পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটি। এখান থেকে বরফের ঢল নেমে গেছে উপকূলের দিকে। আন্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রের মোট এলাকা প্রায় সাড়ে তেরো মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার–ভারতের আয়তনের চারগুণেরও বেশি। এই বিশাল এলাকার জমাট বরফ কিন্তু থেমে নেই–খুব ধীরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তবে এই প্রবাহ ঠিক তরলের প্রবাহের মতো নয় বরং ধাতু বা শিলার মতো ক্রিস্টালাইন পদার্থের প্রবাহ যাকে আমরা সায়েন্টিস্টরা বলি প্লাস্টিক ফ্লো।

আন্টার্কটিকার বরফ অসংখ্য ছোট-ছোট বরফের ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি। এই জমাট বরফ প্রবাহিত হয়েই হিমবাহের জন্ম হয়–ঠিক যেন বরফের এক নদী। সরতে সরতে এই হিমবাহ চলে যায় সমুদ্রে। সমুদ্রের কিনারায় তৈরি হয় আইস শেলফ বা হিমসোপান। সেই ভাসমান হিমসোপান থেকে কিছু কিছু অংশ ভেঙে আইসবার্গ বা হিমশৈল হয়ে ভেসে পড়ে সমুদ্রে। এক একটি আইসবার্গের মাপ এক-একটি দেশের সমানও হতে পারে। ১৯২৬ সালে নরওয়ে অভিযানের নাবিকরা প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার লম্বা একটি আইসবার্গ দেখেছিল। আর ১৯৬৫ সালে রুশ নাবিকরা আন্টার্কটিকার এন্ডারবি ল্যান্ডের কাছে প্রায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার লম্বা আর পাঁচহাজার বর্গকিলোমিটার মাপের একটি আইসবার্গ দেখেছিল।

বরফের এই প্লাস্টিক ফ্লোর জন্যেই ড্রিলিং-এর কাজটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ড্রিল করা গর্তটা পুরোপুরি খাড়া না থেকে বেঁকে যেতে চায়। সেসব দিকে নজর রেখেই আমরা ড্রিলিং এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের দলের নিয়ম হচ্ছে কেউ একা কোথাও ক্যাম্প ছেড়ে বেরোবে না। অন্তত দুজন সবসময় যেন একসঙ্গে থাকে। তাই ওরা পাঁচজন দুটো দলে ভাগ হয়ে হাঁটা শুরু করল দু-দিকে। আমি বললাম, ওরা যেন মোটামুটিভাবে দু-তিন কিলোমিটারের বেশি দূরে না যায়।

বরফের ওপরে নানানদিকে পায়ের ছাপের চিহ্ন। আমাদেরই হাঁটা-চলার প্রমাণ। এর মধ্যে পবনের পায়ের ছাপ আলাদা করে বোঝার কোনও উপায় নেই। সুতরাং, খানিকটা আন্দাজে ভর করে এলোমেলো খোঁজ করাটাই একমাত্র পথ।

ওরা রওনা হয়ে পড়লে আমি হাঁটা দিলাম টয়লেটের দিকে।

টয়লেট বলতে ক্যাম্প থেকে বিশ-পঁচিশ মিটার দূরে বরফের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি বড়সড়ো জায়গা। টয়লেটে যেতে হলে আইস অ্যাক্স হাতে নিয়ে যেতে হয়। ভালো করে গর্ত খুঁড়ে কাজ সেরে আবার সেটা ঢেকে দিতে হয় বরফ দিয়ে। আন্টার্কটিকার এই অঞ্চলে যেরকম ঘন-ঘন তুষারঝড় হয় তাতে মাঝে-মাঝেই টয়লেটের বরফ ড্রেসিং করতে হয় আমাদের।

এই অঞ্চলটায় ঘন-ঘন তুষারঝড়ের মূল কারণ টেম্পারেচার ইনভারশন। সাধারণত যে চাপের তফাত দিয়ে বায়ুপ্রবাহের ব্যাখ্যা করা হয়, সে-ব্যাখ্যা এখানে খাটে না। তাই এই ঝোড়ো বাতাসকে ইনভারশন উইন্ড বলা হয়। আন্টার্কটিকার সারফেস উইন্ড-কে তাই এককথায় অভিনব বলা যেতে পারে।

টয়লেটে আমি যে এলাম তার প্রধান কারণ এই জায়গাটা তন্নতন্ন করে কেউ খোঁজেনি। ওরা এখানে এসে খুঁজেছে পবন শর্মাকে। আর আমি খুঁজতে এসেছি...যা খুঁজতে এসেছি তা খুঁজে পেলাম।

টয়লেট এনক্লোজারের ভেতরে বরফের পাঁচিল ঘেঁষে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ। এখন জমে হিম হয়ে গেছে।

হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম, উকিলসাহেবের বুকে যে-চিহ্ন দেখেছি, এগুলোও তাই।

তা হলে কি পবন শর্মাকে কেউ খুন করেছে?

এ কথা ভাবতেই আন্টার্কটিকার শীত ভুলে গিয়ে অন্যরকম শীতে আমি কেঁপে উঠলাম।

কে জানে, বাকি পাঁচজনও হয়তো এই খারাপ প্রশ্নটার কথাই মনে-মনে ভাবছে।

আমি তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম ক্যাম্পের দিকে। একটা আইস অ্যাক্স নিয়ে এসে টয়লেটের নানান জায়গা খুঁড়ে দেখতে হবে।

পবন শর্মার ডেডবডি অথবা খুনের অস্ত্রটা আমি খুঁজে পেতে চাই।

কিংবা দুটোই।

.

০২.

রাতে ডিনারের সময় সকলের মধ্যেই কেমন একটা চাপা টেনশন টের পেলাম।

টিনের খাবার ফুটিয়ে অদিতি আর সুজাতাই গ্যাসের স্টোভে রান্নাবান্না করেছে, আর ছাত্র রাঁধুনি হিসেবে সুরেন্দ্র নায়েক ওদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছিল।

রান্না বেশ ভালো হওয়া সত্ত্বেও কারও মধ্যে খুশির মেজাজ নেই। সকলেই অদ্ভুতরকম চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা যখন পুরু চাদরের মতো চেহারা নিয়েছে তখন রোহিত তার ওপরে কথার ছুরি চালাল।

দাদা, পবন শর্মাকে তা হলে আর পাওয়া যাবে না?

আমি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললাম, বোধহয় আর পাওয়া যাবে না। কারণ, ও আর নেই।

অদিতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু কয়েকটা হেঁচকির মতো শব্দ তুলেই ও দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাটাকে থামাল।

পবনের সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। শুধু বন্ধুত্ব কেন–তার চেয়েও কিছু বেশি। ওরা সবসময় একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসত। অনেকসময় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি, ওরা দুজনে পবনের কেবিনে খুব ঘন হয়ে বসে গল্প করছে। আন্টার্কটিকার এই নির্জনতা মানুষকে বড় তাড়াতাড়ি কাছাকাছি নিয়ে আসে।

কাজের ফাঁকে বাড়তি সময় পেলেই পবন অদিতিকে তাসের ম্যাজিক শেখাত। আর লখনউ-এর মেয়ে অদিতি পবনকে ক্লাসিক্যাল গান নিয়ে জ্ঞান দিত। সেই জ্ঞানের পরিণাম হিসেবে পবন এমন সব বেসুরো গান গাইত যে, আমরা হেসে কুটিপাটি। তার ওপর ওর ফেবারিট গান ছিল সারে জহাঁসে আচ্ছা–তাও আবার জনগণমন অধিনায়ক-এর সুরে। কাজটা এত কঠিন ছিল যে, আমরা অনেকে বহু চেষ্টা করেও গানটা ওই ঢঙে গাইতে পারিনি। তাই আমরা এই গানটার নাম দিয়েছিলাম পবন স্পেশাল।

আমি গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, আমি দুপুরে আমাদের স্টোরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছি। গুনতিতে একটা আইস অ্যাক্স কম আছে।

চন্দেৰশ্বর সিগারেট খাচ্ছিল। ও নস্যিও নেয়, খইনি খায়, পান কিংবা পানপরাগেও আপত্তি নেই। জিগ্যেস করলেই বলে, মস্ত চিজ হ্যায়–লাজবাব।

আমরা ঠাট্টা করে বলি ভগবান ওকে যাবতীয় নেশা করার জন্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তা থেকে যেটুকু অবসর পায় সেই সময়টায় ও ভূতত্ত্বচর্চা করে। তাতে ও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, না, আমি দুটোই একসাথ করি।

এখন ও জিগ্যেস করল, বস, আর য়ু শিয়ের পবন ইজ ডেড?

হ্যাঁ। কারণ, একটা আইস অ্যাক্স উধাও, পেঙ্গুইনের বুকে রক্তের দাগ, টয়লেটের বরফে রক্তের ছিটে সবগুলো যোগ দিলে একটাই আসার পাওয়া যায়–পবন ইজ ডেড। আর আমার ধারণা, ওর ডেডবডিটা এখানে আশেপাশে বরফের নীচেই কোথাও চাপা দেওয়া আছে।

কে–কে খুন করেছে ওকে? রোহিত জানতে চাইল।

আমি ঠোঁট টিপে মাথা নাড়লাম হতাশায়, বললাম, জানি কে খুন করেছে…।

সবাই চমকে টানটান হয়ে বসল আমার কথায়।

..যে খুন করেছে সে এখন এই ক্যাম্পে আমাদের চোখের সামনে বসে আছে। তেতো গলায় বললাম আমি কারণ বাইরের কেউ এখানে এসে পবনকে খুন করতে পারে না।

যদি প্লেন বা হেলিকপ্টারে করে এসে থাকে? একথা বলল অদিতি। এখন ও নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। অন্তত ওপর-ওপর দেখে তাই মনে হচ্ছে।

সুরেন্দ্র নায়েক তড়িঘড়ি আপত্তি জানিয়ে বলল, না, না–সেটা হলে আমরা ইঞ্জিনের শব্দ পেতাম। তা ছাড়া, যে-কোনও প্লেন এই এরিয়ায় এসে ল্যান্ড করতে পারবে না। স্পেশাল প্লেন দরকার।

যদি কেউ পায়ে হেঁটে চুপিসারে এসে কাজ সেরে যায়…।

বুঝতে পারলাম, অদিতি কিছুতেই মানতে পারছে না আমাদেরই একজন পবনকে খতম করেছে। কিন্তু বাস্তব তো এরকমই হয়। কিছু করার নেই।

অদিতির কথার জবাব দিতে হল না। তার আগে ও নিজেই বিড়বিড় করে বলল, এই পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটিতে কে-ই বা পায়ে হেঁটে আসতে পারবে!

আমি বললাম, ঠিক ধরেছ। আমাদের তিন নম্বর ক্যাম্প এখান থেকে অন্তত নব্বই কিলোমিটার দূরে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, সেখান থেকে কেউ পায়ে হেঁটে আমাদের এই ক্যাম্পে আসতে চায়, তা হলে ব্যাপারটা অনেকটা মই বেয়ে আকাশে পৌঁছনোর চেষ্টার মতো হাস্যকর শোনাবে–তাই না?

কেউ কোনও জবাব দিল না।

আমি ওদের মুখের দিকে একে-একে তাকালাম।

চন্দ্রেশ্বর গুপ্তা। ভালোমানুষ টাইপের চেহারা। জিওলজিস্ট হিসেবে বেশ চৌকস। রোগা শরীর, তবে শক্তি কম নয়। কাজ না থাকলে এর-ওর সঙ্গে মজা করে। কিন্তু এখন সব মজা উবে গেছে।

রোহিত চিরিমার। খুব নিয়ম মেনে চলে। বরফ সম্পর্কে অনেক জানে। আমাকে প্রথম আলাপের পর থেকেই দাদা বলে ডাকে। অভিযানে এসে আজ পর্যন্ত কোনও পরিস্থিতিকেই ভয় পায়নি। সবসময় নির্বিকার। একবার বরফের ফাটল থেকে আমাকে রেসকিউ করেছিল। ফাটলের ওপরটা বরফ জমে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেখানে পা ফেলতেই আমি ভেতরে পড়ে যাই। আমাকে রোহিত এমনভাবে উদ্ধার করেছিল যেন একগ্লাস জল খাচ্ছে ব্যাপারটা এতই সাধারণ ছিল ওর কাছে। এ থেকেই বোঝা যায় ওর নার্ভ কেমন শক্ত।

ক্যাম্পের কাঠের মেঝেতে বসে ছিল সুজাতা রায়। একটু ভিতু টাইপের। অভিযানে এসে থেকে বেশ কয়েকবারই আমাকে বলেছে, লেক এক্সকে ডিসটার্ব করে কোনও লাভ আছে, সূর্যদা?

আমি ওকে বোঝাতে চেয়েছি? আমরা না করলেও আগামীদিনের কোনও গবেষক লেকটাকে ডিসটার্ব করবেই, সুজাতা। তার চেয়ে প্রথম হওয়াটাই কি ভালো নয়! ভাবো তো, কত সম্মান, কত খ্যাতি, কত প্রচার! দেশে ফিরে অন্তত কয়েকমাস তো তোমাকে নানান টিভি চ্যানেলে হাজিরা দিতে হবে। তুমি সেটা চাও না? তখন সুজাতা বলেছে, হ্যা, চাই–তবে প্রাণের বিনিময়ে নয়। ওই লেকের জলে…।

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়েছি আমি ও এসব তোমার উলটোপালটা আজগুবি সব সিনেমা দেখার ফল–গডজিলা আর জুরাসিক পার্ক-এর মতো।

অদিতি প্রধান। মাইক্রোবায়োলজিস্ট। সাহসী–তবে বেশ হিসেব করে চলে। পবনকে বেশ পছন্দ করত। এখন দুঃখ পেলেও ও যে-ধাতের মেয়ে তাতে সামলে উঠে বদলা নিতে চাইবে– পাগলের মতো খুঁজে বেড়াবে খুনিকে। তবে ও গান ভালোবাসে। হাতে সময় পেলেই টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট চালিয়ে মন দিয়ে শোনে, গুনগুন করে গানও গায়।

সুরেন্দ্র নায়েকের কোনও সমস্যা নেই। কী করতে হবে সেটা ওকে জানিয়ে দিলেই হল। বেপরোয়া। ধৈর্য বড় কম। সবসময় জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য গোছের ঢঙে চলাফেরা করে। আর ফাঁক পেলেই বউকে চিঠি লিখতে বসে। জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ির সময়ে ওর নামে খুব ঘন-ঘন টেলেক্স আসত। তাই জাহাজের রেডিয়ো অফিসার খুরানা মাঝে-মাঝেই টেলেক্স ফর মিস্টার নায়েক না বলে ঠাট্টা করে নায়েক ফর মিস্টার টেলেক্স বলতেন। ওর বউ প্রায় প্রতিদিনই ওকে একটা করে টেলেক্স করত।

কিন্তু কে? এদের পাঁচজনের মধ্যে কে?

সত্যি করে বল, পবন শর্মাকে তোদের পাঁচজনের মধ্যে কে খুন করেছিস।

আইস অ্যাক্স নিয়ে গিয়ে আমি টয়লেট স্পেসের নানান জায়গায় খুঁড়ে-খুঁড়ে দেখেছি। কিন্তু আর কোনও চিহ্ন পাইনি। এই তুষার-রাজ্যে মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা খুব সহজ। বরফে

একবার চাপা দিতে পারলেই কেউ আর তার কোনও হদিশ পাবে না। আর এখানে মৃতদেহ কখনও বিকৃত হয় না, পচে-গলে গন্ধ বেরোয় না। ফলে বছরের পর বছর একইরকম গোপন থেকে যায়। কেউ টের পায় না।

পবন শর্মার ডেডবডির সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো খুনের অস্ত্রটাও খুনি বরফের নীচে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঠিক আছে। মেনে নেওয়া গেল যে, খুনটা টয়লেট স্পেসেই হয়েছে। কিন্তু সেখানে পবন গেল কেমন করে! যেখানে ড্রিল-হাউসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! ড্রিল গমগম করে চলছে!

ক্লোজড রুম প্রবলেমটাকে যদি আপাতত বাদ রাখা যায় তা হলে খুনের বাকি গল্পটা দিব্যি অনুমান করা যায়।

আমরা নানান দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছি। পবন শর্মা ড্রিল-হাউসে একমনে কাজ করছে। খুনি—যে পবনের খুব চেনা, আমাদেরই একজন গিয়ে ওকে যা-হোক-একটা ছল-ছুতোয় ডেকে নিয়ে এল। আইস অ্যাক্সটা খুনি আগে থেকেই টয়লেটে রেখে এসেছিল। পবনকে মনগড়া একটা গল্প শুনিয়ে সে টয়লেটে যেতে বলল। তারপর অন্য পথ ধরে ঘুরপাক খেয়ে একটু পরে সে ও গিয়ে হাজির হল টয়লেটে। উকিলসাহেব ওদের যে-কোনও একজনের পিছু ধরে টয়লেটে চলে গিয়েছিল। তারপর...।

তারপর খুনি পবনের গলায়, ঘাড়ে, কিংবা বুকে ধারালো আইস অ্যাক্স সজোরে চালিয়ে দিয়েছে। পবন শর্মা নিশ্চয়ই তখন বসেছিলনইলে উকিলসাহেবের বুকে রক্ত ছিটকে লাগার কথা নয়। আর আমাদের সবারই গায়ে ভারী প্যারাশুটের জ্যাকেট রক্ত-টক্ত লাগলেও অনায়াসেই মুছে ফেলা যায়। এই ঠান্ডায় সেই কাজটা আরও সহজ। তাই খুনির পোশাকে রক্তের দাগ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু পবন শর্মা আর খুনি কখন টয়লেটে গিয়েছিল সেটা বোঝা খুব মুশকিল। কারণ, ড্রিলের শব্দ মোটেই বন্ধ হয়নি। আমরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। টেরই পাইনি কখন পবন শর্মা বা অন্য কেউ টয়লেটের দিকে গেছে।

এই খুনের একমাত্র সাক্ষী খুনি আর উকিলসাহেব।

ইস, পেঙ্গুইনরা যদি কথা বলতে পারত!

ওরা পাঁচজন নিজেদের মধ্যে নানারকম কথা বলছিল। বলছিল, দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর বেস স্টেশনে পবন শর্মার খুনের খবরটা জানানো হবে কি না।

আমি ওদের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম, খুনি এই ঘরেই আছে। অন্যরকম কিছু বলতে পারলে আমার ভালো লাগত কিন্তু উপায় নেই। তাই খুনি ছাড়া বাকি পাঁচজনকে বলছি সাবধানে থাকতে। আত্মরক্ষা বেঁচে থাকার একটা জরুরি শর্ত। আমরা পাঁচজন যেন আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরও বললাম, খুনিকেও আমার একটা কথা বলার আছে। একটা খুন যখন হয়ে গেছে তখন আর কিছু করার নেই। কিন্তু আর কোনও সমস্যা দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে সেটা সমাধান করা যেতে পারে—খুনটা কোনও সমাধানের পথ নয়। এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট জানি না, খুনি আমার রিকোয়েস্ট শুনবে কি না।

সবাই চুপ। কেউ একটি কথাও বলল না।

আসলে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে গোপনীয়তা বলে প্রায় কিছুই নেই। মানে, আমাদের সব আলোচনাই খুনি জানতে পারবে—হয়তো আলোচনাতে সে অংশও নেবে। তাকে না চেনা পর্যন্ত তাকে বাদ দিয়ে কোনও আলোচনার তেমন সুযোগ নেই। আর... হাসলাম আমি যখন তাকে আমরা চিনতে পারব তখন এইরকম আলোচনার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। সত্যি, ভারি অদ্ভুত সিচুয়েশান।

হঠাৎই অদিতি জিগ্যেস করল, কিন্তু, সূর্যদা, পবন খুন হল কেন?

জানি না। আমি বললাম।

শুরু থেকে এই প্রশ্নটা আমার বুকের ভেতরে তোলপাড় করে চলেছে? কেন খুন হল পবন শর্মা? খুনের মোটিভটা কী? হাজার ভেবেও আমি এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাইনি।

ক্যাম্পের আবহাওয়া ক্রমশ ভারি হয়ে এসেছিল। তাই আমি কাজের প্রসঙ্গ তুললাম। কাল কার কী ডিউটি তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

চন্দ্রেশ্বর গুপ্তার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। তার খানিকপরেই ও একটা চকচকে ছোট প্যাকেট ছিঁড়ে উপুড় করে দিয়েছে মুখের ভেতরে। বোধহয় পানমশলা-টশলা কিছু হবে। সেটা চিবোতে চিবোতে ও জড়ানো গলায় বলল, লেক এক্স-এর জল বিজ্ঞানের অনেক থিয়োরিকে হয়তো বদলে দেবে। বিশেষ করে প্যালিওজিওগ্রাফি আর প্যালিওইকোলজির অনেক চ্যাপটার হয়তো নতুন করে লিখতে হবে।

অদিতি সায় দিলঃ একটা লেক হাজার-হাজার বছর ধরে নেচার থেকে টোটালি আইসোলেটেড। তাতে খুব খুদে প্রাণী মাইক্রোস্কোপিক ক্রিচার, জলের গাছপালা, এমনকী মাছও কয়েক লক্ষ বছর ধরে অ্যাবসলিউট আইসোলেশনে–মানে, আমাদের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ফলে সেখান থেকে নতুন কিছু পাওয়া যেতেই পারে। আমরা হয়তো অনেক নতুন-নতুন প্রজাতির খোঁজ পাব।

সুজাতা হাতে হাত ঘষল বেশ কয়েকবার। তারপর মিনমিন করে বলল, ওখানে মাছ টাছের চেয়ে বড় কিছুও থাকতে পারে, অদিতিদি।

তা থাকতেই পারে। তা হলে দেশে ফিরে পাবলিসিটির লেভেলটা একবার চিন্তা করো। আমরা সবাই রাতারাতি ফেমাস হয়ে যাব।

সুরেন্দ্র হাই তুলল শব্দ করে। তারপর বলল, আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে! লেকের জল বা লাইফ ফর্ম টক্সিক হতে পারে–তাতে অসুখবিসুখ হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে। লেকের এনভায়রনমেন্ট আর আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকতে পারে।

অদিতি বলল, তবে আমার মনে হয় লেক থেকে স্রেফ জল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এইচ টু ও।

রোহিত বলল, তাই যদি হয় তা হলে আমি অন্তত শক্ত হব। আমি অনেক কিছু এক্সপেক্ট করছি। স্রেফ জল নিয়ে আমি দেশে ফিরতে চাই না।

আমিও। চন্দ্রেশ্বর রোহিতের কথায় সায় দিল? তবে ড্রিলটার কন্ডিশন ভালো নয়, বস। আর কদিন ওটার দম থাকবে কে জানে!

আমি বললাম, সেটা নিয়ে আমিও চিন্তায় আছি। আমার মনে হচ্ছে কাল কি পরশুর ভেতরে আমরা লেকের জলে পৌঁছে যাব। তার মধ্যে ড্রিলটা যেন না বিগড়োয়।

সুরেন্দ্র আবার হাই তুলল, বলল, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে–আমি শুতে গেলাম। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, পবনের ডিস্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারটা বেস স্টেশনে জানাবেন না?

হ্যাঁ–জানাব। কাল সকালে। পবন শর্মাকে ফিরে আসার জন্যে আমি আরও আট ঘণ্টা সময় দেব–ও যে আর নেই সেটা সম্পর্কে ডেড শিয়োর হওয়ার জন্যে এই সময়টা আমি দিতে চাইছি। তারপর দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে রেডিয়ো মেসেজ পাঠাব।

আমরা উঠে পড়লাম। এখন বিশ্রাম নেওয়ার পালা। ঘুমিয়ে রাত কাটাব একথা বলাটা যদিও এখানে মানানসই নয়, তবুও অভ্যেস সহজে যায় না। কথাবার্তায় আমরা সবসময় পুরোনো অভ্যেসটাই ব্যবহার করছি।

আমাদের ক্যাম্পে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা ছোট-ছোট ঘর কাঠের পার্টিশান দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া রয়েছে কাজ চালানোর মতো তিনটে ছোট মাপের ল্যাব। একটা স্টোর রুম, আর রান্নাঘর।

আমার খুপরিতে ঢুকে আশ্রয় নিলাম স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। স্লিপিং ব্যাগটা ঠান্ডায় বেজায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ওটাকে লাঠিপেটা করে তবে নরম করতে পারলাম।

সূর্য এখন দক্ষিণ দিগন্তে নেমে এসেছে বলে তেজ খানিকটা কমে গেছে। তবে আকাশে দিব্যি আলো রয়েছে। এখন এখানে রাত এইরকমই। প্রথম-প্রথম আমার কিছুতেই ঘুম আসত না। বিগ আই–মানে, অনিদ্রা রোগ হয়েছিল। পরে ব্যাপারটা মানিয়ে নিয়েছি।

স্লিপিং ব্যাগের অন্ধকারে ঢুকে পবন শর্মার কথা ভাবছিলাম। আমাদের ড্রিল মেশিনটার কলকবজা ও খুব ভালোভাবে জানত। সাধারণ টুকিটাকি ফল্ট ও দিব্যি চটপট সারিয়ে দিত। এখন যদি মেশিনটা হঠাৎ বিগড়ে যায় তা হলে যা-কিছু মেরামতের কাজ দলের একমাত্র ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাকেই করতে হবে। মনে-মনে চাইলাম, লেক এক্স-এ ঢোকার আগে ড্রিল মেশিনটা যেন বিকল না হয়।

.

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর সুরেন্দ্র যখন ড্রিল-হাউসের ডিউটিতে যাচ্ছিল তখন দেখলাম, ক্যাম্পের বাইরে রোহিত চিরিমার ওর সঙ্গে কথা বলছে। হয়তো গতকালের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছে।

অদিতি তৈরি হয়ে ওর ল্যাবের দিকে যাচ্ছিল, সুরেন্দ্র আর রোহিতের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। হাত-পা নেড়ে কথা বলতে লাগল।

ব্রেকফাস্টের সময় অদিতি আমাকে জিগ্যেস করেছে রেডিয়ো ট্রান্সমিশন চালু করে বেস ক্যাম্পে ও পবন শর্মার খবরটা পাঠাবে কি না। আমি বলেছি, না, একটু পরে আমিই খবর দেব।

বেস ক্যাম্পে খবরটা দেওয়ার সময় শুধু এটুকু বললাম যে, গতকাল থেকে পবন শর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় ও আর বেঁচে নেই।

ইচ্ছে করেই রক্তের ছিটে, হারানো আইস অ্যাক্স–এসবের কথা বললাম না। তাতে বেস ক্যাম্পের লোকজন উতলা হয়ে পড়বে, হয়তো এখানে প্লেন পাঠাতে চাইবে।

শিবির থেকে শিবিরে যাতায়াতের জন্যে প্লেনের ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের জাহাজে। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি উপকূলে ফাস্ট আইসের কোল ঘেঁষে আমাদের জাহাজ অ্যাডভেঞ্চারার নোঙর করে আছে। অভিযান শেষ হলে এই জাহাজে চড়েই আমরা দেশে ফিরে যাব।

বেস ক্যাম্পের নির্দেশ পেলে তবেই জাহাজ থেকে নির্দিষ্ট শিবির লক্ষ করে প্লেন ওড়ানো হয়।

আমি বললাম যে, চিন্তায় কোনও কারণ নেই সিচুয়েশান আন্ডার কন্ট্রোল। কোনও হেল্প পাঠাতে হবে না।

কারণ, পবনের এই উধাও হওয়ার ব্যাপারটা আমি নিজেই একটু খতিয়ে দেখতে চাই।

উত্তরে বেস ক্যাম্প থেকে আমাকে যা জানাল তাতে আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। ওরা বলল, ওখানে ব্লিজার্ড চলছে–কোনওমতেই প্লেন ওড়ানো সম্ভব নয়।

ওইসব অঞ্চলে তুষারঝড়ের মূল কারণ ক্যাটাবেটিক উইন্ডস। নানান ধরনের ইনভারশন উইন্ডের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল ক্যাটাবেটিক উইন্ড। এই উইন্ড দু-রকমের হয় :

অর্ডিনারি আর এক্সট্রর্ডিনারি। এর রহস্য এখনও বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি ভেদ করতে পারেনি। উপকূলের দিকে জমির ঢাল যত বাড়ে ক্যাটাবেটিক উইন্ড ততই জোরালো হয়ে ওঠে। এই ঝড়ের দুরন্ত গতির মূলে রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ। আন্টার্কটিকার ঠান্ডায় বাতাসের ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই ভারী বাতাস বরফের ঢাল বেয়ে যতই নামে ততই তার গতি বাড়তে থাকে অনেকটা যেন দুরন্ত গতির পাহাড়ি নদীর মতন। ১৯০৮ আর ১৯১১ সালের দুটি অভিযানে আন্টার্কটিকা গিয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার ডগলাস মসন। ১৯১১-র অভিযানে তিনিই ছিলেন দলনেতা। ফিরে এসে দ্য হোম অফ দ্য ব্লিজার্ড নামে একটা বই লেখেন তিনি। সেই বইতে মসন ক্যাটাবেটিক উইন্ডের ভারী চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ও ঝড়ের গতিকে সামাল দিতে তার দলের অভিযাত্রীরা সামনে এতটাই ঝুঁকে পড়ে হাঁটছিল যে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি তারা বরফের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ল।

আমি ব্লিজার্ডের খবরটা অদিতিকে দিলাম। তাতে ও বলল, ব্লিজার্ড অর নো ব্লিজার্ড লেক এক্স-এর জলের স্যা আমরা নিচ্ছিই—থামছি না।

গুড স্পিরিট। আমি ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম। না, আমার দলের এই মেয়েটা বেশ সাহসী আর ডাকাবুকো।

ড্রিল করে যে-আইস কোরগুলো উঠছে আমরা সেগুলো নানানভাবে পরীক্ষা করে দেখছি। গতকালের কয়েকটা কোর স্যাম্পল এখনও টেস্ট করা বাকি।

আমি রোহিত, সুরেন্দ্র আর অদিতির দিকে খানিকটা এগোতেই সুরেন্দ্র চেঁচিয়ে বলল, চিফ, একটু ড্রিল-হাউসে চলুন—স্টার্ট-আপে একটু হেল্প করবেন।

আসলে ড্রিলটা চালু করার সময় দুজন লোক লাগে। নানারকম প্রোটেকশন লজিক চেক করতে হয়। লুব্রিক্যান্ট দিতে হয় অনেক জায়গায়। তারপর চালু করা—সেটা একার পক্ষে সহজ নয়। ড্রিল চালু অবস্থায় আমি আর পবন মাঝে-মাঝে ওটা দেখতে যেতাম যে ওটা ঠিকমতো চলছে কি না। এখন এই কাজটা আমার একার ঘাড়ে পড়েছে।

অদিতি আর রোহিত বোধহয় অদিতির ল্যাবের দিকে যাচ্ছিল। সুরেন্দ্রর কথায় অদিতি রোহিতকে বলল, তুমি এগোও–আমি মিস্টার নায়েকের সঙ্গে গিয়ে একটু হাত লাগিয়ে দিই। তারপর আমাকে লক্ষ করে : সুর্যদা, আপনি বরং আপনার কাজ করুন–এদিকটা আমি হেল্প করছি।

অদিতি আর সুরেন্দ্র চলে গেল ড্রিল-হাউসের দিকে। আমি আর রোহিত কিছুক্ষণের জন্যে কাজের কথায় ডুবে গেলাম।

একটু পরেই দেখি অদিতি ড্রিল-হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাদের কাছে এসে ও হাতে হাত ঘষে হাত ঝাড়তে লাগল। তারপর হেসে বলল, মিস্টার নায়েকও এখন ভয় পেয়ে গেছে। বলছে, অদিতি ওই জলে কী আছে নোবডি নোজ। আমরা তো আমাদের লজিক দিয়ে চিন্তা করে বলছি ওই লেকে কোনও মন্স্টার রেপটাইল নেই–কোনও ভয়ংকর প্রাণীও নেই। কিন্তু আমরা কি জোর দিয়ে এ কথা বলতে পারি...। তো আমি ওকে সাহস দিয়ে এসেছি।

অদিতির কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরঘর শব্দে ড্রিল চালু হয়ে গেল। সুরেন্দ্র নায়েক ড্রিল স্টার্ট করে দিয়েছে।

রোহিত বলল, আজ বিকেলে না হলেও কাল সকালে ড্রিল-বিটটা লেক এক্স-এর জল টাচ করবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম উই শ্যাল টাচ হিস্ট্রি।

অদিতি হাত নেড়ে বলল, কী থ্রিলিং ব্যাপার!

আমি বললাম, আমাদের খ্যাতির খানিকটা পবন শেয়ার করতে পারলে ভালো লাগত।

একথায় সবাই কেমন চুপ করে গেল।

একটু পরেই রোহিত ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চ্যাপটা ধাতুর বোতল বের করল। আমরা সবাই জানি ওতে ব্র্যান্ডি আছে। অভিযানের শুরুতেই রোহিত আমাকে বলেছে যে, শীতের দেশে ওটা না খেলে ওর চলে না। আমি যেন ওকে সে-অনুমতি দিই। শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, আমিও ওর কাছ থেকে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু চেখে দেখি। এই প্রবল ঠান্ডায় জিনিসটা দারুণ কাজ দেয়।

চকচকে বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রোহিত বলল, দাদা, আজ ভীষণ ঠান্ডা–ঠান্ডা তাড়াতে এক চুমুক খেতে পারেন।

আমি বোতলটা নিলাম। দু-ঢোক খেয়ে রোহিতকে ওটা ফেরত দিলাম।

সত্যি, ঠান্ডাটা এবার কম লাগছে যেন।

রোহিত আর অদিতি এবার অদিতির ল্যাবের দিকে হাঁটা দিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে অ্যাডেলি পেঙ্গুইন গম্ভীরভাবে বরফের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি এবার ক্যাম্পের ল্যাবের দিকে এগোলাম। ড্রিল-হাউসের আওয়াজ শুনতে-শুনতে হঠাৎই মনে হল, শেষ পর্যন্ত ড্রিলটা টিকবে তো! শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওটা যেন মরিয়া হয়ে ব্রেকিং লোডে কাজ করছে।

ল্যাবে স্যাগুলো টেস্ট করতে করতে নানান দুশ্চিন্তার ঢেউয়ে তলিয়ে গিয়েছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল, শুধু ড্রিলটা নয়, আমরাও ব্রেকিং লোডে কাজ করছি। তবে আর বেশিদিন বাকি নেই বড়জোর দু-চারদিন।

এইসব কথা এলোমেলো ভাবছিলাম আর যান্ত্রিকভাবে স্যাগুলো টেস্ট করছিলাম। এই স্যাম্পল টেস্টিং আমি চন্দ্রেশ্বর গুপ্তার কাছে শিখেছি। আন্টার্কটিকা অভিযানে এসে শুধুমাত্র নিজের এরিয়া নিয়ে কাজ করলে হয় না, মাঝে-মাঝে দরকার পড়লে অন্য ডিসিপ্লিনেও

কাজ করতে হয়। চুপচাপ বেকার বসে থাকার চাইতে শিখে-পড়ে নিয়ে সে কাজ করা অনেক ভালো।

হঠাৎ সুজাতার কাঁপা গলার চিৎকারে আমি চমকে উঠলাম।

সূর্যদা! শিগগির! সুরেন্দ্র নায়েককে পাওয়া যাচ্ছে না!

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে স্যাম্পল স্টোর করার কয়েকটা স্টেরিলাইজড কনটেনার ল্যাবের টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে।

ঠং-ঠং করে বিচ্ছিরি শব্দ হল।

কিন্তু আমি সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেলাম। এ কোন সুজাতা!

বরফের প্রতিফলন থেকে বাঁচতে সুজাতার চোখে রোদচশমা। দু-গালের যেটুকু দেখা যাচ্ছে। সাদা, ফ্যাকাসে, রক্তহীন। জ্যাকেটের এখানে-ওখানে আর মাথার টুপিতে বরফের কুচি লেগে রয়েছে।

আর মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, ওর ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না।

আমি ওকে দু-হাতে চেপে ধরে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তখনই ওর কাঁপুনি হাতে টের পেলাম।

সুজাতা এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিল বলে জানতাম কারণ, দুপুরের রান্নার তদারকি ওর দায়িত্ব। আর চন্দ্রেশ্বর গুপ্তার ওকে সাহায্য করার কথা।

তা হলে সুজাতা জানল কী করে যে, সুরেন্দ্র নায়েককে পাওয়া যাচ্ছে না!

সেকথাই জিগ্যেস করলাম ওকে।

উত্তরে ও বলল, রান্নার কাজ করতে করতে একঘেয়ে লাগায় ও ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে বেরোয়। আমি তখন ল্যাবে কাজ করছিলাম, তাই ওর বেরিয়ে যাওয়াটা খেয়াল করিনি। ড্রিল হাউস নিয়ে একটা ভয় ওর মনে কাজ করছিল। অথচ মেরিন বায়োলজিস্ট হিসেবে একটা কৌতূহলও মাথাচাড়া দিচ্ছিল বারবার। তাই ও সুরেন্দ্রর কাজ কতটা এগিয়েছে দেখতে ড্রিল হাউসে যায়।

গিয়ে দ্যাখে ড্রিল চলছে তবে সুরেন্দ্র ড্রিল-হাউসে নেই।

ডাকাডাকি করে বা এদিক-ওদিক খোঁজ করে কোনও ফল না পাওয়ায় সুজাতা দৌড়ে এসেছে আমার কাছে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমি চন্দেৰশ্বরকে রান্নাঘর থেকে ডেকে নিলাম। তারপর তিনজনে বেরিয়ে এলাম ক্যাম্পের বাইরে।

চন্দেৰশ্বরকে বললাম, যাও, ওই ক্যাম্প থেকে অদিতি আর রোহিতকে ডেকে আনো এক্ষুনি।

চন্দেৰশ্বর অদিতির ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। আমি আর সুজাতা ড্রিল-হাউসের দিকে গেলাম।

না, এবার দরজা ভাঙতে হল না, কারণ গতকালের ঘটনার পর ড্রিল-হাউসের দরজা ইচ্ছে করেই আর মেরামত করা হয়নি। বরং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থাটা আরও জোরদার করেছি—একটা তালাও লাগানোর ব্যবস্থা করেছি, যাতে কেউ লুকিয়ে ড্রিল-হাউসে ঢুকে ড্রিলটাকে স্যাবোটাজ করতে না পারে।

কারণ, সাফল্যের শেষ ধাপে পৌঁছে আমি বোকার মতো অসাবধানি হতে রাজি নই।

ঝড়ের সময়, ড্রিল-হাউসে যখন কেউ কাজ করছে তখন, ড্রিল-হাউসের দরজা খুলে গিয়ে বরফ ঢুকে পড়তে পারে ভেতরে। সেইজন্যে আমি বলেছি, কয়েকটা ফুয়েল ড্রাম দরজার পাশে রাখতে যাতে ঝড়ের সময় দরজাটা ভেতর থেকে মোটামুটি আটকে রাখা যায়।

এখন দরজা ভেজানোই ছিল। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বিশাল যন্ত্র, বিকট শব্দ, আর সুরেন্দ্র নায়েকের গরহাজিরি আমাদের ধাক্কা মারল।

আমি আর সুজাতা যখন ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি তখন অদিতি, রোহিত আর চন্দ্রেশ্বর এসে ড্রিল-হাউসে ঢুকল।

এরপর যেন অ্যাকশন রিপ্লে শুরু হল।

পবন শর্মা উধাও হওয়ার পর আমরা যা-যা করেছিলাম, এবারও সেসব করতে লাগলাম। ড্রিল-হাউসকে তন্নতন্ন করে সার্চ করলাম। এবং ফলাফল হল বিরাট শূন্য।

অদিতি মই বেয়ে উঠে গেল ওপরে। হ্যাঁচ খুলে শরীরের অর্ধেকটা বাড়িয়ে দিল বাইরে। তারপর, মিনিটকয়েক পর, ও নেমে এল নীচে। আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল।

নেই। সুরেন্দ্র নায়েক কোথাও নেই।

আমি ড্রিলটা বন্ধ করলাম। তবে আলোর সার্কিটটা অন রাখলাম। ঠোঁট কামড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম।

সুজাতা আমার কাছে এসে জিগ্যেস করল, এবারে আপনি কী বলবেন, সূর্যদা?

আমি ওর দিকে তাকালাম। এতদিন আন্টার্কটিকার থাকার ধকল এবং পরপর দুজন সাথী আশ্চর্যভাবে উধাও হওয়ার ঘটনা ওকে ভীষণ চাপে ফেলে দিয়েছে।

আমিও কি চাপের মধ্যে পড়িনি? কেন সুজাতার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না? হাতের ইশারায় সবাইকে আমি ক্যাম্পে ফিরতে বললাম।

.

দুপুরে লাঞ্চের পর গোলটেবিল বৈঠক বসল।

ড্রিল করার কাজ আমরা চালিয়ে যাব, না কি বন্ধ করব? এই প্রশ্নটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হল।

সকালবেলা যখন ড্রিলিং শুরু হয় তখন তো সুরেন্দ্র বহাল তবিয়তে ড্রিল-হাউসে ছিল। কারণ, অদিতি গিয়ে ওকে সাহায্য করে বেরিয়ে আসার পর ড্রিল স্টার্ট করেছে সুরেন্দ্র। তখন আমরা ড্রিল-হাউসের কাছাকাছিই ছিলাম। সুরেন্দ্রকে চোখে না দেখলেও ওর যন্ত্রের শব্দ শুনেছি।

সুজাতা একটু ইতস্তত করে বলল, সূর্যদা, বরফের নীচের দিকের লেয়ারে—মানে, লেক এক্স-এর কাছাকাছি লেয়ারে নতুন ধরনের কোনও বরফের পোকা নেই তো!

পোকা! হেসে ফেলল চন্দেৰশ্বর আর রোহিত।

আমি বললাম, প্রায় ছমাস আমরা এখানে আছি—সেরকম কোনও পোকা আমরা দেখিনি। তা ছাড়া জমাট বরফের মধ্যে পোকা থাকবে কেমন করে!

যেমন করে আইসফিশ বেঁচে থাকে!

সুজাতার কথায় রোহিত আর চন্দেৰশ্বরের হাসি মিলিয়ে গেল পলকে। আমিও থমকে গেলাম।

ঠিকই বলেছে সুজাতা—মেরিন বায়োলজিস্টের মতোই কথা বলেছে।

আন্টার্কটিকার আইসফিশ বা বরফমাছের খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন, তারা ভাবতেই পারেননি এমনটা সম্ভব। এই মাছের শরীরে একবিন্দুও হিমোগ্লোবিন নেই। এর রক্ত সাদা বললেও ভুল হয় না। আর শুধু রক্ত কেন, বরফমাছের কানকো, লিভার সবই সাদা। তবে সাধারণ লাল-রক্তের মাছের মতো বরফমাছেরও শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্যে অক্সিজেন দরকার হয়। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মাছের দরকারি অক্সিজেনের সিংহভাগটাই জোগান দেয় হিমোগ্লোবিন। উষ্ণতা যত কমে আসে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন জোগান দেওয়ার ক্ষমতাও ততই কমে যায়। ফলে সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা বরফমাছের অন্তত দশগুণ। কিন্তু সাধারণ মাছ আর বরফমাছ জল থেকে অক্সিজেন নেয় একই হারে। তা থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, বরফমাছের হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করে সাধারণ মাছের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সহজেই। পরীক্ষা করে জানা গেছে, একই মাপের লাল-রক্তের মাছের তুলনায় বরফমাছের হৃৎপিণ্ড প্রায় তিনগুণ বড়।

যদি শারীরবিজ্ঞানের অজানা কোনও কৌশলে সত্যি এই ধরনের কোনও পোকা থেকে থাকে বরফের অতল স্তরে! বেগুনের ভেতরে যেমন পোকার খোঁজ পাওয়া যায়—অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না—যদি সেরকম কিছু হয়!

সুজাতা, তুমি কি বলতে চাও যে, বরফের কোনও পোকা—যার খোঁজ বিজ্ঞানীরা এখনও। পাননি—ড্রিলিং শ্যা বেয়ে উঠে এসেছে…তারপর পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েককে খতম করে দিয়েছে?

গলায় যতটা জোর দিতে চেয়েছিলাম ততটা হল না। চন্দেৰশ্বর মুখের ভেতরে কী একটা চিবোচ্ছে, কিন্তু ওর ঠাট্টার কিংবা অবিশ্বাসের ভাবটা প্রায় মিলিয়ে গেছে। রোহিত মাথা নীচু করে জ্যাকেটের ওপরে আঙুল বোলাচ্ছে। আর অদিতি নির্বিকার।

সুজাতা বলল, সূর্যদা, ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। আমি বলছি না যে, আইসফিশের মতো আইসওয়র্ম আছেই। আমি শুধু বলছি, ইটস আ পসিবিলিটি।

আমি খানিকটা গোঁয়ারের মতোই বলে উঠলাম, পোকা থাক বা না থাক আমরা থামছি না। দরকার হয় আমি একাই ড্রিল করব। লেক এক্স-এর জলের স্যাম্পল আমার চাই-ই চাই। এর জন্যেই আমরা মাসের পর মাস জানোয়ারের মতো পরিশ্রম করেছি। আমি...আমি...।

অদিতি হঠাৎ ঠান্ডা গলায় বলল, আসলে আপনি ফেমাস হতে চান। রিসার্চ পেপার, টিভি ইন্টারভিউ, ওয়ার্ল্ডওয়াইড পাবলিসিটি। বিখ্যাত হওয়ার নেশায় আপনি অন্যদের কথা ভাবছেন না।

কেন, তুমি ফেমাস হতে চাও না? চন্দ্রেশ্বর, রোহিত, সুজাতা–ওরা চায় না! আমি একে-একে দেখলাম প্রত্যেকের দিকে ওয়েল, একটা কথা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই। আমি থামছি না। পোকা কিংবা সাপ তো দূরের কথা, যদি ড্রিলিং শ্যা বেয়ে একটা গোটা ডাইনোসরও উঠে আসে তবুও আমি থামছি না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল।

তারপর অদিতি নরম গলায় বলল, হ্যাঁ, আমি ফেমাস হতে চাই বিজ্ঞানী হিসেবে। আর একইসঙ্গে বন্ধুদের বাঁচাতে চাই, নিজেও বাঁচতে চাই।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, সরি, কিছু মনে কোরো না। আমি একটু আপসেট হয়ে পড়েছিলাম।

সুজাতা মুখে হাত চাপা দিয়ে আচমকা উঠে চলে গেল। মনে হল যেন কান্না চাপতে চাইছে। আন্টার্কটিকার ইমোশনাল স্ট্রেস বড় মারাত্মক।

অদিতি বলল, সুরেন্দ্র নায়েকের স্ট্রেঞ্জ ডিস্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারটা বেস ক্যাম্পে জানাবেন তো...?

হ্যাঁ, জানাব– রাতে।

প্রতিদিন রাতে আমি বেস ক্যাম্পের সঙ্গে রেডিয়ো যোগাযোগ করি। সেই খবর তারপর ছড়িয়ে পড়ে বহু জায়গায়। আন্টার্কটিকার সারা বছর ধরেই নানান দেশের গবেষণা চলে। তার জন্যে নানান জায়গায় রয়েছে শিবির। ভারতীয় গবেষক দল এই বরফের দেশে প্রথম পা রেখেছিল ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি। সেদিনই জাতীয় পতাকা উড়েছিল দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে। তারপর থেকে নিয়মিত ভারতীয় অভিযাত্রী দল আন্টার্কটিকার এসেছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার ততটা গোপনীয়তা নেই, যেমনটি আছে অপারেশন লেক এক্স-এর বেলায়। আমাদের এবারের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য যদি অন্যান্য দেশ জেনে যায়... তারপর ওদের দলের কেউ যদি এখানে আমাদের ক্যাম্পে এসে...নাঃ, আমিও কী সব এলোমেলো ভাবছি।

রোহিত যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে বলে উঠল, দাদা, অন্য কোনও রাইভাল কান্ট্রি আমাদের রেডিয়ো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে যদি লেক এক্স-এর ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়, তারপর স্পেশাল টাইপের প্লেন নিয়ে এই অঞ্চলে এসে ল্যান্ড করে...।

চন্দেৰশ্বর বাধা দিল রোহিতকে : তা হলে বেস ক্যাম্পের রেডার ওটাকে স্পট করবে অনেক আগে। আনঅথরাইজড কোনও এয়ারক্র্যাফট এখানে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া, যদিও বা ঢুকতে পারে, তা হলে তার ইঞ্জিনের শব্দ আমরা নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল রোহিত? ঠিকই বলেছ। এ ছাড়া পায়ে হেঁটে কোনও অ্যাকশন স্কোয়াডের পক্ষে এই পোল অফ ইনঅ্যাসেসিবিলিটিতে এসে পৌঁছনো অবাস্তব। কারণ, পিঠে রুকস্যাক ঝুলিয়ে আন্টার্কটিকার এতটা পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এখানে লুকোনোর কোনও জায়গা নেই।

আমি বললাম, অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। এই থিয়োরিটা শুধু ইমপৰব্যা নয়, আটারলি ইমপসি। বাইরে থেকে কেউ আমাদের এই ক্যাম্পে ঝড় তুলতে আসেনি–আমাদের মধ্যেই কেউ ঝড় তুলেছে।

সবাই চুপ করে রইল। আমার কথা সকলের অপছন্দ হলেও ব্যাপারটা সত্যি। বোধহয় মনে-মনে প্রত্যেকে সেই বিশ্রী প্রশ্নটাই ভাবতে লাগলঃ আমাদের মধ্যে কে?

প্রায় দু-মিনিট পর আমি বললাম, ঠিক আছে—এবারে কাজের কথা হোক। চন্দ্রেশ্বর, তুমি আর সুজাতা স্যাম্পল টেস্টিং-এ লেগে পড়ো। রোহিত আর অদিতি, তোমরা অ্যাটমোসফেরিক ডেটা কালেক্ট করো। আমি ড্রিল-ডিউটিতে যাচ্ছি।

সুজাতা বলে উঠল, স্টার্ট-আপ-এর সময় আপনার একা অসুবিধে হবে, সূর্যদা। আমি আপনাকে হেল্প করে তারপর চন্দেৰশ্বরের সঙ্গে টেস্টিং-এ হাত লাগাচ্ছি।

আমি সুজাতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

মেয়েটার মনের খোঁজ পাচ্ছিলাম ধীরে-ধীরে। স্পষ্ট বুঝতে পারি, ও আমার কাছে আসতে চাইছে। অদিতি আর পবনের ঘনিষ্ঠতার কথা সুজাতাই আমাকে প্রথম জানিয়েছিল।

আমি জানি, এটাই স্বাভাবিক। বরফে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তরের এই বেনজির নির্জনতা মনকে কেমন যেন করে দেয়। তখন একটা মন আর-একটা মনের উষ্ণতা খুঁজতে চায়। কাজের সময় মন খুব ব্যস্ত থাকে বলে এলোমেলো চিন্তা তেমন অসুবিধেয় ফ্যালে না। তবে হাতে বাড়তি সময় পেলেই মনটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। দুনিয়ার যত বাস্তব-অবাস্তব চিন্তা মনে ভিড় করে আসে।

তবে আমার কথা আলাদা। আমি যখনই এরকম ভাবার সময় পাই তখন বাড়ির কথা ভাবি। কৃষ্ণার কথা। আর আমাদের ছোট্ট মেয়ে টুসকির কথা।

টুসকিকে এত পুতুল-পুতুল দেখতে যে, শো-কেসে সাজিয়ে রাখলে লোকে ভুল করে ওকে সত্যিকারের পুতুল ভেবে বসবে।

রোহিত উঠে দাঁড়াল। বলল, দাদা, উঠুন–এবার কাজে লেগে পড়ি।

চন্দেৰশ্বর বলল, সবকিছু ঠিকঠাক চললে আর মাত্র কটা দিন। তারপরই বাড়ি ফেরা। কতদিন যে বউয়ের হাতের রান্না খাইনি!

সুজাতা ঠোঁট টিপে বলল, স্ত্রৈণ।

চন্দেৰশ্বর অবাক হয়ে তাকাল সুজাতার দিকেঃ কেয়া, ম্যাডাম, ইয়ে স্ত্রৈণ কেয়া হ্যায়?

আমি হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, ওটা দেবভাষা–তুমি ওর মানে বুঝবে না। ওই শব্দটার মানে হল, তুমি তোমার বউকে খুব ভালোবাসো।

চন্দেৰশ্বর খুশি হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলঃ ও তো সহি বাত।

আমরা বাইরে বেরোতেই চন্দেৰশ্বর বলল, ড্রিল-ডিউটিতে আপনি তো একা থাকবেন। যদি কোনও…ইয়ে..ডেঞ্জার হয়…মানে…।

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, আমি একা দুজনের চেয়েও একটু বেশি। এই কথাটা আমি অফিশিয়ালি সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই। সুজাতা, তুমি সবাইকে এটা বলে দিয়ো। যদি খুনি আমাকে উধাও করার ঝুঁকি নেয় তা হলে দ্যাট উইল বি হেল অফ আ রিস্ক।

চন্দেৰশ্বর চোখ সরিয়ে নিল আমার চোখ থেকে।

.

০৩.

সন্ধেবেলায় সবাই আড্ডার মেজাজে ছিলাম।

অদিতি বেশ কয়েকটা গান শোনাল। রোহিত সেই গানে কখনও কখনও গলা মেলাল। চন্দ্রেশ্বর নানারকম নেশা করা নিয়ে অনেকগুলো মজার গল্প শোনাল। তারপর আমরা সবাই তাসের প্যাকেট নিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেক ফিশ আর রামি খেলা হল।

সময়টা এমন হইহই করে কাটছিল যে, আমরা একরকম ভুলেই গেলাম, কী কাজে আমরা এসেছি, আর কী রহস্যময় বিপদে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।

হাসি, ঠাট্টা, আর মজায় সুজাতা অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠল। অদিতিও মনে হল পবনের করুণ পরিণতির ধাক্কাটা দিব্যি সামলে নিয়েছে।

রাত আটটা নাগাদ তুষারঝড় উঠল।

বিকেল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। এই ঝোড়ো হাওয়াটা ব্লিজার্ডের সুনিশ্চিত খবর নিয়ে আসে। সুতরাং আমরা তৈরি ছিলাম।

বিকেলে ড্রিল-হাউসে আমি কাজ করেছি। তবে আমি সতর্ক ছিলাম। হঠাৎ করে কেউ যদি আমাকে আক্রমণ করতে আসে তা হলে তাকে আমি অনায়াসেই চমকে দিতে পারব। একটা স্টেরিলাইজড স্টেইনলেস স্টিলের কনটেনার আমার জ্যাকেটের ভেতরে লুকোনো আছে। তাতে রয়েছে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড। খুনি হোক কি বরফের পোকা হোক, কিংবা লেক এক্স-এর ভয়ঙ্কর সরীসৃপও যদি হয়, তাকে প্রাথমিকভাবে শায়েস্তা করতে পারবে এই অ্যাসিড। তারপর, প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় ধাপে, রয়েছে একটা বড় মাপের স্ক্রু ড্রাইভার। আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করলে খুনি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারবে, আমি পবন শর্মা বা সুরেন্দ্র নায়েক নই। সূর্যচ্যুতি সেন আলাদা জিনিস।

ড্রিল ডিউটির সময় আমি ড্রিল-হাউসে আবার একদফা অনুসন্ধান চালিয়েছি। টর্চ হাতে নিয়ে কাঠের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখেছি। তাতে সেরকম কিছুই পাইনি। শুধু জেনারেটরের পিছনে এককোণে দু-তিনটে টুকরো পেয়েছি।

অনেকক্ষণ ধরে টুকরোগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছি ওগুলো পাঁউরুটির টুকরো–শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সকালে ব্রেকফাস্টে আমরা টোস্ট, আখরোট আর কফি খেয়েছিলাম। কে জানে, তখন হয়তো অদিতি কিংবা সুরেন্দ্র ব্রেকফাস্ট সঙ্গে নিয়ে ড্রিল-হাউসে এসে ঢুকেছে। আবার গতকাল পবনও এসে থাকতে পারে। কিন্তু কাল পবন উধাও হওয়ার পর আমরা যে তল্লাশি চালিয়েছিলাম তাতে এগুলো পাওয়া যায়নি। তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, হয় আমরা কাল ভালো করে খোঁজ করিনি, অথবা আমাদের গতকালের তল্লাশির পর এগুলো কেউ এখানে ফেলে গেছে।

পাঁউরুটির কয়েকটা টুকরো ছাড়া ড্রিল-হাউসে আর কিছু পাইনি আমি। তবে ইচ্ছে করেই এগুলোর কথা কাউকে আর বলিনি।

সুজাতার কথায় আমার চটকা ভাঙল।

ও বলল, সুর্যদা, ব্লিজার্ড শুরু হয়ে গেছে…।

রোহিত বলল, তার মানে কাজ বাড়ল। কাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু বরফ সরানোর কাজ করতে হবে।

আন্টার্কটিকার ঠান্ডা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। শীতের পোশাক পরে সেই ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু যদি কনকনে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে তা হলে শীতের পোশাক মোটেই আর যথেষ্ট নয়। তুষারঝড়ের সময় শনশনে হাওয়ায় উড়তে থাকে শুকনো বরফের কুচি মরুভূমিতে যেমন বালির ঝড় ওঠে অনেকটা সেইরকম।

এই ঝড়ের সময় ক্যাম্পের বাইরে বেরোনোই মুশকিল। চামড়ার এতটুকু খোলা জায়গা পেলে বরফকুচির ঘায়ে সেখানে আঁচড় পড়বেই। মনে হয় যেন হাজার-হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। কেউ। তবু কিংবা ক্যাম্পকে বাঁচাতে অনেক সময় ব্লিজার্ডের মধ্যেই আমাদের বাইরে

বেরোতে হয়েছে। তখন যে-দৃশ্য দেখেছি তা জীবনে ভোলার নয়। অসংখ্য বরফের কুচি হাওয়ায় ভেসে ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে। সেই ঢেউয়ের মাঝে অন্ধের মতো হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা কয়েকজন আমাদের ঘিরে ফেলেছে সাদা অন্ধকার।

আন্টার্কটিকার এসে থেকে অনেক তুষারঝড় আমরা দেখেছি। ঝড়ের সময় আমরা এ পর্যন্ত হাওয়ার সবচেয়ে বেশি গতি পেয়েছি ঘণ্টায় একশো আশি কিলোমিটার।

আজকের ঝড়টার তেজ কম হলেও আমার কেমন অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের পাঁচজনের ভেতরের ঝড় যেন হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

চন্দেৰশ্বর আর রোহিতকে বললাম, ক্যাম্পের বাইরে জানলা আর দেওয়ালগুলো ভালো করে চেক করতে। এই উড়ন্ত বরফের মজা হল এই যে, ওরা যেখানেই ধাক্কা খায় সেখানেই লেপটে আটকে যায় আঠার মতো।

ওরা দুজনে সিনথেটিক দড়ি আর শাবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরোনোর আগে চোখ, মাথা, শরীর ভালো করে ঢেকে নিল। ওদের বললাম, রান্নাঘর আর স্টোরটায় ভালো করে নজর দিতে। কারণ, ক্যাম্পে ল্যাবগুলোর আমরা যতটা যত্ন নিই, রান্নাঘর বা স্টোরের বেলায় তার দশভাগের একভাগও নিই না।

অদিতি আর সুজাতাকে বললাম, তোমরা বসে গল্প করো—আমি সবকটা ঘর ঘুরে একবার দেখে আসি।

মিনিটদশেকের মধ্যেই আমাদের কাজ সারা হয়ে গেল, কিন্তু দুরন্ত গতির ঝড়ের জন্যে মনে হল যেন একঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে।

গল্পগুজবে আরও খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পর সুজাতা হঠাৎ বলল, বেস ক্যাম্পে খবর পাঠাবেন না, সূর্যদা?

রোহিত বলল, হ্যাঁ, সুরেন্দ্র উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানান…।

সুজাতা বলল, আর লেক এক্স-এর ব্যাপারে বেস ক্যাম্পকে অ্যালার্ট করে দেবেন।

অ্যালার্ট করে দেব মানে! আমি অবাক হয়ে সুজাতার মুখের দিকে তাকালাম। এই দুদিনে ওর বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। এক কাল্পনিক জলের সরীসৃপ আর বরফের পোকা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সুজাতা আমার চোখে তাকাতে সাহস পেল না। চোখ নামিয়ে বলল, এই যে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েক হাওয়ায় মিলিয়ে গেল…।

আমি ভীষণ বিরক্ত হলাম। এইরকম একটা একঘেয়ে থিয়োরি আর কঁহা তক শোনা যায়!

শোনো, সুজাতা, লেক এক্স-এর সঙ্গে পবন আর সুরেন্দ্রর ডিস্যাপিয়ারেন্সের কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি যে বলছ দুটো ব্যাপার কানেক্টেড…তার কোনও প্রমাণ তুমি পেয়েছ?

সুজাতা চুপ করে রইল। তবে মুখের ভাবে বোঝা গেল আমার কথা ও মানতে রাজি নয়।

শোনো… আমি বলে চললাম, ওদের উধাও হওয়ার নিশ্চয়ই কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। মানে…।

সত্যিকারের আছে কি? বলল চন্দ্রেশ্বর, দু-দুটো মানুষ পরপর দু-দিন হুউস করে উধাও হয়ে গেল। তাদের আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। এর পেছনে কোথায় যুক্তি কোথায় কারণ! বস, ডোন্ট মাইন্ড, খুব অবাস্তব শোনালেও বেস ক্যাম্পকে লেক এক্স ফ্যাক্টরটার কথা বলা দরকার।

সুজাতা ধীরে-ধীরে বলল, এরপর...বেশি দেরি হয়ে গেলে..খবরটা দেওয়ার জন্যে আমরা কেউই হয়তো আর থাকব না।

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। রোহিত, চন্দ্রেশ্বর, আর সুজাতা–ওরা চায় যতই উদ্ভট হোক, বেস ক্যাম্প লেক এক্স-এর ভয়ের ব্যাপারটা জানুক। বাকি রইলাম আমি আর অদিতি। অদিতির কী মত কে জানে! আমাদের প্রজেক্ট প্রায় শেষ হয়তো কালই বরফ কেটে জলের সন্ধান পাবে ড্রিল। এরকম একটা সময়ে এইরকম বিতর্ক আমার ভালো লাগছিল না।

শেষ পর্যন্ত ভি এইচ এফ ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাতে বসলাম।

বেস স্টেশনের রেডিয়ো অপারেটর ঘুম-জড়ানো গলায় আমাদের ডাকে সাড়া দিল। আমি জানালাম যে, আমাদের টিমের আর-একজন, সুরেন্দ্র নায়েককে পাওয়া যাচ্ছে না।

খবরটা পেয়েই অপারেটরের ঘুম কেটে গেল।

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা জানালাম। বললাম যে, আমাদের এখানে ব্লিজার্ড চলছে।

উত্তরে সে বলল, ওখানেও তুষারঝড় এখনও থামেনি।

আমার পাশে ছিল রোহিত। আর রোহিতের পাশে সুজাতা। আমি মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, লেক এক্স-এর উদ্ভট থিয়োরির কথা বেস স্টেশনকে জানাব না। ওরা হয়তো ভাববে আমরা পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু সেটা আর হল না।

কারণ, হঠাৎই সুজাতা রোহিতকে ডিঙিয়ে ট্রান্সমিটারের ওপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল ওই অবাস্তব থিয়োরির কথা। বলতে-বলতে আবেগে ভয়ে ও কাঁদতে শুরু করল। এবং কথা শেষ করেই বলে দিল, ওভার অ্যান্ড আউট। ফলে রেডিয়ো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আমরা পাঁচজন চুপচাপ বসে রইলাম। বেস স্টেশন এখন কী ভাববে কে জানে! আবার রেডিয়ো যোগাযোগ করে সুজাতার কথা যে পাগলের প্রলাপ সেটা বলাটা ঠিক হবে না। ওরা ভাববে দলের ওপরে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি।

সুজাতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ওর ওপরে রাগ করে কোনও লাভ নেই। ওর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।

রাতে আমরা যখন খেতে বসলাম তখন তুষারঝড় প্রায় থেমে গেছে।

.

সারারাত ভালো ঘুম হল না।

স্লিপিং ব্যাগে এপাশ-ওপাশ করে আর নানান দুঃস্বপ্ন দেখে রাত কাটল। ভোরবেলায় শেষ যে-স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভাঙল সেটা বেশ বিচিত্র।

একটা লেপার্ড সিল একটা অ্যাডেলি পেঙ্গুইনকে একেবারে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে নিরীহ প্রাণীটা বুকে ভর দিয়ে ডানা দিয়ে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে বরফের ওপর দিয়ে পিছলে পালাচ্ছে। আর বরফের ওপরে রেখে যাচ্ছে রক্তের দাগ। স্তিমিত সূর্যের আলো বরফের মসৃণ তল থেকে ঠিকরে পড়ছে। সেই আলোয় রক্তের দাগটাকে অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

তখনই আইডিয়াটা আমার মাথায় এল। ঘুমও ভেঙে গেল একইসঙ্গে।

ঠিক করলাম, বিষয়টা নিয়ে অদিতির সঙ্গে গোপনে কথা বলব। উকিলসাহেবের বুক থেকে যে-রক্তের দানাগুলো আমি তুলে নিয়েছিলাম সেগুলো এখনও আমার কাছে যত্ন করে রাখা আছে। এখনও আমার ধারণা ওগুলো পবনের রক্ত। ধারণা কেন, প্রায় সুনিশ্চিত বিশ্বাস, কারণ, উকিলসাহেবকে দেখে আমার আহত বলে মনে হয়নি।

অদিতি যদি ওই রক্ত পরীক্ষা করে আমাকে বলে যে, ওটা মানুষের রক্ত—পেঙ্গুইনের নয়, তা হলে আমি ধরে নেব পবন খুন হয়েছে, সুরেন্দ্রও। এরপর কার পালা কে জানে!

গ্যাসের উনুন জ্বেলে রোজই আমাদের জল তৈরি করে নিতে হয়। খাওয়ার জল, মুখ ধোওয়ার জল, বাসনমাজার জল—সবই পাওয়া যায় বরফ গলিয়ে। যেহেতু গ্যাস খরচ কম হওয়াটাই ভালো, সেহেতু জলের বরাদ্দ মাথাপিছু মাপা—এক কাপ কি বড়জোর দুকাপ। আর স্নানের তো কোনও প্রশ্নই নেই!

ঘুম থেকে উঠে বরাদ্দ জলে হাত-মুখ ধুয়ে চলে গেলাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে। বাকি চারজন তখন বড় প্লাস্টিকের কাপে করে কফি খাচ্ছে।

ওদের দেখামাত্রই প্রথম যে কাজটা আমার মন করে বসল সেটা হল আদমসুমারি। কাল রাতে আমরা পাঁচজন ছিলাম, আজ সকালেও পাঁচজন আছি তো!

স্যান্ডউইচ, আলুভাজা, কাজুবাদাম আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার সময় মনেই হল না বাড়ি থেকে বহু দূরে বরফের মহাদেশে বসে আছি।

রোহিত তখন সুজাতাকে আইসবার্গের গল্প বলছিল।

বিজ্ঞানী হিসেবে সুজাতার বহু তথ্য জানা থাকলেও মন দিয়ে শুনছিল রোহিতের কথা। এতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিটা অন্তত খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যাবে।

আইসবার্গের মাপের কথা বলতে গিয়ে রোহিত বলল, এক-একটা আইসবার্গ লম্বায় কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আর এর হাইট গড়ে কয়েক কিলোমিটার। প্রথম যখন বরফের স্তরটা নিজের ভারে আইস শেলফ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসে তখন এই ভাঙা টুকরোগুলোর চেহারা থাকে একেবারে টেবিলের মতো ফ্ল্যাট। ওরকম আইসবার্গ তো এখানে আসার সময় দেখেছ! তারপর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আইসবার্গগুলো ক্ষয়ে যায়, ওদের চেহারা পালটায়। ভেসে যাওয়ার পথে

এলোমেলো জলের ঝাপটায় ওদের গায়ে বিচিত্র সব শেপের গুহা তৈরি হয়। কখনও তৈরি হয় বরফের ছুঁচলো পিক, কখনও বা আর্চ—দেখে মনে হতে পারে ঠিক যেন কাচের তৈরি রাজপ্রাসাদ।

রোহিত একটু দম নেওয়ার জন্যে থামতেই সুজাতা বলল, কই, আমরা তো অত সুন্দর আইসবার্গ দেখিনি!

উত্তরে মুচকি হাসল রোহিত ও ওসব দেখার জন্যে ভাগ্য চাই, ভাগ্য! আমি এই এরিয়ার সমুদ্রে বহু ঘুরেছি কত সুন্দর সুন্দর চেহারার আইসবার্গ দেখেছি। দেখেছি আইসবার্গের ওপরটা ক্ষয়ে গর্ত হয়ে যাওয়ার পর তার ভেতরে বরফ গলে মিষ্টিজলের ছোট্ট পুকুর তৈরি হয়েছে। আর সেই পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে অ্যালবাট্রস—যাকে সিন্ধুসারস বলে।

এইসব দেখে আমার খুব সাধ হত আইসবার্গে চড়ে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে। এইভাবে বেড়াতে বেড়াতে একদিন হয়তো গোটা পৃথিবীটাই চক্কর মেরে আসতাম। ভাবো তো, কী থ্রিলিং!

অদিতি কফির মগে লম্বা চুমুক দিয়ে মন্তব্য করল, তদ্দিনে তোমার আইসবার্গ গলে জল হয়ে যেত।

রোহিত কফি শেষ করে হাতে-হাত ঘষল কয়েকবার, তারপর বলল, না, ম্যাডাম, বড় বড় আইসবার্গ সহজে গলে জল হয় না। পুরোপুরি গলে জল হতে ওগুলো প্রায় দু-বছর কি তার বেশি সময় নেয়। ভাবুন তো, ঈশ্বরের কী অদ্ভুত লীলা—নোনা সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মিষ্টি জলের পাহাড়! যেসব জায়গায় খাওয়ার জলের খুব অভাব সেখানে যদি কোনওভাবে এইসব পাহাড় পৌঁছে দেওয়া যেত। যেমন ধরুন, আরবদেশগুলোর মতো শুকনো জায়গায় যদি আন্টার্কটিকা থেকে আইসবার্গ কয়েকটা টাগবোট দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে কেমন মজা! সমুদ্রপথে এই ডিসট্যান্সটা হবে

প্রায় আটহাজার কিলোমিটার মতো, আর নিয়ে যেতে সময় লাগবে বড়জোর একবছর। যদি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আইসবার্গগুলোর ওপরটা পাতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে নেওয়া হয়, তা হলে বরফ গলবে অনেক কম। আর প্লাস্টিকের আড়ালে কিছুটা করে বরফ গলে তৈরি হয়ে যাবে মিঠে জলের হ্রদ। সেখান থেকে সরাসরি পাম্প করে মরুভূমির কোস্টাল এরিয়াতে দিব্যি জল পাঠানো যাবে।

তবে যা-ই বলো, এতে অনেক খরচ পড়ে যাবে। অদিতি বলল।

অদিতি ওর বিষয়ের বাইরেও অনেক খোঁজখবর রাখে। আইসবার্গ নিয়ে এত কথা আমারও জানা ছিল না। আমি শুধু জানি, পানীয়জলের অভাব মেটাতে আরবের দেশগুলোতে বিশবছর আগে একটা ডিস্যালিনেশন প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমে সমুদ্রের নোনাজল থেকে নুন বের করা। তারপর নুনবিহীন জলকে সমুদ্রতীরের কাছাকাছি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের কুলিং ওয়াটার হিসেবে ব্যবহার করা। এর পরের ধাপের কাজ ছিল সেই কুলিং ওয়াটার কে প্রসেস করে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তৈরি করা। তবে শেষ পর্যন্ত সেই প্রজেক্ট খুব একটা লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়নি।

রোহিত মাথা নেড়ে অদিতির কথায় সায় দিল হ্যাঁ, খরচ পড়বে বটে, তবে ইটস আ নভেল পসিবিলিটি। তারপর একটু সময় নিয়ে বলল, আরও একটা নভেল পসিবিলিটির কথা সায়েন্টিস্টরা ভেবেছে—আন্টার্কটিকাকে ন্যাচারাল কোল্ড স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না...।

ব্যাপারটা নিয়ে বিদেশি পত্রপত্রিকায় কয়েকটা লেখা আমার চোখে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছে, পৃথিবীর বাড়তি খাদ্য-শস্য যদি জাহাজে করে আন্টার্কটিকায় নিয়ে এসে সঞ্চয় করে রাখা যায়, তা হলে এর বিশুদ্ধ হিমশীতল পরিবেশে সেগুলো একটুও নষ্ট হবে না। তারপর, দরকার মতো, সেইসব খাদ্য-শস্য এখান থেকে নিয়ে গিয়ে খরচ করা যেতে পারে। এতে সারা পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের সমস্যা আর থাকবে না।

তবে এই কাজের পথে এখনও পর্যন্ত একটাই বাধা–খরচ।

চন্দেৰশ্বর চুপচাপ বসে রোহিতের কথা শুনছিল। ও কফি শেষ করে মুখে মশলাপাতি কিছু একটা পুরে দিয়ে জাবর কাটছিল। হঠাৎই জড়ানো গলায় বলল, সুনিয়ে কোশ্চেন জোড়ি, আইসবার্গ নিয়ে আমিও কুছু কুছু জানি।

ওর কথা বলার ধরনে অদিতি আর সুজাতা তো হেসে কুটিপাটি।

সুজাতা হেসে জিগ্যেস করল, তা কী সেই কুছু কুছু জানতে পারি?

আলবাত! তখন থেকে দেখছি তোমরা রোহিতের দিকে ধেয়ান দিয়ে বসে আছ...।

রোহিত বলল, চন্দ্রেশ্বর, তোমাকে ভাই আমি একটুও ঈর্ষা করি না।

ঈর্ষা? চন্দেৰশ্বর অবাক হয়ে রোহিতের দিকে তাকাল : ঈর্ষা মানে কী?

আমি কপাল চাপড়ে বললাম, ওঃ, আবার সেই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম।

অদিতি চন্দেৰশ্বরকে বলল, ওসব ছাড়ো–তোমার আইসবার্গের গল্প শোনাও।

চন্দেৰশ্বর হাসল। উৎসাহ পেয়ে জাবর কাটা থামিয়ে ওর কুছু কুছু শুরু করল।

টাইটানিকের নাম সবাই শুনেছ তো! লাক্সারি লাইনার টাইটানিক...।

সুজাতা ফস করে বলে উঠল : ও গল্প সবার জানা।

চন্দ্রেশ্বরের উৎসাহ দপ করে নিভে গেল। মুখে ফুটে উঠল বেজার ভাব। দুজন তরুণীর মনোযোগ পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়-হয় দেখে মরিয়া হয়ে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সুজাতার দিকে : বলো তো কী জানো?

সুজাতা হার-না-মানা ভঙ্গিতে বলল, আইসবার্গে ধাক্কা লেগে টাইটানিক জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজটা আমেরিকা যাচ্ছিল। ওটাই ছিল ফার্স্ট ভয়েজ।

চন্দেৰশ্বর অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, ব্যস? স্টোরি খতম? বলো তো, অ্যাক্সিডেন্টটা কবে হয়েছিল, কজন মারা গিয়েছিল?

আমি সুজাতাকে বললাম, তুমি বড় ডিসটার্ব করো, সুজাতা। চন্দেৰশ্বরের মুড এসে গেছে, ওকে বলতে দাও।

সুজাতা এক অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল। ধীরে-ধীরে বলল, আপনি বলছেন, তাই চুপ করে যাচ্ছি। আপনি আমার বস।

কেন জানি না, মনে হল, শেষ লাইনটা ও অন্যরকমভাবে বলল। আমার চোখ থেকে চোখ এতটুকুও সরাল না। আর কেউ সেটা লক্ষ করল কি না কে জানে!

টাইটানিকের গল্পটা বলার জন্যে অদিতি চন্দেৰশ্বরকে তাগাদা করল।

চন্দেৰশ্বর কয়েকবার জাবর কেটে বলতে শুরু করল।

ইয়ারটা ছিল নাইনটিন টুয়েলভ, ফোর্টিন্থ এপ্রিল। সেদিন রাতে নিউফাউন্ডল্যান্ডের কাছে একটা আইসবার্গের সঙ্গে টাইটানিকের কলিশন হয়। ওই অ্যাক্সিডেন্টে পরদিন ভোরবেলা টাইটানিক ডুবে যায়। তার সঙ্গে প্যাসেঞ্জার আর ক্রু মিলিয়ে মোট পনেরোশো তেরোজন মানুষও ডুবে মারা যায়। তারপর থেকে নর্থ আটলান্টিকের শিপিং লেনের আইসবার্গ ডেঞ্জার জোনগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল আইস প্যাট্রল চালু করা হয়। প্যাট্রল ভেসেল থেকে অন্যান্য জাহাজে রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে বিপজ্জনক আইসবার্গ আর প্যাক আইসের খবর জানানো হয়। তাতে টাইটানিকের মতো ট্র্যাজিক অ্যাক্সিডেন্টের পসিবিলিটি অনেক কমে গেছে।

রোহিত বলল, দাদা, টাইটানিককে কবছর আগে স্যালভেজ করা হয়েছে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ১৯৮৫ সাল থেকে স্যালভেশানের কাজ শুরু হয়েছিল। সে-বছর অ্যালভিন ব্যাথিস্ফিয়ার ব্যবহার করে টাইটানিকের বয়লারের কিছু অংশ উদ্ধার করা গিয়েছিল। এরপর ১৯৮৭-তে টাইটানিকের প্রায় দেড়শো জিনিস জল থেকে তোলা হয়েছিল। নাও, এখন বরফের গল্প ছেড়ে বডি তোলো বাইরে গিয়ে বরফ সরানোর কাজ করতে হবে। চলো, চলো।

খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে অদিতি বলল, আর দু-একদিনের মধ্যেই আমরা আন্টার্কটিকা ছেড়ে চলে যাব। তো স্মৃতি হিসেবে এখান থেকে বরফ ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই তাও আবার যাওয়ার পথে গলে জল হয়ে যাবে।

সুজাতা উৎসাহী খুকির মতো বলে উঠল, আর নিয়ে যাওয়া যেত পেঙ্গুইন। আমার দিদির ছেলেটা বারবার করে বলে দিয়েছে, মাসি, একটা বাচ্চা পেঙ্গুইন তোমাকে নিয়ে আসতেই হবে– কোনও কথা শুনব না। কিন্তু... সুজাতার মুখটা মনখারাপগোছের হয়ে গেল। বেজারভাবে বলল, কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই! পেঙ্গুইন আন্টার্কটিকার বাইরে সহজে বাঁচে না।

কেন? রোহিত জিগ্যেস করল।

এক নম্বর কারণ হল, ওরা ভীষণ ঠান্ডা ছাড়া থাকতে পারে না। আর দু-নম্বর হল, এই বিশুদ্ধ পরিবেশে থেকে ওরা এমন হ্যাঁবিচুয়েটেড হয়ে গেছে যে, ওদের রোগজীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, এই অঞ্চলের বাইরে গেলেই ওরা রোগজীবাণুর আক্রমণে মারা পড়ে। এককথায়, বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া প্র্যাকটিক্যালি ইমপসি। তাই ভাবছি কী নিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওই জলই নিয়ে যেতে হবে।

ক্যাম্প থেকে বেরোতে-বেরোতে চন্দেৰশ্বর বলল, এই জল! জল! করেই আমাদের মাথা জল হয়ে যাবে।

আমি হেসে বললাম, ঠিকই বলেছ সরকারের লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা এই অভিযানে এসেছি স্রেফ একটু জলের জন্যে।

সুজাতা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল।

বাইরে বেরিয়ে প্রথমে শুরু হল তুষারঝড়ের বরফ সরানোর কাজ। বেলচা, গাঁইতি, কোদাল–যা পারলাম কাজে লাগালাম। অতিরিক্ত পরিশ্রমে জ্যাকেটের ভেতরে জামা ঘেমে যেতে লাগল। তখন আমরা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে আগে জামা শুকিয়ে নিতে লাগলাম–নইলে ঘামে ভেজা জামা জমে শক্ত হয়ে যাবে।

আমার নাক দিয়ে সর্দি গড়িয়ে পড়ছিল। গ্লাভসের পিঠ দিয়ে নাক মুছতে গিয়ে টের পেলাম গোঁফের কাছটা জ্বালা করছে। কনকনে ঠান্ডায় হাতের আঙুল অসাড় হয়ে আসছিল। তখন ক্যাম্পে ঢুকে গ্লাভস খুলে হাতে হাত ঘষেছি। আঙুল বারবার মুঠো করে আর খুলে জমাট ভাবটা কাটিয়েছি।

প্রায় দু-ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনির পর ক্যাম্প, ড্রিল-হাউস, আর অদিতির তাঁবু বরফ সরিয়ে ঠিকঠাক করা হল। তখন আমি বললাম, এখন একমগ করে গরম-গরম চিকেন সুপ না হলে চলছে না। সুপ খেয়ে তারপর ড্রিল চালু করব।

সঙ্গে-সঙ্গে অদিতি বলল, আমি কিচেনে গিয়ে গ্যাস জ্বালছি, আপনি স্টোর থেকে সুপের ক্যান নিয়ে আসুন।

ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি। বলে আমি স্টোরের দিকে পা বাড়ালাম।

আমাদের স্টোর আর রান্নাঘরের দুটো করে দরজা : একটা বাইরের দিকে, আর-একটা ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে। রান্নাঘরের বাইরের দরজাটা বেশিরভাগ সময়েই বন্ধ থাকে—শুধু বাসনপত্র ধোওয়ার সময় খোলা হয়। তবে স্টোরের বাইরের দরজাটা আমরা ব্যবহার করি বেশি। এখানে চুরি-টুরির কোনও ভয় নেই বলে দরজাগুলো স্রেফ শেকল দিয়ে আটকানো থাকে।

বাইরের দরজার শেকল খুলে আমি স্টোরে ঢুকলাম।

বেশ বড় মাপের স্টোর রুম মালপত্রে বোঝাই। আমরা এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেলে পরের অভিযাত্রী দল এখানে আসবে। এখন আন্টার্কটিকার বেশিরভাগ ক্যাম্পই একাধিক টিম ব্যবহার করে গ্রীষ্মের টিম, আর শীতের টিম। তবে যে ক্যাম্পকে বাতিল করে দেওয়া হয় সেটা ভুতুড়ে বাড়ির মতো পড়ে থাকে—তুষারঝড়ের প্রবল ঝাপটার সঙ্গে মোকাবিলা করে যে-কদিন পারে টিকে থাকে। আমাদের ক্যাম্পে শীতের দল আসবে, তারপর আবার গ্রীষ্মের দল। আপাতত সেইরকমই ঠিক আছে।

সুইচ টিপে স্টোর রুমের আলো জ্বালোম।

একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে খাবারের ক্রেট, টিন আর প্যাকিং বক্স। প্রায় ঘরের চাল পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে—লোড করা ফুল পাঞ্জাব ট্রাক যেমন দেখতে হয়। আর তার ঠিক বিপরীতদিকে নানান যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট, ট্রান্সফর্মার, ট্রান্সমিটার, শাবল, গাঁইতি, আইস অ্যাক্স, সিনথিটিক দড়ি, তাঁবু, পোশাক-আশাক, তিনটে স্নোমোবাইল গাড়ি—আরও কত কী!

আমি খাবারের স্টোরের কাছে গেলাম। চিকেন স্যুপের কৌটোগুলো খুঁজতে লাগলাম।

হঠাৎই দেখি, নীচের দিকে অনেকগুলো বাক্স একটু অগোছালো এবং বিপজ্জনকভাবে বাইরে বেরিয়ে আছে। গতকালও এরকম অগোছালো ব্যাপারটা ছিল না। তা ছাড়া

খাবারের বাক্সগুলো একটু যেন অন্যরকমভাবে সাজানো।

মনে হল, ওগুলো ঠিক করে না সাজালে পড়ে গিয়ে ছত্রখান হয়ে যেতে পারে।

দলের প্রত্যেকেই জানে, আমি একটু খুঁতখুঁতে মানুষ সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসি। তাই ওরা সকলেই গুছিয়ে কাজ করাটা অভ্যেস করে নিয়েছে।

তা হলে এই ব্যাপারটা কেমন করে হল!

স্বভাব যায় না মলে!

তাই বাক্সগুলোর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওগুলো টেনেটুনে ঠিকঠাক করে সাজাতে চাইলাম।

আর ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

একগাদা টিন, ক্রেট আর প্যাকিং বক্স হুড়মুড় করে পড়তে লাগল আমার ঘাড়ে।

ভাগ্যিস নীচের বাক্সগুলোর টাল খেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি একপলক আগে টের পেয়েছিলাম। তাই সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি পাঁচ হাত দূরে কাঠের মেঝেতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি আঘাত এড়াতে পারলাম না। একটা ভারী ক্রেট ডান কাঁধের ওপরে এসে পড়ল। বেশ কয়েকটা টিনের বাক্স খসে পড়ল মাথায়। মাথার ওপরে একটা জায়গা ব্যথায় টনটন করতে লাগল, সেইসঙ্গে জ্বালাও টের পেলাম। বোধহয় মাথা ফেটে গেছে।

শব্দ শুনে অদিতি ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। ওর পেছন-পেছন এল চন্দ্রেশ্বর, রোহিত আর সুজাতা।

কী হয়েছে, সূর্যদা! সুজাতা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

রোহিত কী হল, দাদা? বলে ছুটে এল আমার কাছে। আমাকে হাত ধরে তুলল।

ততক্ষণে অদিতি আমার কাছে এসে বেশ দুশ্চিন্তার গলায় জানতে চাইল, কোথাও লাগেনি তো? দেখি…।

আমি মাথায় হাত দিয়ে যন্ত্রণায় উঃ করে উঠলাম।

চন্দেৰশ্বর আমার মাথার চুল সরিয়ে কাটা জায়গাটা দেখতে চাইল : লেট মি হ্যাভ আ লুক, বস।

ওর পাশে উদ্বিগ্ন মুখে সুজাতা : দেখি, সূর্যদা, কোথায় লেগেছে? ও আমার মাথার চুল সরিয়ে ক্ষতচিহ্নটা খুঁজতে লাগল।

শেষপর্যন্ত সুজাতা আর চন্দেৰশ্বর মিলে আমার প্রাথমিক চিকিৎসা করল। আমি হতভম্ব ভাবটা কাটাতে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম। তারপর ঠান্ডা মাথায় বুঝতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা ঠিক কী হল।

অদিতি বলল, আপনার একটা বিরাট ফাড়াকেটে গেছে! আর-একটু হলেই বিচ্ছিরিরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হত।

অ্যাক্সিডেন্ট? আমি অদিতির চোখে তাকালাম। আচ্ছা, মেয়েটা কি এতই বোকা! এখনও বুঝতে পারেনি?

এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়—আমাদের কাউকে খুন করার চেষ্টা। সেইজন্যেই খুনি ওরকম ফাঁদ পেতেছিল। নীচের দিকে খাবারদাবারের খালি টিন আর বাক্সগুলো রেখে তার ওপরে ভরতি ভারী বাক্সগুলো চাপিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে একটা মরণফাঁদ পেতেছিল সে।

কিন্তু আমাদের নজর এড়িয়ে এতগুলো বাক্স কি খুনির পক্ষে নাড়াচাড়া করা সম্ভব? তাই যদি হয় তা হলে খুনির গায়ে অনেক জোর থাকা দরকার, আর হাতে অনেক সময়।

মনের সন্দেহের কথা অদিতিকে বলতেই ও বলল, হতে পারে, সূর্যদা। কাল রাতে এই আড়াইটে-তিনটেনাগাদ আমি স্টোর রুম থেকে শব্দ পেয়েছিলাম। ভাবলাম, বোধহয় আমাদেরই কেউ স্টোর রুমে স্লিপিং ব্যাগের খোঁজে গেছে–তাই আর উঠে দেখিনি।

অদিতির কথায় রোহিত বলল যে, হ্যাঁ, ও-ও ওইরকম শব্দ শুনেছে, তবে তখন ও ঘড়ি দেখেনি বলে সময়টা ঠিক বলতে পারবে না।

কিন্তু ওরা আমাকে এসব কথা আগে বলেনি কেন কে জানে!

আমার আঘাত সেরকম গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু খুনির সাহস আর স্পর্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

চন্দেৰশ্বর আর রোহিত ক্রেট, টিন, আর বাক্সগুলোকে টেনে-টেনে আবার সাজিয়ে রাখতে লাগল। অদিতি আর সুজাতা রান্নাঘরের দিকে গেল চিকেন সুপ তৈরি করতে।

একটু পরে গরম-গরম চিকেন সুপ খেয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। স্টোর রুমের কাজ সেরে এসে রোহিত আমাকে বলল, দাদা, ড্রিল ডিউটিতে আমি যাচ্ছি।

আমি বললাম, এখন আমরা সবাই ড্রিল-হাউসে যাব। কারণ, আমার ধারণা, আজ দু একঘণ্টার মধ্যেই আমরা বরফ কেটে লেক এক্স-এর জলে পৌঁছে যাব।

রোহিত বলল, আমি আর চন্দেৰশ্বর গিয়ে মেশিনটা স্টার্ট করি আপনারা পরে আসুন।

অগত্যা রাজি হতেই হল।

রোহিত ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চন্দেৰশ্বর খইনি টিপতে টিপতে ওর পিছু নিল।

ওরা চলে যেতেই অদিতিকে আমি কাছে ডাকলাম। সুজাতা তখন বাসন-কোসন ধোওয়ার কাজে ব্যস্ত।

অদিতিকে রক্ত পরীক্ষার কথাটা জানালাম। বললাম, ব্যাপারটা যেন বাকি তিনজন কিছুতেই না জানতে পারে।

অদিতি ভেতরে-ভেতরে অবাক হলেও মুখে সেরকম কোনও ভাব প্রকাশ করল না। শুধু ঘাড় নেড়ে বলল, আজকেই করে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও আবার বলল, এখানে আর ভালো লাগছে না। এরকম সন্দেহ আর বিপদ মাথায় নিয়ে কখনও একসঙ্গে থাকা যায়!

আমি বললাম, বেশি নয়, আর একটা কি দুটো দিন..জলের স্যাম্পল হাতে পাওয়ামাত্রই আমরা দক্ষিণ গঙ্গোত্রীকে খবর পাঠাব।

কী আর করা যাবে ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অদিতি।

এমন সময় সুজাতা হাতের কাজ সেরে ঘরে এল। বলল, সূর্যদা, আমাদের এখানকার কাজ তো মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে, আজ বিকেলে তা হলে একটু বেড়াতে বেরোব?

আমি আর অদিতি হেসে ফেললাম।

আমি বললাম, এখানে কোথায় বেড়াতে বেরোবে?

কেন, স্নোমোবাইলে চড়ে ওই পেঙ্গুইন রুকারিটায় যাব। পেঙ্গুইনদের ছবি তুলব। আমার দিদির ছেলেটাকে সত্যি-পেঙ্গুইন না দিতে পারি, অন্তত পেঙ্গুইনের ফটোগ্রাফ তো দিতে পারব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন তো, সূর্যদা?

গত পাঁচমাসে পেঙ্গুইন রুকারিতে আমরা দুবার গেছি। কারণ, শুধু-শুধু স্নোমোবাইলের তেল পোড়ানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু এখন অভিযান বলতে গেলে প্রায় শেষ। ফলে এখন আর অত হিসেব করে চলার দরকার নেই। বেড়ানোর মুডে ওখানে একবার যাওয়া যেতেই পারে।

সুতরাং সুজাতাকে বললাম, হয়তো কাল-পরশুই আমরা এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাব। অতএব, অন্তত একবার বেড়াতে বেরোনোটা আমাদের পাওনা। তোমার কথাই রইল…তবে আজ নয়, কাল। কী, রাজি তো?

সুজাতা ছোট্ট মেয়ের মতন কঁকুনি দিয়ে ঘাড় নাড়ল। ও রাজি। ও কৃতজ্ঞতার চোখে আমার দিকে তাকাল।

সুজাতাকে বেশ স্বাভাবিক আর হাসিখুশি লাগছিল। বোধহয় অনেক চেষ্টার পর ভয়টাকে ও মন থেকে তাড়াতে পেরেছে। ওকে খুশি দেখে আমার ভালো লাগছিল।

ওকে বললাম, তুমি ড্রিল-হাউসে যাও…আমি আর অদিতি একটু পরে যাচ্ছি।

ও চলে যেতেই অদিতিকে নিয়ে আমার ঘরে এলাম।

ঘরের এককোণে অনেক স্যাম্প্ল ব্যাগ আর কনটেনার রাখা ছিল। তা থেকে একটা স্যা ব্যাগ তুলে নিলাম। ব্যাগটা আলোয় দিকে তুলে ধরে দেখলাম। রক্তের দানাগুলো চিকচিক করছে।

ব্যাগ থেকে দুটো দানা বের করে আর-একটা স্যাল ব্যাগে ভরলাম। সেটা অদিতিকে দিয়ে বললাম, তোমার টেস্ট করা হয়ে গেলে তুমি ওরিজিনাল স্যাম্পলের কয়েকটা স্লাইড আমাকে দেবে। এখানকার রিপোর্টের সঙ্গে ওগুলো আমাকে হেডকোয়ার্টারে জমা দিতে হবে।

অদিতি ঘাড় নেড়ে বলল, আজ বিকেলের মধ্যেই রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

এবার চলো, ড্রিল-হাউসে যাই।

ও স্যাম্পল ব্যাগটা ল্যাবে রেখে চট করে ফিরে এল, বলল, চলুন…।

ক্যাম্পের বাইরে বেরোনোমাত্রই আমরা একটা ধাক্কা খেলাম : ড্রিলের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু চাপা গরগর আওয়াজে জেনারেটর চলছে।

আমি আর অদিতি ড্রিল-হাউসের দিকে এগোচ্ছি, ঠিক তখনই চন্দেৰশ্বর আর সুজাতা ছুটে বেরিয়ে এল ড্রিল-হাউসের বাইরে। দু-হাত শূন্যে তুলে চন্দেৰশ্বর চেঁচিয়ে বলল, বস, উই হ্যাভ মেড ইট। হিপ হিপ হুররে!

আমি আর অদিতি প্রায় ছুটে গেলাম ওদের দিকে।

সুজাতা চিৎকার করে বলল, সূর্যদা, শেষপর্যন্ত আমরা জিতেছি। উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি। তারপর ছুটে এসে আমাকে বুকে জাপটে ধরল, আনন্দে কী একটা বলতে গেল, কিন্তু আবেগে কেঁদে ফেলল।

বুঝলাম, ড্রিল কেন থেমে গেছে। ক্যাম্পের ভেতরে আমি আনমনা হয়ে কথা বলছিলাম বলে বুঝতে পারিনি ড্রিলের শব্দ কখন থেমে গেছে।

আমি সুজাতার পিঠ চাপড়ে শাবাশ! বললাম। তারপর ওকে ধরে নিয়ে গেলাম ড্রিল হাউসে।

সেখানে রোহিত তখন একমনে কাজ করছে। আমাদের দেখেই ও বলল, পৃথিবীতে আমরাই প্রথম লেক এক্স-এর জল টাচ করলাম। আমরা ইতিহাসের পাতায় ঢুকে গেলাম।

অদিতি শুধু চাপা গলায় বলল, ইটস আনবিলিভে! ফ্যানট্যাটিক!

সুজাতা আমাকে ইশারায় কাছে ডাকল। ড্রিল করে তোলা স্যাগুলো উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখাল।

স্যাম্পল কনটেনারগুলো পরপর সাজিয়ে রাখা। তাতে বরফের পাশাপাশি রয়েছে হলদে কাদা-কাদা একটা পদার্থ বরফ, জল আর লুব্রিক্যান্টে মাখামাখি। আর তার পাশেই দুটো

কনটেনারে রয়েছে বাদামি রঙের ঘোলাটে জল—লেক এক্স-এর জল।

আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠে কনটেনারগুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়লাম। তারপর চোখ কপালে তুলে সুজাতাকে প্রশ্ন করলাম, রেপটাইল আর আইসওয়মগুলো কোথায় গেল?

আমার ঠাট্টাটা বুঝতে সুজাতার কয়েক সেকেন্ড দেরি হল। তারপর মুচকি হেসে মুখ নামিয়ে বলল, সরি, সূর্যদা!

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম : সুজাতা, এখন সরি-টরির সময় নয়। এখন শুধু আনন্দের সময়। এসো, হাতের কাজগুলো আগে সেরে নিই, তারপর সেলিব্রেট করা যাবে।

আমরা সবাই মিলে কাজে মেতে গেলাম। লেক এক্স-এর জলের স্যাগুলো সিল্ড কনটেনারে করে নিয়ে যেতে হবে হেডকোয়ার্টারে। যাবতীয় অ্যানালিসিস সেখানেই হবে—এইরকমই নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে।

গানের সুর ভাজতে-ভজতে যখন আমরা কাজ করছি তখনও বুঝতে পারিনি পরদিনই আমাদের বেহালার সুর বাজাতে হবে।

.

০৪.

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু গা এলিয়ে দিলাম। যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছিলাম। সেটা মোটামুটি শেষ হওয়াতে বেশ নিশ্চিন্ত লাগছিল। এখন বেশ হালকা মনে বুদ্ধিটাকে খেলানো যায়। তাই স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েকের উধাও হওয়ার কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম স্টোর রুমের সেই দুর্ঘটনার কথা।

এইসব ব্যাপার নিয়ে রিপোর্টে ঠিক কী লিখব সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সকালে ড্রিল-হাউসে গোছগাছের কাজে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। তাই লাঞ্চের জন্যে আমরা ক্যাম্পে চলে এসেছি। খাওয়াদাওয়ার পর আমি বিশ্রাম নিলেও বাকিরা বিশ্রাম নেয়নি।

চন্দেৰশ্বর আর রোহিত আবার ড্রিল-হাউসে গেছে বাকি কাজ গুছিয়ে শেষ করার জন্যে। আমি যখন বলেছি, এত টায়ার্ড হয়ে পড়েছ...একটু রেস্ট নিলে পারতে। তাতে কিছু এনার্জি তৈরি হত। তার উত্তরে রোহিত মুচকি হেসে বলেছে, দাদা, এনার্জি আমাদের সঙ্গেই আছে। বলে ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে চ্যাপটা বোতলটা বের করে আমাকে দেখিয়েছে। তারপর ওরা দুজনে হাসাহাসি করতে করতে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেছে।

ড্রিল-হাউসে যে কাজ বাকি আছে তাতে এ-বেলায় শেষ হবে না। কাল সকালটাও লেগে যাবে। দেখা যাক, কত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটানো যায়!

চন্দেৰশ্বর আর রোহিত বেরিয়ে যাওয়ার পর সুজাতা রান্নাঘর গুছিয়ে ফেলার কাজে লেগে পড়েছিল। আর অদিতি ল্যাবে ব্যস্ত ছিল—বোধহয় ব্লাড টেস্ট করছিল।

আমি একা-একা আনমনা চিন্তায় ডুবে গেলাম।

এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা। কৃষ্ণার কথা, টুসকির কথা।

আন্টার্কটিকার সঙ্গে কলকাতার সময়ের তফাত মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মতো। এখন তা হলে কী করছে টুসকি? পড়ছে, না খেলছে? শেষ ওদের টেলেক্স করেছি দিনসাতেক আগে। যে-মেসেজটা টেলেক্স করতে হবে সেটা আমরা রেডিয়ো কমিউনিকেশানের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিই বেস স্টেশনে। সেখান থেকে ওরা স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়ে টেলেক্স মেসেজ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

কৃষ্ণা আর টুসকির কথা ভাবতে ভাবতে হোমসিক হয়ে পড়লাম। সবকিছু ভুলে গিয়ে মনে হতে লাগল কতক্ষণে বাড়ি ফিরে গিয়ে টুসকিকে জাপটে ধরে চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দেব। আমার ছোট্ট মেয়েটা আইসক্রিম-পাগল। যখন আন্টার্কটিকার জন্যে বাড়ি ছেড়ে রওনা হই তখন ও বারবার বলছিল, বাবার কী মজা! ওখানকার বরফের ওপরে রোজ সিরাপ ঢেলে দিয়ে দিব্যি মজা করে খেতে পারবে। শত চেষ্টাতেও ওকে বোঝাতে পারিনি যে, আন্টার্কটিকার এসে কারও আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করবে না।

টুসকির কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে-মনে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম : ধবধবে সাদা বরফের ওপরে কে যেন লাল রঙের রোজ সিরাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি সেই সিরাপে জিভ ছোঁয়াতেই মিষ্টির বদলে নোনতা স্বাদ পেলাম। সিরাপটা কখন যেন বদলে গেছে রক্তে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরকাতরতা উবে গেল। ভেসে গেল কৃষ্ণা আর টুসকির চিন্তা। রূঢ় বাস্তব ধাক্কা মারল আমাকে।

তন্দ্রার মধ্যেই আবছাভাবে মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকে ডাকছে। এখন বুঝলাম, অদিতি। ও আমার কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে কয়েকটা কাচের স্লাইড আর একটা স্যা ব্যাগ।

সূর্যদা, আমার টেস্ট করা হয়ে গেছে। স্যাটা মানুষের রক্ত। হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ আর হোয়াইট ব্লাড করপাস-এর শেপ দেখে বোঝা গেছে।

কথাটা বলতে গিয়ে অদিতির গলা কেঁপে গেল। ও জ্যাকেটের হাতা দিয়ে চোখ মুছল। বোধহয় পবনের খুনের ব্যাপারটা ওকে আবার ধাক্কা দিল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। ওর হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে গুছিয়ে রেখে দিলাম। মনের মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করছিল। বুঝলাম, সন্দেহ বড় বিষম বস্তু।

আমি অদিতির মুখের দিকে তাকালাম। নাঃ, ওকে আর বাড়তি ঝুঁকির মধ্যে ফেলাটা ঠিক হবে না।

ওকে বললাম, আমি ড্রিল-হাউসে যাচ্ছি..সুজাতার কাজ হয়ে গেলে ওকে নিয়ে ড্রিল হাউসে এসো। হাতের সব কাজ সেরে নিই। তারপর কাল হালকা মেজাজে পেঙ্গুইন রুকারিতে বেড়াতে যাব। আর কাল রাতে রেডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে ফাইনাল প্যাকিং শুরু করব। ও. কে.?

ও. কে., সূর্যদা। বলে অদিতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আমার দলের এই মেয়েটা এককথায় সম্পদ। সবসময়েই ও যে-কোনও কাজের জন্যে তৈরি। এরকম বিপজ্জনক অভিযানে এরকম বেপরোয়া মেয়ে খুব জরুরি।

.

অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে শুরু থেকে ঘটনাগুলো ভাবছিলাম।

প্রথমে পবন শর্মা খুন হল। উধাও হল ওর মৃতদেহ।

এরপর উধাও হল সুরেন্দ্র নায়েক।

ব্যাপারটা অনেকটা পবন শর্মার মতোই–শুধু রক্তের দাগটুকু যা পাওয়া যায়নি।

পবন আর সুরেন্দ্র–ওরা দুজনেই উধাও হয়েছে ড্রিল-হাউস থেকে।

পবনের ধারণা ছিল, ড্রিলিং শ্যা বেয়ে কোনও প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ লেক এক্স থেকে উঠে আসতে পরে। অথচ সুরেন্দ্র কিন্তু মোটেই ভিতু ছিল না।

দুরকমের দুজন মানুষ ড্রিল-হাউস থেকে উধাও হয়ে গেল।

এখন তো আমরা লেক এক্স-এর জলে পৌঁছে গেছি! কোনও সরীসৃপের সন্ধান তো আমরা পাইনি! আসলে পবন আর সুরেন্দ্রকে সরীসৃপের মতো কোনও মানুষ খুন করেছে। আমাদেরই কেউ একজন।

তারপর আজ সকালের ঘটনা কিংবা বলা ভালো দুর্ঘটনা।

স্টোর রুমের ওই অ্যাক্সিডেন্টটার জন্যে আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না। কিন্তু আমাকে খতম করাই কি খুনির উদ্দেশ্য ছিল? কারণ, আমার বদলে অন্য কেউ সেখানে যেতেই পারত। তবে যেত না শুধু খুনি–সে ফাঁদ পেতেছে আমাদের জন্যে। আমাদের সবাইকে খতম করে সে কি একা বেঁচে থাকতে চায়?

আনমনা ভাবতে ভাবতে হাত চলে গিয়েছিল মাথায়। চোট পাওয়া জায়গাটায় এখনও বেশ ব্যথা আছে।

ঠিক তখনই কে যেন আমার ঘরে ঢুকল।

আমাদের ঘরে দরজা একটা আছে বটে, তবে সেটা এতই পলকা যে, থাকা-না-থাকা প্রায় সমান। সেইজন্যেই আমি বরাবর দরজা ভেজিয়ে ঘুমোই–সেটা দলের সবাই জানে। এতদিন দলের অন্য অনেকেই আমার মতো দরজা ভেজিয়ে ঘুমোত, কিন্তু পবন আর সুরেন্দ্রর ব্যাপারটার পর থেকে অদিতি আর সুজাতা দরজায় ছিটকিনি এঁটে শোয়।

কেবিনের জানলা পরদায় ঢাকা ছিল বলে ভেতরটা বেশ অন্ধকার। ফলে কাউকে দেখতে না পেলেও দরজায় সূক্ষ্ম আওয়াজে আমার ছনম্বর ইন্দ্রিয় বলে উঠল, কেবিনে কেউ ঢুকে পড়েছে।

খুনি কি এতবড় ঝুঁকি নেবে?

ক্যাম্পের ভেতরেই সে কি খুন করতে চায় আমাকে?

কিন্তু খুনি তো জানে না, হাতের নাগালের মধ্যে একটা আইস অ্যাক্স রেখে আমি ঘুমোই। স্লিপিং ব্যাগের জিপার খানিকটা খুলে ডানহাতটা বের করলাম। অতি সন্তর্পণে আমার হাত সরীসৃপের মতো হেঁটে এগিয়ে গেল আইস অ্যাক্সটার দিকে।

ওটার হাতলটা চেপে ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকারের মানুষটা চাপা ফিসফিসে গলায় ডেকে উঠল, সূর্যদা–

কে? গলাটা কার? সে কি জিপার খোলার সামান্য খসখস শব্দটা শুনতে পেয়েছে?

আমি কোনও জবাব দিলাম না। শুধু আইস অ্যাক্সের হাতলের ওপরে আমার মুঠো আরও শক্ত করলাম।

চন্দ্রেশ্বর, রোহিত, অদিতি, কিংবা সুজাতা–যে-ই হোক, তাকে আমি চমকে দেব।

সূর্যদা…। আবার চাপা ডাকটা ভেসে এল।

সে কি জানতে চাইছে, আমি জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি? যদি ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে কাজ শেষ করতে কোনও অসুবিধে হবে না। আর যদি জেগে থাকি, তা হলে…।

সূর্যদা, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

এবার বোঝা গেল, মেয়ের গলা। হয় সুজাতা, নয়তো অদিতি।

আমি সাড়া দিলাম : কে?

ও, আপনি জেগে আছেন? আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না…ভীষণ ভয় করছে।

সুজাতাকে এবার চেনা গেল। এই সময়ে ও আমার কেবিনে এসেছে কেন? নেহাত ভয় পাচ্ছে বলে?

আইস অ্যাক্সের ওপরে আমার হাত শিথিল হল। স্লিপিং ব্যাগের জিপারটা আরও খানিকটা খুলে শরীরটাকে সহজ করে নিলাম। তারপর উঠে বসলাম।

সুজাতা আমার খুব কাছে চলে এল। চাপা গলায় ইনিয়েবিনিয়ে বলল, আমার ভীষণ ভয় করছে, সূর্যদা। এভাবে আমি আর পারছি না।

আমি সুজাতার উষ্ণতা টের পেলাম। আলতো করে বললাম, ভয় পাওয়ার কী আছে! আর তো দু-একটা দিন!

সেইজন্যেই তো আমি আর পারছি না। অন্ধকারে সুজাতার হাত আমার শরীর খুঁজে পেল : আর কদিন পরেই তো আমাদের ফিরে যেতে হবে। আবার সেই একঘেয়ে জীবন।

সুজাতার গল্পটা আমি জানি—ওর মুখেই শুনেছি। পড়াশোনা শেষ করার বছর দুয়েকের মধ্যে ও একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। ম্যানেজমেন্টের ঝকঝকে ছাত্র। চোখের সামনে বিরাট স্বপ্ন। ওদের সাধ ছিল, আমেরিকায় গিয়ে সেল করবে। ছেলেটি আমেরিকা রওনা হওয়ার দিনসাতক আগে সুজাতার মা হার্ট অ্যাটাকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে ওকে সি-অফ করতে সুজাতা এয়ারপোর্টেও যেতে পারেনি।

তারপর কী যে হল! বিদেশে ও চলে যাওয়ার পর দুটো চিঠি পেয়েছিল সুজাতা। উত্তরও দিয়েছিল। সেই উত্তরের আর কোনও উত্তর আসেনি। ব্যাপারটা এমন আচমকা শেষ হয়ে গেল যেন কোনও গল্পের বইয়ের শেষ পৃষ্ঠাগুলো কেউ একটানে ছিঁড়ে নিয়েছে।

এইভাবেই শেষ হয়েছে সুজাতার অসম্পূর্ণ গল্পটা।

একঘেয়ে জীবন কেন বলছ? আন্টার্কটিকাতেই বরং আমার একঘেয়ে লাগছে। আমি তো মাঝে-মাঝেই হোমসিক হয়ে পড়ছি।

আমার কথায় সুজাতা বোধহয় হাসল। সেই ধরনেরই একটা চাপা শব্দ পেলাম যেন। তারপর তেতো গলায় বলল, :, হোম থাকলে তবে না হোমসিক! আমার এখানেই ভালো। লাগছে, সূর্যদা।

হতাশ হওয়া ভালো নয়, সুজাতা। হতাশা একটা অসুখ। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করে ওর পিঠ চাপড়ে চিলাম : তুমি যাও–ঘরে গিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করো...।

ও আমার হাতটা চেপে ধরল। তারপর চাপা গলায় প্রশ্ন করল, আপনার মন বলে কিছু নেই?

আছে। তবে সেই মনটা পড়ে আছে কলকাতায়। আর এখানে? এখানে আমি বরফের দেশের প্রাণী ছাড়া আর কিছু নই।

আপনি এত অন্যরকম কেন বলতে পারেন?

তুমিই বলো তুমি তো মেরিন বায়োলজিস্ট...।

এবার আমাকে আঁকড়ে ধরল সুজাতা। আমার কাঁধের কাছে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, আমি যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, সূর্যদা।

আমি ওকে বাধা দিলাম না। কৃষ্ণা আর টুসকির বর্ম আমাকে আন্টার্কটিকায় বরফ করে দিয়েছে।

ওকে শুধু বললাম, তুমি খুব লাকি, সুজাতা, যে তুমি কষ্ট পেতে জানো। অনেক মানুষ আছে যারা কষ্টও টের পায় না। ভাবো তো, তাদের কী কষ্ট!

যেমন আপনি...। কথা বলতে বলতে আমার হাতের আঙুলে পাগলের মতো মোচড় দিতে লাগল ও।

আমি অন্ধকারে হেসে ফেললাম। বুক ঠেলে একটা বড় শ্বাস বেরিয়ে এল। সুজাতা আমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে না। ভালোবাসার দুর্গে ফাটল ধরাতে গেলে তার চেয়েও তীব্র ভালোবাসা দরকার হয়। কৃষ্ণা আর টুসকিকে হারানো কি এতই সহজ। সুজাতা এটা বোঝে না?

মেয়েটার জন্যে কষ্ট হল আমার। বুঝতে পারছিলাম, মনে-মনে ও খুব একা। আর এটাও বুঝতে পারছিলাম, ও আর অদিতি একই ধাতুতে গড়া নয়।

সুজাতা আমার গায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলঃ সূর্যদা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে...।

আমি ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, সুজাতা, তোমাকে একটা কথা বলি...।

কী কথা? শ্বাস টানতে টানতে জিগ্যেস করল ও।

ভগবানের দোকানে পাঁচফোড়নের প্যাকেট বিক্রি হয়–তাতে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, যন্ত্রণা, ভালোবাসা, কষ্ট সব মেশানো থাকে। কেউ চাইলেই শুধু সুখ, আনন্দ আর ভালোবাসার প্যাকেট কিনতে পারে না। আসলে ওই পাঁচফোড়নের প্যাকেটটাই জীবন। তোমার কি ধারণা আমার কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই? আছে। কারও বাইরেটা দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না। তুমি মন খারাপ কোরো না। দেখো, দুদিন পরেই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। তুমি যাও...ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো...দেখবে ঘুম এসে যাবে।

সুজাতা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। আমি ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ওর উষ্ণতা টের পাচ্ছিলাম খানিকটা। ওর মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিলাম ধীরে-ধীরে।

সুজাতা মেয়ে খারাপ নয়। অবশ্য আমরা কেউই খারাপ নই। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে একজন ভয়ঙ্কর খুনি লুকিয়ে রয়েছে।

আমি ডাকলাম : সুজাতা।

উ। ও আমাকে আঁকড়ে ধরল।

তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

সুজাতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল পলকে : সন্দেহ?

হ্যাঁ। ঠান্ডা গলায় বললাম আমি, আমাদের মধ্যে কাকে তোমার খুনি বলে মনে হয়?

ভালো করে দেখতে না পেলেও অনুমান করতে পারলাম, সুজাতা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলল, সূর্যদা, সেরকমভাবে কাউকে সন্দেহ হয় না। তবে নিশ্চয়ই আমরা যারা বাকি রয়েছি...তাদের মধ্যেই কেউ। এই ধরুন, আপনি... আমি...চন্দেৰশ্বর...আমরা পাঁচজন...। ।

আচ্ছা সুজাতা, এমন কিছু কি তুমি দেখেছ, যাতে তোমার সন্দেহ হয়েছে, খটকা লেগেছে...?

না, সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না...। ইতস্তত করে ও বলল।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, অকওয়ার্ড কোনও ইনসিডেন্ট–ছোট হোক, বড় হোক–কিছু মনে পড়ছে না?

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমি কী একটা বলতে যাব, তখনই সুজাতা বলে উঠল, আপনি বলছেন বলে মনে হচ্ছে...আজ খুব সকালে আমি টয়লেটে যাব বলে উঠেছিলাম। তখন দেখি রোহিত স্টোর রুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলল, খিদে পাচ্ছে বলে খাবার খুঁজতে স্টোরে ঢুকেছিল। কিন্তু ওর হাতে খাবারের কোনও ক্যান-ট্যান কিছু ছিল না।

হয়তো পকেটে ছিল…।

তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু তারপরই স্টোর রুমে আপনার ওই অ্যাক্সিডেন্ট…ওটা কি আপনি জেনুইন অ্যাক্সিডেন্ট বলে মনে করেন, সূর্যদা?

কে বলেছে সুজাতার বুদ্ধি নেই!

তুমি ঠিকই গেস করেছ। ওটা বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট নয়। কেউ ওটা সাজিয়েছে।

ওটা রোহিতের ডিজাইন হতে পারে?

সুজাতা এত নির্লিপ্তভাবে কথাটা বলল যে, আমার অবাক লাগল।

রোহিত আইস এক্সপার্ট। বরফের হালচাল ও সকলের চেয়ে ভালো জানে। তাহলে কি ও-ই সরিয়ে দিয়েছে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েককে–তারপর বরফের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে ওদের ডেডবডি?

কিন্তু দুটো ডেডবডি লুকোনোর জন্যে আইস এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই–আইস অ্যাক্স দিয়ে বরফ খুঁড়ে ফেললেই হল। অবশ্য তাতে সময় লাগবে–তা ছাড়া আন্টার্কটিকার বরফও বেশ শক্ত। সুতরাং, দু-দুটো মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার জন্যে বরফ খুঁড়তে হলে সেটা আমাদের চোখের আড়ালে করাটা রীতিমতো কঠিন।

সেই কঠিন কাজটাই কি রোহিত সেরে ফেলেছে।

কিন্তু তাতেও যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

রোহিত কিংবা আর যে-ই খুনি হোক, সে কি খুন করবে বলে আগে থেকেই কোনও গর্ত খুঁড়ে রাখতে পারে?

প্রথম কথা, বরফ মাটি নয় যে, গর্ত খুঁড়ে রাখলে সেটা সহজে বুজে যাবে না। এখানে প্রায়ই ঝড় উঠছে...সে-ঝড়ে গর্ত নিশ্চিতভাবে বুজে যাবে। তা ছাড়া, আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি গর্ত খুঁড়ে রাখলে সেটা আর-সবার চোখে পড়ে যাবে।

নাঃ, অঙ্ক মিলছে না।

আন্টার্কটিকায় ডেডবডি উধাও করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। অথচ সেটাই হয়েছে। ডেডবডি দুটো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

চিন্তাগুলো মনের ভেতরে বয়ে গেল ঝড়ের মতো।

তখনই টের পেলাম, সুজাতার হাত আমার হাত চেপে ধরেছে।

সুর্যদা, ব্যাপারটা রোহিতের ডিজাইন হতে পারে? চাপা গলায় আবার জিগ্যেস করল সুজাতা।

আমি আলতো করে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। অঙ্কের উত্তর এখনও মেলেনি, সুজাতা। খবরটা দিয়ে তুমি ভালো করলে।

সুজাতা আমার হাতটা আঁকড়ে ধরল আবার। বলল, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব, সূর্যদা?

আমি এতটুকু বিচলিত হলাম না। যে-কোনও রিকোয়েস্টের স্পষ্ট উত্তর দিতে আমি ভালোবাসি। তাই বললাম, বলো, কী রিকোয়েস্ট?

সুজাতা এরপর যা করল তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

অন্ধকারে ও একটা আংটি গুঁজে দিল আমার হাতে। বলল, সূর্যদা, এই আংটিটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমাকে একজন দিয়েছিল আমেরিকা যাওয়ার আগে। সেই

ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেলেও আংটিটা ও যখন দিয়েছিল তখন আমাদের ভালোবাসা নষ্ট হয়নি। তখন রোজ ভোর হত ভালোবাসা দিয়ে, রাত নামত ভালোবাসা নিয়ে। কী দারুণ সময় ছিল! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুজাতা : এই আংটিটা আপনি রাখুন, সূর্যদা। এটা আপনি নিলে আমার ভীষণ ভালো লাগবে।

সুজাতা হঠাৎই কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আপনাকে যখনই দেখি..কেন জানি না, ওর কথা মনে পড়ে যায়। আপনি এটা রাখুন, সূর্যদা, প্লিজ...।

কাঁদতে কাঁদতেই আমাকে একরকম জাপটে ধরল সুজাতা। আংটি ধরা হাতের তালুটা জোর করে মুঠো করে দিল। তারপর কাঁদতেই থাকল।

শুনতে পেলাম, কান্নার গোঙানির মধ্যেই ও বারবার বলছে, আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না...আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না...।

আমি চুপচাপ সুজাতাকে অনুভব করতে লাগলাম। ওর পিঠে হাত রাখলাম।

জীবন এইরকমই কখনও নিষ্ঠুর, কখনও সুন্দর।

অনেকক্ষণ পর শান্ত হল সুজাতা। ওর আঙুল আমার আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমি একসময় বললাম, সুজাতা, এবারে যাও—তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল অনেক কাজ আছে।

উত্তরে ও বলল, না সূর্যদা—আমি এখানে শোব...।

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই সুজাতা আমার কাছ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ছোট্ট খুকির বায়না করার মতো বলল, আমি আপনার কাছে ঘুমোব—।

তোমার যা খুশি…।

বহু পরীক্ষা আমি পার হয়ে এসেছি…সুজাতা নতুন করে আর কী পরীক্ষা নেবে।

তবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি যা ভাবছিলাম সেটা জানতে পারলে সুজাতা খুব কষ্ট পেত।

আমি ভাবছিলাম, আমাকে চুপিসাড়ে খুন করতে এসে আমি জেগে আছি দেখে সুজাতা এরকম ন্যাকা-ন্যাকা অভিনয় করছে না তো!

.

০৫.

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর শুধু কাজ আর কাজ।

সম্ভবত আজই আন্টার্কটিকায় আমাদের শেষ কাজের দিন। হয়তো রাত থেকেই শুরু করে দেব তল্পিতল্পা বাঁধার কাজ।

তাই চটপট সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিলাম।

চন্দেৰশ্বর আর রোহিত ড্রিল-হাউসে ডিউটি করতে গেল। সুজাতা আর অদিতি পড়ল মেরিন বায়োলজি আর মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে।

আমি ক্যাম্পে বসে কাল রাতের কথা ভাবতে লাগলাম।

কাল রাতে সুজাতা যদি সত্যি-সত্যি অভিনয় করে থাকে তা হলে মানতেই হবে ও খুব বড় অভিনেত্রী। ওর নাম সুজাতার বদলে সুচিত্রা হতে পারত।

আমি ভাবছিলাম আর একটা অসম্ভব ধাঁধার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

খুনি ভুল করবেই। আমাদের খুনিও করেছে। কিন্তু কী সেই ভুল?

ভাবতে-ভাবতে থইথই জলে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পর মনে হল, এবার বাইরে বেরোই। চারিদিকে ঠিকঠাক নজর রাখি, যাতে নাটকের শেষ দৃশ্যে আর কোনও ছন্দপতন না হয়।

তাই বাইরের পোশাক গায়ে চাপিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে বেরোলাম।

চারিদিকে শুধু বরফ অর বরফ। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। যেন এই চাদরের নীচে কোনও পবিত্র মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। তবে মৃতদেহ তো একটি নয়–অনেক। তার মধ্যে পবন শর্মা আর সুরেন্দ্র নায়েকও রয়েছে।

সামান্য হাওয়া বইছিল। হয়তো নতুন কোনও তুষারঝড়ের খবর পাঠাচ্ছিল। আমি ড্রিল হাউসের দিকে কয়েক পা এগোতেই চোখ পড়ল টয়লেটের দিকে। তিনটে পেঙ্গুইন টয়লেটের কাছে ঘোরাফেরা করছে।

আমার একটু অবাক লাগল। ওখানে তো খাবার-দাবার কিছু নেই যে, পাখিগুলো এভাবে ঘোরাফেরা করবে!

পেঙ্গুইনকে দেখে কখনওই আমার পাখি বলতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন বলছেন তখন আর উপায় কী! আদিম যুগে সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের ফলে এসেছিল পাখি। পেঙ্গুইন সেই আদিম পাখিদের একটি। আন্টার্কটিকা অঞ্চলে হিসেব মতো ছরকমের পেঙ্গুইন পাওয়া যায়–তার মধ্যে এম্পারার পেঙ্গুইন আর অ্যাডেলি পেঙ্গুইন হল মূল মহাদেশের বাসিন্দা। বাকিরা সব কুমেরু বৃত্তের বাইরে আন্টার্কটিকার আশপাশের দ্বীপগুলোতে থাকে। আন্টার্কটিকা মহাদেশের দুরকম পেঙ্গুইনের মধ্যে আবার অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি।

পেঙ্গুইনরা জলে পাকা সাঁতারু। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। সাঁতারের গতি ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। এরা জলের তলায় একশো ফুট গভীর পর্যন্ত চলে যেতে পারে, আর জলে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ডুবসাঁতার দিতে পারে। ডানা দিয়ে এরা সাঁতার কাটে, আর সাঁতারের দিক পালটায় পায়ের পাতা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে যখন এরা জল থেকে লাফিয়ে ডাঙায় ওঠে। রকেটের মতো জল ভেদ করে বেরিয়ে সটান বরফের উঁচু ডাঙায় দাঁড়িয়ে পড়ে– ঠিক যেন কলের খেলনা। সমুদ্রের চিংড়ি এদের প্রধান খাদ্য বলে এরা আন্টার্কটিকায় উপকূল ঘেঁষে আস্তানা গাড়ে। কৃত্রিম এই রুকারিটা আন্টার্কটিকায় একমাত্র ব্যতিক্রম।

কৌতূহল আমাকে টয়লেটের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আগামীকাল যদি আমাদের এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে হয়, তা হলে পবন বা সুরেন্দ্রর মৃতদেহ খোঁজার সুযোগ বলতে শুধু আজই। তাই পায়ে-পায়ে পৌঁছে গেলাম টয়লেটের কাছে।

পরশু রাতের তুষারঝড়ে টয়লেটের চেহারা পালটে গেছে। বরফের পাঁচিলগুলো বেঢপ আকারের হয়ে গেছে। ভেতরে বরফ ঢুকে কেমন ঢিবির মতন হয়ে গেছে। ঠিক কোনদিকটায় যেন রক্তের দাগগুলো দেখেছিলাম? নাঃ, এখন সেখানে আর কোনও চিহ্নই নেই। সব বরফে চাপা পড়ে গেছে।

এমন সময় শুনলাম কে যেন আমাকে চেঁচিয়ে ডাকছে।

তাড়াতাড়ি টয়লেটের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ড্রিল-হাউসের কাছ থেকে দুজন আকাশে হাত তুলে নাড়ছে আর আমাকে ডাকছে, সূর্যদা, জলদি আসুন, কুইক!

ওদের হাইট দেখে মনে হল, সুজাতা আর অদিতি। কিন্তু ওরা এরকম উদভ্রান্তের মতো আমাকে ডাকছে কেন?

তাড়াতাড়ি ওদের কাছে গেলাম।

চন্দেৰশ্বর আর রোহিতকে পাওয়া যাচ্ছে না! অদিতি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল।

ড্রিল-হাউসে ঢুকে দেখি ওরা কেউ নেই! সুজাতা প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

আবার ড্রিল-হাউস! আবার দুজন উধাও! এ কী অলৌকিক কাণ্ড ঘটছে বারবার! কোথায় গেল চন্দ্রেশ্বর আর রোহিত? ওরা তো ছেলেমানুষ নয় যে, হঠাৎ করে হারিয়ে যাবে!

আর হারিয়ে যাবেটাই-বা কোথায়?

বরফের ওপরে যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় পা ফেলতে চেষ্টা করলাম। উধাও হওয়ার এই সিঁড়িভাঙা অঙ্ক যেভাবে হোক আমাকে সমাধান করতেই হবে।

অদিতি আর আবেগজর্জর সুজাতাকে সঙ্গে করে ড্রিল-হাউসে ঢুকলাম। ড্রিল-হাউসটাকে এই মুহূর্তে কোনও অপদেবতার অভিশপ্ত কফিন বলে মনে হচ্ছিল।

না, সুজাতা আর অদিতি ভুল বলেনি। ড্রিল-হাউসে কেউ নেই!

চন্দেৰশ্বর আর রোহিত যদি আমাদের না জানিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়ে থাকে, তা হলে মানতেই হবে সে বড় নিষ্ঠুর রসিকতা।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওরা এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়েছে যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না। অদিতি আর সুজাতারও নিশ্চয়ই সেরকমই মনে হচ্ছিল।

আমরা সবাই চোখ-ঢাকা গগল্স তুলে দিয়েছিলাম মাথার ওপরে। লক্ষ করলাম, অদিতির চোয়াল শক্ত, আর সুজাতা থরথর করে কাঁপছে। ওদের মুখে খসখসে রুক্ষ ভাঁজ।

এ যেন সেই হারাধনের ছেলেদের কাহিনি। হারিয়ে গিয়েছিল দুজন–এখন দুই দুগুণে চারজন!

এসো, চটপট রুমটা সার্চ করে ফেলি। নির্দেশ দিতে গিয়ে আমার গলাটা কেমন কেঁপে গেল।

আমার কথায় অদিতি আর সুজাতা সংবিৎ ফিরে পেল যেন। তারপর যন্ত্রের মতো কাজ শুরু করল।

আমি ওদের দেখছিলাম। গত তিন-চার দিনে কত বদলে গেছে ওরা!

অথচ এখানে আসার সময় থেকেই ওরা দুজন উৎসাহ উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটত। সবসময় আন্টার্কটিকা নিয়ে নানান প্রশ্ন করে আমাকে আর রোহিতকে নাজেহাল করে দিত।

রোহিত একদিন কপট বিরক্তি নিয়ে আমাকে বলল, দাদা, এই দুজনকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। ওরা আমাকে এত কোশ্চেন করে যে, আপনি তো জানেন, আমি ওদের নাম দিয়েছি কোশ্চেন জোড়ি। এখন আমাকে জিগ্যেস করছে, আন্টার্কটিকায় লেডি রিসার্চার হিসেবে ওদের পজিশন কোথায়।

আমি তখন হেসে বললাম, ওদের পজিশন অনেক পেছনে।

কেন, অনেক পেছনে কেন! সুজাতা উদ্ধত ছাত্রীর মতো প্রশ্ন করেছিল আমাকে।

আমি নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ইতিহাসকে কি আর বদলানো যায়! শোনো... ১৯৪৭ এ এক মার্কিন অভিযাত্রী দল এখানে এসেছিল। সেই দলে দুজন মহিলা ছিল : এডিথ রন আর জেনি ডারলিংটন। আন্টার্কটিকায় মহিলা হিসেবে ওরাই প্রথম। তারপর, প্রায় ষাট বছর ধরে, বহু মহিলা এই বরফের মহাদেশে পা রেখেছে। ১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারি আর্জেন্টিনার এক মহিলা অভিযাত্রী একটি শিশুর জন্ম দেন এই মহাদেশে।

শিশুটির নাম রাখা হয় এমিলিও মার্কোস পালমা। আর শুধু ভারতের মহিলা অভিযাত্রীদের হিসেবে ধরলে অদিতি আর সুজাতার পজিশন...আচ্ছা, রোহিত, ওদের মধ্যে কে আগে জাহাজ থেকে নেমে আন্টার্কটিকায় বরফে পা দিয়েছিল বলো তো?

রোহিত চোখ সরু করে চিন্তার ভান করতে শুরু করল।

সুজাতা তড়িঘড়ি বলে উঠল, আমি আগে নেমেছি। অদিতিদি পরে নেমেছে...।

অদিতি হাত নেড়ে ওকে বাধা দিয়ে বলল, মোটেই না, আমি আগে নেমেছিলাম। তুই তো ছোট...তাই তোর মনে নেই...আগে-পরে গুলিয়ে ফেলেছিস...।

আমি তখন মধ্যস্থতা করতে চেয়ে বলেছি, থামো! থামো! ঝগড়া করে লাভ নেই। তোমরা দুজনে যুগ্মবিজয়ী হয়েছ। তোমাদের পজিশন টুয়েলথ–শুধু ইন্ডিয়ান লেডি রিসার্চার ধরলে...।

সবই মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের ঘটনা!

অথচ আজ, এখন? উচ্ছল টগবগে মেয়ে দুটো কী ভয়ঙ্কর মলিন হয়ে গেছে! যে-কোনও মুহূর্তে সাপ দেখতে পারে এই আতঙ্ক নিয়ে ওরা ড্রিল-হাউস সার্চ করছে।

এসব কথা ভাবছিলাম আর ড্রিল-হাউসের মেঝেটা খুব খুঁটিয়ে নজর করছিলাম। বুটের ডগা দিয়ে মেঝের বরফ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দেখছিলাম কোনও কিছু পাওয়া যায় কি না। আসলে এইভাবে দু-দুটো জোয়ান মানুষের হুট করে উধাও হওয়ার ব্যাপারটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

হঠাৎই ঠক করে একটা হালকা শব্দ হল।

কী এটা! বরফের ওপরে ঝুঁকে পড়লাম আমি। কী যেন একটা চকচক করছে!

তাড়াতাড়ি পা দিয়ে বরফ খুঁড়তে লাগলাম। তারপর ঝুঁকে পড়ে কোমরে বাঁধা আইস অ্যাক্স খুলে নিলাম।

দশ সেকেন্ডের মধ্যেই আইস অ্যাক্সের কাজ শেষ। বরফ খুঁড়ে জিনিসটা বের করলাম বাইরে।

রোহিতের সেই এনার্জির বোতল।

বোতলটা তুলে নিয়ে আঁকাতেই বুঝলাম, তার ভেতরে এনার্জি এখনও রয়েছে।

বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল আমার। এই বোতল ছেড়ে রোহিত তো কোথাও যাওয়ার ছেলে নয়!

খারাপ কিছু যে একটা ঘটে গেছে তা নিয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না।

চোখ তুলে দেখি অদিতি তখন ড্রিলের ফ্রেমের গায়ে লাগানো মই বেয়ে ওপরে উঠছে। আর সুজাতা ড্রিল আর দেওয়ালের মাঝখানটায় ঝুঁকে পড়ে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

চট করে বোতলটা তুলে নিয়ে আমি জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। বোতলটা আমি সবার চোখের আড়ালে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

অদিতি বোধহয় মইয়ের ওপর থেকে আমাকে লক্ষ করে থাকবে। ও চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, কিছু পেলেন, সূর্যদা?

আইস অ্যাক্স কোমরে গুঁজে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, না, সেরকম কিছু না।

কিন্তু অদিতির মুখ দেখে মনে হল একটা সন্দেহের ছায়া সেখানে খেলা করছে।

ওপরে তন্নতন্ন তল্লাশি চালিয়ে অদিতি নেমে এল। সুজাতাও এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

আমি ভাবতে লাগলাম, দুজনের মধ্যে কে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই হাসি পেয়ে গেল আমার। ঠিক একই কথা নিশ্চয়ই সুজাতা আর অদিতিও ভাবছে।

বাইরে হাওয়ার তেজ বাড়ছিল। শোঁ-শোঁ শব্দ কানে আসছে এবার।

এখন কী করবেন? অদিতি জিগ্যেস করল।

ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে একটু ভাবি। তারপর বেস স্টেশনে খবর দেব। সম্ভব হলে দু চার ঘণ্টার মধ্যেই ওরা প্লেন পাঠিয়ে দিক। খুনির সঙ্গে আর আমি পাশা খেলতে চাই না। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে।

আমি ড্রিল-হাউসের দরজার দিকে পা বাড়ালাম। সঙ্গে-সঙ্গে সুজাতা ছুটে চলে এল আমার কাছে। আমার হাত চেপে ধরে বলল, আমি আপনার সঙ্গে থাকব।

আমি আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, থাকো না, কে বারণ করেছে।

আমাদের পেছন-পেছন অদিতিও চলে এল ড্রিল-হাউসের বাইরে।

নেহাত অভ্যেসবশেই আমরা এপাশ-ওপাশ তাকালাম। না, কেউ কোত্থাও নেই। তারপর এগোলাম ক্যাম্পের দিকে।

ক্যাম্পে ঢোকার সময় ওদের বললাম, আমি একা কিছুক্ষণ ল্যাবে কাজ করতে চাই। ওরা বরং ততক্ষণ নিজেদের কোনও কাজ থাকলে সেরে নিক।

অদিতি জ্যাকেটের বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আমি তা হলে একটু আমার টেন্টে যাই। কয়েকটা টেস্ট আর রিডিং নেওয়া বাকি আছে।

সুজাতা প্রায় আঁতকে উঠলঃ আমি তা হলে কোথায় যাব? আমি একা-একা থাকতে পারব না। আমি আপনার সঙ্গে থাকব, সূর্যদা।

তুই আমার সঙ্গে চল– অদিতি প্রস্তাব দিল : তা হলে আমাকে একটু হেল্প করতে পারবি।

আমি বললাম, তুমি অদিতির সঙ্গেই যাও, সুজাতা। একা-একা ওর কাজের অসুবিধে হবে।

আসলে এখন আমার একটু একা থাকা দরকার।

সুজাতা ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল। একপলক কী ভেবে নিয়ে অদিতিকে বলল, তাই চলো।

ওরা দুজন রওনা হয়ে গেল অদিতির তাঁবুর দিকে।

আমি রোহিতের বোতলটা পকেট থেকে বের করলাম। ছিপি খুলে বোতলটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকলাম।

নাঃ, অস্বাভাবিক কোনও গন্ধ নাকে আসছে না।

তখন বোতল থেকে কয়েক ফোঁটা তরল ঢেলে নিলাম ছিপিতে এবং তার রং দেখেই অবাক হয়ে গেলাম। রোহিতের বোতলের তরলটা উজ্জ্বল কমলা রঙের। আমাদের ড্রিল বিটটাকে লুব্রিকেট করার জন্যে একটা ক্যাডমিয়াম কম্পাউন্ড আমরা ব্যবহার করেছি। মনে হচ্ছে, সেই কম্পাউন্ডটা কেউ রোহিতের ব্র্যান্ডির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

ওই ক্যাডমিয়াম কম্পাউন্ডটা মারাত্মক বিষাক্ত কেমিক্যাল। সেটা রোহিতের বোতলে কে মেশাল?

মনে হয়, এই বোতল থেকে রোহিত আর চন্দ্রেশ্বর কয়েক সেঁক করে খেয়েছে। আর খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বুঝেছে, না খেলেই ভালো হত। তারপর ওদের সব এনার্জি খতম হয়ে গেছে। অথবা, বিষ খেয়ে কাবু হয়ে পড়ার পর খুনি এসে বাকি কাজটুকু শেষ করেছে।

সুতরাং, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রোহিতের বোতল থেকে একটু স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করতে শুরু করলাম। যদি ক্যাডমিয়ামের ট্রেস পাই, তা হলে বুঝব আমার সন্দেহ সত্যি।

কুমেরু অভিযানে এসে আমাদের নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিজের বিষয় ছাড়াও অন্য বিষয়ে কাজ করতে হয়েছে। অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে গিয়ে অনেক জিনিস শিখে ফেলেছি আমি। সুরেন্দ্র বেঁচে থাকলে এই অ্যালিসিসটা ও-ই করত। তারপর বহু খুঁটিনাটি তথ্য আমাকে দিত। কিন্তু সেরকম জ্ঞান বা দক্ষতা আমার নেই। তাই শুধু ক্যাডমিয়ামের ট্রেস খুঁজব। যদি পাই...।

পেলাম।

পেয়েই নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছিল। আমার দলের সাথীরা একজন-একজন করে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর আমি গ্রুপ লিডার হয়ে নির্বিকারভাবে সব দেখে যাচ্ছি–কিচ্ছু করতে পারছি না!

মনের কোণে সন্দেহ যে একটা উঁকি দিচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সন্দেহ তো আর প্রমাণ নয়! তা ছাড়া আমার সন্দেহ যদি ভুল হয় তা হলে বিপদ আরও বাড়বে। আবার অদিতি আর সুজাতাও হয়তো ওদের মতো করে কাউকে সন্দেহ করছে। কে জানে, ওরাও হয়তো প্রমাণ খুঁজছে।

ভাবলাম, ওদের ডেকে নিই। তারপর আলোচনা করে বেস স্টেশনে রেডিয়ো মেসেজ পাঠাব।

এই কথা ভেবে পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অদিতির তাবু পর্যন্ত হেঁটে যাব, না কি ওদের ওয়াকিটকি দিয়ে ডেকে পাঠাব? অদিতি কি ওয়াকিটকি সঙ্গে নিয়ে ওখানে গেছে?

ঠিক তখনই ইঞ্জিনের শব্দ শুনলাম।

আমাদের ক্যাম্পে বা ড্রিল-হাউসে আলো জ্বালানোর জন্যে ইঞ্জিন-জেনারেটর সেট চলছিল। সেই আওয়াজে নতুন আওয়াজটা চাপা পড়ে যেতেই পারত। পড়েনি যে, তার কারণ ইঞ্জিন জেনারেটর সেটের শব্দটা আমাদের কানে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজের মতো হয়ে পুরোপুরি সয়ে গেছে। সেইজন্যেই এই বাড়তি আওয়াজটা আমার কানে ধরা পড়ল।

আমি স্টোরের দিকে হাঁটা দিলাম। কারণ, আওয়াজটা আমার সেদিক থেকেই এসেছে।

আমি স্টোরের বাইরের দরজার কাছে পৌঁছনোর আগেই একটা স্নোমোবাইল নিয়ে অদিতি বেরিয়ে এল। অদিতি যে, সেটা বুঝলাম ওর জ্যাকেটের রং দেখে। এমনিতে ও সুজাতার চেয়ে অনেক লম্বা, কিন্তু স্নোমোবাইলের ড্রাইভিং সিটে বসে থাকায় ওর উচ্চতা বোঝা যাচ্ছিল না।

আমি অবাক হয়ে ওকে জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার? মোমোবাইল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

অদিতি কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে ইতস্তত করে বলল, ইয়ে...মানে...ওই পেঙ্গুইন রুকারিতে বেড়াতে যাচ্ছি। সুজাতা যেতে চাইছে...।

সুজাতা কোথায়?

আ-আমার টেন্টে। ও বলল স্নোমোবাইল নিয়ে আসতে।

সুজাতা একথা বলল। আমি অবাক হয়ে গেলাম : যে ভয়ে একমুহূর্তও একা থাকতে চাইছে না সে তোমাকে স্নোমোবাইল আনার জন্যে ছেড়ে দিল—তোমার সঙ্গে এল না!

না, মানে…ও বলল…। অদিতি একটা উত্তর তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। আর তখনই জিনিসটা আমার নজরে পড়ল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এখন খেয়াল করলাম।

অদিতির জ্যাকেটে রক্তের ছিটে।

সুজাতাকে তুমি কী করেছ? বলেই আমি ওর ওপরে বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমি নড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অদিতি স্নোমোবাইল চালিয়ে দিল। গাড়িটার ধাক্কায় আমি পড়ে গেলাম। কমলা রঙের গাড়িটা ছিটকে গেল বরফের ওপরে। গর্জন করে এগিয়ে চলল অদিতির তাঁবুর দিকে।

আমি কোনওরকমে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলাম অদিতির তাঁবু লক্ষ করে।

খানিকটা এগোনোর পরই দেখি একটা দেহ ধরাধরি করে এনে রাখা হল স্নোমোবাইলে।

কিন্তু অদিতি তো একা নয়! ওর সঙ্গে আর-একজন কে?

যদি ধরে নিই ওরা দুজনে সুজাতার ডেড বডি স্নোমোবাইলে এনে রাখল, তা হলে অদিতির সঙ্গী কে?

আর যদি এমন হয় যে, অদিতি আর সুজাতা অন্য কারও মৃতদেহ—রোহিত, চন্দ্রেশ্বর, বা আর কারও—স্নোমোবাইলে তুলল, তা হলে সুজাতাকেই অদিতির কুকাজের সঙ্গী বলে মানতে হয়।

কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে অদিতির জ্যাকেটে রক্তের ব্যাখ্যাটা তো পাওয়া যাচ্ছে না!

আমার সব অঙ্ক গুলিয়ে যেতে লাগল।

আমি আর দেরি করলাম না। তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলাম ক্যাম্পের কাছে। স্টোরের বাইরের দরজাটা হাট করে খোলা ছিল। চটপট স্টোরে ঢুকে একটা স্নোমোবাইল স্টার্ট করলাম।

ঠান্ডায় এই গাড়িগুলোর স্টার্ট নিতে কোনও সমস্যা হয় না। জাপানের হিয়োমোটো কর্পোরেশন-এর স্নোমোবাইলের বিশেষত্বই এই সাবজিরো এনভায়রনমেন্টে উষ্ণ দেশের সাধারণ গাড়ির মতোই আচরণ করে। আর এদের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও কম। তা ছাড়া বরফের ওপর চলার সময় ফ্রিকশনাল ফোর্স খুব কম বলে এই গাড়ির মোটিভ পাওয়ারও তেমন বেশি প্রয়োজন হয় না।

বাইরে এসে স্নোমোবাইল চালিয়ে দিলাম অদিতির তাবু লক্ষ করে। দেখি ওদের গাড়িটা তবু ছাড়িয়ে তখন অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে।

আন্টার্কটিকায় গাড়িতে চড়ে কোনও গাড়িকে অনুসরণ করার কাজটা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, পলাতক গাড়িটা বরফে তার স্পষ্ট চলার দাগ রেখে যায়। তাই বরফের ঢালের ওঠা নামায় কখনও কখনও অদিতির গাড়িটা হারিয়ে গেলেও আমি পথ হারাইনি।

স্নোমোবাইলে ব্রেক নেই। অ্যাকসিলারেটরে চাপের হেরফের করে গতি কম-বেশি করতে হয়, এবং দরকার হলে গাড়ি থামানোও যেতে পারে। আর গাড়ির দুটো গিয়ারকে প্রয়োজনমতো সুইচ টিপে বদলানো যায়। বরফ যদি মোটামুটি মসৃণ হয় তা হলে স্নোমোবাইলের গতি ঘণ্টায় তিরিশ কি পঁয়তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

এখন গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা প্রায় পঁচিশ কিলোমিটারের দাগ ছুঁই-ছুঁই। এবড়োখেবড়ো পথের জন্যে চলার সময়ে সামান্য ঝাঁকুনি দিচ্ছে। কিন্তু সামনের একটা ঢালের কাছে পৌঁছেই গাড়ির গতি কমিয়ে একেবারে দশে নিয়ে আসতে হল। কারণ, সামনের ঢালে সাগি অনেক বেশি।

আন্টার্কটিকায় যখন ঝোড়ো হাওয়া বয় তখন ভারী বাতাসের দুরন্ত গতির জন্যে বরফের ওপরে গভীর আঁচড় পড়ে যায়। ভিজে বালির ওপরে আঙুল টানলে যেরকম গর্ত হয় অনেকটা সেই ধরনের নকশা কাটা হয়ে যায় বরফের গায়ে। এরকম পাশাপাশি দুটো লম্বাটে গর্তের মাঝে থাকে বরফের আল। এ ধরনের গর্তকেই বলে সাস্ত্রুগি। সাগির ওপর দিয়ে স্নোমোবাইল চালানো খুব ঝকমারি। তাই আমাকে গতিবেগ কমাতে হয়েছে। অবশ্য গতিবেগ কমিয়েছে অদিতিও।

অনেকটা সাসক্রুগি–অঞ্চল পেরোনোর পর বাটির মতো ঢালু একটা জায়গায় চলে এলাম। এতদিনের দিকনির্ণয়ের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছিলাম, অদিতি স্নোমোবাইল নিয়ে পেঙ্গুইন রুকারির দিকেই চলেছে।

কিন্তু কেন? শেষ পর্যন্ত কোথায় যেতে চায় ও?

সেটা বোঝা গেল খানিক পরেই। কারণ, পেঙ্গুইন রুকারির খুব কাছে গিয়ে থামল অদিতির গাড়ি।

অবশ্য গাড়ি না থামিয়ে উপায় ছিল না।

এতক্ষণ মাথার ওপরে গাঢ় নীল আকাশ ছিল, ছিল স্তিমিত হলুদ সূর্য, আর তুলোর স্তূপের মতো কয়েক গণ্ডা ধবধবে মেঘ। এখন সাদা মেঘে সূর্য ঢেকে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ চরাচরে হোয়াইট আউট হয়ে গেছে। আন্টার্কটিকায় হোয়াইট আউট হল ব্ল্যাক আউটের ঠিক উলটো। অর্থাৎ, চারপাশ অন্ধকার কিংবা কালোর বদলে সাদাটে হয়ে যায়। এখন মেঘে ঢাকা সূর্যের আলো ঘষা কাচের মতো ঘোলাটে হয়ে গেছে। ফলে কোথাও কোনও ছায়া না পড়ায় সাদা বরফে কোনও উঁচু-নীচু জায়গা কিংবা সাগি মোটেই আর ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় গাড়ি চালানো খুব মুশকিল।

হয়তো সেইজন্যেই স্নোমোবাইল থামিয়েছে অদিতি। তারপর ওরা নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

অদিতির গাড়ির কাছ থেকে বরফের ঢালটা আরও নীচে নেমে গিয়ে মিশে গেছে কৃত্রিম হ্রদের জলে। সেখানে অসংখ্য অ্যাডেলি পেঙ্গুইন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া, অদিতির গাড়ি থামতেই গোটা পাঁচ-ছয় কৌতূহলী পেঙ্গুইন এসে ওদের প্রায় ঘিরে ধরল।

ওদের কাছে গিয়ে স্নোমোবাইল থামালাম আমি। নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অদিতি শক্ত গলায় বলে উঠল, আইস অ্যাক্সটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিন, সূর্যদা।

আমি সময় নিতে চাইলাম। ওর সঙ্গের পুরুষমানুষটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলাম সে কে। কারণ, চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। মাথা টুপিতে ঢাকা, চোখে ঠুলির মতো জম্পেশ গগল্স, গায়ে হাড় কাঁপানো শীতের জ্যাকেট, পায়ে ভারী জুতো। শরীরের খোলা জায়গা বলতে শুধু দু-গালের দুটো ত্রিভুজ, নাক, আর গোঁফের নীচে ঠোঁটের রেখা।

অদিতিকে সাহায্য করতে নতুন কেউ কি এসেছে আমাদের ক্যাম্পে?

অসম্ভব! আমাদের চোখ এড়িয়ে নতুন কোনও লোক ক্যাম্পে আসতেই পারে না।

অদিতি আবার বলল, আইস অ্যাক্সটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিন।

ওর গলাটা চারপাশের বরফের চেয়েও ঠান্ডা শোনাল।

ওদের কথা শুনে অনুমানে বুঝলাম, ওদের কাছে পিস্তলজাতীয় কোনও অস্ত্র নেই। থাকলে নির্ঘাত সেটা আমাকে দেখাত। তা ছাড়া, আন্টার্কটিকাতে লুকিয়ে পিস্তল-টিস্তল আনা মুশকিল। তাই আইস অ্যাক্সটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে ডানহাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলাম। ভাবটা এমন, ছুঁড়ে দিতেও পারি, আবার না-ও দিতে পারি।

সূর্যদা, কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছেন! নকল অনুনয়ের সুরে জঙ্গি মেয়েটা বলল, কেন বুঝতে পারছেন না, এটা বইয়ের লাস্ট চ্যাপটার লাস্ট চ্যাপটারে আপনার আর কিছু করার নেই...মরা ছাড়া...।

অদিতি, এখনও বলছি তুমি ভুল করছ। আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম ও এখনও থামার সময় আছে।

খিলখিল করে হাসল অদিতি-অনেকক্ষণ হাসল। তারপর বড়-বড় শ্বাস নিয়ে বলল, থামার জন্যে এতগুলো মৃতদেহ ডিঙিয়ে আমরা এতটা পথ আসিনি। লেক এক্স-এর জলের অ্যানালিসিসের যাবতীয় খবর শুধু আমরা দুজন বিজ্ঞানের দুনিয়াকে জানাতে চাই। রিসার্চ পেপার যা-কিছু পাবলিশ করব সব আমাদের দুজনের নামে। আর যদি কপালে নোবেল-টোবেল জুটে যায় তা হলেও ভাগাভাগি করব আমরা দুজন। জানেন তো, খ্যাতি বেশি ভাগ হয়ে গেলে তার আর গুরুত্ব থাকে না। তাই দু-ভাগের বেশি করতে আমার মন চায়নি। অর্ধেক আমি, আর বাকি অর্ধেক ও। নো থার্ড পারসন। লাইক দ্য আইডিয়া? নাউ গেট রিড অফ দ্য ব্লাডি আইস অ্যাক্স, উইল য়ু?

ওর সঙ্গের লোকটা কে? ওর সঙ্গের লোকটা কে হতে পারে?

সূর্যদা, বাচ্চা ছেলের মতো জেদ করবেন না। আমরা দুজন, আপনি একা–য়ু ডোন্ট হ্যাভ আ ড্যাম চান্স। তাই ভদ্রভাবে মরার চেষ্টা করুন–বরফে কবর দেওয়ার আগে আপনার বডিটা নক্কা-ছক্কা হোক সেটা নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না! সো ট্রাই টু ডাই ডিসেন্টলি।

সুজাতাকে তুমি খুন করেছ?

হ্যাঁ, করেছি–তা ছাড়া আর উপায় কী! হাসল অদিতিঃ এখন ওর বডিটাকে এখানে কবর দেব। আর আপনাকে জ্যান্ত টেনে আনব বলে ক্যাম্পে খতম করিনি। ডেডবডি বয়ে

আনার ঝামেলা তো আপনি জানেন! এখন সুবিধে হল, আপনি নিজেই কবরখানায় চলে এসেছেন…নিন, এবার আইস অ্যাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিন!

এইবার ওর সঙ্গী একটা বড় ছুরি বের করে নিল স্নোমোবাইলের ভেতর থেকে। মেঘলা আলোয় ছুরির ফলাটা কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব। মনে পড়ে গেল, গত পরশুই আমি অদিতির সামনে স্পর্ধা দেখিয়ে বলেছি, .আমি একা দুজনের চেয়েও একটু বেশি। এই কথাটা আমি অফিশিয়ালি সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই…। এখন সেটা প্রমাণ করার সময় এসে গেছে। কিন্তু রহস্যটা তো এখনও আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি। থিয়োরি একটা খাড়া করেছি বটে, কিন্তু তার জায়গায়-জায়গায় এখনও কিছু কিছু ফাঁক থেকে গেছে। সেটা জানতে হলে অদিতির শাগরেদের পরিচয়টা আগে জানা দরকার।

তাই বললাম, যদি আইস অ্যাক্সটা না ফেলি?

একথা বলমাত্র যা ঘটে গেল তার জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না।

অদিতিদের আশেপাশে বেশ কয়েকটা পেঙ্গুইন হাঁকডাক করতে-করতে ঘোরাফেরা করছিল। আচমকা তারই একটির গলা লক্ষ করে ছুরি চালাল লোকটা। আর চোখের পলকে পেঙ্গুইনটার মাথা মাটিতে। বরফে রক্তারক্তি। রক্ত ছিটকে লাগল হতভাগ্য পেঙ্গুইনটার পাশে দাঁড়ানো এক নিরীহ জাতভাইয়ের বুকে। পেঙ্গুইনগুলো ডাকাডাকি বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। যেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শোকে ওরা নীরবতা পালন করছে। আর এই ধরনের মৃত্যুর সঙ্গে পাখিগুলো আদৌ পরিচিত নয় বলে খানিকটা যেন হতভম্ব হয়ে গেছে।

যেখানে সুন্দর তোমাকে আদর করে ঘিরে রাখে সেখানে হঠাৎই অসুন্দর থাবা বসালে তুমি আঘাত পাও সবচেয়ে বেশি, তাই না?

এই পাখিটার করুণ মৃত্যু আমাকে পাথর করে দিল। আইস অ্যাক্সটা অজান্তেই খসে পড়ল আমার হাত থেকে। আর একইসঙ্গে মনে পড়ে গেল উকিলসাহেবের কথা।

আমার মাথার মধ্যে যেন হাজার ওয়াটের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলে উঠল। সমস্ত হিসেব মিলে যেতে লাগল সহজ অঙ্কের মতো।

আমি পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম, পবন! এ তুমি কী করলে! তুমি পাগল হয়ে গেছ। য়ু হ্যাভ গন রেভিং ম্যাড, ম্যান।

দাঁত বের করে হাসল পবন শর্মা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, যাক, ফাইনালি আপনি চিনতে পারলেন তা হলে! চিফ, সরি ফর দ্য মিসচিফ কিন্তু আইস অ্যাক্সটা ফেলতে আপনি এত দেরি করলেন কেন? আপনাকে ফোর্স করার এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। অপারেশান লেক এক্স এর শুরু থেকেই অদিতি ছক কষছিল। শি ওয়ান্টেড টু বি রিয়েল ফেমাস। বুদ্ধি সবই ওর– আমি শুধু ওর প্ল্যানমতো কাজ করে গেছি। দ্য হোল প্ল্যান ওয়াজ সো থ্রিলিং!

তা হলে ঠিক এইরকম করে শুরুতেই একটা পেঙ্গুইনকে খুন করেছে পবন শর্মা। সেই রক্ত ছিটকে লেগেছে উকিলসাহেবের বুকে। আমি সেটাকে মানুষের রক্ত ভেবেছি। অদিতি সেই রক্ত পরীক্ষা করে আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে বলেছে, হ্যাঁ, ওটা মানুষেরই রক্ত।

কিন্তু বন্ধ ড্রিল-হাউস থেকে পবন শর্মা বাইরে বেরোল কেমন করে?

সে-কথা জিগ্যেস করতেই আবার হাসল পবন। ওর ডানহাতে ধরা ছুরিটা অলসভাবে ঝুলছে। হতভাগ্য পেঙ্গুইনটার রক্ত জমাট বেঁধে গেছে বরফের ওপরে। টের পাচ্ছি, হাওয়ার জোর ক্রমশ বাড়ছে।

চিফ, আপনার বোধহয় খেয়াল আছে, ড্রিল-হাউসের কাঠের তক্তাগুলো বাইরে থেকে আটকানো ছিল। তারই একটা খুলে আমি আলগা করে রেখেছিলাম। ঘটনার দিন ড্রিলটাকে অটোমেটিক মোডে চালিয়ে রেখে ভেতর থেকে চাপ দিয়ে তক্তাটা খুলে ফেলি।

তার আগে অবশ্য তক্তাগুলোর জোড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছিলাম যে, বাইরেটা শুনশান আছে কি না। ব্যস, কাম ফতে। বাইরে বেরিয়ে তক্তাটাকে আবার ঠুকে জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছি। ড্রিল হাউসের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম আগেই। সো দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্য ক্লোজড রুম প্রবলেম। আপকা ইউনিক বন্ধ করে কা মামলা। ইট ওয়াজ আ নাইস টাচ, ওয়ান্ট ইট? দরাজ গলায় হা-হা করে হেসে উঠল পবন শর্মা। আমাকে বোকা ভাবতে ওর বেশ ভালো লাগছিল।

পেঙ্গুইনটার মৃতদেহ ঘিরে তখনও চার-পাঁচটা পেঙ্গুইন ঘোরাফেরা করছিল। মাঝে-মাঝেই মৃতদেহের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে কাছ থেকে নজর করে ওরা বুঝতে চাইছিল ওদের ভাইটি নড়াচড়া করছে না কেন।

শনশনে ঠান্ডা হাওয়া আমার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো দুই শত্রুর দিকে তাকিয়ে আমি শীত ভুলে যাচ্ছিলাম।

অদিতিকে আমার অপছন্দ হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু পবনকে দেখে গা ঘিনঘিন করছিল। যেন থালায় বেড়ে দেওয়া ভাতের ওপরে একতাল সাদাটে পোকা কিলবিল করছে। ওদের গায়ের লালা চকচক করছে, মিশে যাচ্ছে ভাতের সঙ্গে। এবং সেই ভাতের গ্রাস কেউ তুলে দিতে চাইছে আমার মুখে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, গত পরশু সকালে সুরেন্দ্র নায়েককে ড্রিল-হাউসে পাঠানোর পর অদিতি কেন স্টার্ট-আপে ওকে সাহায্য করার ছুতোয় যেচে ড্রিল-হাউসে যেতে চেয়েছিল। সেখানে ও আর পবন মিলে, বলতে গেলে আমাদের নাকের ডগায়, সুরেন্দ্রকে খুন করেছে। তারপর আমাদের বোকা বানাতে অদিতি ড্রিল-হাউস ছেড়ে চলে এসেছে। আর অদিতি চলে আসার পর পবন ড্রিল স্টার্ট করে দিয়েছে। সেই শব্দ পেয়ে বাইরে থেকে আমরা ভেবেছি সুরেন্দ্র ড্রিল স্টার্ট করল।

সুরেন্দ্রর ভ্যানিশ হওয়ার ব্যাপারটা যে কোনও প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের কাণ্ড হতে পারে সে-ধারণা আমাদের মধ্যে চারিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল অদিতি। কারণ, ড্রিল-হাউস থেকে বেরিয়ে এসে ও বলেছিল, সুরেন্দ্র ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে—যেটা পুরোপুরি ওর বানানো। অথচ সুরেন্দ্র নায়েক তখন আর বেঁচে নেই। আর পবন শুরু থেকেই এমন একটা ভান করছিল যেন লেক এক্স-এর জলে ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণী আছে, সেটা যে-কোনও সময় ড্রিলিং শ্যা বেয়ে উঠে আসতে পারে। অভিনয়ের গুণে পবন ওর ভয়টা সংক্রামক ব্যাধির মতো অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। আমাদের দলে সবচেয়ে ভিতু ছিল সুজাতা রায়। ও ভয়ে একেবারে হিস্টিরিক হয়ে উঠল। তখন এই কাল্পনিক ভয়কে কাজে লাগিয়ে পবন আর অদিতি হারাধনের দশটি ছেলে-র খেলা শুরু করল।

পবন এবার পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। রক্তমাখা ছুরিটা ওর হাতের মুঠোয় পেশাদারি ঢঙে ঝুলছে। খুব নরম গলায় ও বলল, ক্লোজ্‌ড রুম প্রবলেম তৈরি করার পর লুকিয়ে টয়লেটে গিয়ে একটা পেঙ্গুইনকে খতম করলাম। তার পাশে যে-পেঙ্গুইনটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটার বুকে রক্ত ছিটকে লাগল ইয়োর ড্যাম পেট উকিলসাহেব—শালা লইয়ারকা বচ্চা! তারপর ওটার বডি চাপা দিয়ে দিলাম বরফের নীচে। কিছু ব্লাড স্পট নষ্ট করলাম না—আপনার জন্যে ক্লু হিসেবে রেখে দিলাম। আমরা জানতাম, যদি কখনও আপনি ওই ব্লাড টেস্ট করাতে চান তো আপনাকে অদিতির হেল্প নিতে হবে। কারণ, আমাদের দলে আর কেউ ব্লাড টেস্ট করতে জানে না—নট ইভন সুজাতা। সুতরাং, সেদিক থেকে আমরা খুব সেফ ছিলাম।

অদিতি গ্লাভসের পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, সূর্যদা, আমার প্ল্যানটা এখন নিশ্চয়ই আপনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন? পবন উধাও হওয়ার পর সবচেয়ে শক্ত কাজ ছিল ওকে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা। ও কখনও থাকত আমার তাবুতে, আর কখনও থাকত ড্রিল-হাউসে। বিশেষ করে ও রাতটা কাটাত ড্রিল-হাউসে। তা ছাড়া, মাত্র দু-তিনটে রাতের তো মামলা! আর আমি ওর খাবারটা দরকারমতো পৌঁছে দিতাম।

আমার মনে পড়ে গেল ড্রিল-হাউসে কুড়িয়ে পাওয়া পাঁউরুটির টুকরোগুলোর কথা। এ ছাড়া রোহিত যে স্টোর রুম থেকে শব্দ শুনেছে বলে বলছিল সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে হবে চুপিসারে অদিতি অথবা পবন ও-ঘর থেকে খাবার চুরি করছিল।

সুরেন্দ্র, চন্দ্রেশ্বর, রোহিত—ওদের ডেডবডিগুলো কোথায় লুকিয়েছ? আমি অদিতিকে জিগ্যেস করলাম। আর এগিয়ে আসা পবনের জন্যে মনে-মনে একটা উপায় খুঁজতে লাগলাম।

আমার বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। অভিযানের সাথী চার-চারজনকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে পবন আর অদিতির হাত কাঁপেনি। শুধু খ্যাতির লোভে ওরা সাইকোপ্যাথ হয়ে গেছে!

অদিতি আমার প্রশ্নের জবাব দিল, ওরা সবাই শুয়ে আছে বরফের নীচে। সুরেন্দ্রকে পবন ছুরি দিয়ে নিকেশ করেছে। রোহিত আর চন্দেৰশ্বর চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে বিষ মেশানো ব্র্যান্ডি খেয়ে।

পবন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ঠোঁট সামান্য ফাঁক করা সামনের কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই খিকখিক করে হাসল ও। তারপর জাপানি সামুরাই যোদ্ধাদের অনুকরণে লম্বা ছুরিসমেত ডানহাতটা টান-টান করে বাড়িয়ে ধরল সামনে। ওর ছুরির ডগা আমার জ্যাকেট ছুঁয়ে ফেলল। কৃষ্ণা আর টুসকির কথা মনে পড়ল আমার। ওদের সঙ্গে আর কি দেখা হবে?

পবন বলল, ডেডবডিগুলো ক্যাম্পের আশপাশে যেখানে পোঁতা আছে সেগুলো আমরা একটা-একটা করে তুলে নিয়ে আসব। এনে পুঁতে দেব এখানে। আপনার আর সুজাতারটাও। তা হলে হেডকোয়ার্টার যদি পরে কোনও এনকোয়ারি করে কি ইনভেস্টিগেশান চালায় তো বডিগুলো আর খুঁজে পাবে না। সব ফুস! বাঁহাত ঘুরিয়ে ম্যাজিশিয়ানের মতো একটা ভঙ্গি করল পবন। তারপর হাসল আবার।

পবন, আমি তোমার বন্ধু। তোমার ভালো চাই। আমি রিপোর্টে সবকিছু টোন ডাউন করে তোমাদের ফেবারে লিখব–তাতে শাস্তি অনেক কম হবে। আমি…আমি…।

আপনি আমার কাছে এখন একটা পেঙ্গুইনের বেশি কিছু নন। ঠিক ওই পেঙ্গুইনটার মতন। আঙুল তুলে মরা পেঙ্গুইনটার দিকে দেখাল পবন ও ধড় আর মাথা আলাদা হয়ে পড়ে আছে।

আমি ভয় পাওয়া কাতর গলায় বললাম, পবন, প্লিজ! আমি খ্যাতি চাই না, পুরস্কার চাই না…ফেমাস হতে চাই না! আমাকে মেরো না..প্লিজ!

কোথায় গেল সেই আয়রনম্যান সূর্যদ্যুতি সেন! আমাদের সিক্রেট এক্সপিডিশানের লিডার! আয়রনম্যান থেকে এখন সে স্পঞ্জম্যান হয়ে গেছে! ভয় বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস চিফ–বিশেষ করে মৃত্যুভয়…। চিফ, সরি ফর দ্য মিসচিফ! পবনের হাতের ছুরি অল্প-অল্প দুলতে লাগল।

পবন, প্লিজ! অদিতি…প্লিজ…! আমি বড়-বড় শ্বাস টানতে গিয়ে হঠাত্ত কাশতে শুরু করলাম। কাশতে কাশতে আমার মুখ লাল হয়ে গেল, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। জ্যাকেটের ভেতর থেকে আমি স্টেইনলেস স্টিলের কনটেনারটা বের করে নিলাম। হাতের ইশারায় কোনওরকমে পবনকে থামতে বলে কনটেনারের ঢাকনা খুললাম। তারপর ওটা মুখের কাছে নিলাম চুমুক দেওয়ার জন্যে।

আমার অভিনয়ে পবন ঠকে গেল। ভাবল, জীবন ভিক্ষে চাওয়া, কাকুতি-মিনতি করা, মেরুদাঁড়াহীন একটা প্রাণী ওর সামনে ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসহায় অবস্থায় ব্র্যান্ডি বা ওইজাতীয় কিছু খেতে চাইছে।

তাই ও বলল, য়ু আর গ্রেট, চিফ। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা বের করেন।

ঠান্ডা হাওয়ার বেগ শনশন করে বাড়ছিল। যে-কটা পেঙ্গুইন আমাদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল সেগুলো ঢাল বেয়ে চলে যেতে লাগল নীচে হ্রদের দিকে।

আমি কনটেনারটা পবনের দিকে বাড়িয়ে ধরে ওর দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেলাম।

আমরা এখন প্রায় মুখোমুখি। ওকে বললাম, তুমি একচুমুক খেতে পারো...কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ...।

আমার কাতর অবস্থা দেখে পবন হাসল।

আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আজ উষ্ণতা বড়জোর মাইনাস বত্তিরিশ কি তেত্তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিডের হিমাঙ্ক মাইনাস ৪১.৬ ডিগ্রি। সুতরাং অ্যাসিডটা জমে হিম হয়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। বরং এই ঠান্ডায় অ্যাসিডের কোনও ভেপার তৈরি হবে না–ধোঁয়ার মতো সেটা দেখাও যাবে না কনটেনারের মুখ দিয়ে। ফলে পবন বুঝতে পারবে না আমি ওর মুখে কী ছুঁড়ে দিতে চলেছি।

না, বুঝতে পারল না।

বুঝতে পারল যখন, তখন দেরি হয়ে গেছে। ওর মুখ, গগল্‌স আর জ্যাকেট ভয়ঙ্কর অ্যাসিড একেবারে শেষ করে দিল। ছুরিটা খসে পড়ল ওর হাত থেকে। দু-হাতে মুখ চেপে ধরে ও পড়ে গেল বরফের ওপরে। কসাইখানার মৃত্যুপথযাত্রী শুয়োরের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

হতবাক অদিতি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে–যেন সিনেমার রোমাঞ্চকর শেষ দৃশ্য দেখছে।

কিন্তু দৃশ্যটা আমি আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে চাই। আমি গ্রুপ লিডার। আমিই সবসময় শেষ কথা বলব। পবন শর্মা বা রাবণ শর্‌মা নয়।

তাই কনটেনারটা ফেলে দিয়ে পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আইস অ্যাক্সটা তুলে নিলাম। কৃষ্ণা আর টুসকির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। টুসকিকে কোলে নিয়ে চুমো খেতে চাই। বারবার, অনেকবার। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। কোনও শুয়োরের বাচ্চা আমাকে রুখতে পারবে না।

হিংস্র জন্তুর মতো একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে। এবং একইসঙ্গে ভয়ঙ্কর শক্তিতে আইস অ্যাক্স গেঁথে দিলাম পবনের কোমরে।

ওর জ্যাকেট, পোশাক, চামড়া, মাংসসব স্তর ভেদ করে আইস অ্যাক্সের ধারালো ফলা বোধহয় হাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল।

পবন একটা যন্ত্রণার চিৎকার নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাই আইস অ্যাক্সের আঘাতের জন্যে আলাদা করে চিৎকার করতে পারল না। চিৎকারটা একটু জোরালো হল শুধু।

ও আর অদিতি বোধহয় এখন বুঝতে পারছে, আমি দুজনের চেয়েও একটু বেশি।

আইস অ্যাক্সটা পবনের শরীরে গেঁথে গিয়েছিল। তাই ওটা টানাটানি না করে পবনের ফেলে দেওয়া ছুরিটা তুলে নিলাম।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে তুষারঝড় শুরু হয়ে গেল।

শুকনো বরফকুচি অল্প-অল্প উড়ছিল একটু আগে থেকেই। এখন সেটা বাড়তে শুরু করল।

এতক্ষণ পর অদিতি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কান্না তো নয়, যেন কোনও পাগলের সব হারানোর হাহাকার।

প—ব–ন!

অদিতির ডাকটা এমন বুকফাটা যে, মৃত মানুষও জেগে উঠতে চাইবে। কিন্তু পবন উঠল না। আমি জানি, আর কোনওদিন উঠবে না। কারণ, ওর কাতরানি বন্ধ হয়ে গেছে।

পবন ওর কতটা বন্ধু ছিল? কত কাছাকাছি ছিল?

অদিতির দিকে দু-পা এগোতেই ও হিস্টিরিয়া রুগির মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল? খবরদার! আমার দিকে এগোবেন না।

বরফ উড়ছিল। শীতও আমাদের নিয়ে এবার ছেলেখেলা করতে শুরু করেছে। আশেপাশে পেঙ্গুইন আর একটাও নেই। এখন বড় ভয়ের সময়। এখানে আর থাকাটা ভালো হবে না। আন্টার্কটিকায় ঠান্ডা কারও কথা শোনে না। নিজের খুশিমতো কাজ করে।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, অদিতি! আমি তোমার ভালো চাই। আমাকে ভুল বুঝো না। এর মধ্যেই অনেক ভুল হয়ে গেছে। প্লিজ! চলো, আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই। সেখানে ঠান্ডা মাথায় বসে কথা হবে।

অদিতি এবার পাগলের মতো কাজ করে বসল। একলাফে উঠে পড়ল ওর মোমোবাইলে। গাড়ি স্টার্ট করে ছুটিয়ে দিল। চাপা গর্জন তুলে সাদা বরফের কুচির আড়ালে ওর গাড়িটা হারিয়ে গেল।

কিন্তু এই ব্লিজার্ডের মধ্যে ও কোথায় যাবে?

একজন জীবিত ও একজন মৃত রওনা হয়ে গেল দিকশূন্যপুরের দিকে। যখন ওদের আবার খুঁজে পাওয়া যাবে তখন সুজাতা আর ও একই জায়গায় চলে গেছে। আন্টার্কটিকায় যারা হারিয়ে যায় তারা একেবারে হারিয়ে যায়। তাদের আর ফেরানো যায় না।

আমি বোকার মতো ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। হারাধনের দশটি ছেলের গল্প এখন শেষ। এখন কোন বনে আমি যাব? এখানে এসেছিলাম সাতজন। তারপর কী যে এক বিয়োগের

অঙ্ক শুরু হয়ে গেল! শেষ পর্যন্ত হাতে রইল এক। আমি। এবং একা।

ছুরিটা ফেলে দিলাম। হাত তুলে তুষারঝড় আড়াল করে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেলাম স্নোমোবাইলের কাছে। যেভাবে হোক ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে। যেতেই হবে। তারপর রেডিয়ো মেসেজ পাঠাতে হবে বেস ক্যাম্পে। ওখানে ব্লিজার্ড এখন থেমেছে কিনা কে জানে। ওরা কি প্লেন পাঠাতে পারবে?

পারুক বা না পারুক আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আর রিপোর্ট লিখতে হবে।

লিখতে হবে 'হারাধনের সাতটি ছেলে'-র কাহিনি।

হীরা চুনি

হীরা চুনি

ঘটনাটা আত্মহত্যা কিংবা দুর্ঘটনা, দুটোর একটা মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোনওটাই নয়। পরিষ্কার খুন।

খুনের পর অকুস্থলে সবার আগে হাজির হওয়ার সুযোগ খুব কম ডিটেকটিভই পায়, কিন্তু এক্ষেত্র ঈশ্বর করুণাময়। আমিই প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছি।

সি.আই.টি. রোডের একটা শরিকী সংঘর্ষ মেটাতে আমি আর আমার সঙ্গী, সার্জেন্ট সুরেশ নন্দা, জিপ ছুটিয়ে যাচ্ছিলাম, ফুলবাগানে মোড় ঘুরতেই একটা বাচ্চা ছেলে ব্লু স্টার হোটেলের পেছনের গলিটা থেকে বেরিয়ে এল। চিৎকার করে বলতে লাগল, গলিতে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

ছেলেটা ছুটে চলে গেলেও নন্দা গাড়ি ঘুরিয়ে গলিটায় ঢুকল।

ছ'টা বেজে এখন কয়েক মিনিট। জুনের ভ্যাপসা গরম। তারই মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি দামি পোশাক-পরিচ্ছদ পরা এক যুবকের মৃতদেহ রাস্তায় অসহায়ভাবে পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, মাত্র কয়েকমিনিট আগেই সে হোটেলের অন্তত তিন কি চারতলার জানলা দিয়ে পড়েছে। ওপরে তাকিয়ে মেপে নিলাম—হোটেলটা ছ'তলা।

ফরসা দেহটা হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এত ওপর থেকে পিচের রাস্তায় এসে পড়লে যে পরিমাণ রক্তপাত হওয়ার কথা তা হয়নি। যুবকের দু-চোখের মাঝে নাকের ওপরটা কালচে হয়ে ফুলে আছে এবং মুখের বাঁ দিকে, বাঁ হাতে ও বাঁ কবজিতে কেমন গোলাপি আভা।

পুলিশের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা না করা পর্যন্ত হয়তো আমাদের ছোঁওয়া উচিত নয়, কিন্তু প্রয়োজন ও কৌতূহল বেশিরভাগ সময়েই জিতে যায়। সুতরাং আঙুলের ডগা মৃতদেহের চোয়ালে ঠেকিয়ে আস্তে ঠেলা মারলাম। মাথাটা খুব সহজেই একপাশে ঘুরে গেল।

রাইগর মর্টিস শুরু হয়নি এখনও না? সুরেশ প্রশ্ন করে।

না, আমি বলি। লোকটার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে খুললাম। চারশো তিপ্পান্ন টাকা, কয়েকটা সংখ্যা ও ঠিকানা লেখা চিরকুট, আর সাতটা একইরকম আইভরি কার্ড। কার্ডগুলো সম্ভবত মৃত ব্যক্তির। তাতে লেখা : বিশ্বনাথ শিভালকর, এজেন্ট। সতেরো, এলগিন রোড, কলকাতা ৭০০০২০।

নাম-ঠিকানা সুরেশকে পড়ে শোনালাম। ব্যাগটা আবার ফিরিয়ে রাখলাম পকেটে, উঠে দাঁড়ালাম। ডাক্তারি পরীক্ষা হয়ে গেলে আরও খুঁটিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখব।

বডির বাঁ দিকটায় পোস্টমর্টেম লিভিডিটি দেখা যাচ্ছে। সুরেশ সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, অতটা লালচে হতে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছে, কী বলেন?

হ্যাঁ, তা লাগবে।

মেঝের কাছাকাছি মৃতদেহের যে-অংশ থাকে সেখানে রক্ত জমে গিয়েই পোস্ট মর্টেম লিভিডিটি হয়। অর্থাৎ, কেউ বিশ্বনাথ শিভালকরকে ওপরের জানলা দিয়ে ফেলে দেবার আগে সে বাঁ কাত হয়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক পড়ে ছিল।

মরার আগে কষে মাল টেনেছে—গন্ধ পাচ্ছি, একটু অবাক হয়ে সুরেশ বলল।

অল্পেতে অবাক হওয়া সুরেশের স্বভাব। ওর চেহারা ছিপছিপে, লম্বা। বয়েস কম, কথাবার্তা নরম। আর লোক ঠকানো, মোলায়েম আচার-ব্যবহার। ফলে এমনিতে বোঝা মুশকিল, ও দরকার পড়লে বেশ শক্ত হতে পারে। এ ছাড়া সুরেশ খিদিরপুরে বালসারার ক্লাবে নিয়মিত মার্শাল আর্ট-এর চর্চা করে। খালি হাতের লড়াইয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে ওর জুড়ি নেই এবং ভয় নামক অনুভূতি ওর ইন্দ্রিয়ের আওতার বাইরে।

দু-চোখের মাঝে যে-আঘাত পেয়েছে তাতেই মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, প্রশ্নের রেশ টেনে কথাটা শেষ করল সুরেশ।

হতে পারে। খুনি হয়তো ভেবেছে ওপর থেকে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়লে ওই আঘাতের আর চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কিন্তু খুনির দুর্ভাগ্য—।

সুরেশ আমার কথা শুনে হাসল, বলল, তা এখন কী করবেন?

ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকো। আমি হোটেল থেকে হেডকোয়ার্টারে ফোন করছি। তারপর সবাইকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখি।

গলি থেকে বেরিয়ে পথ ঘুরে ব্লু স্টার-এর সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বিশাল কাচের দরজা পাঠানপুঙ্গব শোভিত।

দরজা পেরোলেই এয়ারকন্ডিশন্ড রিসেপশন—অনিবার্যভাবেই উগ্র আধুনিকাখচিত।

সোজা গিয়ে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে আই.ডি.-টা বের করে সুন্দরীকে দেখালাম। তারপর ফোন তুলে হেডকোয়ার্টারে ডায়াল করলাম। ও.সি. অজিত বোসকে খুনের ঘটনাটা জানিয়ে এই কেসে ফুলটাইম ডিউটি চাইলাম। উনি

ডি.সি.ডি.ডি.-কে জানিয়ে দেবেন বলে অনুমতি দিলেন। এবং বললেন, শিগগিরই অ্যাম্বুলেন্স ও ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের দুজন লোক পাঠাচ্ছেন।

ব্লস্টার হোটেলের স্টারের সংখ্যা পাঁচ না হলেও তিনের কম নয়। লবিটা প্রয়োজনের তুলনায় ছোট এবং এলিভেটরটা সম্ভবত খোদ ওটিস সাহেবের হাতে তৈরি। রিসেপশনিস্ট-এর কাছে ম্যানেজারের খোঁজ করলাম। উত্তর পেতে দেরি হচ্ছে দেখে কাউন্টারে খটখট করে দুবার শব্দ করলাম।

কাউন্টারের পেছনের দরজা খুলে মধ্যবয়স্ক, বেঁটে, টাক মাথা এবং বেশ স্বাস্থ্যবান জনৈক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বেশবাস পরিপাটি। হাসিমুখে নকল দাঁতের বিজ্ঞাপন।

বলুন, সার্জেন্ট, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?' তার গলার স্বর আমার অনুমানের চেয়েও ভরাট, গম্ভীর।

সার্জেন্ট নয়, ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর বরাট, আইডেন্টিটি কার্ডটা ওঁর চোখের সামনে একবার নাচালাম। বললাম, বিশ্বনাথ শিভালকর আপনার বোর্ডার?

ডেস্কে রাখা ভোলা খাতার দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন তিনি। বললেন, হ্যাঁ, আজই সকালে এসে উঠেছেন।

সঙ্গে কেউ ছিল?

পকেট থেকে নোটবই ও বলপেন বের করে নিলাম : আপনার নামটা বলুন–।

অ্যাডভানি। প্রতাপ অ্যাডভানি।

শিভালকরের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

না। কিন্তু কেন বলুন তো? কী হয়েছে?

হোটেলের পেছনের গলিতে শিভালকর শুয়ে আছে। মারা গেছে। কেউ ওকে বোধহয় চারতলার জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

চমকে উঠলেন প্রতাপ অ্যাডভানি, আত্মহত্যা নয় তো?

তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলাম, শিভালকরকে আপনি চিনতেন?

না, কিন্তু আমি ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন অ্যাডভানি, আমার হোটেলে এসব কাণ্ড কখনও হয়নি।

কারণ বিশ্বনাথ শিভালকর কখনও আসেনি, কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, কাউন্টারে আপনি সবসময় থাকেন না?

না। দরকার হলে আসি।

শিভালকর কোন ঘরে ছিল?

এক মিনিট, আড়চোখের নজর আবার ছুটে গেল খাতার দিকে : টু-ও-নাইন।

তার মানে তিনতলা। তিনতলার জানলা দিয়েই নীচে পড়েছে শিভালকর।

খাতায় ওর নাম-ঠিকানা লেখা আছে?

হ্যাঁ, সেটাই হোটেলের নিয়ম। সেভেনটিন এলগিন রোড, ক্যালকাটা টুয়েন্টি।

শিভালকর কটার সময় আপনার হোটেলে এসে ওঠে?

সাড়ে দশটা নাগাদ।

নোটবই পকেটে রাখলাম।

ওর ঘরের চাবিটা আমাকে দিন, মিস্টার অ্যাডভানি। আর কাউন্টারেই থাকুন। অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা এক্ষুনি এসে পড়বেন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন অ্যাডভানি নিশ্চয়ই। আমি আছি।

একটা বড় চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বের করে আমার হাতে দিলেন তিনি, কোনওরকম দরকার হলেই বলবেন, ইন্সপেক্টর, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।

সো কাইন্ড অফ ইউ। হাসলাম। তারপর পা বাড়ালাম এলিভেটরের দিকে।

এলিভেটরের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। প্রাগৈতিহাসিক এলিভেটরকে আমার ভীষণ ভয়। সুতরাং ওটিস সাহেবকে এলিভেটর আবিষ্কারের জন্যে মনে-মনে নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠতে শুরু করলাম।

বাইরের জাঁকজমকের তুলনায় হোটেলের ঘরগুলো সর্বহারা। এর চেয়ে ছোট ঘর অনেক দেখেছি, তবে উষ্ণতা ও অস্বস্তিতে দুশো ন'নম্বর কামরা আমার স্মৃতিকে হার মানাল। ঘরে পাখা ও প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্রই যে যথেষ্ট পুরোনো তা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

ঘরে ধ্বস্তাধ্বস্তির কোনও চিহ্ন নেই। তবে কেউ একজন যে বিশ্বনাথ শিভালকরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার চিহ্ন পাওয়া যায়। ঘরের এক পাশে রাখা টেবিলে হুইস্কির বোতল, থামস আপ এবং দুটো গেলাস। একটা গেলাসের কানায় হালকা গোলাপি লিপস্টিকের ছাপ। এ ছাড়া একটা অদ্ভুত সেন্টের গন্ধ গোটা ঘরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বিছানার নীচে ধুলো ছাড়া কিছু পেলাম না। আলমারিতে দুটো হ্যাঁঙার এবং একটা মাকড়সার জাল চোখে পড়ল। বাথরুমেও কিছু নেই।

ড্রেসিং টেবিলের পাশে একটা ভি.আই.পি. অ্যাটাচি কেস পেলাম। সেটা সাবধানে বিছানার রেখে খুললাম। আমি চাই না কোনও হাতের ছাপ আমার অসাবধানতার জন্যে নষ্ট হোক।

অ্যাটাচিতে ডায়েরি, কাগজপত্র, কিছু টাকা ও একটা পেপারব্যাক ছাড়া একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলাম। শ্যাময় লেদারের সুন্দর একটা পাউচ। মুখটা চেন টেনে বন্ধ করা। ওপরে সোনালি মনোগ্রাম : বি.এস.।

পাউচটা খুললাম। ভেতরে কিছু নেই। না, কিছু নেই বললে ভুল হবে–শুধু কয়েক টুকরো টিসু ও তুলো পেলাম। একটু চিন্তিতভাবেই পাউচটা অ্যাটাচি কেসে ঢুকিয়ে রাখলাম। আর তখনই আমার নজরে পড়ল ছোট্ট লেন্সটা।

এ ধরনের লেন্স সাধারণত জহুরিরা ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং শ্যাময়-পাউচ, টিস্যু পেপার, তুলো এবং লেন্স যোগ করে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তা হল, বিশ্বনাথ শিভালকর দামি পাথরের লেনদেন করত। সেই কারণেই ওর কার্ডে এজেন্ট শব্দটা লেখা আছে।

সব জিনিস অ্যাটাচি কেসে আবার গুছিয়ে ওটা আগের জায়গায় রেখে দিলাম। তারপর বিছানাটা তছনছ করে দেখতে শুরু করলাম। তখনই দু বালিশের ফাঁকে লিপস্টিকটা খুঁজে পেলাম।

লিপস্টিকটা জাত এবং চরিত্রে অসাধারণ। সস্তার জিনিসও অনেক সময় ভীষণ দামি দেখায়। এটা তা নয়। একেবারে খাঁটি সোনার তৈরি। চারপাশে আলপনার কাজ করা এবং ঢাকনার ওপর সুন্দর মনোগ্রামে এল.সি. লেখা। আজকের দিনটা বোধহয় মনোগ্রামের দিন।

এ ধরনের লিপস্টিক মেয়েরা নিজেদের জন্যে কেনে না। কেউ উপহার দিলে নেয়। তা ছাড়া জিনিসটা এত দামি এবং কারুকার্য খচিত যে, স্বর্ণকারের গোপন চিহ্ন খোদাই করা

থাকলেও থাকতে পারে। সেই গোপন চিহ্ন থেকে আমরা সহজেই এর স্বর্ণকার এবং মালকিনকে খুঁজে বের করতে পারব।

নিজের রুমাল ও শিভালকরের লেন্সের সাহায্য নিয়ে চিহ্নটা খুঁজে পেলাম। ওটা ঢাকনার ভেতর দিকে ছিল ঃ দুটো ছোট বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে রয়েছে, এবং তাদের একটার মধ্যে ছোট্ট করে ইংরেজি ‘এ’ অক্ষরটা খোদাই করা।

লিপস্টিকটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে বিছানা সার্চ করা শেষ করলাম। চাদরটা আবার ঠিকমতো ঢেকে দিচ্ছি, দরজায় কেউ নক করল। তারপরই ঘরে ঢুকল দুজন ফোরেনসিক এক্সপার্ট ও একজন ফটোগ্রাফার।

প্রথম দুজনের একজনকে প্রশ্ন করলাম, গলির কাজ শেষ?

ওখানে কিছুই করার নেই–শুধু ফটো তোলা ছাড়া। বিশ্বাস সেসব তুলেছে।

ফটোগ্রাফার বিশ্বাস গলির দিকের জানলার কাছে এগিয়ে গেল । জানলা দিয়ে গলির কয়েকটা ফটো বরং তুলে নিই।

ডক্টর আসেনি? আমি জিগ্যেস করলাম।

দ্বিতীয়জন উত্তর দিল, এইমাত্র এসেছেন ডক্টর হুসেন।

ঠিক আছে। আপনারা এবার হাত লাগান। আমার কাজ শেষ। শুধু যাওয়ার আগে নীচে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে।

দুশো ন’নম্বর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

নীচে নামার আগে দুশো নয়ের দুপাশের ঘরের দরজায় টোকা মারলাম। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না।

লবিতে এসে অ্যাডভানিকে কাউন্টারে পেলাম না। কিন্তু কাউন্টারের পেছনের দরজাটা সামান্য ভোলা। সুতরাং রিসেপশনিস্টকে হতভম্ব করে কাউন্টারের পেছনে গেলাম। দরজা ঠেলে সটান ঢুকে গেলাম অ্যাডভানির ঘরে।

শিভালকরের ঘরের সঙ্গে এ-ঘরের খুব একটা তফাত নেই। অতিরিক্তের মধ্যে একটা টিভি সেট এবং জানলায় গ্রিল বসানো। অ্যাডভানি বিছানার শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন। যন্ত্রণায় তার চোখ কুঁচকে গেছে।

কী হল, মিস্টার অ্যাডভানি? আমি প্রশ্ন করলাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে হাসতে চেষ্টা করলেন। বললেন, আলসার। তার ওপর সুইসাইডের ব্যাপারটায় বেশ আপসেট হয়ে পড়েছি।

বুঝলাম না শিভালকরের মৃত্যুকে তার আত্মহত্যার লেবেল লাগানোর এত বেঁক কেন। সে কি নিজের হোটেলকে বদনামের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে?

অতিকষ্টে বিছানায় উঠে বসলেন অ্যাডভানি : কিছু বলবেন, ইন্সপেক্টর?

যদি আপনার কষ্ট না হয়, তাহলে—

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি : প্রয়োজন যখন তখন উপায় কী। বলুন, কী জানতে চান।

শিভালকরের ঘরে কোন বেয়ারার ডিউটি ছিল?

আবদুলের। কেন, ওকে পেলেন না?

খোঁজ করিনি। নিস্পৃহ স্বরে উত্তর দিলাম, শিভালকর যখন আসে তখন আবদুল কি ওকে ওপরে পোঁছে দিয়েছিল?

না। আবদুল তখন কাছাকাছি ছিল না। মিস্টার শিভালকর চাবি নিয়ে নিজেই ওপরে গিয়েছিলেন।

শিভালকরের ঘরে একটা মেয়ে এসেছিল। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। কোনও মেয়েকে আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছেন?

একটা মেয়েকে দেখেছি–খুব সুন্দর দেখতে। সোজা লিফটে গিয়ে উঠেছিল।

তাকে চেনেন?

না। তবে মেয়েটা একেবারে বিউটি কুইন। কাঁধ পর্যন্ত চুল, চোখে টিন্টেড গ্লাসের চশমা, পরনে সোনা রং সাউথ ইন্ডিয়া সিল্ক–দাম কম করেও তিন হাজার টাকা হবে।

তখন কটা বাজে?

এই..চারটে হবে। কিংবা সোয়া চারটে।

এ ছাড়া আর কোনও মেয়েকে দ্যাখেননি?

না। মিস্টার বরাট, একটু কষ্ট করবেন? আমি একদম উঠতে পারছি না। কাউন্টারের ভেতরের তাকে একটা পিচবোর্ডের বাক্স আছে। কয়েকদিন আগে একটা জেলুসিল ট্যাবলেটের পাতা ওখানে রেখেছিলাম। দেখুন তো আছে কি না, থাকলে আমাকে দুটো এনে দিন, ট্যাবলেট দুটো খেলে পেটের যন্ত্রণাটা হয়তো একটু কমবে।

কাউন্টারে গেলাম। বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করে ট্যাবলেটের পাতাটা খুঁজে পেলাম। দুটো ট্যাবলেট ছিঁড়ে এনে অ্যাডভানিকে দিলাম।

থ্যাংকু ইউ। ভগবান না করুন, কখনও যেন আপনার আলসার না হয়।

আর একটা কথা—তারপরই আপনার ছুটি। হোটেলে টেলিফোন এলে কে ধরে? রিসেপশনিস্ট?

না, আমি। আমি না থাকলে সুজি ধরে সুজি গোমেজ। ইশারায় কাউন্টারের দিকে দেখালেন অ্যাডভানি।

শিভালকরের কোনও ফোন এসেছিল?

ওঃ—হো–।

কী হল?

একদম ভুলে গেছি। ওঁর একটা ফোন এসেছিল। যে ফোন করেছিল তার কথা শুনে। মনে হয়েছে মিস্টার শিভালকরের ওপর বেশ রেগে আছে। তার ধমকের উত্তরে শিভালকর খালি বলছিলেন, শুধু-শুধু রাগ করছ কেন, প্যাটেল? আগে আমাকে বলতে দাও। আহা, শোনই না, এইরকম সব কথা।

এসব ধমক ছাড়া লোকটা আর কী বলেছে?

কিচ্ছু না। তারপর হঠাৎই মিস্টার শিভালকর ফোন নামিয়ে রাখেন।

প্যাটেল আর ফোন করেছিল?

না।

ও ফোন করেছিল কখন?

সময়টা ঠিক খেয়াল নেই। তবে চারটের এদিক ওদিক হবে। হঠাৎই তিনি যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। আপনমনেই বললেন, ওঃ, আমার শত্রুরও যেন

আলসার না হয়।

নোটবইতে আরও কয়েকটা কথা টুকে নিয়ে প্রতাপ অ্যাডভানিকে সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর হোটেলের লাগোয়া পথ ঘুরে ফিরে গেলাম পেছনের গলিতে। পুলিশ ডক্টর ও সুরেশ নন্দার কাজ কদ্দূর এগোল কে জানে!

ঘটনাস্থলে এখন আরও দুটো পুলিশের গাড়ি ও একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে শতখানেক দর্শক।

আমাকে দেখে সুরেশ কাছে এগিয়ে এল। আমি ততক্ষণে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকেছি।

ডক্টর হুসেন খুনের সময়টা মোটামুটি ঠিক করেছেন, স্যার। বলছেন, চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

দ্যাটস রাইট, মৃতদেহের পাশে হাঁটুগেড়ে বসেছিলেন ডক্টর হুসেন, আমাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, চারটে থেকে পাঁচটা। আগে নয়, পরে নয়।

দু-চোখের মাঝে ওই চোটটা কীসের, ডক্টর?’ নন্দা প্রশ্ন করল, ওতেই কি ভদ্রলোক মারা গেছে?

হতে পারে, তবে অটপ্সি না করা পর্যন্ত শিয়োর হয়ে বলা যাবে না। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি অ্যাম্বুলেন্সের দিকে একপলক তাকালেন, আমার কাজ শেষ, মিস্টার বরাট। যদি গাড়ি ছেড়ে দেন তা হলে আমি বডি নিয়ে যেতে পারি।

শিভালকরের পকেট থেকে সব কিছু বের করে নিয়েছ, সুরেশ? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, প্যান্টের উঁচু হয়ে থাকা পাশপকেট চাপড়ে বলল সুরেশ, তবে তাতে কাজের কিছু নেই। শুধু ওই কার্ড আর টাকা।

বডি রিলিজ অর্ডার ডক্টর হুসেনের হাতে দিয়ে আমি আর নন্দা ভিড় ঠেলে বাইরে এলাম। উঠে বসলাম জিপে।

ও, শিভালকর তা হলে হীরে জহরতের দালালি করত? আমার কাছ থেকে হোটেল ঘর অনুসন্ধানের ইতিহাস ও অ্যাডভানির জবানবন্দি শোনার পর নন্দা বলল, কিন্তু কয়েক শো লোক হয়তো আজ সারাদিন এই হোটেলে যাতায়াত করেছে, আর আমরা খবর পেলাম শুধু সোনালি সিল্কের শাড়ি পরা ওই মেয়েটার। এ দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, ঈশ্বর জানেন।

বেয়ারাকে জিগ্যেস করলে হয়তো আরও অনেকের খোঁজ পাওয়া যাবে। ইঞ্জিন চালু করে জিপটা গলি থেকে ব্যাক করতে শুরু করলাম আমি শিভালকরের কার্ডের ঠিকানায় যাচ্ছি, সুরেশ। তুমি–।

জানি, হাসল সুরেশ নন্দা, আমি গিয়ে ওই চারতলার হোটেল-ঘর পাহারা দেব আর যতরকম কায়দায় সম্ভব পুলিশি তদন্ত চালাব।

সুরেশকে আমি ভীষণ স্নেহ করি এবং অনাবশ্যক প্রশ্রয় দিই। তাই সান্ত্বনা দিতে বললাম, কাউকে তো এ কাজ করতেই হবে। তুমি ছাড়া আর কাকে ভরসা করব?

সুরেশের মুখ সহজ হল।

আমি বলে চললাম, প্রথমে বেয়ারা আবদুলকে ধর। খোঁজ করে দ্যাখো শিভালকরের ঘরের আশপাশের বোর্ডাররা কেউ কিছু শুনেছে বা দেখেছে কি না। তা ছাড়া রাস্তার কোণায় একটা পানের দোকান আছে। সেই দোকানদারও হয়তো কিছু দেখে থাকতে পারে।

মোড় ঘুরে হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। সুরেশকে বললাম, আর একটা কথা, কাউকে লিপস্টিকটা দিয়ে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও। জহুরিদের চিহ্ন খুঁজে ওটা কার দোকানে তৈরি হয়েছে বের করতে বলো।

আচ্ছা, স্যার, তাহলে আপনি রওনা হন। সুরেশ নন্দা জিপ থেকে নেমে পড়ল। আমি একটা আশ্বাসের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

.

সতেরো এলগিন রোড প্রথম নজরে বড়লোকের ফ্ল্যাটবাড়ি। অথচ ভেতরটা ছমছমে এবং টিমটিমে আলোয় আলোকিত। অন্তত গোটাদশেক ডাকবাক্স সিঁড়ির নীচের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। ডাকবাক্সের লেখা পড়বার মতো আলো যথেষ্ট নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। দুদিকের দুই ফ্ল্যাটের নেমপ্লেট পড়তে কোনও অসুবিধে হল না। না, শিভালকর বলে কেউ দোতলায় থাকে না।

তিনতলায় এসে অনুসন্ধান শেষ হল। কিন্তু অবাক হলাম ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটে দুটো নাম দেখে : বি. শিভালকর এবং এস. সরজানা—এজেন্টস। ভাবলাম, এক জাতের পাখি, দল বেঁধেছে নাকি? কিন্তু মানুষের অবাক হওয়ার শেষ নেই। নিজের মৃত্যুতে পর্যন্ত সে অবাক হয়। সুতরাং বেল না টিপে দরজায় জোরে নক করলাম।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ঘরের উজ্জ্বল আলো মাথার পেছনে জ্যোতির মতো ধরে রেখে দরজায় যিনি আবির্ভূত হলেন সম্ভবত সে-ই সরজানা। দু-হাত বুকে রেখে বিবেকানন্দ ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে। চেহারা শক্ত-সমর্থ, মাথায় ঘন চুল, ছোট অথচ তীক্ষ্ণ চোখ।

আমাকে দেখে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, আপনিই দরজায় নক করেছেন?

আমি চারপাশে তাকিয়ে যেন কাউকে খুঁজলাম। বললাম, নক করার মতো আর কাউকে তো দেখছি না।

আবার একটা রুক্ষ উত্তর দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল সরজানা, আমি আই.ডি.-টা বের করে ওর চোখের সামনে তুলে ধরলাম। বললাম, ইন্সপেক্টর বরাট, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট

লালবাজার।

সরজানার মুখের রেখা নরম হয়ে এল।

আপনি বিশ্বনাথ শিভালকরের বন্ধু?’ ওকে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, আমরা দুজনেই এখানে থাকি। কী হয়েছে?

দরজায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না, ভেতরে চলুন।

সরজানা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে ভেতরে আহ্বান জানাল।

বসবার ঘরটা বেশি বড় নয়, তবে তার সাজগোজ অমিতব্যয়িতার ইঙ্গিত দেয়। আমি একটা ফোমের চেয়ার বসবার জন্যে বেছে নিয়ে সরজানাকে ইশারা করলাম মুখোমুখি সোফাটায় বসতে।

এবার কাজের কথা হোক। বলে পকেট থেকে নোটবই ও বলপেন বের করে নিলাম আমি, আপনার পুরো নামটা বলুন।

সরজানার কপাল এখনও করোগেটেড অ্যালুমিনিয়াম। তবে ও সোফাটায় গিয়ে বসল, বলল, শ্যাম সরজানা।

মিস্টার শিভালকর আপনার অনেকদিনের বন্ধু?

না। তবে বেশ কিছুদিন আমরা একসঙ্গে আছি। একটু থেমে সরজানা প্রশ্ন করল, কেন?

একটা খারাপ খবর আছে, মিস্টার সরজানা। বিশ্বনাথ শিভালকর খুন হয়েছে।

ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই সিদ্ধান্ত পালটাল। স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইল যেন বুঝতে চাইছে আমি সত্যি কথা বলছি কি না।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কী করে? শ্যাম সরজানা প্রশ্ন করল।

এখনও আমরা ঠিক জানি না। কেউ ওঁকে তিনতলা বা চারতলার জানলা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটাকে হয় সুইসাইড নয় অ্যাকসিডেন্ট বলে দেখাতে চেয়েছে কিন্তু পুলিশ এত বোকা নয়।

কেউ মানে? তার মানে খুনিকে আপনারা এখনও ধরতে পারেননি?

এখনও পারিনি।

হঠাৎই সরজানা উঠে দাঁড়াল। ঘরের একপ্রান্তের তাক থেকে একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে একটা গেলাসে কিছুটা ঢালল। বলল, আপত্তি নেই তো?

নেভার মাইন্ড। আপনি খান।

গেলাসে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে ধীরে-ধীরে সোফার কাছে ফিরে এল সরজানা, বসল।

শিভালকর মারা গেছে বিশ্বাস হতে চায় না। ও বলল।

মিস্টার শিভালকর বিয়ে করেননি?

না।

তার আত্মীয়স্বজন কাউকে চেনেন? আমরা তাঁদের খবর দিতে চাই।

না, চিনি না। ও কখনও কারও কথা বলেনি। তবে শিভালকরের বাবা-মা অনেকদিন মারা গেছেন। আমি জানি।

ওঁর আয় কেমন ছিল?

ভালোই। মোটামুটি আমার মতো। মাসে তিন-চার হাজার টাকার মতো। আপনিও পাথর কেনাবেচা করেন?

পাথর বলতে হীরে আর চুনি। শুধু বেচি। শিভালকরও তাই করত।

শিভালকরকে খুন করতে পারে এমন কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

তেতো হাসি হাসল সরজানা। বলল, দুতিনজনের নাম এখুনি বলতে পারি।

কে কে?

প্রথমত কবিতা পারেখ। এই মেয়েটাকে শিভালকর বিয়ে করবে বলে সব ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু আর একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে ও কবিতাকে ছেড়ে দেয়। তখন কবিতা বারবার করে

চেঁচিয়ে বলেছিল, বিশ্বনাথকে ও খুন করবে।

উনি নিশ্চয়ই সে-কথায় আমল দেননি?

না, প্রথমটা ঠিক দেয়নি। কিন্তু পরে ভয় পেতে শুরু করেছিল। সবসময় সতর্ক থাকতে চেষ্টা করত। শেষের দিকে তো কবিতার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেই বসেছিল।

করার চুমুক দিল শাশ, মতো দামি পাথর

মতো হয়ে গেছে

কবিতা পারেখ কোথায় থাকে জানেন?

দমদম। তিনের এক, এম.সি. গার্ডেন রোড।

আর কার কথা যেন বলছিলেন?

গেলাসে আর একবার চুমুক দিল শ্যাম সরজানা।

হ্যাঁ—নৃপেন দত্তর কথা। সেও আমাদের মতো দামি পাথর বিক্রি করে। ওর ধারণা বিশ্বনাথ বারকয়েক ওর খদ্দের ছুটিয়ে নিয়েছে। ব্যাপারটা ওর কাছে ম্যানিয়া মতো হয়ে গেছে। একবার তো ওদের হাতাহাতি মারপিট শুরু হয়ে গিয়েছিল, আমিই কোনওরকমে থামিয়ে দিয়েছিলাম। একটু থেমে সরজানা আবার বলল, আসলে নৃপেন দত্ত ভালো সেলসম্যান নয়। না আছে টাকা, না আছে কথা। শিভালকরকে ও হিংসে করত।

নৃপেন দত্ত কোথায় থাকে?

খিদিরপুরে শুনেছি। তবে ঠিকানা জানি না।

পাতা উলটে নোটবইয়ের নতুন পাতায় এলাম।

দুজন হল, আমি বললাম, আর কেউ?

না—অন্তত আমি জানি না।

মিস্টার শিভালকরকে প্যাটেল নামে একজন ফোন করেছিল। উনি এই প্যাটেলকে ভীষণ ভয় করতেন। এ নামে কাউকে চেনেন?

শ্যাম সরজানার ভুরু কিছুক্ষণের জন্যে কুঁচকে গেল। তারপর ও মাথা নাড়ল না, চিনি না।

মিস্টার শিভালকর কোনওরকম বিপদে পড়েছিলেন? ধরুন কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া, কিংবা কোনও মামলায় জড়িয়ে পড়া, বা জুয়ার বোর্ডে সর্বস্বান্ত হওয়া—এরকম কিছু?

না। অন্তত আমি যদুর জানি।

আপনি বললেন, অন্য একটা মেয়ের জন্যে মিস্টার শিভালকর কবিতা পারেখকে ছুটি দিয়েছিলেন। কে সে মেয়ে?

যমুনা সরকার। বাঙালি। ইশারায় অদূরে টেবিলে রাখা একটা ফটোর দিকে দেখাল সরজানা : ওই যে—ওর ফটো।

ফটোটা পরীক্ষা করতে কাছে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটার বয়েস কম, এবং দেখতে সত্যিই সুন্দর। কিন্তু ওর সৌন্দর্যে রয়েছে কেমন এক অদ্ভুত শীতল দীপ্তি। তা ছাড়া ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেশ টানা-টানা দুটো চোখকে সংক্রামিত করতে পারেনি।

ফিরে এসে আবার বসলাম, সরজানার মুখোমুখি।

ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার, আমি বললাম, ঠিকানা জানেন?

না।

মিস্টার শিভালকর দেখছি মেয়েদের মধ্যমণি ছিলেন, কী বলেন?

ঠিক তা নয়। মেয়েরা ওর কাছে ভিড় করত, কিন্তু ও একসঙ্গে একজনের বেশি কাউকে পাত্তা দিত না। একটু থামল শ্যাম সরজানা, তারপর বলল, এই যমুনা মেয়েটা বিশ্বনাথকে যেন জাদু করেছিল। বেচারা ওর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আসলে কবিতা পারেখকে ও বিয়ে করবে বলে সব ঠিক ছিল। কিন্তু ওই যমুনা মেয়েটা কোত্থেকে যে এসে

উদয় হল, ব্যস, বিশ্বনাথ কবিতা ভুলে নিছক গদ্যে মনোযোগ দিল। যমুনার প্রেমে হতভাগা একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যমুনা সরকারের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

না। কখনও দেখিনি, আর মাঝে-মাঝে মনে হত, শিভালকরও ওকে কোনওদিন না দেখলে ভালো হত। দিনরাত্তির ওর মুখে খালি যমুনার কথা, আর কাজকর্ম ফেলে মেয়েটার পেছনে ঘুরঘুর করত। বললাম তো, না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে নোটবইয়ে একটা নতুন পয়েন্ট লিখে নিলাম।

মিস্টার শিভালকর কার হয়ে কাজ করতেন?

কারও হয়ে নয়। খাতায় সই করে পাথর নিত।

খাতায় সই করে?

হ্যাঁ, ধারে। প্রায় আধডজন জহুরির কাছ থেকে ও খাতায় সই করে হীরে চুনি এসব নিত। তারপর পাথর বিক্রি হলে তাদের টাকা শোধ করত।

তাহলে বাজারে তাঁর সুনাম ছিল বলতে হবে?

তার চেয়েও বেশি।

বিশ্বনাথ শিভালকরকে আপনি শেষ কখন দেখেন, মিস্টার সরজানা?

চকিতে আমার দিকে তাকাল শ্যাম সরজানা। তারপর গেলাস তুলে চুমুক দিল। অবশিষ্ট তরলটুকু শেষ করতে করতে গেলাসের ওপর দিয়ে আমাকে স্থির চোখে লক্ষ করতে লাগল।

আমাকে সন্দেহ করছেন? ও বলল।

জাস্ট রুটিন, মিস্টার সরজানা, আশ্বাস দিয়ে বললাম, কখন দেখেছেন?

টেবিলের এক কোণে গেলাসটা নামিয়ে রাখল ও, বলল, আজ সকালে। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

কী হয়েছিল?

শিভালকরের ঘরেই আমাদের কমন একটা ফোন রয়েছে। আজ ভোরে, প্রায় ছটা নাগাদ, আচমকা টেলিফোন বেজে ওঠে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং আমি বিছানা ছেড়ে রান্নাঘরে চা করতে যাই। কয়েক মিনিট পরেই দেখি বিশ্বনাথ অ্যাটাচি কেস হাতে জামাকাপড় পরে হাজির। ওকে দেখে মনে হল যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। জানি না, তার কারণ ওই টেলিফোন কি না।

তখন উনি আপনাকে কী বললেন?

কিচ্ছু না। আমি জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে, কিন্তু ও কোনও উত্তর দিল না। সোজা আমাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে বারদুয়েক চুমুক দিল। আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। কারণ, গত কয়েকবছরে ওকে কখনও মদ খেতে দেখিনি। মদ ও মোটেই পছন্দ করত না। কিন্তু আজ হঠাৎ কী অদ্ভুত ব্যাপার!

উনি কিছুই বলেননি?

টুঁ শব্দ পর্যন্ত নয়। আমার মনে হয়, আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটাই ও টের পায়নি। আমি জিগ্যেস করলাম এত সকাল সকাল কে ফোন করেছিল, কিন্তু মনে হয়নি ও আমার কথা শুনতে পেয়েছে। মাত্র আধ মিনিট-টাক ও ফ্ল্যাটে ছিল।

তারপরই কি ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন?

হ্যাঁ।

ফোনে তার সঙ্গে কী কথা হয় কিছু শুনতে পেয়েছিলেন?

না। সরজানা উঠে দাঁড়াল। গেলাসটা হাতে নিয়ে আবার এগিয়ে চলল সেটা ভরতি করতে।

ওকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে লাগলাম। শ্যাম সরজানার কী একটা আচরণ যেন আমার মনে খটকা জাগিয়ে তুলছে। একমাত্র মদের গেলাসে চুমুক দেওয়া ছাড়া ওকে বিন্দুমাত্রও উত্তেজিত মনে হচ্ছে না। না, বিশ্বনাথ শিভালকরের মৃত্যু ওকে উচিতমতো অবাক করতে পারেনি। কিন্তু ও ফিরে এসে সোফায় বসতেই এই প্রথম টের পেলাম, ওর সমস্ত নিরুত্তাপ নির্লিপ্ত আচরণ শুধুমাত্র ওপর-ওপর। শ্যাম সরজানার বুকের ভেতরে উত্তাল কালবৈশাখী।

সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে ও বসল। মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির যুগপৎ ছাপ, কিন্তু মদের গেলাসটাকে যে শক্তিতে ও আঁকড়ে ধরেছে তাতে আঙুল থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে।

নোটবইয়ের পাতা উলটেপালটে উঠে দাঁড়ালাম। আমার অনুসন্ধান এখন ত্রিমুখী ও কবিতা পারেখ, নৃপেন দত্ত ও যমুনা সরকার। সুতরাং তার প্রথম ধাপ হিসেবে এগিয়ে গেলাম ছোট টেবিলটার কাছে। যমুনা সরকারকে তুলে নিলাম। বললাম, মিস্টার সরজানা, হোপ ইউ উডুন্ট মাইন্ড-ফটোটা আমাদের দরকার।

আমি কেন মাইন্ড করতে যাব, তেতো হাসি ফুটে উঠল শ্যাম সরজানার ঠোঁটে : যে মাইন্ড করত—আর কখনও করবে না।

আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি : নতুন কোনও ডেভালাপমেন্ট হলে খবর দেব।

শিভালকরের খুনিকে খুঁজে বের করুন। সহজভাবে বলল সরজানা।

করব। সরজানা ও শিভালকরের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

এলগিন রোড এখন স্বভাবসিদ্ধ শান্ত এবং অন্ধকার। কিন্তু চোখ বুজলে উষ্ণতা ও আদ্রর্তার কারণে দুপুর বলে ভুল হতে পারে। রাস্তার আলো যথারীতি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জ্বলছে।

জিপে উঠে রওনা হলাম। আমি এখন কবিতা পারেখের সঙ্গে কথা বলতে চাই। যার খুনের হুমকি শুনে মহিলাপ্রিয় বিশ্বনাথ শিভালকর পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

.

তিনের এক, এম.সি. গার্ডেন রোডের সঙ্গে কবিতা পারেখকে যোগ করলে যোগফল জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়। সুতরাং চিন্তিতভাবেই দরজার কলিংবেলে চাপ দিলাম।

দরজা খুলল সুপুরুষ সুদর্শন এক যুবক। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। আমাকে দেখে সপ্রসন্ন চোখে প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

আমি পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখালাম।

হোমিসাইড। লালবাজার।

যুবকের ফরসা মুখে অবাধ্য রক্তের ঝলক দেখা দিল। তবুও চেষ্টাকৃত রুক্ষ গলায় বলল, হোয়াট ফর?

কবিতা পারেখ আপনার কে হয়?

বোন। ছোট বোন। হাসলাম। বললাম, আপনার ছোট বোনের প্রাক্তন প্রেমিক খুন হয়েছে।

যুবকের মুখ থেকে এবার রক্ত বিদায় নেওয়ার পালা। তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিয়ে আমাকে ভেতরে ডাকল, আসুন–ভেতরে আসুন।

বসবার ঘরে ছিমছাম পরিচর্যার ছাপ। রবীন্দ্রনাথের খ্রিস্ট ভঙ্গিমার ছবি বাঙালিপ্রীতির ইঙ্গিত দেয়। সুন্দরীর থুতনিতে বিউটি স্পটের মতো ঘরের মধ্যমণি সানমাইকা লাগানো টেবিলে রজনীগন্ধাগুচ্ছ শোভা পাচ্ছে।

একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসলাম। যুবককে উদ্দেশ্য করে বললাম, মিস পারেখকে একবার পাঠিয়ে দিন।

যুবক ইতস্তত করছে দেখে বললাম, উনি বাড়ি নেই ছাড়া আর যা কিছু বলবেন শুনতে রাজি আছি।

যুবক নিস্ক্রান্ত হল।

একটু পরেই গদ্যময় রুক্ষ কবিতা পারেখ ঘরে এসে ঢুকল। অভিজ্ব্যক্তি বলে দেয়, দাদা অনেক কিছুই ওকে খুলে বলেছে।

কবিতার চুল কাঁধ ছুঁয়ে থেমেছে, গাল সামান্য ভাঙা, নাক-চোখ তীক্ষ্ণ, কপালে সবুজ টিপ।

আমার খুব কাছে এসে বসল কবিতা। বলল, কী চাই বলুন?

বিশ্বনাথ শিভালকরকে কেউ তিনতলা থেকে ফেলে দিয়েছে। সহজ সুরে ওকে জানালাম।

ও চকিতে শ্বাস টানল, তারপর স্বাভাবিক হল। চোখ ফিরিয়ে দেখি, কবিতার দাদা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। সুতরাং তাকে লক্ষ্য করে বললাম, মিস্টার পারেখ, কাজ যখন নেই তখন খই ভাজুন গিয়ে।

পারেখ সলজ্জে অদৃশ্য হল।

আপনার দাদা কী করেন? কবিতাকে প্রশ্ন করলাম।

লোহার ব্যাবসা। ও অসন্তুষ্টভাবে উত্তর দিল।

দোকান কোথায়?

এখানেই।

এবার কবিতা পারেখের মতো তুঙ্গ আধুনিকার দমদমবাসের উত্তর খুঁজে পেলাম। দাদার কর্মস্থল—বারাণসীর চেয়েও পুণ্যধাম। সুতরাং বিশ্বনাথ প্রসঙ্গে ফিরে এলাম।

মিস্টার শিভালকরকে কেউ খুন করেছে। ন্যাস্টি বিজনেস। ওকে বললাম।

তো কী করব? কবিতা পারেখের চোখে আগুন জ্বলে উঠল : কেঁদে ঘর ভাসাব, না সহমরণে যাব?

তার দরকার নেই। গোটাকয়েক প্রশ্নের উত্তর দিলেই কাজ হবে।

অবাধ্য চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে গালে হাত দিয়ে বসল ও। বলল, আপনি তো ধরেই বসে আছেন আমি ওকে খুন করেছি, তাই না?

আমি সেকথা বলিনি, মিস পারেখ।

বলতে হয় না, আপনার কুৎসিত মুখে সে কথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে।

আমাদের লালবাজারে কুৎসিত হাজত-ঘরও আছে। হয়তো সেখানেই আপনার উত্তর দিতে সুবিধে হবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি খুন করিনি এবং আরও সত্যি কথা বলতে গেলে, খুনটা করতে পারলে আমি খুশিই হতাম।

অথচ আপনিই একদিন মিস্টার শিভালকরকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়েছিলেন।

শ্যাম সরজানা তা হলে কিছুই বলতে বাকি রাখেনি দেখছি!

মিস পারেখ, আপনি সময় কাটান কী করে?

ডিজাইনারের কাজ করি। লিপস্টিক, বেল্টের বাল, চশমার ফ্রেম, পারফিউমের শিশি, গয়নাগাটি—এইসব।

আজ বিকেলে আপনি কোথায় ছিলেন? চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে?

ও—ওই সময়েই বুঝি বিশ্বনাথ খুন হয়? কবিতা পারেখ বলল।

প্রশ্নের উত্তর দিন।

সারাদিন বাড়িতে বসে কাজ করছিলাম। ইচ্ছে হলে দাদাকে জিগ্যেস করতে পারেন। যদুর শুনেছি, মিস্টার শিভালকরকে আপনি খুন করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন।

সরজানা নিশ্চয়ই এটাও বলতে বাকি রাখেনি! সোজা হয়ে বসল কবিতা। হাঁটুর কাছে শাড়িটা টেনে ঠিক করল।

শুধু বিয়ে করতে রাজি হয়নি বলে কোনও মেয়ে তার প্রেমিককে খুন করবে বলে শাসিয়েছে, এমনটা বেশি শোনা যায় না।

শুধু বিয়ে করতে রাজি হয়নি বলে! আপনি এমনভাবে বলছেন যেন ব্যাপারটা অনেকটা সিনেমায় যেতে রাজি না হওয়ার মতো তুচ্ছ। কবিতা পারেখের মুখ লাল হল। ওর কথার

সুরে অহঙ্কার উঁকি মারল? তা ছাড়া আমি আর পাঁচটা মেয়ের মতো নই। এ ধরনের ফাজলামি আমি বরদাস্ত করি না।

আর কিছু!

কবিতার কালো চোখের তারায় আগুন জ্বলে উঠল সত্যি, আপনার তুলনা নেই! এ ছাড়া আর কী ও করবে? আমায় ফাঁসি দেবে?

যমুনা সরকার বলে কাউকে চেনেন?

না। একটু থেমে ও বলল, কেন, চেনা উচিত?

প্যাটেল নামটা আগে শুনেছেন?

না। যদি অবশ্য বল্লভভাই প্যাটেল না হন।

ব্যঙ্গের খোঁচাটা গায়ে মাখলাম না। জিগ্যেস করলাম, ব্লু স্টার হোটেলে কখনও গেছেন?

নামই শুনিনি।

আপনার সাউথ ইন্ডিয়া সিল্কের কোনও শাড়ি আছে? সোনালি রঙের?

না।

মিস্টার শিভালকরের মৃত্যুতে খুশি হয় এমন কারও নাম বলতে পারেন?

হ্যাঁ। আমি।

মিস পারেখ, এবার অন্তত একটু নরম হন।

উত্তরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কবিতা। গালে হাত দিয়ে পায়চারি করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ধীরে-ধীরে বলল, এক নম্বর হল, ওই অপদার্থটা। শ্যাম সরজানা। ও বিশ্বনাথকে দেখতে পারত না। ভীষণ ঘেন্না করত।

কেন?

আমার জন্যে। শ্যামের কাছ থেকে বিশ্বনাথ আমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। একথা নিশ্চয়ই ও বলেনি, কী বলেন? অর্থবহভাবে একটু থামল কবিতা, তারপর বলল, ব্যাপারটা শ্যামের মনে খুব লেগেছিল। ও একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কাজে বেরোনো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাল কবিতা। একটু ভুরু উঁচিয়ে হাসল ও এবার বুঝেছেন?

এরপরেও ওঁরা একসঙ্গে থাকতেন?

তাতে কী?

কবিতা পারেখকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম কিন্তু কাজে লাগার মতো কোনও উত্তর পেলাম না। সুতরাং যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, মিস পারেখ, আমি বললাম, দরকার হলে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে আসব।

নিশ্চয়ই আসবেন। আর সুসংবাদ শোনানোর জন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ—

.

হোমিসাইড স্কোয়াডে যখন ফিরলাম, অফিসের বড় দেওয়ালঘড়িতে তখন নটা চল্লিশ। সুরেশ নন্দা ইতিমধ্যে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টটা টাইপ করিয়ে নিয়েছে। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে সেটাতেই চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল, আমাকে দেখে চোখ তুলে তাকাল। ঠিক

পাখার নীচে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি ধপ করে বসে পড়লাম। ওকে প্রশ্ন করলাম, হোটেলে কেমন গেল?

সব শান্তি মতো মিটে গেছে। শিভালকরের ঘরে সিল মেরে দিয়েছি।

কিছু পেলে?

না, ঘরে কিছু পাইনি। কাচের গেলাস, হুইস্কির বোতল, থাস আপের বোতল, কোনওটাতেই কোনও ছাপ নেই। কেউ পরিষ্কার করে ওগুলো মুছে রেখে গেছে। তবে অন্য জিনিসের সঙ্গে ওগুলোও ল্যাবে পাঠিয়েছি।

ভালো। আর লিপস্টিকটা? ওটা কার দোকানে তৈরি জানা গেল?

সুরেশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল : একটু আগেই জানতে পেরেছি। বউবাজারে খবর নিতেই সব বেরিয়ে পড়েছে। ওটা অরিন্দম জুয়েলার্স-এর তৈরি। কিন্তু আমরা যখন গেলাম, তখন দোকান বন্ধের সময়। তাই মালিককে দোকানে পাইনি। ফলে কে ওটা তৈরি করিয়েছে, তার নামও জানতে পারিনি। কাল সকালেই জানা যাবে।

আবদুলের সঙ্গে কথা বলেছ?

শুধু আবদুল কেন, সব চাকর-বেয়ারার সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা কিছুই দ্যাখেনি, শোনেনি। আর শিভালকরের আশপাশের ঘরের লোকেরাও কিছু জানে না। মোড়ের মাথার পানওয়ালা বলেছে যে, সোনালি শাড়ি পরা মেয়েটিকে সে দেখেছে। মেয়েটি নাকি চারটে নাগাদ ব্লু-স্টারে ঢুকেছিল। না, ওকে সে বেরিয়ে আসতে দ্যাখেনি।

আর কিছু পাওনি?

পেয়েছি, স্যার। হাসল সুরেশ নন্দা ও প্রায় জনাপাঁচেক জহুরির ফোন পেয়েছি। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে বিশ্বনাথ শিভালকর তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লাখ টাকার

হীরে আর চুনি ধারে বেচতে নিয়েছিল–আজ সকালেই। একটু থেমে ও বলল, হয়তো ওই পাথরগুলোর জন্যেই শিভালকর খুন হয়েছে। নয় এও হতে পারে, পাথরগুলো নিয়ে ও পালানোর মতলব করেছিল। কে জানে আসলে কী হয়েছে। হতাশভাবে কথা শেষ করল সুরেশ।

সুরেশকে শ্যাম সরজানা ও কবিতা পারেখের ইন্টারভিউ সংক্ষেপে শোনালাম। তারপর বললাম, শ্যাম সরজানা, কবিতা পারেখ, যমুনা সরকার, নৃপেন দত্ত এবং বিশ্বনাথ শিভালকরের নামে পার্সোনাল ফাইল খুলতে। আর প্রথম চারজন সম্পর্কে অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিজ যেন এই মুহূর্তে শুরু হয়।

আই ওয়ান্ট দ্য ফাইলস টু বিকাম থিক বাই টুমরো নুন–শার্প।

পরদিন সন্ধ্যায় সব খবরই পাওয়া গেল।

অন্য তিনজন আইনের চোখে নিষ্পাপ নাগরিক সার্টিফিকেট পেলেও যমুনা সরকার আমাদের অবাক করল। তদন্তে জানা গেছে, ও বিবাহিতা, এবং ওর স্বামী এক জেল খাটা দাগি আসামি। তার নাম রূপেন সরকার। মাত্র চারদিন আগে সে ক্রিমিনাল মেন্টাল হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

রূপেন সরকারের কীর্তির ইতিহাস খুলে দেখা গেল, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, কিডন্যাপিং ইত্যাদি সে-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ। এবার সে ধরা পড়েছিল সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে। তার অপরাধের একমাত্র সঙ্গী নরেশ রাও। রূপেনের বর্তমান ঠিকানা জানা যায়নি, তবে নরেশ রাও বর্তমানে আছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের আট নম্বর বাড়িতে। ওটাই তার বরাবরের ডেরা।

ফাইলগুলো আমার পড়া শেষ হলে সুরেশ বলল, শিভালকর কি জানত, ওর গার্লফ্রেন্ডের একটা স্বামী আছে?

আর সেই স্বামী পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে মাত্র চারদিন আগে! নাটক দারুণ জমে উঠেছে, সুরেশ।

উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিলাম। অপারেশন ডিভিশনকে বললাম রূপেন সরকারকে যেখান থেকে তোক পিক আপ করতে। তারপর বেরোনোর জন্যে তৈরি হলাম।

সুরেশকে বললাম, চল, মিসেস যমুনা সরকারকে একবার দর্শন দিয়ে আসি। অনেকক্ষণ ওকে বঞ্চিত করে রেখেছি।

.

কিন্তু ঘটনাচক্রে মিসেস যমুনা সরকার সত্যিই বঞ্চিত থেকে গেল, কারণ ও বাড়ি ছিল না।

তদন্তে জানা গেছে, যমুনা সরকার রূপেন সরকারের সঙ্গে থাকে না, এবং স্বামীর গুণের কথা চিন্তা করেই হয়তো নিজেকে এখনও কুমারী বলে ঘোষণা করে চলেছে। ওর পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখলাম তালা বন্ধ। সুরেশের দিকে এক পলক তাকালাম ও অর্থাৎ ঠিকানা জানতে ও ভুল করেনি তো! ও আমার নীরব সংশয় বুঝতে পেরে বলল, এই ফ্ল্যাটেই উনি থাকেন। নো মিসটেক।

নরেশ রাওয়ের ফ্ল্যাটে গিয়েও একই ফল হল। রাও বাড়িতে নেই। তা হলে কি ও রূপেনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে?

সিঁড়ি নামতে নামতে সুরেশকে বললাম, এই রেটে যদি তদন্ত এগোতে থাকে তা হলে আমাদের রিটায়ার করতে আর বেশি দেরি নেই।

ধর্মতলা পোস্ট অফিস থেকে ডিপার্টমেন্টে ফোন করলাম। বললাম, যমুনা সরকার কিংবা নরেশ রাওকে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে থানায় হাজির করতে। এ ছাড়া দুজন সাদা

পোশাক ডিটেকটিভকে ওদের ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখতে বললাম। তারপর আমরা গাড়িতে উঠলাম।

আমি চালাচ্ছি, ড্রাইভারের সিটে উঠে বসল সুরেশ, জিগ্যেস করল, কোথায় যাবেন এখন?

নিয়ের এক জগন্নাথ সরকার লেন। খিদিরপুর।

নৃপেন দত্ত? সুরেশই ঠিকানাটা খুঁজে বের করেছে, তাই ও জানে।

হ্যাঁ। শিভালকরের রক্তের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওকে বললাম।

সুরেশ না দীর্ঘশ্বাস ফেলল : বেচারা শিভালকর। এই শহরে কে যে ওর বন্ধু ছিল তা শুধু ঈশ্বরই জানেন!

নৃপেন দত্তর বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ। মাথার দুপাশের চুলে পাক ধরেছে। দীর্ঘকায় বলেইহয়তো শরীরের কাঠামো কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। ঠিকরে আসা চোখের ওপর রিমলেস চশমা। প্রত্যেক প্রশ্নেরই চটপট উত্তর দিল সে—শুধু একটা প্রশ্ন ছাড়া ও চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে সে কোথায় ছিল। সে বলল, ওই সময়টা সে গঙ্গার ধারে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এবং হীরে কেনাবেচার কথা ভাবছিল।

আর বিশ্বনাথ শিভালকরের সঙ্গে তার মন কষাকষির ব্যাপারটা? না, না, ওটা নিছকই ভুল বোঝাবুঝি। তার বেশি কিছু নয়। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে শিভালকরের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। আর সেইখানেই ওই ঘটনার ইতি।

হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানতে চাইলাম নতুন কোনও খবর আছে কি না। জানা গেল, আছে।

নরেশ রাওয়ের ফ্ল্যাটের ওপর যাকে নজর রাখতে বলেছিলাম একটু আগে সে ফোন করে বলেছে, নরেশ রাওয়ের সঙ্গে চেহারার বিবরণ মেলে এমন একটি লোককে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখা গেছে।

.

রাওয়ের বাড়িটা আকৃতিতে পাঁচতলা, প্রকৃতিতে ধর্ষিতা কুমারী। একতলার প্রতিটি কাচের জানলায় আঠা দিয়ে কাগজের টেপ লাগানো। বাড়ির দরজায় আবর্জনার স্তূপ। বারান্দার রেলিং কোথাও আছে কোথাও নেই, এবং এককালে বাড়িটার কী রং ছিল এ প্রশ্ন তুলে অনেকের সঙ্গেই বাজি লড়া যায়।

দরজা খোলাই ছিল, সুতরাং ভেতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হল না। নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে নক করলাম। সাড়া নেই।

কিন্তু ভেতরে যেন কারও নড়াচড়ার শব্দ পেলাম।

দরজায় ধাক্কা দিলাম।

কেউ সাড়া দিল না, আর নড়াচড়ার শব্দটাও যেন হঠাৎ থেমে গেল।

দরজা খুলুন! পুলিশ! আমি বললাম।

ভদ্রভাষায় দরজা খুলবে না, সুরেশ বলল, তারপর এগিয়ে এসে দরজায় একটা মাঝারি লাথি কষিয়ে দিল। একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ওপেন আপ! পুলিশ!

প্রায় পনেরো সেকেন্ড কেটে গেল।

সুরেশকে দরজার কাছ থেকে সামান্য সরিয়ে এনে বললাম, এখানে দাঁড়াও। আমি পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দা দিয়ে রাওয়ের ফ্ল্যাটে ঢুকছি। যদি সেরকম কোনও শব্দ পাও সটান

দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে।

পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দা দিয়ে কার্নিশ বেয়ে পা টিপে টিপে রাওয়ের ফ্ল্যাটের দিকে এগোলাম। যেন দীর্ঘ কয়েক বছর পর ফ্ল্যাটের পেছনের কাচের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আর একটু এগোলেই বারান্দার ভাঙা রেলিং।

কিন্তু জানলার পরদায় সামান্য ফাঁক ছিল। সুতরাং ঘরের ভেতর উঁকি মারলাম।

শ্যাম সরজানার ফ্ল্যাটে দেখা ছবির সেই মেয়েটি তার শীতল সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় সেই বাঁকা হাসির রেখাঁটি ওর ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেছে। কারণ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আলুথালু বেশে ঘরের বিছানায় ও পড়ে আছে মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছে না।

সুতরাং মিসেস যমুনা সরকারের দেখা পেলাম।

বাঁধন নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার ফলে ওর সোনালি সিল্কের শাড়ি অনেকটা উঠে গেছে। এবং প্রকাশিত হয়ে পড়েছে পায়ের গোছ, ফরসা ঊরু ইত্যাদি।

জানলাটা চেষ্টা করেও খুলতে পারলাম না। ভেতর থেকে বন্ধ। কোমরের হোলস্টার থেকে ৩৮ পুলিশ স্পেশাল বের করে জানলার কাঁচে আঘাত করলাম। ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়ল ঘরের ভেতর। একলাফে ঘরে ঢুকলাম। ছুটে গেলাম শোবার ঘরের দরজার দিকে।

ফ্ল্যাটের দরজা টেনে খুলতে যাব, দড়াম করে দরজা ভেঙে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল সুরেশ নন্দা, হাতে উদ্যত রিভলভার।

কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে ও আর দেরি করেনি।

শুন্য ঘরে আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কথা নেই।

কিসের আওয়াজ হল? আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সুরেশ, শুনতে পাননি?

শোবার ঘরে যমুনা সরকার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে, আমি বললাম, আমরা ওর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনেছি। বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিল।

যমুনা সরকার? এখানে?

হ্যাঁ। মাথা নেড়ে বললাম, পরনে চোখ-ধাঁধানো সোনালি সাউথ ইন্ডিয়া সিল্ক। ব্লু স্টারে যে-মেয়েটি শিভালকরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তারও পরনে একই শাড়ি ছিল।

ইতিমধ্যে হট্টগোলের শব্দে অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা চারপাশে এসে ভিড় জমিয়েছে। এখন তারা হাঁ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে।

তাদের আমি বললাম, আপনারা দয়া করে চলে যান। এ পুলিশের ব্যাপার।

মিসেস যমুনা সরকার আতঙ্কে উত্তেজনায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন। শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে ওর মিনিটদশেক সময় লাগল। তারপর আমাদের শোনাল ওর কাহিনি। মাঝেমধ্যে অবশ্য খেই হারিয়ে ফেলতে লাগল। অবশেষে, বহু জোড়াতালি দিয়ে গোটা গল্পটা আমরা উদ্ধার করলাম।

ওর কথা অনুযায়ী, এক ঝুটো কিডন্যাপিংয়ের ঘটনায় জোর করে ওকে রাজি করানো হয়েছে। ক্রিমিনাল মেন্টাল হসপিটালে থাকাকালীন যমুনার স্বামী রূপেন সরকার বিশ্বনাথ শিভালকরের সঙ্গে ওর গোপন প্রেমের ব্যাপারটা জানতে পারে। রূপেন সরকারকে যমুনা ভীষণ ভয় করে। কারণ, তাকে ছেড়ে আসার পর থেকেই যমুনার প্রতি রূপেনের আক্রোশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সুতরাং, চারদিন আগে হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে নরেশ রাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এবং দুজনে মিলে ঠিক করে, যমুনার প্রতি শিভালকরের দুর্বলতার চরম দাম তুলবে। আর একইসঙ্গে যমুনার ব্যভিচার-এর শোধ নেবে।

শিভালকরের মৃত্যুর আগের দিন রাতে রূপেন ও নরেশ যমুনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, নরেশ রাওয়ের ফ্ল্যাটে নিয়ে তোলে। তারপর খুনের হুমকি দেখিয়ে পরদিন ভোরবেলা ওকে দিয়ে বিশ্বনাথকে ফোন করায়। এই ফোনের কথা আমরা সরজানার কাছে শুনেছি। যমুনা বিশ্বনাথকে বলে যে, ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এবং সে যদি সহজে বিক্রি করা যাবে এমন কতকগুলো ছোট ছোট মণিরত্নের ব্যবস্থা করতে পারে, তা হলেই যমুনাকে বাঁচাতে পারবে, নয়তো নয়। পাথরগুলোর দাম অন্তত দেড় লাখ টাকা হওয়া চাই। বিশ্বনাথের নিজেরও তেমন ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। কারণ তার ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি থেকেই সে পাথরের দাম পেয়ে যাবে। বিশ্বনাথকে শুধু বানিয়ে বলতে হবে যে, দুজন সশস্ত্র লোক রিভলভার নিয়ে তাকে অন্ধকারে আক্রমণ করে ও পাথরগুলো কেড়ে নেয়। তারপর একটা নীল মারুতি করে পালিয়ে যায়। না, অপরাধীদের সে চিনতে পারেনি।

এই দেড়লাখ টাকার পাথর একটা শ্যাময়-লেদার ব্যাগে ভরে বিশ্বনাথ শিভালকর সি. আই. টি. রোডের ব্লু স্টার হোটেলে গিয়ে উঠবে। না, ছদ্মনামে নয়, নিজের নামে সেখানে সে একটা ফোন পাবে। সেই ফোনেই বলে দেওয়া হবে পাথরগুলো কোথায় কীভাবে সে পৌঁছে দেবে। কিন্তু রূপেন সরকার ব্লু-স্টারে ফোন করে কথামতো শিভালকরকে পায়নি। তখন সে ভীষণ খেপে যায়।

যমুনা সরকার উত্তেজিত গলায় বলল, আমি যে কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিছু একটা করতে হবে–শুধু এটাই মনে হচ্ছিল। তারপর হঠাৎই ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোনোর একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। ব্যস, বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর? সুরেশ নন্দা প্রশ্ন করল।

আমার স্বামী যখন ব্লু-স্টারে বিশ্বনাথের রুম নাম্বারটা নরেশ রাওকে বলে, তখন আমি শুনতে পেয়েছিলাম। সুতরাং একটা ট্যাক্সি ধরে ব্লু-স্টারে গেলাম। হাজার ধাক্কা মেরেও বিশ্বনাথের ঘরের দরজা কেউ খুলল না। এমন সময় পেছনে কারও পায়ের শব্দ পেলাম– তাকিয়ে দেখি আমার স্বামী দাঁড়িয়ে, তার হাতে একটা রিভলভার। ভাবলাম, ও বোধহয়

আমাকে তক্ষুনি খুন করবে কারণ ওর দু-চোখে তখন খুনের আগুন জ্বলছে। কিন্তু দেখলাম, ও রিভলভারটা পকেটে রেখে চাপা গলায় বলল, যেভাবেই হোক পাথরগুলো আমার চাই। বলে একটা প্লাস্টিকের পাত বের করে বিশ্বনাথের ঘরের দরজা ও খুলে ফেলল। দরজার হাতলের কাছে ফ্রেম ও দরজার ফাঁকে পাতটা ও ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর কী যেন একটা করতেই

আর বলতে হবে না। ও কায়দা আমরা জানি। তারপর কী হল? সুরেশ বলে উঠল।

যাই হোক, দরজা খুলে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকলাম, আর তখনই দেখি–দেখি বিশ্বনাথ বিছানায় পড়ে আছে। স্পষ্ট বুঝলাম, ও মারা গেছে। আমি হয়তো চিৎকার করে উঠছিলাম, কারণ রূপেন ঠাস করে আমাকে এক চড় মেরে খিঁচিয়ে বলে উঠল, চুপ করো!

তারপর পাথরগুলো ও অনেক করে খুঁজল, কিন্তু বৃথাই। তখন রাগে আমার ওপর মারধোর শুরু করল। তারপর শাড়ির আড়ালে রিভলভার ধরে আমাকে ট্যাক্সি করে আবার নিয়ে এল এখানে।

আপনাকে বেঁধে রেখেছিল কেন? সুরেশ জানতে চাইল।

ওরা আমাকে খুন করবে ঠিক করেছে। রূপেনকে আমি সে কথা বলতে শুনেছি। ওদের মতলব আমি ফঁস করে দিই তা ওরা কোনওরকমে চায় না। তা ছাড়া রূপেনের ধারণা আমি ওদের মতলবের খবর কোনও না কোনওভাবে বিশ্বনাথকে জানিয়ে দিয়েছি।

ওরা এখন কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

জানি না। মিনিট কুড়ি আগে ওরা কোথায় যেন গেছে। হঠাৎই যমুনার দু-চোখ জলে ভরে উঠল। কান্না মেশানো গলায় ও বলল, ওরা আমাকে দিয়ে জোর করে এসব করিয়েছে। ওদের কথা না শুনলে ওরা আমাকে খুন করত। তা ছাড়া এমনিতেই তো আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। বিশ্বাস করুন, বিশ্বনাথকে আমি সত্যি ভালোবাসতাম!

সুরেশ এবং আমি অপলকে ওর দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিশ্বাস করুন প্লিজ। যমুনার চোখে যমুনা, মনে যমুনা : যা যা আপনাদের বলেছি তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি।

বিশ্বাস করলাম।

তারপর ফোন করে রাওয়ের বাড়িটার নজর রাখার জন্যে আরও কয়েকজন লোক লাগিয়ে দিলাম এবং বললাম, রূপেন সরকার ও নরেশ রাওকে যেখান থেকে হোক, যে-কোনও

অবস্থায় তোক, হেডকোয়ার্টারে তুলে আনতে। তারপর মিসেস সরকারকে নিয়ে আমি ও সুরেশ রওনা হলাম লালবাজার অভিমুখে।

.

ও.সি.-র কাছে রিপোর্ট করতে যাওয়ার আগে নিজের টেবিলটায় একবার নজর বুলিয়ে নিলাম। দেখি ট্রেতে একটা রিপোর্ট পড়ে আছে। তুলে নিয়ে দেখি, শিভালকরের ঘরে পাওয়া কাচের গ্লাসের লিপস্টিক ছাপের রিপোর্ট। বলছে, শিভালকরের বিছানায় পাওয়া এল.সি. লেখা লিপস্টিক ও গ্লাসের লিপস্টিক একই। এ ছাড়া একটা অদ্ভুত খবরও আছে? গ্লাসের লিপস্টিকের ছাপ কোনও মেয়ের ঠোঁট থেকে লাগেনি, বরং মনে হয়, হাতের বুড়ো আঙুল বা তর্জনী দিয়ে কেউ গ্লাসের ওপর সেই ছাপ দিয়েছে। অটপ্সি থেকে জানা গেছে, বিশ্বনাথ শিভালকর যখন মারা যায় তখন তার রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ ছিল পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট। এবং ডাক্তারি রিপোর্ট বলছে, কোনও ভেঁতা অস্ত্র দিয়ে নাকের গোড়ায় আঘাত করার ফলেই শিভালকর মারা গেছে।

রিপোর্টে চোখ বোলানো শেষ হতেই সুরেশ নন্দা ঘরে এসে ঢুকল। বলল, স্যার, ওদিকে মিসেস সরকারের স্টেটমেন্ট নেওয়া কমপ্লিট। আর আশু চক্রবর্তী লিপস্টিকের জহুরি

ছাপের খবর এনেছে। সুখবরই বলতে হবে। কারণ শুধু যে ও জহুরির নামই পেয়েছে তা নয়, লিপস্টিকের মালকিকেও খুঁজে বের করেছে। ললিতা চৌধুরি, বালিগঞ্জ প্লেসে থাকে।

এ.এস.আই. আশু চক্রবর্তীকে সুরেশই বোধহয় লিপস্টিক তদন্তে লাগিয়ে থাকবে। সুতরাং প্রশ্ন করলাম, চক্রবর্তী মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছে?

হ্যাঁ। ললিতা চৌধুরির বক্তব্য, লিপস্টিকটা তার বয়ফ্রেন্ড অসীম সরকারের উপহার। অসীম সরকার বড়লোকের ছেলে, কন্সট্রাকশনের বিজনেস। তা ছাড়া লিপস্টিকটা ললিতাকে গিফট সার্টিফিকেট করে দেওয়া আছে।

চক্রবর্তী ললিতা চৌধুরিকে আগে থাকতে না ঘাঁটালেই পারত। যদি সত্যিই মেয়েটা অপরাধী হয় তা হলে এখন সতর্ক হয়ে যাবে। যাই হোক, দুশ্চিন্তা ছেড়ে প্রশ্ন করলাম, ললিতা চৌধুরি ব্লু-স্টার হোটেলে কবে গিয়েছিল?

আর বলবেন না। হাসল নন্দা ও মেয়েটা নাকি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। আশু চক্রবর্তীকে প্রথমে ও বলে, ও কোনওদিন ব্লু-স্টার হোটেলে যায়নি। কিন্তু অনেক সময় নষ্টের পর স্বীকার করে যে, ও গিয়েছিল প্রায় মাসখানেক আগে। কিন্তু কার সঙ্গে সেটা বলতে চাইছে না। তারপর নাকি ওই হোটেলের ছায়াও আর মাড়ায়নি। ওঃ, গল্প বটে একখানা!

ঠিক আছে, মেয়েটার সঙ্গে আমি পরে একবার কথা বলব। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম, টেবিলে টোকা মেরে একটা তাল বাজিয়ে চললাম। মনে চিন্তার সূক্ষ্ম রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। মিথ্যে কথা যে কেউ একজন বলছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে সেই একজন ললিতা চৌধুরি নয়। তা হলে কে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সুরেশকে বললাম, মিসেস সরকারের জন্যে একজন উকিলের ব্যবস্থা করতে।

ও অবাক হল। বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, মিথ্যে কথার ধাঁধায় কেউ একজন আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। একটু থেমে আরও যোগ করলাম : মিসেস সরকার ও.সি.-র ঘরে আছেন। দেখো যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়।

সুরেশ নন্দা প্রথমটা অবাক হল, তারপর সামলে নিয়ে বলল, আমি আপনার সঙ্গে যাব?

ভয়ের কোনও কারণ নেই, সুরেশ। রিভলভারটা ঠিকমতো আছে কি না পরীক্ষা করে নিলাম। তারপর বললাম, তা ছাড়া একজনের এখানে থাকা দরকার। বলা যায় না, হঠাৎ যদি রূপেন সরকার বা নরেশ রাওয়ের খবর আসে।

একতলায় নেমে এলাম। একটা প্রাইভেট কার বেছে নিয়ে রওনা হলাম। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম বিশ্বনাথ শিভালকরের লাশটা চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে।

.

ব্লু-স্টার হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন রিসেপশন কাউন্টার সুজি গোমেজ-শূন্য। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। রাত বেশি না হলেও হোটেলের পরিবেশে কেমন এক অদ্ভুত নীরবতা থমথম করছে। তার কারণ কি বেমরসুম? কী জানি, জানি না।

কাউন্টারের ওপাশে প্রতাপ অ্যাডভানির ঘরে আলো জ্বলছে। দরজার তলা দিয়ে সেই আলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ঘরের ভেতরে কারও চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চুপি চুপি কাউন্টারের ওপারে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে হাতের চাপ দিয়ে দরজা সামান্য ফাঁক করলাম। ঘরের দৃশ্য দেখার পক্ষে ইঞ্চি তিনেকই যথেষ্ট।

প্রতাপ অ্যাডভানি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একটা সুটকেস গোছগাছ করছেন। পরনের পোশাক দেখে মনে হয় এক্ষুনি বাইরে কোথাও বেরোবেন। একবার ছুটে আসছেন বিছানার

ওপর রাখা খোলা সুটকেসের কাছে, আর একবার ছুটে যাচ্ছেন আলমারির কাছে। যেন হাতে অনেক কাজ, কিন্তু তুলনায় সময় অনেক কম।

আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, মিস্টার অ্যাডভানি? ঘরের ভেতরে পা রেখে হালকা স্বরে বললাম।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যাডভানি। আমার মুখোমুখি। মুহূর্তে ওঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন। রুক্ষভাবে জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার? কারও ঘরে যে নক করে ঢুকতে হয় সেটুকুও জানা নেই?

আছে। আমি বললাম, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কথা ভেবে সেটা প্রয়োজন মনে করিনি।

একটা প্লেনের টিকিট বাঁ-পাশের একটা টেবিলে পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে নামটা পড়লাম। জনৈক অমৃত নাথানির নামে একটা বম্বের টিকিট।

শুধু যাওয়ার টিকিট? আমি মন্তব্য করলাম।

হোটেলের একজন গেস্টের। কিন্তু এসবের মানে কী, ইন্সপেক্টর?

আর যে-সুটকেসটা গোছগাছ করছেন ওটাও বোধহয় সেই গেস্টেরই?

যারই হোক, আপনার জানার কোনও দরকার নেই। ইচ্ছে হলে কোথাও যেতে পারব না এমন কোনও আইন এ দেশে আছে কি?

থাকতে পারে। বিশেষ করে পুলিশি তদন্তে যারা বাধার সৃষ্টি করে তাদের জন্যে তো বটেই।

বাধার সৃষ্টি? সে আবার কী? আপনার কাজে কোথায় বাধা দিয়েছি আমি?

মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করে। আপনি বলেছেন, চারটে নাগাদ বিশ্বনাথ শিভালকরকে প্যাটেল নামে কেউ ফোন করেছিল।

তাতে কী হয়েছে?

প্যাটেল বলে কেউ নেই, মিস্টার অ্যাডভানি। আর বিশ্বনাথ শিভালকর সেদিন ফোনে কোনও কথাই বলেননি। মদ খাওয়া তার অভ্যেস ছিল না, কিন্তু সেদিন হোটেলের ঘরে বসে তিনি প্রচুর মদ খেয়েছিলেন। আর মরবার সময় তার রক্তে অ্যালকোহল ছিল পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট। চারটের সময় তিনি যে শুধু মদে চুর ছিলেন তা নয়, কথা বলবার জন্যে মুখ হাঁ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। একটু থামলাম। তারপর বললাম, আপনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন, মিস্টার অ্যাডভানি?

না–আমি–মানে—আমি–।

তারপর ধরুন ওই লিপস্টিকের ব্যাপারটা। ওটা আপনি মিস্টার শিভালকরের বালিশের ফাঁকে রেখে দিয়েছিলেন। মাসখানেক আগে ললিতা চৌধুরি নামে একটি মেয়ে এই হোটেলে এসে ওই লিপস্টিকটা হারায়। আপনি সেটা পেয়ে আপনার টুকিটাকি রাখার পিচবোর্ডের বাক্সে রেখে দেন–যে-বাক্স থেকে আপনাকে আমি জেলুসিল ট্যাবলেট বের করে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেটাকে আপনি আট-দশ টাকাওয়ালা গোল্ড প্লেটেড অ্যালুমিনিয়াম লিপস্টিক ভেবেছিলেন, সেটা সত্যিই ছিল সোনার তৈরি, গায়ে সুন্দর খোদাইয়ের কাজ করা।

আমাকে বাধা দিয়ে প্রতাপ অ্যাডভানি বললেন, বুঝেছি, আপনি আমাকে ওই খুনের দায়ে ফাঁসাতে–।

খুন বলছেন কেন? মোলায়েম সুরে বললাম, আপনার তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিশ্বনাথ শিভালকর আত্মহত্যা করেছে।

প্রতাপ অ্যাডভানির মুখে ঘাম, চোখ চঞ্চল। কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না।

আমি বললাম, আরও একটা কথা। হাতে করে কিছুটা লিপস্টিক আপনি একটা গেলাসের কানায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আমরা ভাবি, মিস্টার শিভালকরের ঘরে কোনও মেয়ে দেখা করতে এসেছিল। এতেই আমি একটু অবাক হয়েছি, মিস্টার অ্যাডভানি। আপনি কেন এত কষ্ট করতে গেলেন?

আমি–কথা শুরু করেও থমকে গেলেন অ্যাডভানি। চোখে আগুন নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। খোলা সুটকেস থেকে জামাকাপড়ের প্রথম থাকটা তুলে ফেললাম। হ্যাঁ, জায়গামতোই জিনিসটা পেলাম। কালো চামড়ার ছোট পাউচ একটা। আমার বিশ্বনাথ শিভালকরের কথা মনে পড়ল। পাউচটা চোখে পড়ার মুহূর্তেই পিঠে অ্যাডভানির রিভলভারের খোঁচা অনুভব করলাম। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় দশ সেকেন্ড সব চুপচাপ। আমরাও নিশ্চল। তারপর…।

বাথরুমে গিয়ে ঢুকুন, অ্যাডভানি আদেশ দিলেন।

আমি বললাম, কী লাভ? গুলির শব্দ এ-হোটেলের প্রতিটি বোর্ডার শুনতে পাবে।

পাক। ক্ষতি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, এগোন, মিস্টার বরাট।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে খুব ধীরে একটা পা ফেললাম বাথরুমের দিকে আর পরমুহূর্তেই মেঝেতে শুয়ে পড়লাম এবং গড়াতে-গড়াতে নিজের রিভলভারটা বের করে নিতে চেষ্টা করলাম।

অ্যাডভানির প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, কিন্তু দ্বিতীয়টা আমার বাঁ-হাতের বাইসেপ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আমার রিভলভার সক্রিয় হল। এবং পেটে লাগা গুলির ধাক্কায় প্রতাপ অ্যাডভানির শরীরটা হাতচারেক পেছনে ছিটকে পড়ল।

মন্থরগতি চলচ্চিত্রের মতো পুরো ঘটনাটা দেখতে পেলাম। একটু একটু করে অ্যাডভানির ডান হাতটা নেমে এল। অবশেষে রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে। ওর দু-হাত একে একে ভাঁজ হয়ে এসে জড়ো হল পেটের কাছে। ওর শরীরটা সামনে পেছনে কয়েক সেকেন্ড ধরে দুলতে লাগল। তারপর খুব ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেতে।

এক লাথিতে অ্যাডভানির রিভলভারটা খাটের তলায় ঠেলে দিলাম। আমারটা আবার ঢুকিয়ে রাখলাম হোলস্টারে, এবং সুটকেস থেকে দুটো পরিষ্কার গেঞ্জি বের করে নিলাম।

প্রতাপ অ্যাডভানির মনোযোগ এখন শুধু নিজের তলপেটের ক্ষত থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের দিকে। একটা গেঞ্জি ওর বেল্টের নীচে ক্ষতস্থানে গুঁজে দিলাম–যদি রক্তপাত একটু বন্ধ হয়। অন্য গেঞ্জিটা আমার বাঁ-হাতের বাইসেপে বেঁধে নিলাম। প্রতাপ অ্যাডভানি আচ্ছন্ন চোখে আমাকে লক্ষ করতে লাগলেন। ওঁকে ওই অবস্থায় রেখে বেরিয়ে এলাম কাউন্টারে। ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলাম। ইতিমধ্যে হোটেলের বহু গেস্টই নীচের লবিতে এসে হাজির হয়েছে, কিন্তু তাদের কৌতূহলী নজরকে কোনও আমল দিলাম না।

দশ মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স চলে এল। স্ট্রেচারে করে অ্যাডভানিকে পেছনের তোলা হল। আমি উলটোদিকে লম্বা সিটে মাথা নীচু করে বসলাম। অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনড্যান্ট আমার পাশে এসে বসল। পরমুহূর্তেই একটা আলতো কঁকুনি দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটা চলতে শুরু করল।

জড়ানো গলায় অ্যাডভানি বললেন, মিস্টার বরাট, আপনি আমাকে খুন করলেন? আমি—আমি–।

অ্যাম্বুলেন্স-অ্যাটেনড্যান্ট অ্যাডভানির কথা শুনে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি পা দিয়ে ওর পা চেপে ধরলাম। ও চুপ করে গেল। আমি জানি, অ্যাটেনড্যান্ট ছেলেটা বলতে যাচ্ছিল যে, অ্যাডভানির মরার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আর সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কোনও মানুষ যদি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করে যে, সে মারা যাচ্ছে, তা

হলে তার যে কোনও স্বীকারোক্তির দাম তখন মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তির সমান। এখন আমার কাজ হল অ্যাডভানিকে ভুল ধারণার মধ্যে থাকতে দিয়ে যে করে তোক একটা ডাইং ডিক্লেয়ারেশন আদায় করা।

সুতরাং আমি বললাম, আপনার কিছু বলার থাকলে এখনই বলতে পারেন, মিস্টার অ্যাডভানি। পরে আর হয়তো সময় পাবেন না।

প্রতাপ অ্যাডভানি চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। আমার কথায় নিষ্পলক চোখে অসহায়ভাবে তাকালেন। তারপর চোখ সরিয়ে নিলেন। অ্যাম্বুলেন্সের দোলানিতে ওর মাথাটা এপাশ-ওপাশ নড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আপনমনেই বললেন অ্যাডভানি, ক্যারাটে শেখাই আমার কাল হয়েছে, নইলে বিশ্বনাথ শিভালকর আজ বেঁচে থাকতেন, আর...আর আমাকেও এভাবে মরতে হত না। ওঁর গলার স্বর নিস্পৃহ, দুর্বল অথচ তিক্ততায় ভরা।

মিস্টার শিভালকর ক্যারাটে চপ-এর আঘাতে মারা গেছেন? আমি নীচু স্বরে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, ওই হীরে আর চুনিগুলো দেখে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। মিস্টার শিভালকরের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দরজাটা অর্ধেক ভোলা ছিল। দেখলাম, উনি হুইস্কির বোতল হাতে বিছানার বসে আছেন। ভাবলাম, মদ খেয়ে ওঁর শরীর ঠিক নেই। তাই দরজাটা ভেজিয়ে দিতে গেলাম। তখনই দেখলাম সাদা আর লাল পাথরগুলো বিছানার ছড়িয়ে পড়ে আছে। ব্যস– একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অ্যাডভানির বুক ঠেলে।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, লোভ সামলাতে পারলাম না। এই হোটেল-ম্যানেজারি করে কপয়সাই বা পাই! সারাজীবন আমাকে পয়সার জন্যে কষ্ট করতে

হয়েছে। ভাবলাম, পাথরগুলো সরিয়ে নিলে মিস্টার শিভালকর এ অবস্থায় টেরও পাবেন না। তাই করলাম। আমার পকেটে একটা ছোট পাউচ ছিল, পাথরগুলো তাতে ভরে ফেললাম। চলে আসতে যাব, ঠিক তখনই মিস্টার শিভালকর আমার দিকে ফিরে তাকালেন...।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। অতগুলো জহরত হাতছাড়া হয়ে যাবে এ যেন ভাবতেই পারলাম না। চকিতে আমার ক্যারাটে ব্লো ছুটে গেল মিস্টার শিভালকরের কপাল লক্ষ করে। তারপর...বললাম তো, ক্যারাটে শেখাই আমার কাল হল। প্রতাপ অ্যাডভানি থামলেন।

আমি বললাম, তারপর ওঁকে জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন?

না, তখন ফেলিনি। অনেক পরে ওই মতলবটা আমার মাথায় আসে। অ্যাডভানির শ্বাস-প্রশ্বাস এখন আরও দ্রুত হয়ে এসেছে, কণ্ঠস্বরও অনেক দুর্বল বাকিটা তো আপনি জানেন। লিপস্টিক, টেলিফোন, প্যাটেল...নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরাতে গিয়ে আমি সব গোলমাল করে ফেলেছি। তার ওপর পেটের এই আলসারের যন্ত্রণা। আমার মাথার ঠিক ছিল না...আমি ভেবেছিলাম...।

কী ভেবেছিলেন? উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অ্যাডভানি। বিড়বিড় করে বললেন, আমার চেয়ে বোকা আর কেউ নেই।

অ্যাম্বুলেন্সটা ততক্ষণে হসপিটালের কাছাকাছি এসে গেছে। হঠাৎই ভীষণ ক্লান্ত লাগল। না, এখন প্রতাপ অ্যাডভানির ভুল ধারণাটা ভেঙে দেওয়া দরকার। তাই পাশে বসা অ্যাটেনড্যান্টকে বললাম, এবার সত্যি কথাটা ভদ্রলোককে বলতে পারো।

অ্যাডভানির ওপর ঝুঁকে পড়ল ছেলেটা। একটা চোখের পাতা উলটে দেখল, তারপর অভ্যাসগত সুরে বলল, লাভ নেই, স্যার। মারা গেছেন।